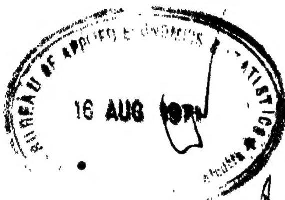


পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা



তৃতীয় খণ্ড

অরুণ কুমার রায়

সুকুমার সিংহ

সম্পাদক অশোক মিত্র


পশ্চিমবঙ্গের
পূজা-পার্বণ ও মেলা

পি. আর. জি. ১৬৩ (বি) (iii) (এন)
১,০০০

অন্নপূর্ণা প্রেস, ৫১এ, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯, ভারত হইতে মুদ্রিত এবং দি ম্যানেজার অব্ পাবলিকেশনস্, সিভিল লাইনস্, দিল্লী হইতে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত।

মূল্য : ১০টা. ৫০প. বা ২৪শি. ৬পে. বা ৩ড. ৭৮সে.



ভারতের জনগণনা, ১৯৬১
পশ্চিমবঙ্গ
অধ্যায় ১৬, পার্ট ৭-বি

পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা

তৃতীয় খণ্ড

অনুসন্ধান, সংকলন ও গ্রন্থনা
অরুণ কুমার রায়

তত্ত্বাবধায়ক
সুকুমার সিংহ

সম্পাদক
অশোক মিত্র

- পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা
  প্রথম খণ্ড (প্রকাশিত)
- পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা
  দ্বিতীয় খণ্ড (প্রকাশিত)
- পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা
  তৃতীয় খণ্ড (বর্তমান গ্রন্থ)
- পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা
  চতুর্থ খণ্ড (যন্ত্রস্থ)
- পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা
  পঞ্চম খণ্ড (সংকলন হইতেছে)

মানচিত্র : শ্রীজলধী দাশগুপ্ত
ও
শ্রীসুধীর চট্টোপাধ্যায়

আলোকচিত্র : শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সিংহ
মুখ্য আলোক চিত্রশিল্পী,
আনন্দবাজার পত্রিকা
ও
শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায়

রেখচিত্র : শিল্পী শ্রীজিতেন দাস

প্রচ্ছদপট
পরিকল্পনা
ও অঙ্কন : শিল্পী শ্রীজিতেন দাস
ও
শ্রীঅরুণ কুমার রায়

ভূমিকা

'পশ্চিমবঙ্গ জনগণনা দপ্তর' থেকে পশ্চিমবঙ্গের উৎসব ও মেলা সম্পর্কে যে তালিকা তৈরী করা হয়েছিল তা প্রতিটি জেলায় পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট এবং জেলাবোর্ড কর্তৃপক্ষ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। সংগৃহীত তালিকা দুটির সমন্বয়ে কয়েকটি স্তম্ভে বিভক্ত একটি বিস্তীর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা হয়। যেমন—প্রতি জেলায় থানাওয়ারী মৌজা নম্বরসহ গ্রামের নাম, স্থানীয় নামে খ্যাত উৎসব ও মেলার নাম, ইংরাজী মাসানুসারে উক্ত উৎসব ও মেলার সময়কাল, স্থায়ীত্ব ও পরিশেষে লোকসমাগমের সংখ্যা দেওয়া হয়। এই ধরণের তালিকা সংগ্রহের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল এ বিষয়ে একটি সার সংগ্রহ করা এবং বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল সারা দেশব্যাপী বিশেষ কোন উৎসব বা মেলার বিস্তৃতির চিত্র তুলে ধরা।

নানা বিরুদ্ধ কারণবশতঃ কতকগুলি চিরাচরিত ও প্রাচীন উৎসব ও মেলা আজ অবলুপ্ত হতে চলেছে। ঐ দ্রুত অপস্রিয়মান উৎসব ও মেলাগুলি সম্বন্ধে এখনই স্থায়িভাবে নথী প্রস্তুত করতে না পারলে ভবিষ্যতে আর কোন দিনই সুযোগ পাওয়া যাবে না। এই প্রয়োজনে এবং পূর্ব প্রকাশিত পুস্তকটি যে জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছিল তা লক্ষ্য করে, জনগণনা দপ্তর এ বিষয়ে আরো বিশদ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন মনে করেন।

এই কর্তব্য সাধনে যে সকল সমস্যা উপস্থিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করে কি উপায়ে বিস্তারিত প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে তার বিচার করা হয়। কেবলমাত্র সরকারী বা আধা সরকারী বিভিন্ন দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর না করে প্রতিটি অঞ্চলের অধিবাসীর কাছে তথ্য সরবরাহের জন্য আবেদন জানানো প্রথম প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। স্থির হয়, প্রথমতঃ প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের নিকট, জেলার দৈনিক ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকাগুলির সম্পাদকের নিকট, যুব সংঘ, গ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, গ্রাম ও শহরের গ্রন্থাগারগুলি, এমন কি ডাকবিভাগের পিওনদের নিকটও আবেদন জানানো হবে। প্রথমবারের তুলনায় এবারে তথ্য সংগ্রহের উপায় এইভাবে বহুলাংশে ব্যাপক করা হয়। বলাবাহুল্য, জেলাবোর্ড পঞ্চায়েত এবং আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট আবেদন জানানো হবে বলে স্থির করা হয়। দ্বিতীয়ত এ বিষয়ে একটি সুপরিকল্পিত প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা একান্ত প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে এমন একটি প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা যায় যা অর্থপ্রকাশে স্বয়ংসম্পূর্ণ অথচ আবেদনে পর্যাপ্ত, যার ফলে যে-কোন সংবাদদাতার সম্মুখে এই প্রশ্নমালা উপস্থিত করলে তিনি সহজেই তাঁর ভাষায় স্থানীয় তথ্যাদি সম্পর্কে বক্তব্য প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ পাবেন।

পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে এ বিষয়ে বারবার আলাপ আলোচনা করে চূড়ান্ত প্রশ্নমালা তৈরি করতে যথেষ্ট সময় ব্যয়িত হয়।

প্রশ্নমালা প্রস্তুতকালে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের উপর সর্বদা লক্ষ্য রাখা হয়।

(ক) প্রশ্নগুলির ভাষা এমন সহজবোধ্য হবে যাতে প্রাথমিক শিক্ষাজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদেরও বুঝতে অসুবিধা না হয়। অন্যপক্ষে ঐগুলির প্রয়োগ এমন ব্যাপক রাখা দরকার যাতে সকল প্রকার তথ্য আহরণ করা যায়। সম্পাদনাকালে অপ্রাসংগিক অংশ বাদ দিয়ে বিশদ তথ্যাদি সংরক্ষণে সযত্ন হতে হবে।

(খ) প্রশ্নগুলির সমন্বয়ে যেন যে গ্রামে বা স্থানে মেলা বসে বা উৎসব পালন করা হয়, সেই গ্রামের বা স্থানের পারিপার্শ্বিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকার চিত্র সুস্পষ্টভাবে আহরণ সম্ভব হয়।

(গ) পূজা বা পার্বণের যে সকল বিশিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান বা ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক বিশেষত্ব ফুটে ওঠে সেই সকল বৈশিষ্ট্যের উপর যেন এই প্রশ্নমালা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

(ঘ) প্রশ্নমালার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য এবং সুবিদিত উৎসবের বা মেলার তথ্যাদি ছাড়াও যেন স্বল্পখ্যাত অথচ গুরুত্বপূর্ণ উৎসব ও মেলার তথ্য অন্বেষণও সম্ভব হয়। জেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত উৎসবাদি ও মেলা ব্যতীতও অন্যান্য উৎসব বা মেলার বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই কারণে যে, অনুমোদিত উৎসব বা মেলার সংখ্যা সমস্ত উৎসব ও মেলার সংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য।

(ঙ) মেলা যে আয়তনেরই হোক না কেন প্রতিটির প্রকৃতি ও ক্রয়-বিক্রয়ের আয়তন সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। আহৃত তথ্যের ভিত্তিতে সেই অঞ্চলের গ্রামশিল্প, শিল্পের গতি ও গঠন পদ্ধতি, কাঁচা মালের গতি ইত্যাদি অনুধাবন করা সম্ভব হবে। এসব তথ্য ছাড়াও প্রশ্নমালা থেকে স্থানীয় জনপ্রিয় আমোদপ্রমোদের একটি তালিকা পাওয়া যাবে।

চূড়ান্ত প্রশ্নমালা তৈরি করতে বেশ কয়েক মাস সময় লেগে যায়। অতঃপর প্রশ্নমালা ছাপানোর পর পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রায় দশ সহস্র প্রশ্নমালা ডাকযোগে প্রেরিত হয়। এই আহ্বানে যাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সংখ্যায় এবং সহৃদয়তায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসমাজই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। পূরণ করা প্রতিটি ফর্ম পাওয়ার পর পরীক্ষা করা হয়েছে এবং যে সব ক্ষেত্রে আরও বিশদ বিবরণের প্রয়োজন মনে হয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে আরও পত্রালাপের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

প্রথমে সংগৃহীত তথ্যাদি জেলা ও থানা বরাবর পৃথক করা হয়েছে। পরীক্ষা ও সত্যাসত্য নিরূপণের পর পরে সেগুলি আবার সংকলনের সুবিধার জন্য তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন—

(ক) প্রশ্নমালার 'ক' বিভাগের তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রথম পর্বে গ্রাম, তার অধিবাসী, গ্রামবাসীর উপজীবিকা, যাতায়াতের ব্যবস্থা এবং গ্রামের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারাবাহিক তথ্য ও বিবরণী দেওয়া হবে।

(খ) প্রশ্নমালার 'খ' বিভাগের তথ্যাদির ভিত্তিতে দ্বিতীয় পর্বে উৎসব, দেবদেবীর পূজা, বিশেষ করে অনুষ্ঠানপদ্ধতি ও পূজাপদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য ও বিবরণী দেওয়া হবে।

(গ) প্রশ্নমালার 'গ' বিভাগের তথ্যাদির ভিত্তিতে মেলা ও সংশ্লিষ্ট আমদানি-রপ্তানি, ক্রয়-বিক্রয় ও আমোদ প্রমোদ সম্পর্কে তথ্য ও বিবরণী দেওয়া হবে।

উল্লিখিত পর্ব তিনটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধের সম্পূরক হিসাবে একটি বিস্তারিত সূচীপত্র এবং সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য বিষয়ে গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিশেষ উৎসব ও মেলা সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ ও নথীপত্র থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত হবে।

প্রচুর তথ্যাদি পাওয়া সত্ত্বেও অনুসন্ধানের পরে দেখা যায় যে অনেক মেলা-পার্বণ বাদ পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন থানায় হয়তো মাত্র কয়েকটি উৎসব ও মেলা ছাড়া অন্য কোন উৎসব মেলার বিবরণী আসেনি। তার থেকে এই প্রমাণ হয় যে, সংবাদ সংগ্রহে ফাঁক থেকে গেছে। অতএব, সারা বৎসরে এক একটি বিশেষ অঞ্চলে কোন কোন বিশেষ দেবদেবীর পূজাচার কিভাবে পালন করা হয় এবং সারা দেশব্যাপী ঐ সকল উৎসবাদির প্রসার সম্পর্কে সঠিক অথচ সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ডাকযোগে দ্বিতীয়বার একটি সমীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সংবাদদাতাদের নিকট প্রেরিত পত্রের নমুনা

পত্রসংখ্যা ১

তারিখ : ৯ই জুলাই, ১৯৬৭।

সবিনয় নিবেদন,

বিগত জনগণনার (১৯৫১ সাল) কার্যে সমগ্র দেশবাসীর নিকট হইতে আমাদের দপ্তর যে অকুণ্ঠ সাহায্যলাভ করিয়াছে, কৃতজ্ঞতার সহিত সর্বদাই আমরা তাহা স্মরণ করি। জনগণনার সারণী ও বিবরণী সমূহে আমরা আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপটিই তুলিয়া ধরিতে চেষ্টিত হইয়াছিলাম। এ বিষয়ে যতটুকু সাফল্য অর্জিত হইয়াছে তাহা আপনাদের সকলের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রসাদগুণেই সম্ভব হইয়াছে; যতটুকু হয় নাই তাহা আমাদেরই অক্ষমতায়। আমাদের বিভিন্ন কার্যে আমরা সর্বদাই আপনাদের নিকট হইতে উদার ও অকৃপণ সাহায্য ও সহযোগিতা পাইয়া থাকি; ইহা আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য। নিজের দেশকে প্রকৃতভাবে বুঝিবার ও জানিবার জন্য আজ সকলেই যে আগ্রহান্বিত, ইহা তাহারই অভ্রান্ত পরিচয়।

১৯৫১ সালের জনগণনার পরে "পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও পরবের" একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ আসন্ন হওয়ায় সুধী ও বিদ্বজ্জনেরা অনেকেই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, যেন দ্বিতীয় সংস্করণে পশ্চিমবঙ্গে উপাসিত দেবদেবী এবং তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসব, মেলা ও পরবের বিশদ বর্ণনা ও বিবরণী এই পুস্তকে স্থান পায়। বলা বাহুল্য, ইহা করিতে পারিলে পুস্তকখানির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বর্ধিত হইবে, এবং সুধী ও বিদ্বৎ সমাজে এবং সাধারণভাবে দেশবাসীর নিকট ইহা সমাদৃত হইবে। একান্ত প্রয়োজনীয় এই দায়িত্ব পালনে আমরা ব্রতী হইয়াছি। এতদ্‌সংলগ্ন প্রশ্নপত্রটি এই উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত হইয়াছে।

এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে হইলে বিপুল তথ্যরাজি সংগ্রহ আবশ্যক। বলা বাহুল্য, সরকারের পক্ষ হইতে নিযুক্ত কর্মচারী মারফত তাহা সম্ভব নয়। কারণ, সত্যনিষ্ঠার সহিত এই ধরণের তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার একান্ত প্রয়োজন; ইহা ছাড়া প্রয়োজন স্ব স্ব গ্রাম ও অঞ্চল সম্পর্কে প্রগাঢ় মমতা ও একাত্মবোধ এবং তাহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতনতা। এগুলির অভাবে সংগৃহীত তথ্য কোন ক্রমেই সম্পূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। আমাদের বিচারে, সত্যনিষ্ঠ এই তথ্যসংগ্রহ শুধু মাত্র আপনাদের মত ব্যক্তিরাই করিতে পারেন। আমরা জানি, নিজের দেশের প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্য সবসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার কাজে নানারকম কষ্ট স্বীকার করিয়াও বিনা পারিশ্রমিকে আপনারা এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বিমুখ নন। আপনাদের কাছে আমরা যে নিষ্ঠা, সততা ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণী আশা করি, তাহা অল্প সময়ের জন্য স্বল্প বেতনে নিযুক্ত কর্মচারীদের নিকট হইতে আশা করা যায় না।

আমাদের বিনীত অনুরোধ আপনি যদি সংলগ্ন প্রশ্নপত্রটি যথাসাধ্য পূরণ করিয়া ফেরত পাঠান, তবে এই কার্যে বিশেষ সহায়তা হইবে। মুদ্রিত প্রশ্নগুলি ছাড়াও আপনি যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অন্যান্য তথ্য যোগ করেন, তাহার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব। এক দফায় সম্ভব না হইলে, দুই তিন দফাতেও তথ্য প্রেরণ করিতে পারেন। সংলগ্ন খামটিতে উত্তরসহ প্রশ্নপত্রগুলি পাঠাইবেন, তাহা হইলে আপনাকে ডাক মাশুল দিতে হইবে না।

আপনার সংগৃহীত তথ্য পুস্তকে সন্নিহিত করিবার সময় আমরা আপনার নাম ঠিকানা প্রকাশ করিয়া ঋণ স্বীকার করিব। আশা করি আপনার আপত্তি হইবে না। অনুগ্রহপূর্বক পত্রপ্রাপ্তির পক্ষকালের মধ্যে উত্তর পাঠাইলে বাধিত হইব। ইতি—

প্রশ্নমালার উত্তর প্রসঙ্গে

১। উত্তর লিখিতে শুরু করিবার আগে প্রশ্নমালাটি আগাগোড়া একবার পড়িয়া নিলে ভালো হয়।

২। প্রত্যেকটি প্রশ্নের ডান দিকের খালি অংশে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া কালিতে উত্তর লিখিতে হইবে। যে সব প্রশ্নে কিংবদন্তী, ইতিহাস, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তৃত উত্তর চাওয়া হইয়াছে স্বভাবতঃই ডানদিকের খালি অংশে সেইগুলির উত্তরের স্থান সংকুলান হইবে না। সেই কারণে প্রশ্নমালার শেষে ৪, ৫ ও ৬নং পৃষ্ঠা খালি রাখা হইয়াছে। প্রশ্নসংখ্যার উল্লেখপূর্বক এই প্রশ্নগুলির উত্তর এই তিনটি পৃষ্ঠাতে লেখাই যুক্তিসঙ্গত হইবে। প্রয়োজন হইলে সমান মাপের সাদা কাগজ যুক্ত করিয়া পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি করাও চলিবে।

৩। আমরা আশা করি উত্তরদাতারা সকলেই সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিবার জন্য চেষ্টিত হইবেন। উত্তরগুলি যাহাতে সত্যনিষ্ঠ এবং যথাযথ হয় সে দিকে বিশেষ ভাবে সজাগ থাকিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

৪। কোন কারণে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর না হইলে, উত্তরদাতাদের নিকট হইতে আমরা অন্ততঃ নিম্নলিখিত প্রশ্নসংখ্যাগুলির উত্তর অবশ্যই আশা করিব :

২, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ও ১৮।

৫। উত্তর সংগ্রহ কাজ সম্পন্ন করিতে স্বভাবতঃই কিছু সময় লাগিবে। আমরা আশা করি প্রশ্নমালা পাইবার পর অনধিক পক্ষকালের মধ্যে উত্তরগুলি লিখিয়া এটি ফেরত পাঠানো সম্ভব হইবে। মুদ্রিত প্রশ্নমালার বাহিরে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্যাদি থাকিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। উৎসব, পার্বণ বা মেলার প্রত্যক্ষ বিবরণীসমূহ একদফায় সম্ভব না হইলে দুই তিন দফায় পাঠানো চলিবে। প্রশ্নমালাটি যত্ন করিয়া রাখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে ; কারণ ময়লা হইলে বা ছিঁড়িয়া গেলে উহা হইতে উত্তরের পাঠোদ্ধার ও সংকলন খুবই দুরূহ হইবে।

৬। উত্তর লেখা শেষ হইলে সংলগ্ন খামটিতে উত্তরসহ প্রশ্নমালাটি ফেরত পাঠাইতে হইবে। খামে সেন্সাস অফিসের ঠিকানা ও ডাক মাশুল দেওয়া আছে।

[প্রশ্নমালাটি ১১নং পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল]

সংবাদদাতাদের নিকট প্রেরিত পত্রের নমুনা

পত্রসংখ্যা ১

তারিখ : ১৮ই মার্চ, ১৯৫৮।

সবিনয় নিবেদন,

পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাস দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হইয়াছে। সংগৃহীত তথ্যাদি সেন্সাস দপ্তর হইতে প্রকাশিতব্য একটি পুস্তকে সংকলিত করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ সম্পর্কে সামগ্রিক চিত্র পাইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি গ্রামে সারা বৎসরে কি কি পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন। আপনার ডাকঘরের ইউনিয়নের অধীনে যে গ্রামগুলি আছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতে সারা বৎসরে কি কি পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা যদি আপনার ডাকঘরের ইউনিয়নের কর্মীদের সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া আমাদের জানাইতে পারেন, তাহা হইলে আমরা একান্ত বাধিত হইব।

পর পৃষ্ঠায় আমরা পূজা-পার্বণের একটি তালিকা সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। বলা বাহুল্য, এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে এবং ইহার বহির্ভূত বহু পূজা-পার্বণ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন গ্রামে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক একটি গ্রামে যে যে পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যেগুলি আমাদের প্রদত্ত এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত, সেগুলির ক্ষেত্রে সেই সেই গ্রামের নামোল্লেখ পূর্বক তালিকা অনুযায়ী পূজা-পার্বণগুলির ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখ করিলেই চলিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি 'ক' গ্রামে 'শ্রীপঞ্চমী', 'বিশ্বকর্মা', 'নাগপঞ্চমী' পূজা বা উৎসব পালিত হয় তবে 'ক' গ্রামের নাম লিখিয়া তাহার কক্ষে ৬১।৩৯।২৯ লিখিলেই চলিবে। তালিকায় নাই, এমন পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হইলে অনুগ্রহ করিয়া পরিষ্কারভাবে উহার নামটি লিখিয়া দিবেন। পূজা-পার্বণের নামগুলি লিখিবার সময় প্রত্যেকটির পাশে যে মাসে উহা অনুষ্ঠিত হয় যদি তাহার উল্লেখ করিতে পারেন, তাহা হইলে খুবই ভালো হয়। একান্ত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক এবং নিত্যনৈমিত্তিক পূজা-পার্বণগুলির উল্লেখ না করাই বাঞ্ছনীয় হইবে।

এতদসংলগ্ন পোষ্টকার্ডটিতে উক্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া ফেরত পাঠাইলে, আপনাকে ডাক মাশুল দিতে হইবে না। উত্তর লিখিবার সময় জেলা ও থানার নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি গ্রামের পূজা-পার্বণগুলি সম্পর্কে উপরিউক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিলে, আমাদের এই গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গ হইবে ; এবং উহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বর্ধিত হইবে। আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এই তথ্য সংগ্রহ সম্ভব নহে। আমরা জানি, নিজ নিজ কর্তব্যকর্মে সবিশেষ ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, নিজের দেশের প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্য সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার এই প্রচেষ্টায় নানারকম কষ্ট স্বীকার করিয়াও বিনা পারিশ্রমিকে আপনারা এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বিমুখ হইবেন না। এ বিষয়ে আপনাদের এই কষ্ট ও যত্ন স্বীকার আমরা সর্বদাই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিব। অনুগ্রহ করিয়া পত্রপ্রাপ্তির পক্ষকালের মধ্যে উত্তর পাঠাইলে বাধিত হইব। ইতি—

পূজা-পার্বণের তালিকা

১। অনন্তচতুর্দশী
২। অন্নপূর্ণা
৩। অক্ষয় তৃতীয়া
৪। অম্বুবাচী
৫। আদিবাসী উৎসব
(উৎসবের নামোল্লেখ করিতে হইবে)
৬। ইদলফেতর
৭। ইত্তুজ্জোহা
৮। ইন্দ্র
৯। উত্তরায়ণ
১০। কার্তিক
১১। গঙ্গা (জাহ্নবী)
১২। খ্রীষ্টান উৎসব
(উৎসবের নামোল্লেখ করিতে হইবে)
১৩। গণেশপূজা
১৪। গম্ভীরা
১৫। গন্ধেশ্বরী
১৬। গাজন
১৭। গোষ্ঠাষ্টমী
১৮। গৌরী
১৯। চড়ক
২০। চণ্ডী
২১। জগদ্ধাত্রী
২২। জুমাৎ-উল-ভিদ
২৩। ঝাঁপান
২৪। ঝুলনযাত্রা
২৫। দশহরা
২৬। দোলযাত্রা
২৭। দুর্গা
২৮। ধর্মরাজ
২৯। নাগপঞ্চমী
৩০। নারায়ণ
৩১। নীল
৩২। পদ্মা
৩৩। পীরের উৎসব
(পীরের নামোল্লেখ করিতে হইবে)
৩৪। পৌষ সংক্রান্তি (মকর সংক্রান্তি)
৩৫। ফতেহা-দোয়াজ-দাহাম
৩৬। বারুণী
৩৭। বাসন্তী
৩৮। বিশালাক্ষী
৩৯। বিশ্বকর্মা
৪০। বিষহরি
৪১। বিষ্ণু
৪২। বৈশাখী পূর্ণিমা
৪৩। ব্রহ্মা
৪৪। ভীম একাদশী
৪৫। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া
৪৬। মনসা
৪৭। মহরম
৪৮। মাঘী পূর্ণিমা
৪৯। মাঘোৎসব
৫০। রটন্তীচতুর্দশী
৫১। রথযাত্রা
৫২। রাখী পূর্ণিমা
৫৩। রামনবমী
৫৪। রাস
৫৫। লক্ষ্মী
৫৬। শনি
৫৭। শিব (যে নামে উপাসিত, তাহার উল্লেখ করিতে হইবে)
৫৮। শিবরাত্রি
৫৯। শীতলা
৬০। শ্যামা
৬১। শ্রীপঞ্চমী (সরস্বতী)
৬২। ষষ্ঠী
৬৩। সত্যনারায়ণ
৬৪। সাধুসন্তের আবির্ভাব বা তিরোধান উৎসব
(সাধুসন্তের নামোল্লেখ করিতে হইবে)
৬৫। সবেবরাত
৬৬। স্নানযাত্রা
৬৭। সূর্য্য
৬৮। ক্ষেত্রপাল

পশ্চিমবঙ্গের উৎসব পার্বণ ও মেলা

প্রশ্নমালা

গ্রামের নাম : **থানা :**

মৌজা : **জেলা :**

ক। গ্রাম বিবরণী :

১। গ্রামের উৎপত্তি সম্পর্কে কোনো ইতিহাস বা কিংবদন্তী জড়িত থাকিলে তাহার বিবরণী দিন।

২। গ্রামে কোন কোন জাতির বাস? কতো-গুলি পাড়া আছে? ঘর বা জনসংখ্যা হিসাবে পাড়াগুলিকে ক্রমিকভাবে উল্লেখ করুন। প্রধান উপজীবিকা কি কি?

৩। গ্রামে যাইবার প্রধান পথ কি? নিকটবর্তী রেলস্টেশন, মোটর ও নৌকা চলাচল ব্যবস্থার উল্লেখ করুন।

খ। পূজা-পার্বণ ও উৎসবের বিবরণী :

৪। উৎসবের নাম, উপলক্ষ ও সময়কাল।

৫। কতোকালের প্রাচীন উৎসব? কোনো ইতিহাস বা কিংবদন্তী থাকিলে তাহার বিবরণী দিন। উৎসবটি কি নির্দিষ্ট গ্রাম ও এলাকা বা জাতি ও শ্রেণীর নিজস্ব বিশেষ উৎসব? না, সমগ্র জেলা বা অঞ্চলের সর্বজনীন উৎসব?

৬। দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে হইলে দেবদেবীর নাম ও মূর্তির বর্ণনা (ধ্যান জানা থাকিলে ধ্যান উদ্ধৃত করুন): গ্রামের সাধারণের দেবদেবী, না ব্যক্তিবিশেষের দেবদেবী? মন্দির বা স্থান আছে? থাকিলে তাহার মোটামুটি বর্ণনা। মূর্তি না থাকিলে উপাস্য দেবদেবীর স্বরূপ কি? শক্তি হইলে তাঁহার ভৈরব কে, এবং কাছেপিঠে তাঁহার স্থান কোথায়? শিব হইলে তাঁহার প্রকাশ কি? গ্রামে কয়টি পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, শীতলা, মনসা, প্রভৃতি আছেন।

৭। উৎসবের উপলক্ষ কি কোনো সাধুসন্ত বা পীরের আবির্ভাব বা তিরোধান? সাধু বা পীরের জীবনী, ধর্ম-প্রচার, তাঁহার সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী বা ইতিহাসের বিবরণী দিন।

৮। পূজা বা উৎসব কবে হইতে শুরু হয়, কতোদিন ধরিয়া চলে? উহার প্রস্তুতি কবে হইতে শুরু হয়—প্রস্তুতির মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য থাকিলে তাহার উল্লেখ করুন। প্রত্যেক দিনের পূজা বা উৎসব পদ্ধতির ধারাবাহিক বিবরণী দিন। সমগ্র পূজা বা উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? সর্বজনীন ভোজ, অন্নসত্র বা প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির আয়োজন হয় কি?

৯। মানত দেওয়া হইলে সাধারণতঃ কি কি মানত দেওয়া হয়? বলি দেওয়া হইলে কি কি পশুপাখী বলি দেওয়া হয়? কি ভাবে এবং উৎসবের কোন সময়ে বলি দেওয়া হয়?

১০। পূজা বা উৎসবের প্রধান সেবায়েত বা ভক্ত কোন সম্প্রদায় বা জাতির লোক? পূজারীর বর্ণ, গোত্র ও পদবী কি?

১১। হিন্দু দেবদেবীর পূজা হইলে অহিন্দুরা অংশ গ্রহণ করে? অহিন্দু উৎসব হইলে হিন্দুরা অংশ গ্রহণ করে? মোটামুটি সংখ্যা কতো?

১২। পূজা বা উৎসব উপলক্ষে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীর আগমন হয়? কারণ কি?

গ। মেলা বিবরণী :

১৩। মেলা বসে কোথায়? কয় বিঘা জমিতে বসে? কাহার জমি—জমিদারের না উপাস্য দেবতার? দান, তোলা প্রভৃতি আদায় করা হয়? মেলা সকালে বসে না বিকালে বসে? নির্দিষ্ট এই স্থানটিতে মেলা বসিবার কারণ কি?

১৪। কতোদিনের প্রাচীন মেলা? কতোদিন ধরিয়া চলে। কতো লোক আসে? প্রধানতঃ কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোক আসে? আশপাশের কোন কোন গ্রাম

বা ইউনিয়ন হইতে লোক আসে? সর্বাপেক্ষা দূরের যাত্রী কোথা হইতে এবং কতো আসে? পুরুষ ও নারীর মোটামুটি সংখ্যা কতো? যাত্রীরা প্রধানতঃ কি কি যানবাহনে আসে?

১৫। মেলায় জিনিসপত্র বিক্রেতারা প্রধানতঃ কোন কোন স্থান হইতে আসে? তাহারা কি প্রতি বৎসরই আসে? কি কি জিনিস বেশি আসে?

১৬। মেলায় কতোগুলি দোকানপাট বসে? খোলা জায়গায় কতো লোক বসে? ফেরিওয়ালার সংখ্যা কতো?

১৭। সমস্ত দোকানপাট ও ফেরিওয়ালার মধ্যে কতোগুলি:

(ক) খাবারের দোকান—ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবার।

(খ) বাসনকোসনের দোকান—তামা, পিতল, লোহা, কাঁচ, মাটি, ইত্যাদি।

(গ) মনিহারী দোকান লণ্ঠন, টর্চলাইট, আয়না, চিরুনি, অন্যান্য রকমারী জিনিসপত্র।

(ঘ) ঔষধপত্রের দোকান—কবিরাজি, হাকিমী, টোটকা প্রভৃতি।

(ঙ) বই, ছবি, পুস্তিকা প্রভৃতির দোকান—কি ধরনের বই, ছবি ও পুস্তিকার প্রচলন বেশি?

(চ) কাপড়চোপড়ের দোকান—মিল, তাঁত, কাটা-কাপড়, লুঙ্গি, গামছা, সতরঞ্চ, তৈরী পোষাক, ইত্যাদি।

(ছ) কৃষি বা কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান—কি কি যন্ত্রপাতি? গরু, মহিষ, ছাগল, প্রভৃতির ক্রয়-বিক্রয় হয় কি?

(জ) শিল্প সামগ্রী বা কারুশিল্পের দোকান—তাঁতের তৈরী জিনিসপত্র, বেত, চ্যাঙ্গারী, ধামা, কুলো, মাটির পুতুল বা হাঁড়িকুড়ি, খেলনা, পাত্র, বাঁশের জিনিস, অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জিনিসপত্র। এগুলি প্রধানতঃ কোন কোন অঞ্চলের বা গ্রামের? ইহারা কি প্রতি বৎসরই আসে?

(ঝ) অন্যান্য দোকান।

১৮। মেলায় আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা কি? খেলা-ধুলা, নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, জুয়া, লটারী, যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান, জলসা, ইত্যাদির বিবরণী দিন। যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান ও অন্যান্য গান-বাজনার বিষয়বস্তু কি? কাহাদের দল, কোথা হইতে আসে? গ্রামের কোনো নিজস্ব দল আছে? অধিকারীর নাম ও ঠিকানা। পালা বা গান সংগ্রহ করিয়া পাঠানো সম্ভব? প্রতিবার কি একই লোক আসে? কতো লোক দেখে বা শোনে?

১৯। উৎসব উপলক্ষে মাদকদ্রব্য পান কি কোনো প্রয়োজনীয় ধর্মাচার?

২০। অন্যান্য মন্তব্য।

অশোক মিত্র

অবতরণিকা ও অবেক্ষা

ইতঃপূর্বে 'পশ্চিমবঙ্গে পূজা-পার্বণ ও মেলা' গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে 'কথাপ্রসঙ্গে' শীর্ষক আলোচনায় একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। পূর্বে বলিয়াছিলাম, গ্রন্থটিতে কেবলমাত্র উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার মানুষের সমাজে অনুসৃত ধর্ম, ধর্মাচরণ ও অনুষ্ঠান এবং তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত কয়েকটি মেলার অর্থনৈতিক লেনদেনের কিছু বিক্ষিপ্ত খণ্ডচিত্রই যে শুধু রহিয়াছে তাহা নহে। ধর্ম, বিশ্বাস ও লোকসংস্কার ছাড়াও, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তরবিন্যাস, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সমাজে আভ্যন্তরিক সংগঠনব্যবস্থা, ক্ষমতার উৎস ও আধার, পারিপার্শ্বিক ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ, জনগণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক মানসের রূপান্তর ও বহিঃপ্রকাশ, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সেই মানসের প্রতিফলন, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ও বিবর্তন সম্পর্কিত বহুবিধ উপাদান এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। এই জাতীয় উপকরণ সমাজবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে যে কত মূল্য বহন করে, তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম।

বর্তমান গ্রন্থে (পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা গ্রন্থমালার তৃতীয় খণ্ড) ২৪-পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামে ও শহরাঞ্চলে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ ও মেলার তথ্য উপস্থাপিত হইয়াছে। এই উপকরণ অবলম্বন করিয়া পশ্চিমবঙ্গের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ডে জনসাধারণের সামাজিক বিবর্তন ও পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন ও বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনার মধ্য দিয়া করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

আয়তন ও লোকসংখ্যার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে ২৪-পরগণা ও মেদিনীপুর বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। দুইদিক হইতেই ২৪-পরগণা ও মেদিনীপুর যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩১·২১ শতাংশ ভূখণ্ড লইয়া এই দুইটি জেলার বিস্তৃতি। এতদ্ব্যতীত, দুইটি জেলার কয়েকটি ভৌগোলিক বিশেষত্বও লক্ষ্য করার মত। প্রতিবেশী জেলা দুইটির মধ্যে ভাগিরথী বা হুগলী নদী বিভাজক সীমারেখা রচনা করিয়াছে। দুইটি জেলার কিছু অংশ বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলরূপে পরিচিত। ২৪-পরগণা জেলার পূর্বদিকের আন্তর্জাতিক সীমারেখা পূর্ব পাকিস্থান বা অধুনা পরিচিত বাংলাদেশের সহিত সীমান্তের ব্যবধান রচনা করিয়াছে। নতুবা, ২৪-পরগণার পারিপার্শ্বিক অঞ্চলগুলিতে পশ্চিমবঙ্গেরই অন্যান্য জেলাগুলি অবস্থিত। মেদিনীপুর জেলার কোন দিকে বিদেশী কোন রাষ্ট্রের অবস্থান নাই। ভারতের দুইটি রাজ্য, যথাক্রমে বিহার ও উড়িষ্যার এক বা একাধিক জেলা মেদিনীপুরের পশ্চিমদিক পরিবেষ্টিত করিয়া আছে। সেইজন্য, মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাঞ্চল এমন এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ভাবাবিষ্ট যে,

সেখানে প্রতিবেশী সংস্কৃতির প্রভাব ও অস্তিত্ব সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। ২৪-পরগণার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী অধ্যুষিত। দক্ষিণদিকে সুন্দরবনের 'লাট' নামক অঞ্চলে মেদিনীপুর জেলা হইতে বা ঐ জেলার বাহিরের অঞ্চল হইতে জেলার মধ্য দিয়া আগত তপশীলভুক্ত জাতি বা উপজাতি এবং অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত জনসমাগম ঘটিয়াছে। এই জেলা কলিকাতা মহানগরী দ্বারা দুইটি অংশে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। শিল্প ও শহরাঞ্চলের জন্ম, বৃদ্ধি ও বিস্তার কলিকাতার উত্তর দক্ষিণ প্রান্তের অক্ষরেখা বরাবর দীর্ঘকাল যাবত ঘটিতে থাকায়, এই জেলায় কেবলমাত্র পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলার মানুষই দৈনন্দিন আয়ের সংস্থান করিতে এখানে আসিয়া ভীড় করেন নাই। সুদূর বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, এমন কি তামিলনাড়ু হইতেও, বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের জনপদ এই জেলায় গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইদিক হইতে মেদিনীপুর জেলায় খড়গপুরে এই ধরনের শহর ও শিল্পাঞ্চলের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ শহর এবং উহার শহরতলী অঞ্চলেও অন্যান্য রাজ্য হইতে ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের আবাসকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে হলদিয়া প্রকল্পে অনুরূপ এক ভবিষ্যত মহানগরী ও শিল্পপ্রধান বলয়ের 'নিউক্লিয়স' জন্ম লইয়াছে বলিয়া, অনুরূপ বিচিত্রতা অল্পবিস্তর এই অঞ্চলে পরিলক্ষিত হইবে এমন আশা করা যায়। তবে, স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী মানুষের প্রাণকেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিতে ইহার যথেষ্ঠ বিলম্ব আছে। কিন্তু একথা মনে করা ভুল যে, মেদিনীপুর জেলায় বহিরাগতের কোন ভীড়ই নাই। কৃষিপ্রধান অঞ্চল হিসাবে এই জেলায় অন্যান্য রাজ্য হইতে অধিবাসী মানুষের আগম-স্রোতের গতি কিছুটা মন্থর মাত্র। এই জেলার বেশ কয়েকটি তপশীলভুক্ত উপজাতির আদি নিবাস ছিল অন্য রাজ্যে। শহরাঞ্চলের প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। ১৯৬১ সালের আদমসুমারীর হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন আয়তনের ও জনসংখ্যার মোট শহরের সংখ্যা ছিল ১৮৪ এবং এক দশকে এই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এখন ২২৫ এ। ২৪-পরগণা ও মেদিনীপুর জেলায় ১৯৬১ সালের হিসাব অনুসারে শহর ও নগরের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৯ ও ১৪। অর্থাৎ মিলিতভাবে দুই জেলায় সংখ্যার দিক হইতে পশ্চিমবাংলার প্রায় ৩৯·১ শতাংশ শহর অবস্থিত ছিল। এক দশকে এই সংখ্যার অগ্রগতি দর্শনীয়। ১৯৭১ সালে এই দুই জেলায় নগরের সংখ্যা যথাক্রমে ৭০ এবং ১৮ দাঁড়াইয়াছে। যৌথহিসাবে জেলাদ্বয়ের শহরগুলি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মোট শহরের ৩৪·৬ শতাংশ অধিকার করিয়া আছে। বিস্তৃতির দিক হইতে ২৪-পরগণা জেলায় শহরাঞ্চলের প্রাধান্য বেশী।

শহরের অগ্রগতি বলিতে গিয়া গ্রামের কথা বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা থাকে। পশ্চিমবঙ্গে জনবসতিপূর্ণ ও জনবসতিহীন গ্রামের (মৌজার) সংখ্যা ৪১,৯৫১ ; ২৪-পরগণা ও মেদিনীপুর জেলায় গ্রাম রহিয়াছে যথাক্রমে ৩,৮৯৯ এবং ১২,১৫২টি। এক কথায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ৩৮·২ শতাংশ গ্রাম এই দুই জেলায় অবস্থিত। ১৯৬১ সালের হইলেও, ১৯৭১ সালের হিসাবের সহিত (যাহা প্রকাশিত হইতে কিছু সময় লাগিবে) ইহার বিশেষ তারতম্য হইবে না। বলাবাহুল্য, ২৪-পরগণায় শহর ও শিল্পনগরীর আধিক্যের জন্য জেলার কৃষি নির্ভর অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। অনুরূপভাবে, মেদিনীপুর জেলার গ্রামীণ অর্থনীতির পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছে কৃষি নির্ভর

বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশা। দুইটি জেলায় বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বনভূমিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ঐ বনাঞ্চল অনেক মানুষের জীবনধারণের উপায় ও পথের সন্ধান দিয়াছে।

মিলিতভাবে দুইটি জেলায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যার যথাক্রমে ৩০·৪ শতাংশ এবং ৩১·৭ শতাংশ ১৯৬১ ও ১৯৭১ সালে বসবাস করিত। এই রাজ্যের গ্রামীন জনসংখ্যার যথাক্রমে ২৩·৭ শতাংশ ও ৩০·২ শতাংশ দুইটির জেলা গ্রামাঞ্চলে ১৯৬১ ও ১৯৭১ সালে বাস করিত। ১৯৬১ ও ১৯৭১ সালে দুই জেলায় শহরাঞ্চলে বসবাসকারী লোকসংখ্যা এই রাজ্যের মোট শহরবাসীর যথাক্রমে ২৭·৩ শতাংশ ও ৩০·৭ শতাংশ। ১৯৬১ সালে রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ২৩·৮ শতাংশ তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতিভুক্ত লোকসংখ্যার ২৮·৩ শতাংশ দুইটি জেলায় বসবাস করিত। বসতির ভীড়ও যথেষ্ট বাড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৯৬১ ও ১৯৭১ সালে যথাক্রমে ৩৯৮ ও ৫০৭ জন মানুষ বাস করিত বলিয়া জানা যায়, ২৪-পরগণায় সেখানে হিসাব দাঁড়াইয়াছে ৪৫৬ হইতে ৬২৩ এবং মেদিনীপুর জেলায় ৩১৯ হইতে ৪২৫। পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির বার্ষিক গড়পড়তা হার (১৯৬১-১৯৭১) শতকরা ২৭·২৪, সেখানে ২৪-পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার এই হিসাব দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে শতকরা ৩৬·৬৩ এবং শতকরা ২৭·০৩। প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যার অনুপাত এই রাজ্যে যেখানে ১৯৭১ সালে গত এক দশকের পরিবর্তনে দাঁড়াইয়াছে ৮৭৮ হইতে ৮৯২, সেখানে ২৪-পরগণায় এই হিসাব ৮৬৬ হইতে ৮৮০-তে এবং মেদিনীপুর জেলায় ৯৫২ হইতে ৯৪৪-তে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯৭১ সালের হিসাবে রাজ্যের লোকসংখ্যার ৩৩·০৫ অংশ সাক্ষর (১৯৬১ সালে ছিল ২৯·২৮), ২৪-পরগণা ও মেদিনীপুর জেলায় সাক্ষরের অনুপাত দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩৭·৯৮ (১৯৬১ সালে ৩২·৪৮) এবং ৩২·৮৮ (১৯৬১ সালে ছিল ২৭·২৭) শতাংশে। দুইটির জেলার মোট সাক্ষর জনসাধারণ সমগ্র রাজ্যের সাক্ষর অধিবাসীদের ৩৪·৪ শতাংশ। অন্যদিকে, ২৪-পরগণা ও মেদিনীপুর জেলায় কর্মে নিযুক্ত লোকসংখ্যার যথাক্রমে ৫০·৯৩ শতাংশ এবং ৭৯·৩৪ শতাংশ কৃষিমুখী বৃত্তি ও পেশার উপর নির্ভরশীল। দুইটি জেলার অর্থনৈতিক কাঠামোতে কৃষিকার্য্যের অবদান কতখানি এই পরিসংখ্যান হইতে তাহা সুস্পষ্ট।

হিসাবের অঙ্ক যথাযথ উপস্থাপিত করার পিছনে যুক্তি আছে। এই জেলা দুইটিতে গত এক দশকে জনজীবনের পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি না বুঝিলে, জনসমাজের অন্তর্নিহিত মূল্য ও মূল্যবোধ, আচার ও আচরণের দিকটি বুঝিতে অসুবিধা হইবে। গত দশকের আদমসুমারীর পরিসংখ্যানে জনজীবনের কয়েকটি সুস্পষ্ট পরিবর্তনের দিকটি তুলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু, এই পরিসংখ্যানের হিসাবের অন্তরালে যেখানে জনসাধারণের মনোজগতে বিভিন্ন অদৃশ্য শক্তির আবেশজনিত পরিবর্তনের মধ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা ও কাঠামো, আচার ও রীতিনীতি, অনুষ্ঠান ও ব্যবহার, মূল্য ও নীতিবোধের ভাঙ্গাগড়া চলে, উত্থানপতন অত্যন্ত ধীর গতিতে সমাপিত হয়, সেখানে বিবর্তন বা পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহ কোন গাণিতিক বা পরিসংখ্যাভিত্তিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করিবার মত

সূচক নির্ণয় করার বৈজ্ঞানিক প্রয়োগকৌশল এখনও সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে অজ্ঞাত। এই কারণে, গত দশকে জনজীবনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শে ও ভাবে পরিবর্তনের আবেগ ও অনুভূতির গতি ও প্রকৃতি আত্মমুখ উপায় নির্ণয় করারও যথার্থতা আছে। অন্যথায়, পূজা-পার্বণ ও মেলার কয়েকটি নথিবদ্ধ বিবরণে সমাজজীবনের অন্তর্নিহিত ভাব ও আদর্শের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে না এবং জনসাধারণ পরিবর্তনমুখী, না উদাসীন তাহারও সংকেত মিলিবে না।

বলাবাহুল্য, বিংশ শতকের ৬১-৭১ দশকটি সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের গণজীবনে এবং আলোচ্যমান জেলা দুইটির জনসমাজে বিশেষভাবে চিহ্নিত হইয়াছে। সমাজের বিভিন্ন মানুষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এই জেলা দুইটিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। শিল্প ও শহরাঞ্চলের ভাবের আবেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, সাক্ষর ও নিরক্ষর, কর্মরত ও কর্মসন্ধানী মানুষের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা, ঐ পরিবেশে ন্যূনতম প্রয়োজনের সহিত সংগতি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সর্বনিম্ন আশাআকাঙ্ক্ষার সামগ্রিক কিংবা আংশিক সাফল্য-লাভে ব্যর্থতা ও অসমর্থতা, তজ্জনিত দুঃখবাদ, নানাপ্রকারের সুযোগসুবিধা লাভের জন্য জনগণের প্রবৃত্তির মধ্যে হিংসালু মনোভাবের অনুপ্রবেশ, সমাজব্যবস্থায় মৌলিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক মত ও পথের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। এই প্রতিবেশ দুই জেলার পৌরাঞ্চলনিবেশী মানুষের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভকে সুতীব্র করিয়া সামাজিক পরিবেশে এক বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানীর মতবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। (অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুর 'ভাঙা ও গড়া' এবং শ্রীবিক্রম কেশরী রায়বর্মণ কর্তৃক রচিত 'অশান্ত বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা' সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৮, দেশ পত্রিকায় যথাক্রমে ৯৫-৯৮ ও ১১৩-১২০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত)।

পরিবর্তনমুখিতার প্রচণ্ড আবেগই বিভিন্ন সময়ে জেলা দুইটিতে কৃষক-বিক্ষোভ ও আন্দোলনের মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজকে ও কৃষিপ্রধান অর্থনীতির ভিত্তিমূলকে প্রবলভাবে আলোড়িত করিয়াছে। আবার অন্যদিকে, শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকবিক্ষোভ, শহরাঞ্চলে ছাত্র ও শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের অসন্তোষ ও সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থায় কর্মীদের আন্দোলন নগরজীবনের সমাজকে তুমুল আলোড়নের আবর্তে লইয়া গিয়াছে। সমাজের এই সংকটের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া এক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ (শ্রী অম্লান দত্ত কর্তৃক 'বাংলার সংকট ও সমাধানের পথ' পূর্বে উল্লিখিত দেশ পত্রিকার ১০৯-১১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত) কলিকাতা মহানগরী এবং পল্লীবাংলার অসামঞ্জস্যকে বর্তমান দশকের অশান্ত অবস্থার এক অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। কলিকাতা মহানগরীতে বিদ্যাচর্চা ও অর্থআহরণের দুই প্রচেষ্টাই যুগপৎ চলিতে থাকায় এই নগরের কোটরে বহিরাগতের আগমন হইয়াছে এবং অভিমন্যুর ব্যূহপ্রবেশের ন্যায় এই আগমপ্রবাহ প্রধানতঃ একমুখী হইয়া প্রবেশের দ্বার উন্মোচন করিয়াছে। কিন্তু, নির্গমপথ রুদ্ধ থাকায়,

মহানগরীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহির্গমনপথে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারিত হয় নাই। ফলে, মহানগরী ও অবশিষ্ট বাংলার ভিতর অতি বৃহৎ একটি ব্যবধান দ্রুত সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য এই ব্যবধান ২৪-পরগণা জেলার সহিত আদৌ রচিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ আছে। কলিকাতা ২৪-পরগণার উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করায় এবং পথঘাটের উন্নয়ন ও দ্রুত যানবাহন ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারতা লাভ করায়, মহানগরীর সহিত এই জেলার দুস্তর কোন প্রভেদ সৃষ্টি হয় নাই। সেইজন্য, মহানগরীর সামাজিক অস্থিরতা জেলার শহর ও পল্লী অঞ্চলে একই সঙ্গে দ্রুত সঞ্চালিত হইয়াছে।

অশান্ত এই সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবেশের অন্যতম প্রধান চরিত্র এই যে, বিক্ষুব্ধ মানুষের পরিবর্তনমুখিতা প্রধানতঃ লোকায়ত মানসপ্রকৃতিসঞ্জাত। ধর্ম সেইজন্য পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অহিফেনের নেশায় সমাধিস্থ করিতে পারে নাই। কারণ, নগরসংস্কৃতির অব্যক্তিক প্রকৃতির জন্য ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানকে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত সংস্কার রূপে জনসাধারণ দেখিতে প্রভাবিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক গোষ্ঠীর আদর্শ ও নিয়মের নিগড় ব্যক্তিজীবনের স্বচ্ছন্দবিহারকে নিয়ন্ত্রিত অথবা স্বাধীনতাকে খর্ব করে নাই। ইহার ফলে একদিকে নগরজীবনে জনসাধারণ ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আশাআকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা হইতে সুরু করিয়া 'বৃহত্তর সমস্যার সমাধানে' 'ঠাকুর অথবা নিয়তি' কিংবা অতিলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত দৈবশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া কামনাবাসনার সার্থক রূপায়ণের জন্য ঐশীশক্তির করুণা ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করিবার অভ্যাস আয়ত্ত করিয়াছেন। এই সংকল্প ও ইচ্ছার মধ্যে ইন্দ্রজালভিত্তিক বিশ্বাসের প্রতিবেশে অতীন্দ্রিয় মানসতাও ব্যক্ত হইয়াছে। তাহার সহিত একই সময়ে সমাজকে সুতীব্র সহিংস আঘাতের দ্বারা পরিবর্তন করার স্পৃহার যুক্ত হওয়ার কোন কারণতা বা আপেক্ষিক সম্বন্ধের নির্দেশ নির্ধারণ করিতে বিশ্লেষণী যুক্তিবাদ ব্যর্থ হইয়াছে। বস্তুতঃ, আপাতপ্রতিভাত বৈপ্লবিক পরিবর্তনমুখী মনের অস্থির যুক্তিবাদী সচেতনতার সহিত এক প্রাচীন সংস্কার ও আদিম বিশ্বাসের আধারে পুষ্ট মানসিকতার আদৌ কোন প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ পারম্পর্য আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু অন্যদিকে, গ্রামীণসমাজের কৃষিকার্য নির্ভর বৃত্তি ও পেশার মানুষগুলির মধ্যেও নগরজীবনের আধুনিক সুযোগসুবিধা ও মূল্যবোধের প্রকৃতি উপলব্ধি করার মত সুবেদী মনের প্রস্তুতি চলিয়াছে। জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক ও সামাজিক মানোন্নয়নের এক অস্থির, চঞ্চল মানসিকতা গ্রামাঞ্চলের যুগপ্রচলিত ব্যামোহ হইতে মুক্তিপথের সন্ধান করিয়া চলিতেছে। ফলে, পল্লী ও নগরের মানুষের মূল্যবোধের স্বতঃপ্রমাণিত কয়েকটি বিভেদী বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও দ্রুততর গতিতে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন সাধনে উভয় সমাজের জনসাধারণ সমানভাবেই কৃতসংকল্প হইয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কলিকাতা মহানগরীর সন্নিকটে ২৪-পরগণা জেলার বিষ্ণুপুর থানায় ঝিকুরবেড়ে গ্রামে (মৌজা নং ৯) (গ্রন্থের পৃঃ ১৩৬-বর্ণিত) 'বাবা ভূতনাথের কাছারীতে' সমাবিষ্ট ভক্তবৃন্দের কয়েকটি প্রার্থনাকে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিলে, ঈশ্বরবাদী উপাসকবৃন্দের অপার্থিব সংস্কারের পিছনে পার্থিব আশাআকাঙ্ক্ষার রূপরেখার অস্পষ্ট এক ইংগিত

পাওয়া যাইবে। রোগব্যাধির নিরাময়, জমিজমাসংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভের বাসনা, পুত্রকন্যালাভের প্রার্থনা প্রভৃতি সাধারণ কামনা ছাড়াও বিশেষ বিশেষ ইচ্ছারও সন্ধান মিলিবে। 'পুত্রের সাইকেলের দোকান ভালভাবে চলার জন্য' স্নেহাতুরা পল্লীরমণীর আকুল আবেদন, 'জমিতে অধিক ধান ফলনের জন্য' (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ হইয়াছে কিনা তাহার উল্লেখ নাই) কৃষকবধূর আকুতি, মনোমত জামাতা-সন্ধানে অনূঢ়া কন্যার মাতার দৈব সাহায্যপ্রার্থনা, বিপথগামী জামাতার শ্বশ্রূমাতার আবেদন যেন জামাতার চিত্তে সুবুদ্ধির জাগরণ হয় এবং কন্যা-জামাতার পুনর্মিলন হয়— এই জাতীয় প্রার্থনার পিছনে দৈনন্দিন জীবনের অর্থনৈতিক ও নৈতিক মানোন্নয়নে ইচ্ছুক গ্রামদেশের জনগণের সরল, সহজ যুক্তিহীন সংস্কারের প্রভাব কার্যকর হইয়াছে। কিন্তু, মহানগরীর জটিল জীবনযাত্রার অসংখ্য সমস্যাজর্জরিত সমাজ হইতে 'কমলা ঘোষ' নামে কোন এক স্নাতকশ্রেণীর ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য 'এক বোতল মদ' 'বাবার পূজার' উপচার হিসাবে দিবার সংকল্প করিলে, একটি বিষয়ে মনে কোন সংশয় থাকে না। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত মহানগরবাসিনী ছাত্রীর চিত্তে যুক্তিবাদের ধারণা থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন সংস্কারের মৃত্যু হয় নাই এবং মহানগরের নাগরিক প্রভাব ঐ প্রাচীন মানসিকতায় বিশেষ কোন রূপান্তর আনিতে পারে নাই। অনুরূপভাবে, হাওড়ার ন্যায় শিল্পাঞ্চলীয় নগরীর 'রেখা দে' নামে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার এক ছাত্রী প্রশ্নপত্রের উত্তরগুলি যথাসময়ে স্মরণ করাইবার জন্য এবং পঠনকালে নিদ্রার ব্যাঘাত লাঘব করাইবার মনস্কামনা পূরণের নিমিত্ত মদ দিয়া পূজা দিবার মানসিক করিয়াছেন। ২৪-পরগণার কোন শিল্পনগরীর 'রেবা বেরা' স্বামীর আয়বৃদ্ধির জন্য এবং অর্থাগমের ফলশ্রুতিস্বরূপ পুরীভ্রমণের বাসনায় মানসিক করিয়াছেন যে, তিনি বস্ত্র ও গঞ্জিকার নৈবেদ্যের উপচারে পূজা দিবেন। সুদূর নদীয়া জেলা হইতে অনুরূপভাবে কোন এক 'শিপ্রা সেনে'র 'যেন ওর সংগে' বিবাহ হয় এবং ঐ বিবাহে মাতাপিতার সুমতি হয় বলিয়া ঐ মহিলা প্রার্থনা জানাইয়াছেন। বাঞ্ছিত প্রার্থনা পূর্ণ হইলে, মদ্য এবং ছাগবলি দিয়া পূজার সংকল্প শুধুমাত্র একটি 'শিপ্রা সেনে'র ক্ষেত্রেই সীমিত থাকে নাই। বরং দেখা যায়, মনোমত পতিনির্বাচনে মানবীয় ইচ্ছাপূরণে দেবতার সাহায্য প্রার্থনার মধ্যে অলৌকিক অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি আনুগত্য 'শিপ্রা সেন' ছাড়াও ২৪-পরগণার কোন এক মহিলা 'কমলা' ঘোষণা করিয়াছেন। সত্বর পতিসন্ধান এবং অনতিবিলম্বে বিবাহের প্রার্থনা জানাইয়া প্রজাপতির অধিক্ষেত্রটি প্রসারিত করিবার পর উহা ভূতনাথের অধিকারক্ষেত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ও ঐ চিন্তায় ইহজগতের সমস্ত কর্মই যেন ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র বা 'Grand Design' এইরূপ কল্পনার আভাস মেলে। বলাবাহুল্য, ধর্মবিশ্বাসী ভগবতভীরু মহিলা বিবাহের পর 'জোড়ে' আসিয়া 'ধুতি-চাদর-ছাতা'র উপচারে পূজার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ঐ উপচার যে মানবিক প্রয়োজনবোধজাত বলিয়া দেবতার কোন প্রয়োজনে আসিবে না, এমন বিশ্বাস মনে স্থান পায় নাই। প্রসঙ্গতঃ, দেবতার জীবনযাত্রায় নরত্বারোপিত আদর্শ অভিব্যক্ত না হইলে, মানুষের প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রী পূজার নৈবেদ্যরূপে অর্পিত হইত না। এক্ষেত্রে দেবতার রূপটি শুধু নরাত্মারোপিত প্রকৃতিরই নহে, দেবতার জীবনযাত্রার প্রণালীটিও অতিমানবীয় ভাবাদর্শে রচিত এবং মানবজীবনের প্রাণধারণের ভাবরূপের আধারে পরিশীলিত। এইভাবে ঐ একই স্থানে প্রার্থনার বৈচিত্রে মানবীয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কামনাবাসনার

পার্থিব রূপটিও প্রতিবিম্বিত হয়। এই প্রার্থনার বিষয় পাত্রপাত্রীর মঙ্গলের ক্ষেত্রেই কেবল সীমাবদ্ধ নহে ; অনেক সময়ে গৃহপালিত পশুপক্ষীও মানবিক প্রার্থনার উপজীব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গাভীর গর্ভকামনা এবং প্রসবান্তে ঐ গাভীর দুগ্ধে দেবতার পূজার প্রতিশ্রুতি ও 'মুরগী'র মড়কের প্রাদুর্ভাব বন্ধের প্রার্থনা প্রভৃতির মধ্যে ভক্ত মানুষটির অর্থ নৈতিক জীবনের অস্পষ্ট প্রতিফলন দৃশ্যমান হইয়া উঠে।

দেবতাকে পূজা দিয়া তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মনোমত ইচ্ছাপূরণের উপায় শুধুমাত্র পশ্চিমবাংলা অথবা ভারতবর্ষেই নহে, পাশ্চাত্য দেশের মানুষকেও বহুকাল হইতেই প্রভাবিত করিয়াছে। ইউরোপে যুক্তিবাদের জন্মকাল হইতেই বিভিন্নভাবে মনস্বীগণ ধর্ম ও ঈশ্বরবাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিয়া আসিয়াছিলেন। ঈশ্বর সম্পর্কে অপ্রযোজ্য কোন ভাবরূপ যদি তাঁহার সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি করে, তাহা হইলে তেমন কোন ধারণা পোষণ না করিয়া নিরীশ্বরবাদী হওয়া অধিকতর কাম্য—এইরূপ মত ফ্রান্সিস বেকন স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। যুক্তিবাদের দ্বারা ঈশ্বরবাদের সম্পর্কে ধ্যানধারণার প্রচলিত ভঙ্গীটি বড় একটা পরিবর্তিত হয় নাই। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবিষয়ে অনেক বেশী স্পষ্ট মতবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রতিন্যাস যখন এমন এক বোঝাপড়ার সম্পর্কে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন কিছু নৈবেদ্যের উপচারে ঈশ্বরকে লুব্ধ করিয়া তাঁহার পরিবর্তে কোন বরদানের প্রতিশ্রুতিতে আবিষ্ট করা প্লেটোর দার্শনিক দৃষ্টিতে মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে ব্যবসায়িক এক লেনদেনের চুক্তি ব্যতীত অন্য কোনরূপে প্রতিভাত হয় নাই। শয়তানীবুদ্ধিসম্পন্ন উত্তমর্ণের দাদনের ন্যায় অগ্রিম ঋণদানের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে কোন উপকার পাইবার আশায় উপঢৌকন দিয়া প্রকৃতই ঈশ্বরকে প্রলোভিত করা যায় না। প্লেটো একথা মনে করিলেও, সেই মত পৃথিবীর মানুষের শেষ কথা হয় নাই। ঈশ্বরকে নৈবেদ্য ও উপচারে উপাসনা করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ ভিক্ষা ও প্রসাদলাভ করার সহজ উপায়টি সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাসের ধারায় অবলুপ্ত হয় নাই। বরং অধিকতর ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষ তাহার নিজস্ব পুরাতন সংস্কারটিকে সর্বকালের সকল যুক্তিবাদের তীক্ষ্ণ আঘাত হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ধর্ম সম্পর্কে মানুষের ধ্যানধারণার একটি মত প্রণিধানযোগ্য।

'On the subjective side it includes all man's psychical functions, feeling will and thought ; on the objective side it has reference to a trans-subjective divine reality. It further involves a living relation of the subject to that reality in worship, fellowship and service, the relation being controlled by a purpose *viz.*, the conservation and enhancement of human values both social and individual, but culminating in utter devotion to the divine reality for its own sake as itself the ultimate value' (The Philosophy of Religion, by D. M. Edwards, pp. 154).

ভারতবর্ষে দেবতাকে পূজা দিবার আদর্শ দেবযজ্ঞ নামক বৈদিক অনুষ্ঠানের পরবর্তী সংস্করণ। যাগ, যজ্ঞ, হোম এবং পূজা সকল ক্ষেত্রেই অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রসহযোগে বিভিন্ন দ্রব্যের দানকেই

বুঝাইত। (যজতিচোদনা দ্রবাদেবতাক্রিয়ং সমুদায়ে কৃতার্থত্যাৎ। তদুক্তে শ্রবণাজ্জুহোতিরাসেচনাধিকঃ স্যাৎ॥ —জৈমিনির পূর্বমীমাংসাসূত্র, ৪.২.২৭-২৮।) দেবতার পূজায় যে উপচার মানতস্বরূপ বা কোন ফলের প্রত্যাশায় দান করা হয়, শাস্ত্রকারগণ সেইজাতীয় দানকে 'কাম্য'রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সন্তানলাভের উদ্দেশ্যে, জয়লাভের বাসনায়, ঐশ্বর্য ও পার্থিব উন্নতির কামনায় কিংবা স্ত্রীলাভ করিবার অভিলাষে সাধারণতঃ 'কাম্য'শ্রেণীভুক্তদানের সংকল্প থাকে (অপত্যবিজয়ৈশ্বর্য—স্ত্রীবালার্থং যদিষ্যত। ইচ্ছাসংস্থং তু তদ্দানং কাম্যমিত্যভিধীয়তে॥ —যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিটীকা—অপরার্ক, পৃঃ ২৮৯ এবং চতুবর্গ-চিন্তামণি---হেমাদ্রী কর্তৃক রচিত, পৃঃ ১৬)। যাগ, যজ্ঞ অথবা দান দুই প্রকার দেবতার প্রীতি-উৎপাদনে সমর্থ হইত। স্বর্গের দেবতারা পূজায় প্রীত হইলে দাতা অমৃতলোকে অথবা স্বর্গলোকে স্থান পাইতেন (শতপথ ব্রাহ্মণ, ২.২.১০.৬)। বলাবাহুল্য, বর্তমান আলোচনায় প্রাচীন হিন্দু সমাজের বিধিনিয়মের প্রয়োগ অনেক সময়েই যথাযথ নাও হইতে পারে। কিন্তু, একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও অনুষ্ঠানের শৃংখল আমাদের এমনভাবেই প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ও সংস্কারের সহিত বন্ধন রচনা করিয়াছে যে আমরা আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা, যুক্তি ও বুদ্ধিসত্বেও, সে বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারি নাই। এ বিষয়ে প্রখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবি লেখক অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুর একটি মতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।

'The desire to cut away all the roots which hold us back to the achievements of Indian civilization seem to be galling to those who are in earnest, and wish to see India emancipated as quickly as possible from its bondage to the past. The more earnest a soul is, the more intense becomes its suffering when he finds himself thwarted in his endeavour to destroy the past' ('Some Aspects of Indian Civilization' by Nirmal Kumar Bose, Man In India, Vol. 51, No. 1, January-March, 1971, pp. 13).

এমতাবস্থায়, এই দুই জেলার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, কর্মরত ও কর্মসন্ধানী, গ্রামীণ ও নাগরিক মানুষের মধ্যে এক উভয় সংকট আসিয়া যদি সকলের বা অনেকের মতবাদে ও জীবনাদর্শে এবং বাস্তব জীবনযাত্রায় এক উভয়বল মানসিকতা সৃষ্টি করে ও তাঁহাদিগকে বিসদৃশ আচরণে উদ্বুদ্ধ করে, তাহা হইলে অবাক হইবার কিছুই নাই। বস্তুতঃ, এই গ্রন্থে বর্ণিত অনেক উপকরণই অনুরূপ অবস্থার সন্ধান দিবে।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি বিষয়ে একটি মূল্যবান তথ্য সমাজের অভ্যন্তরের মানুষগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। গ্রন্থে বর্ণিত বিভিন্ন গ্রামে বসবাসকারী মানুষগুলির সামাজিক, ধর্মীয়, সম্প্রদায়গত ও গোষ্ঠীগত বর্গবিন্যাস করিলে পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত নামগুলি পাওয়া যাইবে :—

আচার্যব্রাহ্মণ, আদিবাসী, উগ্রক্ষত্রিয়, উড়িয়া, ঋষিদাস, একাদশ তিলি, ওরাং, কদমা, করঙ্গা, করণ, করেঙ্গা, কর্মকার, কলু, কয়াল, কংসবণিক, কাওরা, কাগমারা, কাজী, কাদমা, কাপালিক, কাপালী, কামার, কামিলা, কারিগর, কারুয়া, কালন্দী, কাহার, কায়পুত্র, কায়স্থ, কাঁসারী, কুনার, কুমার, কুম্ভকার, কুর্মি, কেওট, কেওড়া, কৈবর্ত, কোদমা, কোরেঙ্গা, কোল, কোড়া, খণ্ডাইত, খয়রা, খড়িয়া, খড়িয়াল, খামারু, খাড়িয়া, খাটরা, খ্রীষ্টান, গন্ধবণিক, গন্ধবেনে, গাইন, গাজী, গিরি, গুড়্যা, গোপ, গোয়ালা, ঘড়িয়াল, ঘাসি, ঘোষ, ঘোড়ই, ঘোড়াই, চণ্ডাল, চামার, ছত্রি, ছত্রী, ছুতার, জেলে, ডোম, তপশীলভুক্ত হিন্দু, তপশীলী, তামলী, তাম্বুলী, তাঁতি, তাঁতী, তিওর, তিলি, তিয়র, তেওর, তেলী, দলুই, দাস, দুলে, দেশালী, ধাওয়া, ধীবর, ধোপা, নবশাখ, নমঃশূদ্র, নরশাখ, নস্কর, নাইয়া, নাগা, নাথ, নাপিত, পাইক, পান, পাল, পুরকাইত, পেয়াদা, পোদ, পোদ্দার, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, প্রামাণিক, ফকির, বণিক, বর্গক্ষত্রিয়, বর্ণহিন্দু, বাইতি, বাউরী, বাগ্দী, বাগাল, বারুই, বারুজীবী বাসুড়ী, বিশ্বাস, বুনো, বেদে, বেনে, বেহারা, বৈদ্য, বৈরাগী, বৈশ্য, বৈশ্যকপালী, বৈষ্ণব, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রহ্মভট্ট, ব্রাহ্মণ, ভট্ট, ভুঁইঞা, ভুঁইয়া, ভূমিজ, ভেলী, মণ্ডল, মল্লক্ষত্রিয়, ময়রা, মহাদণ্ড, মাঝি, মাদাল, মাল, মালাকার, মালী, মালো, মাহাতো, মাহাল্লী, মাহিলী, মাহিষ্য, মিদ্দে, মির, মিস্ত্রী, মুচি, মুণ্ডা, মুসলমান, মেটে, মেথর, মোদক, মোল্লা, মোড়ল, যাদব, যুগী, যোগী, রজক, রাপুজত, রাজবংশী, রাজবংশী তিওর, রাজু, রাজোয়ার, রায়, রুইদাস, লস্কর, লায়েক, লোধা, লোহারী, শঙ্খবণিক, শবর, শাঁখারী, শাহজী, শিকারী, শুক্লী, শুঁড়ি, শূদ্র, শোলাঙ্কি, শৌণ্ডিক, শ্রেষ্ঠীকরণ, সংচাষী, সদ্গোপ, সর্দার, সাঁওতাল, সামন্ত, সাহা, সাহেব, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর, সেখ, সোনারবেনে, সোলাঙ্কী, স্যাকরা, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক, হাড়ি, হাড়ী, হিন্দু এবং ক্ষত্রিয়।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, সংখ্যাধিক্য একদিকে যেমন বিস্ময়ের উদ্রেক করিবে, আবার কয়েকটি অপ্রচলিত গোষ্ঠীর সন্ধানও তেমনই বিশেষ কৌতূহল এবং প্রবল জিজ্ঞাসার সঞ্চার করিবে। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক সংবিধানে জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিভেদ এবং বৈষম্যের অবসানকল্পে কয়েকটি নির্দেশ লিপিবদ্ধ আছে। বিভিন্ন সংবিধানিক এবং নির্বাহী আদেশ ও ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এক শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা রচনা করার প্রয়াস যে কতদূর দুরূহ এবং পরিবর্তনমুখী রাজনৈতিক ভাবে উদ্বুদ্ধ সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা যে কত আয়াসসাধ্য, তাহার গুরুত্ব পূর্বোক্ত গোষ্ঠীসমূহের আধিক্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। তথ্যসংগ্রহকালে একটি প্রশ্নে গ্রামে বা নগরে বসবাসকারী প্রধান প্রধান জাতির নাম অনুসন্ধান করা হইয়াছে। ফলশ্রুতি হিসাবে একটি বিষয়ে ধারণা অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়াছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, আধুনিক জীবনাদর্শ, গ্রাম ও নগরের সমাজব্যবস্থা এবং যুক্তিবাদ যে সমাজের প্রাচীন স্তরবিন্যাস অপনয় করিয়া এক শ্রেণীহীন, বৈষম্যহীন ভাবধারায় সকলকে সম্পৃক্ত করিবে, এমন সাম্যবাদী প্রত্যয় বাস্তবানুগ নহে। বাস্তবিকপক্ষে, বিভিন্ন গ্রাম এবং শহরে বসবাসকারী মানুষের দৃষ্টিকোণে একই গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন ভাবে পরিচিত হয় বলিয়াই, কয়েকটি সমার্থক বা সমশ্রেণীগোত্রীয় গোষ্ঠী একাধিক নামে বর্ণিত হয় নাই। অনেক সময় একটি গোষ্ঠীর চলিত নাম সংস্কৃত ভাষায় বিবৃত হইলে, দুইটিকে অভেদ্য বলিয়া দেখা

অন্যায় হইবে। যেমন শঙ্খবণিক ও শাঁখারী অথবা শঙ্খকার এক নহে। শঙ্খবণিকের বৃত্তি শঙ্খ ও শঙ্খজাত দ্রব্যের ব্যবসায়, শঙ্খকারের পেশা শঙ্খ হইতে বিভিন্ন দ্রব্যের শিল্পকর্ম। শঙ্খকারকে আপাতদৃষ্টিতে শাঁখারী বলিয়া পরিচিত করিতে তথ্য প্রেরকের কোন বাধা ছিল না। অনেক সময়ে, একটি নাম শুদ্ধভাষায় (সংস্কৃতরূপে) পরিচয় দিলে, ঐ গোষ্ঠীর সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস অন্যরূপ হয়। আলোচ্যমান ক্ষেত্রে অবশ্য অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে যে, একটি জাতি যদি দুইটি নামে দুইটি ভিন্ন স্থানে পরিচিত হয়, তবে স্তরবিন্যাসের দ্যোতনায় কোন পৃথক অর্থ হয় কিনা। প্রাচীন হিন্দু সমাজব্যবস্থায় যে বর্ণাশ্রম পরবর্তীকালে সামাজিক ও বৃত্তিগত ক্রমে রূপান্তরিত হইয়াছিল, তাহা এখনও অবলুপ্ত হয় নাই। কারণ, গোষ্ঠীর তালিকায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিটি বর্ণক্রমেরই সন্ধান পাওয়া যাইবে। প্রাচীন সংস্কৃতির ধারার সহিত যুগপৎ আধুনিক সংবিধানিক একটি স্বীকৃতির সহাবস্থান সমাজের অন্তর্নিহিত প্রাচীন মূল্যবোধ ও আধুনিক সচেতনতার বিকৃত রূপ ত্রুটিপূর্ণ বোধের বিসংগত স্থিতিশীলতা প্রকটিত করে। তপশীলী বা তপশীলভুক্ত হিন্দু বলিয়া বিশেষ কোন গোষ্ঠীর নাম পূর্বে প্রচলিত ছিল না। সংবিধানিক নির্দেশে ১৯৩৫ সালে নির্দিষ্ট কয়েকটি নাম ১৯৫০ ও ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিসংশোধিত পর্যায়ে তপশীলভুক্ত হইয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার বিশেষ কতকগুলি স্বীকৃত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগসুবিধা ভোগের অধিকারী হয়। কিন্তু, ইহা একটি চিরন্তন নির্দেশ নহে যাহা দ্বারা গোষ্ঠীগুলি সরকারী ও রাষ্ট্রীয় সাহায্য অনন্তকাল ধরিয়া ভোগ করিবে। বর্তমান সমাজে যদি দেখা যায় যে, সংবিধানিক তপশীলভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি সামগ্রিক-ভাবে তপশীলী বা তপশীলভুক্ত হিন্দু নামে আর একটি বিধিবহির্ভূত নূতন বৃহত্তর গোষ্ঠীর সৃষ্টি করিয়া উহার বিবরে আশ্রয়লাভের চেষ্টা করিতেছে, তবে যে উদ্দেশ্যে সমাজ সংস্কার ও সমাজ উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাটি গ্রহণ করার প্রয়োজন হইয়াছে তাহা ব্যর্থ হইবে এবং ভারতীয় সমাজের অসংখ্য প্রাচীন ব্যবস্থাসম্মত যুগপ্রচলিত অনেকগুলি গোষ্ঠীর মধ্যে আরও একটি আধুনিক গোষ্ঠী আসিয়া দুর্যোগ বাধাইবে। বলাবাহুল্য, শ্রেণীহীন সমাজপ্রবর্তনের পথে এই দশা এক অনতিক্রম্য বাধারূপেই জন্ম লইবে। একই যুক্তিতে, 'আদিবাসী' নামে বিভিন্ন উপজাতিকে অভিহিত করার পিছনে বর্তমান সমাজের অগ্রসর গোষ্ঠীর এক স্বার্থপর, অসামাজিক ও অনাধুনিক প্রচেষ্টা কার্যকর হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। গ্রামীণ বা নাগরিক সমাজে ঐ অনগ্রসর গোষ্ঠীর স্থান স্বভাবত: অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমতুল্য হইবে বলিয়া মতবাদ পোষণ করা বাস্তবসম্মত হইবে না। 'আদিবাসী' পরিচয়ে এক নূতন গোষ্ঠী যদি বর্তমান সমাজে স্বীকৃত হয়, তবে শ্রেণী বৈষম্যলোপের সংস্কারকার্য ভবিষ্যতে অধিক কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। বিভিন্ন উপজাতি যেহেতু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতায় বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত, সেইজন্য সকলকে 'আদিবাসী' অভিধায় এক গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া অভিজ্ঞাত করিলে সামাজিক পুনর্বিন্যাসে এক বিরাট নৃতাত্ত্বিক ত্রুটি থাকিয়া যাইবে।

যেখানে মানুষের মধ্যে এত শ্রেণীভেদ, সেখানে ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানে দেবতার বহুলত্ব কোন বিস্ময় সৃষ্টি করিতে পারে না। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, সম্প্রদায় ও তত্ত্ব বিভিন্ন ভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে নানা আগমপথে প্রবেশ করিয়াছে। সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য ও

বৈপরীত্য সৃষ্টি করিয়াও, ধর্মানুষ্ঠানের নানা বিচিত্র সংস্কার ও বিশ্বাস স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া আত্তীকরণের প্রক্রিয়াকে প্রায় নিষ্ক্রিয় ও অচল করিয়া দিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত দুইটি জেলায় বর্ণিত বিভিন্ন দেবদেবী এবং দৈবশক্তিসম্পন্ন পূজিত বিষয়ের তালিকা নিম্নে বিবৃত করা হইয়াছে।

অদ্বৈতাচার্য, অনন্তজীউ, অন্নপূর্ণা, আটেশ্বর, আটেশ্বরী, আদ্যমহেশ, আদ্যা মা, আনন্দময়ী কালী, আনন্দশংকর শিব, আহ্লাদিনী বুড়ি, ইতু, ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, ঈশ্বর, ঈশ্বরজীউ, উলাবিবি, ওরপরী, ওলাইচণ্ডী, ওলাইবিবি, কপিলাদেবী, কপিলেশ্বর শিব, করম, করুণাময়ী কালী, কাত্যায়নী, কাদুয়াচণ্ডী, কানাই, কানোরায়, কামেশ্বরনাথজীউ, কামেশ্বর শিব, কামেশ্বরী, কার্তিক, কালমুছি, কালষণ্ডা, কালামদন, কালিমায়ী, কালী, কালুরায়, কাশীনাথ শিব, কাশীশ্বর শিব, কুড়ুখাঁ, কৃষ্ণবলরামজীউ, কৃষ্ণরায়, কৃষ্ণরায়জীউ, ক্ষিরাইচণ্ডী, ক্ষীরেশ্বর শিব, ক্ষেত্রপাল, খড়্গেশ্বর শিব, খানেখোদা, খুকীকালী, খেলারায়, গঙ্গা, গঙ্গাঠাকুর, গঙ্গাদেবী, গঙ্গাধর শিব, গণেশ, গণেশজননী, গন্ধেশ্বরী, গরাম, গরামঠাকুর, গরুড়, গাছাকালী, গিরিধারী, গুপ্তমণিদেবী, গুহ, গোকুলচাঁদ, গোকুলেশ্বর শিব, গোপাল, গোপালজীউ, গোপীনাথ, গোপীনাথবল্লভ, গোপীশংকর, গোবিন্দ, গোবিন্দজীউ, গোরক্ষনাথ, গোরাচাঁদ, গোষ্ঠ, গোষ্ঠেশ্বর, গৌর, গৌরনিতাই, গৌরাঙ্গদেব, গ্রাম, গ্রামবুড়ী, ঘণ্টাকর্ণ, ঘাগরাসিনী বনদেবী, চণ্ডী, চণ্ডীদেবী, চতুর্ভুজাজীউ, চন্দনেশ্বর শিব, চন্দ্রশেখর শিব, চন্দ্রেশ্বর শিব, চপলেশ্বর শিব, চমৎকারিণী, চম্পকেশ্বর শিব, চড়ক, চড়ামবুড়ী, চৈতন্যদেব, চৈতাদেবী, জগৎরায়, জগদ্ধাত্রী, জগন্নাথ, জগন্নাথদেব, জরাপাত্র, জলেশ্বর শিব, জয়চণ্ডী, জয়দুর্গা, জয়া, জাঁতাল, জাহীরবুড়িদেবী, জাহ্নবী, জীমূতবাহন, জ্বরাপাত্র, জ্বরাসুর, ঝাড়বাসিনী, ঝাড়েশ্বর শিব, টুসু, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, ডাকাতে কালী, ডাকুইবুড়ী, তারকনাথ শিব, তারকেশ্বর, তিলেশ্বর শিব, তেঁতুলাবুড়ী, ত্রিপুরাসুন্দরী, ত্রৈলক্যনাথ শিব, দক্ষিণরায়, দক্ষিণাকালী, দক্ষিণেশ্বর, দণ্ডেশ্বর শিব, দধিবামন, দশভুজা, দামোদর, দামোদরজীউ, ধনেশ্বরজীউ শিব, ধন্বন্তরী কালী, ধরম, ধর্ম, ধর্মঠাকুর, ধর্মরাজ, নন্দদুলালজীউ, নরসিংহদেব, নাগিনীকন্যা, নাচনজামসিনী বনদেবী, নারায়ণ, নারায়ণী, নাড়ুগোপাল, নিত্যানন্দ, নীল, নৃসিংহ, নৌকেশ্বর শিব, পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ, পন্থেশ্বরী শিব, পাগলাপীর, পাঁচপীর, পাঁচলেশ্বর শিব, প্রতাপেশ্বর শিব, প্রসন্নময়ী কালী, ফলহারিণী কালী, ফুলমণিদেবী, ভগবতী, ভদ্রকালী, ভদ্রাণী, ভদ্রেশ্বর শিব, ভবানী দেবী, ভবানীশ্বর, ভাগবতজীউ, ভাগ্যেশ্বরী দেবী, ভাঙ্গর, ভাঙসিং ঠাকুর, ভীম, ভীমরাজসিনী, ভীমা, ভীমেশ্বরী, ভুবনেশ্বর শিব, ভুবনেশ্বরী, ভূতনাথ, ভূতিনাথ, ভৈরব, ভৈরবঠাকুর, ভৈরবনাথ, ভৈরবসিনী, ভোলানাথ, বগলা, বংগাঠাকুর, বটেশ্বর শিব, বনদেবতা ভৈরবঠাকুর, বনদেবী, বনবিবি, বরাহ, বরাহচণ্ডী, বর্গভীমাদেবী, বলদেব, বলরাম, বলরামদেব, বলাই, বসন্তরায়, বসুন্ধরা, বড়পীর, বড়ামঠাকুর, বাখুৎ, বাণেশ্বর, বাণেশ্বর শিব, বাবনপীর, বাবাঠাকুর, বালকনাথ শিব, বালগোপাল, বালাজী, বালিবিলাসিনী, বাসন্তী, বাসুদেব, বাসুলী, বাসুলীদেবী, বাস্তু, বিজয়চণ্ডী, বিজয়া, বিনন্দজীউ, বিনোদিনীকালী, বিন্ধ্যবাসিনী, বিবিচম্পা, বিবিমা, বিশালাক্ষ্মী, বিশ্বকর্মা, বিষ্ণু, বীরঝাপট, বুড়াকুদরা, বুড়াশিব, বুড়িঠাকুরাণী, বুড়ীবাসুলীদেবী, বুড়োমা, বুড়োশিব, বৃন্দাবনচন্দ্রজীউ, বৃন্দাবনজীউ, বেনেবুড়ী, বৈষ্ণবী, বোঙ্গা, ব্রজমোহনজীউ, ব্রহ্মময়ী কালী, ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণী, মঙ্গলচণ্ডী, মঙ্গলাদেবী,

মঙ্গেশ্বরী, মদনগোপালজীউ, মদনমোহনজীউ, মনসা, মনসাকালী, মশানচণ্ডী, মহাকালভৈরব, মহাকালী, মহাচণ্ডী, মহাপ্রভু, মহাবীর, মহামায়া, মহারুদ্র, মহারুদ্রজীউ, মহালক্ষ্মী, মহিষমর্দিনী, মহেশ্বর, মাকালঠাকুর, মাচাইসিনী, মাণিকপীর, মিলনমা, মুক্তেশ্বর শিব, মুস্কিলআসানপীর, মেকাবুড়ীবনদেবী, যমুনাদেবী, যোগমায়া, রওশনবিবি, রক্তাবতী, রক্ষাকালী, রক্ষাচণ্ডী, রঘুনাথ, রঘুনাথজীউ, রঙ্কিণী, রটন্তীকালী, রত্নেশ্বর শিব, রসিকরায়, রাইঠাকুরানী, রাইরাজা, রাজরাজেশ্বর, রাজরাজেশ্বরী, রাধাকান্ত, রাধাকৃষ্ণ, রাধাগোপালজীউ, রাধাগোবিন্দ, রাধাগোবিন্দজীউ, রাধা-বল্লভজীউ, রাধাবৃন্দাবনচন্দ্র, রাধামাধব, রাধামাধবজীউ, রাধারাণী, রাধিকা, রামলীলাজীউ, রামসীতা, রামেশ্বর শিব, রুদ্র, রুদ্রাণী, রুদ্রেশ্বর শিব, রূপপরী, রূপাসিনী, লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী, লক্ষ্মীজনার্দনজীউ, লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্মীবরাহজীউ, ললিতকুমারী দেবী, শঙ্কর্ষণজীউ, শম্ভুনাথ শিব, শহীদবাবা পীর, শালুই, শিকড়াসিনী, শিব, শিবদুর্গা, শীতলা, শ্মশানকালী, শ্যামচাঁদ, শ্যামরায়, শ্যামলেশ্বর মহাদেব, শ্যামসুন্দর, শ্যামসুন্দরজীউ, শ্যামসুন্দরীকালী, শ্যামা, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীধর, শ্রীধরজীউ, শ্রীরঙ্গজীউ, সতীমা, সত্যনারায়ণ, সত্যপীর, সত্যেশ্বর শিব, সনৎকুমারী, সম্বিতেশ্বর শিব, সরস্বতী, সর্বমঙ্গলা, সহরায়, সাতবিবি, সাতভগিনী, সাতভাইকালী, সাতভোগী দেবী, সাবিত্রী, সিদ্ধেশ্বরী কালী, সিংহবাহিনী দেবী, সীতানন্দজীউ, সীতারাম, সুদর্শন, সুভদ্রা, সূর্য, স্বরূপনারায়ণ, স্বর্গবাউরী ষষ্ঠী, হটেশ্বর শিব, হনুমানজীউ, হরনাথ শিব, হরি, হরিঠাকুর, হরিশংকর, হরিয়াবুড়ী, হল্যাসিণী, হাউড়িমা, হাড়িঝিচণ্ডী, হিড়িম্বেশ্বরী, হুড়েশ্বরী এবং হৈদরপীর।

মানুষের প্রথম দেবতা তাহার চেতনার উদয়কালে কোন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ সে চিন্তা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইতে পারে। কারণ, মানবসমাজে সভ্যতার আলোক কবে কোন বিস্মৃত-কালের উষায় প্রবেশ করিয়াছিল তাহার রহস্য এখনও সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয় নাই। মানুষের অন্তরের দেবতাকে বর্তমান যুগের জ্ঞানের অনুসন্ধানী আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহাকে জানার প্রচেষ্টা আরও কঠিন এক সাধনারই নামান্তর হইবে। বর্তমান আলোচনায় দেবতার স্বরূপ উদঘাটন করার কোন অবকাশ নাই। মানুষের প্রথম ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিটি সর্বপ্রাণবাদী পার্থিব জাগতিক শক্তির মধ্যে প্রোথিত হইয়া আদিমধর্মের সূচনা করিয়াছিল। বিভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠী তাহাদের আদিম ধর্মনিহিত সংস্কার লইয়া ভীতসন্ত্রস্ত চিত্তে প্রথম উপাসনার রীতিপ্রণালীর প্রবর্তন করিয়াছিল। প্রাকৃতিক কিছু কিছু নৈসর্গিক শক্তি কিভাবে নরত্বারোপিত হইয়া দেবতারূপে পুর্নজন্ম লইলেন, তাহার কাহিনী এই আলোচনায় অবতারণা করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু বহুমানুষের ভীড়ে বহুদেবতার জন্মকথা যত রহস্যঘনই হউক, সমুদয় দেবতা পরবর্তীকালে অদৃশ্য হইয়া যান নাই। নশ্বর মানবসমাজে অবিনশ্বর দেবতার সৃষ্টি মানুষই করিয়াছিল। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সহাবস্থান আজও চলিতেছে। প্রতিটি গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসে মৌল যে এক বা একাধিক অবিনশ্বর দেবতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহারা আজও মানুষের শ্রদ্ধা ও ভক্তির আসনে অটল রহিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো দুঃখ করিয়াছিলেন যে, সক্রেটিসের মৃত্যুর কারণ নাকি বহু দেবতায় তাঁহার বিশ্বাস ('Socrates is guilty of corrupting the minds of the young, and of believing in

deities of his own invention instead of the gods recognized by the State'—Plato in Apology, 24B)। ভারতবর্ষের বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব ইহার ধর্মনিরপেক্ষতা। ফলে, কোন বিশেষ ধর্ম ও দেবতা রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ও আনুকূল্য কেবল বর্তমানেই নহে, অতীতেও ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় বড় একটা লাভ করে নাই। ফলে, একাধিক ধর্ম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একাধিক দেবতার যুগপৎ অবস্থিতি কোন সংকটপূর্ণ দুর্যোগের সৃষ্টি করে নাই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্মের আবির্ভাবকালেও কোনদিন ক্রুজেডের ন্যায় ধর্মযুদ্ধের সূচনা হয় নাই। পূর্বে বিবৃত দেবতাকুলের সকলেই কোন বিশেষ একটি গোষ্ঠীর মানুষের মনের দেবতা নহেন। ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী ও বৃত্তির মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বিশেষ বিশেষ দেবতার উপাসনা করিয়াছে।

ভারতীয় সভ্যতার আদিকাল হইতে দেবপূজার সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু, আদিমধর্মের ন্যায় প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবতার মর্যাদায় ভূষিত করিয়া এবং মানবীয় গুণাবলীর অধিকারীরূপে কল্পনা করিয়া বৈদিক ধর্ম প্রথম যুগে আদিমধর্মের সহিত বিচ্ছিন্নতা রচনা করিয়া স্বকীয় বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছিল। বলা নিষ্প্রয়োজন, প্রতিটি শক্তিকে এক বিশেষ নামে সম্বোধন করিয়া উহার উপাসনা করা হইত। সর্বপ্রাণবাদ সর্বেশ্বরবাদে রূপান্তরিত হইবার প্রাক্কালে ঐ শক্তির মানবীয় কোন রূপ ছিল কিনা বলা কঠিন। কিন্তু, কোথাও কোথাও ঋগ্বেদীয় স্তোত্রে ঋগ্বেদীয় দেবতার নরত্বারোপিত রূপের পরিচয় মেলে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দেবতা ইন্দ্র একই নামে বর্তমান দিনের মানুষের কাছে পরিচিত। তাঁহাকে অনেক সময় মানুষের অবয়বে কল্পনা করা হইয়াছে। (যথা, 'তুবিগ্রীবো বপোদরঃ সুবাহুরন্ধসো মদে। ইন্দ্রো বৃত্রাণি জিঘ্নতে॥'— ঋগ্বেদ, ৮. ১৭. ৮)। পূর্বোক্ত বিষ্ণুকে ঋগ্বেদে শুধুমাত্র নরত্বারোপিত দেবতার কায়াতেই দেখিতে পাওয়া যায় না, অনেক সময় 'যুবা'র অবয়বেও 'বৃহচ্ছরীর' বিষ্ণুর দর্শন মেলে (ঋগ্বেদ, ১. ১৫৫. ৬)। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় (অধ্যায় ৫৮) রাম, বিষ্ণু, বলদেব, ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবতার মূর্তি রূপ বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য দেবতার মধ্যে দুর্গা, গণেশ এবং সূর্যেরও উল্লেখ আছে ('আদিত্যমম্বিকাং বিষ্ণুং গণনাথং মহেশ্বরম্। পঞ্চযজ্ঞপরো নিত্যং গৃহস্থঃ পঞ্চ পূজয়েৎ॥' — বৈদ্যনাথ কর্তৃক রচিত স্মৃতিমুক্তাফলের আহ্নিক অংশ, পৃঃ ৩৮৪)। ইতু নামে বর্তমানে যে দেবতা পূজিত হন, তাহাকে সূর্য বা মিত্রেরই নামান্তর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। দুর্গার উপাসনাও দীর্ঘকালের ঐতিহ্যপুষ্ট। দেবীর বিভিন্ন প্রাচীন নামের মধ্যে চণ্ডী নামটির এখনও প্রচলন আছে। মহাভারতে (বিরাটপর্ব, ৬ এবং ভীষ্মপর্ব, ২৩) দুর্গা বিন্ধ্যবাসিনী নামে কল্পিতা হইয়াছেন। বিন্ধ্যবাসিনী নামে এক দেবী বর্তমান তালিকাতেও উল্লিখিত হইয়াছেন। বিবাহের সময় ইন্দ্রাণীপূজার উল্লেখ গোপীনাথ তাঁহার সংস্কার-রত্ন-মালা গ্রন্থের ৫৪৫ পৃষ্ঠায় করিয়াছেন। ঋগ্বেদেও একটি শ্লোকে ইন্দ্রাণীর ন্যায় সীমন্তিনী হইবার প্রার্থনার উল্লেখ পাওয়া যায় ('ইন্দ্রাণীমাসু নারিষু সুভগামহমশ্রবম্। ন হ্যস্যা অপরং চ ন জরসা মরতে পতির্বিশ্চস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ॥— ঋগ্বেদ, ১০.৮৬.১১)। গঙ্গা সম্বন্ধে আলোচনা প্রথম খণ্ডেই করা হইয়াছে। একদিকে যেমন বৈদিক যুগ হইতে স্মৃতি ও পুরাণের কাল পর্যন্ত বর্ণিত বিভিন্ন দেবদেবীর অনেক উপাসনা আজও হইতেছে, অন্যদিকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী তাঁহাদের নিজস্ব সংস্কারপুষ্ট বিভিন্ন ঐশীশক্তিসম্পন্ন মহামানব, অতিমানব ও

অবতারের পূজার্চনাও আরম্ভ করিয়াছেন। রাম, সীতা, ভীম, নৃসিংহ, সাবিত্রী, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতির সহিত বিভিন্ন পীরের উল্লেখ এই পর্যায়ে করা যাইতে পারে। আঞ্চলিক প্রতিবেশ অনুযায়ী অনেকসময় অনেক দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের বিশেষ কারণ থাকে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় গঙ্গাপূজা ও সাগরস্নান অত্যন্ত স্বাভাবিক এক সংস্কার। সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে স্থানীয় দেবদেবীর উপাসনাও অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য। এই কারণে বিভিন্ন বনদেবী তালিকায় আরাধ্যা দেবীরূপে স্থান পাইয়াছেন। গ্রামীণ দেবদেবীর মধ্যে রোগব্যাধির নিয়ামকরূপে শীতলাপূজার জনপ্রিয়তা আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর শুধু বিরোধিতাই করেনা, অত্যাশ্চর্য চিকিৎসা-ব্যবস্থাগ্রহণে অনীহাও প্রকাশ করে। একই দৃষ্টিতে পরিবারনিয়ন্ত্রণের যুগে ষষ্ঠীদেবীর পূজাও কালাসঙ্গতির নির্দেশ করে। সমাজের পরিবর্তন ও সংস্কারসাধনের কার্যে দেবতার প্রতি এই ভক্তির উৎসেই যে এক বিরোধী শক্তি জন্ম লইবে না এমন কথা বলা যায় না। আরও একটি উদাহরণ দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তির নিকট আধুনিক যুগের মানুষের আত্মসমর্পণের সহজভঙ্গীকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে পারা যায়। এই দুই জেলার মানুষের কাছে সরীসৃপের বিভীষিকা এক দুঃস্বপ্নের ন্যায় ভয়াবহ। সেইজন্য, মনসাকে সর্পদেবীরূপে উপাসনা করিয়া সরীসৃপজগতের ক্ষয়ক্ষতি করার প্রয়াসকে উদাসীন অবস্থায় আনার সাধনা সর্বপ্রাণবাদের দীপ্যমান দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রতীত হইতে পারে। উপজাতীয় বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি তাহাদের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস বিসর্জন দেয় নাই। বোংগা, জাঁতাল প্রভৃতি উপজাতীয় দেবদেবী হিন্দু সমাজের অন্যান্য দেবতাদের নিকট নিজস্ব উপাসকবৃন্দকে সমর্পণ করেন নাই। বিশ্বকর্মার পূজা গ্রামাঞ্চলে যে কারুকলাশিল্পীগণই আজ করিতেছেন, তাহা নহে। শিল্পাঞ্চলে এবং শহরে অত্যাধুনিক যন্ত্রশিল্পেও উচ্চশিক্ষিত প্রাযুক্তি-বিশারদ হইতে অল্পশিক্ষিত যন্ত্রবিৎ নাগরিকগণ পর্যন্ত পুরাণের দেবশিল্পীকে শ্রদ্ধার আসনে বসাইয়াছেন। আধুনিক নগরসভ্যতায় প্রাচীন ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয় নাই। নগর বা গ্রামের দূরত্ব যতই হ্রস্ব হউক, সামাজিক গোষ্ঠীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মূল্যমান এবং দূরত্ব কথঞ্চিৎ ও হ্রাস পায় নাই। বর্তমান সমাজের এই বৈচিত্র ও বৈপরীত্য কিন্তু সমস্ত পরিবর্তনের ইচ্ছাশক্তিকে খর্ব করিয়া পুরাতনী প্রতিরূপের ব্যবস্থার মধ্যে আপনাকে অজর অমর করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

দেবদেবীর উপাখ্যানে বক্তব্য সম্পূর্ণ হয় না। তাই বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পূজা বা উৎসবের কার্যক্রমটি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে। পূজা বা উৎসব বৎসরের কোন কোন মাসে অনুষ্ঠিত হয় তাহা পরিশিষ্ট ক-এর সারণীতে বিবৃত হইয়াছে।

সারণীটি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, ১৬৬টি পূজা বা উৎসবের মধ্যে যে কোন একটি মাসে মাত্র একবার অনুষ্ঠিত পূজা বা উৎসরের সংখ্যা ১১৯, যে কোন দুই মাসে দুইবার অনুষ্ঠিত এমন পূজা বা উৎসবের সংখ্যা ২২, নয়টি উৎসব বৎসরের যে কোন তিন মাসে তিনবার অনুষ্ঠিত হয়, ছয়টি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বৎসরে যে কোন চার মাসে চারবার, পাঁচ মাসে পাঁচবার একই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় পাঁচটি, দুইটি উৎসব ছয়মাসে ছয়বার, আরও দুইটি উৎসব আটমাসে আটবার এবং একটি উৎসব নয় মাসে

নয়বার উদযাপিত হয়। শেষোক্ত উৎসবটি মনসাপূজাকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। ফাল্গুন মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এবং পৌষ মাসে এই পূজার কারণ সহজেই অনুমেয়। গ্রামবাংলার এই দুইটি জেলায় শীতের শেষ হইতে শরৎকাল পর্যন্ত বিষধর সর্পের প্রাদুর্ভাব থাকায়, সমগ্র সময় সাধারণ মানুষের নিকট মনসার এই জনপ্রিয়তার কারণ সহজবোধ্য। অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সহিত পূজা বা উৎসবের একটি নিবিড় সম্বন্ধ আছে। সেইজন্য দেখা যায়, বৈশাখ হইতে চৈত্রের উৎসবগুলির সংখ্যা যথাক্রমে দাঁড়ায় ৩৫, ১৩, ১৬, ৪, ১৩, ২০, ১৪, ১০, ৩৩, ৪৬, ৩৮ এবং ৩৪। কৃষিনির্ভর এই অঞ্চলে পৌষ মাসেই কৃষিজীবি কর্মক্লান্ত মানুষগুলি বৎসরের খাদ্যসম্ভার অগ্রহায়ণ মাসে ঘরে তুলিয়া বিশ্রামের অবকাশ পায়। তখনই বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন উৎসবের সংখ্যাধিক্য সূচিত হয়। কার্যকারণতার এই ধারাটি যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। বর্তমান সমাজজীবনের অশান্ত পরিবেশে ও পরিবর্তিত নানা মূল্যবোধের ও ভাবাদর্শের সংঘাতে পূর্বপ্রচলিত সংস্কারের ও অভ্যাসের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। আলোচনার শেষে অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুর মন্তব্যই উদ্ধৃত করিব।

'Many cultures and religions existed side by side with one another ; but the feeling of distinctness which was thus encouraged failed when there was need of combining the people into one 'nation'·· ···

'The weight of our poverty, the inequality between classes, all sit heavily upon us. And it is natural that an ardent and sincere desire has arisen among sensitive souls to find a way out of our present predicament. The examples of Russia, America or even China prove attractive. They seem to be blessed with all that we have not. And the tension thus grows into our ancient land of what history has left behind and what is desired by those who have drawn their inspiration from the successes of other lands.' ('Some Aspects of Indian Civilization by Nirmal Kumar Bose, published in Man In India, Vol. 51, No. 1, January-March, 1971, pp. 12-13).

পরিশিষ্ট ক

উৎসব-মাসক্রম সারণী

(নিম্নলিখিত মাসে পূজা বা উৎসব অনুষ্ঠিত হইলে, 'হাঁ' ; অন্যথায়, 'না')

পূজা বা উৎসবের উপলক্ষ্য	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
অক্ষয় তৃতীয়া	হাঁ	না	না	না	না	না	না	না	না	না	না	না
অধিবাস	না	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	হাঁ	,,
অন্নকূট	,,	,,	,,	,,	,,	,,	হাঁ	হাঁ	,,	,,	না	,,
অন্নপূর্ণা	,,	,,	,,	,,	,,	হাঁ	না	,,	হাঁ	,,	,,	হাঁ
অম্বুবাচী	,,	,,	হাঁ	,,	,,	না	,,	না	না	,,	,,	না
অরন্ধন	,,	,,	না	,,	হাঁ	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
ইন্দ্রপূজা	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
ওলাইচণ্ডী	হাঁ	,,	,,	,,	না	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
ওলাবিবি	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
করম	না	,,	,,	,,	হাঁ	হাঁ	,,	,,	,,	,,	,,	,,
করুণাময়ী কালী	,,	,,	,,	,,	না	না	,,	,,	,,	হাঁ	,,	,,
কার্তিক	,,	,,	,,	,,	,,	,,	হাঁ	,,	,,	না	হাঁ	,,
কালষণ্ডা	,,	,,	,,	,,	,,	,,	না	,,	,,	হাঁ	না	,,
কালামদন	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	হাঁ	না	,,	,,
কালী	হাঁ	হাঁ	,,	,,	,,	হাঁ	হাঁ	হাঁ	,,	,,	হাঁ	হাঁ
কালীয়দমন	না	না	,,	,,	হাঁ	না	না	না	না	,,	না	না
কালুরায়	,,	,,	,,	,,	না	,,	,,	,,	,,	হাঁ	,,	,,
কুদুর্ঘাঠাকুর	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	হাঁ	না	,,	,,

পূজা বা উৎসবের উপলক্ষ্য	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
কৃষ্ণরায়	না	না	না	না	না	না	না	না	না	না	হাঁ	না
খড়েশ্বর শিব	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	না	হাঁ
গঙ্গা ও গঙ্গাদেবী	"	হাঁ	"	"	"	"	"	"	হাঁ	"	"	"
গণেশ	"	না	"	"	"	"	"	"	না	"	হাঁ	না
গণেশজননী	হাঁ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	না	"
গন্ধেশ্বরী	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
গাছাকালীদেবী	না	"	"	"	"	"	"	"	হাঁ	"	"	"
গাজন	"	"	"	"	"	"	"	"	না	"	"	হাঁ
গুহ	"	"	"	"	"	"	হাঁ	"	"	"	"	না
গোবর্দ্ধন যাত্রা	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
গোবিন্দজীউ	"	"	"	"	"	"	না	"	"	"	হাঁ	"
গোরক্ষনাথ	"	হাঁ	"	"	"	"	"	"	"	হাঁ	না	"
গোষ্ঠ	হাঁ	না	হাঁ	"	"	"	হাঁ	হাঁ	"	"	"	হাঁ
গৌরাঙ্গদেব	না	"	না	"	"	"	না	না	"	না	হাঁ	না
ঘাগরাবাসিনী বনদেবী	"	"	"	"	"	"	"	"	"	হাঁ	না	"
চণ্ডী	হাঁ	"	"	"	"	হাঁ	"	হাঁ	হাঁ	না	হাঁ	"
চন্দনযাত্রা	"	"	"	"	"	না	"	না	না	হাঁ	"	"
চড়ক	"	"	"	"	"	"	"	"	"	না	না	"
চাঁচর	না	"	"	"	"	"	"	"	"	হাঁ	"	"
চৈতন্যদেব	"	"	"	"	"	"	হাঁ	"	"	না	হাঁ	"
জগদ্ধাত্রী	"	"	"	"	"	"	না	হাঁ	"	"	না	"
জগন্নাথ	"	"	হাঁ	"	"	"	"	না	"	"	"	"
জন্মাষ্টমী	"	"	না	হাঁ	হাঁ	"	"	"	"	"	"	"

উৎসব-মাসক্রম সারণী

(নিম্নলিখিত মাসে পূজা বা উৎসব অনুষ্ঠিত হইলে, 'হাঁ' ; অন্যথায়, 'না')

পূজা বা উৎসবের উপলক্ষ্য	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
জয়চণ্ডী	না	না	না	না	না	না	না	না	না	না	হাঁ	না
জলেশ্বর শিব	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	না	হাঁ
জাতাল	"	"	হাঁ	"	"	"	"	"	"	"	"	না
জাহীর বুড়ি	"	"	না	"	"	"	"	"	হাঁ	"	"	"
জীতাষ্টমী	"	"	"	"	"	হাঁ	"	"	না	"	"	"
জীমূতবাহন	"	"	"	"	হাঁ	না	"	"	"	"	"	"
জরাপাত্র	"	"	"	"	না	"	"	"	হাঁ	"	"	"
ঝুলনযাত্রা	"	"	"	হাঁ	"	"	"	"	না	"	"	"
টুসু	"	"	"	না	"	হাঁ	"	"	হাঁ	"	"	"
তারকনাথ শিব	"	"	"	"	"	না	"	"	না	"	"	হাঁ
তালনবমী	"	"	"	"	হাঁ	"	"	"	"	"	"	না
তেঁতুলীবুড়ী	"	"	"	"	না	"	"	"	হাঁ	"	"	"
ত্রিপুরাসুন্দরী	"	"	"	"	"	"	"	"	না	হাঁ	"	"
দক্ষিণদর	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
দণ্ড	"	হাঁ	"	"	"	"	"	"	"	না	"	"
দশহরা	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
দশেরা	"	না	"	"	"	হাঁ	"	"	"	"	"	"
দেশ	"	"	"	"	"	না	"	"	"	"	"	হাঁ
দুর্গা	"	"	"	"	"	হাঁ	"	"	"	"	"	না
দোল	"	"	"	"	"	না	"	"	"	"	হাঁ	"
ধর্ম, ধর্মঠাকুর ও ধর্মরাজ	হাঁ	হাঁ	হাঁ	"	হাঁ	"	"	"	"	"	না	হাঁ

পূজা বা উৎসবের উপলক্ষ্য	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
নন্দদুলালজীউ	না	না	না	না	না	না	না	না	হাঁ	না	না	না
নববর্ষ	হাঁ	"	"	"	"	"	"	"	না	"	"	"
নবান্ন	না	"	"	"	"	"	"	হাঁ	"	"	"	"
নাচন জামসিনী বনদেবী	"	"	"	"	"	"	"	না	"	হাঁ	"	"
নামকীর্তন	হাঁ	হাঁ	হাঁ	"	"	"	"	"	"	"	হাঁ	"
নিত্যানন্দ	না	না	না	"	"	"	"	"	"	"	না	"
নীল	"	"	"	"	"	"	"	"	"	না	"	হাঁ
নৌকেশ্বর শিব	হাঁ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	না
পঞ্চানন্দ	না	"	"	হাঁ	"	"	"	"	"	"	হাঁ	হাঁ
পদ্মেশ্বরী	"	"	"	না	"	"	"	"	হাঁ	"	না	না
ফলহারিণী কালী	"	হাঁ	"	"	"	"	"	"	না	হাঁ	"	"
ফুলদোল	হাঁ	না	"	"	"	"	"	"	"	না	"	"
ফুলমনিদেবী	না	"	"	"	"	"	"	"	"	হাঁ	"	"
বঙ্গাঠাকুর	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
বটেশ্বর শিব	"	"	হাঁ	"	"	"	"	"	"	না	"	"
বত্রিশ	"	"	না	"	"	"	"	"	"	"	হাঁ	"
বনবিবি	"	"	"	"	"	"	"	"	হাঁ	"	না	"
বরাম	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
বরোজচণ্ডী	"	"	"	"	"	হাঁ	"	"	না	"	"	"
বলরাম	"	"	হাঁ	"	"	না	"	"	"	"	"	"
বসুন্ধরা	হাঁ	"	না	"	"	"	"	"	"	"	"	"
বাঁধনা	না	"	"	"	"	"	হাঁ	"	"	"	"	"
বারুণীস্নান	"	"	"	"	"	"	না	"	"	"	"	হাঁ

উৎসব-মাসক্রম সারণী

(নিম্নলিখিত মাসে পূজা বা উৎসব অনুষ্ঠিত হইলে, 'হাঁ' ; অন্যথায়, 'না')

পূজা বা উৎসবের উপলক্ষ্য	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
বালিবিলাসিনী	না	না	না	না	না	না	না	না	না	হাঁ	না	না
বালিয়াত	”	”	”	”	”	”	”	”	”	না	”	হাঁ
বাসন্তী	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	হাঁ	”
বাসুলী	হাঁ	”	হাঁ	”	”	”	”	”	হাঁ	হাঁ	না	না
বাস্তু	না	”	না	”	”	”	”	”	”	না	”	হাঁ
বিন্ধ্যবাসিনী	”	”	”	”	”	”	”	”	না	হাঁ	”	না
বিবিমা	”	”	”	”	”	”	”	”	হাঁ	না	”	হাঁ
বিশালাক্ষী	হাঁ	”	”	”	”	”	”	”	”	হাঁ	হাঁ	না
বিশ্বকর্মা	না	”	”	”	হাঁ	”	”	”	না	না	না	”
বীরঝাপট	”	”	”	”	না	”	”	”	হাঁ	”	”	”
বুদ্ধপূর্ণিমা	হাঁ	”	”	”	”	”	”	”	না	”	”	”
বোঙ্গা	না	”	”	”	”	”	”	”	”	হাঁ	”	”
ব্রহ্মময়ী কালী	”	”	”	”	”	হাঁ	হাঁ	হাঁ	হাঁ	”	”	হাঁ
ব্রহ্মা	হাঁ	”	”	”	”	না	না	না	না	”	হাঁ	”
ব্রহ্মাণী দেবী	না	”	”	”	”	হাঁ	”	”	”	না	না	না
ভক্তাপরব	”	”	”	”	”	না	”	”	”	”	”	হাঁ
ভগবতী	হাঁ	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	না
ভবানীদেবী	না	হাঁ	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”
ভাণ্ডসিং	”	না	”	”	”	”	”	”	”	হাঁ	”	”
ভাদু	”	”	”	”	”	হাঁ	”	”	”	না	”	”
ভীম	”	”	”	”	হাঁ	না	”	”	”	”	”	”

পূজা বা উৎসবের উপলক্ষ্য	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
ভীমরাজসিনী	না	না	না	না	না	না	না	না	না	হাঁ	না	না
ভৈরবনাথ	”	”	”	”	”	”	”	”	”	না	হাঁ	”
ভৈরবসিনী শিব	”	”	”	”	”	”	”	”	”	হাঁ	না	”
মকরপরব	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”
মংগলচণ্ডী	”	হাঁ	”	”	”	”	”	”	”	না	”	”
মনসা	হাঁ	”	হাঁ	হাঁ	হাঁ	হাঁ	”	”	হাঁ	”	হাঁ	হাঁ
মশানচণ্ডী	না	না	না	না	না	না	”	”	”	”	না	না
মহাকালী	”	”	”	”	”	”	”	”	”	হাঁ	”	”
মহাবিষ্ণু	”	”	”	”	”	”	”	”	না	না	হাঁ	হাঁ
মহামায়া	হাঁ	”	”	”	”	হাঁ	”	”	”	”	না	না
মহিষমর্দিনী	”	”	”	”	”	না	”	”	”	”	”	”
মহোৎসব	না	”	”	”	”	”	”	”	হাঁ	”	হাঁ	হাঁ
মাঘীপূর্ণিমা	”	”	”	”	”	”	”	”	না	হাঁ	না	না
মাচাইসিনী	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”
যমুনাদেবী	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”
রক্তাবতী	”	”	”	”	”	”	”	”	”	না	হাঁ	”
রক্ষাকালী	হাঁ	হাঁ	”	”	”	”	”	”	”	হাঁ	”	হাঁ
রঘুনাথজীউ	না	না	”	”	”	”	”	”	”	”	না	না
রুক্মিনীদেবী	”	”	”	”	”	”	”	”	হাঁ	না	”	”
রটন্তীকালী	”	”	”	”	”	”	”	”	না	হাঁ	”	”
রথযাত্রা	হাঁ	”	হাঁ	”	”	”	”	”	”	”	হাঁ	”
রাধাকৃষ্ণ	”	”	না	”	”	”	”	”	হাঁ	না	”	”

উৎসব-মাসক্রম সারণী

(নিম্নলিখিত মাসে পূজা বা উৎসব অনুষ্ঠিত হইলে, 'হাঁ' ; অন্যথায়, 'না')

পূজা বা উৎসবের উপলক্ষ্য	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
রাধাগোবিন্দ ও রাধাগোবিন্দজীউ	না	না	না	না	না	না	না	না	না	হাঁ	না	না
রাধাষ্টমী	”	”	”	”	হাঁ	”	”	”	”	না	”	হাঁ
রামনবমী	”	”	”	”	না	”	”	”	”	”	”	”
রাসযাত্রা	”	”	হাঁ	”	হাঁ	”	হাঁ	হাঁ	”	হাঁ	”	”
রূপাসিনীদেবী	”	”	না	”	না	”	না	না	”	”	”	”
লক্ষ্মী	”	”	”	”	”	হাঁ	”	হাঁ	”	না	”	না
শঙ্কর্ষণজীউ	”	”	”	”	”	না	”	না	”	হাঁ	”	”
শালুই	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	হাঁ
শিকড়াসিনী	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	না
শিব	হাঁ	”	”	”	”	”	হাঁ	”	”	না	হাঁ	হাঁ
শিবদুর্গা	”	”	”	”	”	”	না	”	”	”	না	না
শিবচতুর্দশী	না	”	”	”	”	”	”	”	”	”	হাঁ	”
শিবরাত্রি	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”
শীতলা	হাঁ	হাঁ	হাঁ	”	”	হাঁ	”	”	হাঁ	হাঁ	”	হাঁ
শ্মশানকালী	”	না	না	”	”	না	”	”	না	”	”	না
শ্যামা	না	”	”	”	”	”	হাঁ	”	”	না	না	”
শ্রীকৃষ্ণ	হাঁ	”	”	”	”	”	না	”	হাঁ	”	”	”
শ্রীচৈতন্য	না	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”
সনৎকুমারী	”	”	”	”	”	হাঁ	”	”	না	”	”	”
সরস্বতী	”	”	”	”	”	না	”	”	”	হাঁ	হাঁ	”

পূজা বা উৎসবের উপলক্ষ্য	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
সর্বমঙ্গলা	না	না	না	না	না	হাঁ	না	না	না	না	হাঁ	হাঁ
সয়লা	"	"	"	"	"	না	"	"	"	"	"	"
সহরায়	"	"	"	"	"	"	হাঁ	"	"	"	না	না
সাগরস্নান	"	"	"	"	"	"	না	"	হাঁ	"	"	"
সাফরাৎ	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
সিংহবাহিনী	"	"	"	"	"	হাঁ	"	"	না	"	"	"
সীতানবমী	"	"	"	"	"	না	"	"	"	"	হাঁ	"
সুভদ্রা	"	"	হাঁ	"	"	"	"	"	"	"	না	"
স্বর্গবাউরী	"	"	না	"	"	"	"	"	"	হাঁ	"	"
ষষ্ঠী	হাঁ	"	হাঁ	"	"	"	"	"	"	না	"	"
হরি	"	"	না	"	"	"	"	"	"	"	হাঁ	হাঁ
হরিয়াবুড়ী	না	"	হাঁ	"	"	"	"	"	হাঁ	"	না	"
হল্যাসিনী	"	"	না	"	"	"	"	"	না	হাঁ	"	না
হাজরা	"	"	"	"	"	"	"	"	"	না	হাঁ	"
হাড়িঝি	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
হিন্দোলপর্ব	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	না	হাঁ
হিড়িম্বেশ্বরী	"	"	"	"	"	"	হাঁ	"	"	"	"	না
হুড়েশ্বরীদেবী	"	"	"	"	"	হাঁ	না	"	"	"	"	"

দুই ॥

'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' গ্রন্থমালার জন্মকাহিনী সম্পাদক মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রামে ও নগরে সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য আহরণের কাজটি এখন আর ঠিক পূর্বের ন্যায় সহজ নহে। এক দশকের অধিককাল পূর্বে আহৃত এবং সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের উপকরণ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত গবেষণালব্ধ রচনার সহিত তুলনামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর, সত্যাসত্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে অনেক সময়েই বিভিন্নবার বিভিন্নস্থানে অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। এই অনুসন্ধানের কাজ ১৯৭০ সাল পর্যন্ত চলে। বলা বাহুল্য, কোন এক বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একক প্রচেষ্টায় এই জাতীয় গ্রন্থের রচনা এবং প্রকাশনা সম্ভব নহে। একাধিক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান গ্রন্থে সন্নিবেশিত অনেক তথ্য আহরণ করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য, পরবর্তী পর্যায়ে অনুসন্ধান এবং গ্রন্থপ্রণয়নের প্রযত্নটি অনেকাংশে অনায়াসসাধ্য হইয়াছে। গ্রন্থে প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ভাবে এই সাহায্য স্বীকৃত হইয়াছে এবং তথ্যপ্রেরক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও পুনরায় তাঁহাদের অবদানের গুরুত্ব মূল্যহীন স্বীকার করিয়া, সাগ্রহ সহযোগিতার জন্য তাঁহাদের সকলকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫১ সালে এবং ভারতবর্ষে ১৯৬১ সালে জনগণনা দফতরের বহুমুখী পরিকল্পনার উৎস ছিলেন বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীঅশোক মিত্র, আই. সি. এস., যিনি বর্তমানে ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের সচিবরূপে দিল্লীতে অধিষ্ঠিত। আদমসুমারীর বৃহৎ কর্মযজ্ঞে কেবল গাণিতিক সংখ্যার এবং পরিসংখ্যানের শুষ্ক সমিধ আহুতি না দিয়া, জনগণনার মধ্যেও বিভিন্ন সমীক্ষা ও অনুসন্ধানের এক বহুমুখী বিশিষ্ট পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্পাদক মহাশয় করিয়াছিলেন। কর্মযজ্ঞকে জনকোলাহলের উর্দ্ধে লইয়া গিয়া, তাহাতে তিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। বিশুদ্ধ চিন্তা ও মনোজ্ঞ আলোচনা এবং সর্বমুখী অনুসন্ধানী দৃষ্টির আলোকে ভারতের জনজীবনের রূপ ও প্রকৃতির প্রাণবন্ত তৈলচিত্র তিনি উপহার দিলেন। বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে সম্পাদক মহাশয়ের সংস্পর্শলাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলাম। আমাদের দরিদ্র, অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত ও অবহেলিত জনসাধারণের জীবন সশ্রদ্ধ চিত্ত, অনুরাগী মন এবং দরদী হৃদয়ের গভীর উপলব্ধির দ্বারা দেখিবার, বুঝিবার এবং তাহার সম্বন্ধে লিখিবার মূল্যহীন শিক্ষা আমি দূর হইতে তাঁহার নিকট গ্রহণ করিয়াছিলাম। বাস্তবিকপক্ষে, এ শিক্ষা কখনও শেষ হয় না। যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন এই শিক্ষাক্রম চলিতে থাকিবে। যেখানে শিক্ষার সমাপ্তির অধ্যায় জীবনের শেষ মুহূর্তে রচিত হয়, সেখানে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমার শিক্ষার ঋণ শোধ করিবার মত মূঢ় দুঃসাহস আমি কিভাবে দেখাইব ?

পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমে ১৯৬১ সালে জনগণনার ভারপ্রাপ্ত অধীক্ষক শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র সেনগুপ্ত, আই. এ. এস. (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের সচিব) আমাকে এই দফতরে অধিষ্ঠিত না করিলে, আদমসুমারীর চিত্তাকর্ষক কর্মের সহিত আমার কোন পরিচয় হইতে পারিত না। সেইজন্য, তাঁহার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা সীমাহীন হইয়া রহিল।

পশ্চিমবঙ্গ জনগণনা দফতরের বর্তমান অধিকর্তা শ্রীভাস্কর ঘোষ, আই এ. এস., চিন্তার স্বাধীনতায় এবং কর্মের অধিক্ষেত্রে আমাকে স্বচ্ছন্দবিহারের পূর্ণ সুযোগ এবং অবাধ অধিকার দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অধিকন্তু প্রশাসনিক সকল প্রকারের বন্ধন শিথিল করিয়া আমার মুক্তমনে কোন তুচ্ছতার গ্লানি প্রবেশ করিতে দেন নাই। ১৯৭১ সালের জনগণনার ফলাফল তাঁহার গ্রন্থে (Census of India 1971, Series-18, Paper 1 of Provisional Population Totals, West Bengal) প্রকাশিত। এই গ্রন্থ হইতে যথেচ্ছ উদ্ধৃতির দ্বারা বর্তমান আলোচনায় আমার বক্তব্যকে প্রকাশ করিতে অনেক স্বাধীনতা লইয়াছি। শ্রীভাস্কর ঘোষ মহাশয়কে আমি বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমীক্ষা করিতে এক নিরপেক্ষ মানসিকতার প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে অখণ্ড স্বাধীনতা না থাকিলে, কর্মে উৎসাহবোধের সঞ্চার হয় না। ভারতের বর্তমান রেজিষ্ট্রার জেনরল শ্রী এ. চন্দ্রশেখর, আই. এ. এস., দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাকে কর্মে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি।

বেসরকারী মুদ্রণালয়ে গ্রন্থমুদ্রণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে বিশেষ অনুমোদন প্রয়োজন হয়, তাহার জন্য শ্রী কে. ডি. বল্লাল, আই. এ. এস., ডেপুটি রেজিষ্ট্রার জেনরল ও শ্রী কে. কে. চক্রবর্তী, সেন্ট্রাল ট্যাবুলেশন অফিসর বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আমার সহোদরপ্রতিম সহকর্মী শ্রীবিশ্বেশ্বর রায় সহযোগী মনোভাব লইয়া আমার কর্মকে সহজ ও আনন্দময় করিয়াছেন। তাঁহার প্রশাসনিক সাহায্য আমাকে অনেক অচল অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছে। বর্তমান ভূমিকা রচনার প্রাক্কালে এক সুতীব্র আলোচনার দ্বারা আমার বিশ্লেষণকে তিনি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে নীরবে শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

বিভিন্ন কারণে আমি আমার প্রবীণ সহকর্মী উপ-অধিকর্তা বন্ধুদের নিকট নানাভাবে ঋণী। তাঁহাদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রীঅমিয় কুমার মিত্র মহোদয় এই কার্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ও ঐকান্তিক অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাকে এবং সর্বশ্রী হিরণ্ময় চক্রবর্তী ও সিদ্ধার্থ কুমার মিত্রকে আমার শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলাম।

দীর্ঘ এক দশকে এই দফতরে সহকর্মী বন্ধুগণ বিভিন্ন বিষয়ে বহুবিধ সাহায্য করিয়াছেন। এই কাজটি যদি তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট গুরুত্ব এবং মনোযোগ না পাইত, তাহা হইলে গ্রন্থটি প্রকাশিত

হইত কিনা সন্দেহ। অভিজ্ঞ, প্রবীণ, তরুণদর্শন সহকর্মী শ্রীসুনীলকান্তি মজুমদার প্রশাসনিক পরামর্শ ও সাহায্যের মাধ্যমে গ্রন্থটির সত্বর প্রকাশনায় বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাকে যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাইলাম। মুদ্রণ জগতের বিচিত্র জটিল ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা আমি সদাহাস্যময় শ্রীরাম চন্দ্র ভড় মহাশয়ের নিকট গ্রহণ করিয়াছিলাম। বলিতে সঙ্কোচ নাই, মুদ্রণশাখার ভারপ্রাপ্ত সহকর্মী শ্রীরাম চন্দ্র ভড় মহাশয়ের নিকট মুদ্রণ সম্পর্কে এখনও অনেক প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিষয় জানিবার আছে। সুতরাং, তাঁহার অবদান পরিপূর্ণভাবে কেবল শ্রদ্ধায় স্বীকৃত হইবে না। শ্রীঅমিয় রঞ্জন কর মুদ্রণের কার্যে সাহায্য করিয়া এবং সংশোধনের কার্যভার গ্রহণ করিয়া আমাকে মুদ্রণশালার আদিভৌতিক উপদেবতার দৌরাত্ম্য ও উপদ্রব (Printer's Devil) হইতে মুক্ত রাখিয়াছিলেন। পাণ্ডুলিপির প্রস্তুতি এবং উহার প্রতিলিপি ও মেলা সারণী প্রণয়নে এবং স্থানসূচী রচনায় শ্রীশহিদুল হক এই গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত সকল কর্মে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমার অভিজ্ঞতায় গর্ব ও শ্রদ্ধার বিষয় হইয়া থাকিবে। সংশোধনের কাজে সর্বশ্রী হিমাংশু সাহা চৌধুরী, অপূর্ব কুমার সেনগুপ্ত, গৌরী শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুপ্তি চট্টোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য সহায়তা করিয়াছেন।

এই গ্রন্থটির সংকলন, অনুসন্ধান ও গ্রন্থনাকর্মে যিনি এক দশকেরও অধিক সময় গবেষকের আন্তরিকতা প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি পরম অনুরাগে অভিনিবেশ সহকারে দায়িত্ব পালন করিয়াছেন, যিনি গ্রামবাংলার পথেঘাটে, মাঠে ও প্রান্তরে, গ্রীষ্ম-শীত-বর্ষার অকরুণ পরিবেশে ব্যক্তিগত সুখসুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ অস্বীকার করিয়া এক দুরূহ ব্রত তাপসের ন্যায় পালন করিয়াছেন, যিনি কর্মব্যস্ত মুহূর্তে ও কর্মক্লান্তক্ষণে অভিজ্ঞতার দান-প্রতিদানে প্রশাসনিক বন্ধনের জটিলতা সরল করিয়াছেন, তিনি আমার সানুজপ্রতিম। তিনি এই গ্রন্থটির হৃৎস্পন্দনস্বরূপ শ্রীঅরুণ কুমার রায়।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাকে সমাজবিজ্ঞানশাখার সহকর্মী বন্ধুবর্গ, সর্বশ্রী গৌর চন্দ্র বাগচী, অরুণ কুমার ভট্টাচার্য, স্বপন কুমার গুহ, তাপস কুমার ঘোষাল, দিলীপ কুমার সেন, সুভাষ রঞ্জন চৌধুরী, প্রমথ রঞ্জন হালদার, অরুণাভ দত্ত, গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ, দুলাল চন্দ্র দত্ত, আফজলুদ্দিন আহমেদ, জলধি দাশগুপ্ত, সুবীর চট্টোপাধ্যায় ও বিমল কুমার বসু এবং নমুনাপঞ্জীয়ন শাখার সর্বশ্রী মানস কুমার মিত্র ও নিখিল কুমার বাগচী বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। সময়ে অসময়ে পুস্তকের সাহায্য লইতে গ্রন্থাগার শাখার শ্রীমতী শিবাণী দাশগুপ্তাকে এবং প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীঅরুণ কুমার রায়কে বহুবার বিব্রত ও উৎপীড়িত করিয়াছি। সকলকে আমি হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

পরিশিষ্টে প্রদত্ত দুইটি মূল্যবান প্রবন্ধ দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর (শ্রী) আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর (শ্রী) তুষার চট্টোপাধ্যায় বর্তমান গ্রন্থে বিবৃত পূজা-পার্বণ ও মেলার দুইটি দিক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই অবদান আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅনন্ত কুমার চক্রবর্তী ও তাঁহার সহকর্মী সর্বশ্রী খগেন্দ্র নাথ সাহা ও গৌরহরি সাহার নিকট বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্যের জন্য বিশেষভাবে ঋণী রহিয়াছি।

ব্লক-প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান 'আর্ট এনগ্রেভার্স' ও উহার অন্যতম সত্ত্বাধিকারী সর্বশ্রী এন. কে. বসু ও টি. কে বসু এবং মুদ্রণালয় 'অমু প্রেস,' উহার সত্ত্বাধিকারী শ্রীতিনকড়ি বারিক এবং প্রবীণ কর্মী শ্রীবিজয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী মহাশয়ের ব্যক্তিগত আগ্রহে ও অন্যান্য কর্মীদের সহযোগিতায় মুদ্রণকার্য নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়াছে। সকলকে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

অনেকক্ষেত্রে কর্মজীবনের সাফল্যের জন্য আমি ব্যক্তিজীবনে আমার পিতা শ্রীশ্যামাপদ সিংহের নিকট বহু সাহায্য, প্রেরণা ও আশীর্বাদের অমূল্য সম্পদ ভিক্ষা করিয়াছি। পিতাপুত্রের সম্বন্ধ কৃতজ্ঞতা বা শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সামাজিক বিধিনিয়ম দ্বারা শৃংখলিত নহে বলিয়া, আমি ঐ প্রচেষ্টা হইতে বিরত থাকিলাম।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা না লিখিয়া পারিতেছিনা। আমার পাঠগৃহ-শয়নকক্ষে স্তূপীকৃত পাণ্ডুলিপির যে কোন অঙ্গহানি ঘটে নাই, তাহার জন্য সেই একজনের কাছে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাহার ক্ষুদ্র দুইটি অকরুণ হাতের স্পর্শে পূজা-পার্বণের এই রচনাটি যে অক্ষত দেহে মুক্ত হইতে পারিয়াছে, তাহা আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। এ বিষয়ে মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্তা অপেক্ষা আমি নিজেকে অধিক ভাগ্যবান মনে করি। চন্দ্রাবলী যদি 'ডায়মণ্ডের' কাণ্ড করিয়া ফেলিত, আমি প্রমাদ গণিতাম। উক্ত নামধারিণী আমার তিন বৎসরের কন্যা—যাবতীয় গার্হস্থ উপদ্রব ও শিশুসুলভ অপকর্মের একনিষ্ঠা সাধিকা। বলাবাহুল্য, এ বিষয়ে চন্দ্রাবলীর জননী জয়তী দেবীর দৃষ্টি না থাকিলে, আমাকে অন্য কোন দেবদেবীর আরাধনায় বসিতে হইত। অতএব, সে উপচার আমি তাঁহাকেই নিবেদন করিলাম।

মত ও মন্তব্য যাহা ব্যক্ত হইল, তাহা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ও নিজস্ব চিন্তাধারাপ্রসূত। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কোন কর্মসূচীর অথবা কার্যধারার সহিত এই রচনার কোন প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ যোগ নাই এবং কোন দায়িত্ব নাই। গভীর আগ্রহ, সৎ চেষ্টা এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও, গ্রন্থটির সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়করূপে আমিই গ্রহণ করিলাম।

সুকুমার সিংহ

সতেরই আষাঢ়, ১৩৭৮,
সমাজবিজ্ঞান শাখা,
আদমসুমারী দফতর,
পশ্চিমবঙ্গ।

সংকলন ও গ্রন্থণা প্রসঙ্গে

পশ্চিমবঙ্গ জনগণনা দপ্তর এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ ও মেলার বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া মোট চারিটি খণ্ডে সম্পূর্ণ যে গ্রন্থ প্রনয়ণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন বর্তমান গ্রন্থটি তাহারই তৃতীয় খণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এই খণ্ডে ২৪-পরগণা ও মেদিনীপুর জেলায় অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ ও মেলার তথ্যরাজি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। প্রকাশিত প্রথম খণ্ডে মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলার এবং দ্বিতীয় খণ্ডে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হাওড়া ও হুগলী জেলার তথ্যরাজি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে আলোচ্য তৃতীয় খণ্ডে উল্লিখিত দুইটি জেলার তথ্য ব্যতীত আরও একটি জেলার তথ্যাদি সন্নিবেশিত করিবার কথা। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডটির বৃহদাকার ও বিপুল আয়তনের জন্য সাধারণভাবে উহা ব্যবহারের অসুবিধার কথা জানাইয়া পাঠকেরা পরবর্তী খণ্ডগুলিতে জেলার সংখ্যা কমাইয়া গ্রন্থের আয়তন সংক্ষিপ্ত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরামর্শ শিরোধার্য্য করিয়া বর্তমান খণ্ডে আরো একটি জেলার তথ্য বিবরণী দিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে বিরত রহিলাম। ফলে, কলিকাতা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের মোট ১৫টি জেলার মধ্যে অবশিষ্ট চারিটি জেলার এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি আরো দুইটি খণ্ডে প্রকাশ করা হইবে। উহাদের মধ্যে চতুর্থ খণ্ডটি বর্তমানে মুদ্রণ কার্য চলিতেছে এবং পঞ্চম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হইতেছে।

উল্লিখিত দুইটি জেলায় অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ ও মেলার তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ২৪-পরগণা জেলায় ৯১৮টি এবং মেদিনীপুর জেলায় ১,৩২৯টি মোট ২,২৫৭টি মুদ্রিত প্রশ্নমালা বিভিন্ন বিদ্যায়তনের শিক্ষক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে মোট ৬৭০টি প্রশ্নমালা আমাদের হস্তগত হয়। উহার ৬৩টিতে কোন তথ্যাদি ছিল না এবং ১১২টি প্রশ্নমালার অসম্পূর্ণ তথ্যাদি গ্রন্থে ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। ফলে, অবশিষ্ট মোট ৪৯৫টি প্রশ্নমালা হইতে ২৪-পরগণা জেলার ১৬০টি গ্রামের এবং মেদিনীপুর জেলার ২৬০টি গ্রামের অর্থাৎ এই দুইটি জেলার মোট ৪২০টি গ্রামের পূজা-পার্বণ ও মেলা-সংক্রান্ত তথ্যাদি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন আমাদের প্রতিনিধি কর্তৃক সংগৃহীত আরও ৫৩টি গ্রামের তথ্য-বিবরণী দেওয়া হইয়াছে। এই সমীক্ষা কার্যে প্রশ্নমালার মাধ্যমে আমরা যে তথ্য আহরণ করি মূলতঃ তাহা ১৯৫৭ সালের শেষার্ধ হইতে ১৯৬০ সালের প্রথমার্ধকাল পর্যন্ত। আমাদের প্রতিনিধি কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত যে-সকল নিবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে তাহা মূলত ১৯৬৮-৭০ সালে অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। উৎসব ও মেলার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে এই পার্থক্যটুকু স্মরণ রাখিতে হইবে।

আপাততঃ দৃষ্টিতে সমীক্ষার সময়কাল ও গ্রন্থ প্রকাশনের সময়কালের অসঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ বিলম্বিত হইয়াছে বলিয়া অনুযোগ উঠিতে পারে। কথাটি হয়ত নিতান্ত অসত্য নহে। তবে আমরা ভরসা রাখি অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন যে, সারা রাজ্যব্যাপী এইরূপ সমীক্ষা সুষ্ঠুভাবে চালনা করা এবং সমীক্ষালব্ধ তথ্যাদি সুশৃঙ্খলভাবে সংকলন ও সম্পাদনা করিয়া গ্রন্থ রচনা করা সময়সাপেক্ষ বিষয়। পরন্তু ইতিমধ্যে ভারত-চীন সীমান্ত-সংঘর্ষ এবং ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ প্রায় প্রত্যক্ষভাবেই গ্রন্থ প্রকাশের কার্যকে বিঘ্নিত করিয়াছে। তাহা ছাড়া, মুদ্রণ কার্যালয়ে শ্রমিক-মালিক বিরোধ ইত্যাদি কারণও গ্রন্থ মুদ্রণে অযথা কালহরণ করিয়াছে।

সম্পাদনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত তথ্যাদি 'গ্রাম বিবরণী', 'উৎসব বিবরণী' ও 'মেলা বিবরণী' এই তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে।

'গ্রাম বিবরণী' অধ্যায়ে প্রদত্ত গ্রামগুলিকে প্রতি জেলার থানা ভিত্তিতে ক্রমিক মৌজা নম্বর অনুসারে সাজানো হইয়াছে। যেক্ষেত্রে গ্রামের নাম, মৌজার নাম হইতে ভিন্ন, কেবলমাত্র সেক্ষেত্রে মৌজার নামটি বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রামের সহিত প্রদত্ত প্রথম স্তবকের সংখ্যাগুলি গ্রামের মৌজা নম্বর, দ্বিতীয় স্তবকের সংখ্যাগুলি বর্গ মাইলে গ্রামের আয়তন, তৃতীয় স্তবকের সংখ্যাগুলি গ্রামে বসবাসকারী মোট পরিবারের সংখ্যা এবং চতুর্থ স্তবকের সংখ্যাগুলি গ্রামের মোট লোকসংখ্যা বুঝিতে হইবে। উদ্ধৃত পরিসংখ্যানটি ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে প্রদত্ত।

গ্রাম বিবরণী অধ্যায়ে 'ক' হইতে 'চ' পর্যন্ত ছয়টি স্তম্ভে গ্রাম সম্পর্কে নানা তথ্য-বিবরণী পরিবেশিত হইয়াছে। উহার (ক)-এ গ্রামে যে-সকল জাতি বা সম্প্রদায়ের বাস ও মোট পাড়ার সংখ্যা, (খ)-এ গ্রামবাসির প্রধান উপজীবিকা, (গ)-এ গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশনসহ যাতায়াতের ব্যবস্থা, (ঘ)-এ গ্রামে সারা বৎসরে অনুষ্ঠিত যাবতীয় পূজা-পার্বণাদি, (ঙ)-এ গ্রামে অনুষ্ঠিত মেলার উপলক্ষ, সময়, স্থায়ীত্ব ও প্রাচীনত্ব এবং (চ)-এ গ্রাম্য দেব-দেবী ও পূজার নির্দিষ্ট স্থান, মন্দির, মসজিদ-দরগাহ এবং পরিশেষে গ্রামের নামকরণ ও গ্রাম সম্পর্কে কোন ইতিহাস বা কিংবদন্তী থাকিলে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রতিটি 'গ্রাম বিবরণী'র শেষে সংবাদদাতার নাম, পেশা ও ঠিকানা দেওয়া হইয়াছে।

'উৎসব বিবরণী' অধ্যায়ে 'গ্রাম বিবরণী'তে উল্লিখিত উৎসব-পার্বণাদির মধ্যে যেগুলি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে কেবলমাত্র সেইসব উৎসব-পার্বণাদির বিবরণ উৎসবের নামানুসারে বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কালী তাহা যে নামেই উপাসিত হউক না কেন উহা 'কালীপূজা'; ধর্মরাজের গাজন, শিবের গাজন, চড়ক বা নীলপূজা প্রভৃতি পূজা-পার্বণগুলিকে 'চড়ক-গাজন-নীলপূজা' অথবা ধর্মরাজ, জগন্নাথ বা রাধাকৃষ্ণ

প্রভৃতি যে-কোন দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইলে উহা 'রথযাত্রা', হিন্দু সাধুসন্ত বা মুসলমান পীর-ফকিরের আবির্ভাব বা তিরোভাব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবগুলিকে "আবির্ভাব বা তিরোভাবের উৎসব" এবং আদিবাসীদের যে কোন পূজা-পার্বণ তাহা "আদিবাসী উৎসব" এইরূপ শিরোনামার অন্তর্ভুক্ত করিয়া একত্রে উহার বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। রাজনৈতিক মেলা যেমন গান্ধীমেলা, সুভাষমেলা বা স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মেলা উহা 'বিবিধ' শিরোনামায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

'মেলা বিবরণী' অধ্যায়ে 'গ্রাম বিবরণী'তে উল্লিখিত মেলাগুলির মধ্যে যেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে কেবলমাত্র সেইগুলির বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে মেলা বিবরণীগুলি উৎসব বিবরণীতে প্রদত্ত শিরোনামা অনুসারে বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যেক্ষেত্রে আমাদের সংবাদদাতা কোন গ্রামে অনুষ্ঠিত একাধিক মেলার স্বতন্ত্র বিবরণী না দিয়া কেবলমাত্র একটি মেলার বিস্তারিত বিবরণী দিয়া অন্যগুলি উহার অনুরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে আমরাও একটি মাত্র মেলার বিশদ বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। প্রতি ক্ষেত্রে একই মেলা বিবরণী বাবংবার উল্লেখ করা অপ্রয়োজনবোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থে প্রতিটি জেলার "পূজা-পার্বণ", "মেলার স্থান, উপলক্ষ ও লোকসমাগম", "মেলার মাসপঞ্জী" এবং "প্রতীকগোষ্ঠী অনুযায়ী উপাসনা স্থানাদি"—এই চারি প্রকারের মোট আটটি মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে। "পূজা-পার্বণ" ও "প্রতীকগোষ্ঠী অনুযায়ী উপাসনা স্থানাদি" মানচিত্রে সমগ্র জেলার পূজা-পার্বণগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতিটি ভাগের জন্য পৃথক প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। মানচিত্রের সহিত প্রদত্ত নির্দেশিকাতে ঐ সকল প্রতীক চিহ্নের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "প্রতীক গোষ্ঠী অনুযায়ী উপাসনা স্থানাদি" বলিতে যে সকল মন্দিরে বা দেবালয়ে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং নিয়মিত নিত্যপূজা হয় মানচিত্রে কেবলমাত্র সেই সকল স্থানের মন্দিরাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। বিগ্রহহীন পরিত্যক্ত দেবালয়গুলিকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

উৎসব বা মেলা তাহা যত বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্রাকারের হউক না কেন উহার সবগুলিকেই গ্রন্থে স্থান দেওয়া হইয়াছে। মূলতঃ স্থানীয় সংবাদদাতাদের উপর আস্থা রাখিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত তথ্যাদিকে কোনরূপ বিকৃত না করিয়া গ্রন্থটি সম্পাদনা করা হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের নিজস্ব মতামতের কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই; কেবলমাত্র সংগৃহীত তথ্যাদি হইতে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় অংশটুকু বর্জন করা হইয়াছে মাত্র। যদিও তথ্য বিবরণী যাহাতে নির্ভুল হয় সে বিষয়ে যতদূর সম্ভব যত্ন গ্রহণ করা হইয়াছে, তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য-বিবরণীর মধ্যে অসামঞ্জস্য বা ভুল-ত্রুটি অসম্ভব নহে। বলা বাহুল্য সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের

প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা সম্ভব নহে। এই গ্রন্থে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক হইতে যে সকল উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদের আহৃত।

সতেরই আষাঢ়, ১৩৭৮, **অরুণ কুমার রায়**
পশ্চিমবঙ্গ আদমসুমারী দফতর,
কলিকাতা-১।

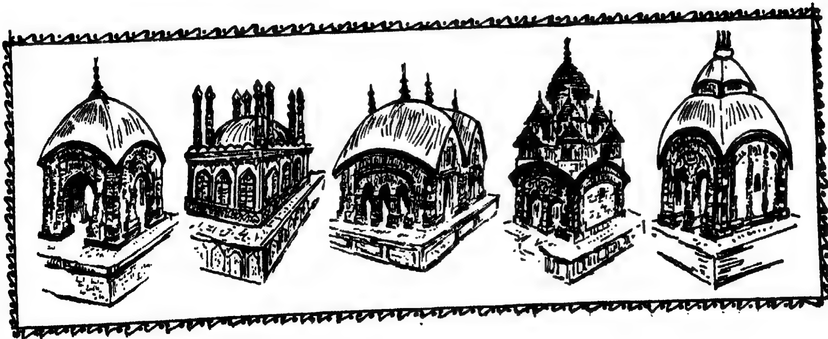
সূচী

২৪-পরগণা জিলা * মেদিনীপুর জিলা

২৪-পরগণা জিলা পৃষ্ঠা ১-২৭১

চিত্র সূচী

২৪-পরগণা



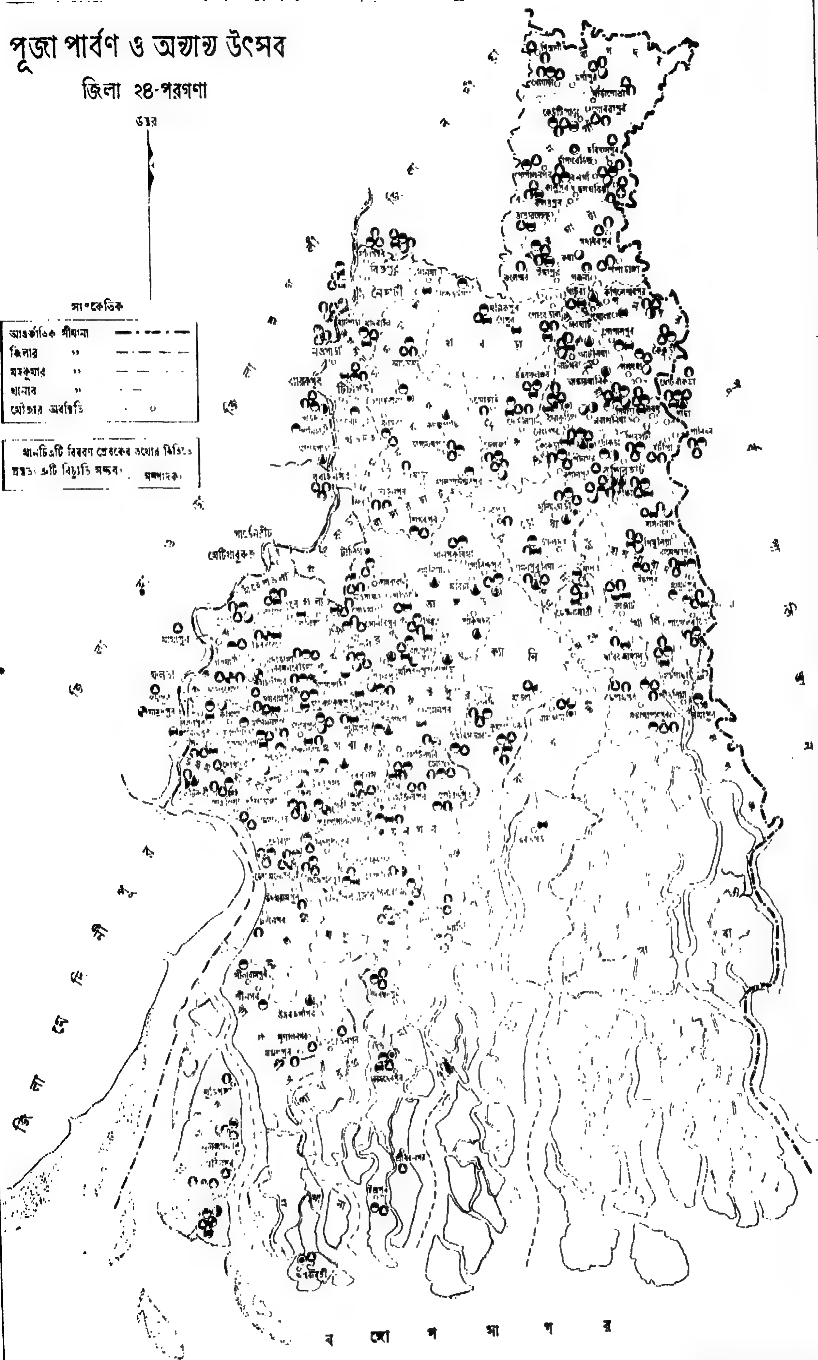
মানচিত্রে

চব্বিশ-পরগণা জিলার

পূজা-পার্ব্বণ ও মেলা

পূজা পার্বণ ও অন্যান্য উৎসবের প্রতীক নির্দেশক

শৈব দেবতা	[শিবপূজা, শিবরাত্রি, চড়ক, গাজন, নীলপূজা প্রভৃতি।]
বিষ্ণু আদি দেবতা	[রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, অক্ষয় তৃতীয়া, অনন্তচতুর্দশী, রাস, দোল, ঝুলন, রথ, স্নান, গোষ্ঠ প্রভৃতি দ্বাদশ যাত্রা এবং বৈষ্ণবীয় মহোৎসব।]
শক্তি	[কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, গন্ধেশ্বরী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি]
ধর্মরাজ	[ধর্মরাজ পূজা, ধর্মরাজের গাজন প্রভৃতি]
লৌকিক ও গ্রাম্য দেবদেবী	[ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, চণ্ডী, ওলাবিবি, পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ, দক্ষিণরায় প্রভৃতি]
পুণ্যস্নানাদি পর্ব	[বারুণী, পৌষসংক্রান্তি, মাঘীপূর্ণিমা, অষ্টমীস্নান প্রভৃতি]
তিথিঘটিত পর্ব	[বাংলা নববর্ষ, পৌষপার্বণ, অম্বুবাচী, জামাইষষ্ঠী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি]
অন্যান্য দেবতা	[কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা, শনি, ব্রহ্মা, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি]
আবির্ভাব-তিরোভাব উৎসব	[হিন্দু সাধুসন্তদিগের]
পীরের উরস	[মুসলমান পীর, ফকির, দরবেশ প্রভৃতি]
আদিবাসী উৎসব	[করম পূজা, বাঁধনা পর্ব প্রভৃতি]
মুসলমানদিগের উৎসব	[মহরম, ঈদ, সবেবরাত প্রভৃতি]
জৈন উৎসব	[জৈন সম্প্রদায়ের যাবতীয় উৎসব]
বৌদ্ধ উৎসব	[বুদ্ধজয়ন্তী প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের যাবতীয় উৎসব]
খৃষ্টানদিগের উৎসব	[ইংরাজী নববর্ষ, বড়দিন, প্রভৃতি খৃষ্টানদিগের যাবতীয় উৎসব]
বিবিধ উৎসব	[ভারতের স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, প্রখ্যাত দেশনেতার জন্মোৎসব]


পূজা পার্বণ ও অন্যান্য উৎসব
জিলা ২৪-পরগণা
উত্তর
সাংকেতিক
আন্তর্জাতিক সীমানা
জিলার ,,
মহকুমার ,,
থানার ,,
মৌজার অবস্থিতি
ব ঙ্গো প সা গ র

রথীন চট্টোপাধ্যায়

মেলার উপলক্ষ ও লোকসমাগমের প্রতীক নির্দেশক

শৈব দেবতা	[শিবপূজা, শিবরাত্রি, চড়ক, গাজন, নীলপূজা প্রভৃতি]	
বিষ্ণুআদি দেবতা	[রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, অক্ষয়তৃতীয়া, অনন্তচতুর্দশী, রাস, ঝুলন, গোষ্ঠ, দোল রথ, স্নান প্রভৃতি দ্বাদশযাত্রা এবং বৈষ্ণবীয় মহোৎসব]	
শক্তি	[কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, গন্ধেশ্বরী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি]	
ধর্মরাজ	[ধর্মরাজপূজা, ধর্মরাজের গাজন প্রভৃতি]	
লৌকিক ও গ্রাম্য দেবদেবী	[ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, চণ্ডী, ওলাবিবি, পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ, দক্ষিণরায় প্রভৃতি]	
পুণ্যস্নানাদি পর্ব	[বারুণী, পৌষসংক্রান্তি, মাঘীপূর্ণিমা, অষ্টমীস্নান প্রভৃতি]	
তিথিঘটিত পর্ব	[বাংলা নববর্ষ, পৌষপার্বণ, অম্বুবাচী, জামাইষষ্ঠী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি]	
অন্যান্য দেবতা	[কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা, শনি, ব্রহ্মা, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি]	
আবির্ভাব-তিরোভাব উৎসব	[হিন্দু সাধুসন্তদিগের]	
পীরের উরস্	[মুসলমান পীর, ফকির, দরবেশ প্রভৃতি]	
আদিবাসী উৎসব	[করমপূজা, বাঁধনা পর্ব প্রভৃতি]	
মুসলমানদিগের উৎসব	[মহরম, ইদ, সবেবরাত প্রভৃতি]	
জৈন উৎসব	[জৈন সম্প্রদায়ের যাবতীয় উৎসব]	
বৌদ্ধ উৎসব	[বুদ্ধজয়ন্তী প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের যাবতীয় উৎসব]	
খৃষ্টানদিগের উৎসব	[ইংরাজী নববর্ষ, বড়দিন প্রভৃতি খৃষ্টানদিগের যাবতীয় উৎসব]	
বিবিধ উৎসব	[ভারতের স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, প্রখ্যাত দেশনেতার জন্মোৎসব]	

লোকসমাগম অনির্দিষ্ট	
১,০০০ পর্যন্ত	
১,০০১ — ২,৫০০	
২,৫০১ — ৫,০০০	
৫,০০১ — ১৫,০০০	
১৫,০০১ — ২৫০০০	
২৫,০০১ এবং তদূর্দ্ধ	

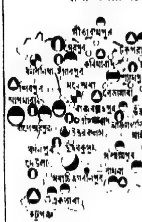
মেলার উপলক্ষ ও লোকসমাগম

জিলা ২৪-পরগণা

উত্তর

সাংকেতিক

আন্তর্জাতিক সীমানা
জিলার ,,
মহকুমার ,,
থানার ,,
মৌজার অবস্থিতি



মানচিত্রটি বিবরণ-প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব।— সম্পাদক।

মাসপঞ্জীর প্রতীক নির্দেশক

বৈশাখ ... ...

জ্যৈষ্ঠ ... ...

আষাঢ় ... ...

শ্রাবণ ... ...

ভাদ্র ... ...

আশ্বিন ... ...

কার্তিক ... ...

অগ্রহায়ণ... ... ...

পৌষ ... ...

মাঘ ... ...

ফাল্গুণ ... ...

চৈত্র ... ...

চান্দ্রমাস ... ...

মাস অনির্দিষ্ট ... ...

মেলার মাসপঞ্জী

জিলা ২৪-পরগণা

সাংকেতিক

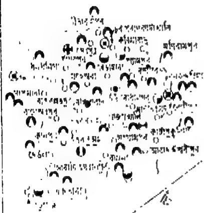
আন্তর্জাতিক সীমানা

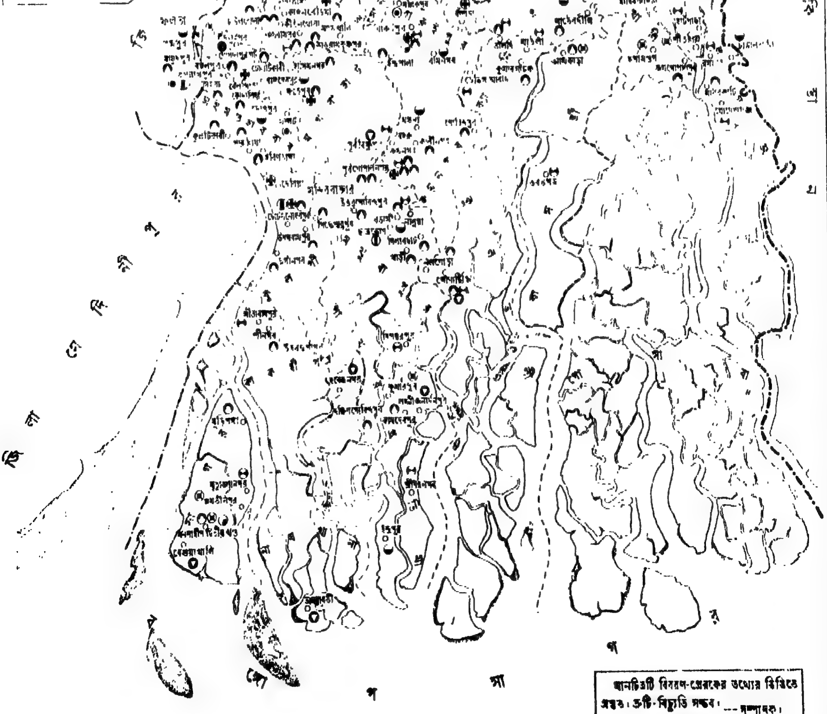
জিলার ”

মহকুমার ”

থানার ”

মেলার অবস্থিতি ০





মানচিত্রটি বিবরণ-প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব। — সম্পাদক।

উপাসনাস্থলাদির প্রতীক নির্দেশক

কালী, দুর্গা, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, [illegible], মহামায়া প্রভৃতি

শিব, ধর্মরাজ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি

চণ্ডী, শীতলা, মনসা, বিশালাক্ষী, ষষ্ঠী, পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর প্রভৃতি গ্রাম্য দেবদেবী

বিষ্ণু আদি যাবতীয় দেবতা

হিন্দু সাধুসন্তদের সমাধিমন্দির

পীর-ফকির প্রভৃতির সমাধিস্থল

মুসলমান সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল

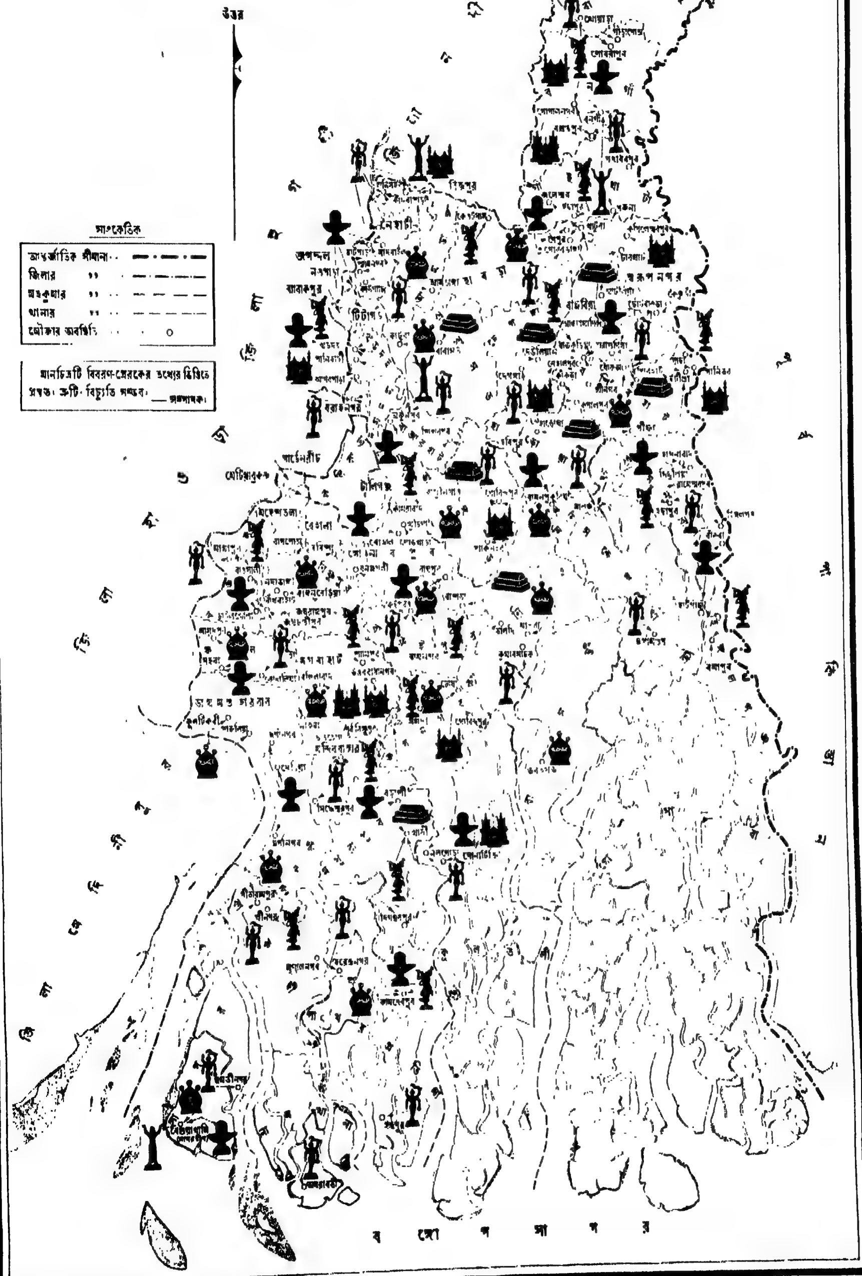
জৈন সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল

আদিবাসীদের উপাসনাস্থল

প্রতীক-গোষ্ঠী অনুযায়ী উপাসনাস্থলাদির বিন্যাস

জিলা ২৪-পরগণা



প্রবীর চট্টোপাধ্যায়।

থানা : বাগদহ

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : সিন্দ্রানী। ১১১,৮০৬'০০।৫৩৯।২,৯১৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, মাহিষ্য, যুগী, সাহা, কামার, স্বর্ণকার, সৎচাষী, ধোপা, বারুই, নাপিত, জেলে, কুমার ও মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বনগ্রাম জংশন হইতে মোটরবাসে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে সিদ্ধেশ্বরী কালীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধেশ্বরী কালীর নিত্য পূজা হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন।

(চ) গ্রামে ইঁটের দেওয়াল ও টিনের চালাযুক্ত একটি মন্দিরে সিদ্ধেশ্বরী কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাভিন্ন গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ আছে।

শ্রীধীরেশ চন্দ্র তরফদার, শিক্ষক,
গ্রাম : সিন্দ্রানী, ২৪-পরগণা।

২। গ্রাম : খোয়াড়া। ৮৬।৭৫৯'৩৫।২৩।১১,৩৪০

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কামার, নাপিত ও নমঃশূদ্র। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বনগ্রাম জংশন। তাহাছাড়া নদীপথেও গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে অষ্টমপ্রহরব্যাপী নামসংকীর্তন মহোৎসব, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দের নিত্য পূজা হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রাধাগোবিন্দমন্দিরে ধাতু নির্মিত রাধাকৃষ্ণমূর্তি এবং মৃত্তিকা নির্মিত দশভুজামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাভিন্ন, গ্রামে শিব, মনসা ও শীতলা আছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ রায়, শিক্ষক,
গ্রাম : মঙ্গলগঞ্জ, ২৪-পরগণা।

৩। গ্রাম : দুর্গাপুর। ৮৮।৪০৯'১৬।১৫৫।৭৯১

(ক) ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, বাগদী, কামার, নাপিত, ধোপা, জেলে ও মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বনগ্রাম জংশন হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাহাছাড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ্ ও মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মনসা ও একটি পঞ্চানন্দ আছে।

শ্রীআকতারউদ্দিন আহম্মদ, শিক্ষক,
গ্রাম : দুর্গাপুর, ২৪-পরগণা।

উৎসব বিবরণী

দোলযাত্রা

খোয়াড়া গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে তিনদিনব্যাপী রাধাগোবিন্দ ঠাকুরবাটীতে দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন এই সর্বজনীন উৎসবটি গ্রাম্যসাধারণের মিলিত প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে দরিদ্রনারায়ণ ও বৈষ্ণব সেবা এবং উৎসবের শেষদিন মালসাভোগ নিবেদন, প্রসাদ বিতরণ, ভাগবত পাঠ এবং কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের দিন মানত হিসাবে পয়সা, চাল, চিনি, বাতাসা প্রভৃতি দেওয়া হয়। রাধাগোবিন্দের প্রধান সেবাইত শ্রীপূর্ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য, মুদ্গল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। উৎসবে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

দুর্গাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব উপলক্ষে গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে বাওড়ের ধারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় চার বিঘা পরিমাণ জমির উপর সাধারণতঃ বৈকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলায় নিকটবর্তী ভরতপুর, নতুনপুর, গোবিন্দপুর, মহানন্দপাড়া, গাঁড়াপোতা, ঝাপা, করঙ্গ, ধুনানী, বানিয়াড়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় সাড়ে তিনশত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ সাধারণতঃ পদব্রজেই আসিয়া থাকেন।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও পুতুল এবং শিল্পসামগ্রীর প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা চাঁদা, গাঁড়াপোতা, বানিয়াড়া, গোবিন্দপুর প্রভৃতি আশেপাশের গ্রাম হইতে আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। যাত্রাদলের অধিকারী শ্রীশরৎ চন্দ্র হালদার, পোঃ থোয়াড়া, চব্বিশ-পরগণা।

প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে গাজনোৎসব উপলক্ষে থোয়াড়া গ্রামের ঘোষপাড়া সংলগ্ন বেনীমাধবতলায় একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রাম হইতে মেলায় লোকজন আসেন এবং বিভিন্ন রকম খাবারের, মনিহারীর, বাসন-কোসন ও ঔষধপত্রের দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য হরিনাম সংকীর্তন ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। গ্রামেই যাত্রার দল আছে।



গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ কেউটিপাড়া। ৩৩।৩০০'০৩।২০০।১,০২৩

(ক) বৈরাগী, গোয়ালা, কাপালিক, জেলে, কামার ও মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী ও মৎস্য ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে গোপালনগর এবং প্রায় আট মাইল দূরে রেলস্টেশন বনগ্রাম জংশন।

ইহা ব্যতীত জেলাবোর্ডের পাকা রাস্তা গ্রামের মধ্য দিয়া যাওয়ায় বর্ষাকাল ব্যতীত অন্যান্য সময়ে ট্যাক্সী অথবা ইছামতী নদী দিয়া নৌকায় গ্রামে যাতায়াতের সুবিধা আছে। গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তাও আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

রথযাত্রা উৎসবটি প্রায় সত্তর-আশি বৎসরের প্রাচীন এবং অন্যান্য উৎসবগুলি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

ইহাছাড়া গ্রামে শীতলা ও মনসাদেবীর নিত্য পূজা হয় এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজন বিভিন্ন উৎসব পালন করেন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন। মেলাটি মাত্র গত চার বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে ষষ্ঠীদেবীর স্থান আছে।

শোনা যায় আদিতে এই গ্রামে কেওট ও ডোম জাতির বসবাস ছিল। সম্ভবতঃ সেই কারণে গ্রামের নাম কেউটপাড়া এবং অপভ্রংশে কেউটিপাড়া হইয়াছে।

শ্রীরাধানাথ সর্দার, চৌকিদার,
গ্রাম ঃ মড়িখাটা. পোঃ গোবরাপুর,
২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ মড়িখাটা (মৌজা ঃ কেউটিপাড়া)। ৩৩।৩০০'০৩।২০০।১,০২৩

(ক) জেলে, কুমার, সর্দার ও সাঁওতাল। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বনগ্রাম জংশন। বনগ্রাম থানার নিকট হইতে গোবরাপুর গ্রাম হইয়া কাঁচা রাস্তায় গ্রামে পৌছান যায়। তাহাছাড়া মোটরে ও নৌপথে যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘীপূর্ণিমার স্নান অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মাঘীপূর্ণিমাস্নান উপলক্ষে মেলা। মাঘ মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি গত চল্লিশ বৎসর যাবত বসিতেছে।

(চ) গ্রামে দুইটি পঞ্চানন্দ ও একটি মনসা আছে।

পূর্বে এই স্থানে একটি নীলকুঠি ছিল। নীলকুঠিতে কাজ করিবার জন্য বাংলার সীমান্ত অঞ্চল হইতে যে-সকল সাঁওতালরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই এই গ্রামে প্রথম বসতি স্থাপন করেন।

শ্রীবাসুদেব সর্দার, কৃষিজীবি,
গ্রাম ঃ মড়িখাটা, ২৪-পরগণা।

৩। গ্রাম ঃ গাঁড়াপোতা। ৫১।১৬৮'১৪।২২২।১,১৩০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, কুমার, মুচি, কলু, ধোপা, স্বর্ণবণিক, বারুই, কাপালিক, বৈরাগী ও মুসলমান। গ্রামে তেরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বনগ্রাম জংশন। বনগ্রাম-বয়ড়া রোডে ৯২ নং বাস রুটে গ্রামে যাতায়াত করা চলে। তাহাছাড়া গ্রামের সীমান্তবর্তী ইছামতী নদী দিয়া নৌকায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তি তিথিতে চড়কপূজা এবং ১লা বৈশাখ হইতে চারদিনব্যাপী সাড়ম্বরে গণেশজননীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে দেবীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া দুর্গাপূজার ন্যায় সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী কল্পাদি পূজা এবং দশমী তিথিতে দেবীর মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়। পূজায় ধুনা পোড়ান ও পাঁঠা মানত করা হয়। মানতের পাঁঠাগুলি বলি না দিয়া দেবীর

নামে উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। দেবীর পূজারী ব্রাহ্মণ।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন ভগ্নপ্রায় কালীমন্দির আছে। মন্দিরটি বর্তমানে বিগ্রহহীন; মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত একটি ঘটে কালীদেবীর নিত্য পূজা হইয়া থাকে।

শোনাযায়, প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে ছয়-ঘরিয়া নিবাসী রামতারণ রায়চৌধুরী এই অঞ্চলটি তৎকালীন বাংলার নবাবের নিকট হইতে 'এনায়েৎ' সনদ প্রাপ্ত হন এবং জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া এই স্থানে জনবসতি গড়িয়া তুলেন। সেই সময় গভীর জঙ্গলের মধ্যে কালীমন্দিরটি আবিষ্কৃত হয়। গ্রামবাসীর ধারণা মন্দিরটি কোন ডাকাত দল কর্তৃক নির্মিত। রামতারণ রায়চৌধুরী মহাশয় এই মন্দিরে ঘট স্থাপন করিয়া নিত্য কালীপূজার ব্যবস্থা করেন।

শ্রীগুরু প্রসাদ হাজরা, প্রধান শিক্ষক,
গাঁড়াপোতা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
২৪-পরগণা।

গ্রামের পত্তন সম্পর্কে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, পূর্বে এই স্থানটি গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। ছয়ঘরিয়ার জমিদারগণ কোন এক সময় এইস্থানে শিকার করিতে আসিয়া একটি জলাশয় ও একটি মন্দির আবিষ্কার করেন। সম্ভবতঃ এই মন্দিরে কোন ডাকাত দল কালীপূজা করিত। তখন ছয়ঘরিয়ার জমিদার ঐ স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বসতি স্থাপন করেন ও পরে উক্ত মন্দিরকে কালীমন্দির মনে করিয়া কালীপূজার পুনঃ প্রবর্তন করেন। কালীমন্দির থাকা হেতু বর্তমানে এই স্থানটি 'কালীতলা' নামেও অভিহিত হয়।

[এখানে লক্ষ্যণীয় যে গ্রাম পত্তন সম্পর্কে একই কিংবদন্তী পাশাপাশি দুইটি গ্রাম গাঁড়াপোতা ও গোবরাপুর সীমান্তে অবস্থিত একটি কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া প্রচলিত আছে।]

শ্রীসদানন্দ চট্টোপাধ্যায়,
ও
শ্রীশচীনন্দন দাস, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ গোবরাপুর, ২৪-পরগণা।

৪। গ্রাম ঃ গোবরাপুর। ৫২।৩৯৯'৪৫।২৩৫।১,৪১৮

(ক) ব্রাহ্মণ, বারুজীবি, কৈবর্ত, বাগ্দী, ছুতার, কামার, বৈরাগী, জেলে, যুগী ও বাইতি। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বনগ্রাম জংশন। তাহাছাড়া কলিকাতা হইতে শ্যামবাজার-বনগ্রাম বাস রুটে অথবা নৌকাযোগে গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে মহিষমর্দ্দিনীপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মহিষমর্দ্দিনীপূজার মেলা। পয়লা বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া পনরদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মহিষমর্দ্দিনী দেবীর একটি নাটমন্দিরসহ পাকা মন্দির আছে।

৫। গ্রাম ঃ গোপালনগর। ৭৪।১৮২'৯০।১৩১।৭৬৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বণিক, স্বর্ণকার, কামার, তিলি, নমঃশূদ্র, মালো, বাগ্দী, সূত্রধর, বৈরাগী, মুচি, কাওরা, গোয়ালা, যুগী, বৈশ্য, বারুজীবি, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, জেলে, মোদক, মুসলমান ও আদিবাসী। গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। বনগ্রাম-চাকদহ পাকা রাস্তাটি গ্রামের মধ্য দিয়া যাওয়ায় মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রাধাগোবিন্দদেবের রথযাত্রা উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব ও কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে একটি রাধাগোবিন্দমন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ এবং একটি প্রাচীন কালীমন্দিরে কালীদেবীর

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। রাধাগোবিন্দ ও কালীর নিত্য পূজা হয়।

শ্রীসতীশ চন্দ্র দে. চাকুরী,
গ্রাম : গোপালনগর, ২৪-পরগণা।

৬। গ্রাম : ভাণ্ডারকোলা।
১৪৩।৮৯৮'০৩।২৫৪।১,৫১৪

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন গোপালনগর হইতে দক্ষিণদিকে প্রায় চার মাইল হাটিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মী-পূজা এবং মাঘে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে তিনটি পঞ্চানন্দ এবং দুইটি বাবাঠাকুর আছে।

শ্রীসতীশ চন্দ্র সরকার, প্রধান শিক্ষক,
ভাণ্ডারকোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
২৪-পরগণা।

৭। গ্রাম : বল্লভপুর। ১৪৯।৩২৩'৬১।৮০।৪৯৫

(ক) সংচাষী, কাওরা, গোয়ালা, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নাপিত ও কামার।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন চাঁদপাড়া। যশোহর রোড হইতে গ্রামে দুইটি রাস্তা গিয়াছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে পঞ্চানন্দপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাহাছাড়া গ্রামে ব্রহ্মাপূজা হয়। পঞ্চানন্দ এবং ব্রহ্মাপূজা প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়।

(ঙ) পঞ্চানন্দপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে একদিন। প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা কালীমন্দির এবং মনসা, শীতলা ও পঞ্চানন্দ আছে।

নদীয়া জেলার হিঙ্গনাড়া গ্রামের সংচাষী সম্প্রদায় প্রথমে এইস্থানে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন। সেই সময় হইতে গ্রামের নাম হয় বল্লভপুর।

শ্রীঅমূল্যরতন ভৌমিক, প্রধান শিক্ষক,
বল্লভপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
২৪-পরগণা।

৮। গ্রাম : কালুপুর। ১৫১।২,১৬৩'৩৪।৬৪৯।৩,৬৭৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কামার, কুমার, তিলি, স্বর্ণকার, সংচাষী, গোপ, পোদ, নমঃশূদ্র, কাহার, বাগদী, নাপিত, যুগী ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বনগ্রাম জংশন। যশোহর রোড দিয়া মোটরবাসে কলিকাতা হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, মনসাপূজা ও বিশ্বকর্মাপূজা; আশ্বিন মাসে দুর্গা-পূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কার্তিকপূজা ও কালী-পূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাহাছাড়া, প্রতি বৎসর নামকীর্তন মহোৎসব হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে গ্রাম্যদেবী আহ্লাদিনীবুড়ির নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীভূষণ চন্দ্র মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক,
কালুপুর পাঁচপোতা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
২৪-পরগণা।

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত বনগ্রাম শহর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের পূজা-পার্বণ ও মেলার তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

চব্বিশ-পরগণা জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম একটি মিউনিসিপ্যাল শহর। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৪৮ মাইল। পূর্বে ইহা যশোহর জেলার একটি মহকুমা ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। বঙ্গ বিভাগের পর ইহা চব্বিশ-পরগণা জেলার সহিত যুক্ত হইয়াছে। বর্তমানে এই মিউনিসিপ্যাল শহরটি ১৭টি ওয়ার্ড লইয়া গঠিত। এই শহরকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ইছামতী নদী প্রবাহিত। ইছামতী নদীর উপর একটি ভাসমান

ও একটি লৌহ সেতুর দ্বারা শহরের দুইটি অংশ সংযুক্ত। পূর্বরেলপথে এইস্থানে একটি রেলস্টেশন আছে; ইহার প্রায় তিন মাইল দূরে পূর্ব পাকিস্থান সীমান্ত। বনগ্রাম হইতে রাণাঘাট যাতায়াতের রেলপথ আছে। কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে যশোহর রোড দিয়া মোটরবাসে সরাসরি বনগ্রামে যাতায়াত করা যায়। এই শহরের মধ্যে একটি আদালত, থানা, ডাকঘর, বালক-বালিকাদের জন্য উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাসপাতাল, সিনেমা এবং বাজার প্রভৃতি আছে।

এইস্থানের প্রাচীন জমিদার চট্টোপাধ্যায় পরিবার। এই বংশের গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শিকারী হিসাবে খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন। ইহাভিন্ন, এই স্থানের প্রাচীন পরিবারগুলির মধ্যে দত্ত, ছয়ঘরিয়া চৌধুরী প্রভৃতি পরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য। নিকটবর্তী ব্যারাকপুর,-শ্রীপল্লী ও ছয়ঘরিয়া গ্রামে যথাক্রমে সুসাহিত্যিক বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রত্নতাত্ত্বিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আদি বাসস্থান ছিল। অতীতের ইহা ব্রাহ্মণ-কায়স্থ অধ্যুষিত গ্রাম হইলেও বর্তমানে এই স্থানে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বিভিন্ন সম্প্রদায় বিশেষ করিয়া বহু নমঃশূদ্র পরিবার আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছেন।

বনগ্রাম শহরের মধ্যস্থিত বিভিন্ন পল্লীতে অনেকগুলি কালী ও শিব মন্দির আছে। তাহার মধ্যে চাঁপাবেড়িয়া-চাকদহ রোডের পাশে একটি কালীমন্দির, খয়রামারির শ্মশানকালীমন্দির, টবাজারের কালীমন্দির, যশোহর রোডের কালীবাড়ী, শিমুলতলার কালীবাড়ী ব্যতীত পুরাতন বনগ্রামে কালীতলায় একটি প্রাচীন বটগাছের নীচে ডাকাতে কালীর নির্দিষ্ট স্থান আছে। ইহা 'সাতভাই' কালী নামেও খ্যাত এবং বিশেষ জাগ্রত ঈশ্বরী বলিয়া বিশ্বাস। কথিত আছে অতীতে ইহা ডাকাতদল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহারা প্রয়োজনে এই দেবীর নিকটে নরবলিও দিতেন। অদ্যাপি প্রতি শনি-মঙ্গলবার এই স্থানে দেবীর বিশেষ পূজা হয় এবং পৌষ মাসে বার্ষিক পূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

শহরের দত্তপাড়ায়, রেলবাজারে, মতিগঞ্জে, মিলিটারী রোডের ধারে, শিমুলতলায় এবং স্টেশনরোডের ধারে শিব-মন্দির আছে। স্টেশন রোডের ধারের মন্দিরটি কেশবেশ্বর শিব মন্দির নামে খ্যাত। ক্যাপ্টেন বি, পি, বিশ্বাস রোডের ধারে চড়কতলায় একটি দেবালয় আছে; ইহাতে কোন মূর্তি নাই। তবে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে এইস্থানে চড়কপূজা হইয়া থাকে। শিমুলতলায় চড়কপূজা উপলক্ষে দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলায় প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার লোকের সমাগম হয় এবং ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে।

ইহাভিন্ন, প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুনঃ-যাত্রার দিন যশোহর রোডের উভয় পার্শ্বে একটি মেলা বসে। ইহাতে প্রায় চার-পাঁচ হাজার নরনারী আসেন এবং পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাঠ বসে।

বাগদহ রোডের পাশে মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি মাদ্রাসায় ঈদ্-এর দিন একটি মেলা বসে।

বনগ্রাম রামকৃষ্ণ পল্লীতে ও চাঁপাবেড়িয়ায় চাকদহ রোডের পাশে ঠাকুররামকৃষ্ণের মন্দির আছে। চাঁপাবেড়িয়ার মন্দিরটি নবনির্মিত।

নিকটবর্তী ছয়ঘরিয়ায় চন্দ্রকান্তরোডের ধারে একটি শিব ও একটি কালী মন্দির আছে। প্রতিবৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজায় একটি মেলা বসে। ইহাব্যতীত, এইস্থানে যশোহর রোডের ধারে অবস্থিত একটি গীর্জায় প্রতি বৎসর বড়দিনের সময় স্থানীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

বনগ্রাম হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে হরিদাসপুর গ্রামে একটি কালীমন্দিরে কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষে এবং চার মাইল দূরে ব্যারাকপুর-শ্রীপল্লীতে অবস্থিত শ্যামসুন্দর ঠাকুরবাড়ীতে প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোলযাত্রা ও কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উপলক্ষে মেলা বসে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বনগ্রামে অনুষ্ঠিত কালীপূজার মেলা সম্পর্কে আমাদের সংবাদদাতা প্রত্যক্ষদর্শী অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনগ্রাম কলেজ ও শ্রীশরৎ চন্দ্র ঘোষ, শিক্ষক, ঢাকাপাড়া, বনগ্রাম কর্তৃক প্রেরিত তথ্য 'মেলা বিবরণী' অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে কালীপূজা উপলক্ষে বনগ্রাম শহরে কালীতলায় প্রায় চার-পাঁচ বিঘা দেবোত্তর জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। অপরপক্ষে এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আমাদের জনৈক সংবাদদাতা অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই মেলাটি গত বাংলা ১৩৩৬-৩৭ সন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

মেলায় বনগ্রাম থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে এবং রানাঘাট, হাবড়া, বসিরহাট, মধ্যমগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে ট্রেনে, মোটরবাসে, রিক্সায় ও হাটিয়া প্রায় চার-পাঁচ হাজার নরনারী আসেন। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই অধিক দেখা যায়।

প্রধানতঃ কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বনগ্রাম, দমদম ও কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। মেলায় দেড়শত হইতে দুইশত দোকানপাট বসে। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, কাপড়চোপড় ও তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত দ্রব্যাদি, লোহা, পিতল ও এলুমিনিয়মের বাসনকোসন, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা, পুতুল, কাঠের তৈয়ারী দ্রব্যাদি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী শিল্পসামগ্রী, বই-ছবি, চা-পান-বিড়ি, বাদাম, বাতাসা এবং শাকসব্জী, মাছ ইত্যাদি মেলায় আমদানী হয়। ইহাভিন্ন, মেলায় গরু-ছাগল প্রভৃতি পশু ক্রয়বিক্রয় হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, কথকতা, কবিগান, রামায়ণগান, কীর্তন ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। স্থানীয় দল ব্যতীত কোন কোন বৎসর পেশাদারী যাত্রাদল আসে। উল্লিখিত অনুষ্ঠানগুলিতে প্রায় দুই হাজার দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

মেলায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দল ও পুলিশবাহিনী সহযোগিতা করিয়া থাকেন।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

গাঁড়াপোতা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে 'দেল' বা চড়কপূজা উপলক্ষে বনগ্রাম-বয়ড়া রোডের উভয় পার্শ্বে প্রায় চার-পাঁচ বিঘা জমির উপর সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। বৈকালের দিকেই মেলায় লোকসমাগম বেশী হয়। ইহা প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মেলায় নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে এবং নদীয়া জেলার শান্তিপুর হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয়; যাত্রীরা প্রধানতঃ বাস, নৌকা, রিক্সা ও গরুর গাড়ীতে করিয়া আসেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ ছাড়াও বনগ্রাম, হাবড়া, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর ব্যবসায়ীরা আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী ও কাপড়চোপড়ের দোকানের সংখ্যা বেশী। ইহাভিন্ন, তামা-পিতল-লোহা-কাঁচ ও মাটির জিনিসপত্র, হাকিমী ও টোটকা ঔষধ, বই-ছবি, কৃষিযন্ত্রপাতি এবং কারুশিল্পজাত জিনিসপত্রের আমদানী হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কবিগান, রামায়ণ-গান, থিয়েটার এবং যাত্রাভিনয় ব্যতীত লাঠি খেলা ও কুস্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই একটি যাত্রার দল আছে; অধিকারীদ্বয়ের নাম—শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দালাল ও শ্রীগজেন্দ্র মোহন সেন। এই সকল আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠানে বহু নরনারীর সমাগম হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

ভাণ্ডারকোলা গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রায় তিন-চার শত নরনারীর সমাগম হয় এবং মাত্র পনর-ষোলটি দোকানপাট বসে ও কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনিহারী দোকান ব্যতীত হাঁড়িকুড়ি ও মাটির পুতুলের দোকানপাট বসে।

মেলা উপলক্ষে যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামেই যাত্রার দল আছে; অধিকারীর নাম—শ্রীহরেন্দ্র নাথ বাগচী। মেলায় লোকসমাগম কম হইলেও যাত্রার আসরে প্রায় দেড় হাজার দর্শকের সমাগম হয়।

পঞ্চানন্দপূজার মেলা

বল্লভপুর গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে পঞ্চানন্দ ঠাকুরের পূজা উপলক্ষে গ্রামের উত্তর সীমানায় এক দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটিতে সাধারণতঃ বৈকালে লোকসমাগম বেশী হয়। ইহা প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় যাত্রী ও বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। ইহাতে ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, মাটির হাঁড়ি-কলসী, পুতুল প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রীর মোট প্রায় চল্লিশটি দোকানপাট বসে। আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষে সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে।

পুণ্যস্নান উপলক্ষে মেলা (মাঘীপূর্ণিমাস্নান)

মড়িঘাটা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে ইছামতী নদীতে পুণ্যস্নান ও গঙ্গাপূজা উপলক্ষে নদীর তীরে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় আট-নয় বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

আশেপাশের নয়-দশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় মোটরবাস, রিক্সা এবং ঘোড়ার ও গরুর গাড়ী করিয়া প্রায় আট-নয় হাজার নরনারী আসেন।

বনগ্রাম, গাঁড়াপোতা, গোবরাপুর, গোপালপুর, রানাঘাট প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। মেলায় প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে। উহার মধ্যে মনিহারী এবং বিভিন্ন খাবারের দোকানের সংখ্যা যথাক্রমে ষাটটি ও পঞ্চাশটির মত হইবে। ইহাভিন্ন, বাসনকোসনের, কাপড়চোপড়ের, বই-ছবির, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের এবং শিল্পসামগ্রী ও কারুশিল্পজাত দ্রব্যাদির দোকানপাট বসে।

আমোদপ্রমোদ উপলক্ষে সার্কাস, ম্যাজিক ও যাত্রাভিনয় হয় এবং লটারী খেলার দল আসে।

মহিষমর্দ্দিনীপূজার মেলা

গোবরাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে মহিষমর্দ্দিনী-পূজা উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে ব্যক্তিবিশেষের জমির উপর ১লা বৈশাখ হইতে পনরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মেলা উপলক্ষে নিকটবর্তী বিভিন্ন গ্রাম ব্যতীত নদীয়া জেলা ও কলিকাতা হইতে প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার নরনারী আসেন।

মেলায় খাবার, মনিহারী, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, মাটির খেলনা-পুতুল, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলা-ঝুড়ি ইত্যাদি দ্রব্যসামগ্রীর প্রায় ষাটটি দোকান বসে এবং কুড়ি-পঁচিশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ চব্বিশ-পরগণা, নদীয়া এবং কলিকাতা হইতে আসেন। ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে তোলা গ্রহণ করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক ও নাগরদোলা আসে এবং তরজা, রামায়ণগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

রথযাত্রার মেলা

গোপালনগর গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে স্থানীয় বাজার সংলগ্ন ব্যক্তিবিশেষের প্রায় চার-পাচ বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটিতে সাধারণতঃ বৈকালের দিকেই লোকসমাগম বেশী হয়। ইহা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, বাসনকোসন, মনিহারী, বই-ছবি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মেলায় দুইদিন কীর্তন গানের অনুষ্ঠান হয়।

কেউটিপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে গাবতলা নামক স্থানে রাস্তার দুইধারে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন বৈকালে একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র গত চার বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। আশেপাশের দুই-তিন মাইলের মধ্যবর্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়। প্রধানতঃ খাবার, মনিহারী ও চা-পান-বিড়ি প্রভৃতির প্রায় ত্রিশটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। বিক্রেতারা মড়িঘাটা, গাঁড়াপোতা, গোবরাপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে আসেন। এই গ্রামের শ্রীসতীশ চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের পুতুলনাচের দল আছে; আমোদপ্রমোদের জন্য এই দল পুতুলনাচ দেখাইয়া থাকেন।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ কয়া। ৪৫।১৬৩·২২।৮৪।৫৩৭

(ক) কামার, নাপিত ও মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কয়া গ্রামের পূর্বদিকে মাত্র দুই মাইল দূরে ঠাকুরনগর রেলস্টেশন এবং পশ্চিমদিকে প্রায় দুই মাইল দূরে যশোহর রোড দিয়া কলিকাতা হইতে নিয়মিত মোটরবাস যাতায়াত করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের ৫ই তারিখ হইতে তিনদিনব্যাপী আজিমুশ্‌শান সাহেবের ইছালে ছওয়ার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

এই গ্রামে আব্দুস ছোবহান নামে জনৈক 'সিপাই বিদ্রোহে'র নেতা বসবাস করিতেন। শোনা যায়, তিনি বিদ্রোহিতার জন্য কিছুদিন জেলও খাটেন। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি সাধারণের নিকট শ্রদ্ধা-ভাজন ছিলেন। স্থানীয় ইছালে ছওয়ার অনুষ্ঠানে সিপাই বিদ্রোহের এই নেতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে সর্বজনীন ভোজ এবং তিনদিনব্যাপী ধর্মালোচনার জন্য সভা আহ্বান করা হয়। এই সভায় গাইঘাটা থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে, স্বরূপনগর থানা, বাদুড়িয়া থানা ও বসিরহাট থানা হইতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় পনর হাজার নরনারীর সমাগম হয়। ইহাছাড়া, বহু দরবেশ ও জ্ঞানী ব্যক্তি সভায় যোগদান করেন। উৎসবটি প্রায় আশি বৎসরের প্রাচীন। উৎসব উপলক্ষে কয়েকটি ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান বসে।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীফকির আহম্মদ, প্রধান শিক্ষক,
কয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গাইঘাটা, ২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ গদাধরপুর। ৭০।১,০৪৬·৩৯।১৭০।৯৬৫

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, নাপিত, যুগী, মাঝি, গোয়ালা ও মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বনগ্রাম জংশন। গ্রামে যাতায়াতের প্রধান পথ রামনগর রোড।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তিতে কালীপূজা এবং চৈত্র মাসে তিনদিনব্যাপী চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন। উল্লিখিত দুইটি উৎসব উপলক্ষেই পূজা-প্রাঙ্গণের আশেপাশে প্রতি বৎসরই কয়েকটি খাবারের ও মনিহারী দোকানপাট বসে এবং যাত্রাভিনয় হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি সাধারণের কালীমন্দির ব্যতীত ছয়টি মনসার স্থান আছে।

শ্রীপদ্মলাল ভূষণ রায় চৌধুরী, প্রধান শিক্ষক,
গদাধরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বনগ্রাম, ২৪-পরগণা।

৩। গ্রাম ঃ ঠাকুরনগর (মৌজা ঃ গজনা)।
৯০।৬৬০·২৩।১৫৩।৮৯৭

(ক) হিন্দু।

(খ) কৃষিকার্য, কুটিরশিল্প, চাকুরি ও ব্যবসায়।

(গ) শিয়ালদহ-বনগ্রাম রেলপথে ঠাকুরনগরেই একটি রেলস্টেশন আছে। নিকটবর্তী যশোহর রোড হইতে জেলাবোর্ডের একটি রাস্তা ঠাকুরনগর উপনিবেশের মধ্য দিয়া গিয়াছে। যশোহর রোড দিয়া কলিকাতা হইতে মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) ঠাকুরনগর উপনিবেশে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে একযোগে হরিঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব এবং বারুণীস্নান অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) হরিঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে মেলা। ফাল্গুন মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি গত দশ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) হরিঠাকুরের একটি মন্দির আছে।

১৯৪৭ সালে বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুগণের জন্য কলিকাতা-বনগ্রাম রেলপথে গোবরডাঙ্গা ও চাঁদপাড়া স্টেশনদ্বয়ের মধ্যস্থলে স্বনামখ্যাত

নেতা শ্রী পি, আর, ঠাকুর মহাশয়ের নেতৃত্বে এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'ঠাকুরনগর উপনিবেশ' গড়িয়া উঠে এবং তাঁহারই নামানুসারে উপনিবেশটির নাম 'ঠাকুরনগর' হয়।

শ্রীসুধাংশু ভূষণ ধরগুপ্ত, প্রধান শিক্ষক,
ঠাকুরনগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়,
পোঃ ঠাকুরনগর, ২৪-পরগণা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—[হরিঠাকুরের জীবনী ও আবির্ভাব উৎসব সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য এবং সংবাদদাতা শ্রীসুধাংশু ভূষণ ধর-গুপ্ত মহাশয়ের প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত নিবন্ধ উৎসব বিবরণী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

৪। গ্রাম : শশাডাঙ্গা। ৯৭।৭৭০·৮৮।২৮৪।১,৪৪৯

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, বৈশ্যকপালী, কামার, গোপ, ছত্রি, নাপিত, জুলে, মুচি, নমঃশূদ্র ও মুসলমান। গ্রামে পনরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে চাঁদপাড়া রেলস্টেশন। কলিকাতা হইতে বনগ্রামগামী মোটরবাসে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র-সংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটিই সর্বজনীন। দুর্গাপূজাটি বার বৎসরের এবং চড়ক উৎসবটি বহুদিনের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়। দুর্গাপূজা উপলক্ষে দশমীর দিন এবং চড়ক উপলক্ষে দুইদিন উভয় পূজা-প্রাঙ্গণের আশেপাশে কয়েকটি খাবার ও মনিহারী দোকানপাট বসে।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীঅমলেন্দু সরকার, প্রধান শিক্ষক,
শশাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ শশাডাঙ্গা, ২৪-পরগণা।

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত জলেশ্বর গ্রামের শিবের গাজন ও ইছাপুর গ্রামের পূজা-পার্বণ সম্পর্কে তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

জলেশ্বর

চব্বিশ-পরগণা জেলার গাইঘাটা থানার অন্তর্গত জলেশ্বর (মৌজা নং ২২) গ্রামটি কলিকাতা হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে এবং শিয়ালদহ-বনগ্রাম রেলপথে গোবরডাঙ্গা স্টেশন হইতে প্রায় ৬ মাইল পশ্চিমে শীর্ণকায় যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। অতীতে ঝোর নদীর একটি খাল এই গ্রামের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইত বলিয়া জানা যায়। গ্রামের সীমান্ত দিয়া যশোহর রোড এবং যশোহর রোড হইতে আর একটি রাস্তা বাহির হইয়া জলেশ্বর গ্রামের মধ্য দিয়া রানাঘাট পর্যন্ত গিয়াছে। কলিকাতা হইতে যশোহর রোড দিয়া সরাসরি মোটরবাসে এই গ্রামে যাতায়াত করিতে পারা যায়।

এই স্থানে জলেশ্বর শিবের অবস্থানহেতু গ্রামের নাম জলেশ্বর হইয়াছে। গ্রামটি মাহিষ্য প্রধান; ইহাভিন্ন, কয়েক ঘর বারুই, স্বর্ণকার, মুসলমান ও মাত্র দুই ঘর ব্রাহ্মণ পরিবারের বসবাস আছে। ১৯৬১ সালের লোকগণনা অনুসারে এই গ্রামে ১,৭২৫ জন নরনারী বাস করেন।

এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য উৎসব জলেশ্বর শিব বা বুড়ো শিবের গাজন। রানাঘাটগামী রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি সুউচ্চ স্তূপের উপর অবস্থিত টিনের চালাযুক্ত পশ্চিমমুখী একটি ছোট পাকা ঘর বর্তমানে শিবমন্দিররূপে ব্যবহৃত হয়। ঘরটির অবস্থা জীর্ণ, ইহার অভ্যন্তরে একটি বাঁধানো বেদী আছে মাত্র। এই শিবমন্দিরের পশ্চিমদিকে স্তূপের নীচে 'শিবপুষ্করিণী' নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীটি খুবই প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহার চারিদিকের পাড় ভাঙ্গিয়া সমতল হইয়া গিয়াছে। সারা বৎসর শিবপুষ্করিণীর জলে জলেশ্বর শিবের প্রতীকস্বরূপ একটি গোলাকার শিলা ডুবানো থাকে; কেবলমাত্র চৈত্র মাসে গাজন উৎসবের পূর্বে ঐ শিলা জল হইতে তুলিয়া যথারীতি উৎসব পালন করা হয় এবং উৎসবান্তে উহা পুনরায় জলে ডুবাইয়া রাখা হয়। শিবমন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে স্তূপের উপর একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে লালপাথরে খোদিত একটি দণ্ডায়মান

বিষ্ণু (?) মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্তিটি চার হাত বিশিষ্ট এবং স্কন্ধের উপর হইতে সমগ্র মুখমণ্ডলটি ভগ্ন। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র নর মূর্তি খোদিত আছে।

শোনা যায়, জলেশ্বরের রাজা কাশী নাথ রায় এই গ্রামে জলেশ্বর শিবের মন্দির নির্মাণ করান। কালের প্রভাবে ঐ মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া বর্তমানে সুউচ্চ স্তূপটি সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার অবস্থান ও আয়তন দেখিলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন মন্দিরটি সুবৃহৎ ছিল। স্তূপটির উপরে অশ্বত্থ, জিউলী প্রভৃতি বৃক্ষের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, তবে এখনো ইহার চারিদিকে পাকা ইঁটের গাঁথুনী ও পাতলা ইঁট ছড়াইয়া আছে। স্তূপটির নীচে সমতল ক্ষেত্রে রানাঘাটগামী রাস্তার ধারে একটি অতি প্রাচীন বটগাছ ও উল্লিখিত শিবপুষ্করিণীটি দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, একদা ইহারা প্রাচীন শিবমন্দির প্রাঙ্গণেই অবস্থিত ছিল।

প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির তিনদিন পূর্ব হইতে জলেশ্বর শিবের গাজন উৎসব আরম্ভ হয়। উৎসবের তিনদিন পূর্বে যে সোম অথবা শুক্রবার পড়ে সেইদিনই জলেশ্বর শিবের প্রতীক শিলাখণ্ডটিকে শিবপুষ্করিণী হইতে গাজনের 'শেষপাট' ও 'দরপাট' ভক্তার সাহায্যে মূল সন্ন্যাসী জল হইতে তুলিয়া প্রথমে পুষ্করিণীর পাড়ে একটি নির্দিষ্ট অশ্বত্থ গাছের নীচে পূজা করেন এবং পরে ঢাক-ঢোলের বাজনাসহ সাড়ম্বরে সেবায়েতের বাড়ী লইয়া আসেন। অতঃপর সেবায়েতের গৃহে জলেশ্বর শিবের অন্ন-ভোগ পূজাদি হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে, শিব তুলিবার দিন মূল সন্ন্যাসী শিব উঠাইবার জন্য জলে অবতরণ করিলে যে-স্থানে শিলাখণ্ডটি থাকে সেইস্থান হইতে জলবুদ্বুদ উঠিয়া ইঙ্গিতে শিবের অবস্থান জানাইয়া দেন।

জলেশ্বর শিব বিশেষ জাগ্রত দেবতা বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। ইহার মাহাত্ম্য সম্পর্কে গ্রামে নানারূপ কিংবদন্তী শোনা যায়। গাজন উৎসব উপলক্ষে সীমান্তবর্তী নদীয়া জেলা এবং চব্বিশ-পরগণা জেলার বিভিন্ন গ্রামের প্রায় পাঁচ-সাত শত নরনারী সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। হিন্দু জাতির যে-কোন লোকই সন্ন্যাসব্রত লইতে পারেন। মানসিক অনুসারে কেহ এক মাস, সাতদিন অথবা তিনদিন ব্রত পালন করেন। ব্রত গ্রহণের দিন হইতে সন্ন্যাসীরা গলায় উত্তরীয় ধারণ, গেরুয়া বস্ত্র পরিধান ও সঙ্গে একটি নূতন গামছা রাখেন এবং দিনান্তে একবার হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন। নীলপূজার দিন সন্ন্যাসীদের নিরম্বু উপবাস করিতে হয়।

নিকটবর্তী আমকোলা গ্রামের গোয়ালা জাতি হইতে প্রতি বৎসর গাজনে একজন মূল সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন। বর্তমান মূল সন্ন্যাসী শ্রীকালী পদ ঘোষ গত ৪০ বৎসর যাবত মূল সন্ন্যাসীর কার্য করিতেছেন। ইহাভিন্ন, 'শেষপাট' ও 'দরপাট' নামে গাজনে দুইজন বিশেষ ভক্তা থাকেন, ইহারা বাগদী সম্প্রদায়ভুক্ত। এই তিনজন ভক্তকে ১লা চৈত্র হইতে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে হয়।

উৎসব উপলক্ষে ধরমপুরের পালেরা পূজার ঘট এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় হাঁড়ি, কলসী, মালসা ইত্যাদি মাটির জিনিসপত্র সরবরাহ করিয়া থাকেন। পরিবর্তে তাঁহারা ঘটের ডাব, একটি গামছা, পান-সুপারী ও কিছু চাউল পাইয়া থাকেন। এই গ্রামের প্রামানিক সম্প্রদায় পূজার প্রয়োজনীয় ফুল-বেলপাতার যোগান দেন ও শিবমন্দির পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করেন, পরিবর্তে কিছু চাউল পান। সিমলা গ্রামের বাগদী সম্প্রদায় পূজার প্রয়োজনীয় চেঙ মাছ ও শোল মাছ দেন, পরিবর্তে একটি নূতন গামছা ও ভোগের কিছু অংশ পান। বাগনা গ্রামের ঢাকীরা উৎসব উপলক্ষে বাজনা বাজানোর জন্য নগদ টাকা ও কিছু চাউল পাইয়া থাকেন। কেমে বয়োস গ্রামের এক ঘর কামার উৎসবের দিন মানতের পাঁঠা বলি দিয়া থাকেন এবং পরিবর্তে বলির ছাগমুণ্ড এবং কিছু চাউল পান। উল্লিখিত পরিবারগুলি পুরুষানুক্রমে উৎসব উপলক্ষে তাঁহাদের স্ব-স্ব কর্তব্য পালন করিতেছেন। গ্রামের ভরদ্বাজ গোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বর্তমানে শিবের সেবায়েত ও পূজারী। ইহারাও পুরুষানুক্রমে সেবায়েতের কার্য করিতেছেন।

উৎসবের প্রথম দিন অর্থাৎ সংক্রান্তির দুইদিন পূর্বে 'ঘাট সন্ন্যাসী' নামে একটি অনুষ্ঠান হয়। এইদিন মূল সন্ন্যাসীসহ অন্যান্য সন্ন্যাসীরা সেবায়েতের বাড়ী আসিয়া ধর্ণা দিয়া পড়িলে পর পূজারী তাঁহাদের গায়ে মন্ত্রপূত বারি ছিটাইয়া দেন। তখন সন্ন্যাসীরা উঠিয়া বসিয়া পূজারীর নিকট হইতে আশীর্বাদ স্বরূপ শিবের মাথার ফুল-বেলপাতা গ্রহণ করেন এবং সেবায়েতের অনুমতি লইয়া শিবের প্রতীক শিলাটিকে শিরে স্থাপন করিয়া বাজনা-বাদ্যসহ

নিকটবর্তী কেমে আমকোলা, জারকোলা ও গাইঘাটা গ্রাম পরিক্রমায় বাহির হন। পরিক্রমা চলাকালীন গৃহস্থেরা উলুধ্বনি সহকারে শিবের মাথায় দুধ, গঙ্গা জল ও ডাবের জল ঢালিয়া দেন। পরে গাইঘাটার যমুনা নদীর তীরে একটি নির্দিষ্ট ঘাটে শিবের স্নানাভিষেকের পর 'তালপাট ভাঙ্গা' অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের বঁটি ঝাঁপপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন সন্ধ্যায় একটি খেজুর গাছের নীচে শিবকে রাখিয়া শেষপাট ভক্তা ঐ গাছে আরোহণ করিয়া খেজুর কাঁটার চারিদিক প্রদক্ষিণ করেন—ইহাকে 'শালভাঙ্গা' অনুষ্ঠান বলে। রাত্রিকালে সেবায়েতের বাড়ী যথারীতি ষোড়শো-পচারে শিবপূজা হয়।

দ্বিতীয় দিন নীলপূজা। এইদিন সকালেও সন্ন্যাসীরা শিবকে লইয়া নিকটবর্তী চণ্ডীগোড়ে গ্রামপরিক্রমায় বাহির হন। সেখান হইতে ফিরিয়া মধ্যাহ্নে সেবায়েতের বাড়ীতে পূজার পর পুনরায় শিবকে লইয়া জলেশ্বর, সিমুলিয়া ও গোপালপুর গ্রামে বাহির হন। গভীর রাত্রে শিবকে লইয়া সন্ন্যাসীরা প্রত্যাবর্তন করিলে পর মন্দিরাভ্যন্তরে মাটির দ্বারা নির্মিত কুমীর, হাঙ্গর ও কচ্ছপ মূর্তির উপর শিবকে স্থাপন করিয়া দুধ ও ডাবের জল দ্বারা স্নান করান হয়। স্নানপর্ব শেষ হইলে শিবকে মন্দিরের বেদীর উপর স্থাপন করিয়া যথারীতি নীলপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন সন্ধ্যায় বহু স্ত্রীলোক মন্দিরে 'নীলের বাতি' দিয়া যান এবং রাত্রিকালে হর-পার্ব্বতী বিবাহপর্ব পালন করা হয়।

নীলপূজার দিন ভোর রাত্রে গ্রামের 'হাজরাতলা' নামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে গাজন উপলক্ষে একটি বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। হাজরাতলা একটি উচ্চ ঢিপির উপর অবস্থিত। কথিত আছে, পূর্বে এইস্থানে জলেশ্বর শিবের ভোগরন্ধনের গৃহাদি ছিল; তাহারই ধ্বংসস্তূপের উপর হাজরাঠাকুরের স্থান। হাজরাঠাকুরের কোন মূর্তি নাই। নীলপূজার দিন মূল সন্ন্যাসীকে এই স্থানে পান-সুপারী দিয়া হাজরাঠাকুরকে আমন্ত্রণ জানাইয়া যাইতে হয়। ভোর রাত্রে এই স্থানে একটি পাঠা বলি দিয়া পোড়া চেঙ মাছ ও শোল মাছ সহ অন্নভোগ দ্বারা পূজা হয়। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকগণ এইদিন হাজরাতলায় একটি নূতন মাটির সরার উপর আর একটি সরা উপুড় করিয়া দুইটিকে একত্রে বাঁধিয়া পূজা দেন। বিশ্বাস পূজার পর ঐ সরা ধুইয়া জল খাইলে বন্ধ্যা নারী সন্তানবতী হন। প্রধানতঃ পাঁঠা বলি মানত করা হয়; এইদিন হাজরাতলায় অনেকগুলি মানতের পাঠা বলি দেওয়া হয়।

সংক্রান্তির দিন মন্দিরে চড়কপূজার পর 'তাবা-পাটভাঙ্গা' (ঝাঁপ) অনুষ্ঠান ও ধুনা পোড়ান হয়; ইহাভিন্ন, এইদিন মানতকারীরা মন্দিরে মানত শোধ করিয়া পূজা দেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সারা বৎসর শিবমন্দিরে কোন পূজাপাঠ হয় না। সুতরাং যে-সকল মানতকারীরা মাঝে মাঝে যে-কোন সোম বা শুক্রবার মন্দিরে আসিয়া শিবের নিকট মানত জানাইয়া যান তাঁহারা চৈত্রসংক্রান্তির দিন আসিয়া মানত শোধ করেন। এইদিন মধ্যাহ্নে মন্দির প্রাঙ্গণে সন্ন্যাসীদের বঁটি ঝাঁপের পর একটি পাঠা বলি দেওয়া হয়। রাত্রিকালে শিবকে সেবায়েতের গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। পরদিন অর্থাৎ ১লা বৈশাখ প্রাতঃকালে সেবায়েতের গৃহে শিব ও ভগবতী পূজার পর শিবকে পুনরায় মন্দিরে আনা হয়। মধ্যাহ্নে সন্ন্যাসীরা গায়ে তেল-হলুদ মাখিয়া শিবঠাকুরকে লইয়া শিবপুষ্করিণীর জলে নামিয়া দুধ-ঘি-চালবাটা দ্বারা প্রস্তুত চরুসহ শিব-ঠাকুরকে অর্থাৎ শিবের প্রতীক শিলাটিকে জলে ডুবাইয়া দিলে উৎসবের সমাপ্তি হয় এবং সন্ন্যাসীরা স্নান সারিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। গ্রামের বৃদ্ধদিগের নিকট শোনা যায় যে, পূর্বের তুলনায় এই উৎসবের আড়ম্বর বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। শিবের নামে বহু দেবোত্তর জমি ছিল, বর্তমানে উহা হস্তান্তর হইয়া গিয়াছে। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। পূর্বে গাজন উৎসব উপলক্ষে সন্ন্যাসব্রতীরা পৃষ্ঠে ও জিহ্বায় বান ফুঁড়িতেন।

জলেশ্বর শিবের গাজন উপলক্ষে প্রতি বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তির দিন মন্দিরের দক্ষিণদিকে দেবোত্তর ও ব্যক্তি-বিশেষের জমির উপর একটি মেলা বসে। পূর্বে মেলাটি তিনদিন স্থায়ী হইত। সীমান্তবর্তী নদীয়া এবং চব্বিশ-পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে মেলায় প্রায় আট-দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। হাবড়া, গাইঘাটা, গোবরডাঙ্গা, মসলন্দপুর, বনগ্রাম, আমডাঙ্গা, বারাসত, বাদুরিয়া, বসিরহাট, রানাঘাট প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর প্রায় একশত বিক্রেতা আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, লোহার তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়ি-কলসী, পাখা, মাদুর, শাকসব্জী, চা-পান-বিড়ি ও

সরবত ইত্যাদির দোকানপাট বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পূর্বে আমোদপ্রমোদ উপলক্ষে লাঠিখেলা প্রতিযোগিতা হইত এবং বিজয়ী দলকে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা ছিল।

স্থানীয় প্রগতি সংঘের সভ্যগণ মেলাটি পরিচালনা এবং জলছত্রের ব্যবস্থা করেন। এই সংঘ মেলার বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া জনকল্যাণের জন্য ব্যয় করেন। ইহাভিন্ন, জনস্বাস্থ্যের খাতিরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের লোকজন এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য পুলিশবাহিনী বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন।

ইছাপুর

চব্বিশ-পরগণা জেলার গাইঘাটা থানার অন্তর্গত ইছাপুর (মৌজা নং ৩৬) একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। প্রাচীন কুশদহের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এই গ্রামটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইছাপুরের সমৃদ্ধির ইতিহাস শুরু হয় রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের আমল হইতে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরূপে এবং চারিত্রিক নানা গুণাবলীর জন্য তাঁহার খ্যাতি কেবলমাত্র ইছাপুর গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; সমগ্র কুশদহ অঞ্চলে পণ্ডিত সমাজের মধ্যে তাঁহার নাম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহাছাড়া, তিনি একজন যোগসিদ্ধ পুরুষরূপেও পরিচিত ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে এই অঞ্চলে অদ্যাপি নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। যতদূর জানা যায় তাঁহার আদি পুরুষগণ কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং আদিশূর কর্তৃক আহূত যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহারা বঙ্গদেশে আসেন। ইঁহারা যশোহর জেলার অন্তর্গত লাউজানি গ্রামে মুকুট রায় নামে জনৈক হিন্দু রাজার রাজত্বে বসবাস করিতেন বলিয়া শোনা যায়। মুকুট রায়ের সহিত সিকন্দর শাহের পুত্র গাজী সাহেবের মতান্তরে সপ্তগ্রাম বিজয়ী জাফর খাঁর পুত্র বরখান গাজীর সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় লাউজানি গ্রাম ত্যাগ করিয়া ইছাপুরে আসিয়া বসবাস করেন এবং ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে নিজেকে ইছাপুরের জমিদাররূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। অপরপক্ষে তাঁহার এই স্থানে আগমন ও জমিদারী প্রাপ্তি সম্পর্কে শোনা যায় যে, জলেশ্বরের রাজা কাশীনাথের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার সহিত আত্মীয়তাসূত্রে রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় এই স্থানের জমিদারী প্রাপ্ত হন এবং সেইহেতু এই গ্রামে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। অনেকে মনে করেন 'খড়দহ মেল'-এর মধ্যে 'সিদ্ধান্তী' নামে যে পৃথক শ্রেণী আছে তাহা সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের দ্বারা গঠিত। তাঁহার বংশধরগণ বর্তমানে ইছাপুরের বড় চৌধুরী পরিবার নামে খ্যাত।

ইছাপুর আজ একটি সাধারণ গ্রাম মাত্র। গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, কামার, কুমার, গোয়ালা, বারুই, ধোপা, নাপিত, পোদ, নমঃশূদ্র, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বাস আছে। ১৯৬১ সালের লোকগণনা অনুসারে এই গ্রামে লোকসংখ্যা ১,৯৩৭। শিয়ালদহ-বনগ্রাম রেলপথে নিকটবর্তী স্টেশন গোবরডাঙ্গা হইতে মোটরবাসে অথবা কলিকাতা হইতে যশোহর রোড দিয়া গাইঘাটা হইয়া মোটরবাসেও গ্রামে যাতায়াত করিতে পারা যায়। গ্রামের সীমান্ত দিয়া গোবরডাঙ্গা-গাইঘাটা পাকা রাস্তা হইতে একটি কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়া সোজা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। গ্রামে প্রাচীন সমৃদ্ধির কোন চিহ্ন আজ আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কেবল অতীত সমৃদ্ধির ক্ষীণতম সাক্ষীরূপে কালের প্রভাবে ক্ষতবিক্ষত বড় চৌধুরীদের নির্মিত গোবিন্দজীউর মন্দিরের একটি জীর্ণ কঙ্কাল আজিও দাঁড়াইয়া আছে। এই বিশাল জরাগ্রস্ত কঙ্কালটিকে দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায় ইহার যৌবনের পরিপূর্ণ রূপটি। পরিত্যক্ত এই মন্দিরের চারিদিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ, মন্দির গাত্রে সর্বত্র ভরিয়া গিয়াছে আগাছায়। চামচিকে আর বাদুড়ের নিশ্চিন্ত আশ্রয় মিলিয়াছে মন্দিরের শূন্য গৃহে।

প্রাচীন গ্রন্থাদি দৃষ্টে জানা যায়, রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পৌত্র রঘুনাথ চক্রবর্তী চতুর্ধুরীণ (নবাব প্রদত্ত খেতাব) তাঁহার বন্ধু নদীয়ার রাজা রাঘবের সহায়তায় ঢাকার 'আসান্ বক্স' নামে জনৈক মুসলমান স্থপতির দ্বারা তাঁহাদের পারিবারিক কুলদেবতা গোবিন্দজীউর জন্য এই

গ্রামে নাটমন্দিরসহ একটি নবরত্ন মন্দির, জোড়বাংলা মন্দির ও দোলমঞ্চ নির্মাণ করান। ঐ সকল প্রাচীন মন্দিরাদির মধ্যে উল্লিখিত জীর্ণ মন্দিরটি ব্যতীত অন্যান্য সবকয়টি মন্দিরই সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ঐ ধ্বংসস্তূপগুলি দেখিয়া আদিতে কোনটি যে জোড়বাংলা মন্দির ছিল, কোনটি যে দোলমঞ্চ ছিল তাহা সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করিবার আজ আর কোন উপায় নাই। বর্তমান জীর্ণ মন্দিরটি খুব সম্ভবতঃ নবরত্ন মন্দির ছিল বলিয়া অনুমিত হয়; তবে উহার নবরত্নের একটি চূড়াও অবশিষ্ট নাই। মন্দিরটি জীর্ণ হইলেও ইহার নীচের দেওয়ালগুলি সুগঠিত আছে বলিয়া অদ্যাপি কালের আক্রমণকে প্রতিহত করিয়া কোনক্রমে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করিতেছে। এই ভগ্ন মন্দিরের চারিদিকের দেওয়ালগাত্রে শোভিত অপূর্ব সুন্দর পোড়ামাটির শিল্পকার্যগুলি আজিও দর্শকের মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশ্য মন্দিরের নীচের দিকের দেওয়ালগাত্র হইতে ঐ সকল পোড়ামাটির শিল্পকার্যগুলি সৌখিন দর্শকেরা যথেচ্ছাচারে ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছেন।

উল্লিখিত মন্দিরাদির ভগ্নস্তূপের নিকট একটি দালান ঘরে গোবিন্দজীউর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বর্তমানে এই ঘরেই গোবিন্দজীউর নিত্য সেবাপূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মূর্তিটি কষ্টিপাথর দ্বারা নির্মিত। ইহার শিরে শিখীপুচ্ছ, হস্তে মোহনবংশী এবং মালকোচা দিয়া বস্ত্র পরিহিত। গোবিন্দজীউ একক মূর্তি, পাশে রাধিকা নাই। ইহার চক্ষুদ্বয় কৃত্রিম অর্থাৎ খোদিত নহে; শঙ্খের উপর গালা দ্বারা চক্ষুতারকা অঙ্কন করিয়া মূর্তির গায়ে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিগ্রহের এই ত্রুটি সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী শোনা যায়; কিন্তু তাহার পূর্বে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পূর্বে গোবিন্দজীউর আর একটি মূর্তি ছিল; সেই মূর্তিটি চৌধুরী পরিবারের কাহার দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। উক্ত প্রাচীন মূর্তিটি ভগ্ন হইলে যতদূর জানা যায় মুলুক চাঁদ চৌধুরী কর্তৃক বর্তমান মূর্তিটি নির্মিত হয়। কিংবদন্তী আছে স্বপ্নাদেশ অনুসারে যমুনা নদী হইতে প্রাপ্ত একটি শিলা হইতে স্বয়ং দেব-শিল্পী বিশ্বকর্মা সাধারণ ভাস্কররূপে আসিয়া স্থানীয় জনৈক প্রামাণিকের বাড়ী রুদ্ধদ্বার গৃহে লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়া নূতন মূর্তিটি নির্মাণ করেন। মূর্তি নির্মাণকালে তিনি প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছিলেন যে, যতদিন অবধি তাঁহার মূর্তি নির্মাণ কার্য শেষ না হইতেছে ততদিন পর্যন্ত তিনি গৃহের দরজা বন্ধ রাখিবেন, ইতিমধ্যে কেহ মূর্তি দর্শন করিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন না। কিন্তু দীর্ঘদিন শিল্পীর কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া কৌতূহলবশতঃ নির্মাতা ঐ গৃহে প্রবেশ করেন, তখন কেবলমাত্র বিগ্রহের চক্ষু উৎকীর্ণ বাকি। ফলে বিগ্রহের চক্ষুদ্বয় অসমাপ্তই থাকিয়া যায়। বর্তমান পুরোহিত মহাশয় বলেন যে, বিগ্রহটি যে-পদ্মাসনের উপর দণ্ডায়মান উহার নীচে ভাস্করের নাম রামজীবন পাত্র বলিয়া খোদিত আছে। (আমরা উহা স্বচক্ষে দেখি নাই; সুতরাং উহার সত্যাসত্য সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য করিতে সক্ষম নই; কেবলমাত্র পুরোহিত মহাশয়ের উক্তিই এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল।) অপরপক্ষে জানা যায় যে, মুলুক চাঁদ চৌধুরী স্বপ্নাদেশ অনুসারে নদীয়া জেলার শিবনিবাসে রক্ষিত একটি প্রস্তর ফলক হইতে গঙ্গাধর ভাস্কর নামে জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ দ্বারা মূর্তিটি নির্মাণ করান।

গোবিন্দজীউর মধ্যাহ্নে অন্নভোগ দ্বারা নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল ও তদুপলক্ষে একটি মেলা বসে। এক সময় এখানকার দোল উৎসবে খুবই সমারোহ হইত। এখন সে সমারোহ নাই, কোনক্রমে উৎসব পালন করা হইতেছে মাত্র। উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর দোলপূর্ণিমা তিথিতে চাঁচড় ও অধিবাস অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিপদ তিথিতে গোবিন্দজীউকে নানা স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা রাজবেশে সজ্জিত করিয়া একটি নির্দিষ্ট বেদীতে (পূর্বে মন্দির ছিল) স্থাপন করিয়া যথারীতি পূজা এবং পরের দিন পূজান্তে বিগ্রহকে দোলায় স্থাপন করা হয়। ইহাভিন্ন, গোবিন্দজীউকে প্রতি বৎসর শোভাযাত্রাসহকারে একাদশী তিথিতে পা ধোয়াইতে যমুনা নদীতে, দ্বাদশী তিথিতে মধু খাওয়াইতে মল্লিকপুরের ঘাটে, ত্রয়োদশী তিথিতে কাছারীবাড়ী অর্থাৎ মাধবগঞ্জের হাটখোলা মন্দিরে এবং চতুর্দশী তিথিতে পান খাওয়াইতে শ্রীপুরের ঘাটে লইয়া যাওয়া হয়। সুদূর অতীতকাল হইতে অদ্যাবধি দোল-যাত্রা উপলক্ষে উল্লিখিত পর্বগুলি পালন করা হইতেছে। শোভাযাত্রাকালে প্রতিদিনই রাস্তায় প্রচুর আতসবাজী পোড়ান হয়। উৎসবে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় দশ হাজার নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে এবং

কীর্তন গান ও প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়। দোলযাত্রা ব্যতীত প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে গোবিন্দজীউকে কেন্দ্র করিয়া জন্মাষ্টমী পর্ব পালন করা হয়।

গোবিন্দজীউর নিত্য পূজাদির জন্য কিছু দেবোত্তর ভূ-সম্পত্তি প্রামানিক (যাহারা উৎসব উপলক্ষে পুরুষানুক্রমে যজ্ঞের কাঠ ও বালি সরবরাহ করিতেছে), বাজনাদার ও পুরোহিতদিগের মধ্যে বিলি-বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া আছে।

বর্তমান সেবায়েত শ্রীঅমূল্য চরণ চৌধুরী প্রমুখেরা কলিকাতার দমদমে বসবাস করিতেছেন। বর্তমান পূজারী শ্রীতারক প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় গত ১৯ বৎসর যাবৎ পূজারীর কার্য করিতেছেন। ইঁহারা কাশ্যপ গোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

ইছাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে বারোয়ারী দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী-পূজা, চৈত্র মাসে রক্ষাকালীপূজা ও সংক্রান্তি তিথিতে যমুনা নদীর ধারে একটি নির্দিষ্ট বেদীতে চড়ক বা দেল উৎসব এবং শীতলাপূজা হইয়া থাকে।

গোবিন্দজীউর দোলযাত্রা উপলক্ষে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথি হইতে চারদিনব্যাপী মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় চার বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলার জমি আংশিক দেবোত্তর এবং আংশিক ব্যক্তিবিশেষের। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং ইহাতে আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে মোট প্রায় দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় তেলেভাজা, ময়রা, মনিহারী, জামাকাপড়, তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ, হাঁড়ী-কলসী, খেলনা-পুতুল, মাদুর, তালপাতার পাখা, এলুমিনিয়ম ও কাঁচের বাসনপত্র, চুড়ি, কাঠের তৈয়ারী বারকোস, প্রদীপদণ্ড, বেনেমসলা, চাল, মাছ, শাকসব্জী, আবির, রং প্রভৃতি আমদানী হয়। ইহাভিন্ন, পান-বিড়ির দোকান, আইসক্রীম-সরবত, বেলুন ইত্যাদির দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ হাবড়া, গাইঘাটা, গোবরডাঙ্গা, বনগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসেন। বিক্রেতাদের নিকট খাজনা আদায় করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক, নাগরদোলা, অশ্বচক্র প্রভৃতির দল আসে এবং স্থানীয় যুবকদল থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় করেন।

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব (হরিঠাকুর)

ঠাকুরনগর উপনিবেশে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে আরম্ভ হইয়া তিনদিনব্যাপী সাড়ম্বরে মতুয়া সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু হরিঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা দেশে ও বাংলা দেশের বাহিরে তাঁহার বহু ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলী আছেন। ১৯৪৭ সালে বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুগণ এই স্থানে হরিঠাকুরের মন্দিরসহ একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার বাৎসরিক আবির্ভাব উৎসবের প্রচলন করেন। উৎসব উপলক্ষে হরিঠাকুরের অগণিত ভক্ত ও শিষ্যগণ প্রতি বৎসর ঠাকুরনগরে আশ্রমে উপস্থিত হন।

উৎসবের প্রথম দিনে অধিবাস ও হরিঠাকুরের পূজা হয় এবং পরবর্তী দিবসত্রয় প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় যথারীতি হরিঠাকুরের প্রতিকৃতি পূজা, স্নান, হোমযজ্ঞ ও অহোরাত্র ডঙ্কা নিশানসহ অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রায় পাঁচিশ হইতে ত্রিশ সহস্র ভক্ত নরনারী আসেন। উৎসবের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মসভায় বহু প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও সমাজসেবীর শুভাগমন হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, স্বনামখ্যাত ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায়, ডাঃ জীবন রতন ধর, শ্রীতারক দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীবিজয় সিংহ নাহার প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

হরিঠাকুর সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি ফরিদপুর জেলার সাফলীডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১২১৮ বঙ্গাব্দে ফাল্গুনী মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। হরিঠাকুরের আদিপুরুষ রামদাস ব্রহ্মচারী মৈথিলী ব্রাহ্মণ ও শক্তি-সাধক ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রামদাস ব্রহ্মচারী তাঁহার পত্নী রুক্মিণী দেবীসহ শ্রীধাম

নবদ্বীপে আসেন। সেখান হইতে চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন করিয়া ফিরিবার পথে তিনি যশোহর জেলায় নবগঙ্গা নদীর তীরে লক্ষ্মীপাশা গ্রামে উপনীত হন এবং সেখানে বসবাস আরম্ভ করেন। কথিত আছে, তাঁহার চিতা ভস্মের উপর বর্তমান লক্ষ্মীপাশার কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

রামদাস ব্রহ্মচারী ছিলেন অলৌকিক শক্তিধর মহাপুরুষ। অস্পৃশ্য নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের বহু নরনারীকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করায় এবং তাহাদের সহিত অবাধ সামাজিক মেলামেশা করিবার জন্য লক্ষ্মীপাশার তৎকালীন অভিজাত ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁহাকে জাতিচ্যুত করেন। কিন্তু নির্ভীক এই মহাপুরুষ তাহাতে বিচলিত না হইয়া বরং তাহার পুত্র চন্দ্রমোহন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে এক নমঃশূদ্র কন্যার সহিত বিবাহ দেন।

চন্দ্রমোহনের অধস্তন পঞ্চমপুরুষ যশোবন্ত ঠাকুরের প্রথম পুত্রের জন্মের নয় বৎসর পর্যন্ত আর কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় নাই। শাস্ত্রে আছে, যাঁহার একপুত্র তিনি অপুত্রক বলিয়া গণ্য হন। এজন্য যশোবন্তের সাধ্বী পত্নী অন্নপূর্ণা দেবী সর্বদা সাধুসন্ন্যাসীর চরণ পূজা ও সেবা করিয়া দ্বিতীয় পুত্রলাভের কামনা করিতেন। একদা ফরিদপুর জেলার মুগডোবা গ্রাম নিবাসী রাধাকান্ত গোস্বামী নামে এক মহাপুরুষ যশোবন্তের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। অন্নপূর্ণা দেবী যথারীতি তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া পুত্রের কামনা করেন। মহাপুরুষ তাহার সেবায় প্রসন্ন হইয়া নিজের ভিক্ষার ঝুলি হইতে প্রস্তর নির্মিত বাসুদেব বিগ্রহ বাহির করিয়া অন্নপূর্ণা দেবীর ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বর প্রদান করেন—"এই বাসুদেব যথাকালে তোমার গর্ভে সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিবে।" মহাপুরুষের বরে যথাসময়ে অন্নপূর্ণা দেবীর একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অন্নপূর্ণা দেবীর ঐ কনিষ্ঠ পুত্র হরিচাঁদ পরবর্তীকালে হরিঠাকুর নামে খ্যাত হন।

শিশুকালেই হরিচাঁদের অঙ্গে নানা শুভ লক্ষণ দেখিয়া পিতা যশোবন্ত পুত্রের শিক্ষাদীক্ষার যথোচিত সুব্যবস্থা করেন। বাল্যকালে হরিচাঁদ রাখাল বালকগণের সহিত খেলাধূলা ও বনে বনে ধেনু চরাইয়া আনন্দলাভ করিতেন। রাখাল বালকেরা তাঁহাকে "রাখাল রাজা" বেশে বনফুলে সাজাইয়া দিত। একদা হরিচাঁদের খেলার সাথী বিশ্বনাথ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন—

"নিদানের কর্তা আমি
বিশাহর কি করিবে তুচ্ছ ভেদ বমি ?"

সত্যই হরিচাঁদ অলৌকিক শক্তিবলে তাঁহার খেলার সাথীকে রোগমুক্ত করেন। অপর একদিন গোচারণকালে হরিচাঁদ যখন 'হিজলিকা' বৃক্ষের তলায় বসিয়াছিলেন সেই সময় এক বিষধর সর্প দীর্ঘ ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহার শিরোপরি বিরাজ করিতে থাকে। তাঁহাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া রাখালবালকগণ ভয়ে ও আতঙ্কে চীৎকার করিয়া হরিচাঁদকে স্থান ত্যাগ করিতে বলে; কিন্তু ইহাতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। সর্প আপন মনে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। হরিঠাকুর সম্পর্কে এরূপ বহু কিংবদন্তী শোনা যায়।

যৌবনে তিনি দারপরিগ্রহ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্মে মনোনিবেশ করেন এবং সংসার পরিচালনার জন্য কৃষিকার্য ও ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সহিত জীবিকার্জন করিয়া তিনি আদর্শ গৃহীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই সময় স্থানীয় জমিদারের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তিনি স্বগ্রাম সাফলীডাঙ্গা পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে নিকটবর্তী ওড়কান্দি (ফরিদপুরে) গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এই স্থানে গুরুচাঁদ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার এই পুত্র উত্তরকালে শক্তিমান সাধকরূপে খ্যাতিলাভ করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়আশয়ে হরিঠাকুরের বিতৃষ্ণা আসে। এই সময় তিনি বৈষয়িক কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আত্মদর্শন ও আত্মোপলব্ধির কার্যে মনোনিবেশ করেন। এই সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, একদা হরিঠাকুর সন্ধ্যাবেলায় গ্রামের হাট হইতে একাকী গৃহে ফিরিবার পথে নির্জন প্রান্তরে এক বকুল বৃক্ষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। সেই সময়ে তিনি এক দৈববাণী শ্রবণ করেন,—"ওহে তুমি যে ক্ষীরোদের হরি। সংসারের তুচ্ছ কর্ম লইয়া কি কারণে কাল কাটাইতেছ?" এই বাণী শ্রবণমাত্র হরিঠাকুর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং ঐ স্থানে সারারাত্রি সমাধিস্থ অবস্থায় কাটাইয়া দেন। পরদিন প্রাতে লোকজন আসিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া যান। এই ঘটনার পর হরিঠাকুর অধিকাংশ সময় সাধনভজনে ও

ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন এবং শিষ্য পরিবৃত হইয়া সর্বদা শাস্ত্রচর্চা ও ধর্মালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। কখন কখন ভক্তগৃহে গমনপূর্বক হরিনাম কীর্তন ও মহোৎসবে যোগদান করিয়া নানা অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতেন। তাঁহার করুণায় পুত্রহীনের পুত্রলাভ, অন্ধের দৃষ্টিলাভ ও দুরারোগ্য ব্যাধির উপশমের বহু অপূর্ব কাহিনী প্রচলিত আছে। শোনা যায় পুরীধাম হইতে মহাপ্রভুর প্রত্যাদেশ পাইয়া দুইজন পাণ্ডা সুদূর ওড়কান্দি গ্রামে হরিঠাকুরের জন্য ভোগের প্রসাদ আনিয়াছিলেন। হরিঠাকুরের লীলা প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে গিয়া স্বতঃই মনে হয়,—

"এমনি হরির অহেতু করুণা প্রেমের এমনি যাদু
কয়লা হৃদয় গলি হীরা হয় তস্করও হয় সাধু।"

ভক্তকবি রসরাজ তারক চন্দ্র সরকার কৃত "শ্রীশ্রীহরি-লীলা-খণ্ড" গ্রন্থে এই মহাপুরুষের জীবনী ও লীলা প্রসঙ্গ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

হরিঠাকুরের প্রবর্তিত ধর্মাচরণে কোন জটিল ক্রিয়াকাণ্ডের স্থান নাই। তাঁহার ধর্ম সহজ, সরল ও বাস্তব। গৃহস্থ জীবনে পূর্ণ শান্তি লাভ করাই তাঁহার জীবনের মূল শিক্ষা। "গৃহধর্ম পবিত্রতর দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন"—এই মহাসত্য উপলব্ধি করিয়া ঠাকুর বলিতেন—

"করিবে গৃহস্থ ধর্ম লয়ে নিজ নারী।
গৃহে থেকে ন্যাসী, বাণপ্রস্থী ব্রহ্মচারী॥
পরনারী মাতৃবৎ মিথ্যা নাহি কবে।
পর দুঃখে দুঃখী সদা সচ্চরিত্র রবে॥
গৃহেতে থাকিয়া যার হয় ভাবোদয়।
সেই সে পরম সাধু জানিও নিশ্চয়॥"

হরিঠাকুরের শিষ্যগণ 'হরিনাম' মন্ত্রে দীক্ষিত এবং সর্বদা হরিনামে মাতোয়ারা বলিয়া তাঁহার ভক্তসম্প্রদায় 'মতুয়া' নামে খ্যাত। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এবং আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার কিয়দংশে হরিঠাকুরের ধর্মমত প্রচলিত আছে। হরিঠাকুর স্বয়ং ভক্তবৃন্দের সহিত নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে ২৩শে ফাল্গুন বুধবার প্রাতঃকালে হরিঠাকুর দেহরক্ষা করেন। দেহরক্ষার অব্যবহিত পূর্বে তিনি তাঁহার শোকাকুল সমবেত ভক্তগণকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন,—

"আমি নাহি ছেড়ে যাব জানিও বিশেষ,
গুরুচাঁদ দেহে এই করিনু প্রবেশ।"

তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র গুরুচাঁদ 'মতুয়া' সম্প্রদায়ের গুরুপদে অভিষিক্ত হন এবং পিতার ধর্মমত প্রচারে ব্রতী হন। অধুনালুপ্ত "অনন্ত বিজয়" পত্রিকার মাধ্যমে কিছুকাল এই ধর্মমত প্রচার করা হয়। পরে হরিঠাকুরের সুযোগ্য প্রপৌত্র ও দেশবরেণ্য নেতা শ্রী পি, আর, ঠাকুর মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় 'ঠাকুরনগর পত্রিকার' মাধ্যমে মতুয়া সম্প্রদায়ের ধর্মমত প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা (হরিঠাকুর)

ঠাকুরনগর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুনী মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে হরিঠাকুরের মন্দির সংলগ্ন বিস্তৃত জমিতে একটি মেলা বসে। মেলার জমি শ্রী পি, আর, ঠাকুর মহাশয়ের। আসলে মেলাটি হরিঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে বসিলেও এইদিন বারুণীস্নানের যোগহেতু মেলাটি বারুণীস্নানের মেলা বলিয়া পরিচিত। পূর্বে হরিঠাকুরের জন্মভূমি ফরিদপুর জেলার সাফলীডাঙ্গা গ্রামে ঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে মেলা বসিত। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত হরিঠাকুরের ভক্তবৃন্দ ঠাকুরনগর উপনিবেশে হরিঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পুনরায় এই স্থানে মেলার প্রচলন করেন। মেলাটি গত দশ বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং তিনদিনব্যাপী স্থায়ী হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম হইতে মেলায় প্রায় ত্রিশ সহস্র নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে।

মেলায় প্রায় পাঁচশত দোকানপাট বসে এবং কিছু সংখ্যক ফেরিওয়ালা আসেন। প্রধানতঃ বনগ্রাম, বারাসত,

হাবড়া এবং কলিকাতা হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই বিক্রেতাগণ আসিয়া থাকেন। অস্থায়ী চালাঘর বাঁধিয়া মেলায় দোকানগুলি বসে। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, মনিহারী, তেলেভাজা, কাপড়চোপড় প্রভৃতি দোকানপাটের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, তামা, পিতল, লোহা ও কাঁচের বাসনপত্র, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির খেলনা, হাঁড়িকুড়ি, বই-ছবি, কবিরাজী ঔষধপত্র এবং শাকসব্জী ও চা-পান-বিড়ি প্রভৃতির দোকান-পাটও বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য মেলায় সার্কাস, ম্যাজিক, নাগরদোলা এবং গ্রামের যুবক সম্প্রদায় কর্তৃক থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মেলায় জনসমাগম ও দোকানপাট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া জানা যায়।



থানা ঃ স্বরূপনগর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ কপিলেশ্বরপুর। ২৫৫৭৩'৮৬৷১৭৫৷১,০৩১

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে পাঁচ মাইল দূরে গোবরডাঙ্গা রেলস্টেশন। নৌকাযোগেও গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ও মাঘীপূর্ণিমার স্নান এবং চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব।

(ঙ) মাঘীপূর্ণিমার স্নানের মেলা। মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথি হইতে পনরদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে চড়কপূজার নির্দিষ্ট স্থান, কালীর স্থান এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি মসজিদ্ ঘর ও তৎসংলগ্ন একটি ঈদ্‌গা আছে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী রায়, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ কপিলেশ্বরপুর, ২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ ঘোলা। ২৮৷৫৩৩২৩৷১৫০৷৮৮৩

(ক) পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈষ্ণকাপালী ও মুসলমান। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন গোবরডাঙ্গা হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। গ্রামটি ইছামতী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমায় 'যমুনার মেলা' নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে দুর্গামূর্তির ন্যায় যমুনা দেবীর মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। এইদিন যমুনা নদীতে বহু নরনারী পুণ্যস্নান করেন।

(ঙ) মাঘীপূর্ণিমাস্নান উপলক্ষে মেলা। মাঘীপূর্ণিমা তিথি হইতে একমাসব্যাপী। প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মনসা, শীতলা এবং বনবিবির নির্দিষ্ট স্থান আছে। জনৈক ফকির বনবিবির পূজা করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ মণ্ডল, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ সুবিদপুর,
পোঃ রামনগর ভায়া খাটুরা, ২৪ পরগণা।

৩। গ্রাম ঃ বারঘরিয়া (মৌজা ঃ গোপালপুর)। ৩৪৷১,০৫০'৬৪৷৩৬৮৷২,১৫৯

(ক) গোপ, মাহিষ্য, নাপিত ও কামার। গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মসলন্দপুর হইতে মোটরযোগে গ্রামে পৌছানো যায়। গ্রামের পশ্চিম তীরে ইছামতী নদী প্রবাহিত বলিয়া নৌকায় যাতায়াতেরও সুবিধা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং অগ্রহায়ণ মাসের যে কোন মঙ্গলবারে একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে ঘট স্থাপন করিয়া চণ্ডীদেবীর পূজা হয়।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) কথিত আছে গ্রাম পত্তনের আদিতে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বারো ঘর গৃহস্থ আসিয়া এইস্থানে বসবাস স্থাপন করেন বলিয়া গ্রামের নাম বারোঘরিয়া হইয়াছে।

শ্রীহেম নাথ দাশ, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ বারঘরিয়া, ২৪-পরগণা।

৪। গ্রাম ঃ গলদহা। ৪১৷৫৯৪'৫০৷২৪৭৷১,৪১২

(ক) পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, গোয়ালা, নাপিত, রুইদাস, নমঃশূদ্র ও মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মসলন্দপুর। বসিরহাটগামী মোটরবাসে গ্রামে পৌছানো যায়। গ্রামের নিকটবর্তী ইছামতী নদীতে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী-পূজা এবং চান্দ্রমাস হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম ও ইদুজ্জোহা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীঅন্নদাচরণ সরকার, শিক্ষক,
গ্রাম : গজদহা, পোঃ আটুরিয়া, ২৪-পরগণা।

৫। গ্রাম : ছোট বাঁকড়া। ৪২।৬২৫।২২।৩৫২।১,৮১৬

(ক) ব্রাহ্মণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, রাজবংশী, বাগ্দী, তাঁতি, রুইদাস ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) বসিরহাট-স্বরূপনগর রাস্তায় আটুরিয়া হইতে জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া এই গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ তিনদিনব্যাপী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত তারকনাথ শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে বৈদ্যনাথ মণ্ডল নামে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তারকনাথ শিবের পূজা ও গাজন উৎসবের প্রচলন করেন। তদবধি এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। উৎসবের প্রথম দিনে যথারীতি পূজা ও হোম, দ্বিতীয় দিনে পূজান্তে শিবকে লইয়া আশে-পাশের গ্রাম পরিক্রমা এবং তৃতীয় দিনে পূজা ও হোম হয়। উৎসব উপলক্ষে অনেকে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। শিবের সেবায়েত জাতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এবং পূজারী ব্রাহ্মণ। শিবের নিত্য পূজা হয়; তবে প্রতি সোমবার বিশেষ পূজা হইয়া থাকে।

(ঙ) শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা। চৈত্র মাসে তিন-দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মাটির ঘরে তারকনাথ শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। ইহাভিন্ন, একটি পঞ্চানন্দ ও ছয়টি শীতলা আছে।

শ্রীকালীপদ হালদার, শিক্ষক,
গ্রাম : ছোট বাঁকড়া, পোঃ বড় বাঁকড়া,
২৪-পরগণা।

৬। গ্রাম : কৈজুড়ী। ৬২।৬৯৮।২০।৫৯৬।৩,৫০৯

(ক) ব্রাহ্মণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কামার, কুমার, নাপিত, রাজবংশী, নমঃশূদ্র, যোগী ও রুইদাস। গ্রামে মোট পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মসলন্দপুর হইতে প্রায় চার মাইল দূরে আটুরিয়া হইয়া মোটরবাস চলাচল করে। ইহা ব্যতীত বর্ষায় নৌকাযোগে এবং অন্যান্য সময় গরুর গাড়ীতে গ্রামে পৌছানো যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে নামকীর্তন মহোৎসব, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি ব্যক্তিবিশেষের ও একটি সাধারণের কালীমন্দির, একটি দুর্গামণ্ডপ, তিনটি আখড়া ও পঞ্চানন্দ, শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেবদেবী আছে।

শ্রীরাধারমণ সরকার, শিক্ষক,
গ্রাম : কৈজুড়ী, ২৪-পরগণা।

চারঘাট (মৌজা নং ২৯)—বর্তমান স্বরূপনগর থানার চারঘাট গ্রামটি প্রাচীন কুশদহের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। শিয়ালদহ-বনগ্রাম রেলপথে মসলন্দপুর রেলস্টেশন হইতে প্রায় চার মাইল দূরে গ্রামটি অবস্থিত। এই স্থানে যমুনাগর্ভে 'হুরে শুঁড়ীরদহ' ও নদী তীরে পীর ঠাকুরবর নামে জনৈক পীরের একটি আস্তানা আছে। পীর ঠাকুরবরের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে গ্রামে নানা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। পীর ঠাকুরবর প্রথমে হিন্দু ছিলেন পরে মুসলমান হন। তিনি চিরকুমার ছিলেন এবং হিন্দু সন্ন্যাসীর মত গোপনে সাধন-ভজন করিতেন বলিয়া পীর ঠাকুরবর নামে খ্যাত হন। চারঘাটে তাঁহার সমাধিস্থানে প্রত্যহ মুসলমান খাদেম ফুল-বেলপাতা অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার পূজা করেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পীর ঠাকুরবরের আস্তানায় হাজত দিয়া থাকেন।

পীর ঠাকুরবর সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি ব্রাহ্মণ-নগরের রাজা মুকুট রায়ের পুত্র ছিলেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত লাউজনি গ্রাম প্রাচীন ব্রাহ্মণনগর নামে পরিচিত ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এই স্থানটি কপোতাক্ষ নদের পূর্ব তীরে অবস্থিত এবং পূর্বে ইহার দক্ষিণদিক দিয়া হরিহর নদ প্রবাহিত হইত। মাধবাচার্য ও

কৃষ্ণরাম দাসের "রায়মঙ্গল" কাব্য এবং 'কালুগাজী ও চম্পাবতী" নামক পুঁথি হইতে জানা যায় যে, মুসলমান গাথা-সাহিত্যের অন্যতম নায়ক বিরাটনগরের অধিপতি সিকন্দর শাহের পুত্র গাজী সুন্দরবনের ব্যাঘ্রের সাহায্যে ব্রাহ্মণনগর অধিকার করিয়া মুকুট রায়ের সুন্দরী কন্যা চম্পাবতীকে বিবাহ করেন। মুকুট রায়ের সেনাপতি মহাবীর দক্ষিণ রায় গাজীর প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রবল যুদ্ধ করেন, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া সুন্দরবন অভিমুখে পলায়ন করেন এবং পরে গাজীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সুন্দরবনের একাংশের আধিপত্য লাভ করেন। দক্ষিণ রায় পরে বনদেবতার পদে উন্নীত হন এবং নানা স্থানে তাঁহার পূজার প্রবর্তন হয়। চব্বিশ পরগণার ধপধপি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ রায়ের বিশাল মূর্তি পূজা হয়। বিরাটনগর কোথায় ছিল তাহা নির্নীত হয় নাই। গাথা-সাহিত্যে গাজী সিকন্দর শাহের পুত্ররূপে বর্ণিত হইলেও কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তিনি সপ্তগ্রাম বিজয়ী জাফর খাঁর পুত্র এবং ইঁহার প্রকৃত নাম বরখান গাজী। গাথা-সাহিত্যের নানা স্থানে ইনি বড় খাঁ গাজী নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণনগরের রাজা মুকুট রায়ের সাত পুত্র ও চম্পাবতী নামে একটি মাত্র কন্যা ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, রূপকথায় উল্লিখিত 'সাত ভাই চম্পা' ও এই চম্পাবতী অভিন্না। মুকুট রায় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সবংশে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং গাজীর সহিত চম্পাবতীর বিবাহ দেন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কামদেব পলাইয়া গিয়া গোবরডাঙ্গার নিকটবর্তী চারঘাটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কামদেব পরে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং পীর ঠাকুরবর নামে প্রসিদ্ধ হন। ইনি প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন। কথিত আছে হরেকৃষ্ণ সাহা বা 'হরে শুড়ী' নামক এক ব্যক্তি তাঁহার কৃপালাভ করিয়া ব্যবসায় প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন; কিন্তু পরে গর্বিত হইয়া পীর সাহেবকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে, তাঁহার অভিশাপে হরেকৃষ্ণ সাহা নৌকা সমেত যমুনা গর্ভে নিমজ্জিত হন। তদবধি উক্ত স্থান 'হরে শুড়ীরদহ' নামে পরিচিত।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

কৈজুড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব উপলক্ষে গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে মাঠের ধারে একটি প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন এবং মাত্র একদিন স্থায়ী হয়। সাধারণতঃ বৈকালের দিকে মেলায় লোক-সমাগম ও বেচাকেনা হয়। এই মেলাটি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। মেলায় নিকটবর্তী বাঁকড়া, বাজিতপুর, স্বরূপনগর ও বিহারী প্রভৃতি ইউনিয়ন এবং দশ-বার মাইল দূরবর্তী অঞ্চল হইতে মোট প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ গরুর গাড়ী,সাইকেল ও পদব্রজে আসিয়া থাকেন।

বিক্রেতারা প্রতি বৎসর বাঁকড়া, বাদুরিয়া, আটুরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসেন। মেলায় প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকান বসে এবং চার-পাচ জন ফেরিওয়ালাও আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত, লোহা ও মাটির জিনিসপত্রের দোকান, বই-ছবির দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলো ও চাঙ্গারী ইত্যাদির দোকানপাট বসিয়া থাকে। মেলায় আমোদপ্রমোদের কোন ব্যবস্থা নাই।

ছোট বাঁকড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে তারক-নাথের শিবের গাজন উপলক্ষে মন্দিরের সম্মুখে দেবোত্তর ও ব্যক্তিবিশেষের প্রায় চার বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি তিনদিনব্যাপী চলে এবং সাধারণতঃ বৈকালের দিকে মেলায় লোকসমাগম হয়। ইহা প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্বরূপনগর, রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট দুই-তিন হাজার নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে। যাত্রীরা সাধারণতঃ পদব্রজে, রিক্সায় ও গরুর গাড়ীতে আসেন।

সংগ্রামপুর, কাটিয়া, আটুরিয়া, স্বরূপনগর, গোকুলপুর, গোয়ালদাহ, বড় বাঁকড়া ইউনিয়ন ও অন্যান্য গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতা ও ফেরিওয়ালা আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত, মনিহারী দোকান, মাটির খেলনা-পুতুল ও হাঁড়িকুঁড়ির দোকান, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলা ইত্যাদির দোকানপাট বসিয়া থাকে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য প্রতি বৎসর মেলায় কবিগান ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। গ্রামেই যাত্রাদল আছে, অধিকারীর নাম—শ্রীবীরেন্দ্র নাথ মণ্ডল। ইহাভিন্ন, মেলায় জুয়া ও লটারী খেলা হয়।

পুণ্যস্নান উপলক্ষে মেলা
(মাঘীপূর্ণিমাস্নান)

কপিলেশ্বর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমার স্নান উপলক্ষে গ্রামের দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত যমুনা নদীর তীরে পনরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং ইহাতে প্রধানতঃ স্বরূপনগর, গাইঘাটা, বাদুরিয়া প্রভৃতি থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে মোটরবাস, নৌকা ও পদব্রজে যাত্রীরা আসিয়া থাকেন।

বিক্রেতারা প্রধানতঃ বনগ্রাম ও বসিরহাট মহকুমা হইতে প্রতি বৎসর আসেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকানের সংখ্যাই অধিক। ইহাভিন্ন, কাঁসা-পিতলের বাসনকোসন, মাটির হাঁড়ি-কলসী-পুতুল, কৃষিযন্ত্রপাতি, বই-ছবি, ঔষধ-পত্র, মনিহারী দ্রব্য এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী নানাবিধ শিল্পসামগ্রী আমদানী হইয়া থাকে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

ঘোলা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে 'যমুনা মেলা' উৎসব উপলক্ষে যমুনা নদীর উভয় তীরে গ্রামবাসীদের প্রায় পঁচিশ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি এক মাস স্থায়ী হয় এবং ইহা প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং স্থানীয় অঞ্চলে ইহা যমুনার মেলা নামে খ্যাত। মেলায় নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল ও বসিরহাট, বারাসত প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে গড়ে প্রায় পনর-কুড়ি হাজার নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। হিন্দুদের উৎসব হইলেও অহিন্দুরা মেলায় আসিয়া থাকেন। যাত্রীরা সাধারণতঃ পদব্রজেই আসেন।

বিক্রেতাগণ বসিরহাট, বাদুরিয়া, খোলাপোতা, বারাসত, গোবরডাঙ্গা, স্বরূপনগর, বনগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। মেলায় দোকান-পাটের মোট সংখ্যা প্রায় দুইশত এবং ফেরিওয়ালার সংখ্যা ত্রিশজন। অধিকাংশ দোকানই খোলা জায়গায় বসে। সমস্ত দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকানের সংখ্যাই অধিক। ইহা ব্যতীত, মনিহারী দোকান, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনার দোকান, জুতার দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, বই-ছবির দোকান, কবিরাজী, হাকিমী ও টোটকা ঔষধপত্রের দোকান, বাঁশের ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলো, ঝুড়ি, চ্যাঙ্গারী প্রভৃতি দোকানপাট বসিয়া থাকে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান ও তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিক দল আসে এবং জুয়া খেলা হয়। কোন কোন বৎসর কবিগান, সিনেমা, যাত্রাভিনয় ও তরজাগানেরও ব্যবস্থা করা হয়। কলিকাতার প্রসিদ্ধ পেশাদারী যাত্রাদল আসে।

মেলায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দল ও পুলিশবাহিনী বিশেষ সাহায্য করেন

থানা ঃ বাদুরিয়া

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ আটলিয়া। ৩২।৩৬০.৫০।১৬৬।৮২৫

(ক) মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মৎস্য ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে সাত মাইল দূরে মসলন্দপুর রেলস্টেশন। স্টেশন হইতে পাঁচ মাইল মোটরবাসে এবং দুই মাইল রাস্তা হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) বড়পীর নামে খ্যাত মহম্মদ আবদুল কাদের জিলানী একদা এই গ্রামে আসিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতি স্মরণ উপলক্ষে প্রতি বৎসর ২৮শে কার্তিক হইতে আটদিনব্যাপী একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) বড়পীরের স্মরণোৎসব উপলক্ষে মেলা। প্রতি বৎসর ২৮শে কার্তিক হইতে আটদিনব্যাপী। মেলাটি তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে বড়পীরের একটি দরগাহ আছে।

এই স্থানের মাটি অতিরিক্ত এঁটেল বলিয়া গ্রামটির নাম আটলিয়া হইয়াছে এই রকম অনুমান করা হয়।

শ্রীরমলা কান্ত রায়চৌধুরী, গ্রামসেবক,
গ্রাম ঃ রামচন্দ্রপুর, পোঃ তেঁতুলিয়া,
২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ আটঘরা। ৩৬।৯৩৫.২৭।২৬৬।১,৫৫১

(ক) ব্রাহ্মণ, সৎচাষী, কাহার, কামার, পোদ ও মুসলমান। গ্রামটি মুসলমান প্রধান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে। যেমন—মুসলমানপাড়া, হিন্দুপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য, পশুপালন ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মসলন্দপুর হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। রুদ্রপুর ও বাদুরিয়া হইতে মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, চৈত্র মাসে চড়ক এবং মনসাপূজা হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন এবং সর্বজনীন। গ্রামের হাজরাতলায় একটি বৃক্ষের নীচে উল্লিখিত পূজা-পার্বণগুলি অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক সাড়ম্বরে মহরম ও ফতেহা-দোয়াজ-দাহাম উৎসব পালিত হয়। ফতেহা-দোয়াজ-দাহাম উপলক্ষে হজরত মহম্মদের জীবনী ও তাঁহার নানা সদগুণের ব্যাখ্যা এবং ধর্মালোচনা করা হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে হাজরাতলায় হিন্দুদিগের পূজার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। ইহা ব্যতীত, গ্রামে একটি শীতলা ও মনসার স্থান আছে।

শ্রীফজলে করিম, শিক্ষক,
আটঘরা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বৃগাছি, ২৪-পরগণা।

৩। গ্রাম ঃ আন্ধারমাণিক। ৪৩।৩৩৯.১৯।

(শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, জেলেপাড়া, কাপালীপাড়া, মণ্ডলপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মসলন্দপুর। হাবড়া রোড দিয়া নিয়মিত মোটরবাস যাতায়াত করে। ইছামতী নদীর সহিত সংযুক্ত এই গ্রাম সংলগ্ন মাসকাটা খাল দিয়া নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) সাহাচাঁদ পীরের উরস্ উপলক্ষে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রায় কুড়িদিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সাহাচাঁদ পীরের জীবনী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে শোনা যায় যে, তিনি সুদূর আরব হইতে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এই দেশে আসেন। তিনি বহু দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় করিতে পারিতেন এবং তাঁহার সাদাসিধা জীবনযাত্রা ও অনুপম চরিত্রের জন্য বহু লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তিনি দেহরক্ষা করিলে এই স্থানে তাঁহার তিরোভাব উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে সাহাচাঁদ পীরের আত্মার শান্তি কামনা এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কোরাণ পাঠ ও ভক্তরা 'হাজত' করিয়া

থাকেন। নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় এই উৎসবে যোগদান করেন। উৎসবটি পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) সাহাচাঁদ পীরের উরস্ উপলক্ষে মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে পনরদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে সাহাচাঁদ পীরের একটি মাজার শরীফ ও তৎসংলগ্ন একটি দরগাহ আছে।

গ্রামটির পূর্ব নাম কৃষ্ণপুর। শোনা যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই গ্রামের নাম পরিবর্তন করিয়া আঁধারমাণিক নামকরণ করেন। আরো শোনা যায় যশোহর রাজবংশের রাজা কচুরায় কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ পরিবারসহ এই গ্রামে স্বয়ং বসতি স্থাপন করেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র কর, গ্রামসেবক,
ব্লক ডেভেলমেন্ট অফিস, বাদুরিয়া,
২৪-পরগণা।

৪। গ্রাম ঃ তারাগুনিয়া। ৮৫।৯৭৮'৩৫।
(শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, বৈশ্যকাপালী, জেলে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কামার, নাপিত, কুমার, বারুজীবি, ছুতার, গোয়ালা, শাঁখারী, কাহার, হাড়ী, রুইদাস, যোগী, গন্ধবণিক ও মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরি ও ব্যবসায়।

(গ) কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে ৭৯ এ বাস রুটে বাদুরিয়া হইয়া অথবা হাবড়া-বসিরহাট ৮২ নং বাস রুটেও গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বারুণীর স্নান অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন। স্থানীয় নাগবংশের কেশব চন্দ্র নাগচৌধুরী মহাশয় এই উৎসবের প্রবর্তন করেন এবং অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণের তত্ত্বাবধানে এই উৎসব পালিত হইতেছে। উৎসবের দিন গঙ্গাদেবীর মূর্তি পূজা করা হয়।

তাহাছাড়া, মুসলমান সম্প্রদায় স্থানীয় রওশন বিবির দরগায় প্রতি বৎসর সবেবরাত উৎসবের দিন তাঁহার আবির্ভাব উৎসব পালন করেন।

(ঙ) বারুণীস্নানের মেলা। চৈত্র মাসে দশদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা আনন্দময়ীকালী নামে খ্যাত। কালীমন্দির সংলগ্ন একটি শিবমন্দিরে চার ফুট উচ্চ একটি কৃষ্ণপাথরের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামের আর একটি মন্দিরেও শিবলিঙ্গ আছে।

অতীতে এই গ্রামের পূর্ব প্রান্ত দিয়া ইছামতী প্রবাহিত ছিল। এই নদী এতই প্রশস্ত ছিল যে, সারাদিনে একবারের বেশী খেয়া নৌকা পারাপার করা সম্ভব হইত না। খেয়ার পাটুনি ভোরে কাকের ডাক শুনিয়া নৌকা ছাড়িত এবং সন্ধ্যায় আকাশে তারা দেখিয়া এপারে আসিয়া পৌছাইত। জনশ্রুতি আছে এই কারণেই নাকি গ্রামের অপর পারের নাম কাকডাকা হইতে কাকডাঙ্গা এবং এপারের গ্রামের নাম তারাগোনা হইতে তারাগুনিয়া হইয়াছে।

তারাগুনিয়া গ্রাম সম্পর্কে আর একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, রওশন বিবি নাম্নী এক ধর্মপ্রাণা মহিলা বহুকাল পূর্বে সুদূর বাগদাদ হইতে বাংলাদেশে আসেন। একদা নৌকাপথে যাত্রাকালে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং নিজের অন্তিম অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অনুচরবর্গকে বলেন যে, যে-স্থানে দিনান্তে পশ্চিমাকাশে তারা দেখা যাইবে সেই স্থানে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবেন এবং তখন তাঁহাকে যেন নিকটবর্তী স্থানে সমাধিস্থ করা হয়। এই গ্রামের নিকট আসিয়া রওশন বিবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন এবং তাঁহার অনুচরগণ এই স্থানে নদীর তীরে কবর খনন করিয়া রওশন বিবির দেহ সমাহিত করেন। সেই সময় হইতেই গ্রামের নাম হয় 'তারাগুনিয়া'।

বাদুরিয়া এল্. এম্. এস্. ই. স্কুলের প্রধান শিক্ষক,
ও
শ্রীগোপাল চন্দ্র কর, গ্রামসেবক,
ব্লক ডেভেলমেন্ট অফিস, বাদুরিয়া,
গ্রাম ও পোঃ বাদুরিয়া, ২৪-পরগণা।

৫। গ্রাম ঃ পিয়াড়া। ৯৪।৮৮৮'৩৩।৩৮৯।২,৩০১

(ক) রাজবংশী, তিয়র, রুইদাস, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নাপিত, কামার, কুমার, বৈশ্যকাপালী ও মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে অথবা শিয়ালদহ-

বনগ্রাম রেলপথে বারাসত স্টেশন হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ভগবতীপূজা, ভাদ্র মাসে মনসাপূজা ও বিশ্বকর্মাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব ও চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাছাড়া, গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় চান্দ্রমাস অনুযায়ী মহরম, ঈদলফেতর, ঈদোজ্জোহা, সবেবরাত, ফতেহা-দোয়াজ-দাহাম ও ফতেহা-ইয়াজ দাহাম উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি বারোয়ারীতলায় হিন্দুদের উল্লিখিত অধিকাংশ উৎসবগুলি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ মণ্ডল, শিক্ষক,
গ্রাম : পিয়াড়া, পোঃ গন্ধকপুর,
২৪-পরগণা।

৬। গ্রাম : আটুরিয়া। ১০।১।১,২২১'০২।৩৮-২।২,৭৭৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নাপিত, যাদব, তিয়র, মুচি, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কাপালী, বারুই, যোগী, জেলে, বেনে, কামার, কুমার, মুসলমান প্রভৃতি। গ্রামে মোট সতরটি পাড়া আছে। যথা—ব্রাহ্মণপাড়া, কায়স্থপাড়া, তিয়রপাড়া, মুচিপাড়া, কায়পুত্রপাড়া, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়পাড়া, কাপালীপাড়া, বারুইপাড়া, যোগীপাড়া, জেলেপাড়া, বেনেপাড়া, সোনার-বেনেপাড়া, কামারপাড়া ও কুমারপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) বসিরহাট-স্বরূপনগর রাস্তায় ৮৪ নং বাস রুটে গ্রামে যাতায়াত চলে। গ্রামের নিকটবর্তী পোলতা খাল দিয়া নৌকা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে নামসংকীর্তন মহোৎসব, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে বাস্তুপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব ও চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি সবজনীন। মহোৎসব, রথযাত্রা ও দুর্গোৎসব প্রায় ষাট বৎসরের এবং দোল ও চড়কপূজাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। গ্রামের যোগী সম্প্রদায় কর্তৃক একটি শিবপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাভিন্ন, স্থানীয় মুসলমানগণ একটি পীরের উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে হিন্দুদিগের দেবদেবী পূজার নির্দিষ্ট স্থান ও মুসলমানদের দুইটি ঈদগা আছে।

শ্রীমৃণাল কান্তি মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক,
আটুরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : আটুরিয়া, ২৪-পরগণা।

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব (বড়পীর)

আটলিয়া গ্রামে বড়পীর নামে খ্যাত মুসলমান সম্প্রদায়ের একজন ধর্মগুরু মহম্মদ আবদুল কাদের জিলানী সাহেব ধর্ম প্রচারের জন্য দেশভ্রমণে বাহির হইয়া এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন এবং গ্রাম পরিত্যাগকালে তিনি তাঁহার ব্যবহৃত হাতের যষ্টিটি রাখিয়া যান। উহার কিছুদিন পরে রুইদাস সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং প্রতি বৎসর ২৮শে কার্তিক (ঐ তারিখে বড়পীর এই গ্রামে শুভাগমন করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়) যে-স্থানে বড়পীর অবস্থান করিয়াছিলেন সেই স্থানে হাজত পূজা ও বনভোজনের আয়োজন করেন। ক্রমেই গ্রামের লোক এবং আশেপাশের গ্রামবাসী এই বনভোজন উৎসবে যোগদান করিতে থাকেন। কিন্তু ইহার পর উৎসবটির পরিচালনা ভার ক্রমে মুসলমান ফকিরদের হাতে চলিয়া যায়। তাহারা এই স্থানে একটি পীরের দরগাহ নির্মাণ করেন এবং প্রতি বৎসর ২৮শে কার্তিক হইতে আটদিনব্যাপী সাড়ম্বরে উৎসবের ব্যবস্থা করেন। উৎসব উপলক্ষে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু নরনারীর এবং সাধু-

সন্ত ও ফকিরের সমাগম হয়। যাত্রীরা পীরের দরগাহে মানতপূজা দেন ও দরিদ্রদের দান খয়রাত করিয়া থাকেন। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন। ফকিরদের মধ্যে মহম্মদ এলাবক্সের সময়েই বড়পীরের খ্যাতি ও মাহাত্ম্য বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র প্রচারিত হয়। এই সময় অখণ্ড বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে উৎসব উপলক্ষে এই গ্রামে বহু নরনারীর সমাগম হইত। কিন্তু দেশ বিভাগের পর এই উৎসবের আড়ম্বর ও লোক-সমাগম বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

পীরের দরগাহ হইতে বাতের জন্য মন্ত্রপূত তেলপড়া ও অন্যান্য রোগের জন্য ঔষধপত্রাদি বিক্রয় করা হয়। তবে এই স্থানের বড়পীরের বাতের তেলপড়া বিশেষ বিখ্যাত। পীরের পরিত্যক্ত ঘণ্টাটি কিছুকাল পূর্বে অপহৃত হইয়াছে।

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা
(মহম্মদ আবদুল কাদের জিলানী)

বড়পীর নামে খ্যাত মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু মহম্মদ আবদুল কাদের জিলানী সাহেবের শুভ আগমন উপলক্ষে প্রতি বৎসর ২৮শে কার্তিক আটলিয়া গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় দশ বিঘা জমির উপর আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে মেলায় প্রায় সাত-আট হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। প্রধানতঃ বাদুরিয়া, হাবড়া, বসিরহাট, গোবরডাঙ্গা এবং অন্যান্য জেলা হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার খাবার ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই অধিক। ইহাভিন্ন, শিল্পসামগ্রী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড় প্রভৃতি মেলায় আমদানী হইয়া থাকে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক, নাগরদোলা এবং যাত্রাভিনয় ও পীরের মাহাত্ম্য কীর্তনের আয়োজন করা হয়।

(সাহাচাঁদ পীর)

আন্ধারমাণিক গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে পনরদিনব্যাপী সাহাচাঁদ পীরের উরস্ উপলক্ষে পীরের দরগাহ সংলগ্ন ব্যক্তিবিশেষের প্রায় দশ বিঘা পরিমাণ জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। আটঘরা, যদুরহাটি, রঘুনাথপুর, চাতরাচণ্ডীপুর, রামচন্দ্রপুর, বাজিতপুর, শায়েস্তানগর, চাঁপপুকুর, হাড়োয়া, বাদুরিয়া প্রভৃতি নিকটবর্তী ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা প্রধানতঃ মোটরবাস, সাইকেল, গরুর গাড়ী ও নৌকাযোগে মেলায় আসেন। ইহাদের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজনের সংখ্যাই বেশী।

মেলায় মোট পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং পাঁচ-ছয় জন ফেরিওয়ালা আসেন। স্থানীয় বিক্রেতা ভিন্ন আশেপাশের গ্রাম হইতে মেলায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, মাদুর, ধামা, কুলো, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও পুতুলের দোকান, কাঠের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকান এবং দুই-একটি কাপড়ের দোকান, কবিরাজী ঔষধ ও বই-ছবির দোকান বসে। ধামা, কুলো প্রভৃতি শিল্প-সামগ্রী বিক্রেতারা প্রধানতঃ প্রতি বৎসরই যশাইকাটি ও পূর্ব শিমলা গ্রাম হইতে আসিয়া থাকেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক, তরজা, কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামের নিকটবর্তী কলিঙ্গ গ্রাম হইতে প্রধানতঃ প্রতি বৎসরই যাত্রার দল আসে। কোন কোন বৎসর কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রার দল আনা হয়। এই সকল আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠানে প্রায় দুই-তিন সহস্র নরনারী যোগদান করিয়া থাকেন।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

আটঘরা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব উপলক্ষে হাজরাতলার মাঠে ব্যক্তিবিশেষের প্রায়

এক বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং মাত্র একদিনই স্থায়ী হয়।

দুর্গাপুর, বাগজোলা, শিমনিয়া, চাঁদপুর প্রভৃতি নিকটবর্তী গ্রাম হইতে গরুর গাড়ী, রিক্সা অথবা হাঁটিয়া মেলায় তিন-চারি শত নরনারী আসেন। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক।

বাহুরিয়া, বাগজোলা, রুদ্রপুর, মসলন্দপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। মেলায় প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকান বসে ও দশ-বারো জন ফেরিওয়ালা আসেন। তন্মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাভিন্ন, মনিহারী, লোহার তৈয়ারী দা, বঁটি, কোদাল, কুড়াল প্রভৃতি জিনিস-পত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলা-চ্যাঙ্গারী এবং মাটির হাঁড়ি, কলসী, পুতুল প্রভৃতি আমদানী হইয়া থাকে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, কবিগান ও যাত্রাভিনয় ব্যতীত কপাটি ও জুয়া খেলা হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে, অধিকারীর নাম—শ্রীবলাই মণ্ডল।

পুণ্যস্নান উপলক্ষে মেলা (বারুণীস্নান)

তারাগুনিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বারুণীস্নান উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় ত্রিশ বিঘা জমির উপর দশদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। সাধারণতঃ বৈকালের দিকে মেলায় লোকসমাগম বেশী হয়। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় সাত হাজার নরনারী ট্রেন, বাস এবং নৌকাযোগে মেলায় আসেন।

মেলায় দোকানপাট এবং ফেরিওয়ালার সংখ্যা প্রায় একশত। দোকানপাটের মধ্যে মনিহারী, ময়রা, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রই বেশী আমদানী হয়। অন্যান্য দোকানপাটের মধ্যে বাসনকোসন, লোহা ও কাঁচের জিনিস-পত্র, বই-ছবি, তাঁতের কাপড়চোপড় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচ ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে, অধিকারীর নাম—শ্রীপরিতোষ গাইন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে অগণিত নরনারীর সমাবেশ হয়।

রথযাত্রার মেলা

আটুরিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে স্থানীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রায় পনর কাঠা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলায় প্রধানতঃ বৈকালের দিকে লোকজন আসেন এবং ইহা প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় বাঁকড়া, বাজিতপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মোট প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা মেলায় প্রধানতঃ পদব্রজে আসিয়া থাকেন।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, মনিহারী দোকান, বই-ছবির দোকান, গামছা ও তৈয়ারী পোষাকের দোকান, মাটির হাঁড়িকুড়ি, পুতুল ও খেলনার দোকান, কৃষি ও কারিগরী জিনিসপত্রের দোকান এবং বাঁশের তৈয়ারী ধামা, কুলো, চ্যাঙ্গারী ইত্যাদির দোকানপাট বসিয়া থাকে। কোন কোন বৎসর মাছ ও শাকসব্জীর দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রতি বৎসর নিকটবর্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের কোন ব্যবস্থা নাই।

থানা ঃ বসিরহাট

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ ধান্যকুড়িয়া। ৭।৩৬০`৭০।৫৬৩।৩,৩৫৯

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে বসিরহাটগামী মোটরবাসে এই গ্রামে যাতায়াত করা যায়। গ্রামটি টাকী রোডের উত্তর পাশে অবস্থিত। গ্রামের মধ্যে 'পতিতপাবন সাউ রোড' নামে একটি রাস্তা আছে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব, ভাদ্র মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও রাসযাত্রা উৎসব, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব, পৌষ মাসে পৌষপার্বণ, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ও শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত উৎসবগুলিই প্রাচীন। তাহাছাড়া, গ্রামে প্রতি বৎসর গ্রামপূজা, বিশ্বকর্মাপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন। মেলাটি বেশ প্রাচীন।

রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিবমন্দির, কালীমন্দির, মদনমোহন-জীউর মন্দির ও রাসমঞ্চ আছে।

এক সময়ে এই অঞ্চল গভীর বন-জঙ্গলে আবৃত ছিল। বর্গী হাঙ্গামার সময়ে ফতেপুর হইতে কয়েক ঘর তেলী বর্গীদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই স্থানে আসিয়া প্রথম বসতি স্থাপন করেন। গ্রাম পত্তনের সময় এই স্থানে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি কালীমন্দির দৃষ্ট হয়। রাত্রিকালে এই মন্দিরে নূপুরের ধ্বনি শোনা যাইত বলিয়া সাধারণে ইহাকে বিশেষ জাগ্রত দেবী বলিয়া মনে করিতেন। আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারী আসিয়া জঙ্গলাবৃত এই কালীমন্দিরে নানা উপাচারে পূজা দিয়া যাইতেন। কিন্তু জনৈক অর্থলোলুপ অসাধু ব্যক্তি কর্তৃক কৌশলে মন্দিরে নূপুরের ধ্বনি করিবার কথা একদা ধরা পড়িলে কালীপূজা বন্ধ হইয়া যায়। উক্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজিও গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রবাদ আছে, এই গ্রামের জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি ধানের ব্যবসায় লাভবান হইয়া গ্রামের একজন প্রতিষ্ঠাবান ধনী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হন। এই কারণেই নাকি গ্রামের নাম ধান্যকুড়িয়া হইয়াছে।

ধান্যকুড়িয়া একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই স্থানে একটি সরকারী হাসপাতাল, মাতৃসদন ও চতুষ্পাঠী আছে। এই গ্রামের গাইন, বল্লভ ও সাউ পরিবার প্রাচীন বাসিন্দা-রূপে পরিচিত। গাইনবাবুদের বাগানবাড়ী একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

শ্রীশহিদুল হক,
পশ্চিমবঙ্গ সেন্সাস দপ্তর,
কলিকাতা।

ধানকুড়িয়া—কলিকাতা হইতে ২৭ মাইল দূর। এখানকার রেলস্টেশনের নাম ধানকুড়িয়া গাইন গার্ডেন। স্টেশনের সম্মুখেই ইংরাজী ক্যাসল-এর অনুকরণে নির্মিত গাইনবাবুদের সুন্দর বাগানবাটী দেখিতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত দানবীর শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয় ধানকুড়িয়ার অধিবাসী ছিলেন। সততা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা শ্যামাচরণ অতি দীন অবস্থা হইতে বিশেষ ধনশালী হইয়া উঠেন। পাটের ব্যবসায়ে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন। তাঁহার ন্যায় পরদুঃখকাতর দয়ালু ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। একবার ২৪ পরগণা জেলায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তিনি স্বীয় পত্নীর উৎসাহে নিজের বাড়ীতে একটি অন্নসত্র খুলেন এবং এক বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া প্রত্যহ অন্যূন দুই হাজার নরনারীকে অন্নদান করেন। ধানকুড়িয়া গ্রামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি অতিথিশালা আছে। ১৩০৫ সালে শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয় পরলোক গমন করেন। মদনমোহনের মন্দির ধানকুড়িয়ার একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

[বাংলায় ভ্রমণ : ১ম খণ্ড, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত, পৃঃ নং ৪৭]

২। গ্রাম ঃ নেহালপুর। ৮।৪১৩৩১।৪৬৩।২,৫৬৮

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে সেখপাড়া, কামার-পাড়া, ঘোষপাড়া, ধাওয়াপাড়া, মুচিপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে টাকী রোড দিয়া ৭৯ নং বাস রুটে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে নববর্ষ উৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসে ব্যক্তি-বিশেষের শীতলাপূজা, ভাদ্র মাসে মনসাপূজা ও বিশ্বকর্মা-পূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব, পৌষ মাসে পৌষপার্বণ, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা, শিবরাত্রি উৎসব ও পীর গোরাচাদের উরস্ এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

তাহাছাড়া, বৎসরের বিভিন্ন সময় গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় মহরম, ঈদ প্রভৃতি উৎসব পালন করেন।

(ঙ) পীর গোরাচাদের মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি সম্প্রতিকালের।

(চ) গ্রামে প্রায় প্রতিটি হিন্দুর বাড়ীতে মনসাদেবী আছে। তাহাছাড়া, দুইটি মসজিদ বিদ্যমান।

অতীতে এই স্থানটি গভীর বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। জনশ্রুতি আছে বহুকাল পূর্বে সুদূর বাগদাদ হইতে দুইজন মুসলমান ভ্রাতা ধর্ম প্রচারের জন্য এই স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ক্রমে তাঁহারা এই স্থানের জমিদার হইয়া বসেন ও একটি গড় নির্মাণ করেন। অবশ্য সেই প্রাচীন গড়ের চিহ্ন আজ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম নেহালানন্দন ছিল, তাঁহারই নামানুসারে গ্রামের নাম নেহালপুর হইয়াছে।

শ্রীশহিদুল হক,
পশ্চিমবঙ্গ সেন্সাস দপ্তর,
কলিকাতা।

৩। গ্রাম ঃ কাঁকড়া। ১৮।৩৩৮১৭।১৮৪।১,১৮৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত, জেলে ও মুসলমান। গ্রামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে ৭৯ নং বাস রুটে স্বরূপনগর হইয়া একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া হাঁটা পথে গ্রামে পৌছান যায়। তাহাছাড়া, বর্তমানে নবনির্মিত বারাসত-হাসনাবাদ রেলপথে হাড়োয়া রোড অথবা মালতীপুর স্টেশনে নামিয়াও হাঁটা পথে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি দুর্গামণ্ডপ এবং সাতটি শিবমন্দির ব্যতীত মনসা ও শীতলার স্থান আছে।

উপরোক্ত শিবমন্দিরগুলি ও দুর্গামণ্ডপটি শোনা যায় রায় উপাধিধারী জনৈক জমিদার কর্তৃক নির্মিত। দুর্গামণ্ডপ ও শিবমন্দিরগুলি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়। বর্তমানে দুর্গামণ্ডপটির অবস্থা খুবই জীর্ণ।

শ্রীশহিদুল হক,
পশ্চিমবঙ্গ সেন্সাস দপ্তর,
কলিকাতা।

৪। গ্রাম ঃ কৃপালপুর। ২৩।৬১৯৪৬।২০০।১,১৭৪

(ক) কৈবর্তদাস, নাপিত, কামার, সর্দার ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পাচ মাইল দূর দিয়া মোটর-বাস এবং আধ মাইল দূর দিয়া প্রবাহিত নদীপথে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে হিন্দু সম্প্রদায়ের কালীপূজা ও মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চান্দ্রমাস হিসাবে প্রতি বৎসর মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ঙ) ঈদ-এর মেলা। পনরদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দির, একটি মসজিদ এবং শীতলা ও মনসা আছে।

শ্রীসৈয়দ আলী, প্রধান শিক্ষক,
কৃপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ঃ জগৎপুর, ২৪-পরগণা।

৫। গ্রাম : শ্রীনগর। ২৫।১,৫৯০'৮৭।৬৫০।৩,৬৭১

(ক) ব্রাহ্মণ, সৎচাষী, নাপিত, কামার, নমঃশূদ্র ও মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) কলিকাতা-বসিরহাট বাস রুটে বেঁকীরহাট হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া দক্ষিণে এক মাইল অগ্রসর হইলে এই গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামের একমাত্র উৎসব রক্ষাকালীপূজা। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ মঙ্গলবার সাড়ম্বরে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন। বাতাসা লুট এই উৎসবের একটি বৈশিষ্ট্য। সমবেত শত শত লোকের মাঝে শিলাবৃষ্টির ন্যায় প্রচুর বাতাসা লুট দেওয়া হয়। গ্রামবাসীগণ উৎসবটিকে চার-পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে রক্ষাকালীপূজার জন্য একটি পাকা দেবালয় এবং একটি জিউলী গাছের নীচে পঞ্চানন্দের স্থান আছে। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে গ্রামের স্ত্রীলোকগণ পঞ্চানন্দের স্থানে সম্মিলিতভাবে রন্ধন করিয়া খাওয়াদাওয়া করেন।

শ্রীগণেশ চন্দ্র মণ্ডল, শিক্ষক,
গ্রাম : চাঁদনগর পোঃ শ্রীনগর,
২৪-পরগণা।

৬। গ্রাম : গোবিন্দপুর ধোকড়া।
৬৬।৪৬ '৯৩।২৩৬।১,৪৫৯

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী ও চাকুরী।

(গ) কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে শ্যামবাজার-বসিরহাট অথবা শ্যামবাজার-হাসনাবাদ বাস রুটে টাকী রোডে খোলাপোতায় নামিয়া সেখান হইতে বসিরহাট-হাবড়াগামী মোটরবাসে গ্রামে পৌছান যায়। তাহাছাড়া, বসিরহাট শহর হইতে ইছামতী নদীতে নৌকা করিয়া পূর্ব বিবিপুর হইয়াও গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা এবং চৈত্র মাসে বারুণীস্নান অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটিই প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

বারুণীস্নানের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শীতলামন্দির, দুইটি পঞ্চানন্দ, একটি শিব, দুইটি মনসা এবং একটি উলাবিবি আছে।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ ঘোষ, শিক্ষক,
গ্রাম : গোবিন্দপুর ধোকড়া, পোঃ শুকদেবপুর,
২৪-পরগণা।

৭। গ্রাম : পিফা। ৭৩।৯৬৯'৩২।৩৪৩।২,১২২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, স্বর্ণকার, কাহার, কৈবর্ত, মুচি, জেলে, বাগ্দী, সাঁওতাল, ওরাং, কাপালিক ও মুসলমান। গ্রামে তেরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে ৭৯সি বাস রুটে হাসনাবাদ হইতে বাস বদল করিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ও শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাহাছাড়া, প্রতি বৎসর বিভিন্ন তিথিতে সত্যব্রত উৎসব, অষ্টমপ্রহর নামসংকীর্তন মহোৎসব, ইতুপূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবগুলি বহুদিনের প্রাচীন।

গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় মহরম, ঈদ, সবেবরাত প্রভৃতি উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন।

কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন।

চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। উল্লিখিত মেলাগুলি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কুমারপুকুরের নিকট একটি কালীমন্দির এবং বাবাঠাকুর, শীতলা ও মনসার স্থান আছে।

শোনা যায় এই ভূখণ্ড বিদ্যাধরী নদী বিধৌত পলিমাটি দ্বারা গঠিত বলিয়া খুব উর্বরা ছিল। এই স্থানে প্রচুর শাকসব্জি ও উৎকৃষ্ট ধরণের পেঁপে উৎপন্ন হইত।

এই স্থানের পেঁপের বিশেষ সুখ্যাতি ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে গ্রামের নাম 'পেঁপে' অপভ্রংশে পিফা হইয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দত্ত, শিক্ষক,
গ্রাম : পিফা, ২৪-পরগণা।

৮। গ্রাম : শিবহাটী। ১১২।৩৬৭·২৭।১৯৪।১,১২৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, তাঁতী, জেলে ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও তাঁতের কাজ।

(গ) কলিকাতা-বসিরহাট মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। ইহাভিন্ন, নৌকায়ও যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা আষাঢ় চতুর্ভুজ সিংহবাহিনী দেবীর বার্ষিক পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ও চৈত্র মাসে শেষ চারদিনব্যাপী চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রায় দুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) সিংহবাহিনীপূজার মেলা। ১লা আষাঢ়। প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে নদীর ধারে টিনের ছাউনীযুক্ত সাধারণের একটি পাকা দেবালয়ের সম্মুখে একটি "যূপকাষ্ঠ" এবং চারদিকে বকুল, বট, অশ্বত্থ ও বেলগাছ আছে। বেলগাছ তলায় ষষ্ঠীর স্থান। এই দেবালয়েই উল্লিখিত উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীবিমল কুমার রায়চৌধুরী, চাকুরী,
গ্রাম ও পোঃ শিবহাটী,
২৪-পরগণা।

৯। গ্রাম : গাছা। ১১৭।১,৫০০·৩৮।৫১৯।২,৭০৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, নাপিত, মুচি, কাহার, নমঃশূদ্র ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে দুই মাইল দক্ষিণে জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া কলিকাতা হইতে ইটাণ্ডা পর্যন্ত মোটরবাস যাতায়াত করে। জলপথে নৌকায় ও গ্রামে যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) গ্রামে ঘোষপাড়ার দুর্গামণ্ডপে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা হয়। উৎসবগুলি গ্রামের ঘোষ পরিবার কর্তৃক পরিচালিত হইলেও সাধারণে ইহাতে যোগদান করেন।

কর্মকারপাড়ায় একটি দুর্গাপূজা হয়। পূজাটি কর্মকারপাড়ার লোকদ্বারাই সম্পাদিত হয়। বেনেবউপাড়ায় পৌষসংক্রান্তিতে বাস্তুপূজা এবং ফাল্গুন মাসের যে-কোন মঙ্গলবার একটি কালীপূজা হয়। কালীপূজার স্থানে ঘট স্থাপন করিয়া মনসাপূজা এবং মূর্তি নির্মাণ করিয়া পঞ্চানন্দ ও শিবপূজা করা হয়। কালীপূজাটি প্রায় একশত বৎসর এবং বাস্তুপূজাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। ইহাভিন্ন, বেনেবউপাড়ায় একটি পীরের স্থান আছে। এই পীর পাগলা পীর নামে খ্যাত। পীরোত্তর প্রায় পাঁচ কাঠা জমির উপর সাধারণের একটি গৃহ আছে। প্রতি বৎসর ৩০শে ফাল্গুন হইতে সপ্তাহব্যাপী পীরের উৎসব উপলক্ষে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কয়েক সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। উৎসবের প্রথম দিন হিন্দুগণ এবং দ্বিতীয় দিনে মুসলমান সম্প্রদায় পীরের স্থানে হাজত দেন। ভক্তদের বিশ্বাস পাগলা পীরের দরগাহে মানত করিলে স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব ও মৃতবৎসা দোষ কাটিয়া যায়। মানত হিসাবে কেহ কেহ আপন শিশু-সন্তানের সমতুল্য ওজনের মিষ্টি, বাতাসা ইত্যাদি পীরের নামে উৎসর্গ করেন। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

দাসপাড়ায় দাস (মুচী) সম্প্রদায় কর্তৃক পৌষসংক্রান্তিতে একটি বাস্তুপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে সাড়ম্বরে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চড়ক উৎসব উপলক্ষে চড়কতলায় কিছু দোকানপাট বসে। বাস্তুপূজাটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। ইহা ব্যতীত, গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে রাসপূর্ণিমা হইতে তিনদিনব্যাপী সাড়ম্বরে রাধাকৃষ্ণের রাসোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে রাধাকৃষ্ণের একটি সুন্দর বড় পাকা মন্দির আছে। মন্দিরটি রাজেন্দ্র মোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

গত সাত-আট বৎসর যাবত গ্রামের বালকেরা প্রতি বৎসর মাঘ মাসে একটি সরস্বতীপূজা করিতেছে।

(ঙ) পাগলা পীরের মেলা। প্রতি বৎসর ৩০শে ফাল্গুন হইতে ৭ই চৈত্র পর্যন্ত গ্রামের বেনেবউপাড়ায় মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামেএ কটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির, ঘোষপাড়ায় ও কর্মকারপাড়ায় দুইটি দুর্গামণ্ডপ, বেনেবউপাড়ায় বাস্তুপূজার এবং দাসপাড়ায় কালীপূজা ও বাস্তুপূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে। ইহাভিন্ন, গ্রামে তিনটি শীতলার স্থান এবং কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় দ্বারা বাঁধানো গাছাকালী-দেবীর স্থান আছে। প্রতি বৎসর পৌষ-মাঘ মাসের মধ্যে গাছাকালীর স্থানে কালীর মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা হয় এবং পরের দিন মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়। গ্রামের ব্রাহ্মণ, কর্মকার, ঘোষ ও নাপিত সম্প্রদায় কর্তৃক এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

শ্রীআমজাদ আলী, প্রধান শিক্ষক,
গাছা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
ও
শ্রীযাদব চন্দ্র ধর, প্রধান শিক্ষক,
ইটীণ্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ ইটীণ্ডা, ২৪-পরগণা।

১০। গ্রাম : পানিতর।

১২০।২,৮৬৫'৪৭।১,১০২। ৬,২৭৯

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মৎস্য ব্যবসায়।

(গ) কলিকাতা হইতে ইটীণ্ডা পর্যন্ত মোটরবাস চলাচল করে। ইটীণ্ডাঘাট হইতে মোটর, রিক্সা অথবা গরুর গাড়ীতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। গ্রামের সীমানা দিয়া একটি খাল থাকায় নৌকা ও ডোঙ্গায় যাতায়াতের সুবিধা আছে। গ্রামটি পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও পূর্ণিমা তিথিতে বাগ্দীপাড়ায় শিবপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং অষ্টমপ্রহরব্যাপী নামকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) শিবপূজার মেলা। কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথি হইতে সাতদিনব্যাপী।

(চ) গ্রামে একটি কালীমন্দির আছে। মন্দিরটি স্থানীয় শ্রীবাসুদেব তরফদার কর্তৃক সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, একটি মসজিদ আছে। প্রতি বৎসর মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ ও বকরী ঈদে বিশেষ নামাজ পাঠ হয়।

শ্রীছবিরউদ্দিন আহম্মদ, চাকুরী,
গ্রাম : আথারপুর, পোঃ ইটীণ্ডা,
২৪-পরগণা।

১১। গ্রাম : ইটীণ্ডা। ১২১।৩২৯'০১।৫৮১।৩,৩৭০

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে বারটি পাড়া আছে। যেমন—কারিগরপাড়া, স্বর্ণকারপাড়া, ঘোষপাড়া, পাল-পাড়া, বণিকপাড়া, ধোপাপাড়া, নাপিতপাড়া, মুসলমান-পাড়া প্রভৃতি।

(খ) চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) কলিকাতা হইতে ইটীণ্ডা পর্যন্ত মোটরবাস যাতায়াত করে। গ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়া ইছামতী নদী প্রবাহিত থাকায় মোটরলঞ্চ ও নৌকায় গ্রামে যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে মহাসমারোহে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, প্রতি শনি-মঙ্গলবার গ্রামে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরীকালীর বিশেষ পূজা হয়। স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে বহু নরনারী সিদ্ধেশ্বরীদেবীর নিকট এই দুইদিন মানতপূজাও দিতে আসেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির ব্যতীত একটি প্রাচীন সিদ্ধেশ্বরীকালী-মন্দির আছে। শিবমন্দিরে শিবমূর্তি ও কালীমন্দিরে কালীর শিলাময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। কথিত আছে কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ধূমঘাট হইতে ফিরিবার পথে ইটীণ্ডা গ্রামের পত্তন করেন এবং সিদ্ধেশ্বরীকালীমন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। পরে টাকীর জমিদারগণের প্রচেষ্টায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা ও সিদ্ধেশ্বরীকালীর নিত্য পূজার ব্যবস্থা হয়।

শ্রীযাদব চন্দ্র ধর, প্রধান শিক্ষক,
ইটীণ্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ ইটীণ্ডা, ২৪-পরগণা।

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত বসিরহাট শহরে অনুষ্ঠিত উৎসব-পার্বণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

বসিরহাট চব্বিশ-পরগণা জেলার একটি মহকুমা এবং কলিকাতা হইতে প্রায় ৩৫ মাইল দূরে ইছামতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ইহা একটি মিউনিসিপ্যাল শহর। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে এই স্থানের জনসংখ্যা ৫৩,৯৪৩। পূর্ব রেলপথে বারাসত জংশন হইতে বসিরহাট পর্যন্ত একটি রেলপথ আছে। কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে মোটরবাসে সরাসরি বসিরহাট পৌছান যায়।

বসিরহাট শহরের অন্তর্গত মির্জাপুর ও বড় কালীবাড়ীপাড়ায় প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, নলকোড়া, নৈহাটী, ভেবলা, ভবানীপুর ও সাঁইপালায় চৈত্র মাসে চড়কপূজা এবং বসিরহাট-হাটখোলায় বারুণী তিথিতে ইছামতী নদীতে পুণ্যস্নান ও সাড়ম্বরে গঙ্গাপূজা হইয়া থাকে। বারুণী উপলক্ষে এইস্থানে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন এবং ইহাতে আশেপাশের অঞ্চল হইতে প্রতিদিন প্রায় সাত-আট হাজার নরনারীর সমাগম হয় ও নানাপ্রকার জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। উৎসব উপলক্ষে দরিদ্রনারায়ণ সেবা এবং যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বসিরহাট-দালালপাড়ায় প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসিত। গত দুই-তিন বৎসর হইল ঐ উৎসব ও মেলাটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নলকোড়া এবং মন্দিরহাটায় দুইটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। এই মন্দির দুইটিতে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের নিত্য পূজা হয়।

শহরের মধ্যে বড়কালীবাড়ীপাড়ায়, দন্তীঘাটে, হাটখোলায় এবং নৈহাটীতে কালীমন্দির আছে। নৈহাটীর কালীবাড়ীটি সাধক বামাক্ষ্যাপার শিষ্য তারাক্ষ্যাপা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণমুখী একটি পাকা দেবালয়ে প্রস্ফুটিত পদ্মের মধ্যে শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত শায়িত শিবের বক্ষস্থলে দণ্ডায়মানা কষ্টিপাথর নির্মিত প্রায় দুই ফুট উচ্চ একটি সুন্দর দক্ষিণাকালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি বাংলা ১৩৪২ সনে নির্মিত। স্থানীয় শ্রীমণি মোহন গোস্বামী মন্দিরটি নির্মাণ করান। উল্লিখিত কালীমন্দিরগুলিতে নিত্য পূজা এবং বৎসরান্তে একবার উৎসব হইয়া থাকে।

ট্যাটরা পঞ্চাননতলা রোডের ধারে পঞ্চাননের একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। ইহাভিন্ন, প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে এই স্থানে বাস্তুপূজা হইয়া থাকে।

বসিরহাটে 'শোনপুকুর' ও 'নেওরাদীঘি' নামে দুইটি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। শোনপুকুরের পাড়ে জনৈক পীরের আস্তানা ব্যতীত 'আস্তানা রোডে'র ধারে একটি পীরের স্থান আছে। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই এই পীরের স্থানে হাজত দিয়া থাকেন। ইহাভিন্ন, বসিরহাট-নিকারীপাড়ায় একটি এবং টাউন স্কুলের নিকট একটি মসজিদ আছে। টাউন স্কুলের নিকটস্থ মসজিদটি খুবই প্রাচীন এবং ইহা 'সালিক' বা শাহী মসজিদ নামে খ্যাত। সালিক মসজিদ সম্পর্কে শ্রীযুত অশোক মিত্র মহাশয় কর্তৃক রচিত ১৯৫১ সালের চব্বিশ-পরগণা ডিষ্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুক-এ নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়—

"There is one building of archaeological interest in the town—the mosque known as the Sālik mosque. It consists of a hall measuring 36 feet by 24 feet, with two carved stone pillars, 8 feet high, supporting the roof; the latter has six domes arranged in two rows. The mosque is popularly reputed to have been built by one Alā-ud-din in the year 1305 A.D., but an inscription over the central *mihrāb* shows that it was erected by one Ulugh Majlis-i-Azam in 1466-67 A.D. The inscription is in Arabic, written in Tughra characters, and its translation is as follows:—'No God is there but He, and Muhammad is His Prophet. This mosque was built by the great and liberal Majlis, Ulugh Majlis-i-Azam—may his greatness be perpetuated—in the year 871.' An inscription on a mosque at Pandua in the Hooghly district shows that it was built by the same person in 1477 A.D. during the reign of Yusuf Shah."

(p. xciviii-xcix)

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা
(পাগলা পীর)

গাছা গ্রামে বেনেবউপাড়ার মধ্যস্থলে একটি প্রাচীন পুষ্করিণীর ধারে ব্যক্তিবিশেষের চার-পাচ বিঘা জমির উপর প্রতি বৎসর ৩০শে ফাল্গুন হইতে ৭ই চৈত্র পর্যন্ত একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং পাগলা পীরের মেলা নামে খ্যাত।

বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ইটাণ্ডা, বাঁকড়া, শায়েস্তা-নগর, পিয়াড়া প্রভৃতি বিভিন্ন ইউনিয়ন হইতে এবং বনগ্রাম ও গোবরডাঙ্গা হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় আট-দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। প্রধানতঃ গরুর গাড়ী, রিক্সা ও সাইকেলে যাত্রীরা আসিয়া থাকেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারত বিভাগের পূর্বে পূর্ববঙ্গ হইতে বহু নরনারী এই মেলায় যোগদান করিতেন।

মেলায় শতাধিক দোকানপাট বসে এবং কুড়ি জনের মত ফেরিওয়ালা আসেন। উহার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটি দোকান খোলা জায়গায় বসে। বসিরহাট, ইটাণ্ডা, সকিরাবাদ, জয়নগর, বাঁকড়া, ভোমরা প্রভৃতি স্থান হইতে মেলায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও মুড়ি-ছোলা-বাদাম ইত্যাদি খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। অন্যান্য দোকানের মধ্যে মনিহারী দোকান, এলুমিনিয়ম, তামা, পিতল ও লোহার বাসনপত্রের দোকান, তাঁতের কাপড় ও তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদের দোকান, কাঠের দরজা, জানালা, তক্তপোষ, পিঁড়ে, চৌকি প্রভৃতি কাঠের জিনিসপত্রের দোকান, লোহার তৈয়ারী কাটারী, কোদাল, কুড়াল, লাঙ্গল, জোয়াল প্রভৃতি কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, কবিরাজী ও হাকিমী ঔষধপত্র এবং বই-ছবির দোকানপাট উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত, ইটাণ্ডা, বসিরহাট, পিয়াড়া, শায়েস্তানগর এবং মেরুদণ্ডী গ্রাম হইতে বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলো, চ্যাঙ্গারী, খুঁচি, চুবড়ি, চালনি প্রভৃতির দোকান এবং মাটির খেলনা, পুতুল ও হাঁড়ি-কলসীর দোকান, শোলার টোপর, ঝাঝি, পুতুল প্রভৃতির দোকান প্রতি বৎসর মেলায় আসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, চরকী, সার্কাস, ম্যাজিক, লটারী খেলা এবং কবিগান ও যাত্রাভিনয় হয়। প্রায় সাত-আট শত লোক এই সকল আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করেন।

(পীর গোরাচাঁদ)

নেহালপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ১২ই ফাল্গুন পীর গোরাচাঁদের উরস্ উপলক্ষে গ্রামের মহিষপুকুর নামক পুষ্করিণীর পাড়ে প্রায় চার বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

মেলায় স্থানীয় এবং নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় শত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয়। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, চুড়ি, খুন্সী, হাঁড়ি-কলসী, সস্তার বই-ছবি, বাদাম, ছোলাভাজা ইত্যাদির পনর-কুড়িটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সন্ধ্যা হইতে সারারাত্রি-ব্যাপী জারিগান ও মর্সিয়াগানের আসর বসে। গায়করা ভিন্ন গ্রাম হইতে আসেন।

ঈদ উৎসবের মেলা

কৃপালপুর গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ পরব উপলক্ষে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর পনরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ হইতে ষাট বৎসরের প্রাচীন।

হাদিপুর, গোপালপুর, ধান্যকুড়িয়া, ঘোড়ারস, চৈতা প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রায় চার-পাচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় ষাটটি দোকানপাট বসে এবং আট-দশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, তামা, পিতল, লোহা, কাঁচ ও মাটির বাসনপত্রের দোকান, কারিগরী সংক্রান্ত

জিনিসপত্রের দোকান, শিল্পসামগ্রী ও কারুশিল্পের দোকান এবং বই-ছবির দোকান বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক, কবিগান, জলসা ও যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামের যাত্রাদল ব্যতীত কোন কোন বৎসর কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রাদল আসে।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

ধান্যকুড়িয়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির দিন চড়ক উপলক্ষে একদিনের জন্য একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন বলিয়া গ্রামবাসীদের নিকট জানা যায়। ইহাতে স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় শত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় কয়েকটি ময়রা, তেলেভাজা, মুড়ি, মুড়কী, বাদাম-ছোলাভাজার দোকানপাট বসে। তাহাছাড়া, দুই একটি চুড়ি, খুনসি ও বই-ছবির দোকানপাটও বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নিয়মিত কোন ব্যবস্থা নাই। তবে কোন কোন বৎসর তরজাগানের ব্যবস্থা করা হয়।

কাঁকড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়কপূজা উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন স্থানে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন এবং সাধারণতঃ বৈকালের দিকে লোকসমাগম হয়।

মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ যেমন, মিজানগর, আমটোনা, হাজরাতলা, কচুয়া প্রভৃতি স্থান হইতে সাধারণতঃ হাঁটিয়া প্রায় চার-পাচ শত নরনারী মেলায় আসেন।

মেলায় মিষ্টান্ন, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবার ও চুড়ি-খুনসী, হাঁড়িকুড়ি, মাটির খেলনা, বাঁশের তৈয়ারী ঝুড়ি-চুবড়ী ইত্যাদির কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কোন কোন বৎসর মন্দির সংলগ্ন স্থানে তরজা ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

পানিতর (খোজাডাঙ্গা) গ্রামে বাগদীপাড়ায় প্রতি বৎসর রাস পূর্ণিমায় শিবপূজা উপলক্ষে গ্রামের মধ্যে সপ্তাহ-ব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে।

আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় লোকজন আসেন। প্রধানতঃ ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী জিনিসপত্রের দোকান, লোহার তৈয়ারী জিনিস-পত্রের দোকান, মাটির হাঁড়িকুড়ির দোকান, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলো ইত্যাদি দ্রব্যসামগ্রীর দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য দুইতিনদিনব্যাপী গান-বাজনা হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

বসিরহাট থানার অন্তর্গত পিফা গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিজয়া দশমী তিথিতে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী আমনানী, ভেরিয়া, চাঁপাপুকুর প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী সাধারণতঃ বাস, সাইকেল, সাইকেল রিক্সা, গরুর গাড়ী এবং পায়ে হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় স্থানীয় বিক্রেতাগণ ছাড়া বসিরহাট, মৃজাপুর, হরিশপুর, সাঁইপালা, পাইকপাড়া, ট্যাটরা, ভেবলা, রাঘবপুর, কঠুর, শ্বেতপুকুর প্রভৃতি স্থান হইতে বহু বিক্রেতা আসেন। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, তামা-পিতল-লোহা-মাটির জিনিসপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, কারুশিল্পজাত জিনিসপত্র প্রভৃতি দোকানপাটও বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, কবিগান, জারিগান এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কলিকাতা ও বসিরহাট হইতে কোন কোন বৎসর পেশাদারী যাত্রাদল আসে। গ্রামেই নিজস্ব যাত্রাদল আছে,অধিকারীর নাম—শ্রীরমেন্দ্র নাথ মিত্র। যাত্রাগানের আসরে অসংখ্য দর্শকের সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—পিফা গ্রামে অনুষ্ঠিত চড়ক ও কালীপূজা উপলক্ষে যে মেলা বসে তাহা উল্লিখিত দুর্গাপূজার মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

পুণ্যস্নান উপলক্ষে মেলা
(বারুণীস্নান)

গোবিন্দপুর ধোকড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বারুণীস্নান উপলক্ষে স্থানীয় শীতলামন্দির সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং ফলতা ও বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহ হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ সাধারণতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। স্থানীয় ব্যবসায়ীগণই মেলায় দোকান দিয়া থাকেন। ইহাতে খাবার, মনিহারী, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের নির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা নাই।

রথযাত্রার মেলা

ধান্যকুড়িয়া গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে স্থানীয় রাসমঞ্চ সংলগ্ন প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় সাধারণতঃ স্থানীয় এবং নদীয়া, হাজরাতলা, খাসপুর, রাজবাড়ীয়া, যত্নুরআঁটি, আড়বেলিয়া, কচুয়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় তিন-চার হাজার নরনারীর সমাগম হয়। উহার মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী।

নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতেই বিক্রেতারা আসেন। মেলায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে এবং উহাদের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, প্লাষ্টিকের খেলনা, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও পুতুল, চারাগাছ, কাঠ ও লোহার তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতি দোকানপাটও বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না। মেলায় আমোদপ্রমোদের কোন ব্যবস্থা নাই।

রাসযাত্রার মেলা

ধান্যকুড়িয়া গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উপলক্ষে স্থানীয় রাসমঞ্চ সংলগ্ন প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর চার-পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং প্রধানতঃ বৈকাল হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মেলায় লোকসমাগম ও বেচাকেনা হয়।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত হাজরাতলা, খাসপুর, রাজবাড়ীয়া, যত্নুরআঁটি, বাদুরিয়া, হাবড়া, হাড়োয়া, পিয়াড়া, বেড়াচাঁপা, দেউলিয়া, আড়বেলিয়া, মাটিয়া, সাংবেড়িয়া, নেহালপুর, বিবিপুর, বেগমপুর, স্বরূপনগর, কচুয়া এবং বারাসত থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহ হইতে এবং নদীয়া জেলা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় দশ-বার হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা প্রধানতঃ ট্রেনে, মোটরবাসে ও সাইকেল রিক্সায় আসেন।

আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সাধারণতঃ মেলায় ব্যবসায়ীরা আসেন। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। উহার মধ্যে মিষ্টান্ন, তেলেভাজা ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, মাটির হাঁড়ি-কলসী, তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র, চা-পান-বিড়ি প্রভৃতির দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য তরজাগান ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় যাত্রাদল ব্যতীত প্রতি বৎসর পেশাদারী যাত্রাদল আসে। বহু নরনারী যাত্রা দেখিতে আসেন। যাত্রার আসরে স্ত্রীলোকদিগের বসিবার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমোদের জন্য সখের জুয়াখেলার ব্যবস্থা হয়। জুয়া খেলায় অর্জিত অর্থের বেশীর ভাগই যাত্রাভিনয়ের জন্য ব্যয়িত হয়। মেলায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদল যথেষ্ট পরিশ্রম করেন।

সিংহবাহিনীপূজার মেলা

শিবহাটী গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা আষাঢ় সিংহবাহিনীদেবীর বার্ষিক পূজা উপলক্ষে প্রায় দেড় বিঘা

দেবোত্তর জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

পিয়াড়া, মেরুদণ্ডী, লবঙ্গ প্রভৃতি স্থান হইতে মেলায় মাত্র আড়াইশত হইতে তিনশত যাত্রী আসেন এবং ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, তাঁতের কাপড়, লুঙ্গি, গামছা, তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ, মাটির পুতুল, খেলনা ও হাঁড়িকুড়ি এবং বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের মোট পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান বসে। তাঁতের বস্ত্রাদি এই গ্রামের এবং মাটির দ্রব্যাদি মেরুদণ্ডী গ্রাম ও বাঁশের জিনিসপত্র লবঙ্গ গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আমদানী হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কীর্তন ও যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামের যাত্রাদল ব্যতীত কোন কোন বৎসর মেরুদণ্ডী গ্রাম হইতে যাত্রাদল আসে।



থানা ঃ হাসনাবাদ

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ সিমুলিয়া। ৫৪।১৫০·৮৭।২৩০।১,৩৫৮
হাসনাবাদ। ৫৮।৩৩৯·৬৬।৬৯৬।১,৫৮৪

(ক) সিমুলিয়া গ্রামে ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কামার ও মুসলমানের বাস এবং হাসনাবাদ গ্রামে ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, বাগ্দী, নমঃশূদ্র ও মুসলমান জাতির বাস।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের পাশ দিয়া একটি পাকা সড়ক চলিয়া গিয়াছে। উক্ত সড়ক দিয়া কলিকাতা হইতে মোটর-বাসে অথবা শিয়ালদহ হইতে ট্রেনে হাসনাবাদে যাতায়াত করা চলে। নিকটবর্তী ইছামতী নদী দিয়া নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে দুইদিনব্যাপী শীতলাপূজা, আশ্বিন মাসে পাঁচদিনব্যাপী দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে শ্যামাপূজা, চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা এবং সংক্রান্তির পাঁচদিন পূর্ব হইতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বৎসরে একবার মুসলমান সম্প্রদায়ের ইছালে ছাওয়ার বা ধর্মসভা হয়।

শীতলাপূজা ও চড়ক উৎসব বহুকালের প্রাচীন, দুর্গাপূজা ও শ্যামাপূজা গত বার বৎসর এবং বাসন্তীপূজাটি গত নয় বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে। উভয় স্থানের অধিবাসীরা মিলিতভাবে উল্লিখিত উৎসবগুলি পালন করেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি শিবলিঙ্গ এবং অন্যান্য পূজাদির জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীব্রজবিহারী সর্দার, চাকুরী,
হাসনাবাদ, ২৪-পরগণা।

হাসনাবাদ—কলিকাতা হইতে প্রায় ৪৩ মাইল দূরে বসিরহাট মহকুমার পশ্চিমাংশে ইছামতী নদীর তীরে হাসনাবাদ অবস্থিত। ইহা সুন্দরবন অঞ্চলের একটি বিখ্যাত গঞ্জ। কোম্পানির আমলে এখানে একটি লবণের কারখানা ছিল। পাদরি কেরী সাহেব একদা এই স্থানে একটি পর্ণ কুটীর নির্মাণ করিয়া সপরিবারে কয়েক বৎসর বসবাস করিয়াছিলেন। তৎকালে এই স্থানে ব্যাঘ্র ভীতির জন্য লোকবসতি তেমন গড়িয়া উঠে নাই। উল্লিখিত লবণ কোম্পানীর শর্ট সাহেব ও কেরী সাহেবের বন্দুক থাকায় ব্যাঘ্র ভীতি অনেকটা নিবারিত হয় এবং দলে দলে বহু লোক আসিয়া হাসনাবাদে বসতি স্থাপন করেন। এইরূপেই হাসনাবাদ একটি গঞ্জে পরিণত হয়। বর্তমানে এই স্থানে থানা, ডাকঘর, প্রাথমিক ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে।

২। গ্রাম ঃ রামেশ্বরপুর।
৬০।২৮২·৭৮।৩০০।১,৭২৩

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) কলিকাতা হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত চলে। পি, ডবলিউ, ডি-র ও জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবগুলি প্রাচীন ও সর্বজনীন।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে তিন হইতে আটদিনব্যাপী চলে। মেলাটি মাত্র পনর-ষোল বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি, একটি শীতলা, দুইটি মনসা এবং শিব আছে। ইহাভিন্ন, গ্রামে একটি ভারতসেবাশ্রম সঙ্ঘের মঠে প্রতি বৎসর স্বামী প্রণবানন্দের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীএন্তাজ আলী, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ বরুণহাটা,
২৪-পরগণা।

৩। গ্রাম ঃ ইছাপুর। ৭৯।১,৯৬১·৯৮।৬২৬।৩,৫৪৪

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, বৈশ্য, কাপালী, রুইদাস, মুসলমান ও আদিবাসী (বুনো) সম্প্রদায়।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) বারাসত-হাসনাবাদ রেলপথে বসিরহাট হইতে অথবা কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা ও ফাল্গুন মাসে রাধাকৃষ্ণের দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দোল উৎসবটি গ্রামে ঋষিদাস সম্প্রদায়ের। তাঁহারাই রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের সেবায়েত, তবে পূজা ও উৎসবাদি ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দশদিনব্যাপী। মেলাটি মাত্র কুড়ি-পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কালী ও রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে। এই দুই মন্দিরে প্রতিদিন নিয়মিত পূজাদি হয়। ইছাপুর গ্রাম সংলগ্ন বেদেমারী পারঘাটা (মৌজা নং ৭৮) গ্রামে একটি দেবালয়ে পঞ্চদেবতা, যথা—কালী, বনদেবী, শীতলা, মনসা ও হরি ঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বৎসরে একবার এই পঞ্চদেবতার স্থানে সাড়ম্বরে সর্বজনীন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে ঐ স্থানে নামকীর্তন ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র, প্রধান শিক্ষক,
বেদেমারী পারঘাটা অবৈতনিক বিদ্যালয়,
ইছাপুর, ২৪-পরগণা।

মেলা বিবরণী

দোলযাত্রার মেলা

রামেশ্বরপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে রাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে প্রায় দুই বিঘা পরিমাণ জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র পনর-ষোল বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে এবং তিন হইতে আটদিনব্যাপী স্থায়ী হয়।

বরুণহাট, ফাটাখালি, মহিষপুকুর, থাপুকুর, কালুতলা, জয়গাঁ, পাটলী, ধরমবেড়ে, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে রিক্সা, নৌকা ও পায়ে হাঁটিয়া মেলায় মোট প্রায় আট-নয় শত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় খাবার দ্রব্য, কাচের বাসনপত্র, ধামা, কুলা, চ্যাঙ্গারী, মাটির খেলনা-পুতুল, বই-ছবি ইত্যাদির পাঁচশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে। হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ, টাকী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও সার্কাসের দল ব্যতীত কবিগান ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। গ্রামেই একটি যাত্রাদল আছে।

ইছাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে তিন-চার বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন এবং দোল পূর্ণিমার দিন আরম্ভ হইয়া দশদিনব্যাপী চলে। আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে মেলায় মোট প্রায় সাত-আট শত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় খাবার, মনিহারী, কাপড়চোপড়, ধামা, কুলা, খেলনা, বই-ছবি এবং শাকসব্জী, মাছ প্রভৃতির প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা হাসনাবাদ, ভবানীপুর, থাপুকুর, কালীনগর প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক এবং নানাপ্রকার খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হয়। মেলায় জুয়া খেলার দল আসে।

থানা ঃ হিঙ্গলগঞ্জ

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ কণকনগর (মৌজা ঃ শাণ্ডেলের বিল)। ৯৫।৩,১৫৪·৫৬।৭৭৩।৫,০২০

(ক) মাহিষ্য ও পোদ সম্প্রদায়। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) হিঙ্গলগঞ্জ হইতে জলপথে ও স্থলপথে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে হরিপূজা, ফাল্গুন মাসে কালীপূজা ও চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবগুলি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং গ্রামের পোদ সম্প্রদায় ইহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি কুড়ি-পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) সুন্দরবনের অন্তর্গত এই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটি স্যাণ্ডেল সাহেব নামক জনৈক ব্যক্তি ২৪-পরগণা জেলা কালেক্টরের নিকট হইতে জমা-বন্দোবস্ত লইয়া ইং ১৮৪১ সালে শ্রীপুর নিবাসী তারণ সরকার ও যোগেন ঘোষ মহাশয়ের নিকট ৯৯ বৎসরের জন্য লীজ দেন। তারণ সরকারের পুত্র কণক সরকারের নামানুসারে গ্রামের নাম কণকপুর হইয়াছে।

শ্রীতুলসীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ কণকনগর, পোঃ শাণ্ডেলের বিল,
২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ বাঁকরা। ৯৮।৬১১·৬৮।৪৬৮।২,৬৬৯

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে দশটি পাড়া আছে। যথা—কারিকরপাড়া, কাছারিপাড়া, গাইনপাড়া ও সর্দারপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কলিকাতা হইতে হাসনাবাদগামী মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। ইহাভিন্ন, ইছামতী নদী দিয়া মোটরলঞ্চে বা নৌকাযোগে গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, ফাল্গুন মাসে হরিপূজা, চৈত্র মাসে রক্ষাকালী, শীতলা ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চড়ক উৎসবটি চৈত্রসংক্রান্তির সাতদিন পূর্ব হইতে সুরু হইয়া সংক্রান্তির দিন শেষ হয়। উৎসব উপলক্ষে ভক্তেরা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া পবিত্র জীবন যাপন ও নানারূপ কৃচ্ছসাধন করিয়া থাকেন। সংক্রান্তির পূর্ব দিন নীলপূজা এবং সংক্রান্তির দিন সাড়ম্বরে শিবপূজা ও চড়ক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। কালী, শীতলা ও হরিপূজা প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন এবং দুর্গাপূজাটি বিগত কুড়ি বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে। উল্লিখিত উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে তিনদিনব্যাপী। দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) খড়ের ছাউনিযুক্ত সাধারণের একটি মেটে ঘরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ঘরেই একটি ঘটে হরিঠাকুরের পূজা হয়—হরিঠাকুরের কোন মূর্তি নাই। ইহাভিন্ন, গ্রামে শীতলা, কালী ও দুর্গা পূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীমেহের আলী, চাধুরী,
গ্রাম ও পোঃ বাঁকরা, ২৪-পরগণা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—হিঙ্গলগঞ্জে রাধাগোবিন্দজীউর মন্দিরে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব উপলক্ষে ১৪ দিন-ব্যাপী একটি মেলা হয়। মেলায় প্রতিদিন প্রায় চার-পাচ হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং প্রায় একশত দোকান-পাট বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য সিনেমা ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। কথিত আছে, রাধাগোবিন্দজীউর মন্দিরটি যশোহরের রাজা বসন্ত রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই স্থানে একটি প্রাচীন গড় আছে ; ইহা প্রতাপাদিত্যের গড় নামে খ্যাত। ইহাভিন্ন, রমাপুর (মৌজা নং ১১৪) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উপলক্ষে আর একটি মেলা বসে।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

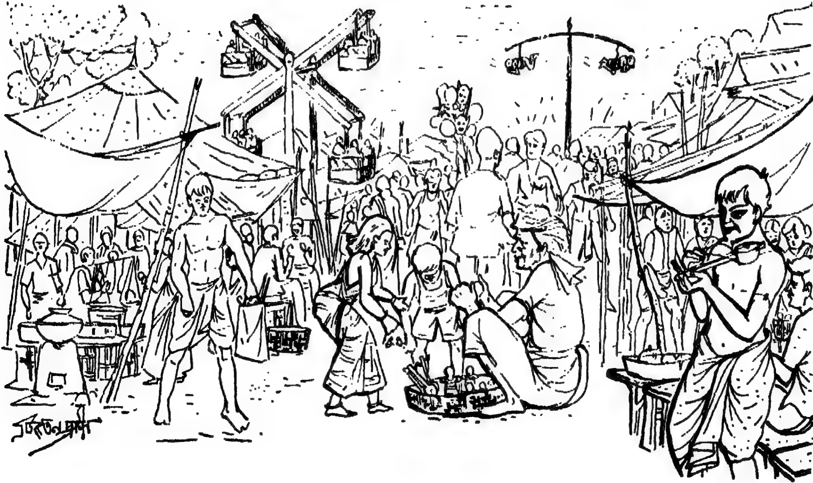
বাঁকরা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়ক উপলক্ষে শিবমন্দিরের সামনে খেলার মাঠে প্রায় চার বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন এবং প্রতিদিন বৈকালের দিকে মেলায় লোকসমাগম ও বেচাকেনা হয়।

স্যাণ্ডেলের বিল, আমবেড়িয়া, হিঙ্গলগঞ্জ, সাহাপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে মেলায় প্রতিদিন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ পদব্রজে ও গরুর গাড়ীতে আসিয়া থাকেন।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে এবং দশ-পনর জন ফেরিওয়ালা আসেন। প্রধানতঃ নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে এবং হিঙ্গলগঞ্জ, টাকী, হাসনাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। অধিকাংশ দোকানপাটই খোলা জায়গায় বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার খাবার ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাভিন্ন, বাসন-কোসন, কাপড়চোপড়, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনা-পুতুল, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলা, চ্যাঙ্গারী, বই-ছবি এবং শাকসব্জী ইত্যাদির দোকানপাট বসিয়া থাকে।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, কবিগান, যাত্রাভিনয় ও নানা প্রকার খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রাভিনয়ের দল আছে। কোন কোন বৎসর পেশাদারী দলও আনা হয়।



গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ ঢেকনামারী। ২।৫৪৯·৫৫।১৬২।৯৭৫

(ক) মাহিষ্য, বাগ্দী, পোদ এবং মুণ্ডা ও ওরাং আদিবাসী। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) বারাসত-হাসনাবাদ রেলপথে বসিরহাট অথবা হাড়োয়া হইতে মোটরবাসে যাতায়াত করা হয়। গ্রামের প্রায় তিন মাইল দূর দিয়া নদীপথে নৌকায় যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) গ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায় প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে মনসাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং পৌষ মাসে 'টুসু' উৎসব পালন করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত, আদিবাসীদের ধরমপূজা, করমপূজা এবং গ্রামপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে আদিবাসী স্ত্রী-পুরুষেরা মাদক দ্রব্য পান করিয়া একত্রে ঝুমুরনাচ, করমনাচ ও গান করেন এবং ইঁহারা কালীপূজার সময় গরু ও মহিষকে মদ্যপানে উত্তেজিত করিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন। উৎসবগুলি প্রাচীন এবং উৎসব উপলক্ষে হাঁস, মুরগী ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে শীতলা, কালী ও রাধাগোবিন্দের স্থান আছে। চৈত্র মাসের কোন শনি বা মঙ্গলবার শীতলা ও কালী পূজা হয় এবং পরে অষ্টমপ্রহরব্যাপী অখণ্ড নাম-সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীনিতাই পদ মণ্ডল, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ ঢেকনামারী,
২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ ন্যাজাট্। ২১।১,৬৮৬·৩৬।৩০০।২,২৫৫

(ক) হিন্দু এবং ওরাং, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীর বাস। মাহিষ্যপাড়া, বৈরাগীপাড়া প্রভৃতি নামে গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) বসিরহাট শহর হইতে একটি পাকা রাস্তা গ্রামের নিকট দিয়া গিয়াছে। এই রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে শীতলাপূজা এবং ফাল্গুন মাসে গৌরাঙ্গদেবের দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের এবং অন্যান্য পূজাগুলি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং সর্বজনীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে অনেকগুলি কালী, দুইটি শীতলা, দুইটি শিব ও একটি হরিবাসর আছে।

গ্রামটির আকৃতি অনেকটা গরুর ল্যাজের মত দেখিতে বলিয়া গ্রামের নাম 'ল্যাজহাট', অপভ্রংশে ন্যাজাট্ হইয়াছে অনেকে মনে করেন।

শ্রীবলাই লাল চট্টোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
ন্যাজাট্ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ ন্যাজাট্,
২৪-পরগণা।

৩। গ্রাম ঃ সন্দেশখালি (মৌজা ঃ দ্বারিরজাঙ্গাল)। ৩৭।৩,৮১২·৭৩।৬৬১।৪,৩৯৫

(ক) মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মুণ্ডা, সর্দার (সাঁওতাল) প্রভৃতির বাস।

(খ) কৃষিকার্য ও মৎস ব্যবসায়।

(গ) কলিকাতা হইতে রেলপথে হাসনাবাদ আসিয়া তথা হইতে কালিন্দী ও রায়মঙ্গল নদীপথে মোটরলঞ্চে এই গ্রামে পৌছান যাইতে পারে।

(ঘ) গ্রামের অন্যতম প্রধান উৎসব চড়ক। সারা চৈত্র মাস গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী চড়ক উপলক্ষে চৈত্র মাসে নিয়ামিষ ভোজন করেন এবং অনেকে শিবের নামে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। সংক্রান্তির দিন যথারীতি শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন ভক্তদের ঝাঁপ ও চড়ক গাছে পাক্ খাওয়া দেখিতে বহু লোকের সমাগম হয়। উৎসবটি প্রাচীন।

ইহাছাড়া, গ্রামে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে মনসা-পূজা, শীতলাপূজা, মৎসব্যবসায়ীগণ কর্তৃক মাকালঠাকুরের পূজা এবং ব্যাঘ্র দেবতা 'দক্ষিণরায়'-এর পূজা হইয়া থাকে।

গ্রামে কাহারও কঠিন অসুখ-বিসুখ হইলে 'সতীমা'র বৈঠক বসান হয়। এই বৈঠক গ্রামের একজন 'গুণীন' পরিচালনা করেন এবং তাঁহারই উপর 'সতীমা'র ভর হয়। ভরপ্রাপ্ত অবস্থায় ঐ ব্যক্তি 'সতীমা'র নির্দেশিত ঔষধপত্র দিয়া থাকেন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীনরঞ্জন ঘোষ, শিক্ষক,
গ্রাম : সন্দেশখালি,
২৪-পরগণা।

৪। গ্রাম : হাটগাছা। ৪০।১,৭৯৪'৯০।৪১৬।৩,১৯৩

(ক) ব্রাহ্মণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মুসলমান এবং মুণ্ডা, ওরাং, ঘাসি প্রভৃতি আদিবাসীর বাস। সর্দারপাড়া, ঘাসীপাড়া প্রভৃতি নামে গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

• (গ) কলিকাতা হইতে রেলপথে হাসনাবাদ আসিয়া সেখান হইতে কালিন্দী ও রায়মঙ্গল নদীপথে মোটরলঞ্চে এই গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, ফাল্গুন মাসে রাধাগোবিন্দজীউর দোলযাত্রা ও হরিপূজা এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে শিবপূজা ও শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দোলযাত্রা উৎসব ব্যতীত অন্যান্য উৎসবগুলি সর্বজনীন। গ্রামে শিবপূজা উৎসবটি অতি আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। শিবপূজা উপলক্ষে আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে অগণিত নরনারীর সমাগম হয়। শিবের সেবায়েত দুরারোগ্য ব্যাধির দৈব ঔষধপত্র দিয়া থাকেন।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি গত পনর-কুড়ি বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে সম্মুখে থামযুক্ত বারান্দাসহ একটি পাকা শিবমন্দির আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীহলধর গায়েন, সহকারী শিক্ষক,
হাটগাছা ক্ষিরোদ চন্দ্র ইনষ্টিটিউশন,
গ্রাম ও পোঃ হাটগাছা,
২৪-পরগণা।

৫। গ্রাম : শীতলিয়া। ৪৯।১,৬৯২'৯২।৬৯০।২,৬৬৭

(ক) পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, আদিবাসী ও মুসলমান। গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে '৭সি মোটর-বাসে হাসনাবাদ এবং সেখান হইতে নদীপথে মোটরলঞ্চে শীতলিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হরিপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসে রক্ষাকালীপূজা ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীঅধর চন্দ্র রায়, প্রধান শিক্ষক,
শীতলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ শীতলিয়া,
২৪-পরগণা।

৬। গ্রাম : জয়গোপালপুর।
৫২।১,৯৫১'৬৭।৪৫৮।২,৯৭৭

(ক) বর্ণহিন্দু, তপশীলী, আদিবাসী ও মুসলমান। গ্রামে পাচটি পাড়া আছে। যেমন—পাইকপাড়া, সর্দার-পাড়া, দাসপাড়া, মণ্ডলপাড়া ও মুসলমানপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কলিকাতা হইতে মোটরবাসে হাসনাবাদ এবং হাসনাবাদ হইতে প্রায় ষোল মাইল নৌকায় অথবা ক্যানিং রেলস্টেশন হইতে চৌদ্দ মাইল মোটরলঞ্চে করিয়া এই গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক পূজা এবং হরিপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজাটি সম্প্রতিকালের, কালীপূজা ও হরিপূজাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের এবং শিবপূজা ও চড়ক উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। উৎসবের সবগুলিই সর্বজনীন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীরঘুনাথ মণ্ডল, শিক্ষক,
গ্রাম : জয়গোপালপুর,
২৪-পরগণা।

৭। গ্রাম ঃ দুর্গামণ্ডপ। ৫৭।২,৩১২ ৫৪।৪৮৮।৩,০৭৮

(ক) পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, আদিবাসী ও মুসলমান। গ্রামে পাচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে মোটরবাসে হাসনাবাদ এবং হাসনাবাদ হইতে মোটরলঞ্চ বা নৌকায় গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতিকালের।

(চ) গ্রামে সর্বজনীন পূজা-পার্বণের জন্য খড়ের ছাউনী-যুক্ত একটি মাটির ঘর আছে। ইহাভিন্ন, বাবাঠাকুর, শীতলা, গঙ্গাদেবী ও বনবিবি আছে।

শ্রীসুধীর কুমার রায়, প্রধান শিক্ষক,
নর্থ দুর্গামণ্ডপ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ দুর্গামণ্ডপ,
২৪-পরগণা।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

সন্দেশখালি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি গত কুড়ি-পঁচিশ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

আশেপাশের গ্রামাঞ্চল এবং হাটখোলা হইতে বহু সংখ্যক যাত্রী ও বিক্রেতা মেলায় আসেন। মেলায় প্রায় চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং দশ-পনর জন ফেরিওয়ালা আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী ও তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, ঔষধপত্র, বই-ছবি, লোহার জিনিসপত্র যেমন—দা, বঁটি, কাস্তে, বাঁশের ও বেতের তৈয়ারী ধমা, কুলা, চুপড়ী প্রভৃতির দোকানপাটও বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে সামান্য তোলা গ্রহণ করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের মধ্যে পুতুলনাচ, কীর্তন ও যাত্রাভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রামেই কীর্তন গানের দল আছে।

জয়গোপালপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়ক উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। উৎসবটি প্রাচীন হইলেও মেলাটি গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল অনুষ্ঠিত হইতেছে। নিকটবর্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু লোকজন আসিয়া থাকেন।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং দুই-চার জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ নিকটবর্তী আমতলা বাজার হইতেই প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। অধিকাংশ দোকানপত্রই খোলা জায়গায় বসে। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি বিভিন্ন খাবার দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাভিন্ন,মনিহারী, কাঁচের কাপ-ডিস্, বই-ছবি, টোটকা ঔষধপত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল ইত্যাদির দোকানপাট বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

ন্যাজাট্ গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি ছোট আকারের মেলা বসে। মেলাটি গত পঁচিশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

আখড়াতলা, বয়ারমারী, বামুনিয়া, চৈতাল প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় দুই হাজার নরনারী হাঁটিয়া বা নৌকায় করিয়া মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজনের সংখ্যাই বেশী।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয়। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী ও বই-ছবি ইত্যাদির দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য লাঠিখেলা, কপাটিখেলা ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই একটি যাত্রাদল আছে।

শীতলিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিদ্যালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় দুই বিঘা পরিমান জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের প্রাচীন। আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে হাঁটিয়া ও নৌকায় মেলায় প্রায় দুই হাজার নরনারী আসেন। তন্মধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোকজনের সংখ্যাই বেশী।

স্থানীয় বিক্রেতা ব্যতীত নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই ব্যবসায়ীরা আসেন। সমগ্র দোকান-পাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, মাটির পুতুল, হাঁড়ি কুড়ি, বই-ছবি, কাপড়চোপড় প্রভৃতি জিনিসপত্রের পচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য খেলাধূলা, লটারী খেলা ও যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামেই একটি যাত্রাদল আছে।

•

দুর্গামণ্ডপ নামক গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে স্থানীয় হাটখোলায় প্রায় দুই বিঘা জমির উপর চার-পাচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতিকালের।

সুখদনিয়া, গাববেড়িয়া, তুষখালি, ধুচনীখালি, কোড়া-কাড়ি প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। তন্মধ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়র লোকজনই বেশী।

মেলায় প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে এবং পাচ-ছয় জন ফেরিওয়ালা আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনিহারী দোকানের সংখ্যা বেশী। অন্যান্য দোকানপাটের মধ্যে কাঁচ ও মাটির বাসনকোসন, ঔষধ-পত্র, কাপড়চোপড় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আমোদপ্রমোদের জন্য কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে, অধিকারীর নাম—শ্রীচতুর চন্দ্র মাইতি।

দোলযাত্রার মেলা

হাটগাছা গ্রামের সাহেবখালি ও গৌড়েশ্বর নদীর সঙ্গমস্থলে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে রাধাগোবিন্দের দোল উৎসব উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত পনর-কুড়ি বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

সন্দেশখালি, দুলদুলী, বিশপুর প্রভৃতি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, কাপড়চোপড়, ঔষধপত্র, বই-ছবি প্রভৃতি জিনিসপত্রের পচিশ-ত্রিশটি দোকান বসে। তাহাছাড়া, বাঁশতলা, ভাণ্ডারখালি, দুলদুলী, লেবুখালি প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রচুর শিল্পসামগ্রী ও কারুশিল্পের দোকানপাট আসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ম্যাজিক, সিনেমা, কবিগান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রাদল আনা হয়। তাহাছাড়া, মেলায় জুয়া ও লটারী খেলা হয়।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : হরিপুর। ৮।১,২৫৩'৯৫।৩৩৭।২,০৬৭

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) পূর্ব রেলপথে বারাসত জংশন হইতে হাসনাবাদ-গামী ট্রেনে হাড়োয়া রোড স্টেশনে নামিয়া মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। তাহাছাড়া, কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে ৭৯ নং বাস রুটে প্রথমে বেড়াচাঁপা এবং সেখান হইতে হাড়োয়াগামী বাসে করিয়াও গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ভগ্নপ্রায় একটি শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং একটি মসজিদ আছে।

এই গ্রামে 'ধনপোতা' নামে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। জনশ্রুতি আছে যে, এই স্থানে রাজা চন্দ্রকেতুর ধনাগার ছিল। তাহাছাড়া, ইহার পার্শ্ববর্তী একটি ধ্বংসস্তূপ 'ঢিবির বাগান' নামে খ্যাত।

শ্রীসুধীর চন্দ্র ভট্টাচার্য, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ খলিসাদী,
২৪-পরগণা।

২। গ্রাম : উচিলদহ। ৯৪।১,৮৬১'৩২।৩৮৮।২,৫২৭

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, পোদ, তাঁতী, নমঃশূদ্র, মুচি, খণ্ডাইত, শ্রেষ্ঠীকরণ ও আদিবাসী। গ্রামে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে ৭৯ নং ও ৭৯সি বাসে বেড়াচাঁপায় এবং সেখান হইতে ৮৬ নং বাসে হাড়োয়ায় আসিয়া তৎপর হাড়োয়া খাল দিয়া মোটরলঞ্চ ও নৌকায় অথবা পদব্রজে গ্রামে পৌছান যায়। তাহাছাড়া, শ্যামবাজার হইতে মোটরলঞ্চে কুলটির গেট পৌছাইয়া সেখান হইতে হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাহাছাড়া, গ্রামে মনসাকালী ও সতীমায়ের নিত্য পূজা হইয়া থাকে।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে সাতদিনব্যাপী।

(চ) গ্রামে তিনটি শীতলা, মনসাকালী ও সতীমায়ের স্থান এবং একটি হরিবাসর আছে।

শ্রীচিত্ত রঞ্জন মিত্র, প্রধান শিক্ষক,
উচিলদহ জুনিয়র বেসিক স্কুল,
পোঃ বাগুণ্ডী মোহনপুর, ২৪-পরগণা।

৩। গ্রাম : হাড়োয়া। ১১২।৮৩'৫৩।৭২।৫৮৯

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরি, চাকুরি ও ব্যবসায়।

(গ) পূর্ব রেলপথে বারাসত জংশন হইয়া হাড়োয়া রোড স্টেশন হইতে যাতায়াত করা যায়। ইহাভিন্ন, কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে বেড়াচাঁপা হইয়া মোটর-বাসেও যাতায়াত করিতে পারা যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে নববর্ষ উৎসব, ভাদ্র মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব, পৌষ মাসে পৌষপার্বণ, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ও পীর গোরাচাঁদের উরস্ এবং চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহাভিন্ন, স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায় মহরম, ঈদ, সবেবরাত প্রভৃতি উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতিকালের।

গোরাচাঁদ পীরের উরস্ উপলক্ষে মেলা। ১২ই ফাল্গুন হইতে সপ্তাহব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

মহরমের মেলা। চান্দ্রমাস অনুযায়ী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি চণ্ডীমণ্ডপ, গোরাচাঁদ পীরের দরগাহ এবং একটি মসজিদ আছে। ইহাভিন্ন, রাঙা মসজিদ নামে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশহিদুল হক,
পশ্চিমবঙ্গ সেন্সাস দপ্তর,
কলিকাতা।

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব (গোরাচাঁদ পীরের উরস্)

চব্বিশ-পরগণা জেলার হাড়োয়া-হাসনাবাদ অঞ্চলে গোরাচাঁদ পীরের প্রভাব খুব বেশী। এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই গোরাচাঁদ পীরকে বিশেষ মান্য করেন। বাংলা দেশের নানাস্থানে গোরাচাঁদ পীরের আস্তানা আছে। ইনি গোড়াই গাজী নামেও খ্যাত এবং তাঁহার অলৌকিক ঐশী ক্ষমতা সম্পর্কে লোকের মুখে মুখে নানারূপ কিংবদন্তী শোনা যায়।

গোরাচাঁদ পীরের প্রকৃত নাম হজরত শাহ সৈয়দ আব্বাস আলী। অবশ্য তিনি বাংলা দেশে গোরাচাঁদ পীর নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি আরব দেশে এক মহান পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা হজরত করিম উল্লাহ ছিলেন শহীদরাজ হজরত হোসায়েন রাজীর অধস্তন বংশধর এবং মাতা হজরত বিবি মায়মুনা সিদ্দিকা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন হজরত সিদ্দিক আকবরের অধস্তন বংশে। হিজরাব্দের ৬৯৩ সালে, ২১শে রমজান তারিখে প্রাতঃকালে শিশু আব্বাস ভূমিষ্ঠ হন এবং ৮০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। গোরাচাঁদ পীর চিরকুমার এবং আরবী ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বাংলা দেশে আসিয়া তিনি বাংলা ভাষাও আয়ত্ত করেন।

শিশুকাল হইতেই গোরাচাঁদের সংসারের প্রতি বিরাগ এবং ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়েন। এই সময় একদিন দৈব নির্দেশে তিনি তাঁহার মোর্শেদ হজরত শাহ সৈয়দ জালাল রাজীর দর্শন পান এবং ৭০৮ হিজরাব্দ হইতে ৭২০ হিজরাব্দ পর্যন্ত দ্বাদশ বৎসরকাল মোর্শেদাশ্রমে থাকিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে চরম উন্নতি সাধন ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এই সময় তাঁহার বয়স মাত্র আটাশ বৎসর।

ইহার পর তিনি একবিংশ জন আউলিয়াসহ ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করেন এবং দিল্লী হইতে সিলেট হইয়া বাংলা দেশে আসিয়া চব্বিশ-পরগণা জেলার বালাণ্ডা পরগণার অন্তর্গত হাড়োয়ার নিকটবর্তী পদ্মা নদীর তীরে আস্তানা স্থাপন করেন এবং বালাণ্ডার রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানী দেউলিয়ায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। রাজা চন্দ্রকেতু স্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে স্বীকার না করায় গোরাচাঁদ পীর তাঁহাকে স্বীয় অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শনপূর্বক বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। কথিত আছে, তাঁহার প্রভাবে একটি লৌহদণ্ড সুপক্ক কদলীতে পরিণত হয় এবং একজন মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবন লাভ করেন। ইহা দেখিয়াও কিন্তু রাজা চন্দ্রকেতুর মন টলিল না। রাজা চন্দ্রকেতুকে স্বমতে আনিতে না পারিয়া তিনি অতঃপর সুন্দরবনের হাতিয়াগড় অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে গমন করেন। সেখানে তখন রাজা মহীদানন্দ রাজত্ব করিতে-ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র আকানন্দ ও বাকানন্দ মহাবীর ছিলেন। গোরাচাঁদ পীর যেদিন সেখানে উপস্থিত হইলেন সেইদিন রাজা মহীদানন্দের কৌলিক প্রথানুযায়ী কালী-পূজায় নরবলী উপলক্ষ করিয়া এক সংঘর্ষে লিপ্ত হন। উভয়পক্ষের এই যুদ্ধে বাকানন্দ পীরের হস্তে নিহত হন এবং আকানন্দ কর্তৃক এক দৈবশক্তিসম্পন্ন অস্ত্রাঘাতে গোরাচাঁদ পীর গুরুতররূপে আহত হন। সেই সময় একটি পান পাইলে উহা মন্ত্রপূত করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইতে পারিলে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিতে পারিতেন, এইজন্য একটি পান চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হাতিয়াগড়ে সেই সময় পান পাওয়া যাইত না (কথিত আছে অদ্যাপি এই স্থানে কেহ পান চাষ করেন না)। সুতরাং পান না পাইয়া গোরাচাঁদ পীর রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কুলটিবিহারী নামক গ্রামে আসিয়া এক নির্জন স্থানে শয়ন করিয়া রহিলেন। সেই স্থানে কালু ঘোষ নামক জনৈক গোয়ালার গাভী আসিয়া প্রত্যহ তাঁহার মুখে দুগ্ধধারা বর্ষণ করিয়া যাইত। শোনা যায়, অন্যের অলক্ষ্যে সপ্তাহকাল এইরূপে দুগ্ধ পান করিতে পারিলে তিনি নাকি সুস্থ হইয়া উঠিতে পারিতেন। কিন্তু সপ্তম দিবসে গাভীর দুগ্ধ কম হইতেছে কেন তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য কালু ঘোষ গাভীর অনুসরণ করিয়া গাভী কর্তৃক পীরকে দুগ্ধদান প্রত্যক্ষ করেন। ফলে, গোরাচাঁদ পীর তাঁহার মৃত্যু অবধারিত বুঝিতে পারিয়া কালু ঘোষকে তাঁহার মৃতদেহ হাড়োয়ায় আনিয়া সমাধি দিতে অনুরোধ করেন। কেহ কেহ অনুমান

করেন পীরের হাড় হইতে এই স্থানের নাম হাড়োয়া হইয়াছে।

কালু ঘোষ হিন্দু হইয়া একজন মুসলমানের কবর দিয়াছিলেন এই অপরাধে তাঁহার জনৈক প্রতিবেশী তাঁহাকে প্রায়ই ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া একদিন তিনি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন এবং নরহত্যার অপরাধে ধৃত হইয়া কালু ঘোষ গৌড়ের শাসনকর্তা আলাউদ্দীনের নিকট প্রেরিত হইলে কালু ঘোষের স্ত্রী পীর গোরাচাঁদের সমাধির পার্শ্বে বসিয়া স্বামীর প্রাণ রক্ষার জন্য আকুল প্রার্থনা জানান। কথিত আছে, পীর গোরাচাঁদ কবর হইতে উঠিয়া গৌড়ে গমন করেন এবং কালু ঘোষকে মুক্তি দিবার জন্য গৌড়ের শাসনকর্তাকে অনুরোধ করেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আলাউদ্দীন অত্যন্ত বিস্মিত হন এবং কালু ঘোষকে মুক্তি দিয়া পীরের সেবার জন্য বহু নিষ্কর ভূসম্পত্তি ও পীরের দরগাহের নিকট একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়া দেন। তদবধি কালু ঘোষের বংশধরগণ বহুকাল ধরিয়া এই সমাধির সেবায়েত বা খাদেম ছিলেন। বর্তমানে এই বংশের কাহারও সন্ধান পাওয়া যায় না।

হাড়োয়ায় গোরাচাঁদ পীরের দরগাহে প্রতি ফাল্গুন মাসের ১১ই তারিখ হইতে তিনদিনব্যাপী খুব ধুমধামের সহিত পীরের উরস্ পালন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এমন কি ভারতের নানাস্থান হইতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। উৎসবটি ছয় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

উৎসব আরম্ভের প্রায় পক্ষকাল পূর্ব হইতেই ইহার প্রস্তুতি শুরু হয়। প্রস্তুতি পর্বে পীরের সমাধিস্থানটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রঙ-বেরঙের কাগজের ফুল ও পতাকা, গোলাপ জল, আতর, আগরবাতি এবং সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা উৎসব প্রাঙ্গণটিকে সুশোভিত করা হয়। ১১ই ফাল্গুন সকাল হইতে পীরের সমাধিস্থানে ফতেহা, কোরানপাঠ, মিলাদ মহফিল এবং সারারাত্রিব্যাপী পীরের জীবনী ও ধর্মালোচনা হয়।

এইদিন ভক্তদের নিবেদিত কাঁচা দুধ পীরের সমাধির উপর ঢালিয়া দেওয়া হয় এবং সমাধিস্থান হইতে নির্গত ঐ দুধ মাটির পাত্রে গ্রহণ করিয়া ভক্তেরা পান করেন এবং আত্মীয়-স্বজনদিগকে বিতরণ করেন। সাধারণের বিশ্বাস ঐ দুধ পান করিলে রোগব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহাভিন্ন, অনেকে সমাধিস্থানে ধূলামাটি সারা গায়ে-মুখে মাখেন। প্রধানতঃ এইদিন ভক্তরা পীরের নিকট ফুল-মিষ্টি নিবেদন করেন এবং নূতন বস্ত্র দ্বারা পীরের সমাধিটিকে ঢাকিয়া দেন।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনে প্রথম দিনের ন্যায়ই নানারূপ পর্ব পালন করা হয়। এইদিন ভক্তরা রান্না করা ছাগ বা মুরগীর মাংস এবং অন্ন দিয়া পীরের নিকট মানসিক শোধ করিয়া থাকেন। পীরের নিকট নিবেদনের পর ঐ সকল অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়।

দ্বিপ্রহরে পীরের সমাধিস্থান হইতে একটি শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীগণ দরুদ শরীফ, কোরানপাঠ ও পীরের কীর্তিগাথা গাহিয়া থাকেন। শোভাযাত্রার পথে প্রতীক্ষারত দর্শকেরা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদিগকে পান-জল-মিষ্টি প্রভৃতি দ্বারা আপ্যায়িত করেন এবং যাত্রাপথে ফুল ছড়াইয়া দেন।

উৎসবের তৃতীয় দিনেও সকাল হইতে ভক্তদের মানসিক শোধ, কোরানপাঠ হয় এবং বিভিন্ন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা ধর্মালোচনা করিয়া থাকেন।

উৎসব উপলক্ষে বহু ফকির, দরবেশ প্রভৃতির সমাগম হয় এবং উৎসবের তিনদিন ফকিরদের নানা গানে ও ওস্তাদদের কাওয়ালী গানে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া থাকে।

ডাঃ সিদ্দিকী তাঁহার পুস্তিকায় গোরাচাঁদ পীরের উরস্ শরীফ-এর যে-বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল।

প্রত্যেক বৎসর ১১ই ফাল্গুন তারিখ হইতে ১৩ই ফাল্গুন পর্যন্ত তিন দিন উক্ত মাজারে ওরস্-শরীফ উপলক্ষে জাতিধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে, লক্ষ লক্ষ নরনারী, হাড়োয়া গ্রামে সমবেত হইয়া জেয়ারাত আদি করিয়া থাকে।

মাজার শরীফে ১১ই ফাল্গুন তারিখের রাত্রে যে মাহফিল্ হয়, সেই মাহফিলে, সহস্র সহস্র মোসল্মান্—আলেম, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, কবি, ভক্ত-সাধক সমবেত হইয়া বিভিন্ন ভাষায় এস্লাম্ ধর্মের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওয়াজ, আউলিয়া রাজীর জীবনী সংক্রান্ত প্রবন্ধ পাঠ ও

কবিতা আবৃত্তি করিয়া থাকেন এবং সাধারণ শ্রোতারা তাহা শ্রবণ করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ ঐ দিন রাত্রি ৮টার সময় হইতে উক্ত মাহফিলের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং রাত্রি ১১টা পর্যন্ত কার্য্য চলে। ১১টার সময় ওয়াজ আদি বন্ধ করিয়া এশার নামাজ আদায় করা হয় এবং নামাজ অন্তে পুনরায় ভোরে ওয়াজ আদি চলিতে থাকে।

অতঃপর ১২ই ফাল্গুন তারিখে, ফজরের নামাজ আদায় করিয়া, হজরত পীরের রুহে সওয়াববখশীর উদ্দেশ্যে, কোরয়ান শরীফের খতম্ তেলাওয়াত ও দরুদ শরীফ, বেসমেল্লাহ শরীফ ও কোলহুয়াল্লাহ শরীফ—অন্ততঃ সওয়া লাখ আবৃত্তি করা হয়। পূর্বাহ্ণ দশটার মধ্যে এই সকল কার্য্য সমাপ্ত করিয়া, পীরের পবিত্র রুহে সওয়াব রেসানী করা হয়।

অতঃপর পূর্বাহ্ণ দশটার সময় খাদেমদারেরা পীর পুকুর হইতে পানি উঠাইয়া, মাজার মাকবারাকে উত্তমরূপে ধৌত করেন। তাহার পর পবিত্র বস্ত্র দ্বারা, মাজার মাকবারা মুছিয়া দেওয়া হয়। এই কার্য্য সমাপ্ত হইলে, বার গোপপুরের কিষ্টু ঘোষ ও কানাই ঘোষদিগের সময় পীরের প্রতি যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখান হইত সেইভাবে প্রতিবেশী গ্রামের বহু গোপ নন্দন ও অপরাপর ব্যক্তিরা, ভারে ভারে গো-দুগ্ধ আনিয়া, মাজার মাকবারার দ্বারে সমবেত হয়েন, এবং খাদেমদারেরা উহা মাজার মাকবারার উপর ঢালিয়া দেন। দুগ্ধ 'নরদমা' ভেদ করিয়া, যখন বাহির হইয়া আসে, তখন সেই দুগ্ধ, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলে নিজ নিজ পাত্রে ধরিয়া লয়।

অতঃপর, পুনরায় পীর পুকুর হইতে পানি উঠাইয়া মাজার মাকবারাকে ধৌত করা হয় ও শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পুনরায় দর্গাহ মুছিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর খাদেম্দারদিগের পক্ষ হইতে মাকবারার উপর সোন্দল চড়ান হয়। তাহার পর অপরাপর ব্যক্তির পক্ষ হইতে—(যদি কাহারও মানসিক থাকে) সোন্দল্ চড়ান হয়। এই সময় দফ বাদ্য বাজান হয়।

এই কার্য্য সমাপ্ত হইলে, জনসাধারণের তরফ হইতে শির্ণী নেয়াজ ও হাজুত্ নেয়াজ উপস্থিত করা হয় এবং খাদেম্দারদিগের দ্বারা উহা গৃহীত হয়। যখন সোন্দল্ লইয়া দল বাঁধিয়া ভক্তেরা আগমন করেন, তখন তাঁহারা নানাবিধ বাজনা বাজাইয়া ও কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে আগমন করিয়া থাকেন। এই সময় ভক্তিমূলক বাঙলা ভাষায় তারাণা গীত ও গান করা হইয়া থাকে। ১৩ই ফাল্গুন তারিখে সকলেই বিদায় গ্রহণ করে।

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এবং ও'ম্যালি সাহেবের চব্বিশ-পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ও ডাঃ আবদুল্ গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের লিখিত "বালাণ্ডার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী" নামক পুস্তিকার সাহায্যে লিখিত।]

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

হরিপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে সাড়ম্বরে চড়কপূজা হইয়া থাকে। গ্রামে একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়াই প্রতি বৎসর চড়ক উৎসব পালিত হয়। উৎসব উপলক্ষে শতাধিক ভক্ত সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং আশেপাশের প্রায় আট-নয় শত নরনারী মন্দির দর্শন করিতে ও পূজা দিতে আসেন। সংক্রান্তির দিন বৈকালে সন্ন্যাসীদিগের কাঁটাঝাঁপ দেখিতে বহু যাত্রী আসেন। সন্ন্যাসীরা বাঁশের উচ্চ মঞ্চ হইতে নীচে বিছান কাঁটার উপর ঝাঁপ দিবার পূর্বে দর্শকদিগের মধ্যে আম, ডাব ও আতপ চাউল নিক্ষেপ করিয়া মুখে শিব ধ্বনি দিয়া ঝাঁপ দেন। উৎসবটি সর্বজনীন এবং শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। উৎসব উপলক্ষে প্রসাদ বিতরণ এবং যাত্রাভিনয় হয়।

মনসাকালীপূজা

উচিলদহ গ্রামে একটি দেবালয়ে হংসবাহিনী ও সর্প বিভূষিতা মনসাদেবী এবং কালীপূজার ঘট প্রতিষ্ঠিত আছে। বাংলা ১৩৫৩ সনে গ্রামে বসবাসকারী মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীনগেন্দ্র নাথ দাস নামে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া একযোগে মনসা ও কালী পূজার ব্যবস্থা করেন। এই অঞ্চলে ইহা 'মনসাকালীপূজা' নামে খ্যাত। শোনা যায়, শ্রীদাস স্বপ্নে মনসাকালীপূজার নিম্নলিখিত ধ্যানটি জানিতে পারেন এবং এই ধ্যানেই পূজা হয়।

নমস্তে মনসাদেবী, নমস্তে জগতারিণী
সুক্ষমোক্ষদায়ী তুমি গো জননী।

তন্ত্রদায়া মাতা তুমি মন্ত্রজ্ঞানরূপিণী
দয়া-ধর্মজ্ঞান, তুমি বিদ্যাদায়িণী।
তোমারই মা মন্ত্রগুণে প্রচারিলাম জগজ্জনে
ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর
মা কালী মনসাদেবী।

মনসাকালীর নিত্য পূজা হয়। তবে প্রতি শনিবারে ঢাকঢোল বাজনা সহকারে বিশেষ পূজা হইয়া থাকে। প্রতি শনিবারে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু ভক্ত নরনারী মনসাকালীর নিকট মানসিক পূজা দিতে আসেন। শনিবারের পূজায় পূজারীর উপর দেবীর ভর হয় এবং ভরপ্রাপ্ত অবস্থায় পূজারী মানতকারী নরনারীদিগকে নানারূপ রোগব্যাধি মুক্তির দৈব ঔষধপত্রাদির বিধান দিয়া থাকেন।

মহরম

হাড়োয়া গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে মহরম উৎসব পালন করিয়া থাকেন। মুসলমানগণ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মহরম উপলক্ষে উপবাসব্রত, কোরান-পাঠ ও যথাসাধ্য দরিদ্রভোজন পর্ব পালন করেন এবং মহরমের দিন হোসেনের স্মৃতি স্মরণে তাজিয়াসহ শোভাযাত্রা বাহির করেন। শোভাযাত্রার সহিত লাঠিখেলা ও তলোয়ারখেলা প্রদর্শিত হয়। এইভাবে গ্রাম প্রদক্ষিণের পর শোভাযাত্রাকারীরা গোরাচাঁদ পীরের দরগাহে আসিয়া পীঠস্থানের ধূলামাটি সারা গায়ে-মুখে মাখেন এবং কারবালা প্রান্তরের দুঃখময় স্মৃতি স্মরণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

রথযাত্রা

উচিলদহ গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথদেবের বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ দ্বারা যথারীতি জগন্নাথদেবের পূজার পর বিগ্রহকে রথে আরোহণ করাইয়া হরিনাম কীর্তন ও খোল-করতালের বাজনাসহ রথের দড়ি টানা হয়। উৎসবে যোগদানকারী প্রায় দুই-তিন হাজার নরনারী রথযাত্রায় অনুগমন করেন। জগন্নাথ বিগ্রহকে রথে করিয়া গ্রামের' একটি স্থানে নির্দিষ্ট 'মাসীর বাড়ী'তে আনা হয় এবং সেইস্থানে সপ্তাহকালব্যাপী যথারীতি পূজার্চনার পর জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি ব্যক্তিবিশেষের হইলেও আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের লোকজন এই উৎসবে যোগদান করেন।

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা (গোরাচাঁদ পীর)

হাড়োয়া গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে পীর গোরাচাঁদের উরস্ উপলক্ষে পীরের সমাধিস্থান সংলগ্ন ব্যক্তিবিশেষের পঁচিশ-ত্রিশ বিঘা জমির উপর চার-পাঁচ দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মেলায় প্রধানতঃ চব্বিশ-পরগণা জেলার হাড়োয়া, বারাসত, বসিরহাট, বাদুরিয়া প্রভৃতি থানা হইতে এবং কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি জেলা হইতে ট্রেনে, মোটরবাসে, রিক্সায় ও গরুর গাড়ীতে করিয়া প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার নরনারী আসেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ভিন্ন, চব্বিশ-পরগণা জেলার বিভিন্ন থানা হইতে এবং কলিকাতা হইতে প্রধানতঃ প্রতি বৎসর বিক্রেতা ও ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় দুইশতাধিক দোকানপাট বসে। উহার মধ্যে মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মনিহারী প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, কাপড়চোপড়, মাটির তৈয়ারী জিনিসপত্র, কাঠের তৈয়ারী আসবাবপত্র, বই-ছবি, প্লাষ্টিকের খেলনা, ফটোগ্রাফীর দোকান, পিক্‌টোগ্রাফীর দোকান, চুড়ি-ঘুনসীর দোকান, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান এবং মাদুর প্রভৃতির দোকান বসে এবং হাঁস, মুরগী, ছাগল প্রভৃতি পশু-পক্ষী ক্রয়বিক্রয় হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কর আদায় করা হয়।

আমোদপ্রমোদ উপলক্ষে প্রায় প্রতি বৎসর এখানে কয়েকটি সার্কাস ও ম্যাজিক দল আসে। তাহাছাড়া, কবিগান, কাওয়ালীগান এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক

তথ্য ও শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। মেলায় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্থানীয় থানার পুলিশ-বাহিনী বিশেষ সহযোগিতা করেন।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

হরিপুর গ্রামের ধনপোতা বাজারের সংলগ্ন শিবমন্দির প্রাঙ্গণে চৈত্র মাসে চড়কপূজা উপলক্ষে দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। সাধারণতঃ বৈকালের দিকেই মেলায় লোকসমাগম বেশী হয়।

তালবেড়ে, অর্জুনতলা, পায়রাগাছা, খলিসানী, শঙ্করপুর, গোয়ালপোতা, খলিধারী, আন্দুলিয়া, চৌহাটা, সাবাসপুর, মেটোয়ারী, মথুরা, শেরপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ সাধারণতঃ হাঁটিয়াই মেলায় আসেন।

হাড়োয়া হাটের ব্যবসায়ীগণ ব্যতীত প্রতি বৎসর কলিকাতা হইতে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী ও ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় মোট প্রায় ষাটটি দোকানপাট বসে। মিষ্টান্ন, মনিহারী, খেলনা, পুতুল, বাসনকোসন, কৃষি-যন্ত্রপাতি, কাপড়, গামছা, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র, সরবতের দোকান, কবিরাজী ঔষধপত্র, বই-ছবি প্রভৃতি মেলায় আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় একটি যাত্রাদল ব্যতীত কোন কোন বৎসর পেশাদারী যাত্রাদল কর্তৃক যাত্রাভিনয় হয়। যাত্রানুষ্ঠানে প্রায় পাচশত দর্শকের সমাগম হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

হাড়োয়া গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে ব্যক্তিবিশেষের জমির উপর তিন-দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

মেলায় নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিন-চার হাজার নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে। তন্মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের নারীর সংখ্যাই অধিক। যাত্রীগণ প্রধানতঃ মোটরবাস, রিক্সা ও পায়ে হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রীর পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য প্রতি বৎসর নিয়মিত কোন ব্যবস্থা করা হয় না। তবে কোন কোন বৎসর স্থানীয় যুবকবৃন্দ থিয়েটার বা যাত্রাভিনয় করিয়া থাকেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক চলচ্চিত্র দেখাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

মহরমের মেলা

হাড়োয়ার মহরম উৎসব উপলক্ষে হাড়োয়া রোডের উভয় পার্শ্বে এবং স্থানীয় হাটের জমিতে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

আশেপাশের গ্রাম ব্যতীত বারাসত, বসিরহাট প্রভৃতি থানা হইতে মেলায় সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাচ-ছয় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ সাধারণতঃ ট্রেনে, বাসে ও পদব্রজে মেলায় আসেন।

নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রাম হইতে বিক্রেতারা আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মনিহারী প্রভৃতি জিনিসপত্রের পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং দশ-পনর জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান ও তোলা আদায় করা হয়।

এই মেলায় আমোদপ্রমোদ উপলক্ষে লাঠিখেলা প্রতি-যোগিতা হয় এবং ম্যাজিকের দল আসে।

থানা : মিনা খাঁ

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : মালঞ্চ। ৮০।১৬২৭৭।১৩৬।৭৩৪

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, নাপিত, কামার, জেলে, বাগ্দী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরি ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলষ্টেশন ক্যানিং শহর। শিয়ালদহ হইতে মোটরবাসে ঘুসিঘাটা কর্পোরেশন পর্যন্ত আসিয়া সেখান হইতে মোটরলঞ্চযোগে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। তাহাছাড়া, কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে নৌকাযোগে বা মোটরলঞ্চযোগে কুলটি লকগেট পার হইয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ভাদ্রসংক্রান্তিতে মনসাপূজা। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। ভাদ্রসংক্রান্তির দিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালীমন্দির, একটি তারকেশ্বর নামে খ্যাত শিবমন্দির, মনসাদেবীর একটি নির্দিষ্ট স্থান এবং বনবিবির একটি দরগা আছে।

গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে জানা যায় যে, বহুকাল পূর্বে স্থানীয় অধিবাসীরা ফুলের চাষ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। ইহা ব্যতীত গ্রামের ধনী ব্যক্তিরা নানা রকম ফুলের বাগান করিতেন। এই কারণে গ্রামের নাম মালঞ্চ হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

শ্রীনীলকান্ত প্রামাণিক, শিক্ষক,
গ্রাম : মালঞ্চ, পোঃ মিনা খাঁ,
২৪-পরগণা।

১। গ্রাম : বামনপুকুরিয়া। ৯০।৯৯৪৫৭।৫৭৩।২,২৮৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, ধোপা, কামার, খ্রীষ্টান ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) পূর্ব রেলপথে হাড়োয়া রোড স্টেশনে নামিয়া বেড়াচাপা-হাড়োয়া বাস রুটে হাড়োয়া খাল পার হইয়া সেখান হইতে মোটরবাসে গ্রামে পৌছান যায়। তাহা-ছাড়া, শ্যামবাজার হইতে মোটরবাসে বেড়াচাপা হইয়া হাড়োয়া এবং হাড়োয়া খাল পার হইয়া ঘুসিঘাটা হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, পৌষ মাসে পৌষপার্বণ এবং চৈত্র মাসে শিবপূজা ও গোরাচাঁদ পীরের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সম্প্রতিকালের।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

শিবপূজার মেলা। চৈত্র মাসে একদিন।

গোরাচাঁদ পীরের তিরোধান উৎসব উপলক্ষে মেলা। চৈত্র মাসে দুইদিন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির, একটি শীতলামন্দির এবং একটি পঞ্চানন্দ, একটি আটেশ্বরী, চারটি শীতলা, দুইটি কালী এবং একটি মনসার স্থান আছে। ইহা ব্যতীত, পীর গোরাচাঁদের একটি দরগাহ আছে।

শ্রীনুট বিহারী জানা,
বামনপুকুরিয়া, ২৪-পরগণা।

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব
(গোরাচাঁদ পীর)

বামনপুকুরিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে গোরাচাঁদ পীরের উরস্ অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রামে মাত্র একঘর মুসলমান পরিবার বাস করেন, তাঁহাদের গৃহপ্রাঙ্গণে গোরাচাঁদ পীরের নামে একটি দরগাহ আছে। শোনা যায় জনৈক হিন্দু কর্তৃক এই দরগাহ প্রতিষ্ঠিত। চৈত্র মাসে পীরের উরস্ উপলক্ষে পার্শ্ববর্তী কুশাংরা গ্রামে বসবাসকারী মুসলমানগণ এই গ্রামে আসিয়া উৎসবের আয়োজন ও পরিচালনা করেন এবং স্থানীয় হিন্দুগণও ইহাতে সহযোগিতা করিয়া থাকেন।

উৎসবের দিন অপরাহ্নে উৎসবে যোগদানকারী মুসলমানগণ পীরের দরগাহে জমায়েত হন এবং অতঃপর নানা বাদ্যভাণ্ডসহ একটি শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম পরিক্রমায়

বাহির হন। শোভাযাত্রার পুরোভাগে জনৈক ফকির রঙ্গীন কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া ক্ষীরের গামলা বহন করেন। এই ভাবে গ্রাম পরিক্রমা শেষে শোভাযাত্রাকারীরা দরগাহে ফিরিয়া আসিলে পর ভক্তদের মধ্যে প্রসাদরূপে উক্ত ক্ষীর বিতরণ করা হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই গোরাচাঁদ পীরের নিকট নৈবেদ্য, ডালা ও অর্থাদি মানত দিয়া থাকেন।

[গোরাচাঁদ পীর সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য হাড়োয়া গ্রাম বিবরণী দ্রষ্টব্য।]

মেলা বিবরণী

দুর্গাপূজার মেলা

বামনপুকুরিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে স্থানীয় নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র কুড়ি-পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী মিনাখাঁ, উচিলদহ, ধুতুরদহ প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ ব্যতীত পার্শ্ববর্তী মিনাখাঁ, কুশাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসেন। বিবিধ খাবার দ্রব্য, মনিহারী, খেলনা-পুতুল, ফলমূল ইত্যাদি দ্রব্যসামগ্রীর প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকান-পাট বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই গ্রামে অনুষ্ঠিত পীর গোরাচাঁদের মেলার এবং চৈত্র মাসে শিবপূজার মেলার বিবরণী উল্লিখিত দুর্গাপূজার মেলা বিবরণীর অনুরূপ।



গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ কেওটসাহা। ১০।৩০৬'৫৭।৫৮।৪১২

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) শিয়ালদহ-বনগ্রাম রেলপথে হাবড়া স্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরজীউর সর্বজনীন দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্যামসুন্দরজীউর পাকা মন্দির আছে। শোনা যায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে এই বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শ্যামসুন্দরজীউর একটি মন্দির আছে।

শ্রীঅনিল কান্তি বড়াল, প্রধান শিক্ষক,
সেনডাঙ্গা বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
পোঃ টাবাবেড়িয়া, ২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ মল্লিকপুর। ১৪১।৫১৯'৭০।১১৬।৬২৭

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বারুই, জেলে, গোয়ালা, নমঃশূদ্র প্রভৃতির বাস।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে গোবরডাঙ্গা রেল-স্টেশন। একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) পৌষসংক্রান্তিতে বাস্তুপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা, ফাল্গুন মাসে কালীপূজা ও নামসংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি ষষ্ঠীতলা, একটি মনসাতলা ও দুইটি কালীতলা আছে।

শ্রীবিভূপদ চক্রবর্তী,
কনকনিয়া মেটিয়াগাছি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
পোঃ গোবরডাঙ্গা, ২৪-পরগণা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য— এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আমাদের সংবাদদাতা শ্রীবিভূপদ চক্রবর্তী মহাশয় জানাইয়াছেন নিকটবর্তী মেটিয়াগাছি (মৌজা নং ১৪০) গ্রামে ইছালে ছাওয়ার উপলক্ষে প্রতি বৎসর একটি মেলা বসে।

ইহাভিন্ন, হাবড়া থানার অন্তর্গত অশোকনগর বানীপুরে স্থানীয় ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় প্রতি বৎসর শীতকালে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি মেলা বসে। মেলাটি দেশ স্বাধীন হইবার পর আরম্ভ হইয়াছে।

[গোবরডাঙ্গা ও গৈপুরে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য-বিবরণী নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

গোবরডাঙ্গা

চব্বিশ-পরগণা জেলার হাবড়া থানার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গার দূরত্ব কলিকাতা হইতে প্রায় ৩৬ মাইল। অতীতে ইহা প্রাচীন কুশদ্বীপ বা কুশদহ অঞ্চলের অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট পল্লী ছিল। এই কুশদ্বীপ বা কুশদহ অঞ্চলের সঠিক সীমানা কি ছিল তাহা আজ আর জানিবার উপায় নাই; তবে ইহা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শাসনাধীন যশোহর, নদীয়া ও চব্বিশ-পরগণা জেলার কিয়দংশ লইয়া গঠিত ছিল বলিয়া জানা যায়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার রাজ্যকে যে চারটি সমাজে বিভক্ত করিয়াছিলেন কুশদহ সমাজ তাহার মধ্যে একটি। যমুনা নদীর তীরবর্তী গোবরডাঙ্গা, খাটুরা, গৈপুর, ইছাপুর, গাইঘাটা, জলেশ্বর, চারঘাটা প্রভৃতি বর্তমানে আমাদের আলোচ্য গ্রামগুলি কুশদহ অঞ্চলের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য উল্লেখযোগ্য স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল।

কুশদহের মধ্য দিয়া প্রবাহিত যমুনা নদী তৎকালে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দূর দেশে যাতায়াতের অন্যতম প্রধান জলপথরূপে ব্যবহৃত হইত। ইহা বর্তমান চারঘাটার নিকট ইছামতী নদীর সহিত মিলিত হইয়া বাদুরিয়া, বসিরহাট, টাকী, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ হইয়া সুন্দরবন অঞ্চলের মধ্য দিয়া নানা শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হইয়া সাগরাভিমুখে প্রবাহিত ছিল। এই জলপথ দিয়াই গোবরডাঙ্গা হইতে কলিকাতা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী

সওদাগরী নৌকা যাতায়াত করিত। তখন দেশে রেলপথ স্থাপিত হয় নাই, রাস্তাঘাট নির্মিত হয় নাই। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চল দিয়া কলিকাতা হইতে যশোহর রোড নির্মিত হয় এবং ইহার প্রায় শতবর্ষ পরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে শিয়ালদহ-খুলনা রেলপথ স্থাপিত হইলে পর মূলতঃ গোবরডাঙ্গার জমিদার এবং খাটুরার বড় বাড়ীর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রমুখ স্থানীয় ব্যক্তিদিগের প্রচেষ্টায় এই স্থানে (গোবরডাঙ্গায়) একটি রেলস্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন ট্রেন ব্যতীত কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে যশোহর রোড দিয়া ঘাটঘাটা হইয়া মোটরবাসে অনায়াসেই এই গ্রামে যাতায়াত করিতে পারা যায়। ফলে, জলপথে যাতায়াতের আজ বড় একটা প্রয়োজন নাই; সে গুরুত্বও নাই। অতীতের সেই প্রশস্ত, উচ্ছল যমুনা আজ একটি শীর্ণকায় খালের ন্যায় কেবলমাত্র নামটুক সম্বল করিয়া কোনক্রমে টিঁকিয়া আছে। মজিয়া যাওয়া যমুনা নদী দেখিয়া সেদিনের সেই কর্মচঞ্চল স্রোতস্বিনীকে চিনিতে পারিবার উপায় নাই। অথচ যমুনার সহিত সংযুক্ত চালুন্দিয়া খাল সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে, একদা এই নদী এত প্রশস্ত ছিল যে, উহা পারাপার করিতে দিন অবসান হইয়া যাইত বলিয়া যাত্রীরা সঙ্গে চাউল ও হাঁড়ি লইতেন। অনুমান চাউল-হাণ্ডিয়া অপভ্রংশে চালুন্দিয়া হইয়াছে এবং ইহার একটি অংশে খারুচা বা খাটুরা গ্রাম অবস্থিত। হয়ত এই কিংবদন্তী হইতে অনুমান করা যাইতে পারা যায়, যমুনা নদীর অতীত কলেবরের স্বরূপ।

গ্রাম্য কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, এই অঞ্চল শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল ছিল। আশেপাশে অবস্থিত গৈপুর, গোপীনাটোলা, কানাইনাটশালা প্রভৃতি গ্রামের নামকরণ উক্ত কিংবদন্তীকে অনুসরণ করিয়াই চিহ্নিত। এইরূপ এক কিংবদন্তী অনুসারে বলা হয় যে, গোপদিগের গাভীর গোবর এই স্থানে সঞ্চিত করা হইত বলিয়া এই গ্রামের নাম হয় গোবরডাঙ্গা। গোবরডাঙ্গার সংলগ্ন খাটুরা গ্রাম সম্পর্কে বলা হয় যে, এই অঞ্চলে কঙ্কণা হ্রদ বেষ্টিত মেদিয়া গ্রামে রত্নেশ্বর রায় নামে জনৈক রাজা বসবাস করিতেন এবং এই স্থানে তাঁহার গাভী রাখিবার খোঁয়াড় ছিল বলিয়া গ্রামের নাম খাটুরা হইয়াছে। সে যাহাই হউক গোবরডাঙ্গা-খাটুরা যে একটি প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই স্থানে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ভিন্ন বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বসবাস করিতেন এবং টোল ও চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত চর্চা হইত। এই স্থানের বিদগ্ধ পণ্ডিত ও মনীষীগণের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সুদূর বিস্তৃত ছিল। অতীতের ন্যায় ইহার বর্তমানও কম গৌরবের নহে। গোবরডাঙ্গা নিবাসী কবি ক্ষেত্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, খাটুরার বড় বাড়ীর মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই, সি, এস, মহাশয় এবং মহিলা সাহিত্যিক প্রভাবতী দেবী প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আরো উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রখ্যাত কথক ও কবি রামধন তর্কবাগীশ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় খাটুরা গ্রামের একজন সুসন্তান এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে তিনিই প্রথম বিধবা বিবাহ করেন। নিকটবর্তী চৌবেড়িয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীদীনবন্ধু মিত্র তাঁহার প্রখ্যাত সুরধনী কাব্যে শ্রীশচন্দ্র সম্পর্কে লেখেন—

"সাহিত্য-সবিতা শ্রীশ সুনিষ্ঠ পাঠক।
বিধবা সধবা করা পথ প্রদর্শক॥"

বাংলা দেশে চিনির ব্যবসায় গোবরডাঙ্গা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই স্থানে অনেকগুলি চিনি প্রস্তুতের কারখানা ছিল এবং গোবরডাঙ্গার কলের চিনি কলিকাতা তথা বহির্বাংলায়ও রপ্তানি হইত। ইহাভিন্ন, খাটুরা-উত্তরপাড়ায় একটি লবণের কারখানা ছিল এবং এখানে নীলের চাষ হইত। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে নীল চাষীদের সহিত বিবাদের ফলে এই স্থানে নীলের চাষ বন্ধ হইয়া যায়। নিকটবর্তী সরকারপাড়ায় অদ্যাপি একটি নীলকুঠিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

গোবরডাঙ্গা-খাটুরার আদি বাসিন্দাদের মধ্যে স্থানীয় জমিদার মুখোপাধ্যায় পরিবার, দত্ত ও কুণ্ডুগণ এবং খাটুরার বন্দ্যোপাধ্যায়, রক্ষিত, সরখেল, পাল, সেন, আশ প্রভৃতি পরিবারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা অধিকাংশই তেজারতী ও মহাজনী কারবার করিতেন এবং হুগলী সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি অবরুদ্ধ হইলে পর (যেমন আশ, সেন প্রভৃতি পরিবার) এই স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। স্থানীয় পালেরা বর্গীর হাঙ্গামাকালে এবং যতদূর জানা যায় দত্ত পরিবারের মহেশ চন্দ্র দত্ত বাংলা ১০৭০ সনে এই স্থানে বসতি স্থাপন করেন।

স্থানীয় মুখোপাধ্যায় পরিবার প্রজাহিতৈষী জমিদাররূপে পরিচিত। ইঁহাদের আদি নিবাস যশোহর জেলার সারসা গ্রামে। এই বংশের খেলারাম মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গার জমিদারী ক্রয় করেন। গোবরডাঙ্গার শিক্ষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও নানামুখী উন্নতির মূলে এই পরিবারের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধরগণের কেহ কেহ এই স্থানে বসবাস করিতেছেন। যমুনা নদীর তীরে 'প্রসন্ন ভবন' নামে খ্যাত প্রাসাদতুল্য দুইটি প্রাচীন অট্টালিকা মুখোপাধ্যায়দিগের অতীত সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তির সাক্ষীরূপে দাঁড়াইয়া আছে। খেলারাম মুখোপাধ্যায়ের পুত্র কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাংলা ১২২৯ সনে 'প্রসন্ন ভবন' নির্মাণ করেন। তাঁহার আমলে জমিদারীর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। প্রসন্ন ভবনের মধ্যস্থিত বিখ্যাত নাচ ঘরে কেবলমাত্র সঙ্গীত ও নৃত্যকলা চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই; দেশ এবং জাতির কল্যাণ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ বিদ্যাসাগর, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, কেশব চন্দ্র সেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতারাও এই নাচ ঘরে একদা মিলিত হইয়াছিলেন। প্রজাবৎসল জমিদার সারদা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় গোবরডাঙ্গায় শিক্ষা, চিকিৎসা, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি বহু উন্নতিমূলক কার্য সাধিত হয়। ইঁহাদের অট্টালিকার বহিপ্রাঙ্গণে যে সূর্যঘড়ি স্থাপিত আছে তাহা সারদা প্রসন্নের প্রচেষ্টায় তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর উড্রো সাহেবের তত্ত্বাবধানে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। যদিও ইহার সময় নির্দেশক ঘণ্টা, মিনিট বা পলের চিহ্নগুলির অধিকাংশই আজ কালের প্রভাবে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাভিন্ন, ইঁহাদের পারিবারিক সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রাচীন ও মূল্যবান বহু নিদর্শনের সহিত গৃহকর্তাদিগের শিকারের স্মৃতি-স্মারক নানারূপ মৃত জীবজন্তুগুলিও বাস্তবিক দ্রষ্টব্য বস্তু। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই পরিবারের জ্ঞানদা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কেবল মাত্র সুরবাহার বাদ্যযন্ত্রশিল্পী হিসাবেই খ্যাত ছিলেন না, ভারতের তৎকালীন বিখ্যাত শিকারী-দিগের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিচিত ছিলেন। প্রসন্ন ভবন সংগ্রহশালায় রক্ষিত উল্লিখিত মৃত জীবজন্তুগুলির অধিকাংশই তাঁহার শিকারী জীবনের সার্থক সম্মানরূপে বিরাজিত। স্বাধীনতার পর এই পরিবারের শ্রীজয়ন্তী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন।

বর্তমানে গোবরডাঙ্গা একটি মিউনিসিপাল শহর। স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠানটি ১১টি ওয়ার্ডে বিভক্ত এবং মোট ৪'০০ বর্গমাইল এলাকা লইয়া গঠিত। আগামী ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠানটির শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে গিরিজা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রচেষ্টায় এই জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। এই শহরে ডাকঘর, হাসপাতাল, প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়, মহা-বিদ্যালয়, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, সাধারণ পাঠাগার, বাজার, সিনেমা এবং একটি সরকারী পশুপালন কেন্দ্র আছে। এই পশুপালন কেন্দ্রের চারিদিকে বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়িয়া অশ্বখুরাকৃতি একটি হ্রদ স্থানটিকে মনোরম করিয়া রাখিয়াছে। ১৯৪৭ সালে 'গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই অঞ্চলের বিদ্যার্থীদের উচ্চ শিক্ষা-লাভের পথ সুগম হইয়াছে।

এই স্থানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, তেলী, কামার, কুমার, হাড়ী, বাগ্দী, ডোম, ঋষিদাস, নমঃশূদ্র, মুসলমান, আদিবাসী, সাওঁতাল, বুনো প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস। নীলচাষ উপলক্ষে বুনো সম্প্রদায় বাঁকুড়া, বীরভূম, ছোট-নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে এই স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ভারত স্বাধীন হইবার পর উদ্বাস্তু আগমনের ফলে এই স্থানে কয়েকটি বৃহৎ উদ্বাস্তু উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ায় পূর্বের তুলনায় এই স্থানের লোকসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় সত্তর ভাগই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। ১৯৬১ সনের জনগণনা অনুসারে এই স্থানের মোট জনসংখ্যা ১৩,৪৭৬। দেশ বিভাগের ফলে বহু শিক্ষিত লোক এই স্থানে আসিয়া বসবাস স্থাপন করায় গোবরডাঙ্গার শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আবার নূতন করিয়া জোয়ার আসিয়াছে।

গোবরডাঙ্গার প্রসন্নময়ীকালী বিশেষ জাগ্রত ঈশ্বরী বলিয়া খ্যাত। জমিদার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বাংলা ১২২৯ সনে জমিদার বাড়ীর বহিপ্রাঙ্গণে প্রসন্নময়ী কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্মুখে রকসহ বারান্দাযুক্ত দক্ষিণমুখী একটি পাকা ঘরে শ্বেত পাথরের বেদীর উপর শবরূপী শিবের বক্ষে দণ্ডায়মানা প্রায় ২½ ফুট উচ্চ কষ্টি পাথরের সুন্দর দক্ষিণা কালিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। শবরূপী শিব শ্বেত পাথরে নির্মিত। দেবী নানারূপ রৌপ্য ও স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা। ইহাভিন্ন, এই মন্দিরে শ্বেত

পাথরের একটি গোপাল মূর্তি এবং কয়েকটি নারায়ণ শিলা আছে। দালান ও মন্দিরাভ্যন্তরের মেঝে শ্বেত পাথর দ্বারা নির্মিত। কথিত আছে দেবী প্রসন্ন হইয়া একদা স্বপ্নাদেশে মুখোপাধ্যায় পরিবারে আসিয়াছিলেন বলিয়া ইনি প্রসন্নময়ীকালীরূপে খ্যাত হন। এই কারণে অদ্যাপি এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের প্রতিটি পুরুষের নামের সহিত 'প্রসন্ন' শব্দ যুক্ত থাকে। দেবীর নিত্য অন্নভোগ ও সন্ধ্যারতি ব্যতীত প্রতি বৎসর নববর্ষে, শারদীয়া অষ্টমী তিথিতে ও কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে সাড়ম্বরে পূজাপাট এবং প্রতি শনি মঙ্গলবার বিশেষ পূজা হইয়া থাকে। উৎসব উপলক্ষে আশেপাশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু লোকজনের সমাগম হয়। শনি-মঙ্গলবার অনেকে দেবীর নিকট মানসিক করেন ও মানত শোধ করিয়া পূজা দেন। মানত অনুসারে ষোড়শোপচারে পূজা, অর্থ বস্ত্র, অলঙ্কার ও পাঠা বলি দিয়া থাকেন।

প্রসন্নময়ী কালীমন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যেই উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত দুইটি সারিতে পূর্বমুখী ছয়টি ও পশ্চিমমুখী ছয়টি মোট দ্বাদশটি শিবমন্দির আছে। শিবমন্দিরগুলি আটচালা গঠনরীতিতে নির্মিত এবং উহার প্রতিটি মন্দিরেই গৌরীপট্টসহ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি ও চৈত্র মাসে গাজন উৎসব ও তদুপলক্ষে মেলা বসে। ইহাভিন্ন, কুণ্ডপুকুর পাড়ে চৈত্র মাসে চড়কপূজা ও তদুপলক্ষে মেলা এবং সমাদ্দারপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দিরে চড়কপূজা ও তদুপলক্ষে যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

চৈত্র মাসের শুরু হইতেই গাজন উৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। প্রধানতঃ স্থানীয় কেওট, বাগ্দী, বাউরী ও কিছু সংখ্যক উচ্চবর্ণের হিন্দু গাজনে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসব্রতীগণ ব্রতগ্রহণের পর নূতন গেরুয়া বস্ত্র পরিধান ও গলায় উত্তরীয় ধারণ করিয়া একবেলা হবিষান্ন ভক্ষণ এবং রাত্রিকালে গৃহের বাহিরে বাস করেন। সংক্রান্তির পূর্বদিন সন্ধ্যায় ভক্তেরা শিবমন্দিরে নীলের প্রদীপ দেন এবং রাত্রিকালে সাড়ম্বরে নীলপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন সন্ন্যাসীরা ঢাক-ঢোল বাজাইয়া উৎসব প্রাঙ্গণে নৃত্য-গীত করিয়া থাকেন। সংক্রান্তির দিন গাজনে সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ-পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ঝাঁপ উপলক্ষে একটি খেজুর গাছের নীচে চারজন সন্ন্যাসী একটি চাদরে ধারাল অস্ত্র-শস্ত্র রাখিয়া উহার চারিকোণ ধরিয়া দাঁড়ান এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীরা ঐ খেজুর গাছের উপর হইতে একটি খেজুর কাঁটার ডাল ও একছড়া খেজুর হাতে লইয়া একের পর এক নীচে বিস্তৃত চাদরের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়েন। এইভাবে ঝাঁপ দেওয়ার পর সন্ন্যাসব্রতীগণ কণ্টকিত জমির উপর গড়াগড়ি দেন। ঝাঁপপর্ব দেখিতে বহু লোকের সমাগম হয়। ১লা বৈশাখ সন্ন্যাসব্রতীগণ মন্দির প্রাঙ্গণে ঢাক-ঢোলের বাজনার তালে তালে কিছুক্ষণ নৃত্য করেন, ইহাকে 'ধানবোনা নাচ' বলে। মধ্যাহ্নে সন্ন্যাসী ভোজনের আয়োজন করা হয়। সন্ন্যাসী ভোজের পর গাজন উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

১লা বৈশাখ অপরাহ্নে প্রসন্নময়ী কালীমন্দির প্রাঙ্গণে গোষ্ঠ উৎসব পালন করা হয়। ইহা মুখোপাধ্যায় পরিবার কর্তৃক প্রবর্তিত প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন উৎসব। পূর্বে এই উৎসব উপলক্ষে চারিদিক ঘেরা একটি স্থানে একটি গাভী ও একটি শূকর শাবককে ছাড়িয়া দেওয়া হইত এবং গাভী ও শূকর শাবক দুইটি প্রাণ ভয়ে ছোটাছুটি করিতে করিতে যতক্ষণ পর্যন্ত না গাভীটি শূকর শাবককে আক্রমণ করিত ততক্ষণ পর্যন্ত এই খেলা চলিত। এইরূপ আমোদ প্রত্যক্ষ করিতে বহু লোকের সমাগম হইত। বহুদিন হইল এই খেলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

গোষ্ঠ উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ যমুনা নদীর তীরে এবং জমিদার বাড়ীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসে। অবশ্য চড়ক উপলক্ষে চৈত্রসংক্রান্তির দিনই এই মেলা আরম্ভ হয়, তবে ১লা তারিখে গোষ্ঠ উপলক্ষ করিয়া অধিক দোকানপাট ও লোকসমাগম হয় বলিয়া ইহা গোষ্ঠ মেলা নামেই পরিচিত। সপ্তাহব্যাপী স্থায়ী এই মেলায় আশেপাশের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় বিশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মসলন্দপুর, চারঘাটা, লক্ষ্মীপুর, মেদিয়া, গাইঘাটা, হাবড়া প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। ইহাতে শতাধিক দোকানপাট বসে এবং পচিশ-ত্রিশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, পান-বিড়ি, সরবত প্রভৃতি বিভিন্ন খাবারের দোকান এবং তামা, পিতল, লোহা, এলুমিনিয়ম, কাঁচ ও মাটির তৈয়ারী বাসনপত্রের দোকানের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। ইহাছাড়া, মনিহারী, কাপড়চোপড়, লাঙ্গল, জোয়াল, কাস্তে, কোদাল, নিড়েনী প্রভৃতি কৃষি ও

কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলো, টোকা, পাখা প্রভৃতি দ্রব্য, মাটির খেলনা-পুতুল, বই-ছবি ও ঔষধপত্রের দোকানপাট বসে। শিল্প-সামগ্রী বিক্রেতারা প্রতি বৎসর প্রধানতঃ লক্ষ্মীপুর, চারঘাটা, মেদিয়া ও হ্যাওড়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে আসেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য মেলায় সার্কাসের দল আসে এবং জুয়া ও লটারী খেলা হয়। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদল মেলায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয় এবং আদায়কৃত অর্থ প্রসন্নময়ীকালীর সেবা-পূজার নিমিত্তে ব্যয় করা হয়।

ইহাভিন্ন, গোবরডাঙ্গার ষষ্ঠীতলায় প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা এবং আশ্বিন মাসে শারদীয়া বিজয়া দশমী তিথিতে প্রসন্নময়ী কালীমন্দিরের নিকট যমুনা নদীর তীরে মেলা বসে। রথযাত্রার মেলাটি প্রাচীন এবং প্রতি বৎসর প্রায় সাত-আট হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

উল্লিখিত মন্দিরাদি ব্যতীত, সমাদ্দারপাড়ায় একটি হরিসভা গৃহে প্রতিষ্ঠিত গৌর-নিতাই বিগ্রহের নিত্য পূজা ও বৎসরের যে-কোন সময় মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভট্টাচার্যপাড়ায় 'বাবারথান' নামে খ্যাত ধর্মঠাকুরের নির্দিষ্ট স্থানে গাজনের সময় পূজা হয়। সাধুর্খাপাড়ায় একটি দেবালয়ে মৃন্ময়ী কালী মূর্তি, ১নং কলোনীতে একটি রক্ষাকালী মূর্তি ও দুইটি মনসামন্দির এবং ২নং কলোনীতে একটি শীতলা ও একটি কালী মন্দির আছে। ১নং কলোনীতে অবস্থিত একটি মনসামন্দিরের সেবায়েত শ্রীরমেশ চন্দ্র সাহা। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী একটি সাধারণ দালানঘর মাত্র। ইহার মধ্যস্থলের প্রকোষ্ঠে মৃন্ময়ী মনসা মূর্তি, বাম পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে শীতলা মূর্তি, দক্ষিণ পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ এবং একটি পৃথক মন্দিরে গৌরীপট্টসহ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবমন্দিরটি বাংলা ১৩৭৫ সনে এবং মনসামন্দিরটি বাংলা ১৩৭৪ সনে কলিকাতার রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল কর্তৃক নির্মিত। মনসামন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত পাকা নাট-মন্দির আছে। উক্ত দেবদেবীর নিত্য পূজা হয়। প্রতি বৃহস্পতি ও রবিবার সেবায়েতের উপর মনসাদেবীর ভর হইয়া থাকে এবং ভর প্রাপ্ত অবস্থায় তিনি নানারূপ দৈব ঔষধের নির্দেশ দিয়া থাকেন। সেই জন্য সপ্তাহের এই দুইদিন মন্দিরে অনেক ভক্তের সমাগম হয়। প্রতি বৎসর বৈশাখী শুক্লা তিথিতে মনসাদেবীর বার্ষিক উৎসব হয়।

দ্বিতীয় মনসামন্দিরটির বর্তমান সেবায়েত শ্রীমতী মুনীরানী দে নামক জনৈক মহিলা। মন্দিরটির নির্মাণ কার্য চলিতেছে, কলিকাতার শ্রীসুবোধ রায়চৌধুরী নামে জনৈক ব্যক্তি মন্দির নির্মাণ করাইতেছেন। এই স্থানেও সেবায়েতের উপর দেবীর ভর হইয়া থাকে। দেবীর নিত্য পূজা ও বৈশাখ মাসে বার্ষিক উৎসব হয়।

ইহাছাড়া, গোবরডাঙ্গায় একটি ষষ্ঠীতলা, একটি বাবাঠাকুরের স্থান এবং বিভিন্ন পল্লীতে প্রতি বৎসর সর্বজনীন দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, সরস্বতী ইত্যাদি পূজা হইয়া থাকে।

গোবরডাঙ্গা সংলগ্ন খাটুরা একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। কিংবদন্তী আছে, পূর্বে এই স্থানে রত্নেশ্বর নামে জনৈক রাজার চারিদিক পরিখাবেষ্ঠিত রাজবাড়ী ছিল। ঐ পরিখা বর্তমানে কঙ্কণা হ্রদ নামে পরিচিত। কঙ্কণা হ্রদ অতিক্রমকালে চণ্ডীদেবী তাঁহার হস্তের অলঙ্কার খাড়ু অর্থাৎ কঙ্কণ এই স্থানে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা খারুড়া নামে খ্যাত হয়। বর্তমানে খারুড়া অপভ্রংশে খাটুরা হইয়াছে। খাটুরা নামকরণ সম্পর্কে অপর যে কিংবদন্তীটি প্রচলিত আছে তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রামে এই চণ্ডীতলায় একটি চালাঘরে চণ্ডীদেবী ও তৎসংলগ্ন আর একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ এবং খাটুরা বাজারের নিকট একটি মন্দিরে মৃন্ময়ী কালী মূর্তি এবং স্থানীয় রক্ষিত পরিবারের একটি দোলমঞ্চ আছে। খাটুরার চণ্ডী বিশেষ জাগ্রত দেবী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। চণ্ডীদেবীর কোন মূর্তি নাই, তবে নিত্য পূজা হয় এবং প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে কালীপূজা উপলক্ষে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়। মৈত্র পদবীধারী ব্রাহ্মণেরা দেবীর পূজারী। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। ইহাভিন্ন, এই স্থানে কঙ্কণা হ্রদের তীরে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত দুইটি জোড়া শিবমন্দির আছে।

গৈপুর

যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত গৈপুর গ্রামেও একদা বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বসবাস ছিল। গ্রাম্য কিংবদন্তী অনুসারে বলা হয় যে, গোপীগণ বাস করিতেন বলিয়া এই স্থানের নাম গোপীপুর হয়। গোপীপুর অপভ্রংশে গৈপুর হইয়াছে। শোনা যায়, গৈপুরে পূর্বে কৃষ্ণনগর রাজাদিগের একটি কাছারিবাড়ী ছিল, এখনও ঐ স্থানটি কাছারিবাড়ী ঘাট নামে পরিচিত। এই স্থানের আদি বাসীন্দারূপে মজুমদার, বসু, মিত্র, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। গৈপুরের বসু পরিবারেই জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ময়ূরভঞ্জের লৌহখনির আবিষ্কারক স্বনামধন্য প্রমথ নাথ বসু মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। কবি অপূর্ব কৃষ্ণ ভট্টাচার্যও এই গ্রামেরই সন্তান। •

গৈপুরের পূজা-পার্বণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রাম্য দেবী ওলাবিবির পূজা। গ্রামে ওলাবিবির একটি প্রাচীন দরগাহ আছে। যমুনা নদীর একটি খালের দক্ষিণ পাড়ে পূর্বমুখী এই দরগাহ ঘরটি অবস্থিত। ঘরটির অবস্থা খুবই জীর্ণ; ইহার দরজা-জানালা বহুকাল পূর্বেই অদৃশ্য হইয়াছে এবং জঙ্গলাবৃত উপরের ছাদ যে-কোন সময়ই ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। দরগাহ গাত্রের একটি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ইহা বাংলা ১৩০৩ সনে রামকৃষ্ণ রক্ষিত ও তাঁহার পুত্র শরৎ চন্দ্র রক্ষিত কর্তৃক নির্মিত এবং রাজমিস্ত্রী ছিলেন নিবারণ চন্দ্র মিস্ত্রী। এই শিলালিপিতে তৎকালীন দরগাহের খাদেম বা সেবায়েতের নামও উৎকীর্ণ ছিল; তবে কোন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি খাদেমের নামটি ঘসিয়া উঠাইয়া দেওয়ায় শিলাগাত্রে আজ কেবল 'শ্রী' ও 'ফকির' এই দুইটি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। তবু একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তিই ওলাবিবির দরগাহের খাদেম ছিলেন।

একটি বাঁধানো বেদীর উপর দরগাহ ঘরের মধ্যে ওলাবিবির প্রতীকস্বরূপ পাশাপাশি তিনটি মাটির ঢিপি দেখিতে পাওয়া যায়। উহার মধ্যস্থলের ঢিপিটি উভয় পার্শ্বের দুইটি ঢিপি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ। ওলাবিবির বেদীর সহিত লাগান বেলেপাথরের উপরে প্রাচীন বাংলা অক্ষরে লিখিত দুইটি শিলালিপি আছে। কিন্তু উহা এতই অস্পষ্ট ও ময়লা দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া আছে যে, উহার মর্মোদ্ধার করা খুবই শক্ত। বাংলা দেশে এই জাতীয় গ্রাম্য দেব-দেবীর জন্য কোন মন্দিরাদি বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ কোন উন্মুক্ত গাছের তলায় বা চালাঘরের নীচে ইঁহাদের নির্দিষ্ট 'থান' বা স্থান থাকে। এই স্থানে ওলাবিবির জন্য শিলালিপিসহ পাকা ঘর নির্মাণ হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ইনি এই অঞ্চলে বিশেষ জাগ্রতা দেবী ছিলেন। তবে বর্তমানে ইঁহার দৈন্যদশা দেখিয়া মনে হয় কালের প্রভাবে ভক্তের অন্তরে ইঁহার মাহাত্ম্য ম্লান হইয়া গিয়াছে।

প্রধানতঃ কলেরা রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ওলাবিবির নিকট মানসিক পূজা দিয়া থাকেন। পূর্বে নিত্য পূজা এবং বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর ফাল্গুনসংক্রান্তি হইতে তিনদিনব্যাপী একটি বৃহৎ মেলা বসিত। যমুনা নদীর খালের ধারে মেলার দোকানপাট বসিত বলিয়া ইহা 'খালপাড়ের মেলা' নামে খ্যাত ছিল। গত বাংলা ১৩৭১ সন হইতে উৎসব ও মেলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে কোন সেবায়েত নাই, নিত্য পূজাও হয় না। তবে আজও ভক্তরা দরগাহে দুধ ঢালিয়া ফুল-বেলপাতা দিয়া মাঝে মাঝে নিজেরাই পূজা দেন।

দরগাহের আশেপাশে বর্তমানে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত কয়েক ঘর উদ্বাস্তু পরিবার বসবাস করিতেছেন। গোবরডাঙ্গা-গাইঘাটা পাকা রাস্তার ধারেই গ্রামটি অবস্থিত। এই রাস্তা হইতে বাহির হইয়া গ্রামের মধ্য দিয়া একটি খোয়া ঢালা রাস্তা সোজা দরগাহের দিকে গিয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, চব্বিশ-পরগণা জেলার উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের উপর কয়েকজন পীর ও বিবিমার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইঁহাদের মধ্যে হাড়োয়ার গোরাচাঁদ পীর, চারঘাটার ঠাকুরবর পীর, কঙ্কণা হ্রদের অপর পারে হয়দাদপুর গ্রামে পীর হৈদর,

সাতবেড়িয়া গ্রামের বিবিচম্পা, মাণিক পীর, সত্য পীর, মুস্কিল-আসান পীর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। চারঘাটা, বেড়ীরামনগর প্রভৃতি অঞ্চলের সমস্যাপীড়িত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষেরা সমস্যা সমাধানের জন্য মুস্কিল-আসান পীরের নিকট মানত জানাইয়া থাকেন। হৈদর পীরের সহিত রাজা রত্নেশ্বর রায়ের সংঘর্ষের কথাও লোক মুখে শোনা যায়।

(গোবরডাঙ্গা, গৈপুর ও ইছাপুর গ্রামের প্রাচীন ইতিহাসালোচনায় শ্রীমতী হাসিরাশি দেবীর 'কুশদহের ইতিহাস' পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।)

মেলা বিবরণী

দোলযাত্রার মেলা

কেওটসাহা গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমায় শ্যামসুন্দরজীউর দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে সরকারী জমির উপর বৈকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

সেনডাঙ্গা, চাপড়া, ভাণ্ডারগাছা, গিলাপোল, পুমলিয়া প্রভৃতি আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় এক সহস্র নর-নারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা নিকটবর্তী গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে মাটি ও লোহার বাসনপত্রের দোকান এবং ময়রা ও তেলেভাজার দোকানের সংখ্যাই অধিক। ইহা ব্যতীত, মনিহারী দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, চ্যাঙ্গারী, কুলো ও বাঁশের জিনিসপত্রের দোকান এবং মাছ, শাকসব্জী ও মুদির দোকান বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য কেবল 'যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

[হাবড়া উপনগরীতে শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১২ই কার্তিক, ১৩৬৫ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়।]

হাবড়া (২৪ পরগণা), ২৫শে অক্টোবর—হাবড়া উদ্বাস্তু উপনগরীতে কমপক্ষেও প্রায় দেড় শতাধিক দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। রং বে-রংয়ের আলোতে মণ্ডপগুলি ঝলমল করিত। শিশুরা রাত্র ভোর হইতে না হইতেই মণ্ডপে দৌড়াদৌড়ি করিয়া পূজার আনন্দ বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়াছিল। পুলিশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মাইক নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছিল, কিন্তু এবারে পূজায় কোন মণ্ডপেই মাইকের যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয় নাই। নবমী পূজায় কচুয়ার মোড়ের এক মণ্ডপে প্রায় ৪ লক্ষ লোক প্রতিমা দর্শন করিয়াছিল। বিজয়া দশমীরদিন বিরাট হাবড়া উপনগরীর কোন রাস্তাতেই তিলধরণের স্থান ছিল না। বিজয়া দশমীরদিন হাবড়ায় বাজী পোড়ান লইয়া দুইদল লোকের কলহ বাধে কিন্তু পুলিশের হস্তক্ষেপের ফলে গণ্ডগোল বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

হাবড়া 'বয়েজ হোম'এ দুর্গোৎসব উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল।

থানা ঃ আমডাঙ্গা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ মশুণ্ডা (মৌজা ঃ ধনিয়া)।

১১।৯০২·২১।৪৩২।২,৩১৩

(ক) গোয়ালা, কলু, কামার, নাপিত ইত্যাদি বর্ণ হিন্দু ব্যতীত কয়েক ঘর ওরাং আদিবাসী গ্রামে বসবাস করেন। গ্রামে পাঁচ-ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) কৃষ্ণনগর রোড দিয়া মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষ মাসে মশান চণ্ডীর পূজা ও উৎসব।

(ঙ) মশান চণ্ডীপূজা উপলক্ষে মেলা। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে সপ্তাহব্যাপী। মেলাটি ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) মশান চণ্ডীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীহৃদয় রঞ্জন পাল, শিক্ষক,
নপাড়া, পোঃ বারাসত,
২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ আমডাঙ্গা। ৪৮।৫০৫·৮৪।২৬০।১,৩৩৫

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় চার মাইল দূরে দোগাছিয়া রেলস্টেশন। কৃষ্ণনগর হইতে তিনটি বাস রুটে নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও ব্রজমোহনজীউর (রাধাকৃষ্ণ) রাসযাত্রা উৎসব, পৌষ মাসে করুণাময়ী কালীর বার্ষিক উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। করুণাময়ী কালীমন্দিরে দুর্গাপূজা ও সরস্বতীপূজা উপলক্ষে ঘট স্থাপন করিয়া যথারীতি পূজা সম্পন্ন করা হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) করুণাময়ী কালীপূজা উপলক্ষে মেলা। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে চারদিনব্যাপী। গত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মেলাটি আরম্ভ হয়।

(চ) গ্রামে করুণাময়ী কালীর মন্দির ব্যতীত একটি পঞ্চানন্দতলা, একটি ষষ্ঠীতলা, একটি শীতলা ও মনসাতলা আছে। করুণাময়ী কালীমন্দিরে দেবীর ভৈরব বুড়া-শিবের স্থান আছে।

শ্রীহৃদয় রঞ্জন পাল, শিক্ষক
নপাড়া, পোঃ বারাসত,
ও
শ্রীমকবুল আলী, শিক্ষক,
আমডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
২৪-পরগণা।

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা

আমডাঙ্গা গ্রামে একটি প্রাচীন মঠবাড়ী আছে। অতীতকালে মঠবাড়ীটি শক্তি সাধনার কেন্দ্র ছিল বলিয়া মনে হয়। মঠের সীমানার মধ্যে একটি পৃথক মন্দিরে করুণাময়ী নামে খ্যাত কালী মূর্তি ব্যতীত একটি রত্নবেদী ও একটি পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। মঠের অভ্যন্তরে মঠের ভূতপূর্ব চৌদ্দজন মহান্তের চৌদ্দটি সমাধি স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি সমাধি স্থানের উপর একটি করিয়া শিবমন্দির আছে। উহার মধ্যে মঠের প্রথম মহান্ত রামানন্দ গিরির সমাধি মন্দিরটি ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং অনুমান করা যায় ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোন এক সময় এই গ্রামে মঠটি স্থাপিত হইয়াছিল। মঠের একাদশ মহান্ত স্বামী অচলানন্দ গিরি একজন শক্তিধর সাধক ছিলেন। তারকেশ্বরের মঠের মহান্তগণ আমডাঙ্গায় আসিয়া তাঁহাকে আচার্য পদে অভিষিক্ত করেন। স্বামী অচলানন্দের সহিত দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত কয়েকবার সাক্ষাৎকার হয়। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত "তান্ত্রিক সন্ধ্যা পদ্ধতি" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি

অদ্যাপি এই মঠে রক্ষিত আছে। হালিশহর হইতে মাতৃসাধক রামপ্রসাদ মাঝে মাঝে এই মঠে আসিতেন বলিয়া জানা যায়। কথিত আছে ১৭৬২-৬৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় নবাব মীরকাশিমের আদেশে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র মুঙ্গেরে কারারুদ্ধ হন এবং তাঁহার প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। ঐ সময় এই মঠের দ্বিতীয় মহান্ত দৈবশক্তির প্রভাবে মহারাজার প্রাণ রক্ষা করেন। এই কারণে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র করুণাময়ী কালীর পূজার জন্য ও সুষ্ঠুভাবে মঠ পরিচালনার জন্য নলাচল নামক ভূসম্পত্তি দান করেন।

প্রতি বৎসর পৌষ মাসে (২৫শে ডিসেম্বরের দুইদিন পূর্বে) চারদিনব্যাপী এই মঠে সাড়ম্বরে করুণাময়ী কালীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সুপ্রাচীন মঠের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার কল্পে এবং জনসাধারণের মধ্যে করুণাময়ী কালীর নাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে উৎসব শুরু হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে অবধি কেবলমাত্র বৎসরে একবার কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে ভিন্ন অন্য সময়ে সাধারণ লোক কালী মূর্তি দর্শন করিতে পারিতেন না। উৎসব উপলক্ষে যথারীতি কালীপূজা ও হোম-যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। মঠের বর্তমান মহান্তই পূজাদি করিয়া থাকেন। আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ-সাত হাজার নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। কালীমন্দির সংলগ্ন একটি নির্দিষ্ট স্থানে দেবীর ভৈরব বুড়াশিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। বৎসরের যে-কোন সময়ই করুণাময়ী কালীর নিকট মানসিক পূজা দেওয়া চলে। প্রধানতঃ ষোড়শোপচারে পূজা, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং পাঠা বলি ইত্যাদি মানত করা হয়।

মশান চণ্ডীপূজা

মগুরা গ্রামে মশান চণ্ডীর একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। এই স্থানে রক্ষিত কয়েক খণ্ডে বিভক্ত প্রস্তর নির্মিত একটি দেবী মূর্তিকে মশান চণ্ডীরূপে নিত্য পূজা করা হয়। মশান চণ্ডী জাগ্রত দেবী বলিয়া বিশ্বাস। কথিত আছে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে এই পূজা আরম্ভ হয়। কিন্তু কোন কারণে দেবী মূর্তিটি ভগ্ন হইলে মাঝে কিছুকাল দেবীর পূজা বন্ধ থাকে; পরে বাংলা ১৩৩৬ সন হইতে পুনরায় ঐ ভগ্ন মূর্তিতেই মশান চণ্ডীর পূজা আরম্ভ হয়।

প্রতি বৎসর পৌষ মাসের শেষ মঙ্গলবার সাড়ম্বরে মশান চণ্ডীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে আশেপাশের দশ-বারটি গ্রাম হইতে বহু নর-নারী দেবীর নিকট মানত পূজা দিতে আসেন। চণ্ডীর নিকট ষোড়শোপচারে পূজা ও পাঠা বলি মানত করা হয়। পূর্বে মহিষ বলি এমন কি নরবলিও হইত বলিয়া শোনা যায়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং উৎসব উপলক্ষে সাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। জনৈক ভট্টাচার্য পদবীধারী ব্রাহ্মণ বর্তমানে মশান চণ্ডীর নিত্য পূজাদি করেন।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

আমডাঙ্গা গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে (২৫শে ডিসেম্বরের দুইদিন পূর্বে) করুণাময়ী কালীর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কালীমন্দির সংলগ্ন প্রায় আট-দশ বিঘা দেবোত্তর জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শুরু হয় বলিয়া জানা যায়।

মেলায় নিকটবর্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে এবং বসিরহাট, ব্যারাকপুর, কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় পাঁচ-সাত হাজার নরনারী আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, বাসনকোসন, মনিহারী, তাঁতের কাপড় ও লুঙ্গি, গামছা, স্থানীয় কামারদের তৈয়ারী কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলো, চ্যাঙ্গারী, মাটির খেলনা, পুতুল ও হাঁড়িকুড়ি, টোটকা ঔষধ ও বই-ছবি ইত্যাদির প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং কয়েক জন ফেরিওয়ালা আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক ও নাগরদোলার দল আসে এবং লটারী খেলা, জলসা ও থিয়েটার হয়।

মশান চণ্ডীপূজার মেলা

মগুণ্ডা গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসের শেষ মঙ্গলবার মশান চণ্ডীর বার্ষিক পূজা উপলক্ষে সাধারণের প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

মরিচা, শ্রীকৃষ্ণপুর, জেঠিয়া, খাদাহাটা, চণ্ডীগড় প্রভৃতি নিকটবর্তী গ্রাম হইতে এবং হরিণঘাটা, বারাসত, কাঁচড়াপাড়া, নৈহাটী ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে মেলায় প্রায় চৌদ্দ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক।

আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে এবং কাঁচড়াপাড়া, নৈহাটি ও কলিকাতা হইতে মেলায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। শতাধিক দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। ইহাভিন্ন, বহু ফেরিওয়ালা আসেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে মনিহারী ও কাপড়চোপড়ের দোকানের সংখ্যাই বেশী। গুহাছাড়া, ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবার দ্রব্য, বাসনকোসন, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, কারুশিল্পজাত দ্রব্যাদি, বই-ছবি, ফলমূল ইত্যাদি আমদানী হইয়া থাকে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, পুতুলনাচ ও নাগরদোলা বসে এবং তরজাগান ও যাত্রাভিনয় হয়।



গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ কাটুরা। ৩০।১৯২.৯২।৫৮।৩.৭

(ক) ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, রুইদাস, কামার, নাপিত, হাড়ী, ধোপা ও মুসলমান। গ্রামে পাচটি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, ঘোষপাড়া, হাড়ীপাড়া, মুচিপাড়া ও মুসলমানপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন দত্তপুকুর। গ্রাম হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে টাকী রোড দিয়া নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি আদিতে গ্রামের জমিদার রায়চৌধুরী পরিবার কর্তৃক পরিচালিত হইত, বর্তমানে সর্বজনীন উৎসব।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন। প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

চড়কের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তিতে একদিন। প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বারোয়ারীতলায় একটি ছোট মন্দিরে পঞ্চানন্দের প্রতীক একটি শীলা আছে।

শ্রীভোলা নাথ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম : কাটুরা, পোঃ ছোট জাগুলিয়া,
২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ দেয়াড়া। ৫৭।৬২৯.১৬।৩০৪।১,৫৭৪

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) কলিকাতা হইতে মোটরবাসে অথবা দমদম ক্যানটমেণ্ট রেলস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে একটি ঘট স্থাপন করিয়া শিবপূজা ও গাজন উৎসব পালন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে অনেকে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। চৈত্রসংক্রান্তির দিন যথারীতি পূজার পর শিবের মাথায় 'ফুল চাপান' এবং একটি মাটির কুমীর মূর্তি নির্মাণ করিয়া উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হয়। উৎসবটি প্রাচীন এবং উহা ব্যক্তি-বিশেষ কর্তৃক পরিচালিত হইলেও সর্বসাধারণে যোগদান করিয়া থাকেন।

(ঙ) শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা। চৈত্রসংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শীতলাতলা আছে।

শ্রীপান্নালাল ভট্টাচার্য, শিক্ষক,
গ্রাম : ভাতুড়িয়া,
পোঃ রাজারহাট-বিষ্ণুপুর,
২৪-পরগণা।

৩। গ্রাম ঃ কদম্বগাছি। ১৪৩।৭৭৩.৬১।৪১৩।২,২৯৯

(ক) কায়স্থ, গোয়ালা, কামার, কুমার, নাপিত ও মুসলমান। গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বারাসত জংশন। কলিকাতা-হাসনাবাদ অথবা কলিকাতা ইটাণ্ডাঘাট বাস রুটে এই গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ৩রা মাঘ তারিখে মানিক পীরের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। শোনা যায় একদা মানিক পীর এই গ্রামে আসিয়া ছিলেন বলিয়া গ্রামবাসীগণ তাঁহার পুণ্যস্মৃতি উপলক্ষে এই উৎসব প্রচলন করেন। গ্রামে একটি পীরের দরগাহ আছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই উৎসবে যোগদান করেন এবং পীরের দরগায় পূজা ও সিন্নি মানত দেন। জনৈক মুসলমান দরগাহের বর্তমান খাদেম।

(ঙ) মানিক পীরের উৎসব উপলক্ষে মেলা। প্রতি বৎসর ৩রা মাঘ একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

জনৈক গ্রামসেবক,
বারাসত ব্লক ডেভেলপমেণ্ট নং ১,
গ্রাম ও পোঃ কদম্বগাছি,
২৪-পরগণা।

৪। গ্রাম ঃ ভাগ্যমন্তপুর। ১৬৫।২৭০·০৪।১৫৫।৯৮·৮

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) কলিকাতা-টাকী বাস রুটে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপূজা হইয়া থাকে। উৎসবগুলি সর্বজনীন। চড়কপূজাটি প্রাচীন উৎসব।

(ঙ) চড়কের মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীফকির আহম্মদ, প্রধান শিক্ষক,
ভাগ্যমন্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
২৪-পরগণা।

৫। গ্রাম ঃ দাদপুর। ১৬৬।৩৩৮·৩৩ ২০৪।৯৮৭

(ক) মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল উত্তরে টাকী রোড দিয়া মোটরবাস যাতায়াত করে। টাকী রোড হইতে জেলাবোর্ডের একটি রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) ×

(ঙ) গ্রামে প্রতি বৎসর ১২ই মাঘ তারিখে 'বুড়ীমার মেলা' নামে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। এই মেলার সহিত কোন ধর্মীয় উৎসবের যোগ নাই। প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে এই গ্রামে মুন্সী আব্দুল আজিজ নামে জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বাস করিতেন, তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহী এই মেলার প্রচলন করেন বলিয়া সাধারণ লোকে ইহাকে বুড়ীর মেলা বলিয়া থাকেন।

(চ) ×

শ্রীখবির আহম্মদ, প্রধান শিক্ষক,
দাদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কদম্বগাছি, ২৪-পরগণা।

৬। গ্রাম ঃ সরদার আটি
(মৌজা ঃ মালরামেশ্বরপুর)।
১৯৪।৮৭৩·৭১।২৫৪।১,৪৭৪

(ক) পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কাওরা ও মুসলমান। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে। যেমন—বিশ্বাসপাড়া, কাওরাপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বারাসত জংশন হইতে জেলাবোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে বিদ্যাধরী নদী দিয়া নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে রথযাত্রা হইতে পুনর্যাত্রার দিন পর্যন্ত নয়দিনব্যাপী সাড়ম্বরে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের ভোগ-পূজা এবং রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন উক্ত মূর্তিগুলিকে রথে স্থাপন করিয়া রথ টানা হয়। বাংলা ১২৫৫ সনে নির্মিত ১৩ চূড়াবিশিষ্ট রথটি জীর্ণ হইয়া যাওয়ায় বাংলা ১৩১৮ সনে বর্তমান রথটি পুনর্নির্মিত হয়। জগন্নাথদেবের নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। উৎসবটি সর্বজনীন এবং শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) শোনা যায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে বাগরাই সর্দার নামে জনৈক ব্যক্তি কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে খাজনা জমা দিতে যায়। ঐ দিনই রাজবাড়ীতে একদল ডাকাত আক্রমণ করে। বাগরাই সর্দার বিপুল বিক্রমে ঐ ডাকাত দলকে বাধা দেয়। তাহার সাহসিকতায় মুগ্ধ হইয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাহাকে মালরামেশ্বরপুর মৌজাটি মহাত্রাণ নিষ্কর বলিয়া দানপত্র করেন। বাগরাই সর্দার জঙ্গল কাটিয়া এই গ্রামের পত্তন করে বলিয়া গ্রামটির নাম সরদার আটী হইয়াছে।

শ্রীঅনিল চক্রবর্তী, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ কালিকাপুর,
পোঃ শাসনা, ২৪-পরগণা।

[সাইবানা গ্রামের নন্দদুলালজীউর উৎসবাদি সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি নিয়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

চব্বিশ-পরগণা জেলার বারাসত থানার অন্তর্গত সাইবানা গ্রামে সুপ্রাচীন নন্দদুলালজীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকায় ইহা বৈষ্ণবদিগের একটি তীর্থস্থান স্বরূপ। নিকটবর্তী রেলস্টেশন বারাসত জংশন হইতে অথবা ব্যারাকপুর রেলস্টেশন হইতে বারাসত-ব্যারাকপুর রোড দিয়া মোটরবাসে এই গ্রামে পৌছান যায়। বারাসত-ব্যারাকপুর রোড হইতে একটি পাকা রাস্তা বাহির হইয়া প্রায় দেড় মাইল দূরবর্তী নন্দদুলালজীউর মন্দির পর্যন্ত গিয়াছে। পূর্বে সাইবানা একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। এই স্থানের বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়গণ প্রাচীন বাসিন্দারূপে পরিচিত। মুখোপাধ্যায় পরিবারের ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য ও মন্ত্রী ছিলেন। সাইবানায় তাঁহাদের পৈতৃক বাস্তুভিটায় বর্তমানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রামে ব্রাহ্মণ ব্যতীত মাহিষ্য, কুমার, কামার, বাগ্দী, গোয়ালা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বাস আছে।

নন্দদুলালজীউর মন্দিরটি সমতল ছাদবিশিষ্ট পূর্বমুখী একটি সাধারণ গৃহ মাত্র। ইহার সম্মুখস্থ বারান্দার এবং ঘরের মেঝে শ্বেতপাথর দ্বারা নির্মিত। গৃহাভ্যান্তরে একটি কাঠমঞ্চে নন্দদুলালজীউ নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। রাধিকা মূর্তিটি ধাতুময়ী এবং কৃষ্ণ মূর্তিটি কষ্টিপাথর দ্বারা নির্মিত। এই ঘরে অপর একটি পৃথক আসনে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের দারুময় মূর্তি ও শালগ্রাম শিলা আছে।

নন্দলালজীউর মন্দির ঠিক কোন সময় প্রতিষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন প্রমান পাওয়া যায় না ; তবে ইহা যে বিভিন্ন সময়ে সংস্কৃত হইয়াছে মন্দিরগাত্রে তাহার প্রমান আছে। জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, হুগলী জেলার শ্রীরামপুর থানার অন্তর্গত চাতরা গ্রাম নিবাসী শ্রীচৈতন্য পরিকর কাশীশ্বরের জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্তরঙ্গ পণ্ডিত রুদ্ররাম স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া গৌড়ের বাদশাহের প্রাসাদ হইতে একটি শিলা আনাইয়া উহার দ্বারা তিনটি কৃষ্ণ মূর্তি নির্মাণ করেন এবং ঐ তিনটি মূর্তি তাঁহারা তিন ভ্রাতা যথাক্রমে জ্যেষ্ঠ রুদ্ররাম হুগলী জেলার বল্লভপুরে রাধাবল্লভজীউর, মধ্যম রামরাম চব্বিশ-পরগণা জেলার খড়দহে শ্যামসুন্দরজীউর ও কনিষ্ঠ লক্ষণ সাইবানায় নন্দদুলালজীউর নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য সেবা-পূজার ব্যবস্থা করেন। (এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের 'পূজা-পার্বণ ও মেলা', ২য় খণ্ডের ৬১২ পৃষ্ঠায় বল্লভপুরের রাধাবল্লভজীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।) রাধাবল্লভজীউর মন্দির ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া জানা যায়। সাইবানার নন্দদুলালজীউর বিগ্রহ প্রায় ঐ একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

মন্দির সম্মুখস্থ নাটমন্দিরটি শ্রীমতী ভবতারিণী দেবী কর্তৃক ৭ই শ্রাবণ ১৩২৫ সনে নির্মিত এবং বাংলা ১৩৬২ সনে কলিকাতার এন্টনী বাগানের অক্ষয় কুমার নন্দী কর্তৃক সংস্কৃত। নাটমন্দিরসহ মূল মন্দিরটির চারিদিক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মন্দির সীমানার বাহিরে প্রবেশদ্বারের সম্মুখে পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি ইষ্টক নির্মিত আটচালা মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাভিন্ন, গ্রামে দুইটি পঞ্চানন্দ ও একটি মনসার স্থান আছে।

নন্দদুলালজীউর নিত্য পূজা ব্যতীত বৎসরের বিভিন্ন তিথিতে বৈষ্ণবদিগের যাবতীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল উৎসবাদিতে এখন আর তেমন ধুমধাম নাই। উহার মধ্যে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে উৎসব এবং ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোলযাত্রা উৎসব উল্লেখযোগ্য। মাঘী পূর্ণিমায় নন্দদুলালজীউর উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে এবং চব্বিশ-পরগণা, নদীয়া, হুগলী ও কলিকাতা হইতে বহু যাত্রী আসিয়া থাকেন। দোলযাত্রা উপলক্ষে মন্দিরে নন্দদুলাল-জীউর যথারীতি পূজার পর উক্ত বিগ্রহদ্বয়কে মন্দির হইতে দোলায় চাপাইয়া নিকটস্থ একটি দোলমঞ্চে স্থাপন করিয়া দেবদোলপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। দোলমঞ্চটি প্রাচীন এবং দেখিতে অতি সুন্দর। বাংলা ১৩৬৫ সনে প্রাচীন দোলমঞ্চটির আমূল সংস্কার করা হইয়াছে।

ইহাভিন্ন, প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে এই মন্দিরে জগন্নাথদেবের পূজা হয় এবং জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি একটি রথে স্থাপন করিয়া রথ টানা

হয়। রথের দিনও মন্দির প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসে। তবে মাঘী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত মেলা অপেক্ষা রথের মেলায় দোকানপাট ও লোকসমাগম কম হয়।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, একই দিনে বল্লভপুরের রাধাবল্লভ, খড়দহের শ্যামসুন্দর এবং সাইবানার নন্দদুলাল বিগ্রহ দর্শন ভক্তদের নিকট পুণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত। এই কারণে প্রতি বৎসর কার্তিকী পূর্ণিমায় শ্যামসুন্দরজীউর রাসযাত্রা উৎসবে যোগদানকারী ভক্তদের অনেকেই এইদিন নন্দদুলালজীউর বিগ্রহ দর্শন করিতে আসেন এবং মাঘী পূর্ণিমায় উক্ত তিন মূর্তি দর্শন করেন।

নন্দদুলালজীউর মন্দিরের বর্তমান বেতনভোগী পূজারী শ্রীভূদেব চন্দ্র আচার্য। ইঁহারা তিন পুরুষ ধরিয়া এবং শ্রীআচার্য স্বয়ং গত ৪০ বৎসর ধরিয়া পূজারীর কার্য করিতেছেন। ইঁহাদের বাড়ী বাঁকুড়া জেলায়। বাংলা ১৩৬২ সনে গঠিত একটি ট্রাস্টি কমিটি কর্তৃক বর্তমানে মন্দিরের যাবতীয় পূজা পার্বণাদি পরিচালিত হইতেছে।

নন্দদুলালজীউর উৎসব উপলক্ষে মন্দির সম্মুখস্থ দেবোত্তর জমিতে মাঘী পূর্ণিমার দিন একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

বারাসত থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে ও ব্যারাকপুর, নৈহাটী, টিটাগড়, খড়দহ এবং হুগলী, নদীয়া ও কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। মেলায় প্রায় একশত দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকান ব্যতীত মনিহারী, বাসনকোসন, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির খেলনা-পুতুল, পোষাক-পরিচ্ছদ, বই-ছবি ইত্যাদি আমদানী হয়। প্রধানতঃ বারাসত, ব্যারাকপুর, টিটাগড় ও কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। পূর্বের তুলনায় মেলায় দোকানপাট ও লোকজনের সংখ্যা খুবই কম। বারাসত ব্লক ডেভেলপমেণ্ট ১নং অফিস হইতে জনস্বাস্থ্যের জন্য মেলায় ভ্রাম্যমান চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

BARĀSAT

Headquarters of the subdivision of the same name, situated 14 miles north-east of Calcutta on the Eastern Railway, central section (from Dum-Dum Junction). The town contains the usual Government buildings found in a subdivisional headquarters, two munsifs' courts, a sub-registry office, a hospital, a post and telegraph office, and a Goverment high school. The sub-jail is a three-storeyed building, popularly known as Vansittart Villa, and said to have been the country residence of Mr. Vansittart, a civil servant in the time of Warren Hastings. Bārāsat was constituted a municipality in 1869,....

Bārāsat was formerly a place of greater importance than at present. In the early part of the nineteenth century it was the seat of a college for military cadets, which they entered on their arrival from Europe. On this account the town has been called "the Sandhurst of Bengal."…. Some remains dating back to the eighteenth century may still be seen about 4 miles to the north-east of the railway station. Here there is a large tank, called Madhumurali, which is said to have been excavated about 300 years ago by two merchant brothers named Madhu and Murali. To the north-west of the tank, Mr. Louis Bonnaud, an indigo planter, is said to have had his factory, the site of which is marked by the remains of a large building overgrown with vegetation. On the back of the tank at its south-eastern corner there is a high pillar, the object of which is unknown; and at its south-western corner there is a octagonal summer-house, now falling into ruin, the history of which is known....

At Kāzipāra, a suburb of the town, a large fair, which lasts three days, is held every year towards the end of December in honour of a Muhammadan Pīr or saint, called Pīr Ekdil Sāhib, of whom the following legend is told :

There lived a king named Shāh Nīl, who was married to Ashik Nuri, but had no children. One morning the female sweeper absented herself ; and on being sent for, she refused to come before dinner, on the plea that by going early to Court she invariably had to see the faces of childless persons the first thing in the morning, which was an unlucky omen. The queen, struck by this remark, set out on a pilgrimage, in the hope that thereby she might obtain a child by the grace of God, and visited Mecca and other holy places. After thirty-six years of prayer an angel appeared to her, and having tried her faith in various ways promised her a child for two-and-a-half days. The queen returned home, and in due time gave birth to a son, which after two-and-a-half days was carried away by the angel, who took the shape of a fox. The child was brought up in the house of one Mullā Tar, and when he was about eight years of age came to Anarpur (the *pargana* containing Barāsat) riding on a tiger, which he could transform into a sheep at will. He crossed the Ganges on his stick, and came first to the village of Berua, where he planted his stick as a sign that he had entered into possession of the country assigned to him. The stick immediately grew into a thicket of bamboos. The boy then assumed the form of a full-grown man, and proceeded to the house of one Chānd Khān of Sri Krishnapur, a landholher of Anarpur, and begged a meal. Nur Khān, Chānd Khān's brother, refused to feed an ablebodied man, and told him to go and work at the mosque he was building. In proof of his supernatural powers, he lifted a block of stone of fifteen hundred weights up to the mosque, and miraculously prevented any bricks being laid on it. The mosque remained unfinished, and has furnished a proverb to the people, who call an incomplete undertaking a 'Chānd Khān's mosque'. After this, the stranger vanished. Again assuming the form of a boy, he called himself Dil Muhammad, and joined some cowherds. After working various miracles, he went to live with one Chhuti Miyān of Kāzipāra and tended his cattle. Sometimes he would ill-treat the cattle, and when the owners came out to punish him he transformed them into tigers and bears. On one occasion his cattle ate up a standing crop of paddy belonging to one Kumār Shāh, who complained to the headman of the village. An officer was accordingly sent to inquire into the matter, but he found the crops in this field better than any other in the neighbourhood. Upon his death a mosque was erected over his remains, and the fair is held at his tomb every year. About three hundred acres of rent-free land belong to the descendants of Chhuti Miyān for the service of the mosque.

(District Census Handbooks, 24-Parganas, 1951, by A. Mitra, p. xcvi-xcvii)

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা
(মাণিক পীর)

কদম্বগাছি গ্রামের গোমাপুকুরের পাড়ে পীরোত্তর জমির উপর প্রতি বৎসর ৩রা মাঘ বৈকালে মাণিক পীরের উৎসব উপলক্ষে একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

কয়ড়া, কালসায়া, উলা, পূর্ব ইছাপুর, দাসপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মেলায় যাত্রী আসেন। মেলায় ময়রা,

তেলেভাজা, মনিহারী প্রভৃতি দ্রব্যাদির মাত্র পনর-কুড়িটি দোকানপত্র বসে।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

দেয়াড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে গ্রামের দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্তে প্রায় এক বিঘা দেবোত্তর জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এবং মাত্র একদিনই স্থায়ী হয়।

রাজারহাট, ভাতেণ্ডা, ভাতুড়িয়া, গলাশিয়া, মাটিয়াগাছা, লাঙ্গলপোতা প্রভৃতি গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় পনরশত নরনারী মেলায় আসেন।

মেলায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং দশ-পনর জন ফেরিওয়ালা আসেন। উহার অধিকাংশ দোকানই খোলা জায়গায় বসে। প্রধানতঃ দেয়াড়া, ভাতুড়িয়া, গলাশিয়া এবং রাজারহাট প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত,মনিহারী দোকান,বাসনকোসনের দোকান, কাপড়-চোপড়ের দোকান, মাটির খেলনা-পুতুলের দোকান, বই-ছবি ইত্যাদির দোকান বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কোন কোন বৎসর তরজাগান এবং যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

ভাগ্যমন্তপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক-পূজা উপলক্ষে প্রায় এক বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

মেলায় আশেপাশের গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় আড়াইশত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় আট-দশটি ময়রা ও তেলেভাজার দোকান ব্যতীত কয়েকটি মনিহারী দোকান, লুঙ্গি, গামছা ও কাপড়-চোপড়ের দোকান এবং মাটির পুতুল ও হাঁড়িকুঁড়ির দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়, তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

রথযাত্রার মেলা

কাটুরা গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে গ্রামের সদর রাস্তার উভয় পাশে একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন এবং একদিন মাত্র স্থায়ী হয়। আশেপাশের চার-পাঁচটি গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় পাঁচশত নরনারী আসেন।

মেলায় ময়রা ও তেলেভাজা, তামা, পিতল, লোহা, কাঁচ এবং মাটির বাসনপত্র, মনিহারী, ছুরি, কাঁচি, দা, বঁটি, বাঁশের তৈয়ারী ঝুড়ি-চুবড়ি এবং শাকসব্জী ইত্যাদি দ্রব্য-সামগ্রীর মাত্র কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়, তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

কোন কোন বৎসর মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

সরদার আটী গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে রথতলায় সাধারণের প্রায় দশ-বার বিঘা পতিত জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

গ্রামের দশ-পনর মাইলের মধ্যবর্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় সাত-আট হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং প্রায় একশত দোকানপাট বসে ও কুড়ি-পঁচিশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। উহার অধিকাংশ দোকানই খোলা জায়গায় বসে। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকানের সংখ্যাই অধিক। ইহা ব্যতীত, মনিহারী, গামছা, লুঙ্গি, মশারী, মাটির পুতুল, হাঁড়িকুঁড়ি ও খেলনা, ফল, শাকসব্জী ও চারাগাছ এবং মাছ ও চাউলের দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কোন কোন বৎসর তরজাগান, টপ্পাগান, থিয়েটার বা যাত্রাভিনয় হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কাটুরা গ্রামে অনুষ্ঠিত চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কের মেলাটি উপরোক্ত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

বিবিধ উৎসব উপলক্ষে মেলা
(বুড়ীমার মেলা)

দাদপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ১২ই মাঘ তারিখে স্থানীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এবং জেলাবোর্ডের রাস্তার দুইধারে প্রায়

আড়াই বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা বুড়ীমার মেলা নামে খ্যাত। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এবং মাত্র একদিন স্থায়ী হয়। স্থানীয় গ্রামবাসীরাই এই মেলা পরিচালনা করিয়া থাকেন।

পাথরা, মানিকপুর, লক্ষ্মীপুর, বাঁকড়া, কামগাছি, ভাগ্যমন্তপুর, বহিরা, মহিষতীপুর, শঙ্করগাছি, কদম্বগাছি, কয়ড়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় চার সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় ষাটটি দোকানপাট বসে। আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। মেলায় সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত, বাসনকোসন, মনিহারী, মাটির পুতুল ও খেলনা, হাঁড়িকুড়ি, ধামা, কুলো, চুবড়ী এবং বই-ছবি ইত্যাদি আমদানী হয়। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

[সাঁইবানায় নন্দদুলালজীউর রাস উৎসব সম্পর্কে ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৬৫ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়।]

গত রাসপূর্ণিমায় ২৪ পরগণা বারাকপুরের অনতিদূরে অতি পুরাতন বৈষ্ণব প্রধান গ্রাম সাঁইবনায় চারিশত বৎসরাধিকালের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺নন্দদুলাল ঠাকুরের রাসযাত্রা এবার বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। রাসের তিনদিন পরে ঠাকুর ঠাকুরানীকে গোষ্ঠ মেলায় প্রধান মন্দির হইতে শোভাযাত্রা সহকারে কয়েকখানি গ্রাম পরিভ্রমণের পরে এবার ছয় সহস্রাধিক টাকা ব্যয়ে সংস্কৃত পুরাতন রাসমঞ্চে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে ৺পূজা রাস ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বহু ভক্ত কলিকাতা ও নিকটস্থ গ্রাম সমূহ হইতে ঐ দিন সমবেত হইয়া কীর্তনে যোগদান করেন ও উহা অন্তে প্রসাদ গ্রহণে তৃপ্ত হন। নূতন ট্রাষ্টীগণ মন্দিরের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ঠাকুরের মন্দির এবং নাট মন্দিরেরও সংস্কার সাধন করিয়াছেন।

দুই রাত্রে স্থানীয় উৎসাহী যুবকবৃন্দের দুইটি দল যাত্রা গান করিয়া সকলকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন।…



গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ সোহাই। ১৭।৭১৯'০১।২৪৩।১,৩৬৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নাপিত, মুচি, নমঃশূদ্র ও মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে। যেমন—রায়পাড়া, নাপিতপাড়া, শাহজীপাড়া, মুচিপাড়া ও মুসলমানপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) দোগাছিয়া রেলস্টেশন হইতে বেলিয়াঘাটা-ঘোষ দেলপুর রোড দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব। উৎসবটি সর্বজনীন এবং গ্রামের একমাত্র উৎসব। ইহা প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তিতে বসে। প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে পঞ্চানন্দ ও শিবের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শোনা যায় যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য রাজধানী দিল্লী হইতে সেনাপতি মানসিংহের অধীনে যে সৈন্যদল প্রেরণ করা হয় তাঁহারা এই স্থানে একটি অস্থায়ী ছাউনী নির্মাণ করেন এবং পানীয় জলের জন্য দুইটি বৃহৎ দীঘি খনন করেন। পরে সৈন্যদল এই স্থান পরিত্যাগ করিলে পর পানীয় জলের সুবিধার জন্য আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু পরিবার এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং ক্রমেই একটি গ্রাম গড়িয়া উঠে।

শ্রীতারক নাথ বিশ্বাস, শিক্ষক,
পোঃ বেলিয়াঘাটা ব্রীজ, ২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ দেগঙ্গা। ৩০।২৪৮'৩৭।১৩১।৭২৪

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে টাকী রোড ধরিয়া ৭৯ নং বাস রুটে গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে নববর্ষ উৎসব, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসে জন্মাষ্টমী, ভাদ্র মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা ও নবান্ন উৎসব, পৌষ মাসে পৌষ-পার্বণ, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল ও শিবরাত্রি উৎসব, চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জগদ্ধাত্রীপূজা ব্যতীত অন্যান্য সবগুলি উৎসবই প্রাচীন।

তাহাছাড়া, মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ ও মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিনে মেলা বসে। মেলাটি বহু কালের প্রাচীন।

জগদ্ধাত্রীপূজার মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে টিনের ছাউনীযুক্ত একটি কালীমন্দির আছে।

এই স্থানে অবস্থিত রাজা চন্দ্রকেতুর গড়ের ধ্বংসাবশেষ একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

শ্রীশচিন্দ্র হক,
পশ্চিমবঙ্গ সেন্সাস দপ্তর,
কলিকাতা।

দেগঙ্গা—বা দ্বিগঙ্গা কলিকাতা হইতে ২১ মাইল দূর। ইহা একটি প্রাচীন স্থান। অনেকে অনুমান করেন যে প্রাচীন গ্রীক ইতিহাস পেরিপ্লাসে উল্লিখিত গঙ্গে বা গঙ্গা-রেজিয়া নগরী এই স্থানেই অবস্থিত ছিল। দেগঙ্গা শব্দটি দেবগঙ্গা, দ্বীপগঙ্গা অথবা দীর্ঘগঙ্গা শব্দের অপভ্রংশ। দেগঙ্গার নিকটে বহুবিস্তৃত ধ্বংসস্তূপ ও প্রাচীন দীর্ঘিকা ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। ইহা দেউলিয়ার রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া কথিত। ইসলাম ধর্মের প্রচারক পীর গোরাচাঁদ বা গোড়াই গাজীর সহিত চন্দ্রকেতুর তুমুল যুদ্ধ হয় এবং তাহারই পরিণতি স্বরূপ তাঁহার রাজধানী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য গোড়াই গাজী বালাণ্ডা পরগণার রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানী দেউলিয়ায় উপস্থিত হন ও তাঁহাকে মুসলমান হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু চন্দ্রকেতুকে স্বমতে আনিতে না পারিয়া এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া গোড়াই গাজী গৌড়ের বাদশাহের

সহায়তা প্রার্থনা করেন। বাদশাহ পীরশাহ নামক জনৈক ব্যক্তিকে বালাণ্ডা পরগণার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। পীরশাহ আসিয়াই গোড়াই গাজীর পরামর্শমত চন্দ্রকেতুকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। চন্দ্রকেতু এই প্রস্তাব উপেক্ষা করেন। তখন পীরশাহের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে চন্দ্রকেতু জয়লাভ করেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁহার বিজয়ের বার্তাবাহী শ্বেত পারাবতের পরিবর্তে পরাজয়ের নিদর্শন কৃষ্ণ পারাবত উড়িয়া অন্তঃপুর অভিমুখে গমন করে। যুদ্ধে চন্দ্রকেতু পরাস্ত হইয়াছেন মনে করিয়া অন্তঃপুরবাসিনীরা দীঘিতে ডুবিয়া আত্মমর্যাদা রক্ষা করেন। বিজয়ী চন্দ্রকেতু গৃহে ফিরিয়া এই শোচনীয় ঘটনায় ক্ষুব্ধ হইয়া নিজেও আত্মহত্যা করেন। পারাবত বিভ্রাটের ফলে সেকালের বহু রাজবংশের এইভাবে ধ্বংস হওয়ার কাহিনী অবগত হওয়া যায়। রাজারা যুদ্ধ যাত্রার সময়ে একটি শ্বেত ও একটি কৃষ্ণ কবুতর সঙ্গে লইয়া যাইতেন। শ্বেত কবুতরটি জয়ের ও কৃষ্ণ কবুতরটি পরাজয়ের বার্তাবহরূপে গণ্য হইত। যখন যুদ্ধ জয়ের আর কোনই আশা থাকিত না তখন রাজার নির্দ্দেশক্রমে তাঁহার কোন প্রিয় অনুচর কৃষ্ণ কবুতর-টিকে ছাড়িয়া দিত। শিক্ষিত কবুতর উড়িয়া অন্তঃপুরে আগমন করিলে রাণী ও অন্যান্য পুরবাসিনীগণ সাধারণতঃ নিকটবর্তী কোন দীঘিকায় ডুবিয়া মরিয়া অত্যাচারীগণের হাত হইতে নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করিতেন।

দেগঙ্গার নিকটবর্তী বালাণ্ডাও একটি প্রাচীন স্থান। মুসলমান অধিকারের পূর্বে ইহা নিম্ন বঙ্গের "বালবল্লভী" রাজ্যের রাজধানী ছিল। বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী প্রসিদ্ধ নিবন্ধকার ভবদেব ভট্ট বালাণ্ডার শাসনকর্তা ছিলেন। ভবদেব যেরূপ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন তেমনই দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি "বালবলভীভুজঙ্গ" উপাধিতে আখ্যাত ছিলেন। ভবদেব ভট্টের পদ্ধতি অনুসারে এখনও ব্রাহ্মণগণের দশকর্ম্মাদি সম্পন্ন হয়। ভুবনেশ্বরে তৎপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরে তাঁহার বংশের প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে। পূর্ব্বকালে বালাণ্ডা অতি উৎকৃষ্ট মছলন্দ বা মাদুরের জন্য বিখ্যাত ছিল।

[পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ', ১ম খণ্ড. গ্রন্থের সাহায্যে লিখিত।]

৩। গ্রাম : উত্তর কলসুর।

৪৭।১,৪৭০'২০।৫৮'২।৩,৯২৮

(ক) ব্রাহ্মণ, কামার, সৎচাষী ও মুসলমান। গ্রামে মণ্ডলপাড়া, পারুইপাড়া, দাসপাড়া, কর্মকারপাড়া ইত্যাদি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন মসলন্দপুর হইতে জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া মোটরবাসে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে ওলাইচণ্ডীর পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রামে জনৈক মহিলা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বাংলা ১২৮০ সনে ওলাইচণ্ডীপূজার প্রচলন করেন। ওলাইচণ্ডী দেবীকে কেন্দ্র করিয়া উৎসবটি অবশ্য গত ছিয়াশি বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) ওলাইচণ্ডীপূজার মেলা। বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষে একদিন। মেলাটি প্রায় ছিয়াশি বৎসরের প্রাচীন।

রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে। উননব্বই বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার,
দেগঙ্গা স্টেজ ডেভেলপমেন্ট ১নং ব্লক,
২৪-পরগণা।

৪। গ্রাম : দেউলিয়া। ৬৮।৬৭৬'৯০।৫৪২।২,৮৬১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সৎচাষী, তেলী, গোয়ালা, কুমার, কামার, স্বর্ণকার, ধোপা, নাপিত, বাগ্দী, রুইদাস, কাহার ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে টাকী রোড দিয়া দেবালয় গ্রাম পর্যন্ত মোটরবাস চলাচল করে। দেবালয় হইতে হাড়োয়া পর্যন্ত অপর একটি বাস রুট আছে। গ্রামটি টাকী রোড-এর পাশে অবস্থিত।

(ঘ) আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী-পূজা এবং চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা ও রাজা চন্দ্রকেতুর দেউলে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাসন্তীপূজাটি গ্রামের 'ভ্রাতৃসঙ্ঘ' কর্তৃক পরিচালিত হয়। বাসন্তীপূজা উপলক্ষে

সপ্তাহব্যাপী পূজা এবং সর্বজনীন ভোজ, যাত্রা, থিয়েটার, জলসা এবং সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদর্শনী ও সিনেমা দেখানোর আয়োজন করা হয়। এই সকল আনন্দ অনুষ্ঠানে এই অঞ্চলের বহু নরনারী যোগদান করিয়া থাকেন। উল্লিখিত অন্যান্য উৎসবগুলিও সর্বজনীন এবং প্রাচীন। রথযাত্রা উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

চড়কের মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে। চড়কের মেলাটিও প্রাচীন। তবে রথযাত্রার তুলনায় দোকানপাট ও লোকসমাগম কম হইয়া থাকে।

(চ) গ্রামে চারটি শীতলার স্থান এবং মনসা, বাসন্তী ও কালীপূজার জন্য নির্দিষ্ট স্থান আছে। ইহাভিন্ন,এই স্থানে গোরাচাঁদ পীরের দরগাহ আছে। প্রতি বৎসর ১২ই ফাল্গুন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পীরের তিরোভাব উপলক্ষে দরগায় ধুপ-দীপ ও সিন্নি দিয়া থাকেন।

শোনা যায় এই গ্রামের প্রাচীন নাম দেবালয় ছিল। এই স্থানে বহু প্রাচীন মন্দির ও দেব-দেউলাদি ছিল বলিয়া সম্ভবতঃ গ্রামটির নাম হয় দেবালয়। পরে দেবালয় হইতে দেউলিয়া হইয়াছে। দেউলিয়া গ্রামে রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানী ছিল। গোড়াই গাজীর সহিত যুদ্ধে রাজা চন্দ্রকেতু সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। রাজা চন্দ্রকেতু দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া গ্রামটির নাম দেউলিয়া হয় এইরূপ জনশ্রুতি আছে।

বর্তমানে কলিকাতার আশুতোষ মিউজিয়মের পক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গোস্বামী মহাশয় এই গ্রামে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কার্য চালাইতেছেন। তিনি অনুমান করেন দেবালয়ে এক প্রাচীন সমৃদ্ধশালী নগরের অস্তিত্ব ছিল। এই স্থানে 'খনা মিহিরের ভিটা' বলিয়া কথিত সুউচ্চ ঢিপি খনন করিয়া সুন্দর পাতলা ইটের গাথুনি পাওয়া গিয়াছে। ইহাছাড়া, এই অঞ্চলে বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় অনেকে মনে করেন পূর্বে এই স্থানে বৌদ্ধদিগের কোন মন্দিরাদি ছিল।

শ্রীঅধীর কুমার চক্রবর্তী, গ্রামসেবক,
ও
শ্রীদিলীপ কুমার মৈত্র, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ দেবালয়, ২৪-পরগণা।

উৎসব বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

সোহাই গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে সাড়ম্বরে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি ব্যক্তিবিশেষের হইলেও আশেপাশের চার-পাঁচটি গ্রামের সমুদয় হিন্দু এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। গ্রামবাসীগণ এই উৎসবটিকে প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করেন। কথিত আছে যশোহর জেলার মহারাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে মহারাজা মানসিংহের নেতৃত্বে এক বিরাট বাদশাহী সেনাবাহিনী খুলনা জেলার ধুমঘট নামক স্থানে যাইবার কালে এই গ্রামে কিছুদিন অবস্থান করেন। পানীয় জলের জন্য ঐ সৈন্যদল এই গ্রামে দুইটি দীঘি খনন কালে একটি পাথরের শিবমূর্তি দেখিতে পান। মহারাজা মানসিংহের হিন্দু সৈন্যগণ এই স্থান পরিত্যাগের পূর্বে উক্ত শিব মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করিয়া যথারীতি পূজা করেন। সম্ভবতঃ সেই সময় হইতেই এই গ্রামে শিবপূজা ও চড়ক উৎসব চলিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ অনুমান করেন শিব মূর্তিটি রাজা বল্লাল সেন-এর রাজত্বকালে কোন এক সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পূর্বে শিব মূর্তিটিকে গ্রামের 'হালো-কালো' নামক দীঘিতে সারা বৎসর ডুবাইয়া রাখা হইত এবং চৈত্র-সংক্রান্তির দিন উৎসব উপলক্ষে গাজনের সন্ন্যাসব্রতীগণ দীঘির জল হইতে শিব মূর্তিটিকে তুলিয়া গ্রামে শিবপূজার নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করিয়া যথারীতি পূজা ও চড়ক উৎসব পালন করিয়া পুনরায় শিব মূর্তিটিকে দীঘির জলে ডুবাইয়া রাখিতেন। বর্তমানে উক্ত দীঘিটি পূর্ববঙ্গ হইতে আগত জনৈক ব্যক্তি ক্রয় করিয়া লওয়ায় এখন গ্রামের রায় পরিবারের একটি পুষ্করিণীতে উক্ত শিব মূর্তিটি ডুবাইয়া রাখা হয়।

চৈত্রসংক্রান্তির পূর্ব দিন রাত্রে শিব ও লীলাবতী পূজা হয়। এই দিন হিন্দু রমণীগণ সন্তান-সন্ততির মঙ্গল কামনায় সারাদিন নীলের উপবাস করেন এবং সন্ধ্যায় পূজা ও পুষ্পাঞ্জলী দিয়া উপবাস ভঙ্গ করেন। চৈত্র-সংক্রান্তির দিন সাড়ম্বরে শিবের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে ব্রতধারী সন্ন্যাসীগণ ধূপদীপ দান করিয়া শিবের স্থানে বাদ্যাদি সহকারে নৃত্য করিয়া থাকেন। অপরাহ্নে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবার পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। উৎসবে আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু নরনারী যোগদান করিয়া থাকেন। শিবের সেবায়েত জাতিতে ব্রাহ্মণ। পূজারীও জাতিতে ব্রাহ্মণ, গোত্র 'বাৎস্য' এবং পদবী রায়।

মেলা বিবরণী

ওলাইচণ্ডীপূজার মেলা

উত্তর কলস্বর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে ওলাইচণ্ডীপূজা উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় ছয় বিঘা জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ছিয়াশী বৎসরের প্রাচীন।

নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় সাড়ে তিন হাজার নরনারী মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল, টোটকা ঔষধপত্র ও বই-ছবি ইত্যাদির মোট কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে এবং দশ-বার জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ নিকটবর্তী বাজার এবং হাবড়া, বাদুরিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন।

আমোদপ্রমোদ উপলক্ষে যাত্রাভিনয়ের অনুষ্ঠানে প্রায় পাচ-ছয় হাজার দর্শকের সমাগম হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

সোহাই গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব উপলক্ষে হালো-কালো দীঘির উত্তর প্রান্তে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। অনুমান করা হয় মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন। প্রধানতঃ নূরনগর, আমনিয়া, সোহাই, শ্বেতপুর প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

বেলেঘাটা, শ্বেতপুর, সোহাই, কুমারপুর, খাঁপুর, ননেআটী, ওধনপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। মেলায় খোলা জায়গায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে ও দশ-বার জন ফেরিওয়ালা আসেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের, মনিহারী, লোহা ও কাঁচের বাসনপত্র, কাপড়, লুঙ্গি, গামছা ও তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ, দা, কুড়ুল, কাস্তে, নিড়ানী, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি কৃষিযন্ত্রপাতি, বই-ছবি, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনা এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলো, তালপাতার পাখা প্রভৃতি দোকানপাট বসে। ওধনপুর, খাঁপুর, বড়গাছি, রামনাথপুর, সোহাই, ফাজিলপুর, নিরাশিয়াপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর শিল্পসামগ্রী ও কারুশিল্পের জিনিসগুলি আসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য মেলায় গাজনের সন্ন্যাসীরা সংনাচ দেখান।

জগদ্ধাত্রীপূজার মেলা

দেগঙ্গা গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী-পূজা উপলক্ষে স্থানীয় বাজার ও তৎসংলগ্ন স্থানে চারদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে এবং বৈকালের দিকেই মেলায় লোকসমাগম হয়।

স্থানীয় এবং বারাসত, বসিরহাট থানার অন্তর্গত প্রায় প্রত্যেক গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দশ-পনর হাজার নরনারী মেলায় আসেন। মেলায় যাত্রীগণ সাধারণতঃ গরুর গাড়ী, রিক্সা, বাস ও পদব্রজে আসিয়া থাকেন।

মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন। প্রতি বৎসর একশত হইতে দেড়শত দোকানপাট বসে এবং ত্রিশ-চল্লিশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, কাপড়চোপড় প্রভৃতি জিনিসপত্রের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, মেলায় হাঁড়িকুড়ি, ধামা, কুলো, মাটির খেলনা, প্লাষ্টিকের জিনিসপত্র ও খেলনা, চুড়ি-খুন্সী, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, বই-ছবি, টোটকা ঔষধপত্র প্রভৃতির দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, থিয়েটার, যাত্রাভিনয় হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্যমূলক চলচ্চিত্র এবং কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় যুবক ও ব্যবসায়ীবৃন্দ মেলাটি সুষ্ঠু পরিচালনা কার্যে সহায়তা করিয়া থাকেন। অগণিত নরনারী উল্লিখিত আনন্দানুষ্ঠানে যোগদান করেন।

রথযাত্রার মেলা

দেগঙ্গা গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে স্থানীয় বাজারে এবং টাকী রোডের উভয়পার্শ্বে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত বারাসত, বসিরহাট ও বাদুরিয়া থানার অন্তর্গত প্রায় প্রত্যেক গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দশ-বার হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ প্রধানতঃ গরুর গাড়ী, রিক্সা ও বাস যোগে মেলায় আসেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ী ভিন্ন বারাসত, বসিরহাট, বাদুরিয়া থানার অন্তর্গত গ্রাম সমূহ হইতে এবং কলিকাতা হইতে বহু বিক্রেতা এবং ফেরিওয়ালা আসেন। মেলার দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় দেড়শত এবং ফেরিওয়ালার সংখ্যা প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন। মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মনিহারী, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র, ধামা, কুলো, ঝুড়ি-চুপড়ী, প্লাষ্টিক ও মাটির খেলনা, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও নানাপ্রকার চারাগাছ ও বীজ, বই-ছবি, টোটকা ঔষধপত্র, কাঠের তৈয়ারী আসবাবপত্র প্রভৃতি আমদানী হয় এবং বীজ ও চারাগাছ ক্রয়-বিক্রয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য প্রতি বৎসর নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে।

দেউলিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে রথতলায় ব্যক্তিবিশেষের জমিতে এবং পি. ডাব্লু. ডি-র রাস্তার দুইধারে আনুমানিক পচিশ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত-দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং প্রধানতঃ রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিনই মেলায় লোকসমাগম ও বেচাকেনা চলে।

মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় পনর হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা প্রধানতঃ দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত সমস্ত ইউনিয়ন হইতে এবং বারাসত ও বসিরহাট থানার বিভিন্ন ইউনিয়ন হইতে আসিয়া থাকেন। বাস, লরী, রিক্সা ও গরুর গাড়ী করিয়া যাত্রীরা আসেন।

মেলায় প্রায় তিনশত দোকানপাট বসে এবং পঞ্চাশ জনের মত ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে প্রায় দুইশত দোকান খোলা জায়গায় বসে। আরবেলিয়া, খোলাপোতা, বসিরহাট, বাদুরিয়া, যদুরহাটী, চৌরাশী, বারাসত প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসেন। সমস্ত দোকানপাটগুলির মধ্যে ফল ও ফুলের চারাগাছ, কাঠের তৈয়ারী জিনিসপত্র এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলো, চ্যাঙ্গারী, টোকা, প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রীর দোকানই বেশী। কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী প্রধানতঃ ঝিকিরা, যাদবপুর, চৌরাশী, চিংড়াগ্রাম ও বসিরহাট হইতে আসিয়া থাকে। এইরূপ দোকানের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশটি। ইহা ব্যতীত ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, কোদাল, কাস্তে, হেঁসুয়া, নিড়ানী, লাঙ্গল, জোয়াল, দা, বঁটি প্রভৃতি কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, মাটির পুতুল ও হাঁড়ি-কুড়ির দোকান, বই-ছবির দোকান ও টোটকা ঔষধপত্রের দোকান বসে। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক ও লটারী প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে।

রাসযাত্রার মেলা

উত্তর কলসুর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে পূর্ণিমার রাসোৎসব উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় ছয় বিঘা পরিমাণ

জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি বারদিনব্যাপী স্থায়ী হয় এবং ইহা প্রায় উননব্বই বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় তিন হাজার হইতে সাড়েতিন হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক।

মেলায় প্রায় চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং দশ-বার জন ফেরিওয়ালা আসেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী ভিন্ন প্রতি বৎসর হাবড়া ও বাদুরিয়া হইতে ব্যবসায়ীরা আসিয়া থাকেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য দোকানপাটের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত বাসন-কোসনের দোকান, মনিহারী দোকান, ঔষধপত্রের দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, বেত ও বাঁশের তৈয়ারী ধামা, কুলো, চ্যাঙ্গারী ইত্যাদি দোকনপাট বসিয়া থাকে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য মেলায় যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রাদল আসে। এই অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার দর্শকের সমাগম হয়।



গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ অর্জ্জুনপুর। ৭।২০২'৭৯।৬৫৯।৪,২০৯

(ক) গ্রামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোকজনই বেশী। ইহা ব্যতীত, কয়েক ঘর নিম্ন বর্ণ হিন্দুর বসবাস আছে। গ্রামে চারটি পাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) রেলস্টেশন দমদম। কলিকাতা হইতে যশোহর রোড দিয়া মোটরবাসে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে কপিলমুনির আশ্রমে গোরক্ষনাথ মঠে যোগী সম্প্রদায়ের পরিচালনায় প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় মহাসমারোহে গোরক্ষনাথের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পৌষ মাসে এই আশ্রমে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। পৌষসংক্রান্তিতে সাগরস্নান উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত কিছু সংখ্যক সাধু-সন্ন্যাসী সাগর মেলায় যাত্রার পূর্বে কয়েকদিন এখানে অতিবাহিত করেন। গোরক্ষনাথের নিকট প্রধানতঃ 'রোট' ও 'লেঙ্গট' (লাল সালু কাপড়) মানত দেয়া হয়।

ইহা ব্যতীত গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে ভৈরবনাথ শিবলিঙ্গের পূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপূজা উপলক্ষে পাচদিনব্যাপী সাড়ম্বরে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিন শিবপূজা, দ্বিতীয় দিনে গাজন সন্ন্যাসীগণের কাটা ও বঁটি ঝাঁপ এবং ফল সংগ্রহ, তৃতীয় দিনে নীলপূজা, বাণ ফোঁড়া ও লীলাবতীর বিবাহ, চতুর্থদিনে চড়কপূজা এবং পঞ্চম বা শেষ দিনে হাজরাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি বহু প্রাচীন এবং সর্বজনীন।

(ঙ) গোরক্ষনাথের বার্ষিক পূজা উপলক্ষে মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কপিলমুনির আশ্রমের সীমানার মধ্যে গোরক্ষনাথ, ভৈরবনাথ শিবলিঙ্গ, কালী ও মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর মন্দির আছে।

কিংবদন্তী আছে যে, আদিতে গ্রামটির নাম ছিল 'খাণ্ডব'। মহাভারতে বর্ণিত অর্জ্জুন এই খাণ্ডব বন দাহন করিয়া গ্রামটির সংস্কার করেন। খুব সম্ভব এই কারণে গ্রামের নাম 'অর্জ্জুনপুর' হইয়াছে।

শ্রীহিরণ্ময় সরকার, চাকুরি,
২৩।৭, বাক্সিপাড়া রোড, ২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ শিখরপুর। ৪৯।৫৭০'২৭।২০৭।১,৩৬১

(ক) ব্রাহ্মণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নাপিত, যোগী। গ্রামে আটটি পাড়া আছে। যথা—নস্করপাড়া, রায়পাড়া, বৈদ্যপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, মোড়লপাড়া, বিশ্বাসপাড়া ও সর্দারপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) রেলস্টেশন দমদম। ভাঙ্গর রোড দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও রাসপূর্ণিমা হইতে তিনদিনব্যাপী সাড়ম্বরে রাসযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাস উৎসব উপলক্ষে গোপ-গোপীসহ রাধাকৃষ্ণের পূজা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং গত কুড়ি বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা হয়।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে তিনদিন। মেলাটি প্রায় কুড়ি বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালীমন্দির ও রাধাকৃষ্ণের একটি মন্দির আছে। তাহাছাড়া একটি শিব, তিনটি পঞ্চানন্দ, দুইটি শীতলা ও দুইটি মনসা আছে।

শ্রীধীরেন্দ্র মোহন পাইন, চাকুরি,
গ্রাম : চাঁদপুর, পোঃ রাজারহাট,
ও
শ্রীনিবারণ চন্দ্র মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক,
শিখরপুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
পোঃ রাজারহাট, ২৪-পরগণা।

মেলা বিবরণী

গোরক্ষনাথের মেলা

অর্জ্জুনপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় গোরক্ষনাথের বার্ষিক পূজা ও উৎসব উপলক্ষে গোরক্ষনাথের মন্দির প্রাঙ্গণে দেবোত্তর প্রায় ষাট বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। ইহা বহুকালের প্রাচীন।

হাতিয়াড়া, বাগুইআটি, দমদম, বিরাটি, রাজারহাট প্রভৃতি স্থান হইতে এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর হইতে মেলায় কয়েক সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যাই বেশী।

মেলায় প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান এবং খেলনা দ্রব্যের দোকানই বেশী দেখা যায়। ইহা ব্যতীত মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, শিল্পসামগ্রী, ঔষধপত্র ও বই-ছবি প্রভৃতি দোকানপাটও বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, লটারী, হরিনাম কীর্তন, কবিগান, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় যুবক সঙ্ঘ কর্তৃক যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় চার সহস্র নরনারী এই সকল আনন্দানুষ্ঠানে যোগদান করেন।

রাসযাত্রার মেলা

শিখরপুর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের রাসপূর্ণিমা তিথিতে রাস উৎসব উপলক্ষে রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রাঙ্গণে দেবোত্তর প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত প্রায় কুড়ি বৎসর যাবত বসিতেছে।

রাজারহাট, চাঁদপুর, পাথরঘাটা প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রায় আট-নয় শত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন। মেলায় প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং পনর-কুড়ি জন ফেরিওয়ালা আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির খেলনা, হাঁড়িকুড়ি, মাদুর, বই-ছবি, চ্যাটাই ইত্যাদির দোকান উল্লেখযোগ্য।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচ, তরজা ও যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রায় চার-পাঁচ শত লোক এই সকল আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।



থানা ঃ বিজপুর

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক বিজপুর থানার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া ও হালিশহরে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণাদি সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি নিয়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

কাঁচড়াপাড়া

চব্বিশ-পরগণা জেলার বিজপুর থানার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া কলিকাতা হইতে প্রায় ২৮ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা একটি মিউনিসিপাল শহর এবং পূর্ব রেলপথে এই স্থানে একটি রেলস্টেশন আছে। এই স্থানের বিভিন্ন কল-কারখানায় কর্মরত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকজন বসবাস করিতেছেন। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে এই স্থানের জনসংখ্যা ৬৮,৯৬৬। কাঁচড়াপাড়ার প্রাচীন নাম কাঞ্চনপল্লী। কাঞ্চনপল্লী পরমবৈষ্ণব শিবানন্দ সেনের পাটরূপে খ্যাত। শিবানন্দ সেবিত কৃষ্ণরায়জীউর মন্দিরটি বর্তমান কাঁচড়াপাড়া রেলস্টেশন হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে নদীয়া সীমান্তে অবস্থিত। যদিও শোনা যায় কাঞ্চনপল্লীই অপভ্রংশে কাঁচড়াপাড়া হইয়াছে, তথাপি প্রাচীন কাঞ্চনপল্লী বলিতে আজ সে-স্থান কাঁচড়াপাড়া বলিয়া পরিচিত সেই স্থান বুঝাইত না; সেন শিবানন্দের পাটই প্রাচীন কাঞ্চনপল্লীতে অবস্থিত ছিল।

সেন শিবানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের পার্শ্বচর ও বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৩৬ শকাব্দে কুমারহট্ট শ্রীনিবাস ভবন হইতে যাত্রা করিয়া কাঞ্চনপল্লীতে তাঁহার এই ভক্তের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়া যখন শ্রীক্ষেত্রে বাস করিতেন তখন প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় ভক্তমণ্ডলী তথায় তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। শিবানন্দ সেন সেই সকল ভক্তদিগের পথ প্রদর্শক হইয়া তাঁহাদের যাত্রাপথের যাবতীয় ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় বহন করিতেন বলিয়া জানা যায়। শিবানন্দের তিন পুত্র চৈতন্যদাস, রামদাস ও পুরীদাসের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পুরীদাস বৈষ্ণব জগতে পরমানন্দ সেন নামে সমধিক পরিচিত। পরমানন্দ সেন সম্পর্কে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—বাড়ী কাঁচড়াপাড়া গ্রাম, জাতিতে বৈদ্য। ইনি মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর শিবানন্দ সেনের পুত্র; ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে পরমানন্দের জন্ম হয়। মহাপ্রভু ইঁহাকে 'কবি-কর্ণপুর' উপাধি দিয়াছিলেন। ইনি ১৪৯৪ শকে (১৫৭২ খৃঃ) সুবিখ্যাত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক ও তাহার চারি বৎসর পরে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' প্রণয়ন করেন; ইহা ছাড়া 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ', 'কেশবাষ্টক', 'চৈতন্যচরিতা কাব্য' প্রভৃতি বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন। (পৃঃ ১৮৭)।

কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দ সেবিত 'কৃষ্ণরায়' নামে খ্যাত কষ্টিপাথর নির্মিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ ও অষ্টধাতু নির্মিত শ্রীরাধিকা মূর্তি দক্ষিণমুখী একটি আটচালা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরের চারিপাশ সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহার সম্মুখস্থ গেট পার হইয়া একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ এবং এই প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া আর একটি গেট পার হইলে দ্বিতীয় একটি বিশাল প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে সুবিশাল কৃষ্ণরায় মন্দির দণ্ডায়মান। মন্দির প্রাঙ্গণের চারিদিকে নানা ফল ও ফুলের বাগান। কৃষ্ণরায় মন্দির দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০ ফুট, প্রস্থে ৪০ ফুট এবং উচ্চতায় ৭০ ফুট হইবে। ইহার সম্মুখের দরদালান ও চারিদিকে ঘোরান সুউচ্চ রক আছে। পশ্চিমদিকের স্থাপিত কয়েকটি সিঁড়ি বাহিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দিরের সম্মুখস্থ দেওয়াল গাত্র বড় বড় পোড়ামাটির ফলক দ্বারা শোভিত। বর্তমানে ঐ সকল ফলকগুলির উপর চুন-বালির পলেপ পড়ায় পূর্বের শিল্প সৌন্দর্য বহুলাংশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সংস্কার অভাবে মন্দিরের সম্মুখস্থ চালার একটি বৃহদাংশের চুন-বালির পলস্তরা খসিয়া পড়িয়াছে। মন্দিরে প্রবেশের একটি মাত্র দরজা আছে এবং এই কাষ্ঠ নির্মিত দরজাটির গাত্রে খোদিত দশাবতার মূর্তি ও অপূর্ব সুন্দর লতাপাতার শিল্পকর্ম সহজেই মানুষের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা ভিন্ন, সমগ্র মন্দিরটির কারুকার্য ও স্থাপত্য শিল্প বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এই সুবিশাল মন্দির গঠন কার্যের মধ্যে লোহা ও গিলানের ব্যবহার করা হয়নি।

মন্দিরাভ্যন্তরে একটি ত্রিস্তর বিশিষ্ট শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত বেদীর উপর রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ব্যতীত একটি পৃথক

কাষ্ঠ মঞ্চে দারু নির্মিত বলরাম (মুখমণ্ডল মাত্র) মূর্তি, নারায়ণ শিলা, একটি ক্ষুদ্রাকৃতি শিবলিঙ্গ এবং চণ্ডী ও সিদ্ধেশ্বরীদেবীর ঘট স্থাপিত আছে। মন্দিরের পিছনে ভোগ রন্ধনাদির জন্য কয়েকটি ঘর আছে।

কৃষ্ণরায় মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ একটি লিপি হইতে জানা যায় যে, কলিকাতার বড়বাজার নিবাসী নিমাইচরণ, গৌরচরণ ও রাধাচরণ ১৭০৭ শকে অর্থাৎ ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করান। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মল্লিকগণ কর্তৃক এই মন্দির নির্মাণের বহু পূর্বে কৃষ্ণরায়জীউ আর একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উক্ত প্রাচীন মন্দিরটি যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত পুত্র রাঘব ওরফে কচুরায় বহু টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে, একদা কচুরায় প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে নালিশ জানাইবার জন্য জলপথে রাজধানী দিল্লী গমন কালে কৃষ্ণরায় বিগ্রহ দর্শনে আসিয়া প্রার্থনা জানান যে, রাজধানী গিয়ে যদি তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হয় তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণরায়ের মন্দির নির্মাণ করিয়া দিবেন। তদনুসারে তিনি কৃষ্ণরায়ের মন্দির নির্মাণ করাইয়া নিত্য সেবা-পূজার জন্য কৃষ্ণবাটি নামে একটি তালুক দান করেন। কচুরায় কর্তৃক নির্মিত মন্দিরটি ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত ছিল এবং প্রায় দুই শতাধিক বৎসর পূর্বে ভাগীরথীর ভাঙ্গনের ফলে উহা সম্পূর্ণ গঙ্গাগর্ভে অবলুপ্ত হইয়াছে। মল্লিকগণ কর্তৃক নির্মিত মন্দিরটিও ভাগীরথীর তীরেই অবস্থিত ছিল; তবে বর্তমানে ভাগীরথী পশ্চিমদিকে প্রায় এক মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণরায়জীউর নিত্য প্রাতঃকালীন উত্থান পূজা, মধ্যাহ্নে অন্নভোগ, সন্ধ্যায় আরতি, শীতলভোগ ও শয়ন পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় ফুলদোল এবং চন্দনযাত্রা, জ্যৈষ্ঠে স্নানযাত্রা, আষাঢ়ে রথযাত্রা, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী, কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা এবং ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে উল্লিখিত উৎসবাদি উপলক্ষে বিশেষ সমারোহ হইত। দোল পূর্ণিমার দিন কৃষ্ণরায় বিগ্রহকে মন্দিরের নিকটবর্তী দোলমঞ্চে স্থাপন করিয়া সারাদিনব্যাপী সাড়ম্বরে দেবদোল অনুষ্ঠিত হইত; দোলমঞ্চটি বর্তমানে ভগ্ন ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। এখন নিয়ম রক্ষার জন্য কোনক্রমে উৎসবাদি পালন করা হইতেছে মাত্র। বর্তমানে কেবলমাত্র আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে কিছু ধূমধাম হয়, তাহাও পূর্বের তুলনায় নগণ্য বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন বলরামসহ কৃষ্ণরায়জীউ বিগ্রহ রথে স্থাপন করিয়া রথের দড়ি টানা হয় এবং তদুপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসে। মেলায় আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে ছয়-সাত হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং নানাবিধ জিনিসপত্রের পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে। এই গ্রামের শ্রীজীতেন্দ্র কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মন্দিরের বর্তমান সেবায়েত। ইঁহারা দক্ষিণ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ এবং পুরুষানুক্রমে কৃষ্ণরায়জীউর সেবায়েত নিযুক্ত আছেন।

কাঁচড়াপাড়া রেলস্টেশনের পূর্বদিকে রেলওয়ে কর্মচারী উপনিবেশে একটি প্রাচীন কালীমন্দির আছে। ইহা 'ডাকাতে কালী' নামে খ্যাত। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী এবং চারিদিকে বারান্দাযুক্ত। যদিও ইহার পাঁচটি চূড়া আছে; তথাপি ইহাকে ঠিক পঞ্চরত্ন মন্দির বলা যায় না। ইহাকে দেখিতে অনেকটা টাওয়ারের মত। মন্দিরাভ্যন্তরে একটি সিমেন্ট জমান বেদীর উপর প্রায় দুই ফুট উচ্চ একটি শিলার নিম্নভাগে খোদিত কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার চারি হস্তের মধ্যে নীচের দুই হস্তে নরমুণ্ড এবং উপরের দক্ষিণ হস্তে খড়্গ আছে; কিন্তু বাম হস্তে ধৃত আয়ুধটি অস্পষ্টতার জন্য ঠিক বুঝা যায় না। কালী মূর্তির কণ্ঠে নরমুণ্ডমালা শোভিত, তবে পদতলে শিব নাই। সমগ্র শিলাটি তেল-সিন্দুর দ্বারা রঞ্জিত। দেবীর নিত্য পূজা ও ও কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে উৎসব হয়।

কালীমন্দির সংলগ্ন আর একটি ঘরে শ্বেত পাথর নির্মিত রামসীতা, কষ্টি পাথর নির্মিত শ্রীকৃষ্ণ এবং পিতল নির্মিত রাধিকা, বালগোপাল প্রভৃতি দেবদেবীর অনেকগুলি মূর্তি আছে। রামসীতার শিরে স্বর্ণমুকুট ও অঙ্গে মূল্যবান নানা স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা সজ্জিত। পশ্চিমা হিন্দুস্থানীগণ কালীমন্দিরের সেবায়েত এবং তাঁহারাই উল্লিখিত দেবদেবীর নিত্য পূজা ও উৎসবাদি পরিচালনা করিয়া থাকেন।

ইহাভিন্ন, কাঁচড়াপাড়া শহর এলাকায় অন্যান্য মন্দিরাদির মধ্যে মান্ধারীবাজারে একটি শিবমন্দির, মণ্ডলবাজার চৌমাথায় একটি শিবমন্দির, স্কুলডিং রোডে একটি শিবমন্দির ও একটি লক্ষ্মীনারায়নমন্দির এবং শহীদনগরে তিনটি শিবমন্দির আছে। শহীদনগর শিবতলায় প্রতি

বৎসর ৩০শে চৈত্র চড়কপূজা উপলক্ষে পাঁচুঘোষ মহাশয়দিগের দ্বারা একটি মেলা বসে। নৃপেন্দ্র সরকার রোডে একটি প্রাচীন ষষ্ঠীতলা ও একটি কালীমন্দির আছে। এই স্থানে চড়কতলায় প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ চড়কপূজা উপলক্ষে একটি মেলা হয়। মিলননগরে একটি জোড়াকালীমন্দির আছে এবং এই স্থানে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে একটি মেলা বসে। ধোপীপুকুর রোডে একটি শীতলামন্দির ও একটি মসজিদ ব্যতীত বাসের মোড়ে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। নেতাজী সুভাষ রোডে একটি নিমগাছের নীচে প্রতিষ্ঠিত ছোট মন্দিরে বিবিমার প্রতীক স্বরূপ সাতটি মাটির ঢিপি আছে। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বিবিমার পূজা হয়।

হালিশহর

চব্বিশ-পরগণা জেলার বিজপুর থানার অন্তর্গত হালিশহর একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ইহার পশ্চিম পাশ দিয়া পূত সলিলা ভাগীরথী প্রবাহিত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে হালিশহরের উল্লেখ আছে।

"বামদিকে হালিশহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥"

প্রাচীনকালে ইহা কুমারহট্ট পরগণার অন্তর্গত এবং কুমারহট্ট নামেই পরিচিত ছিল। কুমারহট্ট নামকরণ সম্পর্কে নানা কিংবদন্তী শোনা যায়। কেহ বলেন এই স্থানের কুম্ভকারদিগের তৈয়ারী মাটির হাঁড়ি-কলসীর বিশেষ খ্যাতি ছিল। গঙ্গারতীরে হাঁড়ি-কলসীর হাট বসিত এবং ঐ সকল হাঁড়ি-কলসী নদীপথে বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইত। তাই এই স্থান কুমারহাট বা কুমারহট্ট নামে পরিচিত হয়। মতান্তরে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্র কুমার উদয়াদিত্য ও তাঁহাদের পরিবার পরিজনেরা বিভিন্ন যোগে এই স্থানে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন বলিয়া শোনা যায় এবং তাঁহাদের আগমন উপলক্ষে গঙ্গার তীরে অস্থায়ী দোকানপসার বা হাট বসিত। এই কারণে অনেকে অনুমান করেন এই স্থানের নাম কুমারহট্ট হয়। অন্য মতে এই অঞ্চলের কুমার সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি রমণীবেশে একদা নবদ্বীপ হইতে আগত পণ্ডিতগণকে কৌশলে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিলে পর গ্রামের নাম কুমারহট্ট হয়। (এই বিষয়ে যোগীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রণীত রামপ্রসাদ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।) আবার অনেকে বলেন, প্রাচীনকালে এই স্থানে অনেকগুলি সংস্কৃত শিক্ষার টোল ছিল এবং এই সকল টোলে দেশ-বিদেশ হইতে বহু ছাত্র বিদ্যাচর্চা করিতে আসিতেন। কুমারহট্টের অধ্যাপকমণ্ডলীর শিক্ষাদীক্ষা নবদ্বীপের অধ্যাপকমণ্ডলীর সমকক্ষ ছিল। টোলের ছাত্রদিগকে 'কুমার' নামে অভিহিত করা হইত এবং কুমারদিগের একযোগে পাঠাভ্যাসের উচ্চ কলরবে বা হট্টগোলে গ্রাম মুখরিত থাকিত। তাই গ্রামের নাম হয় কুমারহট্ট।

শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় মনে করেন, হালিশহর-কুমারহট্টের প্রাচীন নাম বিজয়পুর এবং এই বিজয়পুরেই লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল। তাঁহার মতে হালিশহর মুসলমানযুগের 'হাবেলীশহর'-এর অপভ্রংশ এবং কুমারহট্ট ও হাবেলীশহর সমসাময়িক নাম; বরং হাবেলীশহর প্রাচীনতম হইতে পারে।

হালিশহর পূর্বে নৈহাটি মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত ছিল পরে ১৯০৩ সালে এই স্থানেই একটি মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হয়। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে এই মিউনিসিপাল শহরে জনসংখ্যা ৫১,৫২৩। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ২৬ মাইল। শিয়ালদহ-রানাঘাট রেলপথে হালিশহরেই একটি রেলস্টেশন আছে। অবশ্য পরবর্তী রেলস্টেশন কাঁচড়াপাড়া হইতে ব্যারাকপুরগামী মোটরবাসে এই স্থানে যাতায়াত করা সুবিধাজনক। বর্তমানে হালিশহরে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, মাহিষ্য, কামার, কুমার, নাপিত, জেলে, বাগ্দী, তিওর, কংসবণিক, বারুই, ডোম, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বাস আছে। বড়িষার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদিগের আদিপুরুষ পাঁচু শক্তি খাঁ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশের নানাস্থান হইতে বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি পরিবার আনাইয়া এই স্থানে তাঁহাদের বসবাস স্থাপন করান বলিয়া জানা যায়।

এই হালিশহর বা কুমারহট্ট গ্রামেই শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী বসবাস করিতেন। যে-স্থানে তাঁহার বাসভবন ছিল, উহা এখন 'চৈতন্যডোবা' নামে পরিচিত।

চৈতন্যডোবা একটি পুষ্করিণী বিশেষ এবং বর্তমানে ইহা প্রকৃতই পানা পরিপূর্ণ একটি ডোবায় পরিণত হইয়াছে। ইহার উত্তরপারে ঈশ্বরপুরীর বাসভিটার উপর একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। মঠবাড়ীটির অবস্থা চৈতন্যডোবার ন্যায়ই সমান দুর্দশাগ্রস্ত। মঠ প্রাঙ্গণের চারিদিকে বেষ্টিত প্রাচীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং আশেপাশে চারিদিকে বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতি বিজড়িত কুমারহট্টস্থিত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর বাসভিটা বহুকাল অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল। শ্রীধাম বৃন্দাবন নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ দাস মোহান্ত বাবাজী এই স্থানে আসিয়া উক্ত বৈষ্ণব তীর্থের ও শ্রীনিবাস অঙ্গনের পুনরুদ্ধার করেন এবং তাঁহারই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাংলা ১৩৪২ সনের ১১ই কার্তিক উল্লিখিত মঠবাড়ী ও মন্দিরাদি নির্মিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মোহান্ত প্রাণকৃষ্ণ দাস সেবিত প্রাচীন রাধারাণী বিগ্রহ বাংলা ১৩৭৩ সনে এবং গৌরনিতাই বিগ্রহ ১৩৭৫ সনের আশ্বিন মাসে মন্দির হইতে অপহৃত হয়। বর্তমানে মঠবাড়ীর মধ্যে অবস্থিত দক্ষিণমুখী একটি পাকা মন্দিরে কাঠের মঞ্চের উপর চক্ষু-কর্ণ অঙ্কিত গোবর্ধন শিলা (কেবল মুখমণ্ডল), রাধাকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গদেব ও তাঁহার পারিষদদিগের ফ্রেমে বাঁধান ছবি এবং কয়েকটি শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা রাধাবিনোদজীউর মন্দির নামে পরিচিত। মন্দিরের পশ্চিম পাশে মোহান্তদিগের থাকিবার জন্য কয়েকটি ঘর আছে।

চৈতন্যডোবা সৃষ্টি সম্পর্কে জানা যায় যে, ১৪৩৩ শকাব্দে নীলাচল হইতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাত্রার উদ্দেশে সপার্ষদ পানিহাটী শ্রীরাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট হইয়া তাঁহার দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সুপবিত্র জন্মস্থান দর্শন করিতে আসেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া গুরুদেবের বিচ্ছেদ জনিত বিরহে অবিশ্রান্ত ক্রন্দন, নর্তন ও কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার দেহে অষ্ট-সাত্ত্বিক মহাভাবের বিকাশলাভ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহার সুন্দর বর্ণনা আছে। যেমন—

প্রভু বলেন এই কুমারহট্টেরে নমস্কার।
ঈশ্বরপুরী যে গ্রামে অবতার॥
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সে স্থানে।
আর কিছু শব্দ নাই ঈশ্বরপুরী বিনে॥

(১৫শ অঃ)

শ্রীগুরুর চরণস্পর্শিত পূত মৃত্তিকা মহাপ্রভু স্বয়ং আপনার সর্বাঙ্গে লেপন করিয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে একমুষ্টি ধূলি আপন বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া লইলেন—

সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্বাসে বাঁধি এক ঝুলি॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ, আদিখণ্ড, ১৫শ অঃ)

এবং তাঁহার দেখাদেখি অন্যান্য পার্ষদ ও শ্রীচৈতন্য দর্শন ইচ্ছুক সমাগত ভক্তগণ এই স্থান হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিতে থাকায় একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের সৃষ্টি হয়—ইহাই চৈতন্যডোবা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কুমারহট্টে অবস্থিত শ্রীনিবাস অঙ্গনও বৈষ্ণবদিগের নিকট একটি পবিত্র তীর্থস্থান। এই শ্রীনিবাস অঙ্গনে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার ভক্ত-পার্ষদ সমভিব্যাহারে প্রেমানন্দে কীর্তন করিয়া গিয়াছেন।

বর্তমানে অবহেলিত এই মঠে কোনক্রমে গোবর্ধন শিলার নিত্য পূজা এবং প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে মহাপ্রভুর আগমন স্মৃতি স্মরণ উপলক্ষে এবং আষাঢ়ী শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে মঠ প্রতিষ্ঠাতা প্রাণকৃষ্ণ দাস বাবাজীর তিরোভাব উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মঠের বর্তমান মোহান্ত শ্রীগৌরপদ দাস বাবাজীর মতে উৎসব নামে মাত্র, ভিক্ষালব্ধ আয় হইতে নিত্য পূজা করাই দুষ্কর।

কেবল বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থানরূপেই হালিশহরের পরিচয় সীমাবদ্ধ নহে; ইহা শাক্তদিগেরও তীর্থস্থানস্বরূপ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে (১৭১৮-১৭২৯ খৃঃ) প্রখ্যাত শক্তিসাধক ও স্বভাবকবি রামপ্রসাদ সেন হালিশহরে এক প্রসিদ্ধ বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামরাম সেন, মাতা সিদ্ধেশ্বরীদেবী। সেন বংশের আদি পুরুষ কীর্তিবাস সেন দান-ধ্যানে ও স্নিগ্ধ চরিত্র বলে বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ভক্তি ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া রামপ্রসাদের ইষ্টদেবী কালী তাঁহাকে কন্যারূপে দর্শন দিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ভক্তিপুত শ্যামাসঙ্গীত বাংলা সাহিত্যে 'রামপ্রসাদী' গান নামে পরিচিত। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সঙ্গীত প্রতিভা ও সুমধুর কণ্ঠস্বরের জন্য তাঁহাকে 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত করেন। শক্তিসাধক কবি রামপ্রসাদের কালী-সাধনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'ভারতের

শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"সাধক রামপ্রসাদ তাঁহার কালী-সাধনার ভিতর দিয়া শক্তি-সাধনাকে একটি নবরূপ দান করিয়াছেন। এই নবরূপ হইল একটি ব্যাপক সর্বজনীনরূপ। রামপ্রসাদ তাঁহার আবির্ভাব-কালে শাক্ত সাধনার দুইটি ধারা পাইয়াছিলেন—একটি হইল গুহ্য-সাধনার ধারা, অপরটি হইল বহু অর্থব্যয়ে বহু জাঁকজমকে ষোড়শ বা ততোধিক উপচারে মৃন্ময়ী কালী-প্রতিমার পূজা। এই গুহ্য-সাধনার ধারাটি একটি সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। যাঁহারা বাহিরের পূজার্চ-নাকেই বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন, যতদূর তথ্য পাওয়া যায় দেখিতে পাই, তাঁহাদের সম্প্রদায়-চেতনা অত্যন্ত উগ্র ছিল—বৈষ্ণবধর্ম-বিদ্বেষ এই সব শক্তি-উপাসনার একটি লক্ষণীয় অঙ্গ ছিল। রামপ্রসাদের মধ্যেই আমরা প্রথম চেষ্টা লক্ষ্য করি, কালী-সাধনাকে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর উর্ধ্বে তুলিয়া তাহাকে একটা সর্বজনগ্রাহ্য রূপ দিতে। বাঙলা দেশের শক্তি-সাধনায় রামপ্রসাদ এই প্রথম যে সুর তুলিলেন, দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী শ্যামার পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আমরা সেই সুরেরই পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করিতে পারি।

রামপ্রসাদের সঙ্গীতগুলির ভিতর দিয়া যতটা বুঝিতে পারা যায় তাহাতে পূর্ববর্তী তান্ত্রিক সাধকগণের ন্যায় শ্মশানে শব-সাধনা, ভৈরবীচক্র-সাধনা বা অন্য প্রকারের পশ্বাচার সাধনার পথ তিনি অবলম্বন করেন নাই। এমন কি তান্ত্রিকগণের কারণ-বারিরূপ সুরাপানাদিকেও তিনি বাহ্যবস্তুর দিক্ হইতে গ্রহণ না করিয়া ভাবরূপ মানসরসের দিক্ দিয়াই গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই সাধনায় সুরাপান-সম্বন্ধে তিনি গাহিয়াছেন,—

ওরে সুরা পান করিনে আমি,
সুধা খাই জয় কালী ব'লে।
মন-মাতালে মাতাল করে,
মদ-মাতালে মাতাল বলে।

এই যে 'মদ-মাতাল' অপেক্ষা 'মন-মাতালে'র বা ভাব-মাতালের প্রাধান্য রামপ্রসাদের ক্ষেত্রে ইহাই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বস্তু। কালীকেও পরমতত্ত্বরূপে তিনি ভাবের বস্তু করিয়া লইতে চাহিয়াছেন। শুধু যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তান্ত্রিক সাধনাকে গ্রহণ করিলে চলিবে না, আগে ভাব চাই—পরম সত্যের প্রতি পরমাসক্তি চাই এবং তাহাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করিবার জন্য চিত্তপ্রস্তুতি চাই। সেইজন্য রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, 'সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাব কি ধরতে পারে'।"

হালিশহরে রামপ্রসাদের বাস্তুভিটা সংলগ্ন তাঁহার সাধনস্থল পঞ্চবটী আজিও বিদ্যমান। এই স্থানে তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে স্থানীয় জনসাধারণ লইয়া গঠিত একটি কমিটি কর্তৃক বাংলা ১৩৪১ সনে প্রসন্নময়ী জগদীশ্বরী কালীমন্দির নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী এবং সমতল ছাদবিশিষ্ট। উহার সম্মুখে দালানযুক্ত তিনটি প্রকোষ্ঠের মধ্যটিতে শ্বেত প্রস্তরের বেদীতে পদ্মের উপর শায়িত শ্বেত প্রস্তরের মহাকালের বক্ষে পা দিয়া প্রায় আড়াই ফুট উচ্চ কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত দক্ষিণা কালীর সুন্দর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। দেবী বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিহিতা, শিরে রৌপ্য নির্মিত মুকুট। বেদীর তিনদিক লোহার রেলিং দ্বারা ঘেরা। মন্দির অভ্যন্তরের এবং বাহিরের দালানের মেঝে মোজাইক করা। বেদীর নীচে একটি বৃহৎ তাম্রঘট প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত, বেদীর উপর তাম্রপাত্রে খোদিত নটরাজ মূর্তি এবং কয়েকটি নারায়ণ শিলা দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্বে ঢাকা জেলার জাজিরা-কোণ্ডা গ্রাম এবং অধুনা আসাম প্রদেশের তেজপুর নিবাসী শ্রীসুধাংশু কুমার চন্দ্ররায় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৮৭৯ শকাব্দে উল্লিখিত মাতৃ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং শ্রীযোগেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় শ্বেত প্রস্তরের প্রশস্ত বেদীটি নির্মাণ করাইয়া দেন। বাংলা ১৩৬৭ সনের ৮ই আশ্বিন হালিশহর খাসবাটি নিবাসী শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র পাত্র দ্বারা মন্দিরের বারান্দা এবং ১৮৮১ শকাব্দে কাঁচড়াপাড়ার ডাঃ ভূতনাথ নন্দী দ্বারা মন্দির সংলগ্ন বৃহৎ নাট মন্দিরটি নির্মিত হয়।

কালীমন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব কোনে রামপ্রসাদের সাধনস্থল পঞ্চবটীতে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ ও বটগাছ দাঁড়াইয়া আছে। উক্ত বৃক্ষদ্বয়ের গোড়া ইঁট দ্বারা বাঁধান। পঞ্চবটীর নিকট একটি ঘরে প্রায় এক ফুট উচ্চ শিবলিঙ্গ, একটি বৃষ মূর্তি এবং একটি ত্রিশূল প্রোথিত আছে। গৌরীপট্ট ও বৃষ মূর্তিটি শ্বেত প্রস্তর নির্মিত।

প্রসাদময়ী কালীর প্রতিদিন মধ্যাহ্নে অন্নভোগ, সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি ও শীতলপূজা হয়। ইহা ব্যতীত, প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় দেবীর বার্ষিক পূজা, কার্তিক মাসের

অমাবস্যায় সাড়ম্বরে পূজা এবং ১২ই মাঘ তারিখে অন্নকূট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অন্নকূট উৎসব ও তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলায় পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থান হইতে প্রায় দশ হাজার নরনারীর সমাগম এবং সর্বজনীন ভোগ বিতরণ করা হয়। গত প্রায় ষাট বৎসর যাবত রামপ্রসাদ সাধন-পীঠে উল্লিখিত উৎসবাদি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং উত্তরোত্তর লোকসমাগম বাড়িতেছে। অন্নকূট মেলায় মন্দির প্রাঙ্গণে নানাবিধ খাবার, মনিহারী, মাটির খেলনা-পুতুল, হাঁড়িকুড়ি, বই-ছবি, গামছা, বেত, বাঁশ ও তালপাতার তৈয়ারী দ্রব্য সমগ্রীর প্রায় চল্লিশটি দোকানপাট বসে।

রামপ্রসাদ সাধন-পীঠে শ্যামাপূজা উপলক্ষে গত ৭ই কার্তিক ১৩৬৭ সনে যুগান্তর পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়।

"গত ২রা কার্তিক বুধবার দীপান্বিতা দিবস হালিসহর সাধক রামপ্রসাদ সাধনপীঠে শ্রীশ্রীজগদীশ্বরী কালীমাতার বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত দিবসে প্রাতে শ্রীশ্রীচণ্ডী পূজা পাঠ এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদির পর দ্বিপ্রহরে প্রাত্যহিক পূজা, ভোগরাগাদি ও সাধু সন্ন্যাসীদের সেবা হয়। অপরাহ্ণে পঞ্চবটী মূলে শ্রীগৌর চক্রবর্তীর পরিচালনায় জগদীশ্বরী কালী কীর্তন সমিতি কালী কীর্তন করেন এবং সন্ধ্যায় স্থানীয় শ্রীরামপ্রসাদ লীলা কীর্তন সমিতি কর্তৃক সাধক রামপ্রসাদের জীবনলীলা সঙ্গীতালেখ্য সহ পরিবেশিত হয়। পূজা উপলক্ষে একটি ছোট-খাট মেলাও বসে। গভীর নিশীথে ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনাড়ম্বর প্রাচীন প্রথায় শ্রীশ্রীমায়ের সমস্ত রাত্রিব্যাপী বিশেষ পূজা আরম্ভ হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সংখ্যক লোক এই ঐতিহাসিক পূজা দর্শনের জন্য আসেন তার মধ্যে কিছু সংখ্যক মন্দির, নাট-মন্দির ও পঞ্চবটী মূলে অবস্থান করিয়া সারারাত্রিব্যাপী পূজা দর্শন করেন। পূজা শেষে ভোরে সমবেতদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সাধক রামপ্রসাদের তিরোধান দিবস উপলক্ষে পর দিবস বৃহস্পতিবার স্থানীয় যুবকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দরিদ্রনারায়ণ সেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।"

হালিশহরে অন্যান্য পূজা-পার্বণের মধ্যে কার্তিক পূজার আড়ম্বর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাভিন্ন, প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমার পরে সপ্তমী তিথিতে স্থানীয় চৌধুরী পরিবারের গৃহে প্রতিষ্ঠিত প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন তাঁহাদের কুলদেবতা শ্যামরায়ের বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া চৌধুরী পাড়ার দোলতলায় চাচর ও দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং পূজা প্রাঙ্গণে দোকানপাট বসে। স্থানীয় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের কুলদেবতা রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া মাত্র পচিশ বৎসর পূর্বেও তেঁতুলতলায় সাড়ম্বরে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। এই উৎসবে পুতুলনাচের বিশেষ খ্যাতি ছিল। বর্তমানে উৎসবটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চৈত্র মাসে হালিশহরের শাচণ্ডীতলায় এবং শিবের গলিতে চড়কপূজা হয়। শিবের গলির চড়কের বর্তমান প্রধান সেবাইত শ্রীসাতকড়ি মিস্ত্রী নামে জনৈক ব্যক্তি। ইহারা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু এবং বংশানুক্রমে শিবের সেবায়েতের কাজ করিতেছেন। শাচণ্ডীতলার চড়ক বহুদিনের প্রাচীন এবং ইহা বাসি চড়ক নামে খ্যাত। চণ্ডীপুকুরে চড়কগাছ ডুবান থাকে এবং এই স্থানে একটি বটগাছের নীচে চতুর্ভুজ গণেশ মূর্তি শায়িত অবস্থায় আছে। আগে বাসি চড়কে বাণফোড়া হইত এবং বহু লোকজন আসিতেন। এখন আর চড়কে তেমন ধুমধাম নাই; চণ্ডীপুকুরপাড়ে চড়কের দিন বৈকালে কয়েকটি দোকানপাট বসে।

চৌধুরীদিগের প্রতিষ্ঠিত বলদিয়াঘাটায় সিদ্ধেশ্বরী দেবী ও তাঁহার ভৈরব শিব আছেন। অনেকে বলেন, শিবের গলির বুড়াশিবই সিদ্ধেশ্বরী দেবীর ভৈরব। হালিশহর খাসবাটির নিকট শ্যামাসুন্দরী কালী ও তাঁহার ভৈরব এবং বাজারপাড়ায় শিবের নাভিপদ্ম হইতে উত্থিত পদ্মের উপর উপবিষ্টা রক্তবর্ণা দেবী রুদ্রভৈরবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দুর্গার ধ্যানে দেবীর পূজা হয় এবং প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠী তিথি হইতে দশহরা তিথি পর্যন্ত বার্ষিক পূজা হইয়া থাকে। তাহাছাড়া দুইটি শীতলা, বাগদীপাড়ার মনসাতলায় মনসামূর্তি এবং হালিশহরে কয়েকটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। উহার মধ্যে বারেন্দ্রপাড়ায় কয়েকটি পরিত্যক্ত শিবমন্দির ব্যতীত ঘোষপাড়া রোড হইতে রামপ্রসাদ সাধন-পীঠে যাইবার রাস্তার বামপার্শ্বে দুইটি জোড়া পঞ্চরত্ন শিবমন্দিরে গৌরীপট্টসহ বৃহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির দুইটির সংস্কার কার্য চলিতেছে।

ভাগীরথীর তীরে স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সারস্বত মঠ হালিশহরের আর একটি উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য বস্তু। ইহা বাংলা ১৩২৯ সনে প্রতিষ্ঠিত। এই মঠের অন্তর্গত দক্ষিণমুখী একটি মন্দিরের অভ্যন্তরে সুউচ্চ ও

সুবিশাল শ্বেত প্রস্তর নির্মিত বেদীর উপর স্বামী নিগমানন্দের পূর্ণাবয়ব মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বেদীর মূলে স্থাপিত বস্ত্রাচ্ছাদিত তাম্রঘটে তাঁহার নিত্য পূজা হয়। মূল মন্দিরের সম্মুখে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত প্রশস্ত প্রার্থনা ঘরের সহিত একটি করিডর দ্বারা সংযুক্ত দক্ষিণ দিকে অপর একটি মন্দিরে ভৈরবী মাতা যোগমায়া দেবীর শ্বেত প্রস্তর নির্মিত সমাধিপাট ও তাঁহার বাঁধান প্রতিকৃতি আছে। করিডরের নিকট হইতে একটি প্রশস্ত বাঁধান ঘাট গঙ্গাগর্ভে নামিয়া গিয়াছে। যদিও বর্তমানে গঙ্গা কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া যাওয়ায় ঘাটের নিকট চড়া পড়িয়াছে। মঠের সীমানার মধ্যে গঙ্গার ধারে একটি নাতিবৃহৎ মন্দিরে শ্বেত প্রস্তর নির্মিত একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে—ইহা নিগমেশ্বর শিব নামে খ্যাত। মঠের চারিদিকে নানা ফুল ও ফল গাছ দ্বারা শোভিত। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাংলা ১৩৪২ সনে স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী দেহরক্ষা করিলে পর এই স্থানে তাঁহার উল্লিখিত স্মৃতিমন্দির নির্মিত হয়।

সারস্বত মঠে প্রতি বৎসর বৈশাখী মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব উৎসব, ঝুলন পূর্ণিমায় স্বামী নিগমানন্দের আবির্ভাব ও অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে তিরোভাব উৎসব এবং আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। মঠ দ্বারা পরিচালিত একটি চতুষ্পাঠীতে ছাত্রদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়।

(তথ্য সংগ্রহের কাজে হালিশহরে বারেন্দ্রগলি নিবাসী শ্রীযশোদাজীবন ভট্টাচার্য মহাশয় সাহায্য করিয়াছেন।)



থানা ঃ নৈহাটী

[নৈহাটী শহরাঞ্চলে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ ও মেলা সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

নৈহাটী

কেউ বলেন নয়া-হাট হইতে নৈহাট বা নৈহাটী হইয়াছে ; আবার কেহ বলেন নটীর হাট হইতে নৈহাটী হইয়াছে। কলিকাতা হইতে প্রায় ২৪ মাইল দূরে ভাগীরথীর পূর্বকূলে এই নৈহাটী অবস্থিত। বর্তমানে নিকটবর্তী গরিফা, কাঁঠালপাড়া প্রভৃতি অঞ্চল লইয়া মোট ১৯টি ওয়ার্ডে গঠিত নৈহাটী একটি মিউনিসিপাল শহর। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। জলপথ, স্থলপথ ও রেলপথের সুবিধা থাকায় এই স্থানে কয়েকটি বড় বড় জুট মিল ও অন্যান্য কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল কলকারখানার কাজে নিযুক্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকজনই এখানে বসবাস করিতেছেন। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে এই স্থানের মোট জনসংখ্যা ৫৮,৫৪৭। এই স্থানে হাট-বাজার, থানা, ডাকঘর, স্কুল-কলেজ, সিনেমা, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার প্রভৃতি শহরের যাবতীয় উপকরণ সমুপস্থিত এবং ইহা ২৪-পরগণা জেলার একটি থানা রূপে পরিচিত। পূর্ব রেলপথে এই স্থানে একটি জংশন স্টেশন আছে। এখান হইতে একটি রেলপথ ভাগীরথীর উপর সেতু পার হইয়া হুগলী জেলার ব্যাণ্ডেল জংশন স্টেশনে গিয়া মিলিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ব্যারাকপুর রোড দিয়া সরাসরি মোটরবাসে নৈহাটী যাতায়াত করিতে পারা যায়। তাহা ছাড়া, নৈহাটী ফেরিঘাট হইতে মোটরলঞ্চে ভাগীরথীর অপর পারে চুঁচুড়া শহরেও যাতায়াত করা চলে।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে মাধবাচার্য তাহার চণ্ডীকাব্যে প্রাচীন কুমারহট্টের নিকটবর্তী ভাগীরথীর তীরবর্তী 'গৌড়ীয়পাট' নামে যে স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে বর্তমানে নৈহাটীর উত্তরে অবস্থিত 'গরিফা' (গৌরীপুর) গ্রাম হইতে উহা অভিন্ন। অনুমান করা হয় শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রে গমনাগমন কালে এই স্থানে সাময়িক অবস্থান করিতেন বলিয়া সম্ভবতঃ ইহা গৌড়ীয়পাট নামে খ্যাত হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কিছুকাল পূর্বেও এই স্থানে পুরী তীর্থযাত্রীদিগের জন্য একটি ধর্মশালা ছিল।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে ইংরাজগণের বিরুদ্ধে কলিকাতা বিজয়ে বাহির হইয়া চুঁচুড়ার নিকট হইতে ভাগীরথী অতিক্রম করিয়া নৈহাটীর বর্তমান 'রথডাঙ্গার মাঠ' নামে খ্যাত স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

অতীতে নৈহাটী হুগলী-শ্রীরামপুরের তুলসী চন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া জানা যায়। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম হইতে হুগলীতে বঙ্গদেশের রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে কার্যোপলক্ষে নবাবী কর্মচারী, বুদ্ধিজীবি ও ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি পরিবার রাজধানীর নিকটবর্তী ও ভাগীরথীর তীরবর্তী এই অঞ্চলে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন। সেই সময় হইতেই বর্তমান নৈহাটীর সমৃদ্ধির ইতিহাস শুরু হয়। ঐ সকল প্রাচীন পরিবারগুলির মধ্যে নৈহাটির মিত্র, মজুমদার, দত্ত, সরকার, পাল ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এবং গরিফার বৈদ্যদিগের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। নৈহাটীতে বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও খ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। নৈহাটী-গরিফায় ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক কেশব চন্দ্র সেন এবং কাঁঠাল-পাড়ায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। রেল লাইনের পূর্ব ধারে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পৈত্রিক বাস্তুভিটার প্রায় তিন ভাগই আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে, বাকি অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইতে বিশেষ বিলম্ব নাই। ইহা ভিন্ন, যাঁহাদের গৌরবে নৈহাটী গৌরবান্বিত এবং নৈহাটীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মূলে যাঁহাদের দান সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তাঁহাদের মধ্যে আছেন ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক ও প্রথম অভিধান লেখক রামকমল সেন, 'ইণ্ডিয়ান মিরর্' পত্রিকার

সম্পাদক নরেন্দ্র চন্দ্র সেন, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বি, এল, গুপ্ত, আই-সি-এস, ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, এনার্কিষ্ট পার্টির প্রথম সভাপতি ব্যারিষ্টার পি, মিত্র, মেসার্স কের টাকর কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা তারক চন্দ্র সরকার, কলিকাতার শেরীফ নলিনী চন্দ্র সরকার প্রমুখ ব্যক্তিরা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাংলাদেশের প্রখ্যাত ভূতের ওঝা গঙ্গা ময়রা এই গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন।

নৈহাটীর উল্লেখযোগ্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদের কুলদেবতা রাধাবল্লভজীউর রথযাত্রা উপলক্ষে। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে সমারোহের সহিত রাধাবল্লভজীউর পূজা ও রথ বাহির হয়। রথযাত্রা উপলক্ষে রেল লাইনের ধারে এবং বঙ্কিমভবনের আশেপাশে আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলায় প্রায় দশ-বার হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রায় একশত দোকানপাট বসে।

কাঁঠালপাড়ায় বুড়াশিবের মন্দিরে এবং নৈহাটী বুড়াশিবতলায় প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন হয়। কাঁঠালপাড়ায় শিবের গাজন উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে কয়েকটি দোকানপাট বসে। ইহা ভিন্ন, নৈহাটী শহর এলাকায় আশ্বিন মাসে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দুর্গা ও লক্ষ্মীপূজা, ভাদ্র মাসে অনেকগুলি বিশ্বকর্মাপূজা ও মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দশ-বারটি শিবদুর্গাপূজা, অবাঙালীগণ কর্তৃক গণেশপূজা এবং কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে খুব ধুমধামের সহিত প্রায় একশত কালীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি নৈহাটীর কালীপূজার আড়ম্বর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। আশেপাশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুলোক শ্যামাপূজার রাত্রিতে নৈহাটীতে কালী মূর্তি দর্শন করিতে আসেন। উল্লিখিত পূজামণ্ডপগুলির মধ্যে প্রায় পনেরটি মণ্ডপে দশ হইতে পনর ফুট উচ্চ মৃণ্ময়ী কালীমূর্তি নির্মাণ করা হয়। প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তি তিথিতে এবং চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ প্রভৃতি বিভিন্ন যোগে অগণিত নরনারী নৈহাটির গঙ্গার ঘাটে পুণ্যস্নান ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পনাদি করিয়া থাকেন।

কাঁঠালপাড়ায় একটি এবং নৈহাটীতে একটি শীতলা-মন্দির ব্যতীত নৈহাটী কুমারপাড়ায় মহাকালীমন্দির, বৈদিকপাড়ায় শ্যামসুন্দরী কালীমন্দির, একটি গাছের নীচে পঞ্চাননের প্রতীক স্বরূপ একটি শিলাখণ্ড এবং মনসার নির্দিষ্ট স্থান আছে। উল্লিখিত কালীমন্দির দুইটি প্রাচীন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে 'Journal of Asiatic Society of Bengal' Part III,-এ নৈহাটি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে 'দেলাইচণ্ডী' বা বৃক্ষপূজা সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিম্নে উহা উদ্ধৃত করা হইল ঃ

About twelve years ago, while taking a stroll in the fields to the east of Naihati in the district of 24-Parganas, I was struck by seeing people picking up clods of earth and throwing them at a date tree close to the road on the left. In the course of half an hour I notice four or five persons doing that. Being curious to know why they did so, I asked one of them and he told me that a *Chandi*, a female deity—a form of Durga, Siva's consort—resided in the tree, and is propitiated by offerings of those lumps of clay. I use the word "offering", but he used the word *naibedya*, that is, an offering of uncooked eatables ; so the *Chandi* is supposed to eat the lumps of clay. Unlike the propitiation of other deities, who grant boons enjoyable only in the world to come, the propitiation of this deity is followed immediately by a great relief, and the relief is that children crying at home are at once pacified. I had then a child about a year old whose cries often vexed the whole family, so I took a cold and threw it at the date tree. On approaching the tree, I marked two things—that the lumps of earth had covered several square yards of the ground to a height of eight or ten feet all round the tree, and that the tree was never tapped, so that it appeared like a giant among the often-tapped, indented, moribund date trees. What the consequences of my offering to the date tree were, I do not remember, but I told the thing to several of my friends ; and one of them informed me

of the existence of a similar tree about half a mile north of Naihati on the road leading from the Gauripur Mills to Majipara. Curiosity led me to pay a visit to that tree also and I found the same thing there too.

Ten years later, when I resolved to write on the subject of this curious worship, I thought it proper to pay visits to my old friends again. The new *kutcha* road from Naihati to Amdanga had been made, and the *asthan*, or seat of the deity, had fallen to the right and a few yards away from it. I had no difficulty in recognising the mound of earth. The old tree at the centre of the mound was dead, and its dried stump only occupied the old position, but by its side another tree had grown up to the height of the old one, and was enjoying the offerings of the passersby. On asking a rustic, whose house was situated in the next village, I learnt that, instead of lumps of earth, sweets are often offered,—sweets such as *sandes* and *batasa*,—and that the propitiation of the deity is followed, not only by the pacifying of the crying child, but also by other boons such as the birth of a child, the obtainment of a situation, success in litigation, etc. I asked him if any *mantras* were used with the offerings, and was answered in the negative. I also asked him whether there was any priest of the deity and received a similar answer. Then I asked him what becomes of the sweets that are offered, and he said, they are picked up by cowherd boys. The old man gradually became communicative, and told me of many miracles displayed by the presiding deity of the tree. He said that a neighbour of his once ventured to tap the old date tree (and he pointed out to me the mark of the tapping on its dry stump), but the man who ventured to commit such a sacrilege died in the course of month by vomitting blood. He also told me of a hooded serpent which often came to the tree and which is really the *Chandi*. Thus in the course of ten years I found there were great changes in this very simple worship. The offerings had improved, the sphere of usefulness of the deity had expanded, a myth had grown up, and it only remained for a priest to appear in order to raise the worship to the dignity of a cult. When I visited the other date tree, I found the same improvements there too.

Since my attention was directed to this form of newly growing tree worship, I have been informed of several other date trees in the same neighbourhood enjoying the same consideration and worship. There are two near the Kānchrāpārā station, one to its north-east on the *khal* which is an old bed of the Jamuna, at a place named Kāntāganj and the other to the south-west of the station and to the west of the locomotive workshops, near the Shāh-dighi, an old tank with huge banian trees, said to have excavated by Malik Sahib about two hundred years ago when he founded the old mosque at Bāg. There is a third tree near Mājipārā on the road which runs from the Gauripur mills to that village. There are a fourth at Chāndigarh on the Amdāngā (now very little used because of the construction of a *pucca* road from the Kānkinārā station to that village), and a sixth at Mandalpāra,

(District Handbooks, 1951, 24-Parganas by A. Mitra, p. xliii-xliv)

থানা ঃ জগদ্দল

[জগদ্দল থানার অন্তর্গত ভাটপাড়া মিউনিসিপালিটি এলাকায় ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রামে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ ও মেলা সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি নিয়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

ভাটপাড়া

চব্বিশ-পরগণা জেলার জগদ্দল থানার অন্তর্গত ভাটপাড়া কলিকাতা হইতে প্রায় ২২ মাইল দূরে ভাগীরথীর পূর্ব পারে অবস্থিত। পূর্ব রেলপথে কাঁকিনাড়া ও নৈহাটী এই উভয় স্টেশন হইতে অথবা কলিকাতা হইতে ব্যারাকপুর হইয়া মোটরবাসে এই স্থানে যাতায়াত করিতে পারা যায়। ভাটপাড়া 'ভট্টপল্লী' নামেও খ্যাত। ইহা চব্বিশ-পরগণা জেলার একটি প্রাচীন এবং শিক্ষা-সংস্কৃতিতে একটি বিশিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামরূপে পরিচিত। ভাটপাড়ার নামকরণ সম্পর্কে নানারূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। ভাট বামুন বা ভট্টাচার্যদিগের বসবাস হেতু ইহার ভট্টপল্লী নামকরণ হইয়াছে এইরূপ অনুমান অনেকেই অনুমোদন করেন না; বরং দেখা যায়, ভট্টাচার্যদিগের আগমনের বহু পূর্ব হইতে এই স্থান ভাটপাড়া নামেই পরিচিত ছিল। দুই শতাধিক বৎসর পূর্বে রচিত রেনেলের মানচিত্রে ভাটপাড়া নামের উল্লেখ আছে। ভট্টপল্লী হইতে ভাটপাড়া হয় নাই, ভাটপাড়া হইতেই ভট্টপল্লী হইয়াছে ইহাই অধিকাংশের মত।

ভাটপাড়া বর্তমানে আর পল্লী নহে। ১৯৪১ সনের জনগণনা অনুসারে এই স্থানে লক্ষাধিক জনসংখ্যা নির্ধারিত হওয়ায় উহা শহররূপে পরিগণিত হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই 'ভাটপাড়া মিউনিসিপালিটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পূর্বে ইহা নৈহাটী মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত ছিল। বর্তমানে ইহা মোট ২৫টি ওয়ার্ড লইয়া গঠিত। কাঁকিনাড়া জগদ্দল, ভাটপাড়া, সুন্দীয়া (Govt. Housing Estate), আত্তপুর, শ্যামনগর-মূলাজোড় প্রভৃতি অঞ্চল লইয়া মোট ৪'৭২ বর্গ মাইল এলাকা এই মিউনিসিপালিটির অন্তর্ভুক্ত। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে ভাটপাড়া মিউনিসিপালিটি অঞ্চলের জনসংখ্যা ১৪৭,৬৩০। এই স্থানে নদীয়া জুট মিল, ইন্‌চেক্ টায়ার কোম্পানী, রোলিং মিল, পেপার মিল প্রভৃতি অনেকগুলি ছোট-বড় কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঘোষপাড়া রোডে অবস্থিত ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর পাওয়ার হাউস হইতে কৃষ্ণনগর, বহরমপুর অবধি বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এই সকল কলকারখানায় নিযুক্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী এই অঞ্চলে বসবাস করিতেছেন। চাকুরী এবং ব্যবসায়ই এখানকার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা।

শহরের মধ্যে থানা, ডাকঘর, উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিত্য হাট-বাজার, সিনেমা, শ্মশানঘাট, যুবসঙ্ঘ ও কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে। ইহা ভিন্ন, মিউনিসিপাল এলাকার মধ্যে গঙ্গার তীরে নয়টি প্রাচীন বাঁধানো ঘাট আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গার তীরবর্তী ঐ সকল ঘাটে বহু নরনারী বেড়াইতে আসেন। ভাটপাড়ার নিকটবর্তী জগদ্দলে দুইটি শুষ্কপ্রায় পরিখা দৃষ্টে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য মোগলবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য এই স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন; অবশ্য দুর্গের কোন চিহ্ন আজ আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভাটপাড়ায় বর্তমানে প্রায় একশত কুড়ি ঘর পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের বসবাস আছে। ইহারা এই স্থানে প্রাচীন বাসিন্দারূপে পরিচিত। স্থানীয় ব্রাহ্মণ জমিদার পরমানন্দ হালদার আনুমানিক ১৬৬০-৭০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি কোন সময়ে নারায়ণ ঠাকুর নামে জনৈক সিদ্ধপুরুষকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া, ব্রহ্মত্রভূমি দিয়া এই স্থানে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। শোনা যায়, নারায়ণ ঠাকুর তাঁহার স্বগ্রাম পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলা হইতে কুম্ভক করিয়া প্রতিদিন নৈহাটীর ঘাটে গঙ্গা স্নান করিতে আসিতেন। নারায়ণ ঠাকুরই ভাটপাড়ার বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। ভাটপাড়া বাংলাদেশের সংস্কৃত চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে সুপরিচিত। সুদূর প্রাচীনকাল হইতেই এই স্থানের বিভিন্ন টোলে বহু ছাত্র ও

অধ্যাপক সংস্কৃত শিক্ষা ও অধ্যাপনা করিতেন। অদ্যাপি এই স্থানে মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'সংস্কৃত কলেজে' বহু বিদ্যার্থী সংস্কৃত চর্চা করিয়া থাকেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর ন্যায় ভাটপাড়ার পণ্ডিত সমাজের হিন্দুশাস্ত্রীয় মতামত আজও সমগ্র বাংলাদেশে সম্মানিত ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রাহ্য হইয়া থাকে। কেবলমাত্র অতীতকালেই নয় বর্তমানকালেও এই স্থানে বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং স্বনামধন্য মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়া ভাটপাড়ার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে ইহার বর্তমান অতীতের ন্যায়ই সমান গৌরবোজ্জল। অতীত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যেমন নিমাই তর্কপঞ্চানন, হলধর তর্কচূড়ামণি, তারাচরণ তর্করত্ন, হৃষীকেশ শাস্ত্রী, বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন, যদুনাথ সার্বভৌম, শিবচন্দ্র সার্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় প্রমথ নাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন প্রমুখ পণ্ডিতগণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, তেমনি বর্তমানে নারায়ণ চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, শিবপ্রসাদ কাব্যতীর্থ, ডক্টর জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য, ডক্টর ভবতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতগণের নামও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

ভাটপাড়ার বিভিন্ন পল্লীতে অনেকগুলি প্রাচীন শিব-মন্দির আছে। উহার মধ্যে ঠাকুরপাড়া রোডে দশটি, গোপীকৃষ্ণ রোডে দুইটি, কালাভাঙ্গা রোডে একটি এবং বাঁধাভাঙা রোডে দুইটি শিবমন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঠাকুরপাড়া রোডে পাঁচমন্দিরতলায় একত্রে মোট ছয়টি শিবমন্দিরের মধ্যে পূর্বমুখী বৃহৎ নবরত্ন মন্দিরটি পদ্মলোচন ভট্টাচার্য কর্তৃক ১৭৩৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮১২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার দক্ষিণ গাত্রের দরজায় উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায়। পূর্বে মন্দির গাত্র পোড়ামাটির শিল্পকার্য দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। এখনও ইহার স্থানে স্থানে পোড়ামাটির শিল্পকার্য দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন মন্দির দুইটি রামকান্ত সার্বভৌম ও তাঁহার স্ত্রীর দ্বারা ১৮০১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পঞ্চরত্ন মন্দিরটি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে শ্রীনারায়ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আমূল সংস্কার করিয়া পুনঃ নির্মাণ করেন। পুনর্নির্মাণকালে তিনি মন্দির গাত্রে যে দুইটি শিলালিপি স্থাপন করেন তাহা হইতে জানা যায় যে, আদিতে উক্ত মন্দিরটি তাঁহার পিতামহের প্রপিতামহের কণিষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্ত সার্বভৌম নির্মাণ করিয়াছিলেন। পশ্চিমমুখী নবরত্ন মন্দিরটি ভোলানাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৮১৯-২০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানা যায়।

এই চারিটি মন্দিরের উত্তরে আটচালা গঠনের পশ্চিম-মুখী জোড়া শিবমন্দির দুইটির মধ্যে একটির বর্তমান সেবায়েত শ্রীইন্দুভূষণ কাব্যতীর্থ মহাশয়। মন্দির দুইটি প্রাচীন এবং একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। উভয় মন্দিরই সংস্কার অভাবে জীর্ণ এবং মন্দির-দ্বয়ের গাত্রে সুন্দর পোড়ামাটির শিল্পকার্য দ্বারা অলঙ্কৃত। পাঁচমন্দিরতলার পশ্চিমে সামান্য কিছু দূরে পাশাপাশি দুইটি আটচালা মন্দির আছে। পূর্বে উভয় মন্দিরেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল; বর্তমানে উহার একটি মন্দিরে শীতলাপূজা হইতেছে। ইহার গাত্রে যে সংস্কৃত শ্লোকটি বাংলা ভাষায় উৎকীর্ণ আছে তাহা হইতে জানা যায় যে, 'দ্বগ্নাষ্টেন্দুশক জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায়াং'—১৮৩২ শকাব্দে, অর্থাৎ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌম কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়।

ইহা ভিন্ন, ঠাকুরপাড়া রোডে আরো দুইটি জোড়া শিবমন্দির আছে। উহার একটি পঞ্চরত্ন মন্দির এবং অপরটি নবরত্ন মন্দির। মন্দির দুইটি পশ্চিমমুখী এবং অতি জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও অদ্যাপি ইহাদের গাত্রে নানাস্থানে সুন্দর পোড়ামাটির কাজ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির দ্বারে উপরে স্থাপিত প্রতিষ্ঠা ফলকটি যে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। অবশ্য মন্দির দুইটি যে প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। মন্দিরদ্বয়ে নিত্য শিবপূজা হয়।

বাঁধাভাঙ্গাঘাটের নিকট অমরকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের উত্তরে গঙ্গার তীরে দক্ষিণমুখী পাশাপাশি যে দুইটি শিব-মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, উহা বানেশ্বর পঞ্চানন কর্তৃক ১৭৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত মন্দিরদ্বয়ের একটিতে ভগ্ন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, অপরটিতে বর্তমানে কোন মূর্তি নাই। মন্দির দুইটি অতি জীর্ণ ও পরিত্যক্ত। তবে উভয় মন্দির গাত্রে অলঙ্কৃত পোড়া-মাটির অপূর্ব সুন্দর বৃষবাহন শিব, শিবলিঙ্গ, হনুমান, কার্তিক-

গণেশ ও লক্ষ্মী-সরস্বতীসহ মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা, নৃত্যরতা নারী ও সূক্ষ্ম লতাপাতার শিল্পকর্ম বাস্তবিকই আকর্ষণীয়।

অন্যান্য মন্দিরাদির মধ্যে ভাটপাড়া পঞ্চাননতলা রোডে সাধারণের একটি প্রাচীন মন্দিরে পঞ্চানন ঠাকুরের নিত্য পূজা হয় এবং ঘোষপাড়া রোডে গঙ্গার তীরে একটি দ্বিতল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত জগৎতারিণী নামে খ্যাত দক্ষিণাকালীর নিত্য পূজা ও চৈত্র মাসে সাড়ম্বরে অন্নকূট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কালীমন্দিরটি অপ্রাচীন, গত দশ-বার বৎসর হইল নির্মিত হইয়াছে; তবে দেবীমূর্তিটি প্রাচীন।

ভাটপাড়ার উল্লেখযোগ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয় কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উপলক্ষে কাঁঠালপাড়ার ভরদ্বাজগোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবনরাম মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়ের কুলদেবতা রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এবং একমাসব্যাপী স্থায়ী হয়। পূর্বে মেলাটি কাঁঠালপাড়ার রাসখোলার মাঠে বসিত; কিন্তু বর্তমানে রাসখোলার মাঠে নদীয়া মিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গত ৪৫ বৎসর যাবত ভাটপাড়ার উত্তর প্রান্তে পূর্ব রেলপথ ও ঘোষপাড়া রোডের মধ্যস্থিত দীঘাকৃতি প্রায় দুই বিঘা জমির উপর বসিতেছে। ভাটপাড়া ও নৈহাটী পৌর এলাকা হইতে মেলায় প্রতিদিন প্রায় দশ সহস্র নরনারীর সমাগম হয় এবং চব্বিশ-পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং কলিকাতা ও নদীয়া জেলা হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। মেলায় প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে এবং কুড়ি-পঁচিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে জমির খাজনা বাবদ অর্থ আদায় করা হয়। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে মাদুর ও পাথরের তৈয়ারী জিনিসপত্র অধিক আমদানী হয়। ইহা ব্যতীত, বিভিন্ন প্রকার খাবার দ্রব্য, মনিহারী, তামা-পিতল ও লোহার বাসনপত্র, কাপড়চোপড়, কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং ধামা, কুলা, মাটির পুতুল, খেলনা, হাঁড়ি-কলসী ইত্যাদি আমদানী হইয়া থাকে।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও কয়েকটি ম্যাজিকের দল আসে এবং কেহ কেহ লটারী খেলিয়া থাকেন।

প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমার চারদিন পর স্থানীয় কাত্যায়ন গোত্রীয় ভট্টাচার্য পদবীধারী দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের কুলদেবতা রাধাকৃষ্ণের পঞ্চমদোল উৎসব উপলক্ষে বাঁধাভাঙ্গাঘাটের রাস্তার দুই ধারে খাবার মনিহারী, খেলনা-পুতুল, শিল্পসামগ্রী ইত্যাদির ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে জমির খাজনা আদায় করা হয়। মেলাটি প্রাচীন এবং মাত্র একদিন স্থায়ী হয়।

পূর্বে বাবুপাড়ায় নৈহাটীর জমিদার মুখোপাধ্যায়দিগের পরিচালিত জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে একটি মেলা বসিত। বর্তমানে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বটে, তবে বহুদিন হইল মেলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ভাটপাড়া মিউনিসিপালিটি এলাকার অন্তর্ভুক্ত আতপুরে গোপীমোহন ঘোষদিগের মন্দিরে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও তদুপলক্ষে ঘোষ মহাশয়দিগের প্রায় দশ বিঘা জমির উপর পক্ষকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলায় প্রতিদিন প্রায় পাচ হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, পুতুলনাচ ও সার্কাসের দল আসে। ইহা ভিন্ন, আতপুরে পঞ্চাননতলায় পঞ্চানন ঠাকুরের একটি মন্দির আছে।

জগদ্দলে বাগান রোডে ও ৮ নং বস্তিতে দুইটি শিব-মন্দির, ৭ নং বস্তি ও কাচারী রোডে দুইটি মহাবীরমন্দির, ইষ্ট ঘোষপাড়া রোডে সীতারামমন্দির এবং কাঁকিনাড়া পালঘাট রোডে ও ক্লার্করোডে দুইটি শিবমন্দির ও ইষ্ট ঘোষপাড়া রোডে একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে। উল্লিখিত মন্দিরাদিতে নিত্য পূজা ও বৎসরের বিভিন্ন সময়ে উৎসবাদি হইয়া থাকে।

হিন্দুদের দেবদেবী ব্যতীত, ভাটপাড়া মিউনিসিপালিটি এলাকার মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের ১৭টি মসজিদের মধ্যে ভাটপাড়ায় পাঁচটি, কাঁকিনাড়ায় আটটি এবং জগদ্দলে চারটি মসজিদ অবস্থিত। ভাটপাড়ার মাদরাল রোডের পাশে কারবালা নামক স্থানে প্রতি বৎসর মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কাঁকিনাড়া মাণিকপীর

রোডে মাণিকপীরের একটি দরগাহ, নূতনবাজারের নিকট শহীদবাবাপীরের দরগাহ এবং জগদ্দল কেবিন রোডে দেওয়ান শা ওয়ার্সী পীরের দরগাহ ও করিম শাহের মাজার শরীফ আছে।

মূলাজোড়

কলিকাতা হইতে প্রায় ১৯ মাইল দূরে শ্যামনগর রেল-স্টেশনের অতি সন্নিকটেই মূলাজোড় গ্রামটি অবস্থিত। ইহা জগদ্দল থানার ভাটপাড়া মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত। 'অন্নদামঙ্গল' প্রণেতা কবি ভরতচন্দ্র রায় গুণাকর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শেষ জীবন মূলাজোড়ে অতিবাহিত করেন বলিয়া জানা যায়। মূলাজোড়ের নিকটবর্তী রাহুতা গ্রামে সুসাহিত্যিক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থানের ব্রহ্মময়ী কালী বিশেষ জাগ্রত দেবী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। কালীমন্দিরটি ভাগীরথীর তীরে ফল ও ফুল গাছ দ্বারা শোভিত একটি উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরে প্রবেশ করিতে প্রথমে একটি প্রাচীর বেষ্টিত বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় আর একটি প্রাঙ্গণের মধ্যে দ্বাদশ শিবমন্দির সহ ব্রহ্মময়ী কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে প্রাঙ্গণে গঙ্গার তীরে একটি অষ্টকোনাকৃতি দ্বিতল নহবতখানা এবং পশ্চিমমুখী পাশাপাশি তিনটি শিবমন্দির আছে। উহার মধ্যস্থলের মন্দিরটি পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট এবং অন্য দুইটি সাধারণ মন্দির বিশেষ। মন্দিরগুলিতে যথাক্রমে আনন্দশঙ্কর, হরিশঙ্কর ও গোপীশঙ্কর নামে তিনটি বৃহৎ গৌরীপট্টভেদী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এক সারিতে ছয়টি শিবমন্দিরের পর ব্রহ্মময়ী কালীর সুবৃহৎ নবরত্নমন্দির এবং তাহার পর আরো ছয়টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত। উল্লিখিত সব কয়টি মন্দিরই পশ্চিমমুখী। দ্বাদশ শিবমন্দিরের প্রতিটিতেই বৃহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। উহার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের মন্দির দুইটি কেবল পঞ্চরত্ন গঠনের এবং অন্যান্য মন্দিরগুলি আটচালা গঠনে নির্মিত। মন্দিরের চারিপাশের সুউচ্চ রক্ লাল বেলে পাথরে নির্মিত; কেবল-মাত্র কালীমন্দিরের সন্মুখস্থ রকের কিয়দাংশ শ্বেত পাথর দ্বারা বাঁধানো। কালীমন্দিরের অভ্যন্তরে বেদীর উপর নানা স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা ও বস্ত্রপরিহিতা দেবী দক্ষিণাকালীর কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত প্রায় ৩ ফুট উচ্চ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির আরোহণের সিঁড়ির উভয় পার্শ্বে দুইটি আলোক স্তম্ভের দেওয়াল গাত্রে মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে দুইটি শিলা-ফলক স্থাপিত আছে। উহাতে উৎকীর্ণ লিপি দুইটি নিম্নরূপ :

(দক্ষিণ দিকের লিপি)

শাকেসত্যশিবাব্ধিশৈলশশিমে মোক্ষার্থিনী শ্রীমতা
গোপীমোহন শর্ম্মনা ত্রিপথগাতীরে স্বরাজ্যাস্পদে
প্রসাদে নবচূড়াকহত্রবিধিবৎ শ্রীকালিকাস্থাপিতা
নাম্নাব্রহ্মময়ী মঠস্থ পুরজিল্লিঙ্গৈর্দ্বিষ্টকৈ সমং।

(বামদিকের লিপি)

শাকেরন্ধ্র বিভাবসুক্ষিতিধরক্ষ্মামে পুন্যোদয়াৎ
গোপীমোহন শর্ম্মনাস্মসদনে যস্য প্রতিষ্ঠাকৃতা
সোহয়ং তত্তনয়ৈর্বিভাগ পরতস্তৎকীর্ত্তি সম্বন্ধকে
গোপীকান্ত ইহাস্ত কস্যাদিশি ভূভাগেশ্রিয়া স্থাপিতঃ।

এই আলোকস্তম্ভ দুইটির দেওয়াল গাত্রে দুইটি প্রায় ২½ ফুট দীর্ঘ কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত শিলায় খোদিত অতি সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি লাগান আছে। মন্দির সন্মুখস্থ নাটমন্দিরটির ছাদ আংশিক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর কর্তৃক ব্রহ্মময়ী কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শোনা যায় যে, গোপীমোহন ঠাকুরের ব্রহ্মময়ী নামে একটি কন্যা ছিল এবং ব্রহ্মময়ীর ৯ বৎসর বয়সকালে তিনি তাঁহার বিবাহের আয়োজন করেন। বিবাহের দিন প্রাতঃকালে কলিকাতার গঙ্গার ঘাটে এয়োস্ত্রীগণের সহিত গঙ্গাস্নানের সময় আকস্মিক ব্রহ্মময়ী জলে ডুবিয়া যায় এবং স্রোতের টানে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার শবদেহ মূলাজোড়ের ঘাটে আসিয়া লাগে। এইরূপ মর্মান্তিক দুর্ঘটনার আঘাতে গোপীমোহন ঠাকুর শোকে-দুঃখে কাতর হইয়া পড়িলে সেইদিন রাত্রেই কালীদেবী স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া জানান যে, তিনি স্বয়ং তাঁহার কন্যারূপে এতকাল ঠাকুর পরিবারে লালিত-পালিত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার জন্য শোক না করিয়া তিনি যেন মূলাজোড়ে মন্দির নির্মাণ করিয়া ব্রহ্মময়ী নামে কালী মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। স্বপ্নাদেশ অনুসারে গোপীমোহন

ঠাকুর ব্রহ্মময়ী কালীবাড়ী স্থাপন করিয়া রাজকীয় উপাচারে কন্যাজ্ঞানে ব্রহ্মময়ীর নিত্য ভোগ-পূজাদির আয়োজন করেন। বর্তমানে ঠাকুর পরিবারের আর্থিক অবনতির কারণে পূজা ও উৎসবে পূর্বের মত আর জাঁকজমক হয় না। নিত্য যথারীতি পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে শারদীয়া অষ্টমী তিথিতে, কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজায়, মাঘ মাসে রটন্তী চতুর্দশী তিথিতে, পৌষ মাসে এবং চৈত্র মাসের বাসন্তীপূজার দিন বিশেষ পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঠাকুর পরিবারের তরফ হইতে অদ্যাপি কার্তিক মাসে নয়টি, শারদীয়া অষ্টমী তিথিতে তিনটি এবং প্রতি মাসের অমাবস্যা তিথিতে একটি করিয়া পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। মাত্র সাত-আট বৎসর পূর্বেও কার্তিক মাসের কালীপূজা ও মাঘ মাসের রটন্তী কালীপূজা উপলক্ষে মহিষ বলি দেওয়া হইত বলিয়া জানা যায়। উল্লিখিত উৎসবগুলির মধ্যে পৌষ মাসে অনুষ্ঠিত উৎসবটি অদ্যাপি কিছু সমারোহের সহিত পালিত হয়। সারা পৌষ মাসব্যাপী উৎসব উপলক্ষে নানাস্থান হইতে বহু নরনারী মন্দিরে মানসিক পূজাদি দিতে আসেন। বিশেষ করিয়া পৌষ মাসের প্রতি শনি-মঙ্গলবার সর্বাধিক লোকসমাগম হইতে দেখা যায়। এই উৎসব উপলক্ষে সারা পৌষ মাসব্যাপী মন্দির প্রাঙ্গণে দেবোত্তর জমিতে এবং স্টেশনে যাতায়াতের রাস্তার দুইধারে বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রায় তিনশত দোকানপাট বসে। মেলায় দৈনিক গড়ে ছয়-সাত হাজার নরনারীর সমাগম হয়। আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক ও পুতুলনাচের দল আসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ চব্বিশ-পরগণা, নদীয়া ও কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট হইতে জমির খাজনা আদায় করা হয়।

ব্রহ্মময়ী কালীবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত উল্লিখিত শিবমন্দিরে নিত্য পূজা হয় এবং ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে নীলপূজা উপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মময়ী মন্দিরের পশ্চাতে চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত একটি পৃথক প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে সমতল ছাদ বিশিষ্ট একটি স্বতন্ত্র মন্দিরে গোপীনাথজীউ নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কৃষ্ণ মূর্তি কষ্টি পাথর নির্মিত এবং রাধিকা ধাতুময়ী। শোনা যায়, এই রাধাকৃষ্ণ মূর্তি পূর্বে ফরিদপুর জেলায় ঠাকুর পরিবারের জমিদারীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখান হইতে মূর্তিদ্বয় আনিয়া এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। গোপীনাথজীউর নিত্য পূজা এবং বৎসরের বিভিন্ন সময় বিষ্ণু পর্বাহে যাবতীয় উৎসব হইয়া থাকে।

ব্রহ্মময়ী কালীবাড়ী ও গোপীনাথজীউর মন্দিরের বর্তমান সেবায়েত শ্রীপ্রবীরেন্দ্র মোহন ঠাকুর। কালী ও অন্যান্য দেববিগ্রহাদির নিত্য পূজা ও ভোগরন্ধনের জন্য সাতজন বেতনভোগী ব্রাহ্মণ আছেন। প্রতিদিন জনৈক ব্রাহ্মণ কালীমন্দিরে চণ্ডীপাঠ করেন।

ব্রহ্মময়ী কালীমন্দির সংলগ্ন উত্তর দিকে একটি সংস্কৃত কলেজ, অতিথিশালা এবং দক্ষিণ দিকে গঙ্গার তীরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এই সকল জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি গোপীমোহন ঠাকুর কর্তৃক স্থাপিত। গঙ্গার তীরবর্তী ঠাকুর পরিবারের বিশাল কাচারী বাড়ীটি বর্তমানে ভগ্নদশা প্রাপ্ত।

মূলাজোড়ের নিকটবর্তী ঘোষপাড়া রোডে পাওয়ার হাউসের প্রাচীর সংলগ্ন একটি মন্দিরে সিদ্ধেশ্বরী কালী ও দ্বাদশ শিবমন্দির আছে। সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরটি বহু প্রাচীন।

মাদরাল

ভাটপাড়া মিউনিসিপাল এলাকার বহির্ভূত মাদরাল (মৌজা নং ২) গ্রামে প্রতিষ্ঠিত জয়চণ্ডী দেবী জাগ্রত ঈশ্বরী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। গ্রামটি ভাটপাড়া হইতে পূর্ব দিকে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত এবং কাঁকিনাড়া রেলস্টেশন হইতে এই স্থানে যাতায়াত সুবিধাজনক। মাদরাল গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে শোনা যায়, পশ্চিম দেশীয় মাদার আলী নামে জনৈক মুসলমানের নামানুসারে গ্রামের নাম মাদরাইল বা মাদরাল হইয়াছে। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে মাদরাল শহরাঞ্চলের অন্তর্গত। এইস্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সেটেল্‌মেন্ট রেকর্ডে ইহা 'মাদরাইল' নামে নথীভুক্ত করা হইয়াছে। গ্রামে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈশ্য প্রভৃতি জাতির বাস এবং ব্যানার্জিপাড়া,

মুখার্জিপাড়া, ঘোষালপাড়া, গোয়ালাপাড়া, বাগ্দীপাড়া, দুলেপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

মাদরাল গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরে জয়চণ্ডী দেবীর অষ্টধাতু নির্মিত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কতকাল আগে যে এই মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। জনশ্রুতি আছে, আদিতে জয়চণ্ডী ডাকাতদলের আরাধ্য দেবী ছিলেন এবং তাহারা নরবলি দিয়া জয়চণ্ডীর পূজা দিত। তখন এই অঞ্চল লোকবসতিশূন্য এবং গভীর বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল—লোকে বলিত জয়চণ্ডীর জঙ্গল। ভাটপাড়ার মধু ডাকাত, তেঁতুলের গৌরে বেদে, নৈহাটীর রঘু ডাকাত প্রভৃতি কুখ্যাত ডাকাত দলের আড্ডা ছিল এই জয়চণ্ডীর জঙ্গলে। তাহাদের দুঃসাহসিক অভিযান, নৃসংশতা এ অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে তৎকালে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিল। ডাকাত সর্দ্দার গৌরে বেদের লাঠিয়ালরূপে খ্যাতি ছিল; তাহা ছাড়া গৌরে বেদে রণপায়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তর অনায়াসে পার হইয়া যাইতে পারিত অতি দ্রুতগতিতে। গঙ্গার সহিত সংযুক্ত আজ মজিয়া যাওয়া ত্রিমোহানী খাল দিয়া এই সকল ডাকাতের দল রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া ছোট ছিপ্ নৌকার সাহায্যে ডাকাতি করিয়া ফিরিত জয়চণ্ডীর জঙ্গলে। তারপর ইংরাজ শাসনে দেশ সুরক্ষিত হইল, আশেপাশে জনবসতি গড়িয়া উঠিল, স্থাপিত হইল কলকারখানা। ক্রমেই মানুষের প্রয়োজনে একদিন জয়চণ্ডীর জঙ্গল পরিষ্কার হইয়া গেল, মাদরালেও লোকবসতি গড়িয়া উঠিল। ডাকাতদলের অনেকে বার্দ্ধক্যের কবলিত হইয়া মৃত্যুবরণ করিল, কেহ বা ধরা পড়িল, আবার কেহ কেহ ডাকাতি বৃত্তি ত্যাগ করিয়া কৃষক-মজুররূপে ঘর-সংসারী হইয়া বসিল। জয়চণ্ডীর জঙ্গল পরিত্যাগকালে ডাকাতেরা তাহাদের আরাধ্য দেবীকে চণ্ডীদীঘির জলে বিসর্জন দিয়া গেল—ইহাই জনশ্রুতি। ইহার পর বহুদিন দেবীর মন্দির পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন এক সময় স্থানীয় জগৎ চক্রবর্তী মহাশয় স্বপ্নাদেশ পাইয়া দীঘির জল হইতে উদ্ধার করিলেন জয়চণ্ডীর মূর্তি, পরিত্যক্ত ভগ্নপ্রায় মন্দির-টিকে সংস্কার করিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন জয়চণ্ডী দেবীকে, আয়োজন করিলেন নিত্য সেবা-পূজার। তদবধি নিত্য পূজা ও ফাল্গুন মাসে সপ্তমদোল উৎসব চলিয়া আসিতেছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভাটপাড়ার জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়গণ জয়চণ্ডীর মন্দির আমূল সংস্কার করাইয়া দেন।

প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমার ছয়দিন পর ঢাক-ঢোল বাজাইয়া সাড়ম্বরে জয়চণ্ডী দেবীর যথারীতি পূজা ও সপ্তম দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবের দিন আশে-পাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারী পাঁঠা বলি ও ষোড়শোপচারে পূজা দিতে মন্দিরে আসেন। সধবা স্ত্রীলোকেরা দেবীর নিকট উৎসর্গকৃত আবির ও সিঁদুর পরস্পরের সীমন্তের সিঁথিতে লেপন করিয়া দেন। আগে সমাগত নরনারী মন্দির প্রাঙ্গণে আবির খেলিতেন, সপ্তমী তিথির সন্ধ্যায় স্ত্রীলোকেরা মাটির সরায় করিয়া চণ্ডীদীঘির জলে প্রদীপ ভাসাইয়া দিতেন। উৎসব উপলক্ষে বীরভূম ও নদীয়া জেলা হইতে একতারা হাতে আসিতেন আউল-বাউল-কর্তাভজার দল, চব্বিশ-পরগণা জেলার নানাস্থান হইতে আসিতেন পীর-ফকির-দরবেশ। এখন আর উৎসবের তেমন জাঁকজমক নাই; যদিও আগের তুলনায় উৎসবে এখন লোকসমাগম হয় অনেক বেশী। উৎসবটি সর্বজনীন।

জয়চণ্ডীর সপ্তম দোল উপলক্ষে উৎসব প্রাঙ্গণের মাঠে প্রায় দশ বিঘা জমিতে সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে; আগে মেলা বসিত মাত্র একদিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং মাদরাল, নারায়ণপুর, শিবদাসপুর, রাহুতা, ভাটপাড়া, নৈহাটী, শ্যামনগর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় দশ-বার হাজার যাত্রী আসেন। বিক্রেতারা আসেন কাঁকিনাড়া, নৈহাটী, কাঁচরাপাড়া, বারাসত, বসিরহাট প্রভৃতি অঞ্চল হইতে। মেলায় প্রায় দেড়শত দোকানপাট বসে এবং কুড়ি-পঁচিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতা-দের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য, মনিহারী, তামা, পিতল ও লোহার বাসনপত্র, কাপড়চোপড়, টোটকা ঔষধপত্র, বই-ছবি, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, কাঠের, বাঁশের ও বেঁতের তৈয়ারী শিল্পসামগ্রী এবং মাটির হাঁড়ি, কলসী, পুতুল ইত্যাদি মেলায় আমদানী হইয়া থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পূর্বে এই মেলায় বহু টাকার ডাব কেনাবেচা হইত।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং কবিগান, জলসা, থিয়েটার বা চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

ইহাভিন্ন, মাদরাল গ্রামে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা, লক্ষ্মী-পূজা, কালীপূজা, দোল উৎসব, শীতলাপূজা ও অষ্টম প্রহর-ব্যাপী নাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোলযাত্রা উপলক্ষে স্থানীয় বিদ্যালয়ের নিকট দোলতলায় বৈকালের দিকে একটি ছোট মেলা বসে। গ্রামে চণ্ডী দেবীর মন্দির ভিন্ন, একটি কালীমন্দির, একটি শীতলামন্দির, গাজনতলা এবং স্থানীয় পার্ক সংলগ্ন একটি দ্বিতল মন্দিরে শিব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবমন্দিরের পাশেই ঝিলের ধারে কাষ্ঠ নির্মিত একটি প্রাচীন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

জগদ্দল থানার অন্তর্গত গড় শ্যামনগরে (মৌজা নং ১৯) একটি শীতলামন্দিরে শীতলা দেবীর নিত্য পূজা ও বৈশাখী সংক্রান্তিতে উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

কাউগাছি (মৌজা নং ২০) গ্রামে একটি কালীমন্দির আছে। জনৈক মহিলা ইঁহার সেবায়েত। তাঁহার উপর দেবীর ভর হয় এবং ভরপ্রাপ্ত অবস্থায় নানা প্রকার অসুখ-বিসুখের জন্য দৈব ঔষধের বিধান দিয়া থাকেন।

বাসুদেবপুর (মৌজা নং ২৩) গ্রামে একটি মন্দিরে কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবীর নিত্য পূজা হয়।

(ভাটপাড়ার অন্তর্গত মন্দিরাদি সম্পর্কে সুবৃদ্ধ ডাঃ ভবতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের উল্লেখযোগ্য সাহায্য আলোচিত প্রবন্ধের ভাটপাড়া প্রসঙ্গে নানা স্থানে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং বন্ধুবর শ্রীদীপঙ্কর সেন তথ্যানুসন্ধানের কাজে সাহায্য করিয়াছেন।)



থানা ঃ নওপাড়া

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক নবাবগঞ্জে অনুষ্ঠিত গোপীনাথজীউর ঝুলনযাত্রা উৎসব সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

চব্বিশ-পরগণা জেলার নওপাড়া থানার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ বর্তমানে নর্থ ব্যারাকপুর মিউনিসিপাল শহরের একটি অংশ বিশেষ। ইহা ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত; ব্যারাকপুর রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে বাদামতলায় নামিয়া সেখান হইতে পশ্চিম দিকে প্রায় আধ মাইল সাইকেল রিক্সায় অথবা ফলতা রেলস্টেশন হইতে এই স্থানে যাতায়াত করা যায়।

নবাবগঞ্জে শ্রীধর-বংশীধর রোডের উপর পাশাপাশি দুইটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে। উহার একটি গোপীনাথ-জীউর মন্দির এবং দ্বিতীয়টি রাধাগোবিন্দজীউর মন্দির নামে খ্যাত। গোপীনাথজীউর মন্দিরটি বাংলা ১২৫৭ সনের ২৭শে আষাঢ় স্থানীয় শ্রীধর ও বংশীধর মণ্ডল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সম্মুখে থামযুক্ত দরদালানসহ পূর্বমুখী সমতল ছাদ্ বিশিষ্ট একটি ঘরের মধ্যস্থলে একটি কাষ্ঠ মঞ্চের উপর গোপীনাথজীউ নামে পরিচিত রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কৃষ্ণ মূর্তি কষ্টি পাথর দ্বারা এবং রাধিকা মূর্তি অষ্টধাতু দ্বারা নির্মিত। উভয় মূর্তিই নানা স্বর্ণালঙ্কারে শোভিত। কৃষ্ণের হস্তে মোহন বংশী এবং ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। মন্দিরাভ্যন্তরের এবং উহার সম্মুখস্থ বারান্দার মেঝে শ্বেত পাথর দ্বারা নির্মিত। মন্দির প্রকোষ্ঠের চারিদিক ভোগরন্ধনাদির জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি ঘর দ্বারা বেষ্টিত এবং মন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ সিমেণ্ট দ্বারা বাঁধানো।

রাধাগোবিন্দজীউর মন্দিরটি বাংলা ১৩২৭ সনের ১৫ই বৈশাখ শ্রীমতি দাশুমণি দাসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার স্বামী মহেন্দ্র সাহা মন্দিরটির নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন। রাধাগোবিন্দজীউর মন্দির ও মূর্তি উল্লিখিত গোপীনাথ-জীউর মন্দির ও মূর্তির হুবহু অনুরূপ। এই উভয় মন্দিরেই নিত্য ভোগ-পূজা ও বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বৈষ্ণবদিগের যাবতীয় উৎসব প্রতিপালিত হয়। ইহার মধ্যে শ্রাবণ পূর্ণিমায় ঝুলন উৎসবটি বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; যদিও আগের তুলনায় উৎসবের জাঁকজমক এখন খুবই কম। পূর্বে ঝুলন উৎসব উপলক্ষে গোপীনাথ-জীউকে কেন্দ্র করিয়া যে বিপুল সমারোহ হইত তাহা শুধু স্থানীয় লোকের মুখেই শোনা যায় না; মন্দির প্রবেশের দেওয়াল গাত্রে স্থাপিত একটি শিলালিপি হইতেও তাঁহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। উক্ত শিলালিপি হইতে জানা যায় ১৯০৬ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী ভারতের গভর্নর জেনারেল গিলবার্ট জন এলিয়ট ও তাঁহার পত্নী গোপীনাথ-জীউর মন্দির দর্শনে আসেন। উৎসব উপলক্ষে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহগুলিকে মন্দিরের বাহিরে দোলায় স্থাপন করিয়া শ্রাবণ মাসের একাদশী তিথি হইতে অষ্টমী তিথি পর্যন্ত সাড়ম্বরে যথারীতি পূজাদি হইয়া থাকে এবং প্রতিদিন বিগ্রহগুলিকে নানা স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা বিভিন্ন বেশে সজ্জিত করা হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে উৎসবের কয়দিন মৃন্ময় পুতুল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সাধারণ দর্শকের নিকট এই প্রদর্শনী খুবই আকর্ষণীয়। সাধারণতঃ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে ও বর্তমান সমাজের নানা ব্যঙ্গ চিত্র পুতুলগুলির মাধ্যমে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। উৎসবকালে প্রতিদিন বহু ভক্ত মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন ও পূজা দিতে আসেন। উভয় মন্দিরেই নিত্য সেবা-পূজার জন্য বেতন-ভোগী ব্রাহ্মণ পূজারী আছেন এবং প্রতিদিন মন্দিরে কীর্তনাদি গান হয়। দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে পূজা ও উৎসব পরিচালিত হয়।

ঝুলন উৎসব উপলক্ষে শ্রীধর-বংশীধর রোডের দুই পার্শ্বে একমাসব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলায় প্রথম দশ-বার দিন প্রত্যহ প্রায় আট-দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং প্রায় দেড়শত দোকানপাট বসে। যাত্রী ও বিক্রেতারা প্রধানতঃ ব্যারাকপুর, নৈহাটী, কাঁচড়াপাড়া, টিটাগড়, বারাসত প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে জমির খাজনা আদায় করা হয়। মেলায় বিভিন্ন প্রকার জিনিসপত্রের মধ্যে মনিহারী দ্রব্যাদির দোকানই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাভিন্ন, অনেকগুলি ছোলা-বাদাম ভাজার দোকান বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য

নাগরদোলা ও সার্কাসের দল আসে। মেলায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশবাহিনী বিশেষ সহযোগিতা করিয়া থাকেন।

নবাবগঞ্জে গঙ্গার তীরে একটি শ্যামসুন্দরমন্দির, শ্রীমতি দাশুমণি দাসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি কালী ও একটি শিব মন্দির, একটি বুড়োশিবের মন্দির এবং একটি প্রাচীন ষষ্ঠীতলা আছে। গঙ্গার তীরবর্তী মহেন্দ্র সাহার ঘাটে প্রতি বৎসর শারদীয়া বিজয়া দশমী তিথিতে এই অঞ্চলের বহু দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় এবং তদুপলক্ষে গঙ্গারতীরে বহু দর্শকের সমাগম হয়।



থানা ঃ টিটাগড়

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক টিটাগড়ে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

কলিকাতা হইতে মাত্র ১২ মাইল দূরে চব্বিশ-পরগণা জেলার টিটাগড় থানা অবস্থিত। পূর্ব রেলপথে এই স্থানে একটি রেলস্টেশন আছে এবং কলিকাতা হইতে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়া মোটরবাসে যাতায়াত করিতে পারা যায়। এই থানা এলাকার মধ্যে দুইটি মিউনিসিপালিটি আছে ; উহার একটি টিটাগড় মিউনিসিপালিটি অপরটি ব্যারাকপুর মিউনিসিপালিটি। টিটাগড় থানার মোট ১১.২ বর্গ মাইল আয়তনের মধ্যে ৩.৭ বর্গ মাইল এলাকা উল্লিখিত মিউনিসিপালিটিদ্বয়ের অন্তর্গত শহরাঞ্চলরূপে এবং পনেরটি মৌজা লইয়া অবশিষ্ট ৭.৫ বর্গ মাইল এলাকা গ্রামাঞ্চলরূপে পরিগণিত। এই স্থানে কয়েকটি বৃহৎ পাটকল ও কাগজের কল ব্যতীত অন্যান্য অনেকগুলি কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল কলকারখানায় কর্মরত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকজন বর্তমানে টিটাগড়ে বসবাস করিতেছেন। ১৯৬১ সনের জনগণনা অনুসারে এই থানার মোট জনসংখ্যা ১৫৪,০০৭। এই চলমান বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে আজ টিটাগড়ের আদি বাসিন্দাদের খুঁজিয়া বাহির করা খুবই কষ্টসাধ্য। যতদূর জানা যায়, স্টেশন রোডের নিকট বসবাসকারী সরকার (ইহারা প্রাচীন জমিদার বলিয়া পরিচিত), ঘোষপাড়ার ভট্টাচার্য পরিবার, চন্দন পুকুরের চট্টোপাধ্যায় পরিবার ও বাগচি পরিবার, স্থানীয় বাচস্পতি, মান্না, দাস প্রভৃতি পরিবারগণই টিটাগড়ের প্রাচীন বাসিন্দা ছিলেন।

টিটাগড়ের মন্দিরাদির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য দ্বাদশ শিবমন্দির সহ অন্নপূর্ণার মন্দির। ইহা রানী রাসমণির কন্যা এবং মথুরা মোহন বিশ্বাস মহাশয়ের স্ত্রী জগদম্বা দেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। গঙ্গার তীরবর্তী পার্ক রোডে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে দক্ষিণমুখী সুবিশাল একটি নবরত্ন মন্দিরে দেবী অন্নপূর্ণার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। পূর্বদিকের একটি সিংহ দরজা দিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা যায় এবং ইহার পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ সীমানা ঘিরিয়া পাকা ঘরগুলি একদা ভোগ-রন্ধন ও অতিথি-অভ্যাগতদিগের অবস্থানের উদ্দেশে নির্মিত হইলেও বর্তমানে উহাতে ভাড়াটিয়ারা বসবাস করিতেছেন। পশ্চিম সীমান্ত দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পাশাপাশি ছয়টি আটচালা গঠনের সুউচ্চ শিবমন্দিরের প্রত্যেকটিতেই প্রায় তিন ফুট উচ্চ গৌরীপট্টভেদকারী কৃষ্ণ প্রস্তরের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত ছয়টি শিবমন্দিরের মধ্যস্থলে সংযুক্ত লৌহ ফটক হইতে ইষ্টক নির্মিত একটি রাস্তা সোজা গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত গিয়াছে। গঙ্গার ঘাটে উপরে ছাদ বিশিষ্ট চাদনী হইতে ইষ্টক নির্মিত প্রশস্ত সিঁড়িগুলি গঙ্গার গর্ভে নামিয়াছে। তবে বর্তমানে উক্ত চাঁদনীতে আশেপাশের কলকারখানার হিন্দুস্থানীরা স্থায়ী আশ্রয় গ্রহণ করায় এবং তাহাদের নির্লজ্জ আলাপ-আলোচনা ও কৌতুক দৃষ্টির সম্মুখে মহিলাদিগের স্বাচ্ছন্দ্যে স্নানাদি করা অস্বস্তিকর এবং বেশ দৃষ্টিকটুও লাগে।

অন্নপূর্ণার মন্দিরটি সুউচ্চ রকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং চারিদিকের ঘোরান রক্ ও মন্দিরাভ্যন্তরের মেঝে যথাক্রমে বেলে পাথর ও শ্বেত পাথর দ্বারা নির্মিত। মন্দিরে উঠিবার জন্য দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে সিঁড়ি আছে। মন্দিরের চারিদিকের দেওয়াল গাত্র চুনা-মাটির সুন্দর ফুলের নক্সা দ্বারা অলঙ্কৃত। মন্দিরের সহিত সংযুক্ত প্রশস্ত পাকা নাট মন্দিরটির মেঝে বালি পাথর দ্বারা বাঁধানো। মন্দির ও নাট মন্দিরের স্থানে স্থানে অযত্নের জন্য যে-সকল ক্ষত সৃষ্টি হইয়াছে এখনই উহার সংস্কার সাধিত না হইলে এই অপূর্ব গঠন সুবিশাল মন্দিরটি অদূর ভবিষ্যতে কালের গ্রাসে পতিত হইয়া জীর্ণ হইয়া পড়িবে।

মন্দিরাভ্যন্তরে শ্বেত পাথর নির্মিত বেদীর উপর একটি রৌপ্য নির্মিত মঞ্চের মধ্যস্থলে সিংহাসনের উপর এক পা মুড়িয়া ও এক পা ঝুলাইয়া অষ্টধাতু নির্মিত দেবী অন্নপূর্ণা উপবিষ্টা। দেবী বস্ত্র পরিহিতা ও অঙ্গে নানা স্বর্ণালঙ্কারে শোভিতা। ত্রিনয়নী, দ্বিভুজা দেবী অন্নপূর্ণার মূর্তিটির গঠনভঙ্গী বাস্তবিকই অতি সুন্দর ও নয়নমুগ্ধকর। দেবীর বাম হস্তে অন্নের পাত্র, দক্ষিণ হস্তে খন্তা। সম্মুখে ভিক্ষা প্রার্থী ত্রিশূল হস্তে রৌপ্যময় ভোলানাথ দণ্ডায়মান। ইহা-

ভিন্ন, মন্দিরে একটি পৃথক সিংহাসনে পাথরের গণেশ মূর্তি ও একটি ছোট শিবলিঙ্গ আছে।

অন্নপূর্ণার প্রত্যহ প্রাতঃকালে মঙ্গলারতি, মধ্যাহ্নে অন্নভোগ এবং সন্ধ্যায় আরতি ও দুধ-লুচি সহযোগে শীতল পূজা হয়। ইহা ছাড়া, প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের মহাষ্টমী তিথিতে এবং চৈত্র মাসে সাড়ম্বরে অন্নপূর্ণাপূজা হইয়া থাকে। মন্দিরের বর্তমান সেবায়েত শ্রীভবনাথ বিশ্বাস এবং বেতনভোগী পূজারী শিকেশব চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। ইঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দক্ষিণ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ এবং বংশানুক্রমে অন্নপূর্ণার নিত্য সেবা-পূজা করিতেছেন। পূজারী ব্রাহ্মণ ব্যতীত ভোগরন্ধনকারী ব্রাহ্মণ ও মন্দির মার্জনার জন্য দাসী নিযুক্ত আছে।

অন্নপূর্ণা মন্দির প্রাঙ্গণে অবস্থিত উল্লিখিত শিব-মন্দিরগুলিতে নিত্য পূজা হয় এবং ফাল্গুন মাসের শিবরাত্রি তিথিতে বিশেষ পূজা উপলক্ষে বহু নরনারী আসেন। বর্তমানে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শিবপূজা করেন।

পার্ক রোডে 'পোড়াশিবতলা' নামে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। এই স্থানে একটি গাছের নীচে রক্ষিত কয়েকটি পাথরখণ্ডকে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে নীলপূজার দিন শিব জ্ঞানে পূজা করা হয়। নীলপূজার দিন বহু স্ত্রীলোক পোড়াশিবতলায় পূজা ও নীলের বাতি দিয়া যান।

গঙ্গার তীরের একটি মন্দিরে পীতবর্ণা, ত্রিনয়নী ও চতুর্ভুজা দেবী বিশালাক্ষীর একটি প্রাচীন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরের নিকটেই গঙ্গাগর্ভে 'বিশালাক্ষী দহ'। বিশালাক্ষী বিশেষ জাগ্রতা ঈশ্বরী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। বিশেষ করিয়া এই অঞ্চলের মাঝিরা দেবীকে বিশেষ মান্য করিয়া থাকেন। বিশ্বাস দেবীর নিকট পূজা না দিলে নৌকাডুবি হয়। নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে সাড়ম্বরে বিশালাক্ষীর বার্ষিক পূজা হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে মন্দিরে বহু নরনারীর সমাগম হয়। ভক্তরা দেবীকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া পূজাদি দিয়া থাকেন।

টিটাগড় রেলস্টেশনের নিকটবর্তী আনন্দপুরীতে তারিণী কুমার ঘোষ মহাশয়দিগের প্রতিষ্ঠিত রামসীতার মন্দিরে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রামনবমী তিথিতে উৎসব ও তদুপলক্ষে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলায় প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং নানাবিধ জিনিসপত্রের শতাধিক দোকান বসে। মেলাটি ১৯২৩ সাল হইতে আরম্ভ হয়। ইহাভিন্ন, এই স্থানে হরিসভা রোডে গত দশ-বার বৎসর হইল একটি হরিসভা স্থাপিত হইয়াছে। হরিসভার একটি নাটমন্দিরে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, আষাঢ় মাসে রথ এবং নামকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বি, টি, রোডের ধারে স্থানীয় ষষ্ঠীতলায় অভিভূষণ দাস মহাশয়দিগের প্রবর্তিত রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে একটি মেলা বসে এবং ইঁহাদের বাটীতে প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে সাড়ম্বরে ঝুলনযাত্রা উৎসব হইয়া থাকে।

বি, টি, রোড ও কে, এন, মুখার্জি রোডের সংযোগস্থলে তালপুকুরের নিকট একটি শীতলামন্দির ও একটি কালী-মন্দির এবং বি, সি, চ্যাটার্জি রোডের ধারে একটি ঘরে প্রাচীন কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উল্লিখিত মন্দির-গুলিতে নিত্য পূজা হয়।

টিটাগড় বাচস্পতি পাড়ায় নবনির্মিত সীতারাম ওঙ্কারনাথ আশ্রমে প্রতিদিন ভক্তসমাবেশ, পূজা এবং বৎসরে একবার মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহাভিন্ন, গোবিন্দ চাটার্জী রোডে জনৈক পীরের একটি প্রাচীন মাজার আছে। বর্তমানে ইহার খাদেম শ্রীদাউদ আলী শা।

থানা ঃ খড়দহ

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক খড়দহ থানার অন্তর্গত পানিহাটি, খড়দহ, সোদপুর ও আগড়পাড়ার পূজা-পার্বণ ও মেলা সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

পানিহাটি

"পানিহাটি সম গ্রাম নাহি গঙ্গাতীরে।
বড় বড় সমাজ সব, পতাকা মন্দিরে॥"

পানিহাটি আর খড়দহ ভাগীরথীর তীরবর্তী পাশাপাশি দুইটি প্রাচীন গ্রাম। কিন্তু খড়দহ যখন বনজঙ্গলে আবৃত পানিহাটি তখন দেব-দেউলে পরিপূর্ণ রীতিমত একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম রূপে পরিচিত ছিল। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ব্যতীত ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে রচিত বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য ভাগবত'-এ এবং ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে রচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত'-এ পানিহাটি নামের উল্লেখ আছে। কথিত আছে রাঘব পণ্ডিতের বসবাসের বহু পূর্ব হইতেই ইহা একটি বাণিজ্য প্রধান স্থানরূপে পরিচিত ছিল। তখন ইহার নাম ছিল 'পণ্যহাটী' (Emporium for Merchandise), যাহা অপভ্রংশে পানিহাটি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। তবে জনসমাজে পানিহাটির খ্যাতি মূলতঃ রাঘব পণ্ডিতের জন্যই। শ্রীচৈতন্যদেবের দুই অন্তরঙ্গ পার্ষদ রাঘব পণ্ডিত আর নিত্যানন্দ। প্রথম জনের বাস পানিহাটিতে, দ্বিতীয় জনের বাস খড়দহে। তাই পানিহাটি রাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট ও খড়দহ নিত্যানন্দের শ্রীপাটরূপে বৈষ্ণব জগতে মর্যাদালাভ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া পানিহাটী শ্রীচৈতন্য-দেব ও শ্রীনিত্যানন্দের পদধূলি স্পর্শিত বলিয়া বৈষ্ণবদিগের নিকট অতি পবিত্র স্থান।

কলিকাতা হইতে প্রায় নয় মাইল উত্তরে পানিহাটি অবস্থিত এবং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়া মোটরবাসে এই স্থানে যাতায়াত করাই সুবিধাজনক। অন্যথায় পানিহাটি হইতে প্রায় এক মাইল পূর্বে সোদপুর রেলষ্টেশন হইতেও যাতায়াত করা যায়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত পানিহাটি সাউথ ব্যারাকপুর মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত ছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পানিহাটিতেই একটি স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে পানিহাটি শহররূপে পরিগণিত এবং এই স্থানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈষ্ণব, ধোপা, নাপিত, তেলি, কলু, কামার, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস আছে।

ভাগীরথীর তীরে পানিহাটি শ্রীপাটে রাঘব পণ্ডিতের সমাধি ব্যতীত তাঁহার সেবিত মদনমোহন বিগ্রহ, শ্রীচৈতন্য দেব ও শ্রীনিত্যানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ চিহ্ন রক্ষিত আছে। উল্লিখিত বিগ্রহাদির নিত্য পূজা হয়। রাঘব-মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য আবির্ভাব হয় বলিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। এইখানে প্রায় সাড়ে সাত শত বৎসরের প্রাচীন একটি বটবৃক্ষ আছে, যাহা অদ্যাপি শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া রাঘব-মন্দিরের অনেকখানি স্থান ছায়া সুশীতল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ পানিহাটি আসিয়া এই বৃক্ষ মূলেই উপবেশন করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। এই বটবৃক্ষটির মূল বেষ্টন করিয়া ইঁট দ্বারা বাঁধান বেদীর উপর স্থাপিত একটি স্মৃতিস্তম্ভের প্রস্তর ফলকে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দের আগমনের কথা লিখিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, বেদীতে উঠিবার সিঁড়ির উভয় পার্শ্বে স্থাপিত দুইটি প্রস্তর ফলকের একটিতে নিম্নলিখিত লিপি উৎকীর্ণ আছে ঃ "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ৯২১ (বঙ্গাব্দে) কার্তিক কৃষ্ণ দ্বাদশীতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ৯২৩ সালে এই বৃক্ষতলে শুভাগমন করেন।" শিলালিপির তারিখ ১।৭।১৩২১। অন্যটিতে লেখা "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্তৃক ১৪৩৮ শকে জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে এই স্থানে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কর্মদণ্ড মহোৎসব হয়।" এই বট-বৃক্ষের পশ্চিমে একটি অতি প্রাচীন ঘাটের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। গঙ্গার ভাঙ্গনেই ইহা এইরূপ দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে হয়ত একদিন গঙ্গাগর্ভে সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যাইবে। জানা যায়, হিন্দু রাজত্বকালে এই ঘাটটি নির্মিত। ১৪৩৬ শকাব্দে শারদীয়া বিজয়া দশমী তিথিতে নীলাচল হইতে শ্রীচৈতন্যদেব সপার্ষদ গৌড়

দেশ অভিমুখে যাত্রা করিয়া অষ্টাদশ দিবসে কার্তিকী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে পানিহাটি গ্রামে রাঘব-ভবন সংলগ্ন এই প্রাচীন ঘাটে আসিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের রাঘব-ভবনে আগমন সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যলীলা পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত বর্ণনা আছে।

সেই নৌকা চলি প্রভু আইলা পানিহাটা।

… … …

প্রভু আইলা বলি লোকের হৈল কোলাহল।
মনুষ্য ভরিল সব কিবা জল স্থল॥
রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লঞা গেলা।
পথে যাইতে লোক ভিড় কষ্ট সৃষ্টো আইলা॥
একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস।
প্রাতে কুমারহট্টে যাইলা যাহা শ্রীনিবাস॥

শ্রীচৈতন্যদেব যেদিন পানিহাটিতে পদার্পণ করেন সেইদিন ছিল রবিবার। বর্তমানে উক্ত তিথিতে যদি রবিবার না হয় তবে উহার পরবর্তী রবিবার এই স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন স্মরণ উপলক্ষে একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরম বৈষ্ণব রামদাস বাবাজী ও শ্রীঅমূল্য রায় মহাশয় কর্তৃক মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে উৎসবটি প্রবর্তিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে গত পঞ্চাশ বৎসর যাবত এই স্থানে একটি মেলাও বসিতেছে। মেলাটি মাত্র একদিনই স্থায়ী হয়।

শ্রীপাট পানিহাটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে। এইদিন শ্রীনিত্যানন্দ রাঘব পণ্ডিতের ভবনে সপ্তগ্রামের রাজপুত্র পরমবৈষ্ণব রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড বিধান করিয়া তাঁহার দ্বারা মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। তাই ইহা বৈষ্ণব জগতে 'দণ্ড মহোৎসব' নামে খ্যাত। সেই সুদূর অতীতকাল হইতে অদ্যাবধি এই স্থানে সাড়ম্বরে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং তদুপলক্ষে দেশ-বিদেশ হইতে বহু বৈষ্ণব ও ভক্তের সমাগম হইয়া থাকে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ একদা পানিহাটির মহোৎসবে আসিয়াছিলেন। অবশ্য গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বেও এই উৎসবে যে ধূমধাম হইত এখন আর তাহা দেখা যায় না। উৎসব উপলক্ষে যথারীতি পূজা ও নাম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় এবং পূজায় নিবেদিত দধি, চিড়া, মুড়কি সহযোগে মালসাভোগ সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। মহোৎসবের দিন রাঘব-মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটিও উৎসবের ন্যায় প্রাচীন এবং মাত্র একদিনই স্থায়ী হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে মেলায় বহু যাত্রীর এবং কলিকাতা, নৈহাটী, কাঁচড়াপাড়া, ব্যারাকপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বিক্রেতারা আসেন। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাভিন্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়-চোপড়, কৃষিযন্ত্রপাতি, শিল্পসামগ্রী, খেলনা-পুতুল, বই-ছবি ইত্যাদি আমদানী হয়। অনেক ফেরিওয়ালা মেলায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেচাকেনা করেন।

পানিহাটি রাঘব পণ্ডিতের বাসভবনে শ্রীনিত্যানন্দের সহিত রঘুনাথ দাসের মিলন এবং তদুপলক্ষে তথায় অনুষ্ঠিত দণ্ড মহোৎসবের যে বিস্তারিত বর্ণনা কৃষ্ণদাস গোস্বামী মহাশয় তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের অন্ত্যলীলা পরিচ্ছেদে রাখিয়া গিয়াছেন উহার উদ্ধৃতিটি একটু দীর্ঘ হইলেও প্রলোভনবশতঃ তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

পানীহাটি গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহু জন॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে।
বসিয়াছে প্রভু যেন সূর্যোদয় করে॥
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখি প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়িলা কত দূরে।
সেবক কহে রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে॥
শুনি প্রভু কহে চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোর করিব দণ্ডন॥

ভক্তের প্রতি দণ্ডাদেশ হইল—

দধি চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথ মনে॥
সেইক্ষণে নিজ লোক পাঠাইলা গ্রামে।
ভক্ষ দ্রব্য লোক সব গ্রামে হইতে আনে॥
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
সব দ্রব্য আনাইয়া চৌদিগে ধরিলা॥
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন।
আসিতে লাগিলা লোক অসংখ্য গণন॥

আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল।
শত দুই চারি হোলনা আনাইল॥
বড় বড় মৃত কুণ্ডিকা আনাইলা পাঁচসাতে।
এক বিপ্র প্রভু লাগি চিড়া ভিজায় তাতে॥
এক ঠাঞি তপ্ত দুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া।
অৰ্দ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া॥
অর্দ্ধেক ঘনাবৃত্ত দুগ্ধতে ছানিল।
চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল॥
ধুতি পরি প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা।
সাত কুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা॥
চবুতরা উপর যত প্রভুর নিজগণ।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী রচন॥

সেইদিনের সেই মহোৎসবে শুধু আপামর জনসাধারণই নহে যে-সকল বৈষ্ণব মহাজনেরা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদেরও তালিকা আছে—

রামদাস সুন্দরানন্দ দাস গদাধর।
মুরারি কমলাকর সদাশিব পুরন্দর॥
ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বর দাস।
মহেশ গৌরীদাস হোড় কৃষ্ণদাস॥
উদ্ধারণ আদি যত আর নিজ জন।
উপরে বসিলা সব কে করে গণন॥
শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা॥
দুই দুই মৃত কুণ্ডিকা সবার আগে দিল।
একে দুগ্ধ চিড়া আরে দধি চিড়া কৈল॥
আর যত লোক সব চৌতরা তলানে।
মণ্ডলী বন্ধানে বসিলা তার না হয় গণনে॥
একেক জনারে দুই দুই হোলনা দিল।
দধি চিড়া দুগ্ধ চিড়া দুইতে ভিজাইল॥
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া।
দুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া॥
তীরে স্থান না পাইয়া আর যত জন।
জলে নাম্বি দধি চিড়া করয়ে ভক্ষণ॥
কেহ উপরে কেহ তলে কেহ গঙ্গাতীরে।
বিশ জন তিন ঠাঞি পরিবেশন করে॥

হেনকালে আইলা তথা রাঘব পণ্ডিত।
হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত॥

এই স্মরণীয় চিড়া মহোৎসবে শ্রীনিত্যানন্দের ধ্যানে আহুত হইয়া নীলাচল হইতে শ্রীচৈতন্যদেব ভাব শরীরে পানিহাটিতে আসিয়াছিলেন—

সকল লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥

মহোৎসব উপলক্ষে সেইদিন পানিহাটিতে দোকান-পসারও বসিয়া গিয়াছিল—

মহোৎসব শুনি পসারি নানা গ্রাম হইতে।
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে॥
যত দ্রব্য লঞা আইসে সব মূল্যে লয়।
তারি দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায়॥
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন।
সেই চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ॥

মধ্যাহ্নে বিশ্রামের পর রাঘব-মন্দিরে কীর্তনের আয়োজন হইল—

প্রভু বিশ্রাম কৈল দিন অবশেষ হৈল।
রাঘব মন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল॥
ভক্তগণ সব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগত ভাসায়॥

পানিহাটিতে রাঘব-মন্দির ব্যতীত একটি ছায়া সুশীতল বটবৃক্ষের নীচে বৃন্দাবনের চৌষট্টি মহান্তের সমাজের অনুকরণে নির্মিত একটি স্মৃতি সমাধি মন্দির এবং কলিকাতা মহানির্বান মঠের প্রতিষ্ঠাতা অবধূত জ্ঞানানন্দ স্বামীর জন্মভিটার উপর 'কৈবল্য মঠ' নামে একটি মঠবাড়ী প্রতিষ্ঠিত আছে।

পানিহাটি রায়চৌধুরীদিগের গৃহে একদা সাড়ম্বরে রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। এই উৎসব সম্পর্কে তৎকালীন একটি সংবাদপত্রে ২৯শে কার্তিক, ১২৩৭ সনে যে সংবাদ পরিবেশিত হয় নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :

"এই রাসযাত্রা উৎসব ইতস্ততো হইয়া থাকে বিশেষতঃ পানিহাটিতে শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী স্বীয় ভবনে প্রতিবৎসরে অবিচ্ছেদে ঐ মহোৎসব করিয়া থাকেন এবং তাঁহার গঙ্গাতীরের রাস্তাতে কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় লোকদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ করেন এবং

চারি বৎসরাবধি আমি নিয়ত অতিথিরূপে সেইস্থানে গমন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া দেখিলাম যে তত্রস্থ তাবদ্বিষয় অতিমনোরঞ্জক যেহেতুক পূর্ব্বদিকস্থ কুঠরীতে নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত থাকে অতএব সেইস্থানে অনেক অনেক বিবি ও সাহেবলোকেরা গতমাত্রই সমাদৃত হন এবং সেই স্থান হইতে প্রস্থানকরণের পূর্ব্বে ঐ বাবু তাঁহারদিগের কিঞ্চিৎ ভোজনাদি করিতে বিনয় করেন। তদ্ভিন্ন নীচের তলাহইতে বহুবাদ্যকরকৃত অতিসুশ্রাব্য বাদ্যধ্বনি শ্রুত হওয়া যায় এবং এতদ্দেশীয় ইতর লোকদের সন্তোষার্থ বাঙ্গালা নাচ হইয়াছিল এইরূপে বাবু রায় চৌধুরী কি ইতর কি শিষ্ট কি ধনী কি দরিদ্র আপামর সাধারণ সকলকেই সমানরূপে সন্তুষ্ট করেন এবং যদ্যপি তাঁহার বাটী কলিকাতা ও বারাকপুর হইতে দূর না হইত অর্থাৎ অৰ্দ্ধ পথ মধ্যে তবে এইক্ষণে যত সাহেবলোকেরা তথায় উৎসব দর্শনার্থ গমন করেন এতদপেক্ষাও অধিক তাদৃশ লোকের সমাগম হইত। কিন্তু যদ্যাপি ও অল্প সাহেবলোকেরা তথায় উৎসব দর্শনার্থ গমন করেন তথাপি তাঁহারা সকলেই বাবু রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর মিষ্টালাপেতে আনন্দিত হন। ঐ বাবু বিংশ কি একবিংশ বর্ষবয়স্ক ও ইঙ্গরেজী বিদ্যা অভ্যাস করিতেছেন এবং তিনি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরদিগকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন।

প্রথম নাচ রবিবারের রাত্রিতে হওয়াতে কোন খৃষ্টীয়ান লোক সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন না এবং সোমবারেও নহে যেহেতুক অনবরত বৃষ্টিপাত হইয়াছিল কেবল শ্রুতহওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত রাজা দেবীকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন কিন্তু মঙ্গলবার রাত্রিতে বৃষ্টি রহিতহওয়াতে অনেক অনেক সাহেব ও বিবি সাহেবেরা কেহ বা একাকী কেহ বা আপনার পরিজন-সহিত তথায় উপস্থিত তন্মধ্যে তিন জন সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব ছিলেন এবং অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট বাবুলোকেরা উপস্থিত তন্মধ্যে অতিগুণাকর শ্রীযুতমহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং তদ্বান্ধব শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণসখা ঘোষ ও পরিচারক এক জন সর্ব্বাভ্যাহারে উপস্থিত ছিলেন ঐ মহারাজ তথায় অবস্থিতি-করণসময়ে তাবন্নিমন্ত্রিত মান্য লোকেরদের সহিত মিষ্টালাপ করিয়াছিলেন। কস্যচিজ্জবজনস্য।"

(সংবাদপত্রে সেকালের কথা)

সোদপুর

সোদপুর চব্বিশ-পরগণার পানিহাটি মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত শহররূপে পরিচিত। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় দশ মাইল। পূর্ব রেলপথে এই স্থানে একটি স্টেশন আছে। তাহা ছাড়া, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়া মোটরবাসেও যাতায়াত করিতে পারা যায়।

সোদপুর রেলস্টেশনের নিকট রুগ্ন ও বৃদ্ধ গবাদি পশুর চিকিৎসা ও পালনের জন্য 'পিঁজরাপোল' নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি 'কলিকাতা পিঁজরাপোল সোসাইটি' কর্তৃক ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। কলিকাতার ধনী মাড়োয়ারীগণের অর্থানুকূল্যে এই সমিতি পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে গোপাষ্টমী তিথিতে রেল লাইনের পাশে পিঁজরাপোল সোসাইটির জমির উপর একটি মেলা বসে। গো প্রদর্শনী ও গো সেবাই এই মেলার অন্যতম উদ্দেশ্য। কলিকাতা ও তাহার আশেপাশের অঞ্চল হইতে মেলায় প্রায় আট-দশ হাজার নরনারী আসেন। ইঁহাদের মধ্যে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের লোকজনই বেশী। এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন স্থান হইতে যে-সকল গরুবাছুর আসে যাত্রীরা তাহাদিগকে স্বহস্তে পুরী-মিঠাই, কচি ঘাস ইত্যাদি খাওয়াইয়া থাকেন। গোপাষ্টমীর মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি ইত্যাদির যাট-সত্তরটি দোকান বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে। মেলাটি মাত্র একদিনই স্থায়ী হয়।

সোদপুরে গোপাষ্টমী মেলা সম্পর্কে ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ সনের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

গোজাতির দ্বারা মানুষে যে উপকার পায় তাহার জন্য ভারতের হিন্দুরা উহাকে শুধু গোধন বলিয়া স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই 'গো-মাতা' বলিয়াও সমাদর দিয়াছে। বহু যুগ প্রচলিত গোপাষ্টমী মেলা গো জাতির প্রতি ঐ সমাদরের বহিপ্রকাশ।

এই বৎসর আগামী মঙ্গল ও বুধবার সোদপুরে কলিকাতা পিঁজরাপোল সমিতির উদ্যোগে গোপষ্টমী মেলা

উদ্‌যাপিত হইবে এবং ঐ উপলক্ষে গো-প্রদর্শনী, প্রজনন প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে। মঙ্গলবার বিকেল চারটায় সোদপুরে ঐ মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হইবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুর ঐ মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন। শ্রীজয়নারায়ণ ব্যাস, এম, পি, ঐ অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত থাকিবেন।

পরদিন বুধবার ঐ স্থানে যে গো-প্রদর্শনী হইবে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ তাহার বিচারক হইবেন। রাজ্যের পুনর্বাসন দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণ করিবেন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী দম্পতি অধ্যাপক জে, বি, এস, হালডেন ও শ্রীমতী হালডেন ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

রবিবার সোদপুরে ঐ সম্পর্কে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীবিশ্বনাথ লোহিয়া বলেন যে ঐ মেলা উপলক্ষে যাত্রীদের জন্য কলিকাতা হইতে ট্রেন ও বাসের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে। যাত্রিদের জন্য খাবার দোকান ইত্যাদি থাকিবে। মেলা ক্ষেত্রে যাত্রা, যাদু প্রদর্শনী, সার্কাস ও বিভিন্ন প্রকার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইবে বলিয়া তিনি জানান।

খড়দহ

"আগে পাণিহাটী আর আক্‌না মহেশ।
পুণ্যভূমি সপ্তগ্রাম ধন্য রাঢ় দেশ॥
আগরপাড়া কুমারহট্ট চৌহাটা।
খড়দা কোটাল তাম্বুলি পাথরঘাটা।॥"

(চৈতন্যমঙ্গল—বিজয়গুপ্ত)

চব্বিশ-পরগণা জেলার অন্তর্গত ভাগীরথীর তীরবর্তী খড়দহ একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। মহানগরী কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ১২ মাইল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বাস হেতু খড়দহ শ্রীপাটরূপে পরিচিত এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের অন্যতম তীর্থস্থান। পূর্বে ইহা সাউথ ব্যারাকপুর মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত ছিল। বর্তমানে খড়দহের নামেই একটি মিউনিসিপালিটি আছে এবং উহা একটি শহররূপে পরিগণিত। পূর্ব রেলপথে এই স্থানেই একটি স্টেশন আছে। কলিকাতা হইতে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়া সরাসরি মোটরবাসে যাতায়াত করিতে পারা যায়।

খড়দহের প্রাচীন বাসিন্দাদের মধ্যে গোস্বামীগণই প্রধান। স্থানীয় শিরোমণি, ভট্টাচার্য, ঘোষ, বোস, বিশ্বাস, শিকদার প্রভৃতি পরিবারগুলি প্রাচীন বাসিন্দাদের মধ্যে অন্যতম। তাহা ছাড়া, খড়দহে মাহিষ্য, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ছুতার, নাপিত, মোদক, কামার, কুমার, ধোপা, ডোম, মুসলমান প্রভৃতি জাতির বাস আছে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে নিত্যানন্দ প্রভু খড়দহে আসিয়া বসবাস স্থাপন করিলে পর খড়দহের সমৃদ্ধির ইতিহাস শুরু হয়। তাঁহার বসবাসহেতুই এই স্থান বৈষ্ণব জগতে শ্রীপাটরূপে খ্যাতি লাভ করে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত পাঠে জানা যায় নিত্যানন্দ প্রভুর আগমন-কালে ভাগীরথীর তীরবর্তী খড়দহ হিংস্র জীবজন্তু পরিপূর্ণ জঙ্গলাবৃত একটি সামান্য স্থান ছিল মাত্র। শ্রীচৈতন্য-দেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আট বৎসর পূর্বে বীরভূম জেলার একচক্র গ্রামে ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মুকুন্দ ওঝা, মাতা পদ্মাবতী। ইঁহাদের কৌলিক পদবী বটব্যাল। শ্রীনিত্যানন্দ মাত্র বার বৎসর বয়সকালে জনৈক সাধুর সহিত অবধূত বেশে তীর্থ পর্যটন হেতু গৃহত্যাগ করেন এবং বিশ বৎসরব্যাপী সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি তীর্থস্থান পর্যটন করিয়া বত্রিশ বৎসর বয়সে মথুরায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর তিনি নবদ্বীপে আসিয়া নন্দন আচার্যের গৃহে অবস্থান করেন। এই সময় তাঁহার সহিত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মিলন হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে ভারতবর্ষে ধর্মের গ্লানি সমুপস্থিত। যবনাধিকার প্রযুক্ত ভারতবাসী যবনানুকরণে অনুরক্ত। আচার সর্বস্ব হিন্দুধর্মের কঠিন অনুশাসনে সমাজ জীবন মৃতপ্রায়। এই ধর্ম-সংকটকালে জীবের উদ্ধারের জন্য শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। এই কার্যে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান সহায়ক ছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই আচণ্ডাল জন-সাধারণের মধ্যে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমধর্ম প্রচার করিয়া

'অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়' গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম প্রধান সংগঠক ও প্রচারকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ পূজার প্রবর্তন করেন। ভক্তদের বিশ্বাস বৃন্দাবন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ বলরামই, নবদ্বীপলীলায় শ্রীচৈতন্য-দেবের পার্ষদ নিত্যানন্দরূপে প্রকট হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য ইচ্ছাশক্তিময়, শ্রীনিত্যানন্দ ক্রিয়াশক্তিপর। উভয় মিলিয়া নিতাই-গৌর বিগ্রহ।

প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ শালিগ্রাম নিবাসী সারখেল উপাধিধারী সূর্যদাস পণ্ডিতের কন্যা বসুধা ও জাহ্নবা নামে উভয় ভগ্নীদ্বয়কে বিবাহ করেন। কথিত আছে সূর্যদাস প্রথমে নিত্যানন্দের নিকট কন্যাদানে অসম্মত হন। কিন্তু হঠাৎ বসুধার সর্পদংশনে (বৃন্দাবন দাসের মতে অপস্মার রোগে) মৃত্যু হইলে সূর্যদাস 'জীয়াইলে কন্যা দিব করিলাম পণ' এবং অলৌকিক শক্তির প্রভাবে 'আমি নিত্যানন্দ তাঁরে দিলা প্রাণ দান'। এইরূপে নিত্যানন্দের সহিত বসুধার বিবাহ সম্পন্ন হয়। নিত্যানন্দ কর্তৃক জাহ্নবা দেবীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার পিছনেও একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এই বিবাহ কার্যে পরম বৈষ্ণব উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর বিশেষ সহায়তা করেন এবং বড়গাছি রাজবাড়ীর কুমার কৃষ্ণদাস বিবাহের সকল ব্যয়ভার বহন করেন বলিয়া জানা যায়।

গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ কিছুদিন সস্ত্রীক নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও সপ্তগ্রামে বসবাস করিয়া আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে খড়দহে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন। কিংবদন্তী আছে এই স্থানে বাসস্থানের জন্য স্থানীয় ভূস্বামীর নিকট একখণ্ড জমি প্রার্থনা করিলে তিনি বিদ্রূপ করিয়া গঙ্গায় একটি খড় ফেলিয়া দিয়া ঐ স্থানে তাঁহার বাসস্থান নির্মাণ করিতে বলেন। নিত্যানন্দের প্রভাবে সত্যসত্যই গঙ্গাগর্ভে একটি চর উত্থিত হইল এবং তিনি সেই স্থানে গৃহ নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। এই কিংবদন্তী অনুসারেই নাকি গ্রামের নাম খড়দহ হইয়াছে। বসুধার গর্ভে বীরভদ্র (ওরফে বীরচন্দ্র) ও গঙ্গাদেবী নামে নিত্যানন্দের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে আটষট্টি বৎসর বয়সে "আশ্বিন মাসেতে যোগ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি, নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠ চলিলা ছাড়ি ক্ষিতি"। নিত্যানন্দের বংশধরগণই খড়দহের গোস্বামী বংশ নামে পরিচিত। বাংলা দেশের নানাস্থানে ইঁহাদের বহু শিষ্য-প্রশিষ্য আছেন। শ্রীনিত্যানন্দের বাস্তুভিটা বর্তমানে 'কুঞ্জবাটী' নামে খ্যাত।

পিতার ন্যায় বীরভদ্রও বৈষ্ণব ধর্মের একজন সুযোগ্য প্রচারক ছিলেন। তিনিই বাংলা দেশের নেড়া-নেড়ি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। কথিত আছে তিনি একদিনে বার শত নেড়া-নেড়িকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। বীরভদ্র শ্রীযদুনন্দনাচার্যের জ্যেষ্ঠা শ্রীমতি ও কনিষ্ঠা নারায়ণী নামে দুই কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করেন। নারায়ণীর গর্ভে রামচন্দ্র নামে এক পুত্র তিনটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

শোনা যায়, নিত্যানন্দের তিরোধানের পর বীরভদ্র খড়দহের প্রখ্যাত শ্যামসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু একচক্র গ্রাম হইতে আনিত তাঁহাদের কুলবিগ্রহ বঙ্কিমদেব, ত্রিপুরাসুন্দরী ও অনন্তদেব শিলার নিত্য সেবা-পূজা করিতেন। অদ্যাপি শ্যামসুন্দরের মন্দিরে ত্রিপুরাসুন্দরী ও অনন্তদেব শিলার পূজা হইতেছে। বঙ্কিমদেব নোতাগ্রামে প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্যামসুন্দর বিগ্রহ নির্মাণ সম্পর্কে একটি সুন্দর কিংবদন্তী আছে। (এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' ২য় খণ্ডে ৬১২ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।) সংক্ষেপে তাহা এইরূপ যে, রুদ্ররাম গৌড়ের বাদশাহের নিকট হইতে একটি প্রস্তর আনিয়া শ্যামসুন্দর রাধাবল্লভ ও নন্দদুলাল নামে তিনটি বিগ্রহ নির্মাণ করান। এই বিগ্রহ তিনটির মধ্যে শ্যামসুন্দর বিগ্রহের প্রতি বীরভদ্রের বিশেষ আকর্ষণ ছিল, কিন্তু রুদ্ররাম তাঁহাকে এই বিগ্রহ দান করিতে সম্মত হন নাই। অতঃপর একদিন রুদ্ররাম যখন স্বীয় ভবনে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিলেন এমন সময় হঠাৎ প্রবল মেঘ আসিয়া আকাশ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল এবং শ্রাদ্ধ পণ্ড হইবার উপক্রম হইল। নিমন্ত্রিত হইয়া সেই শ্রাদ্ধবাসরে বীরভদ্রও উপস্থিত ছিলেন। রুদ্ররামের সমূহ বিপদ দেখিয়া তিনি অলৌকিক শক্তির প্রভাবে প্রবল বারি বর্ষণ হইতে শ্রাদ্ধমণ্ডপ রক্ষা করেন। ইহাতে প্রীত হইয়া রুদ্ররাম বীরভদ্রকে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ দান করেন।

মতান্তরে কেহ বলেন বীরভদ্র স্বয়ং গৌড়ের বাদশাহের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে বাদশাহকে মুগ্ধ করিয়া শ্যামসুন্দর বিগ্রহ নির্মাণের জন্য শিলা সংগ্রহ করিয়া আনেন।

বীরভদ্র শ্যামসুন্দরের মূর্তি আনিয়া প্রথমে খড়দহের কুঞ্জবাটীতে স্থাপন করেন এবং পরে নিজে একটি সাধারণ মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে শ্যামসুন্দর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা-পাঠ আরম্ভ করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ঐ মন্দির জীর্ণ হইয়া পড়িলে বর্তমান শ্যামসুন্দর মন্দিরটি নির্মিত হয়। এই নূতন মন্দির খড়দহের কিশোর পরিবারের কুলবধূ পট্টেশ্বরী মাতা গোস্বামিনী কর্তৃক নির্মিত বলিয়া শোনা যায়। কথিত আছে, একদা তাঁহার স্বামী রাজ আদেশে ধৃত হইয়া রাজধানীতে প্রেরিত হন। তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য পট্টেশ্বরী দেবী তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্য-গণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করেন; কিন্তু এদিকে তাঁহার স্বামী প্রমাণ অভাবে মুক্তি পাইয়া খড়দহে ফিরিয়া আসিলেন। তখন পট্টেশ্বরীদেবী তাঁহার সংগৃহীত অর্থের দ্বারা শ্যামসুন্দরের মন্দির নির্মাণ করান। ইংরাজী ১৯৬৭ সালে 'বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাষ্ট' কর্তৃক এই মন্দিরটি পুনঃ সংস্কার করা হয়।

বর্তমানে একটি পূর্বমুখী সুবৃহৎ আটচালা মন্দিরের অভ্যন্তরে বেদীর উপর রৌপ্য নির্মিত মঞ্চে শ্যামসুন্দর নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। কৃষ্ণ কষ্টি পাথর এবং রাধিকা অষ্টধাতু দ্বারা নির্মিত। মন্দির ঘরের মেঝে সিমেণ্ট দ্বারা এবং বাহিরের সম্মুখস্থ দরদালানের মেঝে প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। মন্দিরের সম্মুখে একটি প্রশস্ত পাকা নাট মন্দির আছে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে শ্যামসুন্দর-জীউর মঙ্গলারতি, স্নানাভিষেক, বেশ পরিবর্তন, বাল্যভোগ ও মধ্যাহ্নে অন্নভোগের পর বেলা ১২½ ঘটিকায় মন্দিরের দ্বার বন্ধ হয় এবং পুনরায় ৪½ ঘটিকায় মন্দিরের দ্বার খুলিয়া গাত্রোত্থান, সেবা, সন্ধ্যারতি ও শীতল ভোগের পর রাত্রি ৯½ ঘটিকায় মন্দিরের দ্বার বন্ধ করা হয়। প্রতিদিন নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যা মন্দিরে কীর্তনগানাদি অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে শ্যামসুন্দরজীউর নিকট প্রতিদিন মধ্যাহ্নে সাড়ে বাইশ সের চাউল দ্বারা প্রস্তুত অন্নভোগ দেওয়া হইত, পরে সওয়া এগার সের এবং বর্তমানে মাত্র পাঁচ সের চাউলের অন্নভোগ দেওয়া হয়। নিত্যানন্দ বংশের বিভিন্ন শরিক পালা ক্রমে শ্যামসুন্দরজীউর সেবা-পূজা পরিচালনা করেন। বর্তমানে একটি ট্রাষ্টী কর্তৃক মন্দিরের আয়-ব্যয় নির্বাহিত হয়। মন্দিরে শ্রীনিত্যানন্দ সেবিত অনন্তদেব শালগ্রাম শিলা, ত্রিপুরাসুন্দরী, নীলকণ্ঠ মহাদেব ব্যতীত নীলাচলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের দণ্ড ভঙ্গের একটি খণ্ড, শ্রীনিত্যানন্দের স্বহস্তে লিখিত পুঁথি (ভাগবত) রক্ষিত আছে।

খড়দহে শ্যামসুন্দরের মন্দির ব্যতীত আরো অনেকগুলি মন্দির আছে। যেমন, গোপীনাথমন্দির, মদনমোহনমন্দির, রাধাবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির, মহাপ্রভুমন্দির, রাধাকান্তমন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণমন্দির, কুঞ্জবাটী, বড়ালদের অন্নপূর্ণামন্দির, বিশ্বাসদের ছাব্বিশ শিবমন্দির, রাসখোলায় বালকনাথ শিবমন্দির, খড়দহ থানার নিকট পঞ্চাননের একটি ছোট মন্দির, পুরাতন বাজারের নিকট প্রাচীন শীতলামন্দির, পুরাতন বাজার পোলের নিকট সত্যপীরের দরগাহ, গোস্বামীপাড়ায় বাবাঠাকুরের স্থান এবং রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ প্রভৃতি। উল্লিখিত মন্দিরাদির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অন্নপূর্ণা মন্দির

খড়দহের দোলমঞ্চপাড়ায় স্থানীয় লাহাদের বাড়ীতে সমতল ছাদ্ বিশিষ্ট একটি পৃথক মন্দিরে শ্বেত পাথরের বেদীর উপর নানা স্বর্ণালঙ্কারে শোভিতা অষ্টধাতু নির্মিত অন্নপূর্ণা মূর্তি এবং সম্মুখে ত্রিশূল হস্তে দণ্ডায়মান মহাদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দ্বারিক নাথ লাহা ও বাদলমণি দাসী কর্তৃক অন্নপূর্ণা বিগ্রহ স্থাপিত। মন্দিরাভ্যন্তরে পৃথক একটি মঞ্চে দারুময় গৌর-নিতাই বিগ্রহ এবং শ্বেত পাথরের একটি গণেশ মূর্তি ও নারায়ণ শিলা আছে। উল্লিখিত বিগ্রহাদির অন্নভোগ দ্বারা নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর শারদীয়া অষ্টমী তিথিতে এবং চৈত্র মাসে সাড়ম্বরে অন্নপূর্ণা পূজা হয়। ইহা ছাড়া, কার্তিক পূর্ণিমায় রাসোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মন্দিরে বেতনভোগী ব্রাহ্মণ পূজারী আছেন। বর্তমানে লাহাদের দৌহিত্র বড়ালরা দেবীর সেবায়েত।

কুঞ্জবাটী

ইহা নিত্যানন্দ প্রভুর বসতবাটি বলিয়া কথিত। এই স্থানে পূর্বমুখী একটি ঘরে শ্রীনিত্যানন্দের মৃন্ময় মূর্তি এবং

গৃহ প্রাঙ্গণে তাঁহার পত্নী বসুধা ও জাহ্নবার সমাধি স্থান আছে। এই কুঞ্জবাটীতে বীরভদ্র ও গঙ্গামণি ভূমিষ্ঠ হন। প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কুঞ্জবাটীতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে নামযজ্ঞ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কুঞ্জবাটীর প্রবেশ দ্বারের দেওয়াল গাত্রে স্থাপিত একটি প্রস্তর ফলক হইতে জানা যায়, ইংরাজী ১৯৪২ সনে খড়দহ কোম্পানীর এ, রাইট এবং জে, স্কট কর্তৃক কুঞ্জবাটী পুনর্গঠিত হয়। আদিতে এই কুঞ্জবাটীতেই শ্যামসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

গোপীনাথজীউর মন্দির

শ্যামসুন্দরজীউর মন্দিরের উত্তর দিকে সম্মুখে দালান-যুক্ত সমতল ছাদ্ বিশিষ্ট পশ্চিমমুখী একটি দালানঘরে গোপীনাথজীউ নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ এবং একটি শীতলার ঘট প্রতিষ্ঠিত আছে। কৃষ্ণ মূর্তি কষ্টি পাথরের এবং রাধিকা ধাতুময়ী। মন্দির ঘরের মেঝে সিমেন্ট এবং বাহিরের দালান ও রক্ শ্বেত পাথর দ্বারা মোড়া। মন্দিরের সম্মুখে পাকা নাটমন্দির এবং বায়ুকোনে চারিদিকে বারান্দা বেষ্টিত অষ্টকোনাকৃতি সুউচ্চ দোলমঞ্চ আছে। মন্দির প্রাঙ্গণের চারিদিক প্রাচীর বেষ্টিত। গোপীনাথজীউর নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর রাসযাত্রা ও দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের সেবায়েত স্থানীয় গোস্বামী-গণ। বর্তমান বেতনভোগী পূজারী শ্রীবাগাম্বর ভট্টাচার্য, ইনি পারশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। মন্দিরটি ১৯৬৮ সালে 'বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাষ্ট' কতৃক সংস্কৃত।

মদনমোহনজীউর মন্দির

মদনমোহনজীউর মন্দির খড়দহ গোস্বামীপাড়ায় শ্যামসুন্দরের মন্দিরের নিকটেই অবস্থিত। পশ্চিমমুখী আটচালা একটি মন্দিরে মদনমোহনজীউ নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। পদ্মাসনের উপর দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিটি কষ্টি পাথরের এবং রাধিকা মূর্তিটি অষ্টধাতু নির্মিত। ইহাভিন্ন, মন্দির অভ্যন্তরে একটি পিতল নির্মিত ছোট গোপাল মূর্তি এবং কয়েকটি শালগ্রাম শিলা আছে। নিত্য পূজা ব্যতীত বৈশাখী পূর্ণিমায় ফুল-দোল, গঙ্গার তীরে চাঁচর, শ্রাবণে ঝুলন, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমী, শরৎকালীন রাসযাত্রা, কার্তিক অমাবস্যায় কৃষ্ণের কালীরূপ ধারণ পূর্বক পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় রাধিকা চরণ গোস্বামী মহাশয়ের স্ত্রী প্রসন্নময়ী দেবী মদনমোহনজীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির গাত্রে একটি শিলালিপি আছে, তাহাতে লেখা—বিশ্বাম্ভর দাস, মীর্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বাংলা ১২৯৮। ইহা ছাড়া, মন্দিরে ঝুলান একটি ঘণ্টার গায়ে ইং ১৮৬২ সাল উৎকীর্ণ আছে। দুই স্থানে দুই রকম সন উল্লেখের কারণ সম্পর্কে বর্তমান সেবায়েতরা কিছুই বলিতে পারেন না। তবে তাঁহারা বলেন মন্দিরটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। প্রসন্নময়ী দেবীর কোন পুত্র-সন্তানাদি ছিল না; তিনি কালীপদ চক্রবর্তী নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বালককে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। বর্তমানে চক্রবর্তী মহাশয়ের তিন পুত্র পালাক্রমে মদনমোহনজীউর পূজা-পার্বণ চালাইতেছেন। মদনমোহন-জীউর নামে পুরুলিয়া জেলায় প্রায় ৪০ বিঘা দেবোত্তর জমি আছে।

মহাপ্রভুর মন্দির

শ্যামসুন্দরজীউর মন্দিরের উত্তরে কিছু দূরে খড়দহ শহরের মধ্যে একটি বৃহৎ ইষ্টক নির্মিত নবরত্ন মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীনিত্যানন্দ ও জগন্নাথদেবের দারুময় মূর্তি এবং কৃষ্ণ-রাধিকার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা মহাপ্রভু-মন্দির নামে খ্যাত। মন্দিরটি জীর্ণ। স্থানীয় শ্রীপ্রভাস চট্টোপাধ্যায় (ইনি মহাপ্রভু মন্দিরের জনৈক সেবায়েত) গৃহে রক্ষিত একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ১৭৬০ শকাব্দে নন্দ মোহন গোস্বামী ও ললিত মোহন গোস্বামী কর্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। শিলালিপিটি মন্দির গাত্র হইতে খুলিয়া পড়ায় শ্রীচট্টোপাধ্যায় স্বগৃহে আনিয়া রাখিয়াছেন। মহাপ্রভুর মন্দিরে নিত্য পূজা ব্যতীত আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, মাঘী শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোস্বামীদিগের দৌহিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়গণ বর্তমান মন্দিরের সেবায়েত। জনৈক বেতনভোগী পূজারী উল্লিখিত বিগ্রহাদির নিত্য পূজা করেন।

রাধারন্দাবনচন্দ্রজীউর মন্দির

গোস্বামীপাড়ায় দক্ষিণমুখী সমতল ছাদ বিশিষ্ট একটি ঘরে রাধাবৃন্দাবনচন্দ্রজীউ নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ এবং ষড়্ভুজ গৌরাঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কৃষ্ণ মূর্তিটি কষ্টি পাথরের, রাধিকা ধাতুময়ী এবং ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের দারুময় মূর্তি। মন্দিরের সম্মুখে একটি ছোট প্রাঙ্গণ এবং পাশে ভোগরন্ধনাদির কয়েকটি ঘর আছে। শ্রীমোহিনী মোহন গোস্বামীর পত্নী শুভঙ্করী দেবী কর্তৃক বাংলা ১৩০৮ সনে এই মন্দির স্থাপিত হয়। উল্লিখিত বিগ্রহের নিত্য পূজা ব্যতীত বৈশাখী পূর্ণিমায় ফুলদোল, শ্রাবণে ঝুলন, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী, কার্তিক পূর্ণিমা রাসযাত্রা, মাঘী পূর্ণিমায় উৎসব এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের নিকটে রাসখোলা রোডের উপর রাধাবৃন্দাবনচন্দ্রজীউর অষ্টকোনাকৃতি উচ্চ রাসমঞ্চ আছে। ফুলদোল ও রাসযাত্রা উপলক্ষে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহদ্বয়কে উক্ত রাসমঞ্চে স্থাপন করিয়া উৎসব পালন করা হয়। উক্ত মন্দির ও রাসমঞ্চটি 'বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাষ্ট' কর্তৃক ইংরাজী ১৯৬৮ সালে সংস্কৃত হইয়াছে। উল্লিখিত গোস্বামী বংশের দৌহিত্র পঞ্চানন গোস্বামী, হেমেন্দ্র গোস্বামীগণ মন্দিরের বর্তমান সেবায়েত। পূজারী বেতনভোগী ব্রাহ্মণ।

রাধাকান্ত মন্দির

শ্যামসুন্দর মন্দিরের দক্ষিণে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে খড়দহ-কুলীনপাড়ায় সম্মুখে দালান ও নাটমন্দিরসহ একটি পূর্বমুখী আটচালা মন্দিরে রাধাকান্ত নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। গত দুই বৎসর হইল প্রাচীন রাধিকা মূর্তিটি মন্দির হইতে অপহৃত হওয়ায় বর্তমানে একটি পিতল নির্মিত মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে; কৃষ্ণ মূর্তিটি কষ্টি পাথরের। এই মন্দিরটি স্থানীয় শিরোমণিদিগের এবং শোনা যায় ইহা খড়দহে শ্যামসুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে নির্মিত।

(এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমি যে-সময় খড়দহের মন্দিরাদি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলাম সেই সময় মন্দিরটির আমূল সংস্কার কার্য চলিতেছিল বলিয়া মন্দিরের নিত্য পূজাদি বন্ধ ছিল এবং কলিকাতা নিবাসী সেবায়েতগণ অনুপস্থিত থাকায় রাধাকান্ত মন্দির সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই।)

লক্ষ্মীনারায়ণজীউর মন্দির

রাধাকান্ত মন্দির হইতে সামান্য কিছু দূরে গঙ্গার তীরবর্তী বলরাম ধর্ম সোপান রোডে চারিদিকে ফুল ও ফলের বাগান বেষ্টিত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে প্রাসাদতুল্য পশ্চিমমুখী লক্ষ্মীনারায়ণমন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহা বাংলা ১৩৫৩ সনের ২১শে বৈশাখ স্বামী যতীন্দ্র রামানুজ দাস কর্তৃক স্থাপিত। মূল মন্দিরে সুউচ্চ পাঁচটি চূড়ার মধ্যেরটিতে পর পর তিনটি সুবৃহৎ পিতলের কলসী এবং তাহার উপর একটি বিষ্ণুচক্র স্থাপিত আছে। বহুদূর হইতে এই মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির অভ্যন্তরে শ্বেত প্রস্তরের বেদীর উপর বামে লক্ষ্মীদেবীসহ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। উভয় মূর্তি এবং মন্দির ঘরের মেঝে শ্বেত পাথর নির্মিত। ইহাভিন্ন, মন্দিরে বলরাম স্বামীর মর্মর মূর্তি আছে। মন্দির সংলগ্ন সুপ্রশস্ত ভজনালয়ের তিনদিক রক্ দ্বারা ঘেরা। মন্দিরের বাগান হইতে প্রস্তর নির্মিত একটি ফটক পার হইয়া ইট বাঁধানো প্রশস্ত ঘাটের সিঁড়ি গঙ্গার গর্ভে নামিয়া গিয়াছে। মন্দিরে নিত্য পূজা ব্যতীত দোল, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি তিথিতে উৎসব এবং চৈত্র মাসের শুক্ল একাদশী তিথিতে বলরাম স্বামীর আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের সেবায়েত পুরোহিতগণ পশ্চিমদেশীয় হিন্দুস্থানী।

শিবমন্দির

খড়দহের বিশ্বাস পরিবারের আদি বাস হাওড়া জেলার সাঁকরাইলে ছিল বলিয়া জানা যায়। এই পরিবারের রামহরি বিশ্বাস চট্টগ্রামের নিমক মহলের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন এবং খড়দহে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস কুচবিহারের দেওয়ান ছিলেন। খড়দহের বিশ্বাস-পাড়ায় তাঁহাদের পৈত্রিক জীর্ণ অট্টালিকা, রাস্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত ভগ্ন তোরণদ্বার ইত্যাদি আজিও তাঁহাদের অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষী বহন করিতেছে। গঙ্গার তীরে ফাকি ঘাটে যে ছাব্বিশটি শিবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা রামহরি বিশ্বাস ও প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। উল্লিখিত ছাব্বিশটি মন্দিরই আটচালা গঠন রীতিতে নির্মিত। ফাকি ঘাটের উত্তরে অবস্থিত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পশ্চিম-

মুখী বিশাল ছয়টি মন্দিরের প্রতিটিতেই প্রায় সাড়ে তিনফুট উচ্চ গৌরীপট্টভেদী-শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরের কাঠের দরজায় চৌকাকাঠের পরিবর্তে চওড়া কালো পাথর ব্যবহার করা হইয়াছে; উহার দুইটিতে সুন্দর কারুকার্য খচিত। সম্মুখস্থ গঙ্গার তীরবর্তী রেলিং ঘেরা বাগানে এককালে হয়ত নানারূপ ফুল গাছ দ্বারা সুন্দরভাবে শোভিত ছিল, তবে আজ উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে সবই হৃতশ্রী। মন্দিরগুলিও বহুকাল সংস্কার অভাবে জীর্ণ। নিত্য পূজা নামে মাত্র। ঘাটের দক্ষিণ দিকে গঙ্গার পাড়ে সমচতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের চারিদিক ঘিরিয়া মোট কুড়িটি মন্দির আছে। উহার পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত উত্তর দিকের চারিটি মন্দিরের মধ্যস্থলে একটি লোহার ফটক দিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হয়। এই প্রাঙ্গণের পূর্ব দিকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ছয়টি, দক্ষিণ দিকে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত চারটি এবং পশ্চিম দিকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ছয়টি মন্দির অবস্থিত। প্রবেশ পথের ডান দিকের মন্দির দুইটির ও বাম দিকের মন্দির দুইটির দক্ষিণ ব্যতীত পশ্চিম দিকে দরজা, পূব সারির ছয়টি মন্দিরের প্রথম পাঁচটি মন্দিরের পশ্চিম ব্যতীত দক্ষিণ দিকের দরজা, ইহার দক্ষিণ প্রান্তের মন্দিরটির পশ্চিম ব্যতীত উত্তর দিকে দরজা, দক্ষিণ সারির চারিটি মন্দিরের উত্তর ব্যতীত পশ্চিম দিকে দরজা এবং পশ্চিম সারির ছয়টি মন্দিরের পশ্চিম ব্যতীত দক্ষিণ দিকে দরজা আছে। পশ্চিম দিকের ছয়টি মন্দির অন্যান্য মন্দিরগুলির তুলনায় কিঞ্চিৎ বৃহদাকার এবং ইহারা মন্দির প্রাঙ্গণের দিকে পিছন করিয়া গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেবলমাত্র এই মন্দির ছয়টির অভ্যন্তরে গৌরীপট্টসহ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য মন্দিরগুলিতে সিমেন্ট জমানো গৌরপট্টের উপর লম্বা বা গোলাকার প্রস্তর স্থাপিত আছে। মন্দিরগুলি সুগঠিত এবং টানা রক্ দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। মন্দিরগুলির প্রবেশ দ্বারের দেওয়াল গাত্রে চুন-বালির দ্বারা নির্মিত সুন্দর লতা-পাতা খোদিত এবং প্রতিটি মন্দিরের চূড়ায় তিন সারিতে দুইটি করিয়া ছয়টি পদ্মঘট স্থাপিত। উহাদের মধ্যের ঘটে ত্রিশূল ও উভয় পাশের ঘটে ধ্বজা প্রোথিত আছে। সম্প্রতি 'বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাষ্ট' কর্তৃপক্ষ মন্দিরগুলি সংস্কার করিয়াছেন। বিশ্বাসদের শিবালয়ে নিত্য পূজা ব্যতীত চৈত্র মাসে নীলপূজার দিন উৎসব হয় এবং তদুপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে কয়েকটি খাবার ও মনিহারীর দোকানপাট বসে।

খড়দহ রাসখোলায় প্রাচীন বট গাছের নীচে একটি ছোট মন্দিরে বালকনাথ শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরটি স্থানীয় শ্যামচাঁদ হালদার কর্তৃক স্থাপিত। চৈত্র মাসে এই মন্দিরে নীলপূজা হয়। বালকনাথ শিবমন্দিরের পিছনে কালীপূজার একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্যামসুন্দরজীউর উৎসব ও মেলা

শ্যামসুন্দর বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া সারা বৎসর বৈষ্ণব-দিগের বিভিন্ন পর্বে নানা উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে বৈশাখী পূর্ণিমায় ফুলদোল, কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা, মাঘী পূর্ণিমায় বার্ষিক উৎসব ও ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোলযাত্রা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত উৎসবাদির মধ্যে শ্যামসুন্দরজীউর রাসোৎসবই সর্বাপেক্ষা আড়ম্বরপূর্ণ ও মহাসমারোহময় অনুষ্ঠান। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের ন্যায় খড়দহের রাসোৎসবের খ্যাতি আছে। চব্বিশ-পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং নদীয়া, হুগলী ও কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ত্রিশ হাজার নরনারী খড়দহের রাস দেখিতে আসেন। শ্যামসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই এই উৎসব সুরু হইয়াছে।

কার্তিক পূর্ণিমা হইতে তিনদিনব্যাপী রাস উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন শ্যামসুন্দরজীউ রাসমঞ্চে গিয়া উঠেন। গঙ্গার তীরে রাসখোলার মাঠে চারিদিকে অনুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে সতের চূড়া বিশিষ্ট সুউচ্চ রাসমঞ্চ অবস্থিত। ত্রিস্তর বিশিষ্ট অষ্টকোনাকৃতি রাসমঞ্চের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে আটটি করিয়া ষোলটি রত্ন বা চূড়া এবং সর্ব উচ্চে মধ্যস্থলে একটি চূড়া আছে। রাসমঞ্চে আরোহণের জন্য পশ্চিম দিকে ঘোরান সিঁড়ি ব্যতীত পূব দিকেও সিঁড়ি আছে। শোনা যায়, ইহা প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে স্থানীয় কিশোর পরিবার কর্তৃক নির্মিত। রাসমঞ্চের দেওয়াল গাত্রে স্থাপিত শিলালিপি হইতে জানা যায়, কলিকাতার জোড়াবাগানের ১৬, হরদাস লেন নিবাসী কৃষ্ণ কুমার ভট্টাচার্য ও তাঁহার পত্নী রাধারানী দেবী কর্তৃক বাংলা ১৩০৩ সনে এবং সর্বশেষ ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে

'বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাষ্ট' কর্তৃক ইহার সংস্কার কার্য সাধিত হইয়াছে। ইহার পূর্বে যে প্রাচীন রাসমঞ্চটি ছিল বহু দিন হইল তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

রাস উৎসব উপলক্ষে রঙিন আলোর মালা, শোলার কদম ফুল আর পাখী দিয়া রাসমঞ্চটিকে সুসজ্জিত করা হয়। পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার পর নানারকম বাজনা বাদ্য ও আলোর রোশনাইসহ চতুর্দোলায় চড়িয়া রাধিকাসহ শ্যামসুন্দরজীউ মন্দির হইতে রাসমঞ্চে গমন করেন। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ও স্থানীয় গোস্বামী পরিবারের লোকজন খোল-করতালসহ রাসের গান গাহিতে গাহিতে এই শোভাযাত্রার অনুসরণ করেন। ইহার পর শ্যামসুন্দর-জীউ রাসমঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হইলে অগণিত নরনারী মূর্তি দর্শন করিতে ও নানা উপাচারে নৈবেদ্যের ডালা সাজাইয়া পূজা দিতে আসেন। এইভাবে রাসমঞ্চে রাধিকা-সহ নিশি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে শ্যামসুন্দরজীউ ফিরিয়া যান নিজের মন্দিরে। সেখানেই তাঁহার যথারীতি ভোগ-পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। এইভাবে তিনদিন রাসমঞ্চে যাতায়াত চলে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পূর্বে শোভাযাত্রাকালে আটবাড়ার গোস্বামীদিগের রাসবাড়ী হইয়া শ্যামসুন্দরজীউ রাসমঞ্চে আসিয়া উঠিতেন।

চতুর্থ দিন গোষ্ঠবিহার। এই দিন আর শ্যামসুন্দরজীউ প্রাতঃকালে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন না। এখান হইতেই মধ্যাহ্নে ঢাক-ঢোল, ব্যাণ্ড-ব্যাগপাইপ, খোল-করতাল প্রভৃতি বাজনাসহ শ্যামসুন্দরকে চতুর্দোলায় স্থাপন করিয়া গোষ্ঠের গান গাহিতে গাহিতে গোস্বামীরা গোষ্ঠযাত্রায় বাহির হন। যাত্রাকালে রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্যামসুন্দর বিগ্রহের উপর সুসজ্জিত ছত্র ধরা হয়। এই সময় শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য কাতারে কাতারে লোকজন রাস্তার দুইধারে অপেক্ষা করেন। গৃহস্থ বঁধুরা দরজার সম্মুখে চাঁদোয়া খাটাইয়া তাহার নীচে আলপনা দিয়া আম্রপল্লবসহ ঘট স্থাপন করিয়া রাখেন এবং ক্ষীর, ছানা, মাখন, মিছরি, মালপোয়া, সন্দেশ, ফলমূল প্রভৃতি উপাদেয় উপাচারে নৈবেদ্যের ডালা সাজাইয়া অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন শ্যামসুন্দরজীউর আগমনের প্রতীক্ষায়। যাত্রাপথে শ্যামসুন্দরজীউ বিশ্রাম গ্রহণ করেন এই সকল গৃহস্থদের আঙ্গিনায়। কুলবঁধুরা বিগ্রহ বরণ করেন, পথশ্রান্ত শ্যামসুন্দরজীউকে নিবেদন করেন ভোগের ডালা। এইভাবে গোষ্ঠবিহার শেষ করিয়া শ্যামসুন্দর-জীউ প্রায় সন্ধ্যাকালে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিলে শুরু হয় 'বিরাটভোগ পর্ব'। খড়দহের রাস উৎসবের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই 'বিরাটভোগ পর্ব'। শোনা যায়, প্রায় আশী বৎসর পূর্বে কলিকাতার নিমু গোস্বামী লেনের কেশব চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ইহার প্রবর্তন করেন। এই পর্ব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে একটি বৃহদাকার পিতলের গাড়াতে রাখা হয় খিচুড়ী ভোগ আর গাড়ীর চারিধারে সাজিয়ে দেওয়া হয় ফলমূল-মিষ্টি। গোষ্ঠ বিহারের পর গোস্বামীগণ শ্যামসুন্দর বিগ্রহ কোলে করিয়া গাড়ার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইয়া যায় ভোগ লুটের ধুম। নাট মন্দিরে ও মন্দিরের আশেপাশে অপেক্ষারত অগণিত নরনারী বাঁধ ভাঙা বন্যার ন্যায় স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিরোধ বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া আরম্ভ করেন ভোগ লুট। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই স্বহস্তে কড়া, হাঁড়ি, সরা, বালতি, ধামা—যে যাহা পারেন তাহার দ্বারা সহস্তে গাড়া হইতে ডুবাইয়া খিচুড়ী তুলিয়া লইতে থাকেন। জামা-কাপড়ে খিচুরী লাঞ্ছিত ভক্তদের হাঁকাহাকি, চেঁচামেচি, হৈ হট্টগোলে সারা মন্দির সরগম হইয়া উঠে। কাড়াকাড়ি করিতে গিয়া সরা ভাঙ্গে, হাঁড়ি পড়ে, আহত হন বহুলোক। ভোগ লুট পর্বের পর খড়দহের রাস উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় শ্যামসুন্দরজীউর দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ণিমার পূর্ব দিন সন্ধ্যায় চাচর পর্ব উপলক্ষে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ মন্দির হইতে গঙ্গারধারে সুউচ্চ দোলমঞ্চে লইয়া যাওয়া হয় এবং চাচর পর্বের পর বিগ্রহ মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। পরের দিন প্রাতঃকালে শ্যামসুন্দর বিগ্রহকে পুনরায় দোলমঞ্চে স্থাপন করিয়া সারাদিনব্যাপী উৎসব পালন করা হয়। রাত্রিকালে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ মন্দিরে ফিরিয়া আসেন। দোলযাত্রা উপলক্ষে খুব ধুমধাম হয়। দোলমঞ্চটি খড়দহ মিলের ম্যানেজার পি, সি, রবার্টসন কর্তৃক সংস্কৃত।

খড়দহের শ্যামসুন্দরজীউকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় ফুলদোল উপলক্ষে একদিন, মাঘী পূর্ণিমার উৎসব উপলক্ষে একদিন এবং কার্তিক মাসে

রাসযাত্রা উপলক্ষে প্রায় একমাসব্যাপী মেলা বসে। উহাদের মধ্যে রাসযাত্রার মেলাই উল্লেখযোগ্য। প্রতি বৎসর গঙ্গার তীরে রামখোলায় রাস্তার দুই ধারে ও সরকারী জমিতে এই মেলা বসিয়া থাকে। কলিকাতা ও চব্বিশ-পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে ব্যবসায়ীরা আসেন এবং প্রতিদিন গড়ে প্রায় আট-দশ হাজার যাত্রী সমাগম হয়। বলা বাহুল্য উৎসবের তিনদিনই লোকজন বেশী আসেন। বিশেষতঃ গোষ্ঠ উৎসবের দিন সর্বাধিক লোকসমাগম হইতে দেখা যায়। মেলায় প্রায় দেড়শত দোকানপাট বসে ও বহু ফেরিওয়ালা আসেন। দোকান-পাটগুলির মধ্যে তেলেভাজা, ময়রা প্রভৃতি খাবারের দোকান ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত, মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা-পুতুল, কাঁচ ও লোহার বাসনপত্র, কাপড়চোপড়, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, ধামা-চুবড়ী প্রভৃতি শিল্পসামগ্রী, টোটকা ঔষধপত্র, বই-ছবি ইত্যাদির দোকানপাট বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক ও সার্কাসের দল আসে।

আগরপাড়া

কলিকাতা হইতে প্রায় আট মাইল দূরে আগরপাড়া অবস্থিত। ইহা পানিহাটী মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত এবং পূর্ব রেলপথে এই স্থানেই একটি স্টেশন আছে। কলিকাতা হইতে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়াও যাতায়াত করিতে পারা যায়।

আগরপাড়া রেলস্টেশনের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে সুপ্রসিদ্ধ তারাশাহ পীর নামে জনৈক পীরের আস্তানা আছে। ইহা আনুমানিক প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসরের প্রাচীন। এই স্থানে পীরের সমাধির উপর সম্মুখে টালির চালাসহ এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি ঘর আছে। ইহা নমাজঘর নামে খ্যাত। পারস্যের মহীউদ্দিন কাদের জিলানী চিস্তিয়া তারাশাহের গুরু ছিলেন বলিয়া জানা যায়। শোনা যায় সুদূর পারস্য হইতে তিনি তাঁহার শিষ্যের নিকট আগরপাড়ায় আসেন। এখানে আসিয়া তিনি যে বটবৃক্ষতলে আসন পাতিয়া ছিলেন, সেই প্রাচীন বটবৃক্ষটি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া আজিও বিদ্যমান। তারাশাহ গুরুর আগমনের স্মৃতি স্বরূপ এই স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়া মেলার প্রবর্তন করেন।

তারাশাহ পীরের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, একবার তিনি জনৈক ধনী শিষ্যের গৃহে উৎসব উপলক্ষে শিষ্যদের অনুরোধে অলৌকিক শক্তির প্রভাবে বহু রৌপ্য নির্মিত তৈজসপত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে, রোগমুক্তি, সংকটমোচন, সন্তানলাভ ইত্যাদি বহু ব্যাপারে বহু লোক তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া সফলকাম হইতেন বলিয়াও শোনা যায়। এইরূপ অলৌকিক প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া স্থানীয় জনসাধারণ তাঁহাকে বিশেষ মান্য করিতেন। ভক্তদের বিশ্বাস পীরের আস্তানা সংলগ্ন তারাপুকুরে কামনা জানাইয়া স্নান করিলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। কেহ কেহ বলেন তারাশাহ পীরের নামেই পুকুরটির নাম তারাপুকুর হইয়াছে আবার কেহ কেহ বলেন পাশাপাশি তেরটি পুকুর একত্রিত হইয়া 'তেরপুকুর' অপভ্রংশে তারাপুকুর হইয়াছে এবং তারাপুকুরের সন্নিকটে উক্ত পীরের আস্তানা ছিল বলিয়া ইনি তারাশাহ পীর নামে খ্যাত হন।

কিংবদন্তী আছে, আগরপাড়া ও তৎসন্নিহিত পানিহাটী, ভবানীপুর প্রভৃতি অঞ্চল দেউলিয়ার রাজা চন্দ্রকেতুর অধিকারভুক্ত ছিল। কোন কারণে চন্দ্রকেতুর সহিত সংঘর্ষে তারাশাহ পীর নিহত হইলে পীরের অনুরক্ত ভক্তগণ এইস্থানে মেলার প্রবর্তন করেন। শোনা যায়, রাজা চন্দ্রকেতুর আরাধ্যা তারা দেবীর নাম অনুসারেই উল্লিখিত পুষ্করিণীর নাম 'তারাপুকুর' হইয়াছে।

প্রতি বৎসর ১লা মাঘ পীরের আস্তানা সংলগ্ন ব্যক্তি-বিশেষের (কালনার জমিদার সেন মহাশয়দের) জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি তারাপুকুরের মেলা নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহা পক্ষকালব্যাপী স্থায়ী হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তারাশাহ পীর জীবিত অবস্থায়ই তাঁহার গুরুর আগমন স্মৃতি স্মরণ উপলক্ষে এই মেলার প্রবর্তন করেন। অন্য মতে তারাশাহ পীরের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুরক্ত ভক্তগণ কর্তৃক এই মেলা প্রবর্তিত হয়। স্থানীয় অঞ্চলের লোকজন এখনও ইহাকে 'বড় পীরের' মেলা

বলেন। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রথমোক্ত কারণেই মেলাটি প্রবর্তিত হইয়া থাকিবে।

মেলায় আশেপাশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু যাত্রী আসেন। প্রায় একশত দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা দেখা যায়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ভিন্ন চব্বিশ-পরগণা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর ব্যবসায়ীরা আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাছাড়া, মনিহারী দ্রব্য, বাসনকোসন, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র এবং নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের লোকদের তৈয়ারী ধামা, কুলো, চ্যাঙ্গারী, মাটির হাঁড়ি-কলসী, খেলনা-পুতুল ইত্যাদি আমদানি হয়। পূর্বে মেলায় নানা প্রকার সুগন্ধিযুক্ত চাউল ও চিনির কদমা প্রতিযোগিতার সহিত ক্রয়-বিক্রয় হইত। আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও সার্কাসের দল আসে এবং লটারী খেলা হয়।

আগরপাড়া সম্পর্কে শ্রীযুত অশোক মিত্র মহাশয় তাঁহার রচিত ১৯৫১ সালের ২৪-পরগণা ডিষ্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুক-এ লিখিয়াছেন "The village of Agarpara, which lies within municipal limits, contains a church capable of holding 500 people, with a tower 74 feet high, which was built in 1837 by Mrs. Wilson; there are also a female orphanage and school under the management of the *Church Missionary Society*. A fair, called the Tarapukur *mela*, is held here at the end of January, and lasts one day." (p. cvi)

(উল্লিখিত তথ্য সংগ্রহের কাজে পানিহাটী পৌর প্রতিষ্ঠানের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীশিশির কুমার মিত্র মহাশয়ের সাহায্য উল্লেখযোগ্য।)

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম

আগরপাড়া শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রমে ১৯শে বৈশাখ হইতে শ্রীশ্রীমার শুভ ৬৪তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। উহা আগামী ১০ই জ্যৈষ্ঠ (২৫শে মে) রাত্রি সাড়ে তিনটায় পুণ্যতিথি পূজান্তে উদ্‌যাপিত হইবে। এতৎ সম্পর্কে সন্ধ্যার কার্যসূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—বুধবার ৫ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যা সাতটায় শ্রীযুক্তা সাবিত্রী ঘোষের ভজন গান। বৃহস্পতিবার ৬ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যা সাতটায় শ্রীযুক্তা উৎপলা সেনের কীর্তন ও ভজন; রাত্রে পূর্ণিমা উপলক্ষে শ্রীশ্রীমার বিশেষ পূজা। শনিবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় – শ্রীযুক্তা মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা কীর্তন। রবিবার ৯ই জ্যৈষ্ঠ– শ্রীশ্রীমার নাম সংকীর্তন ও মাতৃপ্রসঙ্গ, সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির ভজন ও কীর্তন; রাত্রি সাড়ে তিনটায় মাতৃতিথি পূজা ও আরতি।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬)

দক্ষিণেশ্বর

[শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংকলিত]

কলিকাতা হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে চব্বিশ-পরগণা জেলার বরাহনগর থানার অন্তর্গত ভাগীরথীর তীরে প্রসিদ্ধ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী অবস্থিত। যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধন পীঠ হিসাবে বর্তমান যুগে এই কালীবাড়ী তীর্থ-গৌরব অর্জন করিয়াছে। পূর্ব রেলপথে শিয়ালদহ হইতে এই স্থানেই একটি রেলস্টেশন আছে। তাহা ছাড়া কলিকাতা হইতে নিয়মিত মোটরবাসেও যাতায়াত করা যায়। কলিকাতা জানবাজারের পুণ্যশীলা রাণী রাসমণি এই কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার অন্তর্গত দক্ষিণমুখী একটি সুবিশাল নবরত্ন মন্দিরের অভ্যন্তরে রৌপ্যমঞ্চের উপর প্রায় আড়াই ফুট উচ্চ প্রস্তর নির্মিত দক্ষিণাকালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দেবী মূর্তি ভবতারিণী কালী নামে খ্যাত। ইহার সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে প্রশস্ত নাট মন্দির, উত্তর দিকে সমতল ছাদ বিশিষ্ট একটি স্বতন্ত্র মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বিস্তৃত মন্দির প্রাঙ্গণ লাল রঙের টালির দ্বারা আবৃত। ইহার পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গার তীরে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত দ্বাদশটি আটচালা মন্দিরের প্রতিটিতে বৃহদাকার গৌরীপট্ট-ভেদী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবমন্দিরের নিকট হইতে চাঁদনী এবং প্রশস্ত বাঁধাঘাট গঙ্গার গর্ভে নামিয়া গিয়াছে। গঙ্গাবক্ষ হইতে কালীবাড়ীর দৃশ্য অতি মনোরম। গঙ্গার উপর দিয়া বিবেকানন্দ সেতু দ্বারা পশ্চিম তীরে বালি হইতে বেলুড় মঠে যাওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরের ঘাট হইতে কালীমন্দির দর্শন করিয়া বহু যাত্রী নৌকাযোগে বেলুড় মঠ গমন করেন। ভবতারিণী মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বাস-কক্ষটিতে তাঁহার শয্যা ও ব্যবহৃত অন্যান্য দ্রব্যাদি সুসজ্জিত করিয়া রাখা আছে। প্রতিদিন এই কক্ষে ঠাকুর রামকৃষ্ণের পূজাপাঠ হয়। ইহাভিন্ন, প্রাচীন নহবতখানায় শ্রীসারদামণি মার প্রতিকৃতি এবং একটি পৃথক মন্দিরে কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠাতা পূণ্যশিলা রাসমনির মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধন বেদী ও পঞ্চবটী এবং ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে উদ্বোধিত 'ইণ্টার ন্যাশনাল গেষ্ট হাইস' এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু। প্রতিদিন দেশ-বিদেশ হইতে বহু যাত্রী মন্দির দর্শনে আসেন। উল্লিখিত বিগ্রহাদির প্রত্যহ নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যা ভোগারতি ব্যতীত বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে সাড়ম্বরে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে ভোগারতির পর বার ঘটিকায় মন্দিরের দ্বার বন্ধ হয় এবং পুনরায় অপরাহ্নে বেলা তিন ঘটিকা হইতে রাত্রি নয় ঘটিকা পর্যন্ত সাধারণের দর্শনের জন্য মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকে। অন্যান্য পর্ব উপলক্ষে সারাদিনই মন্দিরের দ্বার খোলা রাখা হয়।

রাণী রাসমণি কর্তৃক দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় তাহার "পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন—

"রাণী রাসমণি কাশী যাবেন। কৈবর্তের মেয়ে, কিন্তু আসলে অষ্ট সখীর এক সখী। কলকাতার জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী। কিন্তু মন রয়েছে কালিকার পাদপদ্মে।

নৌকোর বহর ছেড়ে দিয়েছে। রাণী ঘুমিয়ে পড়েছেন। উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যন্ত এসেছেন, স্বপ্ন দেখলেন রাসমণি। দেখলেন দেবী ভবতারিণী নিজে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, 'কাশী যাবার দরকার নেই। এই ভাগীরথীর পারেই আমাকে প্রতিষ্ঠা কর্। আমাকে অন্নভোগ দে।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন রাসমণি। ওরে, নৌকো ফিরিয়ে নিয়ে চল্। আর কাশী যেতে হবে না। স্বয়ং কাশীশ্বরী এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

প্রথম ভেবেছিলেন গঙ্গার পশ্চিমকূলে বালি-উত্তরপাড়ার জমি নেবেন। কথায় আছে, গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল। কিন্তু ও-অঞ্চলের জমিদারের বুদ্ধি-শুদ্ধি আজগুবি। টাকার লোভে জমি দিতে তাঁদের আপত্তি নেই, কিন্তু সেই জমিতে পরের টাকায় যে ঘাট তৈরি হবে সে ঘাট দিয়ে তাঁরা গঙ্গায় নাইতে যাবেন না। না যাবেন তো না যাবেন —এমন কথা বলতে পারলেন না রাসমণি তিনি পূর্ব কূলে উপস্থিত হলেন।

পূর্ব কূলে দক্ষিণেশ্বর। এক লপ্তে ষাট বিঘা জমি কিনলেন রাসমণি। জমির কতক অংশের মালিক ছিল হেষ্টি নামে এক সাহেব, আর বাকী অংশে মুসলমানদের কবরখানা আর গাজী পীরের থান। জমির গড়ন খানিকটা কচ্ছপের পিঠের মত। তন্ত্রমতে অমন জমিই শক্তি-সাধনার অনুকূল। তাই, সন্দেহ কি, ঐ পূর্ব কূল দেবীই নির্বাচিত করেছেন পূর্ব থেকে। নয় লাখ টাকায় মন্দির আর মূর্তি তৈরি হল। নবরত্নবিশিষ্ট কালীমন্দির, উত্তরে রাধাগোবিন্দের মন্দির, পশ্চিমে দ্বাদশ শিবমন্দির আর দক্ষিণে নাটমণ্ডপ। মধ্যস্থলে প্রশস্ত চত্বর। উত্তরে-দক্ষিণে-পূবে আরো তিন সার দালান—সব মিলে অতিকায় দেবায়তন। সম্পূর্ণ হতে লেগেছিল প্রায় দশ বছর। এই দশ বছর—উদ্যোগ থেকে উদ্‌যাপন পর্যন্ত—রাসমণি ব্রতধারিণী হয়ে ছিলেন, ছিলেন কঠোর নিয়ম সংযমে।

তৈরি হল মন্দির। তৈরি দেবীমূর্তি। পণ্ডিতেরা পাঁজি দেখতে লাগলেন মন্দিরপ্রতিষ্ঠার শুভদিন কবে ঠিক করা যায়। মূর্তি ছিল বাক্সের মধ্যে বন্দী হয়ে। দেখা গেল, মূর্তি ঘামছে। রাত্রিযোগে স্বপ্ন দেখলেন রাসমণি। ক্লান্ত-কাতর কণ্ঠে ভবতারিণী বলছেন, 'আমাকে আর কতদিন কষ্ট দিবি এমন বন্ধ করে রেখে। শিগ্‌গির আমাকে মুক্তি দে—'

রাণী অধীর হয়ে উঠলেন। আর দেরি করা যায় না। আসন্ন কোনো শুভদিনেই প্রতিষ্ঠিত করতে হয় দেবীকে। স্নানযাত্রার দিনই নিকটতম শুভদিন। কিন্তু এ দেবী শক্তিস্বরূপিণী—একে বিষ্ণু পর্বাহে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কি করে? হোক বিষ্ণু-পর্বাহ, তবু আর অপেক্ষা করা যায় না—মা আকুল হয়ে উঠেছেন। যা শক্তি তাই মাধুরী—তাই "পরমাসি মায়া"। যিনি কালী, তিনিই লক্ষ্মী, তিনিই লজ্জা। যিনি মুণ্ডমালিনী, তিনিই পদ্মালয়া। সর্বার্থ-সাধিকা।

বারো শো বাষট্টি সালের বারোই জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রার দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। দেবী ভবতারিণী। পাষাণময়ী অথচ করুণাদ্রবা। রুপার সহস্রদল পদ্ম, তার উপর দক্ষিণ শিয়রে শবীভূত শিব শুয়ে আছেন। তাঁরই হৃদয়ের উপর পা রেখে দাঁড়িয়েছেন ভবতারিণী। পরণে লাল বেনারসি, মাথায় মুকুট, গলায় সোনার মুণ্ডমালা। নানা অলঙ্কারে ঝলমল করছেন সর্বাঙ্গে। কটিতটে সারে-সারে খণ্ডিত নরকর। দেবী চতুর্ভুজা—দুই বাম করে নৃমুণ্ড আর অসি, আর দক্ষিণ দুই হাতে বর ও অভয়মুদ্রা। দেবী দক্ষিণাস্যা।

এততেও যেন সম্পূর্ণ হল না। সোয়া দু'লাখ টাকায় দিনাজপুর জেলায় শালবাড়ি পরগণা কিনলেন। মা'র সেবায় দান করলেন শালবাড়ি। তবুও হল না পুরোপুরি। মা অন্নভোগ চেয়েছেন, তার ব্যবস্থা কি? পণ্ডিতেরা বললেন, তার বিধি নেই। মাকে চাট্টি খেতে দেব ভক্তি করে, তার বিধি নেই?

না, নেই। তুমি রাণী হলে কি হবে, তুমি অব্রাহ্মণী। অব্রাহ্মণীর অধিকার নেই দেবতাকে ভোগ দেবার। তবে উপায়? রাণী দিকে দিকে লোক পাঠালেন। টোলে বা চতুষ্পাঠীতে কোথাও কেউ কোনো ব্যবস্থা দিতে পারে কি না। সবাই একবাক্যে বললে, কৈবর্তের মেয়ে দেবীকে অন্নভোগ দেবার অধিকারী নয়।

হঠাৎ রামকুমারের টোল থেকে নতুন বিধান এসে পৌঁছল। প্রতিষ্ঠার আগে রাণী যদি দক্ষিণেশ্বরের যাবতীয় সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন তবে অন্নভোগ চলতে পারে। রাসমণি ঠিক করলেন তাঁর গুরুর নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু পূজক পুরোহিত কে হবে? যাকেই ডাকেন সেই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। বলে পাঠায় পুজো করা দূরস্থান, যে-দেবতাকে শূদ্রাণী প্রতিষ্ঠিত করবে তার পায়ের গোড়ায় মাথা পর্যন্ত নোয়াব না। এখন তবে কি করা যায়। শেষ পর্যন্ত রাণী রামকুমারকেই লিখলেন উদ্ধার করতে। রামকুমার বললেন, পূজকের অভাবে মন্দির যখন প্রতিষ্ঠা হয় না, তখন, বেশ, আমিই পূজক হব।"

বর্তমান পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার এই ইতিহাস। প্রথম পূজারী হইলেন হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামের রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন তাঁহার ছোট ভাই গদাধর; পরবর্তী জীবনে যিনি যুগবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস রূপে জগৎখ্যাত হন।

ডাঃ শশীভূষণ দাসগুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহার প্রখ্যাত গ্রন্থ 'ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য'-এ লিখিয়াছেন—

“ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকাল মোটামুটিভাবে উনবিংশ শতকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। রামপ্রসাদের সাধনকাল মোটামুটিভাবে ইহার একশত বৎসর পূর্বে ধরা যাইতে পারে। এই একশত বৎসর ধরিয়া বাঙলার শক্তিসাধকগণ নানাভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সেই সত্যই লক্ষ্য করিতে পারি। আমরা দেখি সাধক রামপ্রসাদ শ্যামাপূজাকে যে একটি সর্বজনীন ধর্ম-সাধনার রূপ দিয়াছেন পরবর্তী কালের সাধকগণ তাহার আরও বিস্তার ঘটাইয়াছেন। সাধক ব্যতীত জনসাধারণের মধ্য হইতে উত্থিত কবিওয়ালা বা পাঁচালীওয়ালা নামে প্রসিদ্ধ ছোট-বড় বহু কবির সঙ্গীতের মধ্যেও আমরা রামপ্রসাদের সাধন স্বরের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। তাহাতে বোঝা যায়, শুধু সাধক-বিশেষের মনে নহে, অষ্টাদশ শতকের মধ্য সময় হইতে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত শতবর্ষকাল বাঙলার জনমানসের মধ্যেই শাক্তধর্ম একটি সর্বজনীন উদার ধর্মরূপে বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বলিব, এই ধারারই পরিণতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আরও একটি তথ্যকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একদিকে রহিলেন রামপ্রসাদ এবং অন্যান্য মাতৃসাধকগণ—আর একদিকে রহিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামিজী মহারাজগণ, যাঁহারা ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরে যে ভারতীয় ধর্মের প্রচার করিলেন তাহা হইল মুখ্যতঃ বেদান্ত ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের নামে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বাহিরে যত ‘মঠ’ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা মুখ্যতঃ ‘বেদান্ত মঠ’। ইতিহাসের দিক্ হইতে জিনিসটি আপাতবিরোধী মনে হইতে পারে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, বাঙলাদেশের ধর্ম-ইতিহাসের যে এই পরিণতি ইহার মধ্যে কোথাও বিরোধ নাই—আছে একটি স্বাভাবিক পরিণতিরই ক্রম। মাতৃপূজা যে মৃন্ময়ী মূর্তি বা অন্য কোনও ধাতুনির্মিত মূর্তির পূজা নয়—মা যে এক অদ্বিতীয় সত্য—মা যে ব্রহ্মময়ী—মায়ের আসল পূজা যে মানস-পূজা এবং সেই মানস-পূজা এবং ব্রহ্মোপাসনার মধ্যে মূলতঃ যে কোনও ভেদ নেই, ইহা রামপ্রসাদ এবং তৎপ্রভাবিত বাঙলার সাধকগণ ও কবিগণের সঙ্গীতে নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই সত্যকে তাঁহার সাধনার ভিতরে সংহতভাবে মূর্ত করিয়া তুলিলেন।...দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম-মত যে খাঁটি শাক্ত-মত, ইহাও যেমন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, তেমনিই আবার স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে যে এই খাঁটি শাক্ত-মত ও খাঁটি বেদান্ত মতের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই; একটা ব্যাপক সমন্বয়-দৃষ্টির মধ্যে ইহারা বিধৃত রহিয়াছে। প্রথমেই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, শ্রীরামকৃষ্ণ সাকার-উপাসক ছিলেন—তিনি কালীমূর্তির পূজারী। কিন্তু এই সাধারণ সত্যকে কোনও রূপে অস্বীকার বা বিকৃত না করিয়াও আমরা বলিতে পারি, এই পরিচয়ের মধ্যে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার সাধক জীবনের ইতিহাসে দেখি, তিনি কেনারাম ভট্টের নিকটে প্রথমে শাক্ত-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণেশ্বরের কালীর পূজারীরূপে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার সাধক-জীবন আরম্ভ করেন (অবশ্য সাধক জীবনের আরম্ভ তাঁহার বাল্য হইতেই)। স্বামী সারদানন্দের মতে ১২৬২ হইতে ১২৭২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তাঁহার সাধনকাল। ইহার মধ্যে ১২৬২-৬৫ এই চারি বৎসরকাল তিনি ভবতারিণীর পূজারীরূপে সাধনা করেন; ১২৬৬-৬৯ এই চারি বৎসরকাল তিনি ভৈরবী ব্রাহ্মণীর উপদেশে এবং নির্দেশে তন্ত্র-সাধনা করেন; ১২৭০-৭৩ এই তিন বৎসর কালের মধ্যে তিনি অন্য বহুরূপ সাধনা করেন। তিনি জটাধারী নামক জনৈক রামাইত সাধুর নিকটে রামমন্ত্রে উপদিষ্ট হন এবং শ্রীরামলালা বিগ্রহ লাভ করেন; তিনি বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত মধুরভাবে সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য ছয়মাস কাল স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া নায়িকাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করেন। এই সময়ে তিনি কিছুদিন আবার আচার্য তোতাপুরীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নির্বিকল্প সমাধির সাধন করেন। ইস্‌লাম-গ্রহণকারী গোবিন্দ রায়ের নিকট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ইস্‌লামের সাধন গ্রহণ করিয়া কিছুদিন নৈষ্ঠিক পন্থায় সাধন করেন। তিনি খ্রীষ্টান সাধনার মূল কথা জানিয়া সেই পন্থায়ও সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। কোনও একটি সাধনাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘ দিন নিষ্ঠার সঙ্গে লাগিয়া থাকিতে না পারিয়াই এইরূপ বার বার নানা সাধন-পন্থা

গ্রহণ করিয়াছিলেন এমন কথা মনে আসিলে শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্পূর্ণ ভুল বোঝা হইবে। আসলে তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল, পরম সত্য যখন কখনও এক বই দুই হইতে পারে না, তখন দেশে দেশে কালে কালে মানুষের মধ্যে যত সাধক আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের বিভিন্ন পন্থার দ্বারা এক পরম সত্যকেই লাভ করিয়াছেন—উপলব্ধি এবং আস্বাদ করিয়াছেন।......এক সত্যকে বিভিন্ন পন্থায় রস-বৈচিত্রে উপলব্ধি করিবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের এই বিভিন্ন পন্থায় সাধনা। তিনি বার বার বলিয়াছেন—'আমি একঘেয়ে কেন হব?' পূজা, অনুষ্ঠান, কীর্তন সবই চাই। 'শুটকো বৈরাগী' না হইয়া তিনি 'রসে বশে' থাকিতে চাহিয়াছেন। তাই তাঁহার বিচিত্র সাধনা। এ বিচিত্র সাধনার অপর একটি বড় দিক্‌ও ছিল। সব নদীর জলই যে গিয়ে এক সাগরে মেশে—সব দেশের সব রকমের সাধনাই যে এক সত্যকেই নানাভাবে উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে, একথাটা তিনি নিজে সাধনা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছিলেন।......মোটের মাথায় দেখিতে পাইতেছি, লীলারস-আস্বাদনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তিবাদের দিকেই ঝোঁক ছিল। সেই ভক্তি-ভাব হইতেই শক্তি-সাধক হিসাবে তাঁহার সন্তানভাব।"

দক্ষিণেশ্বরে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে (ইং ১লা জানুয়ারী) সাড়ম্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কল্পতরু উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের আয়োজন উপলক্ষে গত ১৭ই পৌষ, ১৩৬৭ সনে যুগান্তর পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি পরিবেশিত হয়ঃ—

দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে অনুষ্ঠান

অদ্য (রবিবার) যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরুরূপে ভক্তগণকে যে কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহারই বার্ষিক স্মৃতি উৎসব দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রত্যুষে -মঙ্গল আরতি, ৬ ঘটিকায় মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন, ৯ ঘটিকায় শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও পূজারম্ভ, ১০ হইতে সাড়ে ১২ ঘটিকা পর্যন্ত ধর্ম-সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত, শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় (গীতরত্ন), মৃদঙ্গ বিশারদ শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান অমলেষ দলুই (বাবুয়া), শ্রীবটুক নন্দী —গীটার, শ্রীপ্রতাপ রায়—সঙ্গীত, সাড়ে ১২ ঘটিকায় ভোগ ও ভোগারতি, ১-২ ঘটিকায়—প্রসাদ বিতরণ, ৩ ঘটিকায়—শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার লীলা সম্বন্ধে আলোচনার্থে ধর্মসভা। উদ্বোধন সঙ্গীত ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতা পাঠ শ্রীপান্নালাল মাইতি, সঙ্গীত সনৎ সিংহ, প্রধান অতিথি শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের ভাষণ, সঙ্গীত—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সভাপতি ডাঃ কালিদাস নাগের ভাষণ। সমাপ্তি সঙ্গীত শ্রীপান্নালাল ভট্টাচার্য, ৬ ঘটিকায় কীর্তন কলানিধি শ্রীরথীন্দ্র নাথ ঘোষ ও তাঁহার সহ শিল্পিগণ কর্তৃক লীলা কীর্তন "শিবশক্তি"।

ইণ্টারন্যাশনাল গেষ্ট হাউসে অনুষ্ঠান

অদ্য রবিবার বৈকাল ৪টায় দক্ষিণেশ্বরের ইণ্টারন্যাশনাল গেষ্ট হাউসে শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলের কল্পতরু উৎসব হইবে। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবেন। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অশোক কুমার সেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন।

রামকৃষ্ণ মঠ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু দিবস স্মরণোপলক্ষে তাঁহার অন্ত্যলীলাস্থল কাশীপুর উদ্যান বাটী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে (৯০, কাশীপুর রোড) ১লা হইতে ৩রা জানুয়ারী তিনদিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে ভক্তিমূলক গীত ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, আধ্যাত্মিক আলোচনা, গীতা, মহাভারত ও উপনিষদের ব্যাখ্যা, রামায়ণ গান ও 'পাণ্ডব গৌরব' অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই উৎসব উদ্‌যাপনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়া ১৮ই পৌষ, ১৩৬৭ সনে 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

যুগাবতার জগৎগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিগত ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী দিবসে কল্পতরুরূপে ভক্তগণকে যে অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহারই স্মরণে রবিবার তাঁহার পুণ্য লীলাভূমি দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে, কাশীপুর উদ্যান বাটীতে, আন্তর্জাতিক অতিথিশালায় এবং আরও কয়েকটি স্থানে কল্পতরু উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ঐসব অনুষ্ঠানে বক্তৃতকালে বিভিন্ন বক্তা হিংসায় উন্মত্ত বিশ্বে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও বাণী অনুধাবন করার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন এবং বলেন যে, ঐ মহাবাণীই মানুষের জীবনে শান্তি ও সান্ত্বনা দিতে পারে।

কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে ঐদিন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে পূজা, হোম, কীর্তন ও ধর্মালোচনা হয় এবং এই উপলক্ষে হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভীড় হয়। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত কাতারে কাতারে আবালবৃদ্ধ নরনারী মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। অপরাহ্নের বারিপাত উৎসবের আনন্দ কিছুটা ম্লান করিয়া দেয় বটে; তথাপি লোকের যেন শেষ নাই। সকালের দিকে মন্দিরের দ্বারপথে জনতার এত ভীড় হয় যে, স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিসের পক্ষে জনতা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। হাজার হাজার লোককে মন্দিরে পূজা দেওয়ার জন্য লাইন দিয়া দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয়। শুধু কলিকাতা ও শহরতলী নহে, দূর দূরান্ত হইতেও অসংখ্য ভক্ত নরনারী পুণ্যতীর্থে সমবেত হইয়া দেবী ভবতারিণীর ও তাঁহার পরম ভক্ত ভগবান রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।

মন্দিরের বাহিরে সংলগ্ন বাগানে বিরাট মেলা বসে। পঞ্চবটীর পার্শে গঙ্গার ধারে ধারে বসিয়া যায় ভক্তের দল। তাহারা ভক্তিমূলক সঙ্গীত করে। ভজন ও কীর্তনের মধুর সুরে মুখরিত হইয়া উঠে গঙ্গার তীর। সারাদিন ধরিয়া চলে এই আনন্দের মেলা।

ধর্মসভার অনুষ্ঠান

অপরাহ্নে ডাঃ কালিদাস নাগের পৌরোহিত্যে মন্দির প্রাঙ্গণে এক ধর্মসভার অধিবেশন হয়। প্রখ্যাত ভক্ত-সাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত উহাতে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ভক্তিমূলক সঙ্গীত করেন। শ্রীপান্নালাল মাইতি একটি স্বরচিত দীর্ঘ কবিতায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ইহা ছাড়া ঐদিন পূর্বাহ্নে শ্রীপ্রতাপ রায়, শ্রীসত্যেশ্বর রায়, শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ধর্মসঙ্গীত করেন।

আন্তর্জাতিক অতিথিশালায়

ঐদিন দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের সভাপতিত্বে কল্পতরু উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব প্রধান অতিথিরূপে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শ্রীরামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী মলিনা মিত্র, শ্রীমতী মায়া মিত্র ও শ্রীমতী শেফালী ঘোষ ভজন ও ধর্মসঙ্গীতাদি করেন।

সভাপতি শ্রী সেন ও প্রধান অতিথি ডঃ মহতাব ভারতের সাংস্কৃতিক ও ধর্মজীবনে যুগাবতার রামকৃষ্ণের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন এবং বর্তমান যুগে তাঁহার জীবন ও বাণী অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন।

কাশীপুর উদ্যান বাটীতেও রবিবার তিনদিবসব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন হয়। সকালের দিকে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে পূজা ও হোম হয়। সারাদিন অগণিত নরনারী ঐখানে গিয়া ঠাকুরের উদ্দেশ্যে ভক্তিবিনম্রচিত্তে তাঁহাদের অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করে।

কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে ১৭ই পৌষ ১৩৬৮ সনে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত আর একটি সংবাদ:

সোমবার দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে প্রায় দুই লক্ষ ভক্ত নরনারীর সমাবেশে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কল্পতরু উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়।

সকালে মঙ্গল আরতি, চণ্ডীপাঠ এবং বিশিষ্ট শিল্পীদের ধর্মসঙ্গীত পরিবেশন এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করে। মন্দিরে পূজা দিবার জন্য এত ভীড় হয় যে, প্রায় পাঁচ হাজার লোকের লাইন পড়িয়া যায়। ভীড়ের চাপ সহ্য করিতে না পারায় অনেককেই পূজা না দিয়াই ফিরিয়া যাইতে হয়। ঐদিন যাত্রীদের সুবিধার জন্য সরকারী বাসের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হয় কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাসগুলি সারাদিন যাত্রী বোঝাই অবস্থায় যাতায়াত করে।

অপরাহ্নে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় পচিশ হাজার নরনারীর সমাবেশে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক কুমার সেন এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত।

শ্রী সেনগুপ্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া বলেন, ঠাকুর সাধারণ লোকের আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাই সংসারী মানুষের চাওয়ার অতিরিক্ত কিছুও দান করিয়াছেন তাহা ভক্তি ও বিশ্বাস। শক্তিমান না হইলে ভক্তিমান হওয়া যায় না। তাই

বিশ্বাস চাই, অন্ধ বিশ্বাস, যে বিশ্বাসের জোর বেশী। শ্রী সেনগুপ্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বাণী বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, যে ব্যক্তি অন্ধ তাহাকে পথ দেখাইবার জন্য আরেক জন আগাইয়া আসে। যেমন ঠাকুরের অন্ধ বিশ্বাসে তিনি কালীর দেখা পাইয়াছিলেন।

শ্রী সেনগুপ্ত আরও বলেন, ঠাকুরের মত মানুষ যাকেই ভালবাসুক সে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা তাহার মধ্যেই ঈশ্বরত্ব আছে। সেখানেই ভক্তি সেখানে আসক্তি। আসক্তি ছাড়া ভক্তি আসে না। ত্যাগের জন্য মানুষের জপতপের প্রয়োজন নাই সংসারের মঙ্গল সাধনের মধ্যেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

সভাপতি শ্রীঅশোক সেন তাহার অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। শ্রী সেন বলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দূরের নয় নিকটের। আমরা যাহারা ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে চাই তাহাদের কর্তব্য হইবে নিজের মধ্যে তাঁর আসনকে সাজাইয়া রাখা।

ধর্মসভার উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীপ্রতাপ রায়। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে শ্রীসনৎ সিংহ এবং নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীপান্নালাল মাইতি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সকালের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কুমারী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, মিনতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সন্ধ্যায় শ্রীরথীন্দ্র নাথ ঘোষ ও তাঁহার সম্প্রদায়ের 'লীলা কীর্তন' পরিবেশিত হয়।

[দক্ষিণেশ্বরের আদ্যাপীঠ সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

আদ্যাপীঠ

চব্বিশ-পরগনা জেলার দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী হইতে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে খাঁড়য়াদহের সন্নিকটবর্তী আদ্যাপীঠ বর্তমানকালে বাংলাদেশের একটি তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ এবং এই স্থানের শ্বেত প্রস্তর নির্মিত মনোরম আদ্যা মায়ের মন্দির একটি অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু। মন্দিরটি নবগঠিত বেলঘরিয়া থানার অন্তর্গত। দক্ষিণেশ্বর রেলস্টেশনে নামিয়া অথবা কলিকাতা হইতে মোটরবাসে এই স্থানে যাতায়াত করিতে পারা যায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধনস্থল দক্ষিণেশ্বর আপন মহিমায় আপনি উজ্জ্বল; তাহার সহিত এই স্থানে আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভক্তজনের নিকট ইহার খ্যাতি বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের নিকট হইতে শ্রীঅন্নদাঠাকুর জীবিতকালে যে-সকল কর্মানুষ্ঠানের স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন তাহাই কার্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও এই সঙ্ঘের মূল কেন্দ্র আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান, ইহার সহিত রামকৃষ্ণ মিশনের কোন যোগাযোগ নাই।

শ্রীঅন্নদাঠাকুরের আদি নিবাস পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম জেলায়। ছাত্রজীবনে তিনি কলিকাতা হইতে আয়ুর্বেদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করিতে মনস্থ করেন। এই সময় তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণ কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া আধ্যাত্ম সাধন জীবনে প্রবেশ করেন এবং কলিকাতার ইডেন গার্ডেন হইতে আদ্যা মূর্তি প্রাপ্ত হন ও উত্তর ভারতের বিখ্যাত লছমনঝোলা স্বর্গাশ্রমে উপস্থিত হইয়া একদা ঝুলনপূর্ণিমা নিশিতে এক বিচিত্র মন্দির নির্মাণের আদেশ পান। তদনুসারেই আদ্যাপীঠ মন্দির বর্তমানরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

কালীঘাটের নকুলেশ্বর শিবের মন্দির হইতে দক্ষিণেশ্বরের শিবমন্দিরের অন্তর্বর্তী ভাগীরথীর তীরে কোন স্থলে এই মন্দির প্রতিষ্ঠার নির্দেশ ছিল। তদনুসারে বহু অনুসন্ধানের পর ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে সঙ্ঘমঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য এই স্থানে প্রথম ৫ বিঘা এবং পরে আরও ২২ বিঘা অর্থাৎ মোট ২৭ বিঘা জমি স্থানীয় চট্টোপাধ্যায় ও রায়চৌধুরীদিগের নিকট হইতে ক্রয় করা হয়। ইহার প্রায় ৭ বৎসর পর ১৩৪০ বঙ্গাব্দে সর্বসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতায় উদ্দিষ্ট আদ্যাপীঠ মন্দির নির্মাণ কার্য শুরু হয় এবং দীর্ঘ ৩৩ বৎসর ধরিয়া সুনিপুণ শিল্পীদের কর্ম কুশলতায় তিলে তিলে এই সুবিশাল দেবসৌধ গঠিত হইয়া বর্তমান

কলেবর ধারণ করে। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে এই মন্দির নির্মাণ কার্য সুসম্পন্ন হয় এবং ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটিত হয়। মন্দির নির্মাণ কার্যে প্রধান স্থপতি ছিলেন শ্রী এ, কে, দত্ত; মূলতঃ তিনি ইষ্টক দ্বারা মন্দির নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করেন এবং স্থপতি শ্রীগোপেন সরকার উহার সম্পূর্ণ বহির্গাত্র ৩" পুরু শ্বেত প্রস্তর দ্বারা শ্রীমণ্ডিত করেন। মঠ এলাকার মধ্যস্থলে প্রায় ১০ কাঠা জমি জুড়িয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৯ ফুট উচ্চ চত্বরের উপর প্রায় ৯৬ ফুট উচ্চ দক্ষিণমুখী এই সুবিশাল মন্দির নির্মাণের জন্য অদ্যাবধি প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। মন্দিরের জন্য প্রয়োজনীয় শ্বেত প্রস্তর যোধপুর হইতে সংগ্রহ করা হয়। আদ্যাপীঠের মন্দিরটি বাস্তবিকই মন্দির স্থাপত্যের এক নূতন আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের দেবমন্দিরাদির মধ্যে আদ্যাপীঠের মন্দির একটি বিরল দৃষ্টান্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন সামনাসামনি পরপর তিনটি মন্দির দাঁড়াইয়া আছে এবং সর্বপশ্চাতে দণ্ডায়মান বৃহৎ মন্দিরটির মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্রমান্বয়ে ছোট আরও দুইটি মন্দিরের কিয়দংশ পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মন্দির তিনটির চূড়া ধাপে ধাপে নামিয়াছে এবং প্রতিটি চূড়ার আবার অর্ধবৃত্তাকার তিনটি স্তর ক্রমান্বয়ে স্থূল হইতে হ্রস্বাকৃতি প্রাপ্ত হইয়া উপরের দিকে উঠিয়াছে। মন্দিরাভ্যন্তরে শ্বেত প্রস্তর নির্মিত কারুকার্য খচিত ত্রিস্তর বিশিষ্ট বেদীর প্রথম স্তরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের উপবিষ্ট মূর্তির পদতলে বেদীগাত্রে লিখিত আছে 'গুরু', দ্বিতীয় স্তরে পদ্ম আসনের উপর শায়িত শবরূপী শিবের বক্ষস্থলে দণ্ডায়মান অষ্টধাতু নির্মিত আদ্যামূর্তি—বেদীগাত্রের উভয় পার্শ্বে লিখিত আছে 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি' এবং সর্বোচ্চ স্তরে প্রণব মধ্যস্থ রাধাকৃষ্ণের আলিঙ্গনবদ্ধ যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। কেবল মন্দির স্থাপত্যেই নহে মূর্তি পরিকল্পনারও এইরূপ অভিনবত্ব অন্য কোথাও বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

সম্মুখভাগে মন্দিরের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া সুপ্রশস্ত দ্বিতল 'দর্শন মণ্ডপ' আছে, এই মণ্ডপের সোপান ও মেঝে শ্বেত প্রস্তর মণ্ডিত। দর্শন মণ্ডপ হইতে ভক্ত নরনারী অনায়াসেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ত্রিমূর্তি দর্শন করিতে পারেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সেবায়েত ও পূজারী ভিন্ন অন্য কাহাকেও মূল মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। সকলকেই দর্শন মণ্ডপ হইতে মূর্তি দর্শন করিতে হয়। অর্থাভাবের জন্য অদ্যাপি নাটমন্দির নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই; তবে শীঘ্রই উহার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইবে বলিয়া সঙ্ঘ পরিচালকগণ আশা পোষণ করেন।

প্রতিদিন সূর্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে মঙ্গলারতি, মধ্যাহ্নে সাড়ে দশ ঘটিকায় ভোগারতি এবং সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে শীতলারতি অনুষ্ঠিত হয়। ভোরে ও মধ্যাহ্নে প্রায় অর্ধ ঘণ্টা এবং সন্ধ্যাকালে প্রায় ২০ মিনিট ব্যাপী আরতি হইয়া থাকে। কেবলমাত্র এই আরতির সময়ই মন্দিরের দ্বার সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য খোলা থাকে; অন্য সময়ে মন্দিরদ্বার বন্ধ রাখিয়া পূজাদি সম্পন্ন হয়। ইহা ছাড়া, প্রতি মাসে শুক্লপক্ষের নবমী, কৃষ্ণপক্ষের একাদশী ও সংক্রান্তি ৩ দিন করিয়া বার মাসে ৩৬ দিন; শারদীয়া ও বাসন্তী পূজার সপ্তমী, অষ্টমী ও দশমী তিনদিন করিয়া ৬ দিন; ঝুলনপূর্ণিমা, লক্ষ্মীপূর্ণিমা, রাসপূর্ণিমা ও দোলপূর্ণিমা ৪ দিন; মহালয়া ও দীপান্বিতা অমাবস্যায় ২ দিন; জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমী ২ দিন; শ্রীপঞ্চমী ও নাগপঞ্চমী ২ দিন—মোট ৫২ দিন ভোরে মঙ্গলারতির সময় হইতে বেলা ১২টা পর্যন্ত ও অপরাহ্ণ ৩টা হইতে শীতলারতি পর্যন্ত মন্দিরদ্বার খোলা থাকে।

আদ্যাপীঠে অনুষ্ঠিত উৎসবাদির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য সিদ্ধোৎসব ও মন্দির প্রতিষ্ঠা পর দিবস। বিশ বৎসর যাবত সাধনার শেষে অন্নদাঠাকুর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে সিদ্ধিলাভ করেন এবং এই তিথিতেই মন্দিরে আদ্যা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তদুপলক্ষে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে আদ্যাপীঠে বিশেষ সমারোহের সহিত পূজাপাঠ, আদ্যামায়ের পুষ্পমাল্য শোভিত প্রতিকৃতি সহ নগর কীর্তন, ভোগ বিতরণ এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত নানারূপ ধর্মমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। উৎসবটি বাংলা ১৩২৭ সন হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এইদিন আদ্যাপীঠে প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং মন্দির প্রাঙ্গণে ও সম্মুখস্থ রাস্তার দুই ধারে মেলার দোকানপাট বসে। আদ্যাপীঠে সিদ্ধোৎসব সম্পর্কে ৫।১।৬০

তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়।

"আদ্যাপীঠের উনচত্বারিংশ সিদ্ধোৎসব উপলক্ষে গত ১৭ই জানুয়ারী অতি প্রত্যুষ হইতে বহু যাত্রী ভক্ত সমাগমে, সাধন-সঙ্গীতে, পূজার পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণে দক্ষিণেশ্বর মুখর হয়ে উঠে। বৈকাল ৪টায় ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর পৌরোহিত্যে এক ধর্মসভা হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বিচারপতি শ্রীনির্মল চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় গীতা, ভাগবত, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সাকার উপাসনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন।

এই উপলক্ষে মায়াপুরী নাট্য সমাজ কর্তৃক 'উত্তরা' গীতাভিনয়, শ্রীশ্রীমাতৃনাম কীর্তন সমিতি কর্তৃক 'মহিষমর্দিনী' কীর্তন, শ্রীশ্রীআদ্যামায়ের সুশোভিত প্রতিকৃতি সহ নগর-সংকীর্তন, হাওড়া মায়ের মন্দির কর্তৃক 'সাধক রামপ্রসাদ' শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুরের জীবনী অবলম্বনে ও তদীয় রচিত সঙ্গীতাবলী সমন্বয়ে শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী সম্পাদিত কথা ও গান, শ্রীভোলানাথ নিয়োগী সম্প্রদায় কর্তৃক লীলা-কীর্তন, মায়াপুরী নাট্য সমাজ কর্তৃক শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর রচিত 'মিবার লক্ষ্মী' গীতাভিনয়, এই সকল অনুষ্ঠানগুলি ভক্তহৃদয়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।"

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র মাসের রামনবমী তিথিতে। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅন্নদাঠাকুর এই তিথিতেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের আদেশ অনুসরণ করিয়া বাংলা ১৩২১ সনে ইডেন গার্ডেনের ঝিল হইতে আদ্যাকালীর মূর্তি প্রাপ্ত হন এবং সেই রাত্রেই মায়ের যথারীতি পূজার পর উক্ত মূর্তি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দেন। এই পুণ্য তিথি স্মরণে প্রতি বৎসর আদ্যাপীঠে যথারীতি পূজার সঙ্গে প্রায় অর্ধ শতাধিক কুমারী পূজা ও সহস্রাধিক কুমার ভোজন করান হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইডেন গার্ডেনের ঝিল হইতে প্রাপ্ত মূর্তির অনুরূপ আদ্যামায়ের মূর্তিই বর্তমানে আদ্যাপীঠে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ঝুলনপূর্ণিমায় শ্রীঅন্নদাঠাকুর মন্দির নির্মাণের প্রত্যাদেশ পান এবং মাঘীপূর্ণিমায় শ্রীঅন্নদাঠাকুরের মস্তক হইতে নামান জটাভার তাম্রপাত্রে স্থাপন করতঃ আদ্যাপীঠের ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া তদুপরি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তদুপলক্ষে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের ঝুলনপূর্ণিমা ও মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে আদ্যাপীঠে সমারোহের সহিত উৎসব পালন করা হয়।

ইহা ভিন্ন, প্রতি বৎসর শারদীয়া মহাষ্টমী তিথিতে ও কার্তিকী অমাবস্যায় আদ্যাকালীর বিশেষ পূজা এবং কার্তিকী পূর্ণিমার পরবর্তী সপ্তমী তিথির পর যে রবিবার পড়ে সেইদিন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅন্নদাঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে নানাস্থান হইতে প্রায় চল্লিশ হাজার নরনারী আসেন এবং শ্রীঅন্নদাঠাকুরের সুশোভিত প্রতিকৃতি সহ নগর পরিক্রমায় শোভাযাত্রা বাহির হয় এবং পূজা প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসে।

আদ্যাপীঠে নিত্য পূজাও ঢাক-ঢোলের বাদ্যসহ বেশ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। স্বপ্নাদেশ অনুসারে প্রতিদিন সাড়ে বার সের, সাড়ে বাইশ সের ও বত্রিশ সের চাউলের অন্ন যথাযোগ্য পঞ্চব্যঞ্জনাদিসহ ত্রিমূর্তির উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করা হয়। মন্দিরে নিত্য চণ্ডীপাঠ ও হোম হয় এবং প্রতিদিন ন্যূনপক্ষে পঞ্চাশ জন দরিদ্রনারায়ণ সেবা করান হয়।

ইহা ব্যতীত, আদ্যামন্দিরের পশ্চিম দিকে উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃত ছয়টি আটচালা শিবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের নিত্য পূজা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব এবং সত্যনারায়ণ-জীউর ঘরে নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি মাসের পূর্ণিমায় ও সংক্রান্তি তিথিতে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা পাঠের ব্যবস্থা আছে। উল্লিখিত শিবমন্দিরগুলি আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার পূর্ব হইতেই এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল; যতদূর জানা যায় শিবমন্দিরগুলি স্থানীয় চৌধুরী পরিবারের লোকজন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এক স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া এই প্রাচীন, পরিত্যক্ত ও জীর্ণ মন্দিরগুলি সঙ্ঘকর্মী আনন্দভাই নাম মাত্র মূল্যে ক্রয় করিয়া সংস্কার করান ও যথারীতি নিত্য পূজা ও উৎসবের আয়োজন করেন।

দেব পূজাদি ব্যতীত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্তৃক নানারূপ সমাজকল্যাণমূলক কার্য সম্পাদিত হয়। উহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দক্ষিণেশ্বর বালিকা আশ্রম' ও উহার অন্তর্গত সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাংলা ১৩৩১ সনে শ্রীঅন্নদাঠাকুর অনাথা বালিকাদের আশ্রয়দান এবং প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে তাহাদের জীবন

গড়িয়া তুলিবার জন্য হুগলী জেলার ভদ্রকালীতে এই বালিকা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা এই মঠে স্থানান্তরিত হয়।

দ্বিতীয়, পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকদিগের আশ্রয় ও শিক্ষাদানের জন্য সঙ্ঘকর্মী ব্রহ্মচারী সুধীর ভাইয়ের উদ্যোগে এই স্থানে একটি বালক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তৃতীয়, সঙ্ঘজননী মণিকুন্তলা দেবীর স্মৃতি স্মরণে এই মঠ এলাকায় একটি মাতৃ আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। এই আশ্রমে স্বামীপুত্রহীনা অনাথা মহিলাদিগকে আশ্রয় দেওয়া হয়।

ইহা ভিন্ন, এই সঙ্ঘের অধীনে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে এবং একটি বানপ্রস্থ আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সঙ্ঘের কর্মসূচীর মধ্যে নির্দিষ্ট আছে। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিমধ্যেই গৃহাদি ক্রয় করা হইয়াছে এবং দাতব্য চিকিৎসালয়টিকে সংক্রামক ব্যাধি নিরাময়ের একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে সঙ্ঘ-কর্মীগণ সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

আদ্যাপীঠে সেবায়েত ও পূজারী হিসাবে নির্দিষ্ট কর্মী ভিন্ন আরও প্রায় ১৫-২০ জন কর্মী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেব সেবার কাজে নিযুক্ত আছেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বেতনভুক্ কর্মীও আছেন। এই বৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটি প্রধানতঃ ভক্ত ও অনুরাগীদের সাহায্য ও সহযোগিতায় পরিচালিত হইতেছে। সঙ্ঘের নামে বর্ধমান জেলার মশাগড়িয়া গ্রামে প্রায় ৭৫ বিঘা দেবোত্তর জমি আছে এবং নদীয়া জেলার বাদকুল্লায় একটি কৃষি কেন্দ্র আছে। এই কৃষি কেন্দ্র দুইটি সঙ্ঘকর্মী দ্বারা পরিচালিত হয় এবং উহার যাবতীয় আয় আদ্যাপীঠের দেব সেবায় ব্যয় করা হয়।

(আদ্যাপীঠ সম্পর্কে উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহের কার্যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ব্রহ্মচারী সিদ্ধেশ্বর ভাই বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।)



থানা ঃ বেহালা

[বড়িশার চণ্ডীর মেলা সম্পর্কে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬১ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকায় বজ্রমিত্রের লিখিত একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় ; নিম্নে উহা উদ্ধৃত করা হইল।]

বড়িশার চণ্ডীর মেলা

ঢোল, কাঁশি, বাঁশীর সঙ্গে এখনও পুতুলনাচের আসর জ'মছে। আর জ'মছে তর্জা গানের আসর। আসরের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত বসে লোক। আপাদমস্তক চাদরে মুড়ে ঘেঁষা-ঘেঁষি হ'য়ে ব'সে শীতের রাত্তিরটা তাদের নিমেষের মধ্যে যেন কেটে যায় আড়াআড়ি তর্জার আসরে।

আধুনিক কালের সাংস্কৃতিক আমদানী বিচিত্রানুষ্ঠান। তার আয়োজন বাদ দিলে তো আজকালকার কোনও উৎসবই উৎসব নয়। এই বিচিত্রানুষ্ঠানের আসরেই তো সবচেয়ে বেশী ভীড়। সুতরাং তারও আয়োজন আছে। ফিল্মের প্লে-ব্যাক গাইয়েরা এসে এ-আসর জমান। তাঁদের কণ্ঠে আধুনিক প্রেমসঙ্গীতের কাতর আর্তি থেকে সুরু ক'রে ভক্তিমূলক গানের গদগদ আকুতি কিছুই বাদ যায় না। মুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর সে-গানে কখনও তৃষ্ণা মেটে না। এক গান শেষ হ'তে না হ'তেই আর একটি গানের ফরমাস রাখতে নোটেব্‌ল সিঙ্গারদের প্রাণান্ত হবার জোগাড় আর কী। তাছাড়া আজকাল "কীর্তনকলানিধিদের" ছড়াছড়ি। তাঁরাও এসে পদাবলীর আসর জমান। আর আসর জমান – ইণ্টারন্যাশানাল ওয়ার্ল্ড বেঙ্গলী ফোক মিউজিকের ধ্বজা ওড়ানো নোটেব্‌ল্ আর্টিষ্টরা। ফ্লোরেসেণ্ট আলোয় আলোকার, ডেকোরেটারদের বিচিত্র কাপড়ে সাজানো মঞ্চের মাঝখানে ব'সে তাঁরা "ও বিদেশী বন্ধুরে—নাও বাইয়া যাও কোথাও, পান খাইয়া যাও" কিংবা "আমার যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল ভিজাবো না" বলে গান ধরেন। লোকের ভীড় ভেঙে পড়ে এই পল্লীগানের আসরে।

ক'লকাতার উপকণ্ঠবর্তী বড়িশায় বার্ষিক চণ্ডীপূজা উপলক্ষে যে-সমস্ত লোকরঞ্জনকারী আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়, এগুলি তারই নমুনা। বড়িশা ক'লকাতা কর্পোরেশনের এক্তিয়ারের বাইরে। এখনও এখানকার পল্লীতে পল্লীতে চলতে পুকুর, বাগান, মেঠো পথ, এন্তার ঝোপ-জঙ্গল নজরে পড়ে। আবার হরদম যানবাহনের সংযোগে ক'লকাতার লাগোয়া এই জনপদ জনবহুলও। অনেক ঘরবাড়ী, ইলেকট্রিক আলো, কলের জল, সিনেমা, ইস্কুল, কলেজে এর শহুরে চেহারাও কলকাতার সঙ্গে নিকট সম্পর্ক জানিয়ে দিচ্ছে। তাই এর উৎসবসূচীতে গ্রামীণ পুতুলনাচ, তর্জা গান ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে শহুরে আবহাওয়ার বিচিত্রানুষ্ঠানও এসে ঢুকেছে।

ক'লকাতার আদিপর্বে বড়িশা

বড়িশা, চলিত কথায় ব'ড়শে বা বঁড়শে ক'লকাতা কর্পোরেশনের এলাকার বাইরে হ'লেও ক'লকাতারই অঙ্গ ব'লতে হয় তাকে। সুধু এ-কালেই নয়, প্রায় পৌনে তিনশো বছর আগে ইংরেজরা যখন ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে ক'লকাতায় এসে সাম্রাজ্যের পাকাপোক্ত গাঁথুনি সুরু ক'রেছিল, সেই আমল থেকেই বড়িশা ক'লকাতার সঙ্গে মাখামাখি হ'য়ে আছে। আজ থেকে ২৬৩ বছর আগে, ইংরেজী ১৬৯৮ সালের ১০ই নভেম্বর তারিখে ইংরেজরা এই বড়িশার জায়গীরদার সাবর্ণ-চৌধুরীদের বংশের কয়েক-জনের কাছ থেকে সুতাহুটি, ক'লকাতা আর গোবিন্দপুর—এই মৌজা তিনটি কিনে নিয়েছিল, মাত্র তেরোশো টাকায়। বন-বাদাড়ে গ্রাম ক'লকাতার ভোল ফিরিয়ে আধুনিক শহর ক'লকাতার চেহারা এনে দিয়েছে ইংরেজরাই—নিজেদেরই স্বার্থে অবশ্য। শহর ক'লকাতার ইতিহাসের আদিপর্বে সাবর্ণ-চৌধুরীদের মারফত বড়িশা তাই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে রইলো। সাবর্ণ-চৌধুরীদের সেই বিক্রয়-কোবালা আজও লণ্ডনে বৃটিশ মিউজিয়ামে র'য়েছে। সাবর্ণ-চৌধুরীদের বংশধররা শাখায়-প্রশাখায় বিভক্ত হ'য়ে অনেক বাড়ীঘর তৈরী ক'রে আজও বড়িশায় বাস ক'রছেন। বড়িশায় এখন তিনশো-সাড়ে

তিনশো সাবর্ণ-চৌধুরী পরিবার আছেন। বিচিত্র তাঁদের পরিবারের কিংবা বাড়ীর নাম; যেমন, মহেশ চৌধুরীর বাড়ী, মাঝের বাড়ী, সাঁঝের আটচালা, বড়বাড়ী, বেনাকী বাড়ী, নতুন বাড়ী ইত্যাদি। সাঁঝের আটচালার দুর্গা-মণ্ডপেই ব'সে নাকি ইংরেজদের সঙ্গে সাবর্ণ-চৌধুরীদের সুতানুটি, ক'লকাতা, গোবিন্দপুর কেনার কথাবার্তা আর বিক্রয়ের দলিল স্বাক্ষরিত হ'য়েছিল। আটচালায় ঢাকা সে দুর্গামণ্ডপের চেহারা আজ অন্যরকমের। আটচালা অন্তর্হিত। তার জায়গায় অন্যধরণের ছাদ। কিন্তু এখনও মণ্ডপটির নাম আটচালা। এর সামনের ছাদ ধ্বসেপড়া নাটমন্দিরের থামগুলোর কয়েকটা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। কয়েকটা জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরও মাটিতে গড়াগড়ি দিতে বোধহয় বেশী দেরী নেই। সেই দুর্গামণ্ডপে সাঁঝের আটচালা বাড়ীর দুর্গোৎসব আজও হয়, ভাঙা নাটমন্দিরে পাঠা আর মোষ বলি পড়ে। বৃটিশ মিউজিয়ামের বিক্রয়-কোবালা আর এই চণ্ডীমণ্ডপ ভারতে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদের আসর-সাজানোর দুটি মূক সাক্ষী হ'য়ে আছে।

চণ্ডীর মাঠে মেলা

এই আটচালারই অদূরে বড়িশার চণ্ডীর মাঠে চণ্ডীদেবীর বার্ষিক পূজোৎসব হয় অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা অষ্টমী আর নবমী তিথিতে। পূজা ছাড়া পুতুল নাচ, যাত্রা, কীর্তন, তর্জা, আর আধুনিককালের বিচিত্র সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর্ব চলে দিন সাতেক ধ'রে। তার সঙ্গে মেলা—বাঙলার বার্ষিক পল্লী উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ। দোকান-পাট ব'সে যায় পাশাপাশি, পূজামণ্ডপের চারধারে। বেহালা, বড়িশা প্রভৃতির সংলগ্ন ২৪-পরগণার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আজও আসে কামার, কুমোর, প্রভৃতি গ্রামীণ-শিল্পীরা, মাটির হাঁড়িকুঁড়ি, পুতুল খেলনা, বঁটি, কাটারি, কড়া, খুন্তির স্তূপ নিয়ে। তাছাড়া মনিহারি দোকানও ব'সে যায়। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল খেলনা বিক্রি করতেও অনেকে আসে। তেলেভাজা বেগুনি, পাঁপর, ঘুগনি চা-এর দোকানগুলি যথারীতি জমজমাট হয়। নাগরদোলা, আর ম্যাজিকের তাঁবুতেও বড়িশার চণ্ডীর মেলা দিন সাতেক গুলজার হ'য়ে থাকে। বড়িশার আশে-পাশে গ্রামগুলো থেকে লোক আসে মেলায়, ক'লকাতা থেকেও অনেকে যায়। সুতরাং ক'লকাতার অদূরবর্তী বড়িশার চণ্ডীপূজার মেলা ভালই জমে প্রতি বৎসরে। এটিই এ-অঞ্চলের একটি বৃহত্তম মেলা।

চণ্ডীদেবীর বার্ষিক পূজাটির আয়োজনও বেশ পুরনো। ১৬৯ বছর ধ'রে এই পূজাটি হ'য়ে আসছে।

বার্ষিক পূজার মৃন্ময়মূর্তি

বার্ষিক পূজা উপলক্ষে পূজা-মণ্ডপে দেবী চণ্ডীর একটি মৃন্ময়মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবী চতুর্ভুজা, ত্রিনয়নী, রক্তবর্ণা, রক্তবসনা। পাঁচটি নর-মুণ্ডের আসনে দেবী ব'সে আছেন। তাঁর গলায় নর-মুণ্ডের মালা। চার হাতে জপমালা, পুস্তক, বর আর অভয় মুদ্রা। চন্দ্রকলা তাঁর মুকুটে সংন্যস্ত। মূর্তির গড়নে, অলঙ্করণে অবশ্য প্রাচীন সাবেকী রীতির বদলে আধুনিক রীতিরই অনুপ্রবেশ ঘ'টেছে।

সপ্তমী আর অষ্টমীতে দু-দিন ধ'রে ষোড়শোপচারে পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, বলিদান ইত্যাদি পর্ব যথারীতি চলার পর দশমীতে দেবীর ঘট-বিসর্জন হয়। দিন সাতেক পরে, খুব ধুমধামে মূর্তিটি আদি গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়।

সত্যাগ্রহে মোষবলি বন্ধ

আগে আগে মোষবলিও পড়ত। ছোটখাট নয়, একটি বিশালকায় বলিষ্ঠ মোষ। এক কোপেই বলিদানের শাস্ত্রীয় বিধি এবং সেই বিধির তিলমাত্র ত্রুটি হ'লে তাকে ভয়ানক অশুভের ইঙ্গিতবাহী ব'লে শাস্ত্রও অভিহিত ক'রেছে। কিন্তু বড়িশার বলিপর্বে বিশালকায় মোষটাকে ৫০।৬০ কোপ দিয়ে কাটা হ'ত। মোষবলি বাংলার গ্রামীণ শক্তি-পূজায় ও উৎসবে একটি বহুল-প্রচলিত কৃত্য। অর্থনৈতিক অবনতিতে বাঙলার গ্রামীণ-উৎসবের অনুষ্ঠানের মধ্যে নানা অঙ্গের কাটাই-ছাঁটাই হ'য়েছে। অনেক জায়গায় মোষবলি অনুষ্ঠানের পাটও সেইভাবেই উঠে গেছে। ভালই হ'য়েছে। বলিষ্ঠ একটা মোষকে বলি দিয়ে লোপাট করার চাইতে গাড়ী-লাঙল টানানো ইত্যাদি কাজেই জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহারই হয়। রুচির পরিবর্তনেরও কথা আছে। বলি-অনুষ্ঠানের পিছনে

আদিম জাদুভিত্তিক আচার অনুষ্ঠানের দূরাগত সূত্র যতই লুকিয়ে থাকুক না কেন, এবং এর ওপরে শাস্ত্রীয় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যতই আরোপিত হোক না কেন, আধুনিক সমাজে এ তাৎপর্যহীনই বটে। এই বীভৎস অনুষ্ঠানের পিছনে তাই জনসমর্থন ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে। বড়িশায় মোষবলির প্রথাও এইভাবেই কয়েক বছর আগে উঠে গেছে শুনলুম। সাবর্ণ-চৌধুরী বংশেরই এক দয়া-প্রবণ যুবকের সত্যাগ্রহের ফলে বড়িশার চণ্ডীদেবীর বার্ষিক উৎসবে মোষবলি প্রথা বর্জিত হ'য়েছে।

বড়িশার এই বার্ষিক উৎসবটির সূচনাকারীরূপে সাবর্ণ-চৌধুরী বংশের মহেশ চন্দ্র রায়চৌধুরীর নাম উল্লিখিত হয়। ইনি সাবর্ণ-চৌধুরী বংশের প্রখ্যাত পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার থেকে অধস্তন নবম পুরুষ। লক্ষ্মীকান্ত মোগল আমলে বড়িশা প্রভৃতি গ্রামের জায়গীরদারী পেয়েছিলেন। বাঙলাদেশে আদিশূরের আনিত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে সাবর্ণ-গোত্রের বেদগর্ভই লক্ষ্মীকান্তের পূর্বপুরুষ। লক্ষ্মীকান্তের বংশে অধস্তন চতুর্থ পুরুষ কেশবরাম নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে রাজস্ব আদায়কারীরূপে যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে রায়চৌধুরী উপাধি আর অনেক জায়গীরদারী পেয়েছিলেন। সেই থেকে বড়িশার সাবর্ণগোত্রভুক্ত ব্রাহ্মণরা সাবর্ণ-চৌধুরী ব'লে পরিচিত। অর্থে, প্রতিপত্তিতে বাঙলাদেশের প্রাচীন ভূস্বামীদের মধ্যে এঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন ক'রেছিলেন। ক'লকাতার আদিপর্বে কালীঘাটের মন্দির তৈরীতে, সেখানকার সেবাইত ব্রাহ্মণদের ভূমিদানে, নানা ধর্মক্রিয়ায় এঁদের চাঁদা ও অর্থব্যয়ের অনেক ইতিহাস আছে। পুরনো তায়দাদ ইত্যাদি ঘাঁটলে দান-ধ্যানের অনেক পরিচয় মেলে। ইংরেজরা এঁদের সুতানুটি, ক'লকাতা, গোবিন্দপুর—এই মৌজা তিনটি কিনলেও, এর পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হ'তে পারে নি। সাবর্ণ-চৌধুরীদের আর তাঁদের প্রজাদের মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগীরূপেই তারা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় ক'রত আর সাবর্ণ-চৌধুরীদের সেরেস্তায় বার্ষিক ১২৮১ টাকা ১৪ আনা নিজেদের মালগুজারি দিত। পলাশীর যুদ্ধের সময় পর্যন্ত ইংরেজরা সাবর্ণ-চৌধুরীদের এই মালগুজারি দিয়ে এসেছে। তারপরই ইংরেজরা এদেশে সমস্ত আধিপত্য কায়েম ক'রে আর সাবর্ণ-চৌধুরীদের সেরেস্তার দোর মাড়ায় নি।

আভিজাত্যের আঘাতে উৎসব সুরু

এই সাবর্ণ-চৌধুরী বংশের মহেশচন্দ্র রায়চৌধুরী আজ থেকে ১৬৯ বৎসর আগে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বড়িশার চণ্ডীদেবীর বার্ষিক উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন। এই উৎসবপ্রবর্তনের মূলে নাকি ছিল তাঁর আভিজাত্যের ওপরে আঘাত। পাশের সরশুনা গ্রামের এক জমিদারের আয়োজিত এক উৎসবে আমন্ত্রিত হ'য়ে তিনি নাকি যথোচিত মর্যাদা পান নি। আহত মহেশচন্দ্র সেই জমিদারকে শিক্ষা দেবার জন্যে এই উৎসবের প্রবর্তন ক'রেছিলেন আর দু-হাতে টাকা খরচ ক'রে অভ্যাগত আমন্ত্রিতদের এমন সংবর্ধনা ক'রেছিলেন যে, শুধু বড়িশায় নয়, সেদিনকার ক'লকাতার উঠতি জমিদার মহলেও খুব হৈ-চৈ প'ড়ে গিয়েছিল। ২৪-পরগণার গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা ছড়িয়ে প'ড়েছিল। সেদিনকার বড়লোকদের পূজো-পার্বণ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার রেওয়াজ ছিল। অঢেল হাতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দান, কাঙালী-খাওয়ানো, নাচ গান, যাত্রা, পুতুল নাচ, কীর্তন—লোকসমাজে সেদিনকার প্রচলিত সবরকম আনন্দ-অনুষ্ঠানের আয়োজনে গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ ভীড় করতো বড়িশায়। মহেশচন্দ্রের পরে তাঁর পুত্র হরিশচন্দ্রও এই উৎসব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কালক্রমে উৎসবটি পারিবারিক গণ্ডী উত্তীর্ণ হ'য়ে বারোয়ারীতে পরিণত হয়েছে। বড়িশার দেবী চণ্ডী আর কেবলমাত্র সাবর্ণ-চৌধুরীদেরই পারিবারিক দেবতা নন, বড়িশার সমস্ত অধিবাসীদেরই গ্রামদেবীতে পরিণত হ'য়েছেন এবং গ্রামদেবীর বার্ষিক উৎসবে প্রাপ্য মানসিক পুজা-অর্চনাদি লাভ ক'রছেন। সেইজন্যে সেখানকার বার্ষিক চণ্ডীপূজায় এত ধুমধাম, এত ভীড়।

মহেশচন্দ্র আর তাঁর পুত্র হরিশচন্দ্রের নামে দেবী চণ্ডীকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তীও শোনা যায়। চণ্ডীর মাঠের পুকুর থেকে একটি তামার ঘট পাওয়া যায়। দেবী চণ্ডী নাকি স্বপ্নে জানান, তিনি ঐ ঘটে অধিষ্ঠিত আছেন। মহেশচন্দ্রের বাড়ীতে ঐ ঘট আজও পূজিত হ'চ্ছে এবং বার্ষিক পূজার আগে, ঐ ঘটের পূজা আগে হয়। হরিশচন্দ্র সাধক ছিলেন। তিনি নিজের বাড়ীতে দুর্গোৎসবের আয়োজন ক'রতেন। দেবী দুর্গা নাকি ঝমঝম ক'রে নূপুর বাজিয়ে তাঁর সারা বাড়ীখানা ঘুরে বেড়াতেন।

উল্লিখিত উৎসবের আয়োজন উপলক্ষে গত ১৯শে কার্তিক ১৩৬৭ সনে যুগান্তর পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি পরিবেশিত হয় :

বড়িশার মেলা ও প্রদর্শনী

বড়িশার (কলিকাতা—৮) প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রী৺চণ্ডীমাতার ১৬৮তম পূজোৎসব, মেলা ও প্রদর্শনী আগামী ২৫শে নভেম্বর হইতে ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থানীয় চণ্ডীমাঠে অনুষ্ঠিত হইবে। বাংলা ১২০০ সাল হইতে এই পূজোৎসব প্রতি বৎসর মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। কলিকাতার দক্ষিণে ইহাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য পূজা ও প্রদর্শনী।

প্রদর্শনীতে কলিকাতার বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী অংশ গ্রহণ করেন। কারণ, এই উৎসবে প্রতিদিন প্রায় ২৫।৩০ হাজার নরনারী বহু দূর দূরান্তর হইতে সমবেত হন। স্টলের জন্য প্রদর্শনী সম্পাদক, ১০নং কে, কে, রায়চৌধুরী রোড, বড়িশা, কলিকাতা—৮ ঠিকানায় এখনি যোগাযোগ করিতে হইবে।



থানা ঃ মহেশতলা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ বাগ পোতা। ৩৯:১২১.৩৯।১১৪।৭১৯

(ক) কাওরা, প্রামানিক, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, রাজবংশী। প্রামানিকপাড়া, রাজবংশীপাড়া, সর্দারপাড়া, ইত্যাদি নামে গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) কলিকাতা হইতে মোটরবাসে বেহালা-সরসুনা হইতে যাদব ঘোষ লেন দিয়া যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে গোষ্ঠপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে মঙ্গলচণ্ডীপূজা, ১লা মাঘ দক্ষিণদরপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া প্রতি বৎসর শীতলাপূজা হয়। মঙ্গলচণ্ডীপূজাটি মাত্র পাঁচ বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য উৎসবগুলি বহু প্রাচীন।

(ঙ) গোষ্ঠপূজার মেলা। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে তিনদিন। বহু প্রাচীন।

চণ্ডীপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার। মাত্র পাঁচ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

সরস্বতী পূজার মেলা। মাঘ মাসে দুইদিন। বহু প্রাচীন।

গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে পাঁচদিনব্যাপী। বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কয়েকটি শীতলা মন্দির আছে।

শ্রীবিনয় কুমার সাহা,
গ্রাম ঃ বাগ পোতা, পোঃ বড়িশা,
২৪-পরগণা।

মেলা বিবরণী

গোষ্ঠপূজার মেলা

বাগ পোতা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গোষ্ঠপূজা উপলক্ষে স্থানীয় মিলন সঙ্ঘের মাঠে এবং বাগ পোতা বড়ঠাকুরতলা সংলগ্ন দেবোত্তর জমিতে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন এবং সাধারণতঃ বিকালের দিকেই লোকসমাগম হয়। আশপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে মোট প্রায় দুই হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

মেলার প্রায় চল্লিশটি দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত মনিহারী, কাঁচের বাসনকোসন, মাটির হাঁড়িকুঁড়ি, খেলনা, পুতুল, লোহার যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলো, ঝুড়ি, চ্যাঙ্গারী ইত্যাদির দোকানপাট বসিয়া থাকে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না। সমগ্র দোকানপাটগুলি খোলা জায়গায় বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই গ্রামে অনুষ্ঠিত অন্যান্য মেলাগুলি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ বুইতা। ৩৩।১,৬৯৩।৯৩।১,৩১৭।৬,৪৯৪

(ক) ব্রাহ্মণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয় ও মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) চাকুরী ও কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে বজবজ রেলস্টেশন এবং এক মাইলের মধ্যে মোটরবাস চলাচল করে। নিকটবর্তী একটি খাল দিয়া নৌকা ও সালতিতে যাতায়াতের সুবিধা আছে। গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তাও আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব ও গোষ্ঠযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। তাহা ছাড়া প্রতি বৎসর নামকীর্তন মহোৎসব ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, শীতলা, মনসা ও ওলাবিবি প্রভৃতি দেবদেবী আছে।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ বাগ, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ বুইতা, ২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ চাউল খোলা। ৯৮।৩০৮।৪৬।২৩৫।১,২০৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, ময়রা, সদ্‌গোপ, সোলাঙ্কি, ধোপা, নাপিত, তেলী, কাওরা ও মুসলমান। গ্রামে আটটি পাড়া আছে। যেমন—চৌধুরীপাড়া, চাটুজ্যেপাড়া, সদ্‌গোপপাড়া, সামন্তপাড়া, ময়রাপাড়া, ধোপাপাড়া, শুকলীপাড়া ও মুসলমানপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী, মজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় বার মাইল দূরে বজবজ রেলস্টেশনটি অবস্থিত ; চার মাইল দূরে বাখরাহাট হইতে মোটরবাস এবং প্রায় সাত মাইল দূরে রায়পুর হইতে নৌকায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা, চড়ক উৎসব ও ধর্মপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ছয়টি শিবমন্দিরের প্রত্যেকটিতেই একটি করিয়া শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহা ছাড়া দুইটি পঞ্চানন্দ, তিনটি দক্ষিণরায় এবং মনসা আছে।

শ্রীনির্মল কুমার দত্ত চৌধুরী, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ চাউল খোলা, পোঃ আড়িয়াপাড়া,
২৪-পরগণা।

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক বজবজ মিউনিসিপাল এলাকায় ও তদ্‌সংলগ্ন অন্যান্য কয়েকটি গ্রাম ও বাওয়ালী গ্রামে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ সম্পর্কে সংগৃহীত সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

চব্বিশ-পরগণা জেলার অন্তর্গত বজবজ কলিকাতা হইতে প্রায় সতের মাইল দূরে ভাগীরথীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। ইহা কেরোসিন তৈল ও পেট্রোলের বন্দররূপে সবিশেষ পরিচিত। পূর্ব রেলপথে শিয়ালদহ হইতে বজবজ পর্যন্ত একটি রেলপথ আছে। ইহা ভিন্ন, কলিকাতা হইতে প্রতিদিন নিয়মিত মোটরবাসেও এই স্থানে যাতায়াত করিতে পারা যায়।

বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বকালে এই স্থানে একটি দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আক্রমণ-কালে লর্ড ক্লাইভ উক্ত দুর্গটি দখল করেন। বর্তমানে ঐ দুর্গের কোন চিহ্ন মাত্র নাই। বজবজের নিকট গঙ্গাবক্ষে একদা 'কামাগাটামারু' নামে জাহাজের বিদেশী সৈনিক-দিগের সহিত ভারতীয় সৈনিকদিগের সংঘর্ষ হয় বলিয়া জানা যায়। এই সংঘর্ষে ভারতীয় সৈনিকরা যে শৌর্য ও

সাহসের পরিচয় দেন তাঁহারই স্মরণে বজবজ পুরাতন স্টেশনের নিকট ভারতের প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় জহরলাল নেহেরু একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন।

বজবজ একটি মিউনিসিপাল শহর; ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে মিউনিসিপালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ইহার ১৬টি ওয়াডে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকজন বসবাস করিতেছেন। সন্নিকটবর্তী বিড়লাপুরে অনেকগুলি পাটকল আছে।

বজবজ চিত্রগঞ্জ শ্মশানঘাটের নিকট দক্ষিণমুখী একটি আটচালা মন্দিরে 'খুকীকালী' নামে খ্যাত একটি প্রাচীন কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবীর মন্দিরটি গঙ্গার তীরে অবস্থিত এবং ইহার অভ্যন্তরে একটি বেদীর উপর কষ্টি পাথর নির্মিত মাত্র এক ফুট উচ্চ চতুর্ভুজা, ত্রিনয়নী কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। তবে দেবীর পদতলে শিব নাই। মূর্তিটি ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও ইহার গঠন ভঙ্গী খুবই সুন্দর। সম্ভবতঃ এইরূপ ক্ষুদ্রাকৃতির জন্যই দেবী 'খুকীকালী' নামে খ্যাত হইয়াছেন। মন্দির ঘরের মেঝে শ্বেত পাথর দ্বারা মণ্ডিত এবং বাইরের চারিদিকের বারান্দা মোজাইক করা। মন্দিরের সম্মুখে একটি পাকা নাটমন্দির আছে। স্বামী পূর্ণানন্দ নামক জনৈক সাধক এই দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া জানা যায়। বর্তমান মন্দিরটি বজবজ নিবাসী আশুতোষ ধর মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতি পূর্ণশশী দেবী কর্তৃক বাংলা ১৩৪৩ সনে নির্মিত এবং বাংলা ১৩৭৫ সনে বজবজ ঘোষপাড়া নিবাসী শ্রীমতি নির্মলাবালা ঘোষ ইহার সংস্কার করান। খুকীকালী সাধারণের দেবী এবং বর্তমানে স্থানীয় একটি কমিটি কর্তৃক দেবীর নিত্য পূজা ও উৎসবাদি পরিচালিত হইতেছে। নিত্য ভোগ-পূজা, সন্ধ্যারতি ও শীতলভোগ ব্যতীত কার্তিক মাসের অমাবস্যায় বিশেষ পূজা ও উৎসব পালিত হয়। দৈনিক দেবীর নিকট মানসিক পূজা দিতে আশপাশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু যাত্রী আসেন। সাধারণতঃ ষোড়শোপচারে পূজা, বস্ত্র, অলঙ্কার ও ছাগ বলি দিয়া ভক্তরা মানসিক পূজা দিয়া থাকেন। দেবীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে নানারূপ কিংবদন্তীও শোনা যায়। কালীমন্দিরের সম্মুখে কয়েকটি প্রাচীন বট ও অশ্বত্থগাছ এবং দেবীর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী পূর্ণানন্দের একটি স্মৃতি সমাধি আছে। ইহা বাংলা ১৩৭২ সনে নির্মিত।

ইহা ব্যতীত কালীমন্দির প্রাঙ্গণে একটি শিবমন্দির ও একটি ঘরে কষ্টি পাথর নির্মিত গোপাল মূর্তি ও নারায়ণ শিলা আছে। শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে উহার দেওয়াল গাত্রে গ্রথিত নিম্নলিখিত শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়—

ব্যোমবে দাঙ্গবস্বিন্দু শকে শ্রীগুরুবাসরে
মাঘে শুক্লা ত্রয়োদশ্যাং সরস্বতী তটে শুভে
শ্রীমতি নলিনীবালা দাসী যা ভুবি বিশ্রুতা
বটুকেশ্বর শিবোহয়ং তয়া চাত্র প্রতিষ্ঠিত।

বজবজ মিউনিসিপাল এলাকার অন্তর্গত অন্যান্য পূজা-পার্বণগুলির মধ্যে গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলাটি উল্লেখযোগ্য। বজবজ থানার নিকট একটি মন্দিরে গৌরাঙ্গদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে; নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পূর্বে খুকীকালী মন্দিরের নিকট কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উপলক্ষে একটি বড় মেলা বসিত; বর্তমানে মেলাটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

স্থানীয় মনসাতলায় মনসামন্দির প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ গোষ্ঠ উৎসব উপলক্ষে এবং আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে মেলা বসে।

ইহা ভিন্ন, এই স্থানে চারটি শীতলামন্দির আছে। উহার মধ্যে ডাঃ এস, এন, ঘোষ রোডে ও আশুতোষ মুখার্জি রোডে অবস্থিত মন্দির দুইটিতে যথাক্রমে চৈত্র ও বৈশাখ মাসে দেবীর বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে মেলা বসিয়া থাকে। ধর্মতলা রোডে অবস্থিত শীতলামন্দিরে প্রতি রবিবার পূজারীর উপর দেবীর ভর হয় এবং ভরপ্রাপ্ত অবস্থায় তিনি নানারূপ অসুখ-বিসুখের জন্য দৈব ঔষধের বিধান দিয়া থাকেন। এই কারণে প্রতি রবিবার মন্দিরে বহু লোকজন আসেন। নাপিতপাড়া লেনে অবস্থিত শীতলামন্দিরে বৈশাখ মাসে বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং তদুপলক্ষে যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

বজবজ মিউনিসিপাল এলাকার মৌলানা আজাদ রোড, ডি, এন, ঘোষ রোড, কালীপুর, গোলাম রসুল রোড ও চড়িয়াল বাজারের নিকট অবস্থিত মুসলমান সম্প্রদায়ের মসজিদগুলির মধ্যে মৌলানা আজাদ রোডে অবস্থিত

মসজিদটিই বড় মসজিদ। তাহা ছাড়া, মজফর হোসেন খাঁন রোডের ধারে অবস্থিত পীরডাঙ্গায় জনৈক মুসলমান পীরের দরগাহ আছে। স্থানীয় মুসলমানরা মহরম, ইতুজ্জোহা প্রভৃতি উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

বজবজ থানার অন্তর্গত (মিউনিসিপাল এলাকার বহির্ভূত) অন্যান্য কয়েকটি গ্রামের মধ্যে রায়পুরে গঙ্গা নদীর চড়ায় প্রতি বৎসর পৌষ মাসে এক যোগে কালী ও গঙ্গা পূজা উপলক্ষে সারা পৌষ মাসব্যাপী একটি বড় মেলা বসে।

পূজালী গোয়ালপাড়ায় (মৌজা নং ৪২) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও তদুপলক্ষে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। রাজারামপুরে (মৌজা নং ৪১) কালীপূজার একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। এই স্থানে নিত্য পূজা হয় এবং পূজারীর উপর ভর হয়।

বিড়লাপুর বাজারের নিকট প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথের মেলা বসে। ইহা ভিন্ন, এই স্থানে একটি শিবমন্দির এবং গঙ্গার তীরে একটি মসজিদ আছে।

মায়াপুরের (মৌজা নং ৬৬) কালীমন্দিরটি 'মিলন মায়ের মন্দির' নামে খ্যাত। নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি শনি-মঙ্গলবার পূজারীর উপর দৈব ভর হয় এবং রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের জন্য বহু লোকজন আসেন।

বজবজ হইতে প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ভাগীরথীর তীরে আছিপুর (মৌজা নং ৪৪) ঘোদাখুদিতলায় চীনাদের একটি প্রাচীন মন্দির আছে। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এই মন্দিরে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং তদুপলক্ষে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু চীনা নরনারীর সমাগম হয়। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময় টং আচু নামে জনৈক চীন দেশীয় ব্যক্তি এই স্থানে একটি চিনির কল স্থাপন করেন এবং তাঁহার নাম অনুসারেই এই গ্রামের নাম আছিপুর হইয়াছে।

বাওয়ালী

বাওয়ালী (মৌজা নং ৫৪) চব্বিশ-পরগণা জেলার বজবজ থানার অন্তর্গত একটি সাধারণ গ্রাম। রেলস্টেশন বজবজ হইতে অথবা কলিকাতা হইতে মোটরবাসে এই গ্রামে যাতায়াত করা চলে। বাওয়ালী গ্রাম হইতে প্রায় চার মাইল দূর দিয়া হুগলী নদী প্রবাহিত। বর্তমানে গ্রামে প্রায় ছয় হাজার লোকের বাস। ইঁহাদের মধ্যে মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ, ধোপা, নাপিত সম্প্রদায়ের লোকজনই বেশী। কৃষিকার্য ও চাকুরী গ্রামবাসীর প্রধান উপজীবিকা। গ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও ডাকঘর আছে।

বাওয়ালী গ্রামের কথা বলিতে গেলে প্রথমে বাওয়ালীর মণ্ডলদের কথা বলিতে হয়। স্থানীয় মণ্ডল পরিবারই গ্রামের জমিদার। মণ্ডলগণ কেবলমাত্র এই গ্রামেরই জমিদার নহে, চব্বিশ-পরগণা জেলার এক বৃহদাংশের জমিদাররূপে পরিচিত ছিলেন। মুঘল যুগে বাংলা দেশে বড় বড় ভূস্বামীর অভাব ছিল না। সেই সকল ভূস্বামী-দিগের মধ্যে বাওয়ালীর মণ্ডলদিগের বিশেষ খ্যাতি ছিল। ইঁহারা মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত এবং বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। মণ্ডলেরা যখন বাওয়ালীতে আসেন তখন চব্বিশ-পরগণার এই অঞ্চলটি গভীর বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ হিংস্র জীবজন্তুর আবাসস্থল ছিল। এই বন-জঙ্গলের মধ্যে কয়েক ঘর বাওয়ালী নিভৃতে বসবাস করিত এবং এই অঞ্চলে যাহারা কাঠ ও মধু সংগ্রহ করিতে আসিতেন তাঁহাদের সাহায্য করাই ইহাদের প্রধান কর্ম ছিল। মণ্ডলেরা যখন বন হাসিল করিয়া এই স্থানে গ্রাম পত্তনে উদ্যোগী হন তখন এই বাওয়ালীরাই তাঁহাদের বিশেষ সহায়তা করে। মনে হয় এই কারণেই গ্রামের নামকরণ করা হয় বাওয়ালী। আবার কেহ বলেন এই জঙ্গলের মধ্যে বাওয়ালী ফকিরের একটি আস্তানা ছিল, সেইজন্য গ্রাম পত্তন কালে ইহার নাম রাখা হয় বাওয়ালী। অবশ্য আজ এই গ্রামের আশপাশে কোথাও বাওয়ালী ফকিরের আস্তানার চিহ্নমাত্র নাই।

যতদূর জানা যায় মণ্ডল পরিবারের আদি পুরুষ বাসুদেব রায় মোগল সরকারের অধীনে চাকুরী করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময় এই পরিবারের হরানন্দ মণ্ডল বাওয়ালী অঞ্চলে জমিদারী স্থাপনে উদ্যোগী হন। এই পরিবারের গঙ্গামোহন মণ্ডলের আমলে জমিদারীর শ্রীবৃদ্ধি হয়। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র প্যারীলাল মণ্ডল বহু

বৃহদায়তন দেবমন্দির নির্মাণ করান। টালিগঞ্জ আদিগঙ্গার পূর্ব কূলে ১২৫৩ বঙ্গাব্দে তিনি হরিহরধাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির সংলগ্ন জমিতে আটচালা গঠনের দ্বাদশ শিবমন্দিরে গৌরীপট্ট সহ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার সামান্য দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রাধামদনমোহনজীউর মন্দিরটি মণ্ডল পরিবারের উদয়নারায়ণ মণ্ডল কর্তৃক ১২৩৫ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাধামদনমোহনজীউর মন্দির সংলগ্ন গঙ্গার তীরবর্তী আটচালা গঠনের দ্বাদশ শিবমন্দিরগুলি মানিক নাথ মণ্ডল কর্তৃক ১২০০ বঙ্গাব্দে স্থাপিত বলিয়া জানা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে টালিগঞ্জ আদিগঙ্গার পশ্চিমতীরে মণ্ডল টেম্পল লেনের উপর বর্তমানে পূর্ত বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত যে নবরত্ন মন্দিরটি দেখিতে পাওয়া যায় উহাও বাওয়ালীর মণ্ডলদিগের কীর্তি। এইরূপ সুবিশাল নবরত্ন মন্দির পশ্চিমবঙ্গে অতি অল্পই আছে। বর্তমানে এই মন্দিরে কোন বিগ্রহাদি নাই। এই বৃহৎ পরিবারের বিভিন্ন সরিকেরা আজ চাকুরীজীবি হইয়া নানা-স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহাদের এক বৃহৎ অংশ কলিকাতার টালিগঞ্জ এলাকায় বসবাস করিতেছেন এবং এই পরিবারের সর্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুগল কিশোর মণ্ডল মহাশয় বার্ধক্যে পঙ্গু হইয়া বাওয়ালী গ্রামের বসতবাটীতে মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনিতেছেন। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজ মানুষের অবস্থারও অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। বাওয়ালীর মণ্ডল পরিবারের অতীতের সেই প্রভাব-প্রতিপত্তি আজ অস্তাচলগামী নহে—অস্তমিত। তাই মণ্ডল পরিবারের ঐতিহ্যের শেষ প্রত্যক্ষদর্শী নায়ক হিসাবে সুবৃদ্ধ অসহায় শ্রীযুগল কিশোর মণ্ডলের বেদনাও বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক।

বাওয়ালীর মণ্ডলদিগের আজ আর সে সমৃদ্ধি নাই; শুধু অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষীরূপে বাওয়ালী গ্রামে তাঁহাদের দ্বিতল বসতবাটীর নিকট দাঁড়াইয়া আছে কয়েকটি জীর্ণ প্রাচীন দেবালয়। এই সকল দেবালয়গুলির মধ্যে অনেক-গুলিই আজ বিগ্রহহীন, ভগ্ন ও পরিত্যক্ত; কতকগুলি আবার সম্পূর্ণই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে কেবলমাত্র রাধাবল্লভজীউর, গোপীনাথজীউর ও বাজারের নিকট শ্যামসুন্দরজীউর এই তিনটি মন্দিরেই রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

রাধাবল্লভজীউর মন্দিরটি দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দির। ইহা উচ্চ চত্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সম্মুখে বারান্দাযুক্ত। মন্দিরের অভ্যন্তরের মেঝে ও চত্বরে উঠিবার সোপানশ্রেণী শ্বেত প্রস্তর নির্মিত। মন্দিরের চালার আলিসায় সুন্দর ফুলের নক্সাকাটা এবং মন্দির গাত্রে চুন-বালি দ্বারা নির্মিত একত্রে তিনটি করিয়া মোট ছয়টি অতি সুন্দর ফুলের তোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। চূড়ায় তিন সারিতে দুইটি করিয়া মোট ছয়টি ঘট স্থাপিত। মন্দিরের সম্মুখে নাট-মন্দির ও একটি তুলসীমঞ্চ এবং মন্দির ও নাটমন্দিরের চারিপাশ ঘিরিয়া কয়েক সারি ঘর আছে।

রাধাবল্লভজীউর মন্দিরের পূর্ব পার্শ্বে গোপীনাথজীউর সুউচ্চ নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী এবং ইহার সম্মুখে প্রশস্ত নাটমন্দির আছে। মূল মন্দির ও নাট-মন্দিরের মেঝে সম্পূর্ণ শ্বেত প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত। একটি শ্বেত প্রস্তরের সোপান দ্বারা মূল মন্দিরের সহিত নাট-মন্দিরটি সংযুক্ত। নাটমন্দিরটি খুবই জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং উহার উপরের ছাদ যে-কোন সময়ই ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। মন্দির গাত্রে গ্রথিত লিপি হইতে জানা যায় যে, গোপীনাথজীউর মন্দিরটি ১২০১ বঙ্গাব্দে নির্মিত। ইহার প্রতিষ্ঠাতা মানিক মণ্ডল মহাশয়। নাটমন্দিরের সম্মুখে পরিত্যক্ত অষ্টকোণাকৃতি দোল বা রাসমঞ্চটি বাস্তবিকই দর্শনীয় বস্তু; তবে অবহেলায়, অযত্নে ইহাও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। পূর্বদিকে অবস্থিত ঝুলনমঞ্চটি বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

গোপীনাথজীউর মন্দিরের পশ্চাতে অর্থাৎ উত্তর দিকে একটি একতল ও একটি দ্বিতল দরদালানযুক্ত সমতল ছাদ বিশিষ্ট মন্দির আছে। উভয় মন্দিরেই উপরের ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং দেওয়াল গাত্রের চুন-বালির আবরণ খসিয়া পড়িয়াছে। তথাপি এই মন্দির দুইটির গায়ে কিছু কিছু অতি সুন্দর ফুল ও লতাপাতার নক্সা দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরগুলির পাশে অবস্থিত দক্ষিণমুখী বৃহৎ আটচালা মন্দিরটি একদা রাধাকান্তজীউর মন্দির নামে খ্যাত ছিল। শোনা যায়, এই স্থানে অবস্থিত বাওয়ালীর মণ্ডলদিগের নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে রাধাকান্তজীউর মন্দিরই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। মন্দিরটি ১৬৯৩ শকাব্দে হরানন্দ মণ্ডল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার চারিদিকের

বারান্দা বেলে পাথর এবং মন্দিরাভ্যন্তর শ্বেত প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত। সম্মুখে একটি নাটমন্দির আছে। রাধাকান্ত-জীউর মন্দির গাত্রে এখনও কিছু কিছু প্রাচীন পোড়ামাটির শিল্পকর্ম বিশেষ করিয়া ছয়টি মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত ছয়টি মূর্তির মধ্যে পাঁচটি সাধু-সন্ন্যাসীদের ন্যায় জটা-শ্মশ্রুধারী এবং একটি মাত্র নারী মূর্তি। মনে হয় অতীতে সারা মন্দির গাত্র পোড়ামাটির শিল্প দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল; সংস্কারকালে উহাদের উপর সিমেন্টের আবরণ পড়ায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

রাধাকান্তমন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোনে বন-জঙ্গলে আচ্ছাদিত একটি বিশাল আটচালা মন্দির দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী; ইহার চারিদিকে উচ্চ রক্ এবং সম্মুখে দরদালানযুক্ত। মন্দির গাত্রে কিছু কিছু সুন্দর পোড়ামাটির কাজের নিদর্শন আছে। ইহা ভিন্ন, রাধাকান্ত-মন্দিরের পশ্চিমে আর একটি পূর্বমুখী বিশাল আটচালা মন্দির আছে। পূর্বদিকে পাশাপাশি তিনটি প্রবেশ দ্বার ব্যতীত উত্তর ও দক্ষিণদিকেও প্রবেশ দ্বার আছে। মন্দিরের চারিপাশের রক্ বেলে পাথর এবং মন্দিরাভ্যন্তরের মেঝে শ্বেত পাথর দ্বারা নির্মিত। সম্মুখে মন্দিরে উঠিবার দুইমুখী সোপান ব্যতীত ১৪টি ইষ্টক নির্মিত বৃহৎ থাম দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবত পূর্বে এই স্থানে নাটমন্দির ছিল। মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে স্থাপিত নাতিদীর্ঘ কারুকার্য-খচিত মণ্ডপটি বোধহয় তুলসীমঞ্চরূপে ব্যবহৃত হইত।

উল্লিখিত মন্দিরাদির আশপাশে আরও কয়েকটি ধ্বংসস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবত এইগুলি মন্দির ছিল। তবে এই সকল মন্দির মণ্ডল পরিবারের কাঁহার দ্বারা নির্মিত বা কোন দেবতার নামে উৎসর্গকৃত হইয়াছিল আজ আর তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। বাওয়ালী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত অবহেলিত, জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় এই প্রাচীন মন্দিরগুলি দেখিলে বাঙ্গালী তথা জাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতি প্রিয় ব্যক্তিমাত্রই অপরিসীম বেদনা বোধ করিবেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বর্তমানে কেবলমাত্র রাধাবল্লভ, গোপীনাথজীউ ও শ্যামসুন্দরের মন্দিরেই নিত্য সেবা-পূজা হয় এবং উক্ত মন্দিরগুলিতে প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল ও ফুলদোল, কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে গোষ্ঠ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য উৎসব নামে মাত্র; বর্তমানে মণ্ডল পরিবারের আর্থিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে উৎসবগুলির রাজকীয় আড়ম্বর বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

বাওয়ালী গ্রামে আর একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয় আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে। ইহা 'মাণিকচন্দ্র মণ্ডলের রথ' নামে খ্যাত এবং এই উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া একদা এই অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মেলা বসিত। উৎসব উপলক্ষে মাহেশের রথের ন্যায় সুবৃহৎ কাঠের রথে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি স্থাপন করিয়া রথ টানা হইত। এই সুবৃহৎ রথ টানার জন্য রথের গায়ে লোহার শিকল লাগান ছিল। বাওয়ালী গ্রামে প্রবেশ করিতে রথতলায় পরিত্যক্ত মণ্ডলদিগের এই বিখ্যাত রথের বৃহদাকার চাকাগুলি অতীতের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন। আজও মাণিক মণ্ডলের রথ বাহির হয়, মেলাও বসে, তবে পূর্বের সে গৌরব আর নাই।

রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন দেবোত্তর জমির উপর রথের মেলা বসে। আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় পঁচিশ হাজার নরনারী মেলায় আসেন। প্রধানতঃ বিকালের দিকেই মেলায় লোকসমাগম ও বেচাকেনা হয়। প্রায় দেড়শত দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী ও কাপড়চোপড়ের দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া, বাসনপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী শিল্পসামগ্রী, মাটির খেলনা, পুতুল ও হাঁড়িকুড়ি, বই-ছবি, ঔষধপত্র, মাছ, মাংস, সব্জী ও চারাগাছের আমদানী হয়। দশ-পনর জন ফেরিওয়ালাও আসেন। ব্যবসায়ীরা কলিকাতা ও চব্বিশ-পরগণা জেলার নানা স্থান হইতে আসেন। আমোদ-প্রমোদের জন্য কীর্তনগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা থাকে।

ইহা ভিন্ন, বাওয়ালী গ্রামে একটি শিবমন্দির এবং চণ্ডী ও সত্যপীরের স্থান আছে।

উৎসব বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার উৎসব

চাউল খোলা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির তিন-দিন পূর্ব হইতে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত সাড়ম্বরে সর্বজনীন চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুদিনের প্রাচীন এবং আশপাশের গ্রামের বহু নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। অনেকে মানত করিয়া 'সন্ন্যাসব্রত' গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং দণ্ডী খাটেন। মূল সন্ন্যাসীকে চৈত্র মাসের প্রথম দিন হইতে 'সন্ন্যাসব্রত' গ্রহণ করিতে হয়। অন্যান্য সন্ন্যাসব্রতীরা সাধারণতঃ সংক্রান্তির পূর্বে সাত অথবা তিনদিন সন্ন্যাসব্রত পালন করেন। সন্ন্যাসীদের মধ্যে অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীর লোক।

উৎসবের প্রথম দিন সন্ন্যাসীরা চাউল খোলার শিবমন্দিরের সম্মুখে কাঁটার উপর ঝাঁপ এবং দ্বিতীয় দিনে মহামায়াপুর ধর্মতলায় ও চাউল খোলা গ্রামের চট্টোপাধ্যায়-দিগের শিবমন্দিরের নিকট 'বঁটি ঝাঁপ' দেন। পরদিন নীল পার্বণ উপলক্ষে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণের শিবমন্দিরে, চাউল খোলা গ্রামের শ্যামরায় শিবমন্দিরে এবং শিবপুর গ্রামের শিবমন্দিরে নীলপূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন গ্রাম হইতে গাজনের 'সঙ' বাহির হয় এবং নির্দিষ্ট দিনে বিশেষ বিশেষ স্থানে মিলিত হইয়া আনন্দ উৎসব করেন। চৈত্রসংক্রান্তির দিন চাউল খোলা গ্রামের পশ্চিমাংশের জলাভূমিতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

চাউল খোলা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব উপলক্ষে একটি ছোট আকারের মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মেলায় নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

খাবার, মনিহারী, কাপড়চোপড়, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র এবং মাটির খেলনা-পুতুল ইত্যাদি জিনিসপত্রের কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে। তাহা ছাড়া, ছুরি-কাঁচি, বই-ছবি প্রভৃতির দোকানপাটও বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক প্রদর্শনী, কবিগান ও যাত্রাগানের ব্যবস্থা করা হয় এবং কপাটি খেলার প্রতিযোগিতা হয়।

বুইতা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়ক উপলক্ষে প্রায় এক বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয় এবং ইহাতে বিকালের দিকেই লোকজন আসেন।

মেলায় চকগোপালপুর, বিষ্ণুখাড়া, চণ্ডীপুর, বাওয়ালী, মিঠাপুকুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় চার-পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয় এবং চড়িয়াল, বাওয়ালী ও বিড়লাপুর হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতা ও ফেরিওয়ালারা আসেন। তাঁতের তৈয়ারী কাপড়চোপড়, বেত ও বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা, ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী এবং বই-ছবি ইত্যাদির কুড়ি-পঁচিশটি দোকান-পাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য হা-ডু-ডু ও লাঠিখেলা, নাগরদোলা, ম্যাজিক, লটারী প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে। তাহা ছাড়া, জুয়া খেলাও হয়। মেলায় তরজাগান ও যাত্রাভিনয় বিশেষ আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান।

থানা ঃ বিষ্ণুপুর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ কাঞ্চনবাড়িয়া। ৪১।৫৩০`৬২।৫২৫।৩,২০৩

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কলিকাতা হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত চলে। আমতলা হইতে চড়িয়াল এবং রায়পুর হইতে ঠাকুরপুকুর পর্যন্ত মোটরবাস চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে রাধাকৃষ্ণের গোষ্ঠ উৎসব, আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা এবং চৈত্র মাসে নীল পাবণ ও শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি বহুকালের প্রাচীন। ইহা ব্যতীত গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের গৃহে প্রতি বৎসর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বত্রিশ প্রহর অখণ্ড নামসংকীর্তন মহোৎসব হয়। মহোৎসবে গ্রামের কুড়ি বাইশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রাম হইতে লোক সমাগম হয় এবং নবদ্বীপ, হাওড়া ও মেদিনীপুর হইতে কীর্তনের দল আসে। উৎসবটি গত সত্তর বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে দুইদিনব্যাপী মেলা হয়। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে জগন্নাথদেবের দারুময় মূর্তি এবং একটি শিবমন্দির ব্যতীত পাঁচটি পঞ্চানন্দ এবং একটি বিশালাক্ষী ও মনসা আছে।

শ্রীজীতেন্দ্র নাথ ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
কাঞ্চনবাড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ নাদাভাঙ্গা। ৪২।৬২২`১৭।৪৬৫।২,৩৭৭

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈষ্ণব, ধোপা, নাপিত, কাওরা, বাগ্দী, ডোম, শিকারী ও মুসলমান। গ্রামে অনেকগুলি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, মাম্নাপাড়া, ঘোষপাড়া, নস্করপাড়া, শিকারীপাড়া, নাগাপাড়া, সর্দারপাড়া, মালোপাড়া, কাওরাপাড়া, বাগ্দীপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) কলিকাতা হইতে মোটরবাসে গ্রামে পৌছান যায়। ঐ বাস বিবিরহাট হইতে ঠাকুরপুকুর যাতায়াত করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ রাধাকৃষ্ণের গোষ্ঠ উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, চৈত্র মাসের প্রথম পনর দিন বাদে যে কোন বৃহস্পতিবার ভগবতীপূজা বা গোষ্ঠ উৎসব এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন। গোষ্ঠ ও গাজন উৎসব বহুকালের প্রাচীন এবং ভগবতীপূজাটি ১৩২৬ বঙ্গাব্দ হইতে এবং দুর্গাপূজাটি গত দশ বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রত্যেকটি উৎসব উপলক্ষেই পূজা প্রাঙ্গণের আশপাশে কিছু কিছু দোকানপাট বসে।

(ঙ) গোষ্ঠযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ হইতে পাচ-ছয়দিনব্যাপী মেলা হয়। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন বটগাছের নীচে মাটির দেওয়াল ও খোলার চালাযুক্ত একটি দেবালয়ে দ্বিভুজা, গৌরবর্ণা, ত্রিনয়নী, সিংহবাহিনী ভগবতীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ, ছয়টি শীতলা, এগারটি মনসা ও একটি শিবলিঙ্গ আছে।

শ্রীপুলিন বিহারী নস্কর, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ নাদাভাঙ্গা, পোঃ কাঞ্চনবাড়িয়া,
২৪-পরগণা।

৩। গ্রাম ঃ মৎস্যখালী। ১৫১।২৯৮`৪৩।১৭০।৮১৪

(ক) হিন্দু এবং মুসলমান। গ্রামে সর্দারপাড়া, নস্করপাড়া, কয়ালপাড়া, মণ্ডলপাড়া, হালদারপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে মোটরবাস এবং পাঁচ মাইল দূরে রেলস্টশন। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে। গ্রামের পূর্বদিকে প্রবাহিত একটি খাল দিয়া সালতিতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ১৮ই বৈশাখ ব্যক্তিবিশেষের গোষ্ঠ উৎসব, সর্দারপাড়ায় মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে সর্বজনীন মহোৎসব এবং ফাল্গুন মাসে ব্যক্তিবিশেষের দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দোল উপলক্ষে রাধাকৃষ্ণের পূজা, দেবদোল, নরদোল এবং চাঁচর অনুষ্ঠিত হয়। গোষ্ঠ উৎসবটি প্রায় সত্তর বৎসরের, মহোৎসবটি চৌদ্দ-পনর বৎসরের এবং দোল উৎসবটি দশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গোষ্ঠ উৎসবের মেলা। প্রতি বৎসর ১৮ই বৈশাখ। মেলাটি প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, একটি শিবলিঙ্গ এবং পঞ্চানন্দ, শীতলা, মনসা, বিবিমা ও বড়খান গাজী সাহেবের স্থান আছে।

শোনা যায় যে, পূর্বে এই গ্রামের খালে-বিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যাইত। এই কারণে গ্রামের নাম মৎস্যখালি হইয়াছে।

শ্রীকালীকৃষ্ণ গায়েণ, প্রধান শিক্ষক,
মাছখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বালাখালি, ২৪-পরগণা।

৪। গ্রাম ঃ ভাড়ু রামকৃষ্ণপুর।
১৫৮।৬৪৮'৩৬।৩৭৮।২,৩৩০

(ক) ব্রাহ্মণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, নাপিত, গোয়ালা ও মুসলমান। গ্রামে দশটি পাড়া আছে; যেমন— ব্রাহ্মণপাড়া, বিশ্বাসপাড়া, মাহিষ্যপাড়া, সর্দারপাড়া, মণ্ডলপাড়া, নস্করপাড়া, বেনেপাড়া, গোয়ালাপাড়া, নাপিতপাড়া ও মুসলমানপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) ×

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ গোষ্ঠ উৎসব, আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র পূর্ণিমায় বলদেবের রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোষ্ঠ ও রাস উৎসব প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং লক্ষ্মীপূজাটি ষোল বৎসরের প্রাচীন। রাস উৎসবের বৈশিষ্ট্য স্বরূপ বলা হয় যে, উৎসব উপলক্ষে গ্রামের যে নির্দিষ্ট কদমগাছের নীচে রাসমঞ্চ নির্মাণ করা হয় সেই গাছে প্রতি বৎসর উৎসবের সময় অন্তত একটি কদম ফুল ফুটিয়া থাকে।

(ঙ) গোষ্ঠ উৎসবের মেলা। প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে চার-পাঁচদিনব্যাপী মেলা হয়। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

বলদেবের রাস উৎসবের মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্র পূর্ণিমা হইতে চার-পাঁচদিনব্যাপী মেলা হয়। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি পঞ্চানন, দুইটি বাবাঠাকুর, দুইটি শীতলা ও আটটি মনসা আছে।

শ্রীবাসব চন্দ্র মিস্ত্রী, কৃষিকার্য,
গ্রাম ঃ ভাড়ু রামকৃষ্ণপুর,
পোঃ বাখালী, ২৪-পরগণা।

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত ঝিকুড়বেড়ে, জয়রামপুর, বাখরাহাট ও জয়চণ্ডীপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণাদি সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

ঝিকুড়বেড়ে

চব্বিশ-পরগণা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত ঝিকুরবেড়ে (মৌজা নং ৯) গ্রামে বাবা ভূতনাথের 'বড় কাছারী' অবস্থিত। কেউ কেউ বলেন 'ভূতের কাছারী।' বড় জাগ্রত স্থান বলে সাধারণের বিশ্বাস। ঝিকুরবেড়ে যেতে হ'লে কোলকাতার থেকে ৭৫ নম্বর বাসে বাখরাহাট স্কুলের সামনে নামতে হ'বে। স্কুলের পাশ দিয়ে উত্তর দিকে একটা খোয়া ঢালা রাস্তা সোজা চলে গেছে বড় কাছারীতে। এই এক মাইল পথ হেঁটে যাবার ইচ্ছা না থাকলে সাইকেল রিক্সাতেও যেতে পারেন। গ্রামে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের বাস, সঙ্গে আছেন মাত্র কয়েক ঘর প্রমাণিক।

বাংলা দেশের আর পাঁচটা গ্রামের মতই ঝিকুরবেড়ে একটি বৈচিত্র্যহীন সাধারণ গ্রাম। গ্রামবাসীগণ দৈনন্দিন বাঁধাধরা জীবনের অভ্যস্ত পথে দিন অতিবাহিত করেন। উনিশ শতাব্দীর শেষভাগে একদিন এই গ্রামে নিঃশব্দে প্রতিষ্ঠিত হ'লো বাবা ভূতনাথের 'বড় কাছারী'। গ্রামের প্রান্তে শ্মশান ক্ষেত্র, কেউ শবদাহ করেন, কেউবা মৃত-শিশুদের মাটি চাপা দিয়ে যান। প্রয়োজন না হ'লে গ্রামবাসী কেউ ওদিকটা মাড়ান না; বরং ভূত-প্রেতের আবাসস্থল বলে ওদিকটা যতদূর সম্ভব পরিহার করেই চলেন। স্থানটিকে আরো রহস্যঘন করে তুলেছে একটি অতি প্রাচীন বৃহৎ অশ্বত্থগাছ, দিনের বেলায়ও স্থানটিকে অন্ধকারে ঢেকে রাখে, গা ছম্ ছম্ করে। একদিন সন্ধ্যাবেলা জনৈক বহিরাগত আগন্তুক এসে আশ্রয় নিলেন অশ্বত্থগাছের নীচে; গ্রামবাসীগণ কৌতূহলী হ'লেন। পরের দিন ভোরে আগন্তুক প্রচার করলেন 'ইউরেকা', তিনি পেয়েছেন। গ্রামবাসীদের কৌতূহল চরমে উঠলো, সকলে এসে জড়ো হলেন অশ্বত্থতলায়; ঘিরে দাঁড়ালেন আগন্তুককে, সকলেরই সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'লো আগন্তুকের প্রতি। অবশেষে সকল প্রশ্নের নিরসন করে আগন্তুক জানালেন, রোগ নিরাময়ের জন্য তিনি তারকেশ্বরে 'হত্যা' দিয়েছিলেন; বাবার আদেশ হলো এখানে এসে প্রার্থনা জানাতে। অশ্বত্থ গাছের নীচে প্রার্থনা জানিয়ে তিনি অভীষ্ট ফললাভ করেছেন; অতএব 'মাভৈ'। আগন্তুকের ঘোষনায় গ্রামবাসীদের কৌতূহল কিন্তু নিবৃত হলো না, বরং আরো বেড়েই গেল। ঝিকুরবেড়ের কৌতূহল আশেপাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে বেশী দিন লাগলো না। দলে দলে লোকজন এসে হাজির হ'তে লাগলেন অশ্বত্থগাছের নীচে নানা কামনা-বাসনা নিয়ে। অদূরে দাঁড়িয়ে নীরবে সব লক্ষ্য করছিলেন আর একজন বুদ্ধিমান লোক, তিনি দূরদৃষ্টির দ্বারায় এর মধ্যে বৈষয়িক লাভলোকসানের সন্ধান পেলেন। ভূতুড়ে জায়গা; কিন্তু ভূত-প্রেত অনুচর নিয়ে নিশ্চয় সেখানে বাস করেন স্বয়ং ভূতনাথ দেবাদিদেব মহাদেব। তাই কেউ বলেন 'ভূতের কাছারী' আবার কেউ বলেন 'বড় কাছারী' অর্থাৎ 'Supreme Court'। এই জন্য নিয়ম হলো কাছারীতে মানসিকসহ প্রার্থনা জানিয়ে লিখিত আবেদন জানানোর। রাতের অন্ধকারে সবার অলক্ষ্যে ভূত-প্রেতের দল খাতাপত্র নিয়ে বসেন, আবেদন পাঠ করেন, আর বিচার-নিষ্পত্তি করেন স্বয়ং ভূতনাথ।

অধ্যাপক বিভূতিভূষণ কাঁঠাল মহাশয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিলো তাঁর বেহালার বাড়ীতে। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন—"আমার ঠাকুর্দা গোবিন্দচন্দ্র কাঁঠাল ছিলেন খুব বুদ্ধিমান লোক; তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এর থেকে সংসারে বেশ একটা স্থায়ী আয়ের পথ হবে। এসব অঞ্চল তখন বাওয়ালীর মোড়লদের জমিদারীভুক্ত ছিল। মোড়লদের সঙ্গে আমার ঠাকুর্দার কোন সূত্রে বেশ হৃদ্যতা ছিল। রাজকিশোর মণ্ডল তখন বাওয়ালী জমিদারীর একজন কর্তাব্যক্তি। ঠাকুর্দা তাঁর কাছ থেকে ঐ অশ্বত্থগাছ সংলগ্ন প্রায় পনের কাঠা জমি খাজনা বন্দোবস্ত করে নিয়ে 'বড় কাছারীর' সেবায়েত হয়ে বসলেন।" অধ্যাপক কাঁঠাল মহাশয়ের নিকট রক্ষিত দলিল থেকে জানা যায় সেটা ইংরাজী ১১।৭।৯৮ সনের কথা।

এখন অবশ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আগেকার সেই শ্মশান ক্ষেত্র আজ আর নেই, নেই সেই প্রাচীন অশ্বত্থগাছ; তবে বাবা ভূতনাথ আজও আছেন। আজও প্রতিদিন তাঁর বড় কাছারী খোলা হয়, ভক্তরা আবেদন জানান, ভক্তদের আবেদন শোনেন, বিচার নিষ্পত্তি করেন। সেই 'Tradition' আজও চলেছে। প্রাচীন অশ্বত্থগাছটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তার স্থান অধিকার করেছে একটি নবীন অশ্বত্থগাছ, বছর কুড়ি বয়স হবে। অশ্বত্থগাছের গোড়াটিকে বেড় দিয়ে গোল করে ইট দ্বারা বাঁধানো। গাছের গোড়ায় একটি চৌবাচ্চা বাঁধানো। এর নীচের সিমেন্ট বালি বা পাশের বাঁধানো ইটগুলি অনেকদিন আগেই খসে গেছে, মাটি বেরিয়ে পড়েছে। বর্তমান সেবায়েত শ্রীশশাঙ্ক কাঁঠাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলুম—চৌবাচ্চাটা বাঁধিয়ে দেন না কেন? উত্তরে বললেন, কি হবে ভক্তদের ভক্তির আঘাতে ক'দিন টিকবে বলুন। সামনে দাঁড়ানো আর একজন গ্রামবাসী বললেন, ওর কি তল আছে। অশ্বত্থগাছের গোড়ায় ঠিক চৌবাচ্চার উপরে বাবার প্রতীক সিন্দুরলিপ্ত একটি ত্রিশূল প্রোথিত। আশেপাশের কয়েকটি চালাঘরে নৈবেদ্যের দোকান বসেছে।

সব থেকে বড় কথা এখানে পূজা দিতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দরকার হয় না। যদিও বাবার পূজারী হিসাবে একজন

ব্রাহ্মণ আছেন। দোকান থেকে চিনির সন্দেশ, বাতাসা, জল ইত্যাদি কিনে ভক্তরা নিজেরাই বাবা ভূতনাথের পূজা দেন। শালপাতায় মোড়া নৈবেদ্য অশ্বত্থগাছের নীচে রেখে ভক্তরা প্রার্থনা জানান, সঙ্কল্প করেন; তারপর দু'একটা সন্দেশ-বাতাসা গাছের গোড়ায় রেখে দিয়ে নৈবেদ্য নিয়ে ঘরে ফিরে যান। আত্মতুষ্টির জন্য কেউ কেউ ব্রাহ্মণকে দিয়েও অবশ্য পূজা করান। কেউ কেউ গাছের গোড়ায় ডাবের জল, দুধ অথবা মদ ঢেলে দেন। ঐ তরল পদার্থগুলি গাছের গোড়া বেয়ে এসে উল্লিখিত চৌবাচ্চায় জমা হয়। ভক্তরা সেখান থেকে চরণামৃত পান করেন। বেদীর চারদিকে বাঁশ পুঁতে গাছের সঙ্গে টানা দেওয়া তারে সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দেন লিখিত আবেদন পত্র। গোলাকার বাঁধানো বেদীর উপরে ছত্রের ন্যায় শোভিত হয়ে আছে অসংখ্য আবেদন পত্র। নৈবেদ্যের দোকান থেকেই আবেদন পত্রের ছাপানো ফর্ম পাওয়া যায়; তাতে যাঁদের মনপূতঃ হয় না তাঁরা সাদা কাগজে নাম-ঠিকানাসহ সবিস্তারে বাবার কাছে লিখিত প্রার্থনা জানান। কম করে অর্ধ লক্ষাধিক আবেদন পত্র ঝুলছে দেখলাম। তার অধিকাংশই রোদে-জলে বিবর্ণ হয়ে গেছে। তবু একটু ধৈর্য্য ধরে এই আবেদন পত্রগুলি পাঠ করলে দেখা যাবে মানুষের পার্থিব কামনা-বাসনা কত অনন্ত, কত বিচিত্র, কত তুচ্ছ অথচ কত অপরিহার্য। সংসার সংগ্রামে দুর্বল মানুষ আবহমানকাল ধরে অনন্ত শক্তি ঈশ্বরের পায়ে মাথা খুঁড়ে মরছে—আবর্তিত হয়েছে তাঁদের ভক্তি, বিশ্বাস, সংস্কার। জন্ম নিয়েছে নানা লৌকিক গ্রাম্য দেবদেবী।

রোগব্যাধির নিরাময়, জমি-জমা সংক্রান্ত মামলা-মকদ্দমায় জয়লাভ বা পুত্র-কন্যা লাভ এতো সাধারণ কামনা। এ ছাড়া আছে—মা কামনা করছেন ছেলের সাইকেলের দোকান যেন ভালো চলে, কৃষকের বৌ কামনা করছে যেন এবার একটু বেশী ধান হয় জমিতে, অনূঢ়া কন্যার মাতা কামনা করছেন যেন পছন্দ মত জামাই পান, মায়ের কামনা তাঁর জামাইয়ের যেন সুবুদ্ধি হয়—মেয়েকে এবার ঘরে নিয়ে যায়। কোলকাতার কমলা ঘোষ প্রার্থনা জানিয়েছেন, যদি সামনের B. A. পরীক্ষায় পাশ করে, এক বোতল মদ দিয়ে বাবার পূজা দিয়ে যাবে। হাওড়ার রেখা দে জানিয়েছেন সামনের P. U. পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্রের উত্তরগুলি যেন ঠিকমত স্মরণ হয়, আর তার পড়তে বসলেই বড় ঘুম পায়; পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘুমটা যেন একটু কম হয়; মনস্কামনা সিদ্ধ হলে মদ দিয়ে পুজো দেবেন বলে মানসিক করছেন। চব্বিশ-পরগণার রেবা বেরা জানিয়েছেন যেন এই বছরে তার স্বামীর একটু আয় পয় বাড়ে যার ফলে তারা দুজন একটু পুরীতে বেড়িয়ে আসতে পারে, মানসিক জানিয়েছেন ভালো ধুতি ও গাঁজার কলকে দিয়ে পুজো দেবেন বলে। শিপ্রা সেন ছুটে এসেছেন নদীয়া থেকে। প্রার্থনা জানিয়েছেন—যেন 'ওর' সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, বাবা-মার একটু সুমতি হউক, জোড়ে এসে মদ আর পাঠা বলি দিয়ে পুজো দিয়ে যাবে। চব্বিশ-পরগণার কমলা জানিয়েছে, যেন মনমত স্বামী হয় এবং একটু তাড়াতাড়ি; জোড়ে এসে ধুতি-চাদর-ছাতা দিয়ে পুজো দিয়ে যাবো। পশু-পক্ষীর জন্যও অনেকে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কেউ জানিয়েছেন, গরু যেন গাভীন্ হয়, দুধ দিয়ে পুজো দেব, কেউ জানিয়েছেন আর যেন মুরগীর মড়ক না হয় ইত্যাদি। আবেদন পত্রের শিরোনামায় কেউ লিখেছেন 'পরম পূজনীয় বাবা', কেউ লিখেছেন 'শ্রদ্ধেয় বাবা' আবার কেউ লিখেছেন "শতকোটি প্রণামান্তে নিবেদন বাবা" নীচে শেষ করেছেন, 'বিনীতা', 'বিনীত', 'প্রণতঃ', 'তোমার দাসী' 'তোমার সেবক' প্রভৃতি বিশেষণে। গ্রাম্য দেবদেবীর কাছে ইটের টুকরো কোন গাছের শাখায় বা মন্দিরের দরজা-জানালায় সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে মানসিক জানাতে বা দেবতার প্রত্যাদেশের আশায় দেবালয়ে হত্যা দিতে অনেক স্থানেই দেখা যায়। কিন্তু ছাপানো 'ফর্মে' অথবা সাদা কাগজে রীতিমত application করে মানসিক জানানো আর কোথাও দেখেছি বা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। সেদিক থেকে বড় কাছাড়ীর এই পদ্ধতি অভিনব বলা চলে।

বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী, হিন্দু-মুসলমান জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রতি দিন বহু ভক্ত আসেন বড় কাছারীতে পুজো দিতে। প্রধানতঃ চব্বিশ-পরগণা, কোলকাতা, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি জেলা থেকে ভক্তরা আসেন। প্রতি শনি-মঙ্গল-বার দশ-বার হাজার যাত্রীর সমাগম হয় এবং সপ্তাহের এই দু'দিন বড় কাছারীর আশেপাশের জমিতে ময়রা,

তেলেভাজা, মনিহারী প্রভৃতি জিনিসপত্রের কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে। এছাড়া প্রতি বছর চৈত্রসংক্রান্তির পূর্ব দিন নীলপুজো উপলক্ষে বড় কাছারীতে বিশেষ পূজো হয় ও একটি বড় আকারের মেলা বসে। এই মেলায় উল্লিখিত দোকানপাট ছাড়া, মাটির হাঁড়ি-কলসী, পুতুল, জামাকাপড়, শাকসব্জী, ফলমূল, তালপাতার পাখা, মাদুর, বাঁশ ও বেতের তৈরী জিনিসপত্র এবং কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের মোট প্রায় একশত দোকান বসে। স্থানীয় ঘোষ ও পালদিগের জমিতে মেলা বসে। মেলার জমির 'ডাক' হয় এবং বিক্রেতাদের নিকট খাজনা আদায় করা হয়।

প্রধানতঃ ফলমূল, বিছানাপত্র, মদ এবং পাঁঠা, বাছুর, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পশুপক্ষী মানত জানানো হয়। মানতের বাছুর ব্যতীত অন্যান্য পশুপক্ষীগুলিকে কেউ কেউ বলি দিয়ে নিজেরাই নিয়ে যান। আবার কেউ কেউ বাবার নামে উৎসর্গ করে ছেড়ে দিয়ে যান। ছেড়ে দেওয়া পশুপক্ষী-গুলি বা স্বেচ্ছায় দিয়ে যাওয়া মানতের অন্যান্য জিনিস-পত্রগুলি সেবায়েতেরা পেয়ে থাকেন। সুধাংশু বাবু তাঁর বাড়ীর সামনে বাঁশ দিয়ে ঘেরা স্থানে হাঁস, মুরগী, ছাগল-গুলিকে দেখিয়ে বললেন এগুলি মানতের পাওনা। স্থানীয় মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত কাঁঠাল পরিবার বংশানুক্রমে বড় কাছারীর সেবায়েত।

পূর্বে কাঁঠাল পরিবারের গৃহে সেবিত নারায়ণ শিলা ও অষ্টধাতু নির্মিত গোপালজীউ বিগ্রহদ্বয়কে প্রতি বৎসর তরা বৈশাখ বড় কাছারীতে এনে গোষ্ঠ উৎসব পালন করা হতো। গোষ্ঠ উপলক্ষে মেলা বসতো, সংনাচ ও পুতুল-নাচ হতো। বর্তমানে এই মেলা বন্ধ হয়ে গেছে।

গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে প্রাচীন অশ্বত্থ, বট ও মনসা গাছের নীচে পঞ্চাননের নির্দিষ্ট বাঁধানো স্থান ও বিবিমার একটি বেদী আছে। পঞ্চাননের স্থানে কোন মূর্তি নেই, কয়েকটি পাথরখণ্ডই পঞ্চাননের প্রতীক। মাঝে মাঝে গ্রামবাসীরা পঞ্চাননের পূজো দেন। বর্তমান সেবায়েত মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীহরিসাধন বসু। বিবিমার সেবায়েত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বসু। গ্রামে কলেরা প্রভৃতি মহামারী দেখা দিলে নিকটবর্তী হাটবেড়িয়া গ্রামের আলীবক্স মোল্লাকে দিয়ে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় বিবিমার পূজো দেন। প্রতি বৎসর পৌষ মাসের শুক্লপক্ষে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা খিচুড়ী ও পায়েস রান্না করে এই স্থানে বসে খাওয়া-দাওয়া করেন। পৌষ মাসে বিবিমার পূজো উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের কয়েকটি দোকান বসে।

জয়রামপুর

চব্বিশ-পরগণা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত জয়রামপুর (মৌজা নং ৩৪) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে সাড়ম্বরে খড়্গেশ্বর শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। জয়রামপুর গ্রামটি আমতলার নিকটবর্তী এবং কলিকাতা হইতে মোটরবাসে যাতায়াত করিতে পারা যায়। গ্রামে ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, আচার্য বামুন, নাপিত প্রভৃতি সম্প্রদায় বসবাস করেন।

খড়্গেশ্বর প্রতিষ্ঠিত দেবতা নহে ; লোকে বলেন ইনি স্বয়ম্ভু শিব। প্রায় দুই শতাধিক বৎসর পূর্বে জয়রামপুরে খড়্গেশ্বর শিবের আবির্ভাব হয়। ইহার আবির্ভাব সম্পর্কে গ্রামে কিংবদন্তী শোনা যায়। খড়্গেশ্বর শিব বিশেষ জাগ্রত দেবতা বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। ইনি নিকটবর্তী কল্যানগরী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত চণ্ডী দেবীর ভৈরব বলিয়া খ্যাত।

খড়্গেশ্বরের বর্তমান মন্দিরটি চব্বিশ-পরগণার বন্দেল নিবাসী প্রিয়নাথ রায় ও তাঁহার স্ত্রী কুসুম কুমারী দাসী কর্তৃক ১৩২৯ বঙ্গাব্দে নির্মিত। ইহার পূর্বে খড়ের ছাউনীযুক্ত একটি চালাঘরে খড়্গেশ্বর শিবের পূজাদি হইত। একদা খড়্গেশ্বর শিবের নিকট 'হত্যা' দিয়া শ্রীরায় দুরা-রোগ্য ব্যাধি হইতে নিরাময় লাভ করেন এবং শিবমন্দিরটি নির্মাণ করিয়া দেন। বর্তমান সুউচ্চ ইষ্টক নির্মিত মন্দিরটি আটচালা রীতিতে গঠিত বটে তবে উহার উপরের চালাটি ছত্রকারে সজ্জিত। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী এবং ইহার চারিদিক রক্ দ্বারা বেষ্টিত। মন্দিরাভ্যন্তরে ঘরের মেঝে

ভেদ করিয়া প্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গটি উঠিয়াছে এবং ইহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া গৌরীপট্টটি পৃথকভাবে স্থাপিত। মন্দির সম্মুখস্থ প্রশস্ত পাকা নাটমন্দিরটি সরগুনা নিবাসী রাধাকান্ত নস্কর ও গৌরহরি নস্কর কর্তৃক ১৩৩১ বঙ্গাব্দে নির্মিত।

শিবমন্দিরের দক্ষিণ দিকে স্নানাদির জন্য একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে ; ইহার উত্তর পাড়ের প্রশস্ত ঘাট এবং ঘাট হইতে মন্দির অবধি রাস্তাটি বিষ্ণুপুর থানার নাদাভাঙ্গা গ্রামের প্রেমচাঁদ মণ্ডল ১৩১৭ বঙ্গাব্দে ইট দ্বারা বাঁধাইয়া দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন, মন্দির হইতে কিছু দূরে পশ্চিম দিকে 'জাহ্নবী সরণী' নামে পূর্বদিকে বাঁধানো ঘাটসহ আর একটি পুষ্করিণী আছে। যাত্রীদের পানীয় জলের জন্য ১৩২৭ বঙ্গাব্দে বন্দেল নিবাসী শ্রীধর চন্দ্র রায় ইহা খনন করেন। স্নানাদির জন্য এই পুষ্করিণীটি ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না। খড়্গেশ্বর শিবের উৎসবাদি উপলক্ষে উক্ত পুষ্করিণীর সহিত অস্থায়ী টিউবওয়েল সংযুক্ত করিয়া যাত্রীদের জল পানের ব্যবস্থা করা হয়।

শিবমন্দির প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে দক্ষিণমুখী সমতল ছাদ বিশিষ্ট একটি ঘরে প্রস্তর নির্মিত দক্ষিণাকালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিটি প্রাচীন, তবে মন্দিরটি বাদল চন্দ্র বারিক কর্তৃক ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে নির্মিত। নিত্য পূজা ব্যতীত এই মন্দিরে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে পাঁঠা বলি সহ ধুমধামের সহিত পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

শিবের নাটমন্দির সংলগ্ন একটি প্রাচীন অশ্বত্থগাছ ও একটি শেওড়াগাছের নীচে ইট দ্বারা বাঁধানো স্থানে দুইটি মাটির ঢিপি আছে—ইহা বিবিমার স্থান। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই বিবিমার স্থানে পূজাদি দিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর বৈশাখ ও অগ্রহায়ণ মাসে বিবিমার স্থানে হাজত পূজা দেওয়া হয়। মৌয়াখালি গ্রামের রূপজান বিবি নামে জনৈক স্ত্রীলোক বিবিমার পূজা করেন। চৈত্র মাসে খড়্গেশ্বর শিবের মন্দিরে নীলের বাতি দিতে আসিয়া অনেক হিন্দু রমণী বিবিমার স্থানেও প্রদীপ দিয়া যান।

খড়্গেশ্বর মন্দির হইতে সামান্য দূরে পূর্বদিকে ব্যক্তি-বিশেষের একটি মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে এই মন্দিরে রথযাত্রা উৎসব পালন করা হয়।

গ্রামের বামুনপাড়ায় রাস্তার ধারে খড়ের চালাযুক্ত একটি ইষ্টক নির্মিত ঘরে স্থানীয় চক্রবর্তীদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি মৃন্ময়ী শীতলা মূর্তির সহিত মনসা মূর্তি ও নারায়ণ শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। উল্লিখিত দেবদেবীর নিত্য পূজা হয়।

জয়রামপুর গ্রামে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উৎসব চৈত্র মাসে খড়্গেশ্বর শিবের গাজন। ইহা কেবলমাত্র জয়রামপুর গ্রামের নহে, চব্বিশ-পরগণা জেলার প্রসিদ্ধ গাজন উৎসব-গুলির মধ্যে খড়্গেশ্বরের গাজন অন্যতম। অনেকে বলেন হুগলীর যেমন তারকেশ্বর, চব্বিশ-পরগণার তেমন খড়্গেশ্বর শিব। কথাটির মধ্যে কিছু অতিশয়োক্তি আছে সত্য তবে খড়্গেশ্বর শিবের গাজন উৎসবের আড়ম্বর ও লোকসমাগম নগণ্য নহে।

চৈত্র মাসের সুরু হইতে খড়্গেশ্বর শিবের গাজন উৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। ২৬শে চৈত্র হইতে ভক্তরা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। প্রতি বৎসর প্রায় দশ-বার হাজার নরনারী সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহারা দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণা জেলার এক বিস্তৃত অঞ্চলের বাসিন্দা। হিন্দু জাতির উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর যে-কোন ব্যক্তিই সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে সকলকেই যে মন্দিরের পুরোহিতের নিকট আসিয়া অনুমতি গ্রহণ করিতে হয় তেমন কোন নির্ধারিত নিয়ম নাই। যে-কোন ব্যক্তিই আপন গ্রামে থাকিয়া খড়্গেশ্বর শিবের নামে সংকল্প করিয়া নিজেই সন্ন্যাসব্রতী হইতে পারেন। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ কালে তাহারা গলায় উত্তরীয় পরেন, সঙ্গে একটি নূতন গামছা রাখেন, কেহ কেহ হাতে বেতের ছড়ি রাখেন এবং এক বেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও শুদ্ধাচারে দিন অতিবাহিত করেন। গাজনে একজন মূল সন্ন্যাসী থাকেন, ইনি অন্যান্য সন্ন্যাসব্রতীদের পরিচালনা করেন। বর্তমান বৎসরে (১৩৭৫ বঙ্গাব্দ) মূল সন্ন্যাসীর কাজ করেন গোপ সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীঅতুল ঘোষ।

গাজন উপলক্ষে খড়্গেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে সর্বাপেক্ষা অধিক জনসমাগম হয় ২৮শে ও ২৯শে চৈত্র। এই দুই-দিন সন্ন্যাসব্রতীসহ নানা স্থান হইতে প্রায় বিশ হাজার

ভক্ত ও দর্শকের সমাগম হইয়া থাকে এবং সন্ন্যাসব্রতী ব্যতীত অন্যান্য ভক্তরা মানসিক করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে দণ্ডী খাটেন। প্রতিদিন ভোর রাত্র হইতে দণ্ডী খাটা আরম্ভ হয় এবং মধ্যাহ্ন গড়াইয়া অপরাহ্ণ পর্যন্ত অগণিত ভক্তদের অবিরাম দণ্ডীখাটা চলে। মানতকারীরা দণ্ডী খাটিতে খাটিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া নিকটস্থ দক্ষিণ দিকের পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া দলে দলে মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং শিবলিঙ্গের উপর ডাবের জল ও দুধ ঢালিয়া দিয়া শিব স্পর্শ করিয়া প্রণাম জানান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দণ্ডী খাটা কালে ভক্তরা যে পয়সা (কেহ দশ, কেহ সিকি, কেহ আধুলী—ভক্তদের ইচ্ছানুসারে) দিয়া দণ্ডীর দাগ টানেন উহা সেবায়েতদিগের প্রাপ্য। পুষ্করিণীর ঘাটে সেবায়েতগণ ঐ অর্থ আদায় করেন। ভক্তদের স্নানাদির ফলে এই বৃহৎ পুষ্করিণীর জল মধ্যাহ্নের পূর্বেই পঙ্কিল হইয়া পড়ে। স্নানের ঘাটে এবং মন্দিরে প্রবেশার্থী ভক্ত ও দর্শকদিগের ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশবাহিনী ব্যতীত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবকদলের শতাধিক ব্যক্তি সারাদিনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন।

দণ্ডী খাটা ব্যতীত অনেকে মানসিক করিয়া মস্তক মুণ্ডন করেন। বর্তমানে এই গ্রাম নিবাসী শ্রীকানাই লাল প্রামানিক ক্ষৌরকর্ম করেন। ইঁহারা গত তিন পুরুষ যাবত বংশানুক্রমে এই কার্য করিতেছেন।

চৈত্র মাসের ২৮, ২৯ ও ৩০শে তারিখে শিবমন্দির প্রাঙ্গণে, বিবিমাতলায় এবং বামুনপাড়ায় শীতলামন্দিরের নিকট বাঁশের মাঁচা বাঁধিয়া গাজনের মূল সন্ন্যাসী 'কাঁটা-ঝাপ', 'বঁটি ঝাপ' ইত্যাদি পর্ব পালন করেন। উৎসবের তিনদিন বিকালে ঢাক-ঢোল, কাঁসির বাদ্যসহ দলে দলে আগত গাজন সন্ন্যাসীরা চক্রাকারে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে মুখে খড়্গেশ্বর শিবের জয়ধ্বনি দিয়া উৎসব প্রাঙ্গন মাতাইয়া তুলেন। তাঁহাদের পরস্পরের বেতের লাঠির আঘাতে, ঢাক-ঢোল বাজনার শব্দে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠে।

চৈত্রসংক্রান্তির দিন রাত্রি বার ঘটিকায় শিবের নিকট একটি বিশেষ ভোগ নিবেদন করিয়া উহা পুষ্করণীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই ভোগ ভাসানর সময় ঘাটে ঢাক-ঢোল ও সানাই বাজিতে থাকে।

১লা বৈশাখ সন্ন্যাসীদের গলার উত্তরীয় খুলিয়া তাঁহাদের সন্ন্যাসব্রত হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। বিকালে মন্দির প্রাঙ্গণের উত্তরদিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে গোষ্ঠ উৎসব অনুষ্ঠানের পর খড়্গেশ্বর শিবের গাজন উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

গাজন উৎসব ব্যতীত খড়্গেশ্বর শিবকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি, বৈশাখী পূর্ণিমায় অভিষেক উৎসব এবং নিত্য যথারীতি পূজা ও সারা কার্তিক মাসব্যাপী ভোর ৪ ঘটিকায় মঙ্গলারতি হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, খড়্গেশ্বর শিব বিশেষ জাগ্রত দেবতা বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। শোনা যায় মনস্কামনা জানাইয়া মন্দিরে 'হত্যা' দিলে শিবের প্রত্যাদেশ পাওয়া যায়। মূলতঃ দুরারোগ্য ব্যধি হইতে নিরাময়ের জন্য প্রতিদিনই ভক্তরা 'হত্যা' দিয়া থাকেন। কেবলমাত্র চৈত্র মাসের গাজন উৎসবের কয়দিন মন্দিরে 'হত্যা' দিবার অনুমতি দেওয়া হয় না। খড়্গেশ্বর শিবের মাহাত্ম্যের প্রতি সাধারণ লোকের যে কত অচল বিশ্বাস তাঁহার প্রমাণ স্বরূপ প্রসঙ্গতঃ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বৎসর সন্ন্যাসব্রতীদের মধ্যে চব্বিশ-পরগণার দক্ষিণ গড়িয়া নিবাসী বৃদ্ধ শ্রীনিরোদ বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেতা ৺দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতা) মহাশয়ের সহিত আলাপে জানিলাম যে, তিনি গত ৩০ বৎসর যাবত খড়্গেশ্বর শিবের গাজনে সন্ন্যাসব্রত পালন করিতেছেন। ত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি টি, বি, রোগে আক্রান্ত হন; সেই সময় এই রোগের সুচিকিৎসার অভাব ছিল। প্রচলিত চিকিৎসায় তাঁহার রোগের বিশেষ উপশম না হওয়ায় তিনি খড়্গেশ্বর শিবমন্দিরে আসিয়া 'হত্যা' দেন এবং শিবের প্রত্যাদেশিত ঔষধের দ্বারা আরোগ্যলাভ করেন। তদবধি প্রতি বৎসর তিনি সন্ন্যাসব্রত পালন করিতেছেন। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীও আছেন; তাঁহাকে মন্দির প্রাঙ্গণে দণ্ডী খাটিতে দেখিলাম। ৭ বৎসর পূর্বে তিনি খড়্গেশ্বর শিবের প্রত্যাদেশিত ঔষধ পাইয়া চক্ষুপীড়া হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং সেই কারণে প্রতি বৎসর তিনি মন্দিরে দণ্ডী খাটিতেছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার জীবনের উপলব্ধির কথা বলিতে গিয়া বার বার নিজের মনেই বলিলেন 'বড় জাগ্রত দেবতা',

'বড় প্রত্যক্ষ দেবতা'। এই বিশ্বাস শুধু শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়েরই নয়, আলাপ করিয়া দেখিয়াছি অনেকের মনের কথাই তাই।

সাধারণত ভক্তরা খড়্গেশ্বর শিবের নিকট অর্থ-বস্ত্র, অলঙ্কার এবং গরু, বাছুর, ছাগল প্রভৃতি পশু মানত করিয়া থাকেন। মানতের পশুগুলি বলি দেওয়া হয় না; উহা সেবায়েতগণ পাইয়া থাকেন। স্থানীয় চক্রবর্তী পদবীধারী ব্রাহ্মণগণ কয়েক পুরুষ ধরিয়া খড়্গেশ্বরের সেবায়েত নিযুক্ত আছেন; ইঁহাদের আদি বাড়ী সরশুনা গ্রামে; পূর্ব সেবায়েতদিগের দৌহিত্রসূত্রে ইঁহারা সেবায়েতের অধিকার পাইয়াছেন। এই পরিবারের প্রায় ৮৭ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীশরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত আলাপে জানা যায় যে, তাঁহাদের বাল্যকালে যখন এই স্থানে বৈদ্যুতিক বাতি ছিল না, তখন অনেক ভক্ত মানত হিসাবে খড়্গেশ্বরের মন্দিরে '১৪ নম্বর' বা '২০ নম্বর' পেট্রোম্যাক্স দিতেন। শিবের নিত্য পূজাদির জন্য সামান্য কয়েক বিঘা দেবোত্তর জমি আছে।

খড়্গেশ্বর শিবের গাজন উপলক্ষে প্রতি বৎসর ২৭শে চৈত্র হইতে সংক্রান্তি তিথি পর্যন্ত মন্দির প্রাঙ্গণে এবং নিকটবর্তী প্রায় পনর বিঘা চাষের জমিতে একটি বড় মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং ইহাতে বিষ্ণুপুর, মহেশতলা, বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার, গড়িয়া, সোনারপুর প্রভৃতি বিভিন্ন থানা হইতে প্রায় বিশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় আড়াইশত হইতে তিনশত দোকান-পাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, হোটেল জাতীয় দোকান এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। বড় বড় ময়রা দোকানগুলির অধিকাংশই বিষ্ণুপুর থানার গোতলা হাট হইতে আসে; ইহা ভিন্ন, বজবজ হইতেও ময়রারা আসেন। কলিকাতা ও ডায়মণ্ডহারবার হইতে মনিহারী, এ্যালুমিনিয়ম ও কাঁচের ও লোহার বাসনপত্র, তৈয়ারী জামাকাপড়; বজবজ, বিষ্ণুপুর ও ডায়মণ্ডহারবার হইতে কাঠের তৈয়ারী জিনিসপত্র, লোহার তৈয়ারী কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশের বাঁশি, সরা, ঢোল, তালপাতা ও ময়ূরপুচ্ছের পাখা, মাদুর, ধামা-কুলো-কুনকে; মৌয়াগালি গ্রামের মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল; কলিকাতা হইতে শঙ্খ ও শাখা, কাঁচের চুড়ি ও গহনা, প্লাষ্টিকের খেলনা, রঙ্গিন চশমা ও কলম, টর্চ ইত্যাদি জিনিসপত্র আমদানী হয়। ইহা ব্যতীত, সরবত, চা-পান-বিড়ি, ছোলা, বাদাম, মুড়ি-মুড়কি, বই-পঞ্জিকা, ছবি, শশা, কলা, তরমুজ, বেল, সবেদা, ডাব এবং সূচী-শিল্পের দোকান ও অনেকগুলি নৈবেদ্যের দোকান বসে। ফেরিওয়ালারা বেলুন, বাঁশের বাঁশি, চুলের ফিতা, কাঁটা ইত্যাদি মেলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিক্রয় করেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচ, প্রায় কুড়িটি অশ্বচক্র ও নাগরদোলার দল, জীব-জন্তু প্রদর্শনী ও ম্যাজিকের দল আসে। ইহা ভিন্ন, ফটো তুলিবার দোকান ও উল্কি তুলিবার দল আসে।

মেলা ও উৎসবে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে পুলিশ-বাহিনী ব্যতীত '২৪-পরগণা সেবা সংসদ', '২৪-পরগণা সেবা সমিতি', 'দরিদ্রভাণ্ডার', 'হিতব্রতী', 'নিউ চব্বিশ-পরগণা জনকল্যাণ সমিতি' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের বহু স্বেচ্ছা-সেবক উল্লেখযোগ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। জনস্বাস্থ্যের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

বাখরাহাট

বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বাখরাহাট (মৌজা নং ৪৬) একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামটি মাহিষ্য প্রধান। ইহা ভিন্ন, কুম্ভকার, স্বর্ণবণিক, বৈরাগী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বসবাস আছে। গ্রামবাসীর প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য ও ব্যবসায়। গ্রামে উচ্চ বিদ্যালয়, ডাকঘর ও বাজার আছে। কলিকাতা হইতে আমতলা হইয়া মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করিতে পারা যায়।

বাখরাহাট গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত প্রায় দেড় বিঘা প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া

আছে রাধাবল্লভজীউর সুগঠিত বিশাল আটচালা মন্দির। মন্দিরটি স্থানীয় কৃষ্ণচরণ মণ্ডল কর্তৃক ১২১৯ বঙ্গাব্দে স্থাপিত; ইহারা বাওয়ালীর মণ্ডলদিগের জ্ঞাতি। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরের অভ্যন্তরে কাঠের মঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত কষ্টি পাথর নির্মিত কৃষ্ণ মূর্তি এবং পিতল নির্মিত গোপাল মূর্তি। পূর্বে কৃষ্ণের পাশে অষ্টধাতু নির্মিত রাধারাণীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ২২শে চৈত্র রাধারাণীর মূর্তিটি মন্দির হইতে অপহৃত হইয়াছে।

মন্দিরে প্রত্যহ প্রাতঃকালীন পূজা, মধ্যাহ্নে ভোগ-পূজা, বৈকালীন পূজা এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি ও শীতলপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ভিন্ন, প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা এবং ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোলযাত্রা ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে দোলযাত্রা উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসিত; বহুকাল হইল মেলাটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় শ্রীকালী কুমার মণ্ডল ও তাঁহাদের অন্যান্য শরিকগণ রাধাবল্লভজীউর বর্তমান সেবায়েত। শ্রীদেবদাস শর্মা নামে জনৈক বেতন ভোগী গোস্বামী ব্রাহ্মণ রাধাবল্লভজীউর নিত্য পূজাদি করিয়া থাকেন। রাধাবল্লভজীউর নামে দেবোত্তর প্রায় ত্রিশ বিঘা জমি আছে; ঐ জমির আয় হইতে বিগ্রহাদির নিত্য পূজাদি হইয়া থাকে।

বাখরাহাট বাজারের নিকট প্রতিষ্ঠিত শীতলাপূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর মাঘ-ফাল্গুন মাসে একটি বড় মেলা বসে।

জয়চণ্ডীপুর

কলিকাতা হইতে আমতলা হইয়া মোটরবাসে বাখরাহাট বিদ্যালয়ের সম্মুখে নামিয়া দক্ষিণমুখী একটি রাস্তা ধরিয়া জয়চণ্ডীপুর (মৌজা নং ৫০) গ্রামে পৌছান যায়। গ্রামটি মাহিষ্য প্রধান; ইহা ভিন্ন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কাওরা, ধোপা, নাপিত, মুচি, বাগ্দী, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বসবাস আছে।

জয়চণ্ডীপুরের সিদ্ধেশ্বরী কালী বিশেষ জাগ্রত ঈশ্বরী বলিয়া বিশ্বাস। গ্রামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর পাড়ে সমতল ছাদ বিশিষ্ট দক্ষিণমুখী পাশাপাশি তিনটি পাকা ঘরের মধ্যেরটিতে সিদ্ধেশ্বরী কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের চারিদিক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মন্দিরাভ্যন্তরে একটি বাঁধান বেদীর উপর কাঠের মঞ্চের মধ্যে শিলায় খোদিত শবরূপী শিবের বক্ষস্থলে প্রায় দুই ফুট উচ্চ বস্ত্র পরিহিতা ত্রিনয়নী, চতুর্ভুজা দক্ষিণা কালিকা দণ্ডায়মানা। মূর্তিটি কষ্টি পাথর নির্মিত এবং ইহার গঠন ভঙ্গী অতি সুন্দর। ইহা ভিন্ন, সিদ্ধেশ্বরীর ঘরে মৃন্ময় দক্ষিণরায়ের মূর্তি, মাটির মালসায় মনসা ও পিতলের ঘটে চণ্ডীপূজা হইয়া থাকে।

শোনা যায়, বহুকাল পূর্বে উল্লিখিত পুষ্করিণী হইতে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের জনৈক মহিলার জালে একটি মুখমণ্ডল ও একটি ঘট উঠে এবং স্বপ্নাদেশ অনুসারে ঘটটিকে একটি হোগলার কুড়ে ঘরে স্থাপন করিয়া দক্ষিণা কালিকার ধ্যানে পূজার ব্যবস্থা করা হয়। পরে সুকদেবপুরের পালেরা দেবীর নিকট মানসিক করিয়া মামলায় জয়ী হইয়া হোগলার ঘর ভাঙ্গিয়া একটি পাকা মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। সেই মন্দির জীর্ণ হইয়া পড়িলে বর্তমান মন্দিরটি মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত শী পরিবার নির্মাণ করেন।

সিদ্ধেশ্বরী দেবীর নিত্য পূজা হয়। ইহা ভিন্ন, প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যায় সাড়ম্বরে পূজা এবং মাঘ মাসে 'আক্ষিণপূজা' অনুষ্ঠিত হয়। আক্ষিণপূজা উপলক্ষে মাঘ মাসে মন্দির প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসে। প্রধানতঃ বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা স্ত্রীলোকগণ সন্তান কামনায় সিদ্ধেশ্বরীর নিকট মানসিক করিয়া থাকেন। মানত হিসাবে অর্থ, বস্ত্র বা পাঠা বলি মানত করেন এবং মানত জানাইয়া অনেকে শিশুর মস্তক মুণ্ডনও করিয়া থাকেন। প্রতি দিনই মানত পূজা দিতে মন্দিরে যাত্রীরা আসেন। আদিতে স্থানীয় চট্টোপাধ্যায় পরিবার সিদ্ধেশ্বরী দেবীর সেবায়েত ছিলেন; বর্তমানে তাঁহাদের দৌহিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়গণ দেবীর সেবায়েত নিযুক্ত আছেন।

সিদ্ধেশ্বরী দেবীর পশ্চিম পাশের ঘরে একটি বাঁধান বেদীর উপর ধর্মরাজের ঘট ও বেদীর উভয় পার্শ্বে প্রায় দুই ফুট উচ্চ প্রস্তর নির্মিত দুইটি বিষ্ণু মূর্তি রক্ষিত আছে। বেদীর দক্ষিণ দিকের বিষ্ণু মূর্তিটির দক্ষিণের উপরের হাতে গদা ও নীচের হাতে চক্র, বাম দিকের উপরের হাতে শঙ্খ

ও নীচের হাতে পদ্ম আছে। অপর পক্ষে বেদীর বাম পার্শ্বে রক্ষিত বিষ্ণু মূর্তিটির দক্ষিণের উপরের হাতে শঙ্খ এবং নীচের হাতটি ভগ্ন, বাম দিকের উপরের হাতে গদা ও নীচের হাতে চক্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই উভয় মূর্তির নিম্নভাগের উভয় পার্শ্বে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মানা বীণাবাদ্যরতা নারী মূর্তি খোদিত আছে। ধর্মরাজের সহিত একই ঘরে শিবের পূজা হয়—শিব মূর্তি আছে। ইহা ভিন্ন, এই ঘরে প্রস্তরের ভগ্ন মুখমণ্ডল ও কয়েকটি পাথর খণ্ড আছে। ধর্মরাজ ঠাকুরের নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের অভিষেক উৎসব ও তদুপলক্ষে একটি মেলা বসে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজা উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ করেন না; যদিও ধর্মরাজের সহিত একই ঘরে শিব এবং পাশের ঘরে দক্ষিণাকালী অবস্থান করিতেছেন। ধর্মরাজের সহিত শিবের পূজা করেন শ্রীজিতেন পণ্ডিত; ইনি মুর্গী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ। অপরপক্ষে সিদ্ধেশ্বরীর পূজা করেন উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ। বর্তমানে বেতনভোগী পূজারী শ্রীফনি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত পঞ্চাশ বৎসর যাবত সিদ্ধেশ্বরী দেবীর নিত্য পূজাদি করিতেছেন। অবশ্য ধর্মরাজ বা সিদ্ধেশ্বরী দেবীর নিকট ভক্ত তিনি উচ্চ বা নিম্ন যে-কোন শ্রেণীরই হউন তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে পূজা দিতে কোন বাঁধা নিষেধ নাই।

জয়চণ্ডীপুর গ্রামে এই যে, একই ঘরে ধর্মরাজ ও শিবের এবং পাশের ঘরে দক্ষিণাকালীর অবস্থান; এক ঘরে নিম্ন বর্ণের ব্রাহ্মণের পূজা এবং পাশের ঘরে উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণের পূজা ইহা হইতে ধর্ম তথা সংস্কৃতি সমন্বয়ের একটি সুন্দর ছবির আভাস পাওয়া যায়।

ইহা ভিন্ন, গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে জঙ্গলাবৃত একটি জমিতে 'থানে খোদার' নির্দিষ্ট স্থান আছে। স্থানীয় মোল্লারা থানে খোদার পূজা করেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই থানে খোদার নিকট পূজা দিয়া থাকেন। পৌষ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবার হিন্দুগণ এবং শুক্রবার মুসলমানগণ হাজত পূজা দিয়া থাকেন। পৌষ মাসে এই স্থানে একটি মেলাও বসে। ইহা ভিন্ন, গ্রামে পঞ্চানন ও দক্ষিণ-রায়ের ঘট স্থাপিত আছে।

মেলা বিবরণী

গোষ্ঠযাত্রার মেলা

নাদাভাঙ্গা গ্রামে প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ রাধাকৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রা উৎসব উপলক্ষে একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন এবং পাঁচ-ছয়দিনব্যাপী চলে। গাজীপুর, মৌখালী, বাখরাহাট প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রায় পাঁচ-ছয়শত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, ধামা, কুলো, চাঙ্গারী প্রভৃতি বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকান এবং মাটির পুতুল, খেলনা ও হাঁড়িকুড়ির দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য মেলায় যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

মংজখালি গ্রামে প্রতি বৎসর ১৮ই বৈশাখ রাধাকৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রা উৎসব উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় এগার বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন। আশপাশের প্রায় সমস্ত গ্রাম হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় চার সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় শতাধিক দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ জয়নগর, বারুইপুর, মগরাহাট, আমতলা, বাখরাহাট ও কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। সমগ্র দোকান-পাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত মনিহারী দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, কোদাল, কাস্তে, বেড়ী-হাতা, ছুরি, কাঁচি, বই-ছবি, ঔষধপত্র প্রভৃতির দোকান এবং শিল্পসামগ্রীর দোকানপাট বসে। শিল্পসামগ্রীর দোকানগুলি বলাখালী, রসখালী ও বাখরাহাট প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ঘোড়দৌড়, পুতুলনাচ, নাগরদোলা এবং কবিগান ও যাত্রাভিনয় হয়।

ভাডু রামকৃষ্ণপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ গোষ্ঠ উৎসব উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর চার-পাঁচদিনব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং প্রতিদিন বিকালে মেলায় বেচাকেনা হয়।

আশপাশের গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় এক সহস্র নরনারীর সমাগম হয় এবং ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকান এবং চার-পাঁচটি মনিহারী দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচ ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। প্রতি বৎসর কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রার দল আসে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—চৈত্র মাসে বলদেবের রাস উৎসব উপলক্ষে এই গ্রামে অনুরূপ একটি মেলা হয়।

রথযাত্রার মেলা

কাঞ্চনবাড়িয়া গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং দুইদিনব্যাপী চলে।

গগনগোহালিয়া, নাদাভাঙ্গা, চন্দনদহ, মৌখালী, গাজীপুর প্রভৃতি মৌজা হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় দশ হইতে বারশত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়।

মেলায় পঁচিশ হইতে ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং দশ-বারজন ফেরিওয়ালা আসেন। আশপাশের গ্রাম হইতেই প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত কয়েকটি মনিহারী দোকান, মাটির খেলনা ও হাঁড়িকুড়ির দোকান, ধামা, কুলো, চ্যাঙ্গারী ইত্যাদির দোকান ও বই-ছবির দোকান বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য মেলায় নাগরদোলা, ম্যাজিক ও পুতুলনাচের ব্যবস্থা থাকে।



থানা ঃ সোনারপুর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ খুড়িগাছি। ২১।২৭৫·৭২।১৪৯।১,০৮২

(ক) হিন্দু।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন সোনারপুর হইতে গোড়খাড়া গ্রাম হইয়া একটি কাঁচা রাস্তা খুড়িগাছি পর্যন্ত গিয়াছে। ঐ রাস্তা দিয়াই গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন ব্যতীত ধূমধামের সহিত শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শীতলাপূজা উপলক্ষে একযোগে হরিসভা ও রক্ষাকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং গ্রামবাসীগণ চার-পাঁচদিনব্যাপী উৎসব পালন করিয়া থাকেন। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি শীতলামন্দির আছে। মন্দিরে শীতলার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীসুধাংশু কুমার বসু, চাকুরী,
গ্রাম ঃ কামরাবাদ,
পোঃ সোনারপুর, ২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ গোড়খাড়া। ২২।২৮৫·৪১।১১১।৯২৭

(ক) হিন্দু। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন সোনারপুর হইতে গ্রাম পর্যন্ত একটি মেটে রাস্তা গিয়াছে। ঐ রাস্তা দিয়াই গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামের অন্যতম প্রধান উৎসব চড়ক। প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রাচীন। ইহা ব্যতীত, গ্রামে একটি সর্বজনীন রক্ষাকালীপূজা ও একটি ব্যক্তিগত সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে সর্বজনীন মনসাপূজা ও গোষ্ঠীগতভাবে অরন্ধন উৎসব পালন করা হইত। বর্তমানে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন পরিবারে মনসাপূজা হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। মন্দিরে শিবলিঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীসুধাংশু কুমার বসু, চাকুরী,
গ্রাম ঃ কামরাবাদ,
পোঃ সোনারপুর, ২৪-পরগণা।

৩। গ্রাম ঃ সোনারপুর। ৩৯।৫১৯·২৩।৬১৯।৩,৭৭৭

(ক) হিন্দু। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে। যেমন—ঘোষপাড়া, বৈদ্যপাড়া, সাহেবপাড়া, বেয়ারাপাড়া, সর্দারপাড়া, মুচিপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন সোনারপুর। কলিকাতা হইতে মোটরবাসে সোনারপুর পৌছানো যায়। বাস যাতায়াতের রাস্তাটি পাকা।

(ঘ) গ্রামে বৈশাখ মাসে গোষ্ঠ উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গোষ্ঠ ও গাজন এই উৎসব দুইটি প্রাচীন এবং গ্রামের কৃষি ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজাটি সর্বজনীন এবং সরস্বতীপূজাটি ব্যক্তিবিশেষের।

(ঙ) গোষ্ঠ উৎসবের মেলা। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) সোনারপুর বাজারের মধ্যে একটি পীরের স্থান আছে। সপ্তাহে প্রতি শনি ও মঙ্গলবার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই পীরের স্থানে পূজা দিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত, গ্রামে সাধারণের একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি নবগঠিত।

শ্রীসুধাংশু কুমার বসু, চাকুরী,
গ্রাম ঃ কামরাবাদ,
পোঃ সোনারপুর, ২৪-পরগণা।

৪। গ্রাম ঃ নওপাড়া। ৪০।১১৪·৭৩।১৮২।১,১৩৯

(ক) হিন্দু। গ্রামে চারটি পাড়া আছে। যেমন—ঘোষপাড়া, দাস (রজক) পাড়া, যোগীপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন সোনারপুর হইতে নওয়া-পাড়া পর্যন্ত একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে স্নানযাত্রা তিথিতে গোরক্ষনাথ (শিবমূর্তি) পূজা ও উৎসব, ভাদ্র মাসে বিশ্বকর্মা পূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা হইয়া থাকে।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীসুধাংশু কুমার বসু, চাকুরী,
গ্রাম: কামরাবাদ,
পোঃ সোনারপুর, ২৪-পরগণা।

৫। গ্রাম: কামরাবাদ। ৪।১।১,৫১৫ ১১।৬৯৮।৫,০০৬

(ক) হিন্দু। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে। যেমন—পূর্ব কায়স্থপাড়া, পশ্চিম নস্করপাড়া, উত্তর কামারপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন সোনারপুর হইতে একটি রাস্তা কামরাবাদ গ্রাম পর্যন্ত গিয়াছে। ঐ রাস্তা দিয়াই গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কালীপূজা ও সরস্বতীপূজা সর্বজনীন। দুর্গাপূজা ও দোল উৎসব ব্যক্তি-বিশেষের হইলেও গ্রামবাসী সকলেই উৎসবে যোগদান করেন।

ইহা ব্যতীত, গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের গৃহদেবতা শ্রীধরজীউর একটি মন্দির আছে। মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ঐ মন্দিরে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে রাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমায় একদিন। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শ্রীধরজীউর মন্দির ও শিবমন্দির ব্যতীত একটি সাধারণের শীতলামন্দির আছে। মন্দিরে শীতলার মূর্তি, সন্তান কোলে ষষ্ঠী মূর্তি ও পঞ্চাননের শিলামূর্তি আছে। প্রতি বৎসর ষষ্ঠী ও পঞ্চানন সহ শীতলার পূজা হয়।

শ্রীসুধাংশু কুমার বসু, চাকুরী,
গ্রাম: কামরাবাদ,
পোঃ সোনারপুর, ২৪-পরগণা।

৬। গ্রাম: রাজপুর। ৫৫।৪৪১'৬৬। (শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, মাহিষ্য, বৈরাগী, গোয়ালা, পোদ, কলু, কাওরা, মুচি, হাড়ি, মেথর প্রভৃতি। এগারটি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, গোয়ালাপাড়া, কাওরা-পাড়া, কলুপাড়া, বৈরাগীপাড়া, মুচিপাড়া, হাড়িপাড়া, মেথরপাড়া ইত্যাদি।

(খ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন সোনারপুর হইতে ফিডার রোড দিয়া সাইকেলরিক্সায় অথবা কলিকাতা হইতে ৮০নং বাসযোগে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(গ) চাকুরী, কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(ঘ) বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে ব্রহ্মাপূজা ও ওলাবিবির পূজা, ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী ও শুক্লা তিথিতে হাড়িঝি নামে খ্যাত চণ্ডীপূজা ও রাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রা ও চৈত্র মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়।

ওলাবিবির পূজাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে মহামারী, মড়ক ইত্যাদি দেখা দিলে এই পূজার আয়োজন করা হয়। গ্রামের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্র-দায়ের ইহা সর্বজনীন উৎসব।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে এক সপ্তাহ-ব্যাপী।

শিবচতুর্দশী উপলক্ষে মেলা। ফাল্গুন মাসে এক সপ্তাহব্যাপী।

দোলযাত্রা উপলক্ষে মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। বহুকালের প্রাচীন।

শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা। চৈত্র মাসে এক সপ্তাহব্যাপী। বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের একটি দোলমণ্ডপ ব্যতীত পঞ্চানন্দ, শীতলা, মঙ্গলচণ্ডী ও গাড়ী সাহেব ফকিরের স্থান আছে।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ কর,
৮৮।১এ, যতীনদাস রোড, কলিকাতা-২৯
ও
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী,
গ্রাম ও পোঃ রাজপুর, ২৪-পরগণা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সোনারপুর থানার অন্তর্গত রাজপুর মিউনিসিপাল অফিসের উল্টোদিকে এবং কুলপী রোডের পশ্চিমধারে পূর্বমুখী একটি বৃহৎ আটচালা মন্দিরের অভ্যন্তরে ভবানীশ্বর নামে খ্যাত গৌরীপট্টভেদী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবলিঙ্গ একটি নয়, দুইটি; ভবানীশ্বর শিবলিঙ্গ হইতে অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটি শিবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরটি ১৭১১ শকাব্দে নির্মিত এবং ইহার পূর্বদিকের দেওয়াল গাত্রে ফুল, লতাপাতা, রাধাকৃষ্ণের মূর্তি ইত্যাদির পোড়ামাটির শিল্পকর্মদ্বারা অলঙ্কৃত। মন্দির সংস্কারকালে ঐসকল শিল্পকর্মের উপর চুণ বালির প্রলেপ পড়ায় উহার শিল্পসৌন্দর্য্য বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন, মন্দির গাত্র হইতে কয়েকটি পোড়ামাটির মূর্তি তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। শিবমন্দিরে নিত্য পূজা হয়।

এই শিবমন্দিরের উত্তর দিকে একটি পরিত্যক্ত সুন্দর দ্বিতল রাসমঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়। শোনা যায়, হরিণাভি ঘোষপরিবার কর্তৃক এই রাসমঞ্চটি নির্মিত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর চৈত্র পূর্ণিমায় হরিণাভিতে উক্ত ঘোষ পরিবারদিগের গৃহে রাধাকৃষ্ণের রাসোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ও তদুপলক্ষে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। হরিণাভিতে ঘোষদিগের দুর্গামন্দির এবং ইঁহাদিগের বসতবাটীর সম্মুখস্থ পশ্চিমমুখী দুইটি প্রাচীন আটচালা শিবমন্দির আছে। উহার দক্ষিণ পাশের মন্দিরটি খুবই জীর্ণ; উত্তরদিকের মন্দিরটি ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে সংস্কার করায় অদ্যাপি সুগঠিত আছে। পূর্বে হরিণাভি গ্রামে খুব ধুমধামের সহিত আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। বর্তমানে সুবৃহৎ প্রাচীন রথটি ভগ্নাবস্থায় ঘোষদিগের দুর্গামন্দিরের সম্মুখে রাস্তার পাশে পড়িয়া রহিয়াছে।

শিয়ালদহ-বারুইপুর রেলপথের পশ্চিম পার্শ্বে এবং সোনারপুর ও সুভাষগ্রাম রেলস্টেশনের মধ্যস্থলে বিস্তৃত ধানক্ষেত্রের মধ্যস্থলে হাড়িঝি নামে খ্যাত এক চণ্ডী দেবীর স্থান আছে। দেবী খুবই জাগ্রত ঈশ্বরী বলিয়া বিশ্বাস। রেলপথে যাতায়াতকালে বহু নরনারীকে এই স্থানে দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইতে দেখা যায়। রেল লাইনের পাশে নির্জন মাঠের উপর দরজা-জানালা বিহীন সমতল ছাদ বিশিষ্ট দক্ষিণমুখী একটি মন্দিরে হাড়িঝি চণ্ডীর বর্তমানে পূজা হয়। চণ্ডী দেবীর কোন মূর্তি নাই; মন্দিরাভ্যন্তরে একটি নির্দিষ্ট বেদীর উপর চৈত্র মাসে বৎসরান্তে একবার পূজা হয়। মন্দিরের নির্মাণ কার্য সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। পূর্বে উন্মুক্ত মাঠের উপরেই দেবীর পূজা হইত। সারা বৎসর মন্দির পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ইহার চারিপাশ খেজুরগাছ, কুলগাছ ও আগাছা ঝোপ-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। চৈত্র মাসের উৎসব উপলক্ষে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার বিভিন্ন স্থান হইতে আগত লোকজনের সমাগমে এই নির্জন প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠে। ভক্তরা অনেকে দেবীর নিকট পূজাদি দিয়া এই স্থানে রান্না করিয়া খাওয়াদাওয়া করেন। উৎসব উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে কতকগুলি দোকানপাটও বসে। উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন।

ইহা ভিন্ন, রাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নিকট ময়দানবেশ্বরী নামে এক গ্রাম্য দেবী আছেন।

(আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য।)

৭। গ্রাম : বন হুগলী। ৬৫।৯৪৮`৩৭।৬৬৪।৩,৮৫১

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে। যেমন—বুনোপাড়া, খাঁপাড়া, সর্দারপাড়া, মোল্লাপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে গড়িয়া রেলস্টেশন। ষ্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াতের রাস্তাটি আংশিক পাকা ও আংশিক কাঁচা।

(ঘ) গ্রামে আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে রাস উৎসব, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব,

এবং চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ইহা ব্যতীত, মুসলমান সম্প্রদায়ের ইদুজ্জোহা উৎসব হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে এক-দিন। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি শিবমন্দির আছে। মন্দিরে প্রস্তরময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীমায়ারাণি মণ্ডল, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ বন হুগলী, ২৪-পরগণা।

৮। গ্রাম : রায়পুর। ১০৩।১,১২৫·১৪।২৯৪।১,৭৬৮

(ক) ব্রাহ্মণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কামার, নাপিত, কাওরা ও বাগ্দী। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চম্পাহাটি। গ্রামে যাতা-য়াতের একটি প্রশস্ত কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তির তিনদিন পূর্ব হইতে ২রা বৈশাখ পর্যন্ত সমারোহে চণ্ডীপূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত প্রতি বৎসর গ্রামের হরিসভায় দুইদিনব্যাপী একটি উৎসব উপলক্ষে নাম সংকীর্তন, কবিগান ও তরজাগান হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন। কালীপূজা ও চণ্ডীপূজা বহু প্রাচীন।

রায়পুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসর ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা উৎসব উৎযাপিত হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ছাত্রবৃন্দ ও গ্রামের কিশোর সঙ্ঘ কর্তৃক এই উৎসব পালিত হয়। উৎসব উপলক্ষে কয়েকদিনব্যাপী প্রদর্শনী, কুস্তি, ব্যায়াম, সাঁতার, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি প্রতিযোগিতা ও খেলাধূলা এবং হাস্যকৌতুক, দেশাত্ম-বোধক ও বাউল সংগীত হয়।

(ঙ) চণ্ডীপূজার মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির তিনদিন পূর্ব হইতে ২রা বৈশাখ পর্যন্ত। মেলাটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

স্বাধীনতা দিবস উৎসবের মেলা। দুইদিনব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতিকালের।

(চ) গ্রামের মধ্যস্থলে চণ্ডী দেবীর পাকা মন্দির এবং কালীপূজার নির্দিষ্ট বাঁধানো স্থান ব্যতীত একটি পঞ্চানন, একটি শীতলা, একটি মনসা এবং দুইটি 'বিবিমা'র স্থান আছে

শ্রীসুশীল মণ্ডল, শিক্ষক,
রায়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : রায়পুর, পোঃ চম্পাহাটি, ২৪-পরগণা।

৯। গ্রাম : সাঙ্গুর। ১০৮।৮০৫·৯২।২৯৪।১,৪৪২

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে। যেমন—পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়পাড়া, সৎচাষীপাড়া ও মুসলমানপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, কুটীর শিল্প ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চম্পাহাটি। জেলা বোর্ডের রাস্তা (ভাঙ্গর রোড) দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে রাধাকৃষ্ণের গোষ্ঠ উৎসব, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ও শীতলাপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন ও সর্বজনীন।

(ঙ) গোষ্ঠযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে গাজী মোবারক আলী পীরের একটি স্থান আছে এবং পঞ্চানন্দ ও বনদেবীর পূজা হয়।

শ্রীজ্ঞানদা প্রসাদ নস্কর, প্রধান শিক্ষক,
সাঙ্গুর-নভাসন প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : নভাসন, পোঃ প্রতাপনগর, ২৪ পরগণা।

১০। গ্রাম : নভাসন। ১০৯।২০১·০০।১৬৩।৯১৩

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে। যেমন—পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়পাড়া, কাওরাপাড়া, বাগ্দীপাড়া ও মুসলমানপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, ব্যবসায় ও চাকুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চম্পাহাটী। জেলা বোর্ডের রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে গোষ্ঠপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও চড়ক ব্যতীত কালী, শীতলা, পঞ্চানন্দ, বিবিমা, বাস্তুদেবতাপূজা ও গাজীসাহেব উরস্ অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) গোষ্ঠযাত্রার মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন।

(চ) গ্রামে গাজী সাহেবের একটি স্থান আছে।

—জনৈক সংবাদদাতা।

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক বোড়াল গ্রামে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর পূজা সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

বোড়াল

বোড়াল গ্রামটি চব্বিশ-পরগণা জেলার একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামরূপে পরিচিত এবং বৃহত্তর কলিকাতা হইতে ইহা মাত্র চার মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। গড়িয়ার নিকট আদি গঙ্গার সেতু পার হইয়া ডান দিকে একটি পাকা রাস্তা সোজা বোড়াল গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া সাইকেলরিক্সা অথবা হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

অতীতে বোড়াল গ্রামের প্রান্তর দিয়া আদি গঙ্গা প্রবাহিত ছিল; বর্তমানে আদি গঙ্গা পথ পরিবর্তন করিয়া গ্রাম হইতে বহুদূর সরিয়া গিয়াছে এবং একটি শীর্ণকায় খালে পরিণত হইয়াছে। গঙ্গার তীরবর্তী এই গ্রামের মৃত্তিকাদি খনন করিয়া বহু প্রাচীন কীর্তি ও কৃষ্টিধারার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে স্থানীয় প্রবীন ব্যক্তিরা বলেন সুন্দরবনের নিকটবর্তী এই নিম্নভূমি গঙ্গার জলপ্লাবনে ডুবিয়া যাইত। এই স্থানে ক্ষেত-খামার ও ধানজমির সীমানা নির্দ্ধারক 'আল' গুলি জলে 'বুড়িয়া' অর্থাৎ ডুবিয়া থাকিত। সেই কারণে 'বোড়া-আল' হইতে বোড়াল শব্দটি উৎপত্তি হইয়াছে এবং গ্রামের নামকরণও বোড়াল হইয়াছে।

বর্তমানে বোড়াল গ্রামটি ব্যাপকভাবে তিনটি পাড়ায় বিভক্ত এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বসবাস আছে। এই গ্রামেই ঋষি রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আদি বাসস্থান ছিল; তাঁহার পৈতৃক বাস্তভিটার ভগ্নাবশেষ গ্রামের একাংশে আজিও বর্তমান এবং গ্রামবাসীর প্রচেষ্টায় কয়েক বৎসর হইল ঋষি রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, গ্রামে ডাকঘর, উচ্চবিদ্যালয়, সাধারণ গ্রন্থাগার ইত্যাদি আছে।

বোড়াল গ্রামে সরলদীঘি ও সেনদীঘি নামে দুইটি বৃহৎ প্রাচীন দীঘি আছে। বোড়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের সন্নিকটবর্তী সেনদীঘির পূর্ব প্রান্তে দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির এবং পশ্চিম প্রান্তে দেবীর ভৈরব পঞ্চানন্দের নির্দিষ্ট স্থান আছে। পঞ্চানন্দের কোন মূর্তি নাই; একটি প্রাচীন শিলাখণ্ডকে পঞ্চানন্দ জ্ঞানে পূজা করা হয়। সরলদীঘির উত্তর প্রান্তে বাবাঠাকুরের বাঁধানো স্থান আছে।

সেনদীঘির চারিপাশে নির্জন গভীর জঙ্গলাকীর্ণ সুউচ্চ মাটির স্তূপের একাংশ খনন করিয়া একদা দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর দারুময় মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। কয়েক বৎসর পূর্বেও ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের চারিপাশে সুউচ্চ মাটির স্তূপ ও গভীর জঙ্গল পরিলক্ষিত হইত। সম্প্রতি একটি ইট নির্মাণ কারখানার কল্যাণে উক্ত মাটির স্তূপ ও অরণ্যাদি অদৃশ্য হইয়াছে। ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মূর্তিটি বাংলার সেন রাজবংশের কাঁহারও দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া বিজ্ঞজনেরা অনুমান করেন। যতদূর জানা যায়, বোড়াল গ্রামের আদি জমিদার ছিলেন জগদীশ ঘোষ নামে জনৈক ব্যক্তি। তিনি মুসলমান সুবেদারের নিকট হইতে এই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলটি 'জঙ্গলকাটি পত্তনী' হিসাবে ইজারা লইয়া এই স্থানে জমিদাররূপে বসবাস স্থাপন করেন। ইঁহার অধস্তন নবম পুরুষ হীরালাল ঘোষের আমলে উক্ত ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। প্রায় সাত-আট শত বৎসরের প্রাচীন এই দারুময় মূর্তিটি দীর্ঘকাল মাটির নীচে থাকিবার ফলে উহার অধিকাংশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট হইয়া যায়। গ্রামের যে-স্থান হইতে দেবী মূর্তি আবিষ্কৃত হয়, হীরালাল ঘোষ মহাশয় সেই স্থানেই একটি ঘর নির্মাণ করিয়া উক্ত মূর্তির অনুরূপ একটি মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর ব্রাহ্মণ দ্বারা নিত্য পূজার ব্যবস্থা করেন। ইহা ১৩০১ বঙ্গাব্দের কথা। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে দেবীর তত্ত্বাবধান ও নিত্য পূজার ভার স্থানীয় একটি কমিটির হস্তে অর্পণ করা হয়। এই কমিটির নির্দেশে প্রাচীন মূর্তিটির অনুকরণে প্রায় ৫½ ফুট উচ্চ একটি অষ্টধাতুর মূর্তি নির্মাণ করিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তদবধি এই মূর্তিরই পূজাদি হইতেছে। বাস্তবিকই বাংলা দেশে এইরূপ সুন্দর ও বৃহৎ অষ্টধাতুর মূর্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত ষোড়শী মূর্তি। সমতল ছাদ বিশিষ্ট মন্দিরাভ্যন্তরে অষ্টধাতু নির্মিত একটি বেদীর উপর শবরূপে শায়িত শিবের নাভিপদ্ম হইতে উত্থিত বিকশিত পদ্মের উপর উপবিষ্টা চতুর্ভুজা, ত্রিনয়নী সুন্দরী ষোড়শী মূর্তি

প্রতিষ্ঠিত। বেদীর পাদপীঠে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ঈশ্বর ও রুদ্র—এই পঞ্চমূর্তি স্থাপিত। ব্রহ্মা চতুর্মুখ এবং রক্তবর্ণ, বিষ্ণু শ্যামবর্ণ, পঞ্চমুখ মহেশ্বরের ও ঈশ্বরের বর্ণ শুভ্র, রুদ্রের বর্ণ কমলালেবুর বর্ণের ন্যায়।

দেবীর স্তব :

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ, রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিব
এতে পঞ্চঘুরা প্রোক্তা ফলঃকস্থ পরঃশিব।
তস্যোপরি মহাকালো ভুবনেশো বিরাজতে
যেন সার্দ্ধং মহাদেবী কালীকা রমতে সদা॥

দেবীর ধ্যান :

বলার্কা মণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহুং ত্রিলোচনাম্
পাশাঙ্কুশ শরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাংশ্রয়ে॥

ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর সাংবৎসরিক উৎসব প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শুক্লা তৃতীয়া হইতে আরম্ভ হইয়া তিনদিনব্যাপী চলে। উৎসবের সময় বোড়াল ও আশপাশের গ্রাম হইতে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দশ-বার হাজার নরনারীর সমাগম হয়। উৎসবের প্রথম দুইদিন সাড়ম্বরে দেবীর পূজা, হোম, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং মন্দির প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক কালীকীর্তন, পালাকীর্তন ও ধর্মালোচনা হয়। তৃতীয় দিন অতিথি-অভ্যাগত ও দর্শনার্থীদের মধ্যে দেবীর অন্নভোগ বিতরণ করা হয়। উৎসব উপলক্ষে পূর্বে দেবীর নিকট ছাগ বলি দেওয়া হইত; বর্তমানে ছাগ বলি বন্ধ করা হইয়াছে। ষোড়শোপচারে পূজা অর্ঘ, বস্ত্র, অলঙ্কার দিয়া ভক্তরা মানসিক পূজা দিয়া থাকেন।

প্রতিদিন অন্নভোগ দিয়া দেবীর নিত্য পূজা হয়। নিত্য ভোগ-পূজার জন্য বহু দেবোত্তর ভূসম্পত্তি ছিল; বর্তমানে উহার নামমাত্রই অবশিষ্ট আছে। বর্তমান পূজারী শ্রীপশুপতি মুখোপাধ্যায়।

ত্রিপুরাসুন্দরী বিশেষ জাগ্রত দেবী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। দেবীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে বহু অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। কথিত আছে, শিবচৈতন্য স্বামী নামে জনৈক তান্ত্রিক মহাপুরুষ (ইনি জগদীশ ঘোষের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ) সেনদীঘির উত্তর পাড়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দীর্ঘকাল সাধনা করিয়া দেবীর দর্শনলাভ করিয়া ছিলেন। বাংলা দেশের বহুল প্রচলিত কিংবদন্তী অর্থাৎ নিঃসন্তান সেবায়েতের কন্যা পরিচয় দিয়া শাঁখারীর নিকট হইতে দেবীর শাঁখা পরার অনুরূপ কাহিনী এই স্থানেও শোনা যায়।

দেবীর প্রাচীন মন্দিরের ইষ্টক চূর্ণ সেবনে পাণ্ডু রোগ নিরাময় হয় বলিয়া ভক্তদের বিশ্বাস। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের রচিত 'গ্রাম্য উপাখ্যান' নামক পুস্তক হইতে জানা যায় যে, তাঁহার প্রপিতামহ এই পবিত্র ইষ্টক চূর্ণ সেবন করিয়া পাণ্ডু রোগ হইতে নিরাময় লাভ করেন। এই বিষয়ে একটি জনশ্রুতি আছে, হীরালাল ঘোষ ও গ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ১৩০১ বঙ্গাব্দে দেবীর প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নস্তূপ অপসারণ ও ঐ মন্দিরের ইট দিয়া রাস্তা মেরামতের জন্য কয়েকজন কুলি নিয়োগ করেন। স্তূপ অপসারণকালে কুলিরা আশ্চর্য হইয়া দেখে যে, ঐ ভগ্নস্তূপ হইতে অবিরতভাবে অতি সুগন্ধিযুক্ত ধূপধুনার ধোঁয়া উঠিতেছে। ঐদিন রাত্রে গঙ্গারাম নামে জনৈক কুলির সর্দার স্বপ্নাদেশে জানিতে পারে যে, দেবমন্দিরের ইষ্টকাদি অতি পবিত্র, ইহার দ্বারা রাস্তা নির্মাণ করিলে গ্রামবাসী ও তাহার নিয়োগ কর্তাদের সমূহ ক্ষতি হইবে। সেই হইতে আজিও ঐ সকল ইষ্টকাদি সযত্নে রক্ষা করা হইতেছে।

দেবীর প্রাচীন মন্দির ও স্তূপাদি খননকালে কারুকার্য-খচিত বিভিন্ন আকারের ও প্রকারের ইট, মৃৎ দ্রব্যাদি, জালের কাঠি এবং খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর একটি বিষ্ণু মূর্তি, প্রস্তরে খোদিত বিষ্ণুপাদপদ্ম, হরিণের শিং (দীর্ঘকাল মাটির নীচে থাকায় প্রায় ইহা পাথরে পরিণত হইয়াছে) পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিয়া ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাল ও সেন বংশীয় স্বাধীন রাজাগণ এই স্থানে দীঘিকা খনন, মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা ও বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। বিষ্ণু মূর্তিটি তাঁহাদের মতে পাল রাজাদের সময়কালীন।

ইহা ভিন্ন, ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে সেনদীঘির পশ্চিম পাড়ে লাল বেলে পাথরের একটি তারা মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে ইহা খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর। এই সকল প্রাচীন কীর্তি ও কৃষ্টিধারা নিদর্শনের কতকগুলি ত্রিপুরাসুন্দরী পীঠের একটি প্রকোষ্ঠে সযত্নে রক্ষিত আছে

এবং কতকগুলি কলিকাতা আশুতোষ মিউজিয়মে দান করা হইয়াছে।

বোড়াল গ্রামে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর উৎসব ব্যতীত প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে সংক্রান্তি তিথিতে স্থানীয় বকুল-বাগানের মাঠে চড়কপূজা হয়। বিকালে চড়কগাছে পাক্ খাওয়া দেখিতে গ্রামবাসীরা চড়কতলায় জমা হন। উৎসবটি প্রাচীন এবং এই উৎসব উপলক্ষে চড়কতলায় কয়েকটি দোকানপাট বসে।

উৎসব বিবরণী

দুর্গাপূজা (বুড়োমা)

রাজপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে ব্যক্তি-বিশেষের গৃহে শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা স্থানীয় অঞ্চলে 'বুড়োমা'র পূজা নামে খ্যাত। সপ্তমী তিথি হইতে দশমী তিথি পর্যন্ত দুর্গাপূজার ন্যায় যথারীতি বুড়োমার পূজা হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস বুড়োমা বিশেষ জাগ্রত ঈশ্বরী। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে গ্রামবাসী অনেকে বুড়োমার নিকট মানসিক পূজা ও ছাগ বলি দিয়া থাকেন। উল্লেখ-যোগ্য যে, এই অঞ্চলে বুড়োমার সন্ধি পূজার বলি না হইলে অথবা দশমীতে প্রতিমা বিসর্জন না হইলে অন্য কোন দুর্গা-পূজামণ্ডপে বলি বা প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় না।

দোলযাত্রা

রাজপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমায় সমারোহের সহিত দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি ব্যক্তি-বিশেষের হইলেও সর্বসাধারণ ইহাতে যোগদান করিয়া থাকেন। উৎসব উপলক্ষে যথারীতি রাধাকৃষ্ণের পূজা ও দেবদোলাদির পর সন্ধ্যায় 'দোর ফোঁড়াফুড়ি' নামে একটি অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই পর্বটি রাজপুর গ্রামের দোল উৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলা যায়। পূজা প্রাঙ্গণে একটি সুউচ্চ প্রাচীন সিংহদরজা আছে। 'দোর ফোঁড়াফুড়ি' অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্থানীয় যুবকদিগের মধ্যে দুইটি দল হয়; এক দল রাধার পক্ষ অপর দল কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করেন। উক্ত দুই দলের মধ্যে একদল উল্লিখিত দরজার সম্মুখে দাঁড়ান এবং অপর দল তাহাদের বাঁধা অতিক্রম করিয়া দরজার ভিতর প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন। এইরূপ প্রতিযোগিতায় বহুক্ষণ যাবত ধস্তাধস্তির পর যে-দল জয়লাভ করেন তাঁহাদিগকে সেই বৎসরের বিজয়ী দল বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ইহা প্রত্যক্ষ করিতে আশপাশের গ্রাম হইতে বহু লোকজন আসেন এবং আনন্দ উপভোগ করেন। উৎসবটি প্রাচীন।

রাজপুর গ্রামে ধর্মরাজ ঠাকুরের একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। এই স্থানে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে ধর্মরাজ ঠাকুরের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন। উৎসবে হিন্দু জাতির উচ্চ এবং নিম্ন বর্ণের সকল শ্রেণীর লোকজনই যোগদান করেন এবং ধর্মরাজতলায় মাটির প্রদীপ জালাইয়া মানত, পূজাদি নিবেদন করেন। সাধারণত যোড়শোপচারে পূজা ব্যতীত, স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত চক্ষু ও কর্ণ ধর্মরাজের নিকট মানত জানান হয়। ধর্মরাজের সেবায়েত জাতিতে ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত; তিনি নিকটবর্তী একটি গ্রামে বাস করেন।

ব্রহ্মাপূজা

রাজপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে স্থানীয় বাজারের ব্যবসায়ীরা ধূমধামের সহিত ব্রহ্মাপূজা করিয়া থাকেন। বহুদিন আগে একদা অকস্মাৎ অগ্নি-কাণ্ডের ফলে বাজারের বহু ব্যবসায়ীর দোকানঘর পুড়িয়া যায়। তদবধি বাজার সমিতির পরিচালনায় এই গ্রামে ব্রহ্মাপূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। চতুর্মুখ, রক্তবর্ণ, হংসবাহন ব্রহ্মার মৃন্ময় মূর্তি ব্যতীত অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজামণ্ডপ সাজান হয়। উৎসব উপলক্ষে সপ্তাহ-ব্যাপী কথকতা, পুতুলনাচ, কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

মেলা বিবরণী

গোষ্ঠযাত্রার মেলা

সোনারপুর গ্রামে বৈদ্যপাড়ায় প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গোষ্ঠ উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় জমিদারের প্রায় চার-পাঁচ কাঠা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন এবং উৎসবের দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে এবং ইহাতে নিকটবর্তী বিভিন্ন ইউনিয়ন হইতে দেড় সহস্র হইতে দুই সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

প্রধানতঃ সোনারপুর বাজারের স্থায়ী বিক্রেতারাই মেলায় দোকানপাট দিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত, আশপাশের ইউনিয়ন হইতে কিছু বিক্রেতা আসেন। মেলায় প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং পনর-কুড়ি জন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটের মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, বাসনকোসনের দোকান, জামাকাপড়ের দোকান, কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, বেত ও বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকান, মাটির পুতুল, খেলনা ও হাঁড়িকুড়ির দোকান এবং বই-ছবির দোকান বসে।

কোন কোন বৎসর মেলায় নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসিয়া থাকে।

সাঙ্গুর গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে রাধাকৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রা উৎসব উপলক্ষে গ্রামের সাধারণের প্রায় চার বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এবং প্রতিদিন বিকালের দিকে মেলায় লোকজন আসেন।

কালিকাপুর, চন্দনেশ্বর, ভোজেরহাট প্রভৃতি আশ-পাশের চার-পাঁচ মাইলের মধ্যবর্তী গ্রাম হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় পাঁচ-ছয় শত নরনারীর সমাগম হয় এবং চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে ও কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয়। আশপাশের গ্রাম হইতেও প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, বাসন-কোসনের দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র ও শিল্পসামগ্রীর দোকান উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত, দুই-একটি বই ছবি ও ঔষধপত্রের দোকান আসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য খেলাধুলা, ম্যাজিক, লটারী, পুতুলনাচ ব্যতীত তরজাগান ও যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

বন হুগলী গ্রামের মধ্যস্থলে সাধারণের প্রায় দুই-তিন বিঘা পরিমাণ একটি মাঠে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়ক উপলক্ষে একটি মেলা বসে। মেলাটি পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন এবং একদিনই স্থায়ী হয়।

নূতনহাট, বোড়াল প্রভৃতি আশপাশের গ্রাম হইতে মেলায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় সাত-আট শত নরনারী আসেন।

মেলায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয়। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, লোহা ও কাঁচের বাসনপত্রের দোকান, মাটির পুতুল, খেলনা ও হাঁড়ি-কলসীর দোকান ব্যতীত দুই-একটি বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকান, দা, কুড়াল, কোদাল ইত্যাদি কারিগরী জিনিসপত্রের দোকান ও বই-ছবির দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামে যাত্রার দল আছে। যাত্রাভিনয় দেখিতে সহস্রাধিক নর-নারীর সমাগম হয়।

গোড়খাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব উপলক্ষে গোড়খাড়া ও লাঙ্গলপাড়ার মধ্য সীমানায় প্রায় এক বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলার জমি স্থানীয় জমিদারের। চৈত্রসংক্রান্তির দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই মেলা চলে। মেলাটি প্রাচীন।

সোনারপুর, নওয়াপাড়া, কামরাবাদ, খুড়িগাছি প্রভৃতি ইউনিয়ন এবং অন্যান্য স্থান হইতে মেলায় মোট প্রায় ছয় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের শতকরা সত্তরজনই পুরুষ।

বিক্রেতারা প্রতি বৎসর সোনারপুর বাজার ও সোনারপুর থানার বিভিন্ন স্থান হইতে আসেন। মেলায় শতাধিক দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। পনর-কুড়িজন ফেরিওয়ালা আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মাটির পুতুল ও খেলনা এবং বাঁশের বাঁশি, বেহালা ইত্যাদির দোকানপাট বেশী দেখা যায়। ইহা ব্যতীত, তামা, পিতল, লোহা ও কাঁচের বাসনপত্রের দোকান, মনিহারী দোকান, মিল ও তাঁতের কাপড়, লুঙ্গি, গামছা ও তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদের দোকান, কাটারি, কাস্তে, নিড়ানি, বঁটি, কুরুনি, জাঁতি, কোদাল, কুড়াল, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি যন্ত্রপাতির দোকান, বেত ও বাঁশের তৈয়ারি ধামা, কুলো ইত্যাদির দোকান, কাঠের জিনিসপত্র এবং বই-ছবি ও ঔষধপত্রের দোকান বসে।

মেলায় কোন কোন বৎসর নাগরদোলা, ম্যাজিক ও সার্কাসের দল আসে।

চণ্ডীপূজার মেলা

রায়পুর গ্রামে চণ্ডীপূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তির তিনদিন পূর্ব হইতে ২রা বৈশাখ পর্যন্ত গ্রামের মধ্যস্থলে দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে দেবোত্তর প্রায় তিন বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

চম্পাহাটি, খড়িগোদা, কমলপুর, চাকবাড়িয়া, সাহেবপুর, কালিকাপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় এক সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয় ও মাহিষ্য সম্প্রদায়ের লোকই বেশী।

স্থানীয় বিক্রেতা ভিন্ন চম্পাহাটি বাজারের স্থায়ী দোকানদারগণ প্রতি বৎসর মেলায় দোকানপাট দিয়া থাকেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, খেলনা ও মনিহারী দোকানই বেশী দেখা যায়। ইহা ব্যতীত, মেলায় বাসনকোসনের দোকান, কাটাকাপড়, লুঙ্গি, গামছা প্রভৃতি কাপড়চোপড়ের দোকান, লাঙ্গল, জোয়াল, কাস্তে, নিড়ানি, কাটারি, বঁটি, ছুরি প্রভৃতি কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান এবং শিল্পসামগ্রীর দোকান বসে। শিল্পসামগ্রীর দোকানগুলি প্রতি বৎসর সোনারপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক, লটারী, কবিগান ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। গ্রামেই যাত্রাদল আছে। ইহা ভিন্ন, পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতেও যাত্রার দল আসিয়া থাকে।

দোলযাত্রার মেলা

কামরাবাদ গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দোলযাত্রা উপলক্ষে উৎসব প্রাঙ্গণ সংলগ্ন ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় পাঁচ-ছয় কাঠা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন এবং মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যারাত্রি পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

সোনারপুর, খুঁড়িগাছি, শুয়াপাড়া, গোড়খাড়া প্রভৃতি আশপাশের ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রায় দুই-তিন সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়।

বিক্রেতারা সোনারপুর বাজার হইতে এবং আশপাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। মেলায় প্রতি বৎসর পঁচাত্তরটি দোকানপাট বসে এবং পনর-কুড়ি জন ফেরিওয়ালা আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, তামা, পিতল, লোহা ও কাঁচের বাসনকোসনের দোকান, মিল ও তাঁতের কাপড়, লুঙ্গি, গামছা ও তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদের দোকান, ছুরি, কাঁচি, কাস্তে, কাটারি, কোদাল, কুড়াল, বঁটি প্রভৃতি কৃষিযন্ত্রপাতির দোকান, বেত ও বাঁশের তৈয়ারী ধামা, কুলো, চ্যাঙ্গারি, মাটির পুতুল ও খেলনা এবং কাঠের বিভিন্ন প্রকার জিনিসের দোকান বসে। ইহা ব্যতীত, কয়েকটি বই-ছবি ও ঔষধ-পত্রের দোকান বসে।

কোন কোন বৎসর মেলায় নাগরদোলা, সার্কাস বা ম্যাজিকের দল আসে।

থানা ঃ বারুইপুর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রামঃ মদারাট (মৌজাঃ বারুইপুর)।
৩১২,৪৭২'২৩১,২৮৩১৭,২৩২৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বারুই, কামার, কলু, ধোপা, মুচি ও মুসলমান। গ্রামে দশটি পাড়া আছে। যেমন—বামুনপাড়া, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়পাড়া, বারুইপাড়া, কামার-পাড়া, কলুপাড়া, মুচিপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বারুইপুর। গ্রামের সীমান্তে একটি পাকা রাস্তা দিয়া মোটরবাস, রিক্সা ও গরুর গাড়ী যাতায়াত করে। গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে কালীপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং একশত হইতে একশত পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

ইহা ব্যতীত, প্রতি বৎসর গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক ঈদ ও মহরম উৎসব পালিত হয়।

(ঙ) শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা। চৈত্রসংক্রান্তির দিন বিকালে মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিব, কালী ও পঞ্চানন্দের মন্দির এবং মনসার স্থান আছে। শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ইহা ব্যতীত, মুসলমানদিগের একটি মসজিদ ঘর আছে।

শ্রীরণজিৎ রায়, প্রধান শিক্ষক,
পশ্চিম মদারাট নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
পোঃ মদারাট, ২৪-পরগণা।

২। গ্রামঃ বারুইপুর। ৩১২,৪৭২'২৩১,২৮৩১৭,২৩৯

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। বারুইপাড়া, শাঁখারীপাড়া, চক্রবর্তীপাড়া, ভট্টাচার্যপাড়া, পালপাড়া, পোদপাড়া, শুঁড়ী-পাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে অনেকগুলি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বারুইপুর জংশন। বারুইপুর হইতে বারুইপুর-কুলটী রোড, বারুইপুর-চম্পাহাটী রোড এবং বারুইপুর-ক্যানিং রোড নামে তিনটি রাস্তায় যাতায়াতের সুবিধা আছে। কলিকাতা হইতে নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) এই স্থানে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে সপ্তাহব্যাপী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা, কার্তিক পূর্ণিমা হইতে মাসাবধি শ্রীকৃষ্ণের রাসোৎসব, ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোলোৎসব এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং বারুইপুরের প্রখ্যাত জমিদার রায়চৌধুরী পরিবারের বদান্যতায় উৎসবগুলি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবগুলিতে বিশেষ করিয়া রাসোৎসবে চব্বিশ-পরগণা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এবং কলিকাতা হইতে যাত্রীর সমাবেশ হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে। সপ্তাহব্যাপী।

রাসযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমা হইতে মাসাবধি।

দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন পূর্ণিমায় একদিন।

চড়কের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তি হইতে দুইদিন।

উল্লিখিত মেলাগুলির প্রত্যেকটিই প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) এই স্থানে রাধাকৃষ্ণের মন্দির ও রায়চৌধুরী পরিবারের গৃহদেবতা আনন্দময়ী কালীমন্দির আছে। আনন্দগিরি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আনন্দময়ী কালীমন্দিরের সম্মুখে একটি পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে। ইহা ব্যতীত, দুইটি পঞ্চানন, দুইটি বাবাঠাকুর, একটি শীতলা, বিশালাক্ষী এবং ওলাবিবি ও গাজীসাহেবের স্থান আছে।

বারুইপুর একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচল যাত্রাকালে আদি গঙ্গার তীরবর্তী এই গ্রামের সন্নিহিত আটিসারা গ্রামে ভক্ত শ্রীঅনন্তের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। গ্রামটি

দক্ষিণাঞ্চলের প্রখ্যাত জমিদার রায়চৌধুরীদিগের জমিদারীর অন্তর্গত। শোনা যায়, এই গ্রামে বারুজীবী (পান ব্যবসায়ী) দিগের সংখ্যাধিক্যহেতু গ্রামের নাম বারুইপুর হইয়াছে। বর্তমানে বারুইপুর একটি শহরে পরিণত হইয়াছে। বারুইপুর রেলস্টেশন হইতে লক্ষ্মীকান্তপুর ও ডায়মণ্ডহারবার যাতায়াতের দুইটি রেলপথ গিয়াছে। রেলস্টেশনের নিকট বহু সরকারী অফিস-আদালত প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীঅজিত কুমার হালদার, চাকুরী,
ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিস, বারুইপুর,
২৪-পরগণা।

প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত স্বর্গীয় কালীদাস দত্ত মহাশয়ের "বারুইপুর ও বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বারুইপুরের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। প্রবন্ধটির অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

বর্তমান চব্বিশপরগণা জেলার দক্ষিণাংশে বারুইপুর একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে ও ইহার পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডে পানচাষী বারুইজাতির বাস আছে। প্রবাদ তজ্জন্যই এই গ্রামটি ঐরূপ নামে প্রসিদ্ধ।*

প্রাচীনকালে আদিগঙ্গা নদী ইহার পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবাহিত হইত। উহা তখন কালীঘাট হইতে ক্রমশঃ বৈষ্ণবঘাটা, রাজপুর, মাহিনগর, বারুইপুর, সূর্য্যপুর, বা নাচনগাছা, মূলটি, দক্ষিণ বারাসত, জয়নগর-মজিলপুর, দক্ষিণ বিষ্ণুপুর ও ছত্রভোগ প্রভৃতি গ্রাম অতিক্রম করতঃ সাগরদ্বীপের দক্ষিণে গিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িত।** আজিও বারুইপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে উহার মজা গর্ভ কোথাও নিম্নভূমিতে পরিণত হইয়া, আবার কোথাও বা সঙ্কীর্ণ খালের আকারে বিদ্যমান আছে। উহারই উপর বারুইপুরের বর্তমান হিন্দু শবদাহ ক্ষেত্র কীর্তনখোলা অবস্থিত।

আদিগঙ্গা তীরবর্তী এই স্থানটির প্রাচীন ইতিবৃত্ত এখনও সংকলিত হয় নাই। সুন্দরবনের অন্তর্গত ২২ নম্বর লট ও দক্ষিণ-গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্কৃত মহারাজা লক্ষ্মণসেনদেবের দুইখানি তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ ভূমিদান সনন্দ (তাম্রশাসন) হইতে জানিতে পারা যায় যে, বঙ্গদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে, সেনরাজগণের শাসনকালে, উক্ত আদিগঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরস্থ প্রদেশ, তৎকালীন শাসন বিভাগ, বর্দ্ধমানভুক্তি ও পূর্বতীরস্থ প্রদেশ, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অধীন ছিল।*

দক্ষিণ-গোবিন্দপুরে প্রাপ্ত উল্লিখিত তাম্রশাসনখানিতে আরও দেখা যায় যে, তদ্দারা মহারাজা লক্ষ্মণসেনদেব বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত বেতড্ড চতুরক নামক শাসন বিভাগে গঙ্গাতীরবর্তী বিড্ডর-শাসন নামে একখানি গ্রাম ব্যাসদেব শর্ম্মা নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেন। উহাতে ঐ গ্রামের নিম্নলিখিতরূপ চতুঃসীমা আছে।

উত্তরে—ধর্ম্মনগরী সীমা।
পূর্বে—জাহ্নবী অর্দ্ধসীমা।
দক্ষিণে—লেংঘদেব মণ্ডপী সীমা।
পশ্চিমে—ডালিম্বক্ষেত্র সীমা।**

বর্তমান সময় বারুইপুরের সংলগ্ন……এলাকা। কিন্তু বারুইপুরের নাম এনাগাৎ প্রাক্‌মুসলমান যুগের কোনও লিপি বা গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই।

পুরাতন গ্রন্থাদির মধ্যে, ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত, বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তীর মনসার ভাসানে, চাঁদ সওদাগরের আদিগঙ্গাপথে সিংহলে বাণিজ্য-যাত্রা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম উহার উল্লেখ দেখা যায়। যথা:

"কালীঘাটে চাঁদরাজা কালীকা পূজিয়া।
চুড়াঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া॥
ধনস্থান এড়াইল বড় কুতূহলে।
বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে॥
ছলিয়ার গাঙ্গ বাহি চলিল ত্বরিত।
ছত্রভোগে গিয়া রাজা চাপায় বৃহিত॥"

উক্ত গ্রন্থ রচনার ৭৮ বৎসর পরে, ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচিত হয়। উহা পাঠে

* Bengal District Gazeteer, 24-Parganas, p. 219, by L. S. S. O'Malley.

** আদিগঙ্গা নদী—শ্রীকালীদাস দত্ত, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৯।

* পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমানভুক্তি—শ্রীকালীদাস দত্ত, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, ১৩৩১।

** Inscriptions of Bengal, Vol. III, p. 67, by N. G. Mazumdar.

বোধ হয়, সেই সময় বারুইপুরের কিয়দংশ আটিসারা নামেও অভিহিত হইত। ঐ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর শান্তিপুর হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গার তীরে তীরে পার্ষদগণসহ ছত্রভোগ-পথে নীলাচল গমনকালে উক্ত আটিসারায় জনৈক বৈষ্ণব ভক্ত শ্রীঅনন্ত পণ্ডিতের গৃহে একরাত্রি কীর্তনানন্দে যাপন করেন। উহা এইরূপ :

"হেন মতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে।
উত্তরিলা আসি আটিসারা নগরেতে॥
সেই আটিসারা গ্রামে মহাভাগ্যবান।
আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম॥
রহিলেন আসি প্রভু তাহার আলয়।
কি কহিব আর তাঁর ভাগ্য সমুচ্চয়॥
* * *
সর্বরাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্তন প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে রঙ্গে॥
শুভ দৃষ্টি অনন্ত পণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥
এইমত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগে মহা কুতূহলে॥"*

কিছুদিন পূর্বে বারুইপুর বাজারের সান্নিধ্যে, মজাগঙ্গা-তীরে, শ্রীঅনন্ত পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের দারুময় বিগ্রহ একটি গৃহে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ বিগ্রহ দুইটির গঠনপদ্ধতি, আকার ও ভাবভঙ্গীর সহিত শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রভুর আবির্ভাবকালে কালনা ও নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত ঐরূপ বিগ্রহগুলির সাদৃশ্য দেখিলে, উহাদেরও গঠনকাল যে ঐ সময় তাহা বুঝিতে পারা যায়। উহা ভিন্ন ঐ স্থানটিতে যে শ্রীঅনন্ত পণ্ডিতের ভিটা ছিল তাহারও অন্যান্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সে কারণ সেখানে বরানগর পাঠবাড়ী আশ্রমের কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে একটি মঠও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অধুনা ঐ মঠ ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অতি অল্পপরিসর স্থান আটিসারা নামে অভিহিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার আটিসারাকে একটি নগর ও গ্রাম বলিয়াছেন। উহা হইতে আটিসারা জনপদ যে, ঐ সময় আকারে বড় ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। তৎকালে বর্তমান বারুইপুরের কিয়দংশ উহার অন্তর্গত থাকা সম্ভব।

এই সকল প্রাচীন বিবরণে বারুইপুর ও উহার পার্শ্ববর্তী ভূভাগের উক্ত প্রকার উল্লেখ ব্যতীত অন্য কোনরূপ পরিচয় নাই। অধুনা বারুইপুর মেদনমল্ল পরগণার অধীন। মুসলমান রাজত্বকালে শাসন-সৌকার্যার্থ যে সমস্ত পরগণা নামক বিভাগের সৃষ্টি হয় উহাও তন্মধ্যে একটি। আইন-ই-আকবরীতে প্রকাশিত রাজা তোডরমল্লের জমাবন্দীতে উহার উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন রেভিনিউ সার্ভে রিপোর্টে লিখিত আছে যে, ঐ সময় উহার নানা স্থানে জঙ্গল ছিল এবং বারুইপুরের জমিদার চৌধুরী বংশের পূর্বপুরুষ দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ পান। তখন তাহাদের নিবাস ছিল রাজপুরে। সেখানে তাঁহাদের ভিটার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।

তাঁহাদের জনৈক পূর্বপুরুষ রাজা মদন রায়কে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে, (১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) মুঘল শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁ তিন লক্ষ তিন হাজার টাকার রাজস্ব বাকী পড়ায় ঢাকাতে ধরিয়া লইয়া যান। সেই সময় বাশড়াতে শ্বাপদসঙ্কুল গভীর জঙ্গল ছিল এবং সেখানে সেই জঙ্গল মধ্যে মোবারক গাজী নামে একজন দৈবশক্তি-সম্পন্ন ফকির থাকিতেন। রাজা মদন রায় তখন নিরুপায় হইয়া আত্মরক্ষার্থ তাঁহার শরণাপন্ন হন এবং তাঁহার দৈবশক্তিবলে ঢাকার দরবার হইতে সসম্মানে মুক্তিলাভ করতঃ শিরোপা লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। গাজী সাহেবের গান নামক দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত লোকগাথায় ঐ ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।* বাশড়াতে এখনও গাজী সাহেবের আস্তানা আছে। ইষ্টার্ণ রেলওয়ের দক্ষিণ বিভাগের ক্যানিং শাখায় ঘুটিয়ারি সরিফ স্টেশনের সান্নিধ্যে বাশড়ার ঐ আস্তানায় প্রতি সপ্তাহে তাঁহার স্মরণার্থ একটি মেলা হয় এবং উহাতে বহু হিন্দু-মুসলমান যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। ঐ সময় সেখানে গাজী সাহেবের গানও হয়। প্রবাদ, ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর মদন রায়ই গাজী সাহেবকে সর্বত্র প্রচার

*শ্রীচৈতন্য ভাগবত : অন্ত্য খণ্ড, ২য় অধ্যায়।

*বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩৫৫ সালের ১ম সংখ্যায় গাজী সাহেবের গান প্রকাশিত হইয়াছে।

করেন। হাণ্টার সাহেবের গ্রন্থে উহার যে উল্লেখ আছে তাহা এই :

"In gratitude to Mobrah Gazi the zeminder wished to erect a mosque in the Jungles of Basra for his residence, but he was prevented in a dream. He then ordered that every village should have an altar dedicated to Mobrah Gazi, the King of the forests and wild beasts. These altars of Mobrah Gazi are common in every village in the vicinity of jungles, not only in Maidanmal, but in all the fiscal Divisions adjoining the Sundarbans".*

কবি রামচন্দ্র রচিত হরপার্বতী মঙ্গল নামক একখানি পুরাতন পুঁথিতেও পূর্বোক্ত ঘটনার উল্লেখ আছে। উহাতে আরও দেখা যায় যে, রাজা মদন রায়ের পৌত্র দুর্গাচরণ রায় চৌধুরী রাজপুর হইতে প্রথমে বারুইপুর আসিয়া বসবাস করেন ও সেখানে বহু ভূমি দান করিয়া সমাজ স্থাপন করেন। হরপার্বতী মঙ্গলের ঐ অংশ এইরূপ :

জাহ্নবীর পূর্বভাগ মেদন মল্লানুরাগ
অধিপতি শ্রীমদন রায়।
নিজে মোবারক গাজী আপনি হইয়া রাজী
বন মাঝে দেখা দিলা তায়॥
সঙ্গেতে সহায় হয়ে নবাবে স্বপন কয়ে
শিরোপা পাইল জমিদারী।
দত্তকুল সমুদ্ভব গোষ্ঠীপতি খ্যাতিরব
কায়স্থ কুলের অধিকারী॥
বৃত্তিভোগী কত দ্বিজ পঞ্চম তনয় নিজ
কনিষ্ঠ শ্রীরাম বিচক্ষণ।
বুঝিয়া কাঠের তত্ত্ব জমিদারী তাহে বত্ত
তদগ্রজ শ্রীদুর্গাচরণ॥
সহায় আনন্দময়ী সর্বাংশে হইল জয়ী
শ্রীমতী শ্রীমতী যার রাণী।
করিয়া সমাজ স্থান কত ভূমি কৈল দান
বারুইপুরেতে রাজধানী॥

*Statistical Account of Bengal, Vol. I, p. 120.

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে দুর্গাচরণ রায় চৌধুরী বারুইপুরে ঐ প্রকারে সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের সূত্রপাত করেন এবং তাহার ফলেই উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণের বাসহেতু ক্রমশঃ এই স্থানটি সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। তজ্জন্য উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকার এখানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার রাজস্ব ও শাসন সংক্রান্ত কয়েকটি কার্যালয় স্থাপন করেন। তন্মধ্যে নিমকমহলের সদর দপ্তরখানা ও একটি চিকিৎসা-কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য।* নিমকমহলের উক্ত দপ্তরখানার তৎকালীন প্রধান শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী প্লাউডেন ঐ সময় এখানে সর্বপ্রথম ইংরেজী আদর্শে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ বিদ্যালয়টি পরে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে বারুইপুরের খ্রীষ্টান মিশনের অধীন হইয়া যায়।**

ঐ সময় হইতে শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের জুলুম ও অত্যাচারে বঙ্গদেশের নানা স্থানে অশান্তির সূত্রপাত হয় ও উহা ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে। তখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন স্থানেও নীলচাষ হইত ও নীল প্রস্তুত করিবার বহু গৃহাদি ছিল। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অধীন মথুরাপুর থানার অন্তর্গত ছত্রভোগ ও কাটানদিঘী প্রভৃতি গ্রামে ঐরূপ গৃহাদির ভগ্নাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার শ্বেতাঙ্গ নীলকরগণেরও ঐ সময় সদরস্থান ছিল বারুইপুরে। অধুনা বারুইপুরের সদর রাস্তার উপর একটি বৃহৎ উদ্যানমধ্যে বড়কুঠি নামে যে অট্টালিকাটি আছে উহাই ছিল তাঁহাদের প্রধান কার্যালয় ও আবাসস্থল।† তজ্জন্য তৎকালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়

*"In the early part of the 19th century it was the head-quarters of the Salt Department in the 24 Parganas, and a Salt Agent and a Medical Officer were stationed there."—Bengal District Gazetter, 24-Parganas L.S.S. O'Malley, p. 219.

**"A school at Baruipore which had been started in 1820 by Mr. Plowden the Salt Agent, was transferred to the Society for the Propagation of Gospel in 1823."—24-Parganas Gazetteer, p. 79, by L. S. S. O'Malley.

†ঐ অট্টালিকার পশ্চাতে নীলকরগণ একটি খাল কাটাইয়া উহা আদিগঙ্গা নদীর সহিত সংযুক্ত করেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা তখন নৌকাযোগে বারুইপুর হইতে ছত্রভোগ ও কাটানদিঘী প্রভৃতি স্থানে নীলপ্রস্তুতের কারখানাগুলিতে যাতায়াত করিতেন। ঐ খালের কিয়দংশ এখনও বর্তমান আছে।

উৎপন্ন নীল বারুইপুরের নীল নামে অভিহিত হইত এবং উৎকৃষ্ট বলিয়া বাজারেও উহার বেশ চাহিদা ছিল। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী তারিখের কোম্পানীর গেজেটে উহার এইরূপ উল্লেখ দেখা যায় :

"We understand that the best indigo delivered on contract for the last year has been manufactured by Messrs. Win and Thos. Scott of Gazipore and by Mr. Gwilt of Barrypore."

প্রাচীন বিবরণাদিতে উল্লিখিত আছে যে, খ্রীষ্টান মিশনারীরাও ঐ সময় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার যে সকল স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করেন তন্মধ্যেও বারুইপুরের কেন্দ্রটি প্রধান ছিল। সে কারণে এখানে সর্বপ্রথম একটি ইষ্টকের বৃহৎ গীর্জাও নির্মিত হয়। উহার মধ্যে ৬।৭ শত লোক বসিয়া উপাসনা করিতে পারিত।* উহার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। উহা ভিন্ন ঐ সময় মৃত দুই জন ইংরাজ পাদ্রীর গোরস্থানও আজিও শাসনে যাইবার পথে দেখা যায়।......

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বারুইপুর হইতে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে লুপ্তস্রোতা গঙ্গার তীরে অনন্ত পণ্ডিতের আবাসস্থল তথা মহাপ্রভু-বাটি বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থান স্বরূপ। মহাপ্রভু-বাটিতে প্রতিষ্ঠিত গৌর-নিতাই বিগ্রহের নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে পক্ষকালব্যাপী উৎসব ও মেলা বসে। আটিসারা শ্রীপাঠে উৎসব উপলক্ষে গত ১১ই এপ্রিল ১৯৬৪ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়।

নিখিল বঙ্গ বৈষ্ণব সম্মেলন

শ্রীপাঠ আটিসারায় অনুষ্ঠান

গত ৩রা এপ্রিল রবিবার বেলা ১২-৩০ টায় বারুইপুর শ্রীপাঠ আটিসারা গ্রামে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভাগমন স্মরণোৎসব উপলক্ষে সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে নিখিল বঙ্গ বৈষ্ণব সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে তিন সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী যোগদান করেন। শ্রীমন্দিরের শ্রীনিতাই-গৌর বিগ্রহ সুসজ্জিত করা হয়। শ্রীনাম কীর্তন হয়। ডকটর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী পৌরোহিত্য করেন এবং এডভোকেট শ্রীপতিতপাবন চট্টোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। শ্রীখণ্ডের পণ্ডিত শ্রীনিমানন্দ ঠাকুর ও কবি শ্রীপান্নালাল মাইতি প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। মঙ্গলাচরণের দ্বারা সম্মেলনের কার্য আরম্ভ হয়। সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীরাধারমণ দাস ভাগবতভূষণ সম্মেলনে সমবেত ভক্ত নরনারীকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, শ্রীপাঠ আটিসারা গ্রামে ভক্ত চূড়ামণি শ্রীল অনন্ত আচার্যের ভবনে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শুভাগমন করিয়াছিলেন। অনন্ত আচার্যের সহিত মহাপ্রভুর মিলন হইয়াছিল। বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে এ ভূমি ধন্য এবং এর প্রতিটি ধূলিকণা পুণ্যময়। মহাপ্রভুর প্রবর্তিত প্রেম ধর্মই কলিজীবের একমাত্র পথ। শ্রীপাঠ আটিসারা গ্রাম গৌরাঙ্গ পদরজপূত চিরপুণ্য ভূমি। এই ভাগ্যবান ভক্তের সহিত যে স্থানে ভগবানের এমন মিলন সেই পরমতীর্থ। শ্রীমন্দিরের সেবক শ্রীনফরচন্দ্র দাস বাবাজী ও শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ পূজার্চনা ও ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতে নগর সংকীর্তন হয়। শত শত নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বারুইপুর থানার অন্তর্গত মল্লিকপুর (মৌজা নং ১০) গ্রামটি কলিকাতা হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। শিয়ালদহ-বারুইপুর রেলপথে এই স্থানেই একটি রেলস্টেশন আছে। মল্লিকপুর গ্রামে নাখোদা সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণের একটি প্রসিদ্ধ দরগাহ আছে। ইহা ফকির আবদুল্লা আব্বাসের দরগাহ নামে পরিচিত। দরগাহের মসজিদটি দেখিতে খুবই সুন্দর। ইহার সমীপস্থ কূপের জল পান করিলে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে নিরাময় লাভ করা যায় বলিয়া সাধারণ লোকের বিশ্বাস। এই পবিত্র কূপ হইতে জল লইবার জন্য প্রতি শুক্রবার এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

*Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. I, p. 99.

৩। গ্রাম ঃ **ধনবেড়িয়া। ৫৯।১১৮'১১।৫৬।২৭১**

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন হোটর।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় সাড়ম্বরে বিবিমার পূজা হয়। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে জগতিঘাট নামক স্থানে সাধারণের একটি দেবালয়ে বিবিমার পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি প্রাচীন এবং সর্বজনীন। গ্রামের প্রবীণেরা অনুমান করেন এই 'জগতিঘাটে'র নামই বিজয়গুপ্ত তাঁহার 'মনসামঙ্গল' কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন। জগতিঘাটের নিকট আদিগঙ্গার একটি ক্ষীণ রেখা বর্তমান। উৎসব উপলক্ষে আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় পাঁচ-ছয় শত নরনারী বিবিমার নিকট পূজা বা হাজত দিয়া থাকেন। ভক্তগণের বিশ্বাস বিবিমা জাগ্রতা দেবী, তাঁহার কৃপায় মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। জনৈক মৌলভী বিবিমার পূজাদি করেন। উৎসবের দিন বিবিমার দেবালয় সন্নিকটে তেলেভাজা, পান-বিড়ি প্রভৃতির কয়েকটি দোকানপাট বসে এবং যাত্রাভিনয় হয়।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীমাধব চন্দ্র শী, শিক্ষক,
চন্দনপুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
২৪-পরগণা।

৪। **গ্রাম ঃ ইন্দ্রপালা। ৬৩।৫২৪'১৯।২৮৭ ১,৪০১**

(ক) ব্রাহ্মণ, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, নাপিত, কাওরা ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) কল্যাণপুর রেলস্টেশন হইতে একটি নব নির্মিত রাস্তা গ্রামের পাশ দিয়া গিয়াছে। উহার সহিত গ্রামের দুইটি রাস্তার যোগ আছে। ইহা ব্যতীত, হোটর রেলস্টেশন হইতে একটি কাঁচা রাস্তা গ্রামের মধ্যে গিয়াছে। বর্ষাকালে নৌকায় গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে সর্বজনীন গোষ্ঠ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে একটি বেদীতে রাধাকৃষ্ণের পট পূজা এবং পূজার স্থানে হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। উৎসবটি প্রায় সত্তর-আশী বৎসরের প্রাচীন এবং আশপাশের গ্রামের লোকেরাও এই উৎসবে যোগদান করেন। ইহা ব্যতীত, গ্রামের গায়েনপাড়ায় ও নস্করপাড়ায় দুইটি গোষ্ঠপূজা এবং প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গ্রামে পাঁচ পীরের উৎসব হয়।

(ঙ) গোষ্ঠযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি সত্তর-আশী বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন ভগ্নপ্রায় পাকা মন্দির ব্যতীত দুইটি বাবাঠাকুর ও তিনটি মনসা আছে।

শ্রীরমেন্দ্র নাথ সরকার, শিক্ষক,
গ্রাম : ইন্দ্রপালা, পোঃ কুন্দখালি,
২৪-পরগণা।

৫। **গ্রাম ঃ ধপধপি (মৌজা ঃ রামনগর)। ৯৭।৩,৩৬৮'৬৭।১,৩২২।৭,১৫৪**

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে দশটি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, আচার্যপাড়া, ঘোষপাড়া, চৌধুরীপাড়া, দাসপাড়া, সিংহপাড়া, দত্তপাড়া, খাঁপাড়া, নাপিতপাড়া ও মুসলমানপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর রেলপথে এই গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। কুলপী রোড হইতে দক্ষিণ রামনগর রোড ধরিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) দক্ষিণরায় বা দক্ষিণেশ্বরের বাৎসরিক জাঁতাল উৎসব। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দক্ষিণরায় ঠাকুরের জাঁতাল উৎসব উপলক্ষে ১লা ও ২রা মাঘ মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দক্ষিণরায় ঠাকুরের একটি পাকা মন্দির ব্যতীত গ্রামে দুইটি পঞ্চানন্দ, দুইটি শীতলা ও দুইটি বিবিমা আছে।

শ্রীঅজিত কুমার হালদার, চাকুরী,
বারুইপুর উন্নয়ন সংস্থা,
২৪-পরগণা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ধপধপির দক্ষিণরায় বা দক্ষিণেশ্বর সম্পর্কে ২০শে জানুয়ারী, ১৯৬২ সনে 'যুগান্তর' পত্রিকায় বজ্রমিত্র লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি 'উৎসব বিবরণী' অধ্যায়ে উদ্ধৃত করা হইল।

উৎসব বিবরণী

ধপধপির দক্ষিণেশ্বর

শীতের নিশুতি রাত। কনকনে ঠাণ্ডা। আকাশে শুক্লা দশমীর চাঁদ থাকলে কী হবে! মাঠে ঘাটে কুয়াসার ঘেরাটোপে চাঁদের আলো ঘষা কাঁচের মত আবছা। অন্যদিন এমন সময় ছোট্ট ধপধপি গাঁখানা ঘুমের কোলে মুখ গুজড়ে পড়ে থাকে। আজ কিন্তু এত রাত্তিরেও এই হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডার ভেতরে সে দিব্যি জেগে আছে। ধপধপির দক্ষিণেশ্বরতলায় লোকের ভীড়। হ্যাজাক, অ্যাসিটিলিন গ্যাসের আলো জ্বলছে সেখানে। কর্মব্যস্ত পুরুতসেবাইতদের হাঁক ডাকে, ঢোল কাঁসি ঘড়ি কাঁসর পেটানোর শব্দে আর ভক্তদের "বাবা" "বাবা" বোলে গাঁয়ের ও-তল্লাটটা বেশ সরগম হয়ে আছে। আজ পয়লা মাঘ ধপধপির গ্রামদেবতা দক্ষিণেশ্বরের জাঁতাল পূজো। জাঁতাল কথাটির মানে কী, তা কিন্তু বলতে পারে না কেউ। এটি ওঁর বার্ষিক উৎসব। নিশুতি রাত্তিরেই উৎসবটি করণীয়। সেই উপলক্ষেই ধপধপি এত রাত্তির অবধি জেগে আছে।

ভক্তরা এসেছে অনেক দূর দূর অঞ্চল থেকে। দিন থাকতে থাকতেই সবাই হাজির হয়েছে। না হলে এত রাত্তিরে এই ঠাণ্ডায় আসাই তো দায়। নাটমন্দিরে ঠাঁই নিয়েছে সবাই। কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিয়ে কেউ কেউ বসে আছে, কেউ কেউ শুয়ে আছে গুটিশুটি মেরে। সেবাইতদের বাড়ীতে রান্না হয়েছে ভাত, বাঁধাকপির তরকারি, টমাটোর টক। নিশুতি রাত্তিরে দক্ষিণেশ্বরের পূজোর পর সমাগত ভক্তদের সকলের সেই প্রসাদ খেতে খেতে রাত কাবার হয়ে যাবে।

চব্বিশ পরগণার লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের এই ছোট্ট গণ্ডগ্রামখানা বারুইপুরেরই লাগোয়া। কলকাতা থেকে মাত্র মাইল কুড়ি দূরে বারুইপুর। জংশন ষ্টেশন। কলকাতা থেকে বাসও যাতায়াত করে। সুতরাং বারুইপুর এখন বেশ বড় শহরে পরিণত। বারুইপুর থেকে মাইল চারেক দূরে ধপধপি ষ্টেশন। বারুইপুরের তুলনায় কত ছোট্ট ধপধপি। কিন্তু ধপধপির নামডাক বারুইপুরের চাইতে কম নয়। এই ছোট্ট ষ্টেশনে প্রতি শনি-রবিবারে কম লোক নামে না। ধপধপির সব আকর্ষণ কিন্তু ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরেরই জন্যে। দক্ষিণেশ্বরকে কেউ কেউ দক্ষিণরায়ও বলে কেউ কেউ শুধু বাবা বলেই ডাকে। বাবা নাকি সাক্ষাৎ কল্পতরু। ভক্তরা বলে বাবার কাছে যা চাইবে তাই মিলবে। আর বাবা নাকি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরিও। পৃথিবীতে হেন রোগ নেই যা বাবার দয়ায় ভাল হয় না। শিবের অসাধ্যি রোগ, ডাক্তার বদ্যিরা সাব জবাব দিয়ে দিয়েছে। সেই সব রুগী বাবার চন্নামেত্তো, তেলপড়া, জলপড়া, গাছগাছালির নিংড়নো রস খেয়ে, মালিস করে একেবারে ভালো হয়ে গেছে। এসব লোকের মুখেই মুখেই রটনা। ধপধপি কথাটা বল্লেই চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলের লোকরা তাই কপালে হাত ঠেকিয়ে বাবাকে প্রণাম জানায়। ঐ তামাম তল্লাটটা জুড়ে ধপধপির বাবার জয়-জয়াকার। প্রতি মাসের শনি-মঙ্গলবার লোকে তাই ওষুধ নিতে, পূজো দিতে আসে ধপধপিতে।

যাত্রীদের ভীড় কিন্তু সবচেয়ে বেশী দেখা যায় ফাগুন-চোত মাস থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত। কলেরা-বসন্তের মরশুম ওটা। তখন চব্বিশ পরগণার মা-শীতলা, ওলাবিবি, বিবি-মায়েদের সমস্ত থানে আর পীরেদের দরগায় যাত্রীদের সবচেয়ে ভীড় যেমন জমে, ধপধপির দক্ষিণেশ্বরতলাতেও ঠিক তেমনিটি দেখা যায়। শুধু চব্বিশ পরগণারই লোক নয়, বাঙ্গলাদেশের অন্য অন্য জেলারও লোক এসে ধপধপির এই দেবতাটির কাছে এসে ধন্না দেয়। খাস কলকাতা থেকে বড়লোকরাও আসে মোটর হাঁকিয়ে, ডক্তারের জবাব-দেওয়া রুগীদের জন্যে ওষুধ আনতে। পয়লা মাঘের জাঁতাল পূজোতেও এইরকম অনেককে দেখা যায়। লোকের মানসিকের পূজো পড়ে খুব। সওয়া পাঁচ আনা থেকে দুশো-পাঁচশো টাকা দামের পূজো। কাপড়চোপড়, সোনা-দানা, ফলমিষ্টি—যার যে-রকম সাধ্য সে সে-রকম ঢালে বাবার পায়ে। বাবার মত মাটির মূর্তি গড়েও অনেকে মন্দিরে দেয়। তাদের বলে বাবার "ছলন-মূর্তি"। "ছলন-মূর্তিতে" মন্দির বোঝাই হ'য়ে যায়। জাঁতাল পূজোর দিন পুরনো ছলন-মূর্তিগুলো জলে যায়। আবার সে-দিন থেকে

নতুন ছলন-মূর্তিরা এসে জমা হতে থাকে। কেউ কেউ সোনা-রূপোর মূর্তিও দেয়। সর্বরোগহর এই দেবতাকে প্রদত্ত সব জিনিসই সেবাইত-পুরুতদের প্রাপ্য। সুতরাং তাঁদের দিন যে বেশ ভালই চলে বাবার কৃপায়, তাতে সন্দেহ কী। আমাদের দেশে ডাক্তার, বদ্যি, হাসপাতালের চাইতে "ন চ দৈবাৎ পরং বলম"-এর ওপরে কম ভরসা নয়। অতএব ধপধপির বাবা দক্ষিণেশ্বর যে সাধারণ মানুষের মনে এমনি জাঁকিয়ে বসে থাকবেন এখনও তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

আদিতে বাঘের দেবতা

ধপধপির দক্ষিণেশ্বর কিন্তু গোড়াতেই রোগ-আরামের দেবতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাঘের দেবতা। লোকে বাঘের ভয়েই তাঁর পূজো দিত। সুন্দরবনে যারা যায় কাঠ কাটতে, মধু, মোম সংগ্রহ করতে, মাছ ধরতে—তাদের নাম বাওয়ালী। পৃথিবীর বিখ্যাত রয়াল বেঙ্গল টাইগার—গায়ে কালো ডোরাকাটা কেঁদো বাঘের বাসভূমি এই সুন্দরবন অঞ্চল। সুন্দরবনের জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ, সাপ। জীবন বিপন্ন করে বাওয়ালীরা সুন্দরবনের সম্পদ আহরণ করে আনে। বন কেটে সুন্দরবনে বসত বানিয়েছে ওদেরই দল। কুমীর, বাঘের পেটে ওরা কম যায়নি। তাদের সঙ্গে লড়াই করে ওরাই বন হাসিল করেছে, জনপদ বসিয়েছে, আবাদ করে ক্ষুধিতের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছে। অগম্য সুন্দরবনের ধান, মধু, মোম, কাঠ, মাছের সম্পদ ওদের হাতেই দেশ পেয়েছে। বিনিময়ে ওদের অধিকাংশই আজ নিঃস্ব ভূমিহীন, দারিদ্র্য-পিষ্টের দল বৃদ্ধি করেছে। এই অসহায় মানুষরাই সেদিন সুন্দরবনের ভয়ঙ্কর দুর্মদ বাসিন্দা বাঘেদের সম্মুখীন হয়ে বাঁচবার সংগ্রামে বাঘ-দেবতার কল্পনা করেছে, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে মনে বল আর ভরসা এনে মৃত্যু-পুরীতে ঢুকেছে। দক্ষিণেশ্বর, বা দক্ষিণরায় এইভাবেই আবির্ভূত হয়েছেন ধপধপিতে। আবাদে যাবার সময় বাওয়ালীরা ধপধপির দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরকে পূজো দিয়ে যায়। নিরাপদে ফিরে এলে আবার এখানে এসে পূজো দেয়। শুধু ধপধপিতেই নয়, চব্বিশ পরগণার সমস্ত দক্ষিণার্ধটা জুড়েই এই দেবতাটির প্রাধান্য। গ্রামে গ্রামে ঝোপ-জঙ্গলের মাঝখানে মাটির বেদী কিংবা স্তূপের ওপরে দক্ষিণরায়ের মাটির তৈরী মুণ্ডু দেখতে পাওয়া যায়। লোকে ভক্তিভরে সেখানে পূজো দেয়—হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে। ধপধপির দেবতাটিও এইভাবেই লোকমনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু বন হাসিল হতে হতে আজ বনের সীমানা ধপধপির অনেক দক্ষিণে চলে গেছে। আজ আর বারুইপুর থানার কোথাও বাঘের ভয়ের কথা শুনতে পাওয়া যায় না। অতএব বাঘের দেবতা হিসাবে ধপধপির দক্ষিণরায়ের দামটা কিছু কমেই গেছে। তিনি তাই অন্য আর এক রূপে লোকের মনে আসন গেড়ে বসেছেন। বাঘের দেবতা ধন্বন্তরির কাজ নিয়েছেন। এখনও বনে যাবার সময় বাওয়ালীদের কেউ কেউ ধপধপিতে বাবা দক্ষিণেশ্বরের কাছে এলেও, এখন প্রধানত রুগীদেরই মস্ত ভীড় নিয়ে বাবা পশার জমিয়ে বসে আছে।

বন্দুকধারী বিশাল বীরের মূর্তি

ধপধপির এই দেবতাটির মূর্তিও বিচিত্র। প্রায় আট ফুট উঁচু বন্দুকধারী এক বীর শিকারীর মূর্তি। ডান পাটি মাটিতে মুড়ে বাঁ পাটি সামনে এগিয়ে রেখে তিনি বসে আছেন। গায়ের রং শাদা। দীর্ঘ আয়ত চোখে মস্ত বড়ো গোঁফে মুখখানায় আত্মপ্রত্যয়ী বীর শিকারীর ভাব পরিস্ফুট। তাঁর বেশভূষাও রীতিমত শিকারীর মত। তবে আধুনিক শিকারী আর পৌরাণিক বীরের সাজসজ্জার সমন্বয়। হলদে রঙের আঁটসাঁট ব্রিচেসের ওপরে হলদে রঙের বেনিয়ান পরা। তার ওপরে হাফহাতা গলাবন্ধ কালো পিরাণ। পিরাণের গায়ে সোনালী ফুলের বিচিত্র চিত্রণ। পায়ে নীল রঙের মোজা আর কালো রঙের ফিতে বাঁধা হান্টিং বুট। দু'হাতে বন্দুক ধরা। বীরের মাথায় পাগড়ি, কল্কা, কানে কুণ্ডল বীর বৌলি, হাতে বালা, আঙ্গুলে আংটি, গলায় সোনার হার, কপালে সিঁদুরের মস্ত বড় ফোঁটা। মূর্তির দুপাশে তীর, ধনুক, তূণীর, ঢাল, তরোয়াল, কুড়ুল, বল্লম, ত্রিশূল, সড়কি ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রের সজ্জা। মন্দিরের ভেতরে ভক্তদের দেওয়া অশ্বারোহী, বন্দুকধারী আরও অনেক ছোট বড় "ছলন-মূর্তির" মাঝখানে এই বিশাল বিচিত্র বীর মূর্তি দেখলে মানুষ তো কোন্ ছার, বাঘেদেরও বোধ হয় হৃৎকম্প হবার জোগাড়।

আসল মূর্তি পাথরের টুকরো

মাটির তৈরী এই মূর্তিটি কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের আসল মূর্তি নয়। আসল মূর্তিটি হচ্ছে সিঁদুর মাখানো এবড়ো-খেবড়ো পাথরের একটা টুকরো। সেটি দক্ষিণেশ্বরের মূর্তির সামনে পূজিত হয়। সুদূর অতীতে যখন ধপধপি ছিল বনাঞ্চলে ঢোকার প্রবেশপথ, তখন ঐ পাথরের টুকরোটিকেই বাওয়ালীরা প্রণাম জানিয়ে যেত, ওখানেই পুজো দিত। কালক্রমে সেই পাথরের টুকরোর জায়গায় দক্ষিণেশ্বরের মাটির তৈরী এই জাঁদরেল বীর মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বারুইপুরের জমিদার রায়চৌধুরীদের জমিদারীর মধ্যেই ছিল ধপধপি। তাঁরাই দেবতার মন্দির ইত্যাদি তৈরী করে দিয়েছেন। অনেক দেবোত্তর জমিও তাঁরা দিয়েছিলেন। সব দেবোত্তরের যেমন দশা, তেমনই দক্ষিণেশ্বরের দেবোত্তরেরও দশা। এখন যৎসামান্য জমি দেবোত্তরে আছে, বাদবাকি উধাও হয়েছে অনেকদিনই।

গণেশের মুণ্ডু ও বারাঠাকুর

সমাজের তথাকথিত নীচুস্তরের মানুষরে হাত দিয়ে এই দেবতার প্রথম পুজো সুরু হলেও, কালক্রমে ব্রাহ্মণরা তাঁকে তুলে নিয়েছেন তাঁদের মন্দিরে। কোনও শাস্ত্রে পুরাণে দক্ষিণেশ্বরের পুজোর বিধি নেই তাতে কিছু আসে যায় না। ব্রাহ্মণরা নিজেদের উদ্ভাবিত মন্ত্র-তন্ত্রেই দেবতাটির পুজো করেন। সে মন্ত্র-তন্ত্র তারা সাধারণ্যে প্রকাশ করেন না। কেউ বলেন, তিনি সাক্ষাৎ ক্ষেত্রপাল—শিবের মূর্তি। কেউ বলেন, তিনি গণেশ। কাহিনীও তাঁরা তৈরী করে নিয়েছেন। গণেশের জন্মের পর শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ডু উড়ে গেলে সেই কাটামুণ্ডুই দক্ষিণেশ্বরের মুণ্ডুতে পরিণত হয়েছে। চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন স্থানে দক্ষিণেশ্বর বা দক্ষিণরায়ের যে আর এক মূর্তি ধড় বিহীন মুণ্ডুর পুজো হয়, সেইটি গণেশেরই মুণ্ডু। এর নাম বারাঠাকুর। পৌষ সংক্রান্তিতে, কোথাও বা মাঘ মাসের বিভিন্ন দিনে বিশেষত শনি-মঙ্গলবারে বারাঠাকুরের পুজো হয়। বারাঠাকুরের রং শাদা। বড় বড় চোখ, মস্ত গোঁফ। মাথায় প্রকাণ্ড মুকুট। কোথাও দন্তুর মূর্তি, কোথাও বা ঠোঁট বোজানো মুখ তৈরী হয়। গাছের তলায় মাটির স্তূপের ওপরে বারাঠাকুরের মূর্তি বসিয়ে পুজো করা হয়, ফলমূল নৈবেদ্যের সঙ্গে কাঁকড়া, শোল মাছ, মদ দিয়ে। দিনের বেলায় নয়, রাত্তিরেই বারাঠাকুরের পুজো করণীয়।

কাঁকড়া শোল মাছ, মাংস, মদের ভোগ

ধপধপিতেও বারাতলা আছে। সেখানেও পয়লা মাঘ রাত্তিরে গাছের তলায় মাটির স্তূপের ওপরে বারাঠাকুরের পুজো আগে হয়। তার পরে মন্দিরে সুরু হয় দক্ষিণেশ্বরের জাঁতাল পুজো বা বার্ষিক উৎসব। এই জাঁতাল পুজোতেও ঠাকুরের ভোগে কাঁকড়া, শোল মাছ পোড়া, মাংস আর মদ দেওয়া হয় বলে শুনেছি। সমাজের তথাকথিত নীচু থাকের ধ্যান-ধারণা ব্রাহ্মণ্য সমাজের উঁচু থাকে উঠে এসেছে। সেই স্তরের অনেক অব্রাহ্মণ্য, অ-শাস্ত্রসম্মত লোকাচারের কাছেও যে উঁচু থাককে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে, অনেক প্রমাণের মধ্যে এটি অন্যতম।

বাঘের গন্ধে বাঘের দেবতা অস্থির

ধপধপির দক্ষিণেশ্বরের বাহন নিয়েও ব্রাহ্মণদের মুখে অনেক বিচিত্র কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। বাঘের অধীশ্বর দেবতা বলে আগে নাকি ইনি বাঘের পিঠেই ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু বাঘের গায়ের গন্ধ সহ্য না হওয়ায় তিনি ঘোড়সওয়ার হলেন। কিন্তু তাও মনঃপূত হলো না তাঁর। সিংহাসনে বসার তাঁর সাধ হলো। তাই তিনি বীরাসনে সিংহাসনে বসেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে গরদের জোড়ও পরানো হয়। জাঁতাল পুজোর দিনে তিনি মাথায় রজনীগন্ধার মুকুট পরেন, গলায় গাঁদা-ফুলের মালার বোঝা চাপান। জাঁতাল পুজোয় দূর দূর অঞ্চল থেকে আসা মেয়েপুরুষের দল মন্দিরের সামনে বাবার পুকুরে চান করে দণ্ডী খাটতে খাটতে মন্দিরের সামনে গিয়ে এই মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে পাঁঠা, হাঁস মানোত করে, ওষুধ নেয় সেবাইতদের হাত থেকে।

মুকুটরায়ের সেনাপতি দক্ষিণরায়

সম্পূর্ণ লৌকিক দেবতাই দক্ষিণেশ্বর। কেউ কেউ বলেন, দক্ষিণেশ্বর বা দক্ষিণরায় ব্রাহ্মণনগরের মুকুটরায়ের

সেনাপতি ছিলেন। দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য নিয়ে লেখা কৃষ্ণরাম দাসের "রায়মঙ্গল" কাব্য, "কালুগাজী ও চম্পাবতী" প্রভৃতি মুসলমান গাথা-সাহিত্য প্রভৃতির নায়ক গাজী সাহেব বা বড়খাঁ গাজী বাঘের পাল নিয়ে ব্রাহ্মণনগর অধিকার করে মুকুটরায়ের সুন্দরী কন্যা চম্পাবতীকে বিয়ে করেছিলেন। মুকুটরায়ের সেনাপতি বীর দক্ষিণরায় গাজীকে বাধা দিতে গিয়ে হেরে যান। তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন সুন্দরবনের দিকে। পরে গাজীর সঙ্গে দোস্তানি করে তিনি সুন্দরবনের একাংশের আধিপত্য লাভ করেছিলেন। বাঘ মারতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সুন্দরবনের সেই ব্যাঘ্রহন্তা বীরই কালক্রমে সুন্দরবন অঞ্চলে বনদেবতার পদে উন্নীত হয়েছেন।

গাজীর সঙ্গে সংঘর্ষ ও সৌহার্দ্য

বারাঠাকুরের মুণ্ডকে গণেশের মুণ্ড ব্রাহ্মণরা বলতে পারেন। কিন্তু লৌকিক দেবতাটিকে নিয়ে সপ্তদশ শতকের শেষার্ধের কবি কৃষ্ণরাম দাস যে "রায়মঙ্গল" লিখেছেন, তাতে এর অন্য কারণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

বাঘের উপরে নাহি দক্ষিণের রায়।
একখানি মুণ্ড মাত্র বারা বলে তায়॥
এমন প্রকার পূজা কেন হয় হেথা।
জ্ঞান যদি কহ শুনি দুই এক কথা॥
× × ×
শুন বড়খাঁ গাজী পরতেক পীর।
ঠাকুর দক্ষিণরায় আঠার ভাঁটির॥
দুইজনে দোস্তানী হইয়াছিল আগে।
তারপর হুড়োহুড়ি মহাযুদ্ধ লাগে॥
দক্ষিণরায়ের বুকে মারে বড় গাজী।
পড়িয়া উঠিল রায় বলে মায়া বাজী॥
বড়খাঁ হানিল খাঁড়া গলায় তাহার।
মায়ামুণ্ড ক্ষিতি পড়ে এমনি প্রকার॥
বিরোধ ভাঙ্গিয়া দিল আসিয়া ঈশ্বর।
তারপর দোস্তানী পাইল দোঁহে বর॥
কাটামুণ্ড বারা পূজা সেই হতে করে।
কোনখানে দিব্যমূর্তি ব্যাঘ্রের উপরে॥

হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব আর সৌহার্দ্যের কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে দক্ষিণরায় আর গাজীর সংঘর্ষে। এই দুজনেই দক্ষিণ বঙ্গের লৌকিক দেবতায় পরিণত হয়েছেন। শুধু এ'রা নন, বনবিবি—যিনি সুন্দরবনের বাঘের রাজত্বে অসহায় বাঙালীদের একমাত্র নির্ভর, মুন্সী বয়নদ্দিনের রচিত "বনবিবির জহুরনামায়" যার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে—তাঁরও বনাঞ্চলে দাপট কম নয়। "বনবিবির জহুরনামায়" তিনি আশ্বাস দিয়েছেন :

আঠার ভাঁটির মধ্যে আমি সবার মা।
মা বলে যে ডাকে তার দুঃখ থাকে না॥
সংকটে পড়িয়া যেবা মা বলে ডাকিবে।
কদাচিৎ হিংসা তায় কভু না করিবে॥

সে আশ্বাসবাণী শুনে দক্ষিণরায় বন-জননীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন :

রায় বলে শুন মাতা আরজ আমার।
সত্য সত্য তিন সত্য সত্য অঙ্গীকার॥
বনেতে আসিয়া যেবা মা বলে ডাকিবে।
আমা হৈতে হিংসা তার কদাচ না হবে॥

সুন্দরবনের ব্যাঘ্রভীত মানুষের কাছে দক্ষিণরায়, বড়খাঁ গাজী, বনবিবির সমান আদর। দক্ষিণ বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে এ'দের কাছে মাথা নত করে। বনাঞ্চলের মানুষরা এ'দের নিয়ে বিচিত্র সব অনুষ্ঠান করে, সাক্ষাৎ যম বাঘের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। যাদুভিত্তিক সে-সব অনুষ্ঠানের দাম ওরা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। সাক্ষাৎ যমের মুখে গিয়ে দাঁড়াবার জন্যে যে মনের জোর, সাহস আর আত্মপ্রত্যয়ের দরকার, ঐসব অনুষ্ঠানই এই অসহায় মানুষদের জোগায়।

মেলা বিবরণী

গোষ্ঠযাত্রার মেলা

ইন্দ্রপালা গ্রামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর পাড়ে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গোষ্ঠযাত্রা উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় সত্তর-আশী বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নরনারী মেলায় আসেন এবং কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়; কেবলমাত্র বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র এবং মাটির হাড়িকুড়ি ও খেলনার দোকানগুলি নিকটবর্তী গ্রাম হইতে আসে। মেলায় খাবারের দোকানের সংখ্যা প্রায় দশটি। ইহা ব্যতীত, কয়েকটি মনিহারী দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান এবং বই-ছবি ও ঔষধপত্রের দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের অন্যতম আকর্ষণ দেউলনাচ ও দেউলগান (হাস্যকৌতুক ও সঙ) এবং পুতুলনাচ। ইহা ব্যতীত, ঘোড়দৌড়, কবিগান ও যাত্রাভিনয় হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

মদারাই গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দিরের আশপাশে একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় আশপাশের গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচশত নরনারী আসেন এবং চার-পাঁচটি খাবারের দোকান, দুই-তিনটি বাসনকোসনের দোকান, দুই-একটি মনিহারী, কাপড়-চোপড় ও বই-ছবি প্রভৃতির দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

দক্ষিণেশ্বরের জাঁতাল উৎসবের মেলা

ধপধপি গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ দক্ষিণেশ্বরের বাৎসরিক জাঁতাল উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে উপাস্য দেবতার প্রায় তিন বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় ডায়মণ্ডহারবার, দক্ষিণ বারাসত, লক্ষ্মীকান্তপুর, বারুইপুর, জয়নগর, ক্যানিং, সোনারপুর, গড়িয়া, ব্যারাকপুর ও কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মোট প্রায় একশত চল্লিশটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসিয়া থাকে। বিক্রেতারা প্রতি বৎসর আশপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে আসিয়া থাকেন। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, ঔষধপত্রের দোকান, বই-ছবির দোকান, শিল্পসামগ্রী ও কারুশিল্পের দোকান বসিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত, গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদিও মেলায় বিক্রয় হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রা, জলসা, কবিগান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল আমোদপ্রমোদে প্রায় দেড় হাজার দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

রাসযাত্রার মেলা

বারুইপুরে রাধাকৃষ্ণের রাসোৎসব উপলক্ষে স্থানীয় প্রাচীন জমিদার রায়চৌধুরীদিগের প্রায় আট বিঘা জমির উপর কার্তিক পূর্ণিমা হইতে এক মাসব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

চব্বিশ-পরগণা জেলার বিভিন্ন থানা হইতে এবং কলিকাতা হইতে মেলায় পঁচিশ সহস্রের অধিক নরনারী যোগদান করিয়া থাকেন। প্রধানতঃ ট্রেন, মোটরবাস, ট্যাক্সী ও রিক্সাযোগে যাত্রীরা আসেন।

মেলায় ছয়শতাধিক দোকানপাট বসে। প্রধানতঃ চব্বিশ-পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে ও কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে প্রায় একশত ময়রা, তেলে-ভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান ব্যতীত মনিহারী দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, শিল্পসামগ্রী ও কারু-শিল্পের দোকান, বাসনপত্রের দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান এবং ঔষধপত্র ও বই-ছবি ইত্যাদির দোকান বসে। ইহা ভিন্ন, ফেরিওয়ালাগণ অন্যান্য বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়া থাকেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য প্রতি বৎসর পুতুলনাচ, কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ সনে 'যুগান্তর' পত্রিকায় দক্ষিণ গোবিন্দপুর নিবাসী শ্রীপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় বারুইপুরে রাসযাত্রার মেলা সম্পর্কে অভিযোগ জানাইয়া নিম্নলিখিত পত্র প্রকাশ করেন।

খাস বারুইপুরে রাসমেলা আজ ক'দিন ধরে চল্‌ছে। নানা রকমের খেলা এসেছে তার মধ্যে ইণ্টারন্যাশন্যাল সারকাস প্রধান। এরূপ শুনা যাইতেছে নিত্য এই সারকাসে ৭।৮ হাজার টাকার মত টিকিট বিক্রী হইতেছে। ভিড়ের চাপে কোন প্রকার শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা দেখা যায় না। রাহাজানি, গুণ্ডামি, পকেটমার অবাধে চলিতেছে। মেয়েদের গহনাদি ছিনাইয়া লইতেছে এরূপ শুনা যায়। আশা করি পুলিশ শান্তিরক্ষায় একটু অবহিত হবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—উল্লেখযোগ্য যে, বারুইপুরের রথযাত্রার মেলারও বিশেষ খ্যাতি আছে। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী এই মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং চব্বিশ-পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে মোট প্রায় দশ সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

ইহা ব্যতীত, ফাল্গুন মাসে রাধাকৃষ্ণের দোল উপলক্ষে এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব উপলক্ষে মেলায় যথাক্রমে দুই সহস্র ও পাঁচ সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।



থানা ঃ ভাঙ্গড়

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ বামুনিয়া। ৪৫।১,৯৮১·৬৯।৬৬৯।৪,৩১০

(ক) ব্রাহ্মণ, গোপ, মুসলমান ও ওরাং। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) ভাঙ্গড় রোড দিয়া মোটর ব্যতীত কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে ভাঙ্গড় খাল দিয়া নিয়মিত মোটরলঞ্চ যাতায়াত করে। গ্রামের মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা দিয়া যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ১২ই ফাল্গুন গোরাচাঁদ পীরের উরস অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বেশ প্রাচীন বলিয়া জানা যায়। উৎসব উপলক্ষে অগণিত নরনারীর সমাগম হয়। ভক্তরা ভাত এবং রান্না করা পাঠা বা মুরগীর মাংস পীরের স্থানে মানত দিয়া থাকেন। মানতের খাদ্যবস্তুগুলি দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

(ঙ) গোরাচাঁদ পীরের মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন।

(চ) গ্রামে গোরাচাঁদ পীরের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীনকুলেশ্বর দে, শিক্ষক,
বামুনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ সানপুকুরিয়া। ৬৭।১৪৫·৫০।১৬৫।৮৬২

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। হিন্দুদিগের মধ্যে অধিকাংশই কর্মকার শ্রেণীভুক্ত। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে ভাঙ্গড় খাল দিয়া নৌকা ও মোটরলঞ্চ যাতায়াত করে। ভাঙ্গড় রোড দিয়া মোটর চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় মহোৎসব উপলক্ষে রাধাকৃষ্ণের পূজা ও অষ্টমপ্রহরব্যাপী অখণ্ড নামসংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে হুগলী জেলার হারিট গ্রাম নিবাসী জনৈক বৈষ্ণব ভক্ত এই গ্রামে মহোৎসবের প্রচলন করেন। একটি প্রাচীন বাঁধানো বেদীর উপর তুলসী মণ্ডপের নীচে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপন করিয়া পূর্বদিন যথারীতি অধিবাস ও পরের দিন পূজা ও উৎসব পালন করা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং ইহাতে আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারী আসিয়া থাকেন। উৎসব সমাপ্তির দিন হরির লুটের বাতাসা কুড়াইবার জন্য প্রচুর লোকের হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। প্রতি বৎসর প্রায় তিন-চার মণ বাতাসা লুট দেওয়া হয়। উৎসব উপলক্ষে সর্বজনীন ভোজ ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ইহা ব্যতীত, প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে শ্মশান কালীর পূজা হইয়া থাকে।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমা হইতে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ ও শ্মশানকালীর পাকা বেদী এবং মনসার একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

কিংবদন্তী আছে গ্রাম পত্তন কালে একটি পুকুর খনন করিবার সময় ভূগর্ভে প্রাচীন ইষ্টক নির্মিত একটি সান বাঁধান ঘাট দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সময় পুকুর খননকারীকে স্বপ্নে ঐ পুকুর খনন করিতে নিষেধ করা হয় এবং তদনুসারে পুকুর খনন করা বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর কিছুদিন গ্রামবাসীগণ উক্ত সানের ঘাটে পূজাদি করিতে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন সানের ঘাটটি অদৃশ্য হইয়া যায়। এই কারণে গ্রামের নাম সানপুকুর হইয়াছে বলিয়া প্রবীণদের নিকট হইতে জানা যায়।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ কর্মকার, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ সানপুকুর, পোঃ ভাঙ্গড়,
২৪-পরগণা।

৩। গ্রাম ঃ মরিচা। ৭২।১৯৯·২৫।৩৫৬।১,৮২৫

(ক) মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও তাঁত শিল্পের কাজ।

(গ) ভাঙ্গড় রোড দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ২০শে ফাল্গুন হইতে এক সপ্তাহব্যাপী পীর ইসমাইল শা-র আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি পচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) পীর ইসমাইল শা-র আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে মেলা। প্রতি বৎসর ২০শে ফাল্গুন হইতে সপ্তাহব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন এবং স্থানীয় অঞ্চলে ইহা 'কালাচাঁদ মেলা' নামে খ্যাত।

(চ) ×

শ্রীনুরুল ইসলাম, কৃষিকার্য,
গ্রাম : দীঘরপাড়া,
পোঃ ভাঙ্গড় রঘুনাথপুর, ২৪-পরগণা।

৪। গ্রাম : ভাঙ্গড় (মৌজা : গোবিন্দপুর)। ৯২।৫৫১'৫৯।৪১০।২,০৬৬

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) কলিকাতা হইতে ভাঙ্গড় ক্যানেল দিয়া নিয়মিত মোটরলঞ্চ এবং নৌকা চলাচল করে। ইহা ব্যতীত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্মিত ভাঙ্গড় রোড দিয়া বে-সরকারী ট্রাকে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যায় কালীপূজা এবং ফাল্গুন মাসের ১লা তারিখ হইতে তিনদিন-ব্যাপী অখণ্ড নামসংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি প্রাচীন কালীমন্দির আছে। ভাঙ্গড় বাজারের ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে চাঁদা ও তোলা আদায় করিয়া নিত্য পূজা এবং উৎসব হইয়া থাকে।

ইহা ব্যতীত, প্রতি বৎসর ১৬ই চৈত্র পীর ভাঙ্গড় সুলতান সাহেবের উরস্ মোবারক বা তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে পীরের মাজার আছে। উৎসবের দিন বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু যাত্রী শোভাযাত্রা করিয়া পীরের মাজারে হাজত দিতে আসেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই উৎসবে যোগদান করেন। উৎসবটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। ভাঙ্গড় সুলতান পীরের বংশধরগণই উৎসবের প্রধান সেবায়েত বা খাদেমদার। তাঁহাদের পদবী মীর। পীরের বংশধরগণ পালাক্রমে উৎসব পরিচালনা করিয়া থাকেন। পীরের প্রকৃত নাম আলী আসগর বলিয়া শোনা যায়।

(ঙ) পীর ভাঙ্গড় সুলতান সাহেবের উরস্ উপলক্ষে মেলা। প্রতি বৎসর ১৬ই চৈত্র মেলা হয়। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ইটের দেওয়াল ও টিনের ছাউনীযুক্ত একটি জীর্ণ কালীমন্দির ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির এবং পীর ভাঙ্গড় সুলতান সাহেবের বাঁধান মাজার আছে।

শ্রীমদনমোহন দত্ত, চাকুরী,
গ্রাম ও পোঃ ভাঙ্গড়,
ও
শ্রীমীর আবদুস সামাদ, কৃষিকার্য,
ভাঙ্গড় মীরপাড়া দরগাহবাটী, ২৪-পরগণা।

৫। গ্রাম : শাঁকসহর। ১১৯।৪৫০'৬৩।২৭৯।১,৩৯৬

(ক) কামার, কুমার, গোপ, নাপিত, মুচি, কাওরা ও মুসলমান। গ্রামে নয়টি পাড়া আছে। যেমন—কামার-পাড়া, সর্দারপাড়া, দাসপাড়া, পানপাড়া, প্রামাণিকপাড়া, ঘোষপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) ভাঙ্গড় রোড দিয়া মোটর চলাচল করে। কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে ভাঙ্গড় খাল দিয়া মোটর-লঞ্চে ভাঙ্গড় পৌঁছাইয়া সেখান হইতে চার মাইল পথ ট্রাকে অথবা হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়। কলিকাতা-ক্যানিং রেলপথে চম্পাহাটি রেলস্টেশন হইতে আট মাইল পদব্রজে অথবা ধাপা তপসীটোল স্টেশন হইতে ভাঙ্গড় হইয়া শাঁকসহর পর্যন্ত ট্রাকে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তিতে বাবন পীরের উরস্ অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) বাবন পীরের উরস্ উপলক্ষে মেলা। প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি হইতে দশ-বারদিনব্যাপী মেলা চলে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ এবং বাবন পীরের সমাধি ও তৎসহ একটি পাকা মসজিদ্ আছে।

শোনা যায়, পূর্বে বিদ্যাধরী নদী হইতে শঙ্খ ও শামুক সংগৃহীত হইত এবং এই গ্রামেই উহার প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। এই কারণেই গ্রামের নাম শাঁকসহর হয় বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

শ্রীললিত কুমার সিংহ, ব্যবসায়,
টাংরাখালি,
ও
শ্রীঅক্ষয় কুমার দাস, প্রধান শিক্ষক,
বোদরা উচ্চ বিদ্যালয়,
পোঃ বোদরা, ২৪-পরগণা।

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব
(বাবন পীর)

শাঁকসহর গ্রামে প্রতি পৌষসংক্রান্তিতে সাড়ম্বরে বাবন পীরের তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে বাবন পীরের সমাধি ও তৎসংলগ্ন মানিক পীরের স্থান ও একটি মসজিদ্ আছে। প্রতি বৎসর পীরের সমাধি স্থানে যথারীতি উৎসবের মাধ্যমে বাবন পীরের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। উৎসবটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এবং এই অঞ্চলের সর্বজনীন উৎসব। ২৪ পরগণা জেলার সমগ্র উত্তরাংশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু নরনারী উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত, বহু আদিবাসী সাঁওতাল, মুণ্ডা সম্প্রদায়ের নরনারীও উৎসবের সময় আসিয়া থাকেন। উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন আট-দশ সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীরা প্রধানতঃ ফল-বাতাসা দিয়া পীরের নিকট হাজত বা পূজা দিয়া থাকেন এবং মানত স্বরূপ পীরের স্থানে পাঠা ও মুরগী জবাই করেন। প্রধানতঃ পুরাতন ক্ষত ও বাত বেদনা নিরাময়ের জন্য পীরের নামে তেলপড়া দেওয়া হয়। মানসিককারিগণ বাবন পীরের সমাধি স্থানে একটি নূতন মাটির পাত্রে সরিষার তেল রাখিয়া পীরের নিকট রোগ নিরাময়ের প্রার্থনা জানান। এই গ্রামে অবস্থানকারী বাবন পীরের বংশধরগণ (কয়াল বংশীয়) ঐ মন্ত্রপূত তেল দিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন, বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের জন্য 'জলপড়া' দেওয়া হয়। পীরের সেবায়েত জনৈক মুসলমান, পদবী মোল্লা। উৎসবের সময় বাবন পীরের সমাধি প্রাঙ্গণে পাঁচালি গানের আসর বসে। বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর কমপক্ষে তিন-চারটি পাঁচালিগানের দল আসে। খোল-করতালসহযোগে হিন্দু এবং মুসলমান ফকিরেরা চামর দোলাইয়া মানিক পীরের পাঁচালি গাহিয়া থাকেন।

শোনা যায়, বাবন পীর (মোল্লা) এই গ্রামে এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্মানুরাগী ছিলেন। কোন এক সময় পাগলাবেশী মানিক পীর তাঁহাকে দেখা দিয়া রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের জন্য মন্ত্রপূত তেল বিতরণের আদেশ দেন। তাহার পর হইতেই তিনি গ্রামে রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে ঐ মন্ত্রপূত তেল দিয়া পীড়িতদের নিরাময় করিতেন। ক্রমেই তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং নানা স্থান হইতে 'তেলপড়া' সংগ্রহের জন্য লোকজন আসিতে থাকেন। প্রায় ৭০।৭২ বৎসর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করিলে পর তাঁহার মরদেহ এই গ্রামেই কবর দেওয়া হয়। তাঁহার নানা মহৎ গুণের জন্য মৃত্যুর পর লোকে তাঁহাকে পীর আখ্যা দেন।

কিংবদন্তী আছে, বাবন পীরের মৃত্যুর অব্যবহিত পর কলিকাতাবাসী জনৈক ব্যক্তি তেলপড়া সংগ্রহের জন্য বাবন পীরের বাড়ির উদ্দেশ্যে আসেন। ঐ ব্যক্তি বাবন পীরের মৃত্যু সংবাদ জানিতেন না। পথে বাবন পীর তাঁহাকে বৃদ্ধ ফকিরের বেশে দেখা দিয়া তাঁহার কবর স্থানের নিকট তেল পাত্র রাখিয়া প্রার্থনা জানাইতে উপদেশ দেন এবং পরে ঐ তেল ব্যবহার করিতে বলেন।

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা
(পীর ইসমাইল শা)

মরিচা গ্রামে প্রতি বৎসর ২০শে ফাল্গুন হইতে পীর ইসমাইল শা-র আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে তাঁহার সমাধি-স্থানের নিকট পীরোত্তর জমিতে সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন এবং প্রতিদিন বিকালের দিকে মেলায় বেচাকেনা ও লোকসমাগম হয়। চকবড়ালী, ভাঙ্গড়, রঘুনাথপুর, কালীকাপুর, নলমুড়ি, চালতাবেড়িয়া, ভোজের হাট, হাগুলগাছি প্রভৃতি নিকটবর্তী গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় দুই সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। সমাগত যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান।

মেলায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং প্রায় পনরজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা অধিকাংশই

ভাঙ্গড় বাজার হইতে আসিয়া থাকেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা ও চা-পান-বিড়ির দোকান, মনিহারী দোকান, মাটির পুতুল, হাঁড়িকুড়ি ও খেলনার দোকান ব্যতীত কয়েকটি হাকিমী ও টোটকা ঔষধপত্রের দোকান ও বই-ছবির দোকান বসে। মাটির তৈয়ারী জিনিসপত্রগুলি প্রধানতঃ কালিকাপুর গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় আসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কবিগান, জলসা এবং থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ভিন্ন গ্রাম হইতে থিয়েটার ও যাত্রার দল আসে।

(পীর ভাঙ্গড় সুলতান সাহেব)

ভাঙ্গড়ে প্রতি বৎসর ১৬ই চৈত্র তারিখে পীর ভাঙ্গড় সুলতান সাহেবের উরস্ উপলক্ষে পীরের মাজার সংলগ্ন প্রায় ৫ বিঘা পীরোত্তর জমিতে মেলা বসে। ইহা শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

ভাঙ্গড় থানার এবং হাড়োয়া থানার বিভিন্ন ইউনিয়ন হইতে প্রধানতঃ মেলায় যাত্রীরা আসিয়া থাকেন।

ইহা ব্যতীত, মাতলা ও কলিকাতা হইতেও প্রতি বৎসর কিছু সংখ্যক যাত্রী আসেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় পাঁচ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

প্রধানতঃ ভাঙ্গড় বাজার হইতে এবং আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম ও কলিকাতা হইতে বিক্রেতারা প্রতি বৎসর মেলায় আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান ও তোলা আদায় করা হয়। মেলায় ময়রা, তেলে-ভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই অধিক। ইহা ব্যতীত, কাপড়চোপড়ের দোকান, বাসনকোসনের দোকান, লাঙ্গল, কাস্তে, দা, কুড়াল, খোন্তা, শাবল, খুরপী, নিড়ানী প্রভৃতি কৃষি সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, বই-ছবি ও ঔষধপত্রের দোকান বসে। মরিচা, নলপুকুর, বড়ানি প্রভৃতি গ্রামের তাঁতীদের তৈয়ারী গামছা ও মশারী এবং কালিকাপুর ও পানাপুকুর গ্রামের ডোমদের তৈয়ারী বাঁশের চ্যাঙ্গারী, কুলো, চালুনী প্রভৃতি প্রতি বৎসর মেলায় আসে। মেলায় পশু-পক্ষীর মধ্যে কেবলমাত্র ছাগল বিক্রয় হয়। শতাধিক দোকান-পাট বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য প্রতি বৎসর সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে। ইহা ভিন্ন, রাত্রিকালে উৎসব প্রাঙ্গণে আতশবাজি পোড়ান হয় ও কাওয়ালী গানের আসর বসে। কাওয়ালীর দল কলিকাতা হইতে আসে।

(বাবন পীর)

শাঁকসহর গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তিতে বাবন পীরের তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে পীরের সমাধি স্থানের আশপাশে প্রায় ত্রিশ বিঘা জমির উপর দশ-বারদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলার জমির কিছু অংশ বাবন পীরের বর্তমান বংশধরগণের এবং কিছু অংশ স্থানীয় ব্যক্তিবিশেষের। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং প্রতিদিন মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকা অবধি মেলায় বেচাকেনা চলে।

প্রধানতঃ ২৪-পরগণা জেলার সমগ্র পূর্ব ও উত্তর অঞ্চল হইতে এবং ডায়মণ্ডহারবার ও লক্ষ্মীকান্তপুর হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের আট হইতে দশ সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। পূর্বে খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা হইতেও প্রচুর যাত্রী আসিত।

মেলায় প্রায় আড়াইশত দোকানপাট বসে এবং পঁচিশ-ত্রিশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। অধিকাংশ দোকানই খোলা জায়গায় বসে, তবে কতিপয় ব্যবসায়ী হোগলা দ্বারা অস্থায়ী ঘর নির্মাণ করিয়া লন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ ক্যানিং, চম্পাহাটি, ভাঙ্গড় এবং নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট হইতে দান ও তোলা আদায় করা হয়। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান পঞ্চাশটি; তাঁতের কাপড়, গামছা ও তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদের দোকান চল্লিশটি; বাসনকোসনের দোকান ও মনিহারী দোকান যথাক্রমে পঁচিশটি; দা, কোদাল, কুড়াল, শাবল, কাস্তে, বঁটি, কাটারী, খোস্তা, নিড়ানী প্রভৃতি কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান দশ-বারটি বসে। ইহা ব্যতীত, মাটির হাঁড়িকুড়ি, পুতুল ও খেলনার দোকান, ধামা, কুলো, চ্যাঙ্গারী প্রভৃতি বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকান, বই-ছবি ও ঔষধপত্রের দোকান, কাঠের আসবাবপত্র এবং মাদুরের

দোকান, মুদি দোকান, জুতার দোকান এবং পীরের নিকট হাজত দেবার ফুল-বাতাসার দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক ও সিনেমা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকে। কোন কোন বৎসর থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন, বহু ফকির ও বাউলের সমাগম হয়। ইহারা নানারূপ ভক্তিমূলক গান গাহিয়া থাকেন।

(গোরাচাঁদ পীর)

গোরাচাঁদ পীরের উরস উপলক্ষে বামুনিয়া গ্রামে ফাল্গুন মাসে পীরের নির্দিষ্ট স্থান সংলগ্ন দেবোত্তর জমিতে ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী এবং মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনা-পুতুলের পনর-কুড়িটি দোকান বসে এবং দুই-তিনশত নরনারীর সমাগম হয়। মেলাটি মাত্র আট-নয় বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

মহোৎসবের মেলা

সানপুকুরিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় অষ্টম-প্রহরব্যাপী অখণ্ড নামসংকীর্তন মহোৎসব উপলক্ষে উৎসব প্রাঙ্গণের নিকটবর্তী দেবোত্তর প্রায় পাঁচ হইতে সাত কাঠা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় আশপাশের গ্রাম হইতে মোট পাঁচ হইতে সাতশত নরনারীর সমাগম হয় এবং ময়রা, তেলেভাজা, কাঁচ ও মাটির বাসনপত্র, মনিহারী প্রভৃতি জিনিসপত্রের মাত্র পনর-যোলটি দোকান বসে। ইহা ব্যতীত, ধামা-কুলো, মাটির পুতুল প্রভৃতির কয়েকটি দোকান বসে। শেষোক্ত দোকানপাটগুলি প্রতি বৎসর ভাঙ্গড়, কচুয়া, পানাপুকুর প্রভৃতি স্থান হইতে আসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কোন কোন বৎসর যাত্রাভিনয় হয়।



থানা : জয়নগর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : ঢোষা। ৮১।৫৪৩৬৫।১৬৮।৭২৮

(ক) পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, বাগ্দী, বৈরাগী, উড়িয়া, প্রভৃতি। গ্রামে নয়টি পাড়া আছে। যেমন—মণ্ডলপাড়া, গায়েনপাড়া, বৈদ্যপাড়া, নস্করপাড়া, হালদারপাড়া, বৈরাগীপাড়া, উড়েপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর রেলপথে গোচারণ স্টেশনটি গ্রামের নিকটবর্তী। স্টেশন হইতে পূর্বদিকে জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে পৌছানো যায়। রাস্তাটি মোটরগাড়ী চলাচলের উপযোগী। সাইকেল রিক্সা অথবা গরুর গাড়ী করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়। গ্রামের উত্তরদিকে প্রবাহিত পিয়ালী নদীপথে নৌকায় ঢোষাহাটে পৌছানো যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং চৈত্র মাসে 'দেল উৎসব' বা শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের লক্ষ্মীপূজা, দোল ও রাস উৎসব হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে দুইটি প্রাচীন বটগাছের নীচে মাটির দেওয়াল ও টালির ছাউনি দেওয়া একটি সাধারণের দেবালয় আছে। ঐ দেবালয়ে পঞ্চানন্দ, শীতলা, বসন্তরায়, মনসা, বনবিবি প্রভৃতি দেবদেবী আছে। স্থানটি পঞ্চানন্দতলা নামে খ্যাত।

শ্রীঅভিরাম সরদার, চাকুরী,
ঢোষা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ঢোষা, ২৪-পরগণা।

২। গ্রাম : গোবিন্দপুর।
১১৪।১,০৭৬১৭।১৯৪।১,২৫৪

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে দশটি পাড়া আছে। যেমন—নস্করপাড়া, হালদারপাড়া, গায়েনপাড়া, সরদারপাড়া, বেনেপাড়া, খাঁপুইপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন দক্ষিণ বারাসত হইতে গ্রামে যাতায়াতের একটি সংকীর্ণ মেটে রাস্তা আছে। পিয়ালী নদীর তীরস্থ মহিষমারী ঘাট হইতে নৌকায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখে গোষ্ঠ উৎসব, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবগুলি প্রাচীন এবং সর্বজনীন।

(ঙ) গোষ্ঠযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে দুই-তিনদিনব্যাপী। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে হিন্দু সাধারণের একটি দেবালয় ও মুসলমানদের একটি মসজিদ্ আছে। ইহা ব্যতীত পঞ্চানন, শীতলা, বসন্তরায়, মনসা, বনবিবি প্রভৃতি দেবদেবীর স্থান আছে।

শোনা যায়, গ্রামে জমিদার মিত্র পরিবারের গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দের নামানুসারে গ্রামের নাম গোবিন্দপুর হইয়াছে।

শ্রীহীরালাল হালদার, চাকুরী,
গ্রাম : কালীনগর,
পোঃ নিমপীঠ, ২৪-পরগণা।

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক জয়নগর থানার অন্তর্গত বহড়ু, জয়নগর-মজিলপুর ও দক্ষিণ বারাসত-এ অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণাদি সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

বহড়ু

"সঘনে দামামা ধ্বনি শুনি রায় গুণমণি
বড় ক্ষেত্র বাহিল আনন্দে।"

কলিকাতা হইতে প্রায় ৩২ মাইল দক্ষিণে বহড়ু গ্রাম অবস্থিত। শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর রেলপথে এই গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। তাহা ছাড়া কুলপী রোড এই গ্রামের মধ্য দিয়া জয়নগর-মজিলপুর হইয়া কলিকাতা অভিমুখে গিয়াছে। কুলপী রোড দিয়া নিয়মিত মোটর বাস চলাচল করে। বহড়ু একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এমন কি প্রাক্-মুসলমান যুগে এই গ্রামের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া বিজ্ঞজনেরা মনে করেন। পূর্বে ইহা অধুনালুপ্ত আদি গঙ্গার তীরবর্তী একটি জনপদ ছিল বলিয়া বিশ্বাস এবং সপ্তদশ শতকে রচিত কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে উল্লেখিত 'বড়ুক্ষেত্র' বর্তমান বহড়ু হইতে অভিন্ন বলিয়া অনুমান করা হয়। এই স্থানের মৃত্তিকাদি খননকালে হিন্দু দেবদেবীর কয়েকটি প্রাচীন শিলামূর্তি পাওয়া গিয়াছে। বর্তমান বহড়ু ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রধান গ্রাম বলা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন, কাওরা, বাগ্দী, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস আছে।

বহড়ুর কথা বলিতে হইলে এখানকার প্রাচীন জমিদার বসু পরিবারের কথা আসিয়া পড়ে। বিশেষতঃ বহড়ুর শ্যামসুন্দরজীউর মন্দির প্রসঙ্গে তাহাদের কথা একান্ত অপরিহার্য। বহড়ুর বসুরা প্রথমে চব্বিশ-পরগণার মল্লিকপুরের নিকটবর্তী মাহীনগরে বসবাস করিতেন। সেখান হইতে বহড়ুর নিকটবর্তী ময়দা গ্রামে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন এবং আনুমানিক ১১৫৪ বঙ্গাব্দে ময়দা গ্রামের কয়েকজন ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সহ তাঁহারা বহড়ু গ্রামে আসেন। বসু পরিবারের দেওয়ান নন্দকুমারের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য; এই বংশে তিনিই প্রথম জমিদারীর সূচনা করেন। বলা হয় কাণ্যকুব্জ হইতে আগত পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচজন সঙ্গী বঙ্গদেশে আসেন তাঁহাদের মধ্যে দশরথ বসু হইতে নন্দকুমার অধস্তন ২৩ পুরুষ ছিলেন। কর্মজীবনে ইনি প্রথমে কাশিমবাজার কান্তবাবুদের জমিদারীর ম্যানেজার; মণ্ডলঘাটে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠির গোমস্তা, কাশিমবাজার রেশম কুঠির দেওয়ান ও পরে কলিকাতা কাষ্টম হাউসের দেওয়ানরূপে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে নন্দকুমার বৃন্দাবনে যাইয়া তথাকার মদনমোহন, গোপীনাথ ও গোবিন্দজীউর ভগ্ন-মন্দির নিজ ব্যয়ে সংস্কার করান এবং বৃন্দাবনধামে ব্রহ্মকুণ্ডের পশ্চিমে গোবিন্দমন্দির নির্মাণ করিয়া রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া শোনা যায় মাতৃ আদেশে স্বগ্রাম বহড়ু বসত বাটীতে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে শ্যামসুন্দরজীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১২৩২ বঙ্গাব্দের ২রা আশ্বিন এক দানপত্রের মাধ্যমে তিনি তাঁহার চব্বিশ-পরগণা জেলার জমিদারীর এক বৃহৎ অংশ শ্যামসুন্দরজীউর সেবা-পূজার নিমিত্ত দেবোত্তর করিয়া দেন। ১২৩৩ বঙ্গাব্দে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং তথায় ১২৪১ সনে প্রায় ৮২ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। এই পরিবারে রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু একজন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন এবং কয়েকটি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। বর্তমানে তাঁহাদের প্রাসাদতুল্য জীর্ণ বসতবাটীতে বসু পরিবারের বংশধরগণ বসবাস করিতেছেন। ইঁহাদের বাটীর অভ্যন্তরে সুসজ্জিত বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপটি বর্তমানে প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

বহড়ু প্রসঙ্গে শ্যামসুন্দরজীউর মন্দিরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, মন্দিরটি ফ্রেসকো দ্বারা সজ্জিত। বাংলা দেশে ফ্রেসকো সজ্জিত মন্দিরের সংখ্যা খুবই নগণ্য; তাহার মধ্যে শ্যামসুন্দরজীউ মন্দিরের দেওয়াল গাত্রে ফ্রেসকো চিত্রগুলি এখনো মোটামুটি অম্লান আছে এবং চিত্রগুলির শিল্পকর্মও প্রশংসনীয়। বসুবাটী সংলগ্ন শ্যামসুন্দরজীউর মন্দিরটি সম্পূর্ণ প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। মন্দির নির্মাণের জন্য সুদূর জয়পুর হইতে প্রস্তর আনা হইয়াছিল। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী, সমতল ছাদ বিশিষ্ট এবং ইহার পাশাপাশি তিনটি কক্ষের মধ্যেরটিতে কারুকার্য খচিত কাঠের সিংহাসনের উপর কষ্টি পাথর নির্মিত শ্রীকৃষ্ণ ও অষ্টধাতু নির্মিত শ্রীরাধিকার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই যুগল মূর্তিই শ্যামসুন্দরজীউ নামে খ্যাত। ইহার দক্ষিণ দিকের কক্ষটি শ্যামসুন্দরজীউর শয়ন মন্দিররূপে এবং বাম দিকের কক্ষটি ভোগ-নৈবেদ্যাদি প্রস্তুত করবার জন্য ব্যবহার করা হয়। মন্দির কক্ষের কাষ্ঠ নির্মিত দরজাগুলি এবং সম্মুখস্থ দরদালানের গাত্র খোদাই করিয়া সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত করা হইয়াছে। বহড়ুর শ্যামসুন্দরজীউর মন্দিরের বিস্তারিত বিবরণী দিয়া বন্ধুবর শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায় ২১শে পৌষ ১৩৭৪ সনে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ

প্রকাশ করেন। উহার অংশ বিশেষ আগ্রহী পাঠকের জন্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল :

"আলোচ্য মন্দিরটি নির্মাণ হয়েছিল ১৮২১ থেকে ১৮২৫ সালের মধ্যে। মন্দিরটি পশ্চিম ভারতীয় স্থাপত্য রীতি অনুসারে নির্মিত এবং আকারে আয়তাকার কোঠাবাড়ীর মত। আয়তন এবং আকারের দিক থেকে কোন বিশেষত্বই এই মন্দিরের নেই; অন্তত আমার তাই মনে হয়। উত্তর দিকের দেওয়ালের সঙ্গে একটি দরদালান সংলগ্ন। পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত ছয়টি নাতিদীর্ঘ স্তম্ভ থেকে উঠেছে পাঁচটি পত্রাকৃতি খিলান, এই খিলানগুলি দরদালানের ছাতের ভার বহন করছে; মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ৩৮ ফিট ৯ ইঞ্চি—প্রস্থ ৩২ ফিট ৪ ইঞ্চি—ভিতের উচ্চতা ২ ফিট ৯½ ইঞ্চি—ভিতসহ মন্দিরের উচ্চতা ১৮ ফিট ৪ ইঞ্চি। দরদালানের দৈর্ঘ্য ৩৪ ফিট ৪ ইঞ্চি—প্রস্থ ৯ ফিট ২½ ইঞ্চি এবং মেঝে থেকে ছাদের উচ্চতা ১১ ফিট ৫ ইঞ্চি। উত্তর দিকের দেওয়ালে পাশাপাশি পাঁচটি প্রবেশপথ রয়েছে। প্রতিটি প্রবেশপথের খানিকটা উপরে পত্রাকৃতি খিলান উৎকীর্ণ রয়েছে। প্রধান প্রবেশপথের উচ্চতা ৫ ফিট ৬½ ইঞ্চি—এবং প্রস্থ ২ ফিট ৯ ইঞ্চি। প্রবেশ পথগুলির একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাঁড়িয়ে আছে ছয়টি অর্ধ উৎকীর্ণ স্তম্ভ। প্রবেশপথগুলির নিম্নাংশে প্রস্ফুটিত পদ্মের পাপড়ি উৎকীর্ণ আছে। প্রধান স্তম্ভগুলির শীর্ষে এবং পাদদেশে গর্ভগৃহের ভিতরের দেওয়ালে "ফ্রিজে" এমন কি মন্দিরের প্রবেশপথগুলির চারিদিকে পর্যন্ত এই পদ্ম পাপড়ির বহুল ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি প্রবেশপথের দুই পাশে পুষ্পিত বৃক্ষ শাখা ও পদ্মের ব্যবহার করা হয়েছে। খিলানের শীর্ষে ও দুই পাশেও এই একই মোটিফ ব্যবহৃত হয়েছে।

মন্দির এবং ঠাকুর-দালান এখনও মোটের উপর সুরক্ষিত আছে। কিন্তু যত্র তত্র শালিমার পেইন্ট ব্যবহার করার দরুণ তাদের বাইরের চেহারাটা দাঁড়িয়েছে মসজিদের মত। বিশেষ করে দরদালানটি এতই বেশী রংচং-এ যে চোখে লাগে এবং এই জন্যই মন্দিরের স্থাপত্য-গাম্ভীর্য যাও কিছু ছিল,—একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। ফ্রেসকো-গুলির প্রতি কিন্তু কোন যত্নই নেওয়া হয়নি।

শ্যামসুন্দর মন্দিরের দরদালানের পূর্ব ও পশ্চিমদিকের দেওয়ালে এবং মূল মন্দিরের পাঁচটি প্রবেশপথের ঠিক উপরে আলোচ্য ফ্রেসকোগুলি রয়েছে। দরদালানের পূর্ব ও পশ্চিমদিকের দেওয়ালে প্রায় বর্গাকার জমিনের উপর এই মন্দিরের প্রধান ফ্রেসকোগুলি অংকিত। প্রবেশ পথগুলির উপরে যেখানে অন্যান্য ফ্রেসকোগুলি আছে সেই অংশের মাপ হলো—উচ্চতা ১ ফিট ১১ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৪ ফিট ১০ ইঞ্চি। রামলীলা, কৃষ্ণলীলা এবং চৈতন্যলীলা বিষয়ক বিভিন্ন মোটিফ নিয়ে ফ্রেসকোগুলি অংকিত।

দরদালানের পূর্বদিকের দেওয়ালে বিভিন্ন অবতার মোটিফ স্থান পেয়েছে, যেমন মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, পরশুরাম, রাম এবং কল্কি। আর এক জায়গায় বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথকে দেখা যাচ্ছে। বিষ্ণুলীলা বিষয়ক দুইটি মোটিফ দেওয়ালের শীর্ষদেশে স্থান পেয়েছে। বৈকুণ্ঠ-ধামে সনক, সনন্দ এবং সনাতনসহ লক্ষ্মীনারায়ণ দাঁড়িয়ে আছেন। এর ডানদিকে অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণু, বিষ্ণুর পদতলে লক্ষ্মী বসে আছেন, বিষ্ণুর নাভিদেশ থেকে ব্রহ্মা উঠছেন। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক মোটিফের সংখ্যাই বেশী যেমন অষ্টসখী পরিবৃত রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি, হরিহর, রাধার মানভঞ্জন, কালিকৃষ্ণ, কংসবধ, যশোদা কর্তৃক শিশু কৃষ্ণকে মাখন প্রদান, যমলার্জুন, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা। দরদালানের এই অংশেই মন্দিরের দুটি উৎকৃষ্ট ফ্রেসকো আছে। একটিতে চৈতন্যদেবের ষড়ভুজ মূর্তি, চৈতন্যদেবের দুই পাশে দণ্ডায়মান রাজা প্রতাপ রুদ্র ও সভাপণ্ডিত সার্বভৌম।

একেবারে নীচে ডানদিকে যে ছবিটি আছে তা নিঃসন্দেহে এই মন্দিরের সর্বোৎকৃষ্ট ছবি এবং বিষয়বস্তু হিসাবে এর নির্বাচনে শিল্পির কল্পনাশক্তি ও মৌলিকত্বের পরিচয় বহন করছে। ছবিটির বর্ণনা দিচ্ছি : প্রমোদ উদ্যানে উপবিষ্টা অন্যমনস্কা রাধা উদ্যানসংলগ্ন প্রাসাদের এক পাশ থেকে কৃষ্ণ গোপনে রাধার দিকে চেয়ে আছেন। রাধার সখী বিশাখা একটি আয়না ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, আয়নায় রাধা ও তার পেছনে কৃষ্ণের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিশাখার উদ্দেশ্য রাধাকে কৃষ্ণের উপস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ করে দেওয়া, আর ঠিক তাই তিনি দেহটিকে ঈষৎ হেলিয়ে দিয়ে একটি বিশেষ কৌশলে আয়নাটি ধরে আছেন।

পশ্চিম দিকের দেওয়ালে আঁকা রয়েছে বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ কুঞ্জ ও যমুনা নদী। দেওয়ালের ঠিক মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ রাসমণ্ডল দেখা যাচ্ছে। রাসমণ্ডলের কেন্দ্রে

বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর দুই পাশে রাধা ও জনৈকা সখী। দ্বিতীয় বৃত্তটিতে অষ্টসখীসহ নৃত্যরত শ্রীকৃষ্ণ। তৃতীয় বৃত্তটিতে কুঞ্জগৃহ ও বৃক্ষের মোটিফ দেখা যাচ্ছে।

এইবার প্রবেশপথগুলির উপরভাগের ফ্রেসকো কটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। ডানদিক থেকে প্রথম প্রবেশপথটির উপরে যে ছবিটি দেখা যাচ্ছে তার বিষয়বস্তু হলো বৃষোপরি উপবিষ্ট হরপার্বতী। হরপার্বতীর দুই পাশে নন্দী ও ভৃঙ্গী। দুই নম্বর প্রবেশ পথটির উপর ভাগের ছবিটিতে রামলীলা বিষয়ক মোটিফ স্থান পেয়েছে। সিংহাসনে সীতাকে পাশে নিয়ে রাম বসে আছেন। তাঁর ডানদিকে রাজছত্র ধরে আছেন ভরত, ভরতের পেছনে করজোড়ে দণ্ডায়মান হনুমান। রামের বাঁদিকে দাঁড়িয়ে চামর দোলাচ্ছেন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। তিন নম্বর প্রবেশ পথের উপরে যে দৃশ্যটি অঙ্কিত তাও এক হিসাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা উপবিষ্ট গণেশের দুই পাশে দণ্ডায়মান দুই ব্যক্তির একজন হচ্ছেন নন্দকুমার বসুর পুত্র রামধন। চার নম্বর প্রবেশপথের উপরে চৈতন্যদেবের নামসংকীর্তনের দৃশ্য স্থান পেয়েছে, ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে যে, চৈতন্য তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে মত্ত হয়ে নৃত্য করছেন, ঠিক মাঝখানে একটি তুলসী মঞ্চ। তার এক পাশে যবন হরিদাস ও নিত্যানন্দ এবং অপর পাশে শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত্য ও অপর একজন ভক্ত। চৈতন্য ভাগবতে ভক্তসহ চৈতন্যদেবের এই উদ্দাম নৃত্যের বর্ণনা আছে। পাচ নম্বর বা একেবারে বাঁ দিকের প্রবেশ পথটির উপরে যে ফ্রেসকোটি আছে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের অধিকাংশ ফ্রেসকোগুলি বিবর্ণ এবং অস্পষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু এটি আজও মোটামুটি ভালই আছে। বৃন্দাবনের কুঞ্জে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন আর রাধা তাঁকে পেছন থেকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করছেন, তাঁদের দুই পাশে দুইটি বৃক্ষ দেখা যাচ্ছে।

শ্যামসুন্দরের মন্দির গাত্রের এই ফ্রেসকোগুলির শিল্পী দুর্গারাম ভাস্কর। দরদালানের পূর্বদিকে শিল্পী বাংলা হরফে তাঁর পরিচয় রেখে গেছেন এইভাবে—

"অতি দিন হিন ভক্ত জন: দুর্গারাম ভাস্করেন: চিত্রকরেন।"

কিন্তু কে এই দুর্গারাম ভাস্কর? কোন প্রদেশের লোক তিনি? বাংলার না রাজস্থানের?

ফ্রেসকোগুলির আলোচনা শেষ করার আগে আর একবার দরদালানের পূর্বদিকের দেওয়ালে অঙ্কিত প্রমোদ উদ্যানে উপবিষ্টা রাধার ছবিটির উল্লেখ করছি। প্রকৃত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক দৃশ্য এটা হতে পারে না। কৃষ্ণলীলার কোথাও এমন কোন বর্ণনা নেই, যার মধ্যে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত প্রাসাদের আড়ালে আত্মগোপন করে আছেন, আর রাধা একটি মোড়ার হাতে বসে আছেন এবং বিশাখার হাতে একটি চতুষ্কোণ ফ্রেমে আঁটা আয়না। শুধু তাই নয় প্রাসাদের গায়ে ভেনেসিয়ান জানালাও দেখা যাচ্ছে। আসলে কৃষ্ণলীলার মাধ্যমে শিল্পী দুর্গারাম তৎকালীন বঙ্গসমাজের উচ্চ কোটির নারী পুরুষের প্রেমলীলাই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, ধার্মিকের চোখে দৃশ্যটি কৃষ্ণলীলাই বটে। কিন্তু সন্ধানী চোখে আসল জিনিসটি ধরা পড়তে দেরী হবে না। এই ছবিটিকে একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক আলেখ্য হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।"

শ্যামসুন্দরজীউর নিকট ফলমূল, ছানা, চিনি, সন্দেশ ও ক্ষীর নিবেদন করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালীন ও সন্ধ্যা-কালীন পূজা হয়। প্রাচীন রীতি অনুসারে প্রাতঃকালীন নৈবেদ্য প্রত্যহ গ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগের বাড়ীতে বিতরণ করা হয় এবং সন্ধ্যাকালীন নৈবেদ্য পূজারী ব্রাহ্মণ পাইয়া থাকেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মন্দির প্রাঙ্গণে কীর্তনগানের আসর বসে। কীর্তনীয়ারা মাসিক বেতনভোগী।

নিত্য পূজা ব্যতীত শ্যামসুন্দরজীউকে কেন্দ্র করিয়া এই মন্দিরে শ্রাবণ মাসে ঝুলন, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল উৎসবাদির মধ্যে রাসযাত্রা উৎসবই বিশেষ উল্লেখযোগ্য; যদিও বসু পরিবারের আর্থিক দুরবস্থার জন্য উৎসবের সমারোহ অনেক ম্লান হইয়া গিয়াছে। রাসযাত্রা উপলক্ষে তিন-দিনব্যাপী যথারীতি পূজা, পুতুলনাচ, কবিগান এবং মৃন্ময় পুতুলের মাধ্যমে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নানা কাহিনী প্রদর্শিত হইয়া থাকে। উৎসবের দিন গ্রামস্থ সকল ব্রাহ্মণ পরিবার হইতে অন্ততঃ একজন করিয়া ব্রাহ্মণকে ভোজনে আপ্যায়িত করা হয় এবং প্রায় দুই-তিন হাজার অতিথি-অভ্যাগত ও দর্শকদিগের প্রসাদ বিতরণ

করা হয়। দোলযাত্রা উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসে।

ইহা ভিন্ন, প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমী তিথিতে এই মন্দিরে ঘট স্থাপন করিয়া সরস্বতীপূজা এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে গঙ্গাপূজা হয়। পূর্বে স্থানীয় চক্রবর্তী পরিবার শ্যামসুন্দরজীউর পূজা করিতেন; গত দশ বৎসর যাবৎ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নিত্য সেবা-পূজার কাজ করিতেছেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় মাসিক বেতনভোগী। ইহা ব্যতীত, তিনি বৎসরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে শ্যামসুন্দর-জীউর নিকট নিবেদিত ২০০ দিনের নৈবেদ্যাদি পাইয়া থাকেন।

স্থানীয় কমলাপতি চক্রবর্তী মহাশয়ের বাটীতে বসুদিগের জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দারুময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। চক্রবর্তী মহাশয়রাই উক্ত বিগ্রহের নিত্য সেবা-পূজা করেন; কেবলমাত্র স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা উপলক্ষে বসুরা কিছু আর্থিক সাহায্য করিয়া থাকেন।

বহড়ু বাজারের নিকট মাঝারি ধরণের পাঁচটি আটচালা গঠনের মন্দিরে পাঁচটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই শিবমন্দিরগুলি বসু পরিবারের লোকজন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। উহাদের মধ্যে কেবলমাত্র একটি মন্দিরের দেওয়াল গাত্রে গ্রথিত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, উহা বসু পরিবারের কোন কুলবধূ কর্তৃক ১২৬৩ সনের ২৮শে কার্তিক প্রতিষ্ঠিত। নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন ও চড়কপূজা হইয়া থাকে। চড়ক ও গাজন উৎসব বারোয়ারী। তবে গাজনের সন্ন্যাসীদের যাবতীয় ব্যয় শ্যামসুন্দরজীউর দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে নির্বাহ করা হয়।

ইহা ব্যতীত, বহড়ু গ্রামে প্রতি বৎসর বারোয়ারী দুর্গাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা ও কয়েকটি সরস্বতীপূজা হয়। বসু-বাটীর অভ্যন্তরে চণ্ডীমণ্ডপে পূর্বে দুর্গাপূজা হইত; প্রায় পনর-ষোল বৎসর হইল এই পূজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে দুর্গার মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং নিত্য পূজা হয়।

বহড়ু গ্রামে অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে বসুপাড়ায় একটি টিনের চালা ঘরে বাবাঠাকুরের দণ্ডায়মান মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিটি দ্বিভুজ, ত্রিনয়ন, ব্যাঘ্র চর্ম পরিহিত। বাহুতে ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কর্ণে ধুতরা ফুল, মস্তকে জটা, রক্তবর্ণ ও যজ্ঞোপবীতধারী। বাড়ুজ্যে-পাড়ায় একটি টিনের চালাঘরে বাঁ পা ঝুলাইয়া ও ডান পা মুড়িয়া উপবিষ্ট পঞ্চানন্দের এক সুবিশাল মৃন্ময় মূর্তি আছে। ইঁহার সাজসজ্জা ও বর্ণ উল্লিখিত বাবা-ঠাকুরের মূর্তির ন্যায়ই। তবে ইঁহার পদতলে জরাসুর ও দুই পাশে ভূত-প্রেত অনুচর আছে। এইরূপ বিশাল পঞ্চানন্দ মূর্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। স্থানীয় শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বন্দ্যোপাধ্যায়গণ পঞ্চানন্দের সেবায়েত ও পূজারী। প্রায় ৪৬ বৎসর পূর্বে এইস্থানে পঞ্চানন্দের মূর্তি স্থাপিত হয়। প্রাচীন মূর্তিটি জীর্ণ হইয়া পড়িলে ১৩৭২ বঙ্গাব্দে বর্তমান মূর্তিটি নির্মাণ করা হয়। এই একই ঘরে পঞ্চানন্দের সহিত দক্ষিণরায়ের পূজা করা হয়। ইহা ভিন্ন, বহড়ু দক্ষিণপাড়ায় ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠিত আছে।

জয়নগর-মজিলপুর

"অম্বুলিঙ্গ মহাস্নান, নাহি যার উপমান
তথায় বন্দিল বিশ্বনাথ।
বাদ্য বাজে সুমধুর বাহিয়া রাজা বিষ্ণুপুর
জয়নগর করিল পশ্চাৎ॥"

কলিকাতা হইতে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে চব্বিশ-পরগণা জেলার জয়নগর-মজিলপুর গ্রাম অবস্থিত। পূর্ব রেলপথে শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর শাখায় এই স্থানে একটি রেলস্টেশন আছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে গড়িয়া হইতে মোটরবাসেও জয়নগর-মজিলপুরে যাতায়াত করিতে পারা যায়। রেল লাইনের পূর্বদিকে মজিলপুর এবং পশ্চিমদিকে জয়নগর দুইটি ভিন্ন গ্রাম হইলেও এই দুই গ্রামের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টির পরিচয় আজ একই সূত্রে

বাঁধা। জয়নগর ব্যতীত মজিলপুর অথবা মজিলপুর ব্যতীত জয়নগরের কথা কেহ ভাবিতে পারেন না। রেলস্টেশনটিও জয়নগর-মজিলপুর এই যুগ্ম নামেই পরিচিত।

বর্তমানে লুপ্ত স্রোতা আদি গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী জয়নগর একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম এবং একদা মজিয়া যাওয়া আদি গঙ্গার ভূখণ্ডের উপরই মজিলপুর গ্রামের পত্তন হয় বলিয়া এই গ্রামের নাম মজিলপুর হইয়াছে এইরূপ অনুমান করা হয়। জয়নগর গ্রামে পুষ্করিণী প্রভৃতি খননকালে কৃষ্ণ প্রস্তরের দুইটি বিষ্ণু মূর্তি সহ আরও কতকগুলি প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় পণ্ডিতগণ অনেকে মনে করেন যে, প্রাক্-মুসলমান যুগে এই স্থানে একটি জনপদ ছিল। বর্তমান জনপদটিও প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন হইবে। মজিলপুরও প্রাচীন গ্রাম, তবে জয়নগরের তুলনায় নবীন বলা যাইতে পারে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত মঙ্গল কাব্যগুলিতে মজিলপুর নামের উল্লেখ না থাকিলেও জয়নগর গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত রায়মঙ্গল কাব্যে বহির্বাণিজ্য অন্তে গঙ্গা নদী বাহিয়া সওদাগরের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের যে বিবরণী কবি কৃষ্ণরাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে জয়নগর গ্রামের উল্লেখ আছে।

স্বনামধন্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মজিলপুর গ্রামে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন বলিয়া জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা যশোহরের চন্দ্রকেতু দত্ত নামে জনৈক ভূস্বামীর কুল পুরোহিত ছিলেন এবং মানসিংহ কর্তৃক যশোহর আক্রান্ত হইলে দত্ত পরিবারের সহিত তিনিও মজিলপুরে আসেন।

প্রাচীনকালে জয়নগর মজিলপুর বহু দেবালয় শোভিত এবং টোল-চতুষ্পাঠী সমৃদ্ধ জ্ঞান ও সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল বলিয়া জানা যায়। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ অধ্যুষিত প্রাচীন জয়নগর-মজিলপুর বর্তমানে একটি মিউনিসিপাল শহরে পরিণত হইয়াছে। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে এই স্থানের মোট জনসংখ্যা ১৪,১৭৭। বর্তমানে শহরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস আছে এবং এই স্থান থানা, ডাকঘর, হাট-বাজার, উচ্চ বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতি শহরের যাবতীয় উপকরণে সজ্জিত। মজিলপুরের দত্ত, ভট্টাচার্য, পোত্তা এবং জয়নগরের মিত্র, ঘোষ, মতিলাল প্রভৃতি পরিবার কেবলমাত্র আদিবাসিন্দারূপেই পরিচিত নহেন, জয়নগর-মজিলপুরের প্রগতি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁহাদের অবদানও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জয়নগরে জয়চণ্ডী নামে এক প্রাচীন দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। স্থানীয় মতিলাল পরিবারের জনৈক পূর্বপুরুষ গুণানন্দ মতিলাল প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে এই দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া শোনা যায়। কথিত আছে, দেবী চণ্ডীর নামানুসারেই এই গ্রামের নাম জয়নগর হইয়াছে। পক্ষান্তরে জয়নগর নামকরণের অন্য কারণও উল্লিখিত হইয়া থাকে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত "দেশাবলী বিবৃতি" নাম প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি হইতে জানা যায় যে, জয়নগর নিবাসী জনৈক পণ্ডিতপ্রবর ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার জয়গৌরব হিসাবে এই স্থান জয়নগর নামে খ্যাত হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উক্ত "দেশাবলী বিবৃতি" নামক পুঁথিখানি প্রাচীনত্ব সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মত পার্থক্য আছে।

স্থানীয় চণ্ডীতলায় সমতল ছাদ বিশিষ্ট সম্মুখে দালানযুক্ত দক্ষিণমুখী একটি পাকা ঘরে জয়চণ্ডীদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দেবালয়ের এক সারিতে তিনটি প্রকোষ্ঠের মধ্যেরটিতে সিমেন্টের বেদীর উপর স্থাপিত একটি কাষ্ঠমঞ্চে পদ্মের উপর দণ্ডায়মানা দারুময় দ্বিভুজা, ত্রিনয়নী, গৌরবর্ণা জয়চণ্ডীদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। দেবীর উভয় হস্তে অভয় ও বরাভয় মুদ্রা এবং মণিবন্ধে ও বাহুর উর্ধাংশে চওড়া পেটির ন্যায় অলঙ্কার খোদিত। দেবী বস্ত্র পরিহিতা এবং শিরে সোনার মুকুট শোভিত। মূর্তিটি প্রায় আড়াই ফুট উচ্চ।

এই গ্রামে দেবীর আবির্ভাব সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, অতীতে যখন এই অঞ্চল সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল সেই সময় স্থানীয় মতিলাল বংশের জনৈক আদিপুরুষ গুণসিন্ধু মতিলাল ও টুনু পণ্ডিত নামে জনৈক ব্যক্তি কার্যোপলক্ষে আদিগঙ্গা পথে যাতায়াতকালে একদা অরণ্যের মধ্যে জনৈক রমণীকে একাকী বিচরণ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হন এবং নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহারা উক্ত রমণীর অনুসন্ধানে অগ্রসর হইলে সহসা রমণী মূর্তি বন মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। সেইদিন রাত্রিকালেই মতিলাল মহাশয় এক স্বপ্নাদেশে জানিতে

পারেন যে, ঐ রমণী জয়নগরের দেবী জয়চণ্ডী এবং যে-স্থানে উক্ত রমণীর দর্শন পান উহা জয়নগর নামে খ্যাত। ইহা ভিন্ন, তাঁহার নিত্য পূজাদির আয়োজন করিতেও তিনি নির্দেশিত হন। স্বপ্নাদেশ অনুসারে গুণসিন্ধু মতিলাল একটি বকুল বৃক্ষের নীচে একটি প্রস্তর খণ্ড পান—ইহা দেবী চণ্ডীর প্রতীক। পরে দেবীর দারুময় মূর্তি নির্মাণ করা হয়। দেবীর প্রতীক উক্ত প্রস্তর খণ্ডটি অদ্যাপি মন্দিরাভ্যন্তরে একটি ছোট বেদীর উপর রক্ষিত আছে। সিন্দুরলিপ্ত এই প্রস্তর খণ্ডটির উপরেই দেবীর যাবতীয় পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মন্দিরের আর একটি প্রকোষ্ঠে দেবীর ভৈরবরূপে প্রায় এক ফুট উচ্চ গৌরীপট্টসহ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

বর্তমান মন্দিরটি প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে কলিকাতা নিবাসী শ্রীমহেন্দ্র শ্রীমানি মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে ও স্থানীয় গ্রামবাসীর সাহায্যে নির্মিত হয়। তৎপূর্বে এই স্থানে খড়ের ছাউনিযুক্ত একটি মাটির ঘরে জয়চণ্ডীদেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরের সম্মুখে টিনের ছাউনিযুক্ত প্রশস্ত নাটমন্দিরটি নিত্যহরি মতিলাল মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। অর্থাভাবের জন্য মন্দিরের মেঝে নির্মাণের কাজ অসমাপ্ত আছে।

অন্নপূর্ণার ধ্যানে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে অন্নভোগ ও সন্ধ্যায় দুধ-মিষ্টির শীতল ভোগ দিয়া জয়চণ্ডীদেবীর নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথি হইতে প্রতিপদ তিথি পর্যন্ত পনরদিনব্যাপী সাড়ম্বরে চণ্ডীদেবীর বার্ষিক উৎসব, শারদীয়া অষ্টমী তিথিতে এবং চৈত্র মাসে অন্নপূর্ণাপূজার দিন বিশেষ ভোগ-পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। পনরদিনব্যাপী বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন সন্ধ্যায় দেবী যথাক্রমে ভুবনেশ্বরী, কাত্যায়ণী, ব্রহ্মাণী, মহালক্ষ্মী, মনসা, রাইরাজা, বৈষ্ণবী, ইন্দ্রানী, জাহ্নবী, অন্নপূর্ণা, দুর্গা, বাসন্তী ও রাজরাজেশ্বরীরূপে বেশ পরিবর্তন করেন। রাজরাজেশ্বরী বেশ তিনদিন স্থায়ী হয়। এই সময় চব্বিশ-পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপ, উত্তরভাগ, রায়-দীঘি, বিষ্ণুপুর, আমতলা, বেহালা এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতিদিন ছয়-সাতশত নরনারীর সমাগম হয়। উৎসবকালে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত সর্বসাধারণের দর্শন ও পূজাদি দিবার জন্য মন্দিরের দ্বার খোলা থাকে এবং মন্দির প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসে। মেলায় মনিহারী, তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ, ময়রা, তেলেভাজা, মাটির পুতুল ও হাঁড়ি-কলসী, তালপাতার পাখা ইত্যাদির কুড়ি-পচিশটি দোকান বসে।

জয়চণ্ডী বিশেষ জাগ্রত দেবী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। দেবীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে লোকমুখে নানারূপ কিংবদন্তী শোনা যায়। কথিত আছে, একদা দেবী গ্রাম্য বালিকারূপে নটেশাক আহরণের জন্য স্থানীয় বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের গৃহ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন এবং তথায় শাক আহরণকালে গৃহস্থদের তাড়া খাইয়া দ্রুত পলায়নকালে বেড়ার গায়ে লাগিয়া তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলের কিয়দংশ ছিন্ন হইয়া যায়। পরে স্বপ্নে এই বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায় এবং এই ঘটনার স্মরণে অদ্যাপি প্রতি বৎসর আষাঢ়ী পূর্ণিমায় উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের বাড়ী হইতে নটেশাকের ব্যঞ্জন দিয়া দেবীর ভোগ-পূজা দেওয়া হয়। মন্দিরের সেবায়েতগণ আমাশয় রোগ নিরাময়ের জন্য দেবীর স্বপ্নাদ্য ঔষধ দেন। প্রতিদিন নানা স্থান হইতে ভক্তরা মন্দিরে মানসিক পূজা দিতে আসেন। সাধারণতঃ ষোড়শোপচারে পূজা, অর্থ, বস্ত্র, স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি মানসিক করা হয়। পূর্বে পূজায় পাঠা বলি দেওয়া হইত; মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে বলিদানকালে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় পাঠা বলি দেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে দেবীর নিত্য পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। বেতনভোগী জনৈক ব্রাহ্মণ নিত্য পূজা করেন। বর্তমানে উল্লিখিত টুনু পণ্ডিতের বংশধর ও তাঁহাদের দৌহিত্রগণ পালাক্রমে দেবীর সেবায়েতের কার্য করিতেছেন; পণ্ডিত পদবীধারী সেবায়েতগণ দক্ষিণরাঢ়ী ব্রাহ্মণ।

জয়নগরের মিত্র পরিবার স্থানীয় জমিদাররূপে পরিচিত। ইহাদের জমিদারী আরম্ভ হয় রামগোপাল মিত্র মহাশয়ের আমলে। রামগোপাল মিত্রের আদি বাস বেহালার নিকটবর্তী বড়িষা গ্রামে। ইনি কাণ্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণদের সহিত আগত কালিদাস মিত্রের অধস্তন ১৯তম পুরুষ ছিলেন বলিয়া ধরা হয়। রামগোপাল মিত্র বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীদিগের জমিদারীর কর্মচারী ছিলেন এবং জয়নগর নিবাসী অযোধ্যারাম সেনের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহার পাচ পুত্র সন্তোষ মিত্র, মুকুন্দ মিত্র, মধুসূদন মিত্র, গৌরীকান্ত মিত্র এবং কন্দর্প মিত্র জয়নগরে আসিয়া বসতি

স্থাপন করেন। বর্তমানে ইঁহাদের বংশধরগণই জয়নগরের মিত্র পরিবার নামে পরিচিত।

কুলপী রোডের পশ্চিমে 'মিত্রগঙ্গা'র তীরে মিত্র পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশটি শিবমন্দির আছে। 'মিত্রগঙ্গা' আজ একটি দীঘিরূপে মজিয়া যাওয়া আদিগঙ্গার ক্ষীণ স্মৃতি বহন করিতেছে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট অনুসারে মিত্রগঙ্গা ২'০৯ জলকর এলাকা বলিয়া নথীভুক্ত করা হইয়াছে। মিত্রগঙ্গার পশ্চিম তীরে মিত্র-দিগের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ হইতে উত্তরে বিস্তৃত প্রথম একটি সুউচ্চ দোলমঞ্চ সহ এক সারিতে পূর্বমুখী মোট দ্বাদশটি শিবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একাদশ মন্দিরটি বর্তমানে সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। দক্ষিণ হইতে ষষ্ঠ শিবমন্দিরটি ব্যতীত অন্যান্য মন্দিরগুলি আটচালা শৈলীর গড়নে নির্মিত। কেবলমাত্র ষষ্ঠ মন্দিরটি পঞ্চরত্ন মন্দির। আদিতে এই মন্দিরটিও আটচালা গঠনের ছিল, কিন্তু মন্দিরটির উপরের ছাদ জীর্ণ হইয়া পড়ায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দে শ্রীঅবিনাশ মিত্র উহা সংস্কার করাইয়া বর্তমান পঞ্চরত্ন মন্দিরে রূপান্তরিত করেন। উল্লিখিত দোলমঞ্চ ব্যতীত দ্বাদশ শিবমন্দিরের উত্তর প্রান্তে আর একটি বৃহৎ দোলমঞ্চ এবং ইহার সম্মুখে দক্ষিণমুখী একটি এবং আর একটি সারিতে পশ্চিমমুখী তিনটি শিবমন্দির আছে। এই চারটি শিবমন্দিরও আটচালা রীতিতে গঠিত। মিত্রগঙ্গার তীরবর্তী এই সকল শিবমন্দিরগুলি মিত্র পরিবারের বিভিন্ন বংশধরগণ বিভিন্ন সময়ে নির্মাণ করেন। ইহাদের মধ্যে কেবল মাত্র দুইটি শিবমন্দির গাত্রে প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকালের লিপি উৎকীর্ণ আছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দিরটি কামদেব মিত্র কর্তৃক ১৬৮৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে নির্মিত।

দ্বাদশ শিবমন্দির গাত্রে একদা হয়ত সুন্দর পোড়ামাটির শিল্পকার্য দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল এবং সম্ভবতঃ উহাদের মধ্যে নরনারীর মৈথুন দৃশ্য স্থান পাইয়াছিল। হাণ্টার সাহেব তাঁহার "Statistical Accounts of Bengal" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে জয়নগরের শিবমন্দিরগুলির গাত্রে অলঙ্কৃত এই সকল মৈথুন দৃশ্য সম্বলিত শিল্পকর্মগুলিকে সম্ভবতঃ "Indecent Sculptures" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তীকালে নৈতিক শুচিতাবোধে ঐসকল পোড়ামাটির শিল্পকর্মগুলির উপর নির্বিচারে চুন-বালি লেপন করা হইয়াছে বা দেওয়াল গাত্র হইতে খুলিয়া লওয়া হইয়াছে। তথাপি অতীতের সাক্ষীরূপে চুণ-বালির আবরণ ভেদ করিয়া আজিও মন্দির গাত্রে দুইটি মৈথুনধর্মী শিল্পকর্ম ও কয়েকটি পোড়ামাটির ফুলের কাজ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। দ্বাদশ শিবমন্দিরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত দোলমঞ্চটি গঠনে আধুনিক ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতির ছাপ পড়িলেও দোলমঞ্চটি মোটেই আধুনিক নহে; উহা উল্লিখিত শিব-মন্দিরগুলির সহিত একই সঙ্গে নির্মাণ করা হইয়াছিল। পরবর্তীকালে সংস্কারের সময় ইহার গাত্রে আধুনিকতার ছাপ পড়িয়াছে মাত্র।

মিত্রগঙ্গার তীরে পশ্চিমমুখী যে তিনটি শিবমন্দিরের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে উহা এবং মিত্রগঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ শান বাঁধান প্রশস্ত ঘাট, অর্ন্তজলী স্নানঘাট ও স্নান-ঘাটের উপরে দ্বিতল নহবতখানা মধুসূদন মিত্র মহাশয়ের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ অবিনাশ মিত্র কর্তৃক নির্মিত। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উল্লিখিত স্নানঘাট ব্যতীত মিত্রগঙ্গার চারিদিকে আরও নয়টি শান বাঁধান ঘাট আছে।

উল্লিখিত মন্দিরগুলিতে প্রতিষ্ঠিত গৌরীপট্ট জড়িত শিবলিঙ্গের নিত্য পূজা ও সন্ধ্যারতি এবং ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি ও চৈত্র মাসে গাজন উপলক্ষে সাড়ম্বরে পূজা হয়। গাজন উপলক্ষে মূল সন্ন্যাসী ব্যতীত ন্যূনপক্ষে আরও পাঁচজন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। বর্তমান মূল সন্ন্যাসী শ্রীগৌর সদার। ইনি জাতিতে কাওরা এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীদের পরিচালনা করিয়া থাকেন। সংক্রান্তির পূর্ব দিন নীলপূজা উপলক্ষে সন্ধ্যায় মন্দির প্রাঙ্গণে সন্ন্যাসীদের 'আগুন ঝাঁপ' এবং সংক্রান্তির দিন 'বঁটি ঝাঁপ' ইত্যাদি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে একটি ট্রাষ্টী কর্তৃক দ্বাদশ শিবমন্দিরে সেবা-পূজা পরিচালিত হইয়া থাকে। 'মিত্র-গঙ্গা' হইতে প্রাপ্ত মৎস্য ব্যবসায়ের আয় দ্বারা উৎসবের ব্যয় বহন করা হয়। মিত্র পরিবারের বিভিন্ন শরিকেরা বর্তমান মন্দিরগুলির সেবায়েত। জনৈক ব্রাহ্মণ নিত্য পূজাদি করিয়া থাকেন।

জয়নগর বাজারের নিকট একটি মন্দিরে জয়নগরের বিখ্যাত রাধাবল্লভজীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। সম্মুখে

দরদালান যুক্ত একটি বৃহৎ আটচালা মন্দিরের অভ্যন্তরে কাষ্ঠমঞ্চের উপর প্রায় তিন ফুট উচ্চ রাধা ও কৃষ্ণের দারুময় সুন্দর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণ মূর্তিটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, হস্তে মুরলী, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে ও বাহুতে ফুলামালা চিত্রিত। মস্তকের মধ্যস্থলে বাউলের ন্যায় স্তূপাকারে চূড়া বাঁধা। পরিপাটি করিয়া ধুতি পরিহিত এবং কাঁধের উপর দিয়া চাদর ঝুলান। বাম পার্শ্বে রাধিকা মূর্তিটি গৌরবর্ণা এবং শাড়ী পরিহিতা। মাথার উপর দিয়া প্রলম্বিত ওড়নার একাংশ শ্রীরাধিকার দক্ষিণ হস্তে ধৃত। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরাধিকার মস্তকের মধ্যস্থলে চূড়া বাঁধা। উভয় মূর্তি বিকশিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। এই যুগল রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহই রাধাবল্লভজীউ নামে খ্যাত। ইহা ভিন্ন, এই একই মঞ্চের উপর জগন্নাথ-দেবের দারুমূর্তি, একটি ছোট আকারের কৃষ্ণ ও শিবলিঙ্গ এবং কয়েকটি নারায়ণ শিলা এবং ঘরের এক পাশে আর একটি পৃথক বেদীতে ক্ষুদ্রাকৃতি মৃন্ময় গর্দভবাহিনী শীতলা মূর্তি আছে। মন্দিরাভ্যন্তরের মেঝে শ্বেত পাথর দ্বারা এবং বাইরের দরদালানের মেঝে মোজাইক করা। রাধাবল্লভ-জীউর মন্দিরটি দক্ষিণমুখী এবং ইহার সম্মুখভাগে টিনের ছাউনীযুক্ত প্রশস্ত নাটমন্দির আছে। বর্তমান মন্দিরটি দক্ষিণ বারাসতের বসু পরিবার কর্তৃক নির্মিত এবং মন্দিরের নিকটস্থ দ্বিতল সুবৃহৎ দোলমঞ্চটি মধুসূদন মিত্র ও নাট-মন্দিরটি কৃষ্ণমোহন মিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বসু মন্দিরের সম্মুখভাগ সংস্কার করান।

শোনা যায় রাধাবল্লভজীউ যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায়ের আরাধ্য বিগ্রহ। তিনি ষোড়শ শতকে মারাঠা আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত হইয়া যশোহর হইতে এই বিগ্রহ আনিয়া জয়নগরের প্রায় পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত খাড়ি গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। আবার কাহারও কাহারও মতে বহু প্রাচীনকাল হইতেই খাড়ি গ্রামে একটি মন্দিরে রাধাবল্লভজীউর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। খাড়ি জনপদটি অধপতিত হইলে তথায় রাধাবল্লভজীউর নিত্য সেবা-পূজার ত্রুটি হইতেছে এইরূপ বিবেচনা করিয়া যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য খাড়ি গ্রাম হইতে উক্ত বিগ্রহ আনিয়া জয়নগরে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক জয়নগরে মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে 'List of Ancient Monuments in the Presidency Division' নামক সরকারী নথীতে উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্তমানে রাধাবল্লভজীউর মন্দিরটি দক্ষিণ বারাসত নিবাসী চৌধুরী বংশীয়েরা প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে নির্মাণ করেন বলিয়া জানা যায়। স্থানীয় সরখেল (ব্রাহ্মণ) পরিবার বংশানুক্রমে রাধাবল্লভজীউর নিত্য পূজাদি ও সেবায়েতের কার্য পরিচালনা করিতেছেন। রাধাবল্লভজীউর সেবা-পূজাদির জন্য কেবলমাত্র মিত্র পরিবারই নহে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বহু ভূসম্পত্তি দান করেন। উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের অভাবে হস্তান্তরিত হইয়া যাওয়া মাত্র তিন বৎসর হইল রাধাবল্লভ-জীউর সেবা পরিচালনার জন্য স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া একটি ট্রাষ্টী গঠিত হইয়াছে।

প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ রাধাবল্লভজীউর মন্দিরে মহা-ধুমধামের সহিত গোষ্ঠযাত্রা উৎসব পালন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে মধ্যাহ্নে যথারীতি পূজার পর সন্ধ্যায় বাসুদেব বিগ্রহসহ রাধাবল্লভজীউর বিগ্রহ মন্দির হইতে সুসজ্জিত দোলমঞ্চে আনিয়া স্থাপন করা হয়। ইহার পর একে একে বাদ্যভাণ্ডসহ শোভাযাত্রা করিয়া দুর্গাপুর গ্রামের সরখেল পরিবারের কুলদেবতা দারুময় শ্যামসুন্দর বিগ্রহ, কেটোয়ারা বনমালীপুরের দারুময় মদনমোহন বিগ্রহ, জয়নগরে মিত্র পরিবারের কুলদেবতা গোপীনাথ বিগ্রহ, মজিলপুরের হরিদাস দত্ত মহাশয়ের গৃহের প্রস্তর নির্মিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, পোড়া পরিবারের কষ্টিপাথর নির্মিত শ্যামসুন্দর বিগ্রহ, বৃন্দাবন দত্ত পরিবারের প্রস্তর নির্মিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, জয়নগর উত্তরপাড়ার জিতেন্দ্রনাথ মিত্রদিগের প্রস্তর নির্মিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, গোপাল সরকারদিগের প্রস্তর নির্মিত বাসুদেব বিগ্রহ, মূলদিয়া ভবানীপুরের পালুইদিগের প্রস্তর নির্মিত রাধাকান্ত বিগ্রহ ও ঘোষদিগের রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ, জয়নগরের ঘোষদিগের প্রস্তর নির্মিত গোপাল বিগ্রহ দোলমঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং উল্লিখিত বিগ্রহাদি কয়েক ঘণ্টা দোলমঞ্চে স্থাপন করিয়া পূজা-আরতির পর পুনরায় শোভাযাত্রা করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে। এই উৎসব প্রত্যক্ষ করিতে অগণিত দর্শক ও ভক্তের সমাগম হইয়া থাকে।

গোষ্ঠযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর মন্দির প্রাঙ্গণে দেবোত্তর জমির উপর একটি মেলা বসে। এই মেলায়

আশপাশের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় দশ সহস্র নরনারীর সমাগম হয় এবং ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, মাটির খেলনা-পুতুল ও হাঁড়ি-কলসী, মাদুর, তালপাতার পাখা, লোহার তৈয়ারী নানাবিধ জিনিসপত্র, তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ, পাথরের দ্রব্যসামগ্রী, শাকসব্জী প্রভৃতির দোকান-পাট বসে।

গোষ্ঠ উৎসব ব্যতীত, প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে রাধাবল্লভজীউকে কেন্দ্র করিয়া সাড়ম্বরে পঞ্চমদোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চমদোল উৎসব উপলক্ষে এক প্রাচীন রীতি অনুসারে অদ্যাপি মধুসূদন মিত্রের বংশধরগণ প্রতি বৎসর রাধাবল্লভজীউর মুকুটসহ অন্যান্য সাজসজ্জা প্রেরণ এবং অভিষেক ও ভোগের যাবতীয় খরচ বহন করেন। চতুর্থী তিথিতে রাত্রিকালে চাচড় উপলক্ষে মিত্র পরিবারের লোকজন মশাল জ্বালাইয়া ধূমধামের সহিত শোভাযাত্রা করিয়া রাধাবল্লভজীউর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাদের অনুমতি লইয়া পুরোহিতগণ রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ মন্দির হইতে দোলমঞ্চে আনিয়া স্থাপন করেন। অতঃপর এই স্থানে 'মেড়াদাহ' পর্ব ও প্রচুর টাকার আতশবাজি পোড়ানর পর পূজান্তে গভীর রাত্রিকালে উক্ত বিগ্রহ মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। পরের দিন প্রাতঃকালে পুনরায় উক্ত বিগ্রহদ্বয়কে দোলমঞ্চে স্থাপন করিয়া সারাদিনব্যাপী যথারীতি দেবদোল ও ভোগ-পূজাদির অন্তে রাত্রিকালে বিগ্রহ মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। শোনা যায়, দেব মাহাত্ম্যে প্রতি বৎসর পঞ্চমদোল উপলক্ষে নিকটবর্তী একটি কদম গাছে অসময়ে অন্তত একটি কদম ফুল ফুটিতে দেখা যায়। ঐ কদম ফুল দিয়া বিগ্রহের কর্ণদ্বয় সজ্জিত করা হয়। দোল প্রত্যক্ষ করিতে নিকটবর্তী বিভিন্ন থানা ও কলিকাতা হইতে প্রায় পনর হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং নয়দিনব্যাপী গোষ্ঠ-যাত্রার অনুরূপ একটি মেলা বসে। অতিরিক্ত দোকান-পাটের মধ্যে মেলায় খৈয়ের মোয়া, ফুটকড়াই, বাদাম, চিনির মঠ প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের আমদানী হয় ও আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও সার্কাসের দল আসে।

ইহা ভিন্ন, রাধাবল্লভজীউকে কেন্দ্র করিয়া কার্তিক মাসে রাসযাত্রা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, শ্রাবণ মাসে ঝুলন এবং মাঘী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বসন্তোৎসব উপলক্ষে রাধাবল্লভজীউর বিগ্রহ দোলমঞ্চে আনিয়া স্থাপন করা হয়।

জয়নগরে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে দ্বাদশ শিবমন্দির প্রাঙ্গণে মিত্রদিগের রথ ও তেলিপাড়ায় তেলিদিগের রথ বাহির হয়। উত্তরপাড়ায় ঘোষ ও সরকারদিগের গৃহে প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণের রাসযাত্রা এবং ১লা মাঘ রাধাবল্লভ-জীউর মন্দির প্রাঙ্গণে দক্ষিণরায়-এর পূজা উপলক্ষে মেলা বসে। উত্তরপাড়ায় রাসযাত্রার মেলা তিনদিনব্যাপী স্থায়ী হয় এবং পুতুল প্রদর্শনী, বাউলগান ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়।

দ্বাদশ শিবমন্দির প্রাঙ্গণে রথযাত্রা উৎসবটি ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে আরম্ভ হয়। রথযাত্রা উপলক্ষে আষাঢ়ী শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রাধাবল্লভজীউর মন্দির হইতে জগন্নাথ-দেবের দারুময় মূর্তি রুপার সিংহাসনে স্থাপন করিয়া মিত্রদিগের গৃহে আনিয়া নয়দিনব্যাপী যথারীতি পূজা এবং রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন একটি কাঠের রথে জগন্নাথদেবের বিগ্রহ স্থাপন করিয়া রথটানা হয়। রথের মেলায় প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং ময়রা, তেলেভাজা, মাটির খেলনা-পুতুল, চারাগাছ, কাঁঠাল, আনারস প্রভৃতি ফলের কুড়ি-পচিশটি দোকানপাট বসে।

জয়নগরে অন্যান্য কয়েকটি মন্দিরের মধ্যে জয়চণ্ডী-দেবীর মন্দিরে যাইবার পথের উপরে গম্বুজ বিশিষ্ট অষ্ট কোণাকৃতি একটি নাতিবৃহৎ মন্দিরে গৌরীপট্টসহ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। রামহরি চট্টোপাধ্যায়, যিনি স্থানীয় অঞ্চলে 'হরিভাই' নামে খ্যাত, তিনি তাঁহার মাতৃস্মৃতির উদ্দেশ্যে এই শিবমন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া জানা যায়। জয়চণ্ডীতলার নিকট নবরত্ন মন্দিরটিও হরিভাই-এর প্রতিষ্ঠিত। নবরত্ন মন্দিরে রামসীতার শ্বেত প্রস্তর নির্মিত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরটি ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের নামে দানপত্র করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া, আনন্দমোহন ঘোষ মহাশয়ের বসতবাটী সংলগ্ন একটি আটচালা মন্দিরে ঘোষদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি শিবলিঙ্গ এবং শিবমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে একটি বৃহৎ দোলমঞ্চ আছে। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে ঘোষেদের কুলদেবতা গোপাল বিগ্রহকে দোলমঞ্চে স্থাপন করিয়া উৎসব পালন করা হয়। ইহার সম্মুখে 'ঘোষগঙ্গা'র তীরে

একটি সমতল ছাদ বিশিষ্ট ঘরে বিবিমার প্রতীক স্বরূপ সিন্দুররঞ্জিত দুইটি মাটির ঢিপি দেখিতে পাওয়া যায়। মাটির ঢিপি দুইটির নীচে একটি গর্ত আছে। পূজার সময় বিবিমার উদ্দেশে উক্ত ঢিপির উপর দুধ ও ডাবের জল ঢালিয়া দিলে উহা নীচের ঐ গর্তে আসিয়া সঞ্চিত হয় এবং ভক্তগণ বিবিমার চরণামৃত স্বরূপ উহা সেবন করেন। ইহা ভিন্ন, ঘরের মধ্যে ডান পা ঝুলাইয়া ও বাম পা মুড়িয়া বসা অথবা উভয় পা মুড়িয়া বসা অনেকগুলি বিবিমার শলন মূর্তি আছে। বর্তমানে জনৈকা মুসলমান বৃদ্ধা বিবিমার নিত্য পূজা করেন। প্রতি শনি-মঙ্গল বারে ভক্তের সমাগম হয় এবং পৌষ মাসে উপবাস করিয়া আশ-পাশের বিভিন্ন গ্রামের স্ত্রীলোকেরা শিরনি দিয়া বিবিমার নিকট 'মাঙ্গন পূজা' দেন। মাঙ্গন পূজার দিন ব্রতীরা ফলাহার করেন। প্রধানতঃ মারীভয়, ছোট ছেলেমেয়ের অসুখ-বিসুখ, গরু-বাছুরের রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকজনই বিবিমার নিকট মানত করিয়া থাকেন।

মতিলালপাড়ায় স্থানীয় পুষ্করিণীর ঘাটে একটি সাধারণ মন্দিরে মতিলালদিগের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তি তিথিতে গাজন ও সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই পুষ্করিণীর উত্তর-পশ্চিম কোণে টালির ছাউনীযুক্ত একটি ঘরে পঞ্চাননের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। স্থানীয় বটব্যাল পদবীধারী ব্রাহ্মণেরা পঞ্চাননের পূজা করেন। ইহা ভিন্ন, জয়নগর মিউনিসিপাল এলাকার মধ্যে আরও কয়েকটি পঞ্চানন, শীতলা, দক্ষিণরায়, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর স্থান আছে।

জয়নগরের জয়চণ্ডীর ন্যায় মজিলপুরের ধন্বন্তরী কালী বিশেষ জাগ্রত ঈশ্বরী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। রেল লাইনের নিকট সমতল ছাদ বিশিষ্ট দক্ষিণমুখী একটি সাধারণ ঘরের অভ্যন্তরে বেদীর উপর স্থাপিত কারুকার্য খচিত একটি কাষ্ঠমঞ্চে পদ্মের উপর শায়িত শবরূপী শিবের বক্ষস্থলে দেবী কালিকার দণ্ডায়মান মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। দেবী বস্ত্র পরিহিতা এবং ইহার চারি হস্তে চওড়া পেটীর ন্যায় অলঙ্কার, পদযুগলে মল এবং কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল খোদিত। ইনিই মজিলপুরের ধন্বন্তরী কালী নামে খ্যাত। সুন্দর কাষ্ঠমঞ্চটি ১৩৭১ বঙ্গাব্দে চব্বিশ-পরগণা জেলার সীতাগাছা নিবাসী সূত্রধর শিল্পী শ্রীপ্রাণবল্লভ গায়েন কর্তৃক নির্মিত। মন্দিরাভ্যন্তরের মেঝে শ্বেত প্রস্তর মণ্ডিত এবং ইহার পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে প্রকোষ্ঠে দুইটি শিবলিঙ্গ ব্যতীত পশ্চিম-দিকে একটি পৃথক মন্দিরে আর একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। কালীমন্দিরের সম্মুখভাগে টিনের চালাযুক্ত একটি প্রশস্ত নাটমন্দিরে পশ্চিমদিকে দণ্ডায়মান একটি বৃহৎ পঞ্চানন্দ মূর্তি ও বাবাঠাকুরের শলন মূর্তি আছে।

মজিলপুরে এই কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আদিগঙ্গার তীরবর্তী এই স্থানে একটি শ্মশানক্ষেত্র ছিল এবং ধন্বন্তরী মতান্তরে ভৈরবানন্দ নামে জনৈক তান্ত্রিক এই স্থানে সাধনা করিতেন। একদা তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বর্তমান মন্দিরের পশ্চিমে 'পদ্মপুকুর' নামে খ্যাত জলাশয়ের ঈশান কোণে তাঁহার ইষ্টদেবী কালী মূর্তি পান এবং এই স্থানে একটি কুটির নির্মাণ করিয়া সাধন-ভজনে লিপ্ত হন। এই সময় মজিলপুর নিবাসী রাজেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী নামে জনৈক ব্যক্তি সাধনার নিমিত্ত তাঁহার সহিত মিলিত হন। শোনা যায়, উক্ত তান্ত্রিক সাধারণের মধ্যে দৈবশক্তিসম্পন্ন বাতের ঔষধ ও মাদুলী বিতরণ করিতেন। কিন্তু সহসা তাঁহার মনে অহঙ্কার উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রদত্ত ঔষধাদি ক্রিয়াহীন হইয়া পড়ে। ইহাতে অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার ইষ্টদেবীর ভার উক্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিয়া তিনি এই স্থান ত্যাগ করেন। উক্ত সাধকের নামানুসারেই এই কালী 'ধন্বন্তরী কালী' নামে খ্যাত হন এবং এইরূপে ধন্বন্তরী কালীর সেবাপূজার ভার চক্রবর্তীদিগের হস্তে আসে। তদবধি উক্ত চক্রবর্তী পরিবারই বংশানুক্রমে সেবায়েতের কার্য করিতেছেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মজিলপুর নিবাসী স্বর্গীয় কালিদাস দত্ত ও শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় সাধক ভৈরবানন্দকেই ধন্বন্তরী কালীর প্রতিষ্ঠাতারূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুমানই সম্ভবতঃ যথার্থ। তথাপি স্থানীয় লোক কেহ কেহ উক্ত সাধকের নাম ধন্বন্তরী বলিয়া উল্লেখ করায় আমরা এইস্থানে ধন্বন্তরীর নাম লিপিবদ্ধ করিলাম।

ধন্বন্তরী কালীর নিত্য অন্নভোগ দিয়া পূজা ব্যতীত ভাদ্র মাসের তালনবমী তিথিতে, কার্তিক মাসের অমাবস্যায়,

ফলহারিণী কালীপূজা তিথিতে, মাঘ মাসে রটন্তী কালীপূজা তিথিতে এবং বৈশাখ মাসে সাড়ম্বরে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে জয়নগরের জয়চণ্ডীর ন্যায় ধন্বন্তরী কালী পনরদিনব্যাপী প্রত্যহ বেশ পরিবর্তন করেন। দেবীর নিকট ষোড়শোপচারে পূজা, অর্থ, বস্ত্র, অলঙ্কার ও পাঁঠাবলি মানত করিয়া থাকেন। মন্দিরের সেবায়েতগণ দৈবশক্তিসম্পন্ন বাতের মাদুলী দিয়া থাকেন।

এই উৎসবকালে মন্দির সম্মুখস্থ রাস্তার দুই ধারে পনরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন এবং চব্বিশ-পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে ও কলিকাতা হইতে মেলায় প্রায় বিশ হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, কাপড়চোপড়, কাঠের তৈয়ারী চেয়ার-টেবিল, প্রদীপদণ্ড প্রভৃতি নানাবিধ জিনিস, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী শিল্পসামগ্রী, মাদুর, পাখা, মাটির খেলনা-পুতুল ও হাঁড়ি-কলসী ইত্যাদির প্রায় দেড়শত দোকানপাট বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য পেশাদারী দল কর্তৃক যাত্রাভিনয় হয় এবং কোন কোন বৎসর অশ্বচক্র, নাগরদোলা, ম্যাজিক ও সার্কাসের দল আসে।

ইহা ভিন্ন, তালনবমী তিথিতে ধন্বন্তরী কালীপূজা উপলক্ষে এবং আশ্বিন মাসে মজিলপুরের বারোয়ারী দুর্গাপূজা এবং কার্তিক মাসে বারোয়ারী কালীপূজার পর পদ্মপুকুরে প্রতিমা বিসর্জন উপলক্ষে এই স্থানে অনেকগুলি দোকানপাট বসে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় মজিলপুরের সম্বিতেশ্বর শিবের গাজন, মজিলপুরের সন্নিকটবর্তী দুর্গাপুরে কার্তিক পূর্ণিমায় শ্যামসুন্দরজীউর রাস উৎসব, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব, কাটোয়ারা বনমালীপুরে মদনমোহনজীউর দোল এবং তদুপলক্ষে উল্লিখিত উৎসব প্রাঙ্গণে মেলা বসে।

মজিলপুর কোঁড়পাড়ায় একটি ঘরে কোঁড়দের শ্যামসুন্দর বিগ্রহ, কয়েলপাড়ায় পঞ্চানন, বাবাঠাকুর, শীতলা, পণ্ডিত-পাড়ায় পঞ্চানন, শীতলা, বাবাঠাকুর, বসন্তরায়, জ্বরাসুর প্রভৃতি একাধিক লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি ও স্থান আছে।

দক্ষিণ বারাসত

"বারাসতে উপনীত হইয়া সাধু হরষিত
পূজিল ঠাকুর সদানন্দে।"

কলিকাতা হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরে চব্বিশ-পরগণা জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত দক্ষিণ বারাসত একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বর্তমানে মজিয়া যাওয়া আদি-গঙ্গার তীরবর্তী এই গ্রামে পুষ্করিণী প্রভৃতি খননকালে বহু পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা হইতে ভারতে মুসলমান যুগের পূর্বেও এই গ্রামের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কবি কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে বারাসত গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে শ্রীমন্ত সওদাগর আদিগঙ্গা পথে সিংহল যাত্রাকালে এই স্থানে সুন্দরবনের দেবতা বারাঠাকুরের শত মূর্তি পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া এই গ্রামের নাম বারাসত হয়। বারাসত শিবদাস আচার্য উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রবেশ দ্বারের পাশে ইট দ্বারা বাঁধান একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। পূর্বে এই স্থানে একটি অতি প্রাচীন বট গাছের মূল কাণ্ড ছিল এবং উহার গায়ে লোহার শিকল দ্বারা নৌকা বাঁধার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত। বর্তমানে এই স্থানের কাণ্ডটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে বটে, তবে গ্রামে জীবিত বহু প্রবীণ ব্যক্তি উক্ত কাণ্ডটিকে দেখিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। বিশ্বাস এই স্থানেই শ্রীমন্ত আদি সওদাগরগণ নৌকা নোঙর করিতেন। উহার স্মৃতি স্বরূপই ঐ স্থানটিকে বাঁধান হইয়াছে এবং বৎসরে একবার এই স্থানে দক্ষিণরায়ের পূজাও হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ বারাসতের নিকটবর্তী সরিষাদহ গ্রামটি লুপ্ত স্রোতা আদিগঙ্গার পূর্ব তীরবর্তী একটি সমৃদ্ধশালী জনপদরূপে বিদ্যমান ছিল বলিয়া স্বর্গীয় কালিদাস দত্ত মহাশয় প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে সরিষাদহে বর্তমান জনবসতি গড়িয়া উঠে। তৎপূর্বে এই স্থানটি গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ হিংস্র জীব-জন্তুর আবাসস্থল ছিল।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সরিষাদহ গ্রামের ভূগর্ভ হইতে প্রায় চারফুট উচ্চ কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত একটি অতি সুন্দর বাসুদেব মূর্তি, একটি নৃসিংহ মূর্তি, প্রায় দশ ফুট দৈর্ঘ্য একটি কালো প্রস্তর স্তম্ভ, প্রাচীন পুষ্করিণীর ঘাট ইত্যাদি পুরাকৃত আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বর্তমানে দক্ষিণ বারাসত একটি শহরে পরিণত হইয়াছে। শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর রেলপথে এই গ্রামে একটি স্টেশন আছে। ইহা ভিন্ন, কলিকাতার উপকণ্ঠে গড়িয়া হইতে কুলপী রোড দিয়া মোটরবাসেও দক্ষিণ বারাসতে যাতায়াত করিতে পারা যায়। এই স্থানে থানা, ডাকঘর, উচ্চ বিদ্যালয়, বাজার ও একটি মহাবিদ্যালয় আছে। গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, মোদক, নাপিত, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কলু, কাওরা, বাগ্দী, তিওর, ডোম, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায় বসবাস করেন। স্থানীয় চৌধুরী ও বসু পরিবার গ্রামের প্রাচীন বাসিন্দারূপে পরিচিত। কালিকাপুর, বারাসত, বেলিয়াডাঙ্গা, মাসটিকারী, নরুল্লাপুর, পাথরামুই, খাকসাড়া, ভট্টাচার্যপাড়া, ছোট মাসটিকারী প্রভৃতি ১৪টি মৌজা লইয়া বর্তমান বারাসত অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠিত।

দক্ষিণ বারাসতে আদ্যমহেশ নামে একটি প্রাচীন অনাদিলিঙ্গ শিব ও উহার মন্দির এবং বিনোদিনী কালী নামে খ্যাত একটি কালী মূর্তি বিদ্যমান আছে। শিবমন্দিরটি পূর্বমুখী এবং আটচালা স্থাপত্য রীতিতে গঠিত। মন্দিরের সম্মুখস্থ বারান্দার দুই পাশে দুইটি প্রাচীন বেলগাছ দণ্ডায়মান। মন্দিরের গর্ভগৃহের মেঝে ভেদ করিয়া উত্থিত শিবলিঙ্গটির সহিত একটি পৃথক প্রস্তর নির্মিত গৌরীপট্ট সংযুক্ত। গৌরীপট্টটি বর্তমানে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় শিবলিঙ্গের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। শিবলিঙ্গটির পাশে কয়েকটি সিন্দুর রঞ্জিত গোলাকার পাথর ও একটি ত্রিশূল আছে। কয়েকটি সিঁড়ি বাহিয়া প্রায় সাত-আট ফুট মন্দির গর্ভের নীচে নামিয়া শিবলিঙ্গ দর্শন করিতে হয়। বর্ষাকালে মন্দির গর্ভে জল আসিয়া প্রবেশ করে বলিয়া শিবলিঙ্গটি জলমগ্ন অবস্থায় থাকে। এই কারণে বর্ষাকালে মূর্তি দর্শন করিতে পারা যায় না। সেই সময় উপর হইতে জলের উপর ফুল-বেলপাতা ভাসাইয়া জলমগ্ন শিবের নিত্য পূজা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, শিবমন্দিরের নিকট কুলপী রোডের পূর্ব পার্শ্বে একটি পুষ্করিণী আছে। সম্ভবতঃ বর্ষাকালে এই পুষ্করিণীর জল বৃদ্ধি পাইলে ভূনিম্ন দিয়া মন্দির গর্ভ জলে পরিপূর্ণ হয়। অবশ্য ভক্তদের বিশ্বাস এই পাতালভেদী স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ আপনা আপনি গঙ্গার জলে প্লাবিত হয়।

এই শিবলিঙ্গের আবির্ভাব সম্পর্কে বাংলাদেশের বহুল প্রচলিত কিংবদন্তী যেমন, অন্যের অলক্ষ্যে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া গাভী কর্তৃক ভূগর্ভস্থিত শিবলিঙ্গের মস্তকে দুগ্ধদান ইত্যাদি কাহিনী শোনা যায়। স্থানীয় চৌধুরী পরিবারের উর্ধতন পূর্বপুরুষ দয়াল চৌধুরী মহাশয়ের আমলে এইরূপে অনাদি লিঙ্গের আবির্ভাব হয় এবং তিনি মন্দির নির্মাণ করিয়া স্থানীয় চক্রবর্তী ব্রাহ্মণদিগকে সেবায়েত নিযুক্ত করেন বলিয়া শোনা যায়। চৌধুরীদিগের আদি নিবাস সোনারপুরের অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে। তদবধি উক্ত চক্রবর্তী পরিবার বংশানুক্রমে শিবের নিত্য পূজাদি পরিচালনা করিতেছেন। বর্তমান সেবায়েত শ্রীযামিনীকান্ত চক্রবর্তী এবং বেতনভোগী পূজারী শ্রীদুর্গা ভট্টাচার্য। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে পূজারীর কার্য করিতেছে। সেবা-পূজার জন্য শিবের বহু দেবোত্তর জমি ছিল, বর্তমানে উহার অধিকাংশ হস্তান্তর হইয়া গিয়াছে।

শিবমন্দিরটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। তবে মন্দির গাত্রে খোদিত কোন লিপি বা কোন প্রামাণ্য নথীপত্র না থাকায় মন্দির নির্মাতা বা মন্দিরের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। গ্রামবাসীগণ কেহ কেহ শ্রুতি অবলম্বন করিয়া দাবী করেন যে, মন্দিরটি ১০০১ বঙ্গাব্দে স্থাপিত। তবে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে যে এই অনাদিলিঙ্গ আবির্ভূত হইয়া খ্যাতি ও মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা কৃষ্ণরামের রচিত 'রায়মঙ্গল' কাব্যে "সদানন্দ ঠাকুর" নামে খ্যাত এই অনাদিলিঙ্গের উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায়। যেমন—

"সঘনে দামামা ধ্বনি শুনি রায় গুণমণি
বড়ুক্ষেত্র বাহিল আনন্দে।
বারাসতে উপনীত হইয়া সাধু হরষিত
পূজিল ঠাকুর সদানন্দে॥"

গত ১৪।১৫ বৎসর পূর্বে স্থানীয় অধিবাসী ডাঃ শিবদাস সরকার মহাশয় আর্যসমাজ হইতে সাহায্য লইয়া মন্দিরটির সংস্কার করান।

আত্মমহেশের নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি তিথিতে এবং ১লা বৈশাখ চড়ক উপলক্ষে সাড়ম্বরে পূজা হয়। পূর্বের তুলনায় উৎসবের আড়ম্বর বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। চড়ক উৎসব উপলক্ষে বর্তমানে মাত্র তিন-চারি শত লোকজনের সমাগম হয় এবং মন্দির প্রাঙ্গণে ময়রা, তেলেভাজা, মাটির পুতুল ইত্যাদির পনর-কুড়িটি দোকানপাট বসে ও চড়কগাছে সন্ন্যাসীরা পাক খান।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বারাসতের অন্তর্গত মাসটিকারী গ্রামে চৈত্রসংক্রান্তি তিথিতে; বারাসত বসুপরিবারদিগের শিবমন্দির তলায় ২রা বৈশাখ এবং খাকসাড়া গ্রামে ৩রা বৈশাখ চড়কপূজা ও তদুপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত তিনটি মেলাই মাত্র একদিন স্থায়ী হয়। ইহার মধ্যে মাসটিকারী গ্রামে চড়কের মেলায় প্রায় চার-পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং নানাবিধ জিনিসপত্রের প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। খাকসাড়া গ্রামে চড়কের মেলা উপলক্ষে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা হয়।

বসুবাটী সম্মুখস্থ তিনটি শিবমন্দিরই আটচালা গঠন-রীতিতে নির্মিত। মন্দিরগুলি সুগঠিত এবং তিনটি মন্দিরেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরগুলিতে নিত্য পূজা হয়। উত্তর দিকের পশ্চিমমুখী মন্দিরে এবং ইহার দক্ষিণ পার্শে প্রথম মন্দিরের গাত্র পোড়ামাটির সুন্দর ফুল ও লতাপাতা দ্বারা অলঙ্কৃত। তবে মন্দির সংস্কার কালে শিল্পকার্যগুলির উপর চুণ লেপে দেওয়া হয়েছে। একেবারে দক্ষিণদিকের তৃতীয় মন্দিরটিতে কোন পোড়ামাটির কাজ নেই। মন্দির গাত্রের সুস্পষ্ট লিপি হইতে জানা যায় যে, উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় মন্দিরদ্বয় ১২০৭ বঙ্গাব্দে এবং তৃতীয় মন্দিরটি ১২১৫ বঙ্গাব্দে নির্মিত।

ইহা ব্যতীত, বসুদিগের বাটীর অভ্যন্তরে সুবিশাল দুর্গামণ্ডপে প্রতি বৎসর শারদীয়া দুর্গাপূজা এবং কৃষ্ণমণ্ডপে বসুদিগের কুলদেবতা কষ্টিপাথর নির্মিত রাধাকান্তজীউর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বসু বাটীর বাহিরে উল্লিখিত শিব মন্দিরের নিকট দক্ষিণমুখী একটি দ্বিতল দোলমঞ্চ আছে। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল উপলক্ষে রাধাকান্তজীউর বিগ্রহ দোলমঞ্চে স্থাপন করিয়া উৎসব পালন করা হয়। উৎসবের দিন সন্ধ্যায় বাজী পোড়ান হয়।

বারাসত বাজারের মধ্যে চারিদিকে দরদালানযুক্ত সমতল ছাদবিশিষ্ট দক্ষিণমুখী একটি মন্দিরের অভ্যন্তরে বাঁধান পঞ্চমুণ্ডির বেদীর উপর সিমেণ্ট দ্বারা নির্মিত "ভূপুরযন্ত্র" মণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিত পাথরের বৃহৎ প্রস্ফুটিত পদ্মের মধ্য বিন্দুতে প্রোথিত ৭/৮ ফুট উচ্চ একটি পাথরের স্তম্ভ আছে। স্তম্ভটি সিন্দুর রঞ্জিত এবং উহার অগ্রভাগে স্বর্ণখচিত ত্রিনয়ন এবং রৌপ্যখচিত ভ্রূযুগল, জিহ্বা, নাসিকা সংযোজিত আছে। ইহাই বিনোদিনী কালী রূপে দক্ষিণা কালিকার ধ্যানে পূজা করা হয়। দেবীর শিরোপরি শোলার মুকুট, নাসিকায় স্বর্ণনোলক এবং বেদীর উপর সিন্দুর রঞ্জিত খড়্গ আছে। এই বেদীর উপর নারায়ণ শিলা, ধাতু নির্মিত রাধিকা ও কষ্টিপাথর নির্মিত কৃষ্ণ বিগ্রহ এবং দক্ষিণ পার্শে একটি ভিন্ন কাষ্ঠমঞ্চে শনিঠাকুরের মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

কিংবদন্তী আছে দেবী স্থানীয় দয়াল চৌধুরী নামক জনৈক ব্যক্তিকে একটি বাজার চালু করিয়া তন্মধ্যে দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে স্বপ্নাদেশ দেন। স্বপ্নাদেশ অনুসারে দয়াল চৌধুরী বর্তমান মন্দিরের নিকটবর্তী "কালীকুণ্ড" নামক পুষ্করিণী হইতে দেবীর মুখাকৃতি সম্বলিত পূর্ব উল্লিখিত প্রস্তর স্তম্ভটি পান। লোকমুখে শোনা যায় ইহা ১০১৩ বঙ্গাব্দের ঘটনা। চৌধুরীগণ স্থানীয় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারকে দেবীর সেবায়েত নিযুক্ত করিয়া যথারীতি পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তদবধি বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারগণই বংশানুক্রমে দেবীর সেবা-পূজার কার্য পরিচালনা করিতেছেন। বর্তমান সেবায়েত শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়; ইঁহারা বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের দৌহিত্রসূত্রে সেবায়েত নিযুক্ত হইয়াছেন।

মন্দিরের বারান্দায় ও সিঁড়ির উপর স্থাপিত লিপি হইতে জানা যায় যে, ১৩২৯ বঙ্গাব্দে জয়নগর থানার অন্তর্গত দাড়া গ্রামে বনমালী দাস নামে জনৈক ব্যক্তি দেবীর কৃপায় দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়া বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়া দেন এবং দক্ষিণ বারাসত নিবাসী রামনাথ মিস্ত্রী দ্বারা ইহা নির্মিত হয়। তৎপূর্বে খড়ের ছাউনীযুক্ত একটি মাটির ঘরে দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

নিত্য পূজা ও সন্ধ্যারতি ব্যতীত বৈশাখ মাসের শুক্ল-পক্ষে দেবীর বার্ষিক 'যাত' উৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিণী

কালীপূজা তিথিতে, আষাঢ় মাসে বিপদতারিণী কালীপূজা তিথিতে, মাঘ মাসে রটন্তী কালীপূজা তিথিতে এবং কার্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে পাঠাবলি দিয়া দেবীর বিশেষ পূজা হইয়া থাকে। বার্ষিক 'যাত' উপলক্ষে বাজার প্রাঙ্গণে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে এবং প্রায় এক হাজার নরনারী দেবী দর্শন করিতে ও পূজা দিতে মন্দিরে আসেন। বিনোদিনী কালী বিশেষ জাগ্রতা ঈশ্বরী বলিয়া বিশ্বাস। দেবীর এই স্থানে অধিষ্ঠান হেতু পূর্বে বারাসতে কোন কালীপূজা হইত না। মাত্র দুই-তিন বৎসর হইল এই স্থানে কার্তিক মাসে বারোয়ারী কালীপূজা আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিদিন বহু ভক্ত মন্দিরে পূজা দিতে আসেন এবং অনেকে মন্দিরে 'হত্যা' দিয়া দৈব ঔষধ পাইয়া থাকেন। কাকবন্ধ্যা ও মৃৎবৎস্য দোষ খণ্ডনের জন্য মন্দির হইতে দৈবশক্তি সম্পন্ন কবচ দেওয়া হয়। প্রধানতঃ শাঁখা শাড়ী, স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার, অর্থ, ষোড়শোপচারে পূজা ও পাঠাবলি মানত করা হয়। দেবীর সেবা-পূজার জন্য কিছু দেবোত্তর ভূসম্পত্তি আছে।

কালীমন্দিরের পশ্চিমে একটি মাটির মঞ্চ নির্মাণ করিয়া প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে সর্বজনীন দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা 'সাত সতীনের দোল' নামে খ্যাত। উৎসব উপলক্ষে বর্তমানে বারাসতের সর্বশ্রী অজিত চট্টোপাধ্যায়, গুরুপ্রসাদ রায়চৌধুরী, হরিদাস আচার্য, ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র চক্রবর্তী, দুর্গাদাস বসু ও সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়দিগের গৃহে পূজিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ আনিয়া এই স্থানে যথারীতি পূজা ও উৎসব পালন করা হয়। পূর্বে শ্রীক্ষেত্র নাথ চক্রবর্তী মহাশয়দিগের বাড়ী হইতে বিগ্রহ আসিত; গত কয়েক বৎসর তাঁহারা বিগ্রহ প্রেরণ বন্ধ করায় উপস্থিত সুভাষবাবুদের গৃহ হইতে বিগ্রহ আসিতেছে। সাতটি পরিবার হইতে দেব বিগ্রহ আসে বলিয়া ইহা 'সাত সতীনের দোল' নামে খ্যাত হইয়াছে। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। উৎসবের পূর্বদিন চাঁচর উপলক্ষে রাত্রি নয় ঘটিকায় মেড়া পোড়ান, আতশবাজি পোড়ান এবং একযোগে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন প্রাতঃকালে দেবদোল এবং মধ্যাহ্নে পূজা ও সর্বজনীন দোল উৎসবের পর বিগ্রহগুলি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। 'সাত সতীনের' দোল উপলক্ষে প্রায় চার-পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং উৎসব প্রাঙ্গণে নানাপ্রকার জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে।

ইহা ভিন্ন, বাজারে একটি টিনের চালাযুক্ত ইঁটের ঘরের মধ্যে বিবিমার প্রতীক স্বরূপ পাঁচটি মাটির ঢিপি এবং তৎসহ অনেকগুলি বিবিমার শলন মূর্তি আছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি বিবিমার পূজা করেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই বিবিমার নিকট পূজা দেন। পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন মাসের প্রতি শনি-মঙ্গলবার স্ত্রীলোকগণ ভিক্ষালব্ধ চাউল ও অর্থ দ্বারা বিবিমার নিকট 'মাঙ্গন' পূজা দিয়া থাকেন।

শিবদাস আচার্য বিদ্যালয়ের নিকট সম্মুখে বারান্দাযুক্ত দক্ষিণমুখী একটি পাকা ঘরের মধ্যে বেদীর উপর ডান পা মুড়িয়া এবং বাঁ পা ঝুলাইয়া উপবিষ্ট ধর্মরাজের মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিটি ঘোর শ্যাম বর্ণ, মাথা হইতে বিলম্বিত কুঞ্চিত কেশদাম, কর্ণে কুণ্ডল এবং দক্ষিণ হস্তে অস্ত্র আছে। ধর্মরাজের পায়ে জুতা এবং হাঁটু পর্যন্ত মোজা পরিহিত। ইঁহার বাম পার্শ্বে একটি যমদূত যুক্তকরে দণ্ডায়মান। স্থানীয় মাহিষ্য সম্প্রদায় ধর্মরাজের সেবায়েত এবং নিকটবর্তী শিবপুর গ্রাম নিবাসী জনৈক আচার্য ব্রাহ্মণ ধর্মরাজের পূজারী। ধর্মরাজের নিত্য পূজা হয় না, তবে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় উৎসব ও তদুপলক্ষে ময়রা, তেলেভাজা, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে। ধর্মরাজ মন্দিরের পশ্চিম-দিকে লাগোয়া দক্ষিণমুখী একটি পাকা চারচালা মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

বারাসত মাসটিকারী গ্রামে একটি অতি প্রাচীন পঞ্চাননের স্থান এবং একটি শীতলা মন্দির আছে। পূর্বে এই স্থানে পঞ্চাননের একটি মন্দির ছিল। উক্ত মন্দিরটি সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং উহাকে বেষ্টন করিয়া একটি প্রাচীন অশ্বত্থগাছ অনেকখানি স্থান জুড়িয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহা ভিন্ন, চারিদিকে কয়েকটি দীর্ঘ দেবদারু ও গাবগাছ এই স্থানটিকে কেবল ছায়া সুশীতল নহে, অন্ধকারাচ্ছন্নও করিয়া রাখিয়াছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটিকে দেখিলে মনে হয় আদিতে ইহা বেশ বড় মন্দিরই ছিল। বর্তমানে অশ্বত্থ-

গাছের নীচে ইঁট দ্বারা বাঁধান স্থানের উপর ডান পা মুড়িয়া ও বাঁ পা ঝুলাইয়া উপবিষ্ট ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত ও কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা শোভিত রক্তবর্ণ মৃন্ময় পঞ্চানন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা গ্রামের সাধারণের দেবতা। পঞ্চাননের নিত্য পূজা হয় না, গ্রামবাসীর প্রয়োজনে মাঝে মাঝে জনৈক চক্রবর্তী পদবীধারী ব্রাহ্মণ পূজা করিয়া থাকেন। ইহার পশ্চাতে স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ কর্তৃক ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত টালির চালাযুক্ত একটি পাকা ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা-র প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়া নিত্য পূজাদি হয়।

গ্রামে চারিদিকে বারান্দাসহ টালির ছাউনীযুক্ত দক্ষিণ-মুখী একটি পাকা ঘরে গর্দভবাহিনী মৃন্ময় শীতলা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্বে খড়ের চালাযুক্ত একটি মাটির ঘরে শীতলা দেবীর পূজা হইত; বর্তমান মন্দিরটি মাত্র ১৪।১৫ বৎসর পূর্বে শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নির্মিত। শীতলা দেবী প্রায় চারশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। দেবীর নিত্য পূজা এবং মাঘ মাসে উৎসব উপলক্ষে কথকতা, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি হইয়া থাকে। বর্তমান পূজারী সর্বশ্রী সত্য মুখোপাধ্যায় ও কালীধন মুখোপাধ্যায়।

বারাসত বেলিয়াডাঙ্গায় বন-জঙ্গলের মধ্যে চারিদিক খোলা একটি চালাঘরে দক্ষিণরায় বা বাবাঠাকুরের শলন মূর্তি আছে। নিত্য পূজা হয় না।

এই গ্রামে দক্ষিণমুখী টালির ছাউনীযুক্ত একটি মাটির ঘরে ডান পা মুড়িয়া এবং বাঁ পা ঝুলাইয়া উপবিষ্ট পঞ্চাননের বৃহৎ মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা সাধারণের দেবতা এবং খুবই প্রাচীন। নিত্য পূজা হয় না, বৎসরে একবার সর্বজনীন পূজা হয়।

বারাসত দাসপাড়ায় গভীর অরণ্য মধ্যে শতবর্ষা গাজীর একটি সমাধি স্থান আছে। সুউচ্চ মাটির ঢিপি দ্বারা সমাধি স্থানটি নির্মিত। সম্মুখস্থ একটি প্রাচীন তেঁতুল গাছ হইতে একটি লতা নামিয়া সমাধির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। লতাটি বর্তমানে এমন বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে যে, উহা তেঁতুল গাছেরই একটি প্রকাণ্ড শাখা বলিয়া ভ্রম হয়। সমাধি স্থানটি প্রায় সাত-আটশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। ইহার চারিদিক ঘিরিয়া প্রাচীন ইটের ভিত্ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ বহুকাল পূর্বে এইস্থানে একটি ঘর ছিল। প্রতি শনি-মঙ্গলবার পীরের স্থানে অনেকে মানত পূজা দেন এবং ১লা মাঘ উৎসব হয়। পূর্বে এই উৎসব উপলক্ষে মেলা বসিত। বর্তমান পীরের খাদেম শ্রীনফরুদ্দিন মোল্লা।

বারাসতে অবস্থিত একটি মন্দিরে জগন্নাথদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইঁহার সেবায়েত জনৈক নিঃসন্তান বিধবা মহিলা এই মন্দির ও দেব বিগ্রহকে পুরীর পাণ্ডাদিগকে দানপত্র করিয়া যান।

ইহা ভিন্ন, দক্ষিণ বারাসত অঞ্চলের অন্তর্গত বাঁশটিকরী ও পথেরহাটে মুসলমান সম্প্রদায়ের মসজিদ আছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বারাসত বাজারের সন্নিকটে পুণ্যাত্মা স্বামী অচলানন্দের সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বামী অচলানন্দ বীরাচারী সাধক ছিলেন বলিয়া জানা যায় এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি এই অঞ্চলের বহু নরনারীকে দীক্ষাদান ও ধর্মজীবনে সহায়তা করিয়া ধর্মপিপাসু ব্যক্তিদিগের নিকট চিরস্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী অদ্যাপি লোকমুখে শোনা যায়। স্বামী অচলানন্দের পূর্বাশ্রম সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শোনা যায়, তিনি চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত কামারহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার কালীঘাট হইতে রামনাথ সেন মহাশয় তাঁহাকে বারাসতে লইয়া আসেন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বর্তমানে যে-স্থানে তাঁহার সমাধি মন্দিরটি অবস্থিত তৎকালে সে-স্থানে আদিগঙ্গার তীরবর্তী একটি শ্মশানক্ষেত্র ছিল। তিনি এই শ্মশানক্ষেত্রে লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধন-ভজনে মগ্ন থাকিতেন। ইহার মধ্যে কিছুকালের জন্য তিনি ছত্রভোগে গভীর অরণ্য-বেষ্টিত ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর সাধানায় নিমগ্ন থাকিয়া প্রাচীন ত্রিপুরাসুন্দরী পীঠকে জাগ্রত ও লোকচক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কলিকাতার কালীঘাটে তিনি দেহরক্ষা করিলে পর তাঁহার অন্তিম ইচ্ছানুসারে বারাসতের শ্মশানক্ষেত্রে আনিয়া তাঁহার মরদেহ সমাধিস্থ করা হয় এবং শোভাবাজারে সুরেন্দ্র নাথ দেববাহাদুর ও রামনাথ সেন মহাশয়ের বদান্যতায় তাঁহার বর্তমান সমাধি-মন্দিরটি নির্মিত হয়। পূর্বে স্বামীজীর স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে

এই স্থানে একটি বৃ   মেলা বসিত। চব্বিশ-পরগণা গেজেটিয়ারে এই মেলার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে বহুদিন হইল এই মেলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং বর্তমানে সমাধিমন্দিরটি যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে জীর্ণদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যস্থলের প্রকোষ্ঠে শ্বেত পাথর বাঁধান প্রশস্ত সমাধি স্থানটি ধুলা-বালি ও চামচিকার বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ। সকাল-সন্ধ্যায় হয়ত কয়েকটি ধূপ-দীপ জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। ইহার পাশের প্রকোষ্ঠটিতে স্থানীয় কয়েকটি ছাত্র বাস করিতেছেন। অতীতে যে মহাত্মার পুণ্যস্মৃতির সহিত ওতপ্রোতভাবে বারাসতের কীর্তি বিজড়িত ছিল, তাঁহার সমাধিক্ষেত্রের এই দৈন্যদশা বাস্তবিকই মনকে ভারাক্রান্ত করে।

ময়দা

বহড়ু ও ময়দা দুইটি পাশাপাশি গ্রাম। পূর্ব রেলপথে বহড়ু স্টেশন হইতেই পূর্বদিকে একটি পাকা রাস্তা ধরিয়া প্রায় দুই মাইল পথ সাইকেল রিক্সায় অথবা হাঁটিয়া ময়দা গ্রামে পৌছান যায়। বহড়ুর ন্যায় ময়দাও অধুনালুপ্ত আদিগঙ্গার তীরবর্তী একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ময়দা একটি পরগণারূপে পরিচিত ছিল। বর্তমানে ময়দা গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত, নাপিত, হাড়ী, বাগ্দী, তেওর, ধোপা, জেলে ও মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন পরিবারের বসবাস থাকিলেও ইহা ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রধান গ্রামই বলা যাইতে পারে। এক্ষণে বহড়ু গ্রামে বসবাসকারী দেওয়ান নন্দকুমার বসুদিগের পূর্বপুরুষগণ একদা ময়দা গ্রামে বসবাস করিতেন।

ময়দার কালী জাগ্রত ঈশ্বরী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। দেবীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে গ্রামে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। দক্ষিণমুখী আটচালা গঠনের মধ্যমাকৃতি একটি মন্দিরের অভ্যন্তরে চতুষ্কোণ বাঁধান একটি বেদীর উপর দেবীর প্রতীকস্বরূপ সম্পূর্ণ সিন্দুরলিপ্ত একটি শিলাকে দক্ষিণা কালিকার ধ্যানে পূজা করা হয়। এই শিলারূপী কালিকা স্বয়ম্ভু বলিয়া কথিত। মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির, যূপকাষ্ঠ, পূর্বদিকে ভোগরন্ধন ঘর এবং পশ্চিমদিকে 'কালীকুণ্ড' নামে একটি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। বলা হয় 'কালীকুণ্ড' মজা আদিগঙ্গার অংশ বিশেষ। প্রশস্ত প্রাঙ্গণসহ মন্দিরের চারিদিক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। দক্ষিণদিকে একটি ফটক পার হইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হয়।

ময়দার কালী কত কালের প্রাচীন তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। জনশ্রুতি, যে-কালে অধুনালুপ্ত আদিগঙ্গা দিয়া বড় বড় জাহাজ চলাচল করিত সেইকালে কালীঘাটের কালীর ন্যায়ই ময়দার কালী স্ব-মহিমায় গঙ্গার তীরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গ্রামবাসীরা বলেন কালীমন্দিরের দরজাটি ময়দা গ্রামে একটি পুষ্করিণী খননকালে প্রাপ্ত জাহাজের ভগ্নাবশেষের কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত। ইহা অস্বাভাবিক নহে। কালীমন্দিরটি অবশ্য সুপ্রাচীন নহে। শোনা যায়, বর্তমান কালীমন্দির বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের দ্বারা নির্মিত। জনশ্রুতি অনুসারে বলা হয় ১১৭৬ বঙ্গাব্দে গঙ্গাধর চৌধুরী এই মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দির গাত্রে একটি প্রতিষ্ঠা ফলক ছিল; স্পষ্টতই দেখা যায় যে, উহা কেহ মন্দির গাত্র হইতে খুলিয়া লইয়াছেন। সাবর্ণ চৌধুরীরা দেবীর নিত্য সেবা-পূজার জন্য বহু ভূসম্পত্তি দান করেন এবং অদ্যাপি জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায়, শারদীয়া নবমী তিথিতে এবং কার্তিক মাসের অমাবস্যায় দেবীর উৎসব উপলক্ষে উক্ত চৌধুরীদিগের নামে সংকল্প করিয়া দেবীর নিকট জোড়া পাঠাবলি দেওয়া হয়। উল্লিখিত উৎসব ব্যতীত ১লা বৈশাখ গোষ্ঠ উৎসব, আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী, ভাদ্র মাসে তালনবমী ও ১লা মাঘ তারিখে সাড়ম্বরে মন্দিরে উৎসবাদি হইয়া থাকে। ১লা মাঘ উৎসব উপলক্ষে বহড়ু, জয়নগর, মজিলপুর প্রভৃতি আশপাশের অঞ্চল হইতে প্রায় পনর হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং মন্দির প্রাঙ্গণে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। ইহাতে নানাবিধ জিনিসপত্রের প্রায় দেড়শত দোকানপাট আসে। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে ময়দা ও পার্শ্ববর্তী বহড়ু গ্রামের অধিবাসীরা মিলিতভাবে দেবীর নিকট অন্নভোগ মহোৎসবের আয়োজন করেন। প্রতিদিন মন্দিরে যথারীতি পূজা ও সন্ধ্যারতি

হয়। তবে প্রতি শনি-মঙ্গলবার মানসিককারী ভক্তদিগের অধিক সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ মৃত বৎসা দোষ খণ্ডনের জন্য বহু স্ত্রীলোক কালীকুণ্ডে স্নান করিয়া দেবীর নিকট পূজা মানসিক করেন। সাধারণতঃ ষোড়শোপচারে পূজা, অর্থ, বস্ত্র, শাঁখা, অলঙ্কার, ছাগবলি প্রভৃতি মানত জানান হয়। স্থানীয় বন্দ্যোপাধ্যায়গণ পুরুষানুক্রমে দেবীর সেবা-পূজার কার্য করিতেছেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 'দেবী যন্ত্র' বর্তমানে শ্রীজানকী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত আছে এবং প্রতিদিন তাঁহাদের গৃহেই পৃথকভাবে যথারীতি 'দেবী যন্ত্রে'র পূজা ও অন্নভোগ নিবেদন করা হয়।

ময়দা গ্রামে উল্লিখিত কালী ব্যতীত শীতলা, মনসা, বাবাঠাকুর ও ধর্মরাজ ইত্যাদি লৌকিক দেবদেবী আছেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মরাজের পূজারী অব্রাহ্মণ। শীতলা, মনসা ও বাবা-ঠাকুরের পূজা করেন স্থানীয় চক্রবর্তী ব্রাহ্মণেরা। ইহা ছাড়া, গ্রামে প্রতি বৎসর বারোয়ারী দুইটি শারদীয়া দুর্গাপূজা, দুইটি সরস্বতীপূজা ও লক্ষ্মীপূজা হয়।

উৎসব

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

ঢোষা গ্রামে প্রতি বৎসর ২৮শে চৈত্র হইতে ১লা বৈশাখ পর্যন্ত চারিদিনব্যাপী সাড়ম্বরে সবর্জনীন শিবের গাজন বা 'দেল উৎসব' অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

উৎসব উপলক্ষে ২৮শে চৈত্র তারিখে গ্রামে পাশাপাশি দুইটি প্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে অবস্থিত পঞ্চানন্দতলার নিকট নারিকেল পাতা দিয়া একটি অস্থায়ী পূজামণ্ডপ নির্মাণ করা হয় এবং উক্ত পূজামণ্ডপের মধ্যে একটি মাটির বেদীর উপর একটি কলাগাছকে দুই খণ্ড করিয়া পুঁতিয়া উহার এক খণ্ডের উপর মাটির নূতন মালসায় দুগ্ধমিশ্রিত গঙ্গাজলের মধ্যে শিবের প্রতীকস্বরূপ একটি গোলাকার শিলা রাখিয়া চারদিনব্যাপী শিবপূজা করা হয় এবং অপর খণ্ডটির উপর একটি প্রদীপ রাখা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য শিবের প্রতীকস্বরূপ শিলাখণ্ডটিকে একটি কলসের মধ্যে রাখিয়া সারা বৎসর পুষ্করিণীর জলে ডুবাইয়া রাখা হয়। কেবলমাত্র উৎসবের চারদিন শিলাখণ্ডটি জল হইতে তুলিয়া যথারীতি পূজাদি করা হয়। উৎসবের প্রথম দিন গ্রামের অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষ গলায় উত্তরীয় ধারণ করিয়া শিবের নামে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন এবং উৎসবের কয়দিন সংযম পালন ও দিনান্তে একবার মাত্র হবিষান্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে মধ্যাহ্নে শিবপূজার পর 'ঝাঁপ' পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় দিন নীলপর্ব উপলক্ষে যথারীতি শিবপূজা এবং সন্ধ্যায় গ্রামবাসীরা শিবের ঘরে প্রদীপ দিয়া থাকেন। এইদিন রাত্রে সন্ন্যাসীরা কেবলমাত্র ফলাহার করেন। এই দিনকে 'নীল গোষ্ঠ' বলা হয়।

সংক্রান্তির দিন মধ্যাহ্নে যথারীতি শিবপূজার পর 'আগুন সন্ন্যাস' বা 'ঝাঁপ' পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে ঝাঁপের উদ্দেশ্যে যে মেরা (বাঁশের মাচা) বাঁধা হয়, তাহার নীচে কুল কাঠের আগুন তৈয়ারী করিয়া মেরার উপর হইতে গাজন সন্ন্যাসীরা আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়েন। 'আগুন সন্ন্যাস' বা ঝাঁপের পর গাজনের সন্ন্যাসীরা নিকটস্থ একটি পুষ্করিণীতে গিয়া গলার উত্তরীয় পরিত্যাগ করিয়া ঐগুলি পুকুরের পাঁকের মধ্যে পুঁতিয়া রাখেন। বিকালে প্রতিযোগিতামূলক লাঠি-খেলা ও অন্যান্য নানারূপ খেলাধূলা এবং নাচ-গানের পর উৎসবের সমাপ্তি হয়। উৎসবের কয়দিন সন্ন্যাসীরা গ্রামে গৃহস্থদের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া আবির খেলিয়া থাকেন এবং নানারূপ আমোদপ্রমোদ করেন। এইরূপ আবির খেলাকালে গৃহস্থরা প্রত্যেকেই গাজন সন্ন্যাসীদের সামান্য অর্থ বকশিস দেন।

১লা বৈশাখ অর্থাৎ নববর্ষের দিন ভোরে গ্রামে চাষের জমিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয় এবং এইদিন গৃহপালিত গরু-বাছুরকে স্নান করাইয়া গৃহস্থরা সকলে নিমপাতা ও হলুদবাটা গায়ে মাখিয়া নিজেরাও স্নান

করেন এবং স্নানের পর সকলে পুরীর জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

শিবের নিকট প্রধানতঃ ফলমূল ও মিষ্টান্ন দিয়া পূজা দেওয়া হয় এবং অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শিবের নামে সন্ন্যাস গ্রহণ ও দণ্ডী খাটিয়া থাকেন। শিবের পূজারী কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পদবী আচার্য।

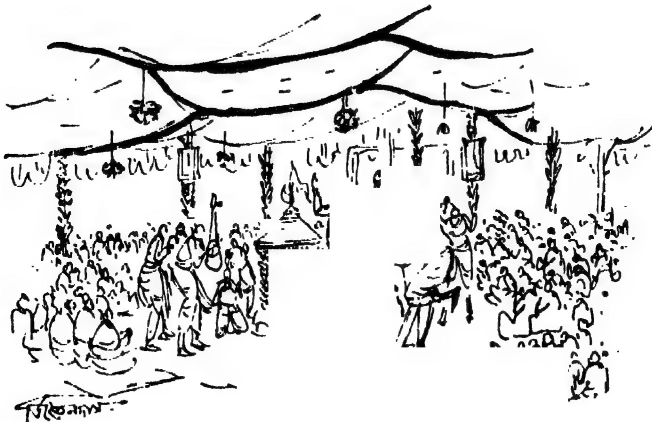
মেলা বিবরণী

গোষ্ঠযাত্রার মেলা

গোবিন্দপুর গ্রামে প্রতি বৎসর গোষ্ঠযাত্রা উপলক্ষে ১লা বৈশাখ হইতে দুই-তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং প্রতিদিন বিকালের দিকেই মেলায় বেচাকেনা ও লোকসমাগম হয়। আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় দুই-তিন সহস্র নরনারী আসেন।

মেলায় প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা সকলেই স্থানীয়। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত, মনিহারী দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, শিল্পসামগ্রী ও কারুশিল্পের দোকান এবং বই-ছবির দোকান বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য জলসা ও যাত্রাভিনয় হয় এবং অনেকে লটারী খেলিয়া থাকেন।



থানা ঃ কুলতলী

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ নলগোড়া। ১৪৫।২,৪৩৯'২৫।৭৮৪।৪,৩৯৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কেওরা, বাগদী, মুচি, দলুই ও মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর রেলপথে মথুরাপুর রোড স্টেশন হইতে মোটরবাসে রায়দীঘি পৌছাইয়া সেখান হইতে নৌকাযোগে অথবা হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় রাস উৎসব, ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দ্দশী, চৈত্র মাসে অন্নপূর্ণাপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক ও পরের দিন গোষ্ঠ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শিবচতুর্দ্দশী ও চড়ক উৎসব সর্বজনীন এবং অন্নপূর্ণা-পূজা ও রাস উৎসব ব্যক্তিবিশেষের। শিবচতুর্দ্দশী ও চড়ক উৎসব বিশ বৎসরের প্রাচীন। রাস উৎসব এবং অন্নপূর্ণা-পূজাটি যথাক্রমে মাত্র আট ও চার বৎসর হইল শুরু হইয়াছে।

(ঙ) চড়কের মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে। মেলাটি বিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিবমন্দির ও কালীমন্দির আছে। দুইটি পঞ্চানন্দ, দুইটি আটেশ্বর, দুইটি নারায়ণী, দুইটি মনসা ও একটি শীতলার স্থান আছে। ইহা ব্যতীত, মনি নদীর তীরে সাংখ্যাচার্য শ্রীমৎ কপিলানন্দ স্বামীর প্রতিষ্ঠিত 'কপিল কুটীর সাংখ্যযোগাশ্রম' আছে। আশ্রম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রতি বৎসর ৭ই বৈশাখ যজ্ঞোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সুন্দরবন লাট অঞ্চলের মধ্যে নলগোড়া একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ইহার পশ্চিম সীমান্ত দিয়া মনি নদী প্রবাহিত। এই গ্রামের মৃত্তিকাদি খননকালে প্রাচীন কীর্তিকলাপের নিদর্শন স্বরূপ চতুর্ভুজ নারায়ণের শিলা বিগ্রহ, শিলালিপি, তোরণ-শিলা এবং একটি মঠবাড়ীর ধ্বংসস্তূপ হইতে তাম্র তৈজস, ধূপাধার, প্রদীপ ও মৃৎপাত্রে কিঞ্চিৎ আতপ তণ্ডুল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, বন-জঙ্গল পরিষ্কারকালে ইষ্টক নির্মিত ভগ্নদশাপ্রাপ্ত নারায়ণীর স্থান পাওয়া গিয়াছে। গ্রামে একটি প্রাচীন দীঘি ছিল, বর্তমানে উহা মজিয়া গিয়াছে। উল্লিখিত প্রাচীন নিদর্শনাদি দৃষ্টে অনুমান করা হয় যে, অতীতে এই অঞ্চল যশোহর রাজ প্রতাপাদিত্যের রাজ্য সীমানার অন্তর্গত একটি জনপদ ছিল। গ্রামে সত্যেশ্বর শিবলিঙ্গ ও ব্যাঘ্রবাহিনী নারায়ণী মূর্তি আছে।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মণ্ডল, শিক্ষক,
নলগোড়া বৈকুণ্ঠধাম বিদ্যামন্দির,
পোঃ সোনাটিক্রি, ২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ সোনাটিক্রি।
১৪৬।৩,৮১৯'০৫।৮৯৭।৫,১৩৫

(ক) হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও আদিবাসী।

কুলতলী থানার লাট অঞ্চলে সোনাটিক্রি একটি বৃহৎ গ্রাম এবং ইহা কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। নিম্নে উহার অন্তর্গত কয়েকটি খণ্ডের পূজা-পার্বণের বিষয় লেখা হইল।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মথুরাপুর রোড হইতে রায়দীঘিগামী মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) সোনাটিক্রি (৬নং) গ্রামের শ্মশানঘাটে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তিতে গঙ্গাপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে গাজন ও পরের দিন গোষ্ঠ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

সোনাটিক্রি (৮নং) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি ও চৈত্রসংক্রান্তিতে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি শিবমন্দির এবং শিবপূজার জন্য প্রায় চৌদ্দ বিঘা দেবোত্তর জমি আছে। উৎসবগুলি প্রাচীন।

সোনাটিক্রি (৯নং) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে রাধাকৃষ্ণের দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন।

সোনাটিক্রি (১২নং) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবের গাজন ও পরের দিন গোষ্ঠ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি মাত্র সাত-আট বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত ৬, ৮ ও ১২ নং সোনাটিক্রি গ্রামে প্রতি বৎসর ২৫শে ডিসেম্বর স্থানীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় বড়দিন উৎসব পালন করেন। ঐদিন গির্জাঘরের সম্মুখে কয়েকটি খাবারের ও মনিহারীর দোকান বসে।

(ঙ) সোনাটিক্রি (৬নং) গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তিতে গঙ্গাপূজার মেলা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে গাজন ও গোষ্ঠ উপলক্ষে মেলা বসে। মেলা দুইটিই প্রাচীন।

সোনাটিক্রি (৮নং) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তিতে গাজন উপলক্ষে মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

সোনাটিক্রি (৯নং) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের দোল উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন এবং আট-দশদিন স্থায়ী হয়।

সোনাটিক্রি (১২নং) গ্রামে প্রতি বৎসর গাজন উপলক্ষে চৈত্রসংক্রান্তি হইতে আট-দশদিনব্যাপী মেলা হয়। মেলাটি মাত্র সাত-আট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ও খৃষ্টানদিগের গীর্জাঘর আছে।

শ্রীশেখরাজ গায়েন, চাকুরী,
গ্রাম ও পোঃ সোনাটিকি, ২৪-পরগণা।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

নলগোড়া গ্রামে প্রতি বৎসর একযোগে চৈত্র-সংক্রান্তিতে চড়ক ও পরের দিবস গোষ্ঠযাত্রা উপলক্ষে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ২০ বৎসরের প্রাচীন। আশপাশের প্রায় দুই-তিন ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় লোকজন আসেন।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশখানি দোকানপাট বসে এবং দুই-চারি জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা সকলেই স্থানীয়। সমস্ত দোকানপাটের মধ্যে খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত, মনিহারী দোকান, কাপড়-চোপড়ের দোকান, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও পুতুলের দোকান এবং কয়েকটি বই-ছবির দোকান বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচ, কবিগান ও যাত্রাভিনয় হয়। শহর অঞ্চল হইতে যাত্রার দল আসে। আমোদ-প্রমোদে সহস্রাধিক শ্রোতা ও দর্শকের সমাবেশ হয়।

সোনাটিক্রি (১২নং) গ্রামে প্রতি বৎসর শিবের গাজন উপলক্ষে চৈত্রসংক্রান্তি হইতে আট-দশদিনব্যাপী ব্যক্তি-বিশেষের জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র সাত-আট বৎসর হয় শুরু হইয়াছে।

নিকটবর্তী পূর্ব ও পশ্চিম জটা, গোপালগঞ্জ, বাইশাহাট, গুড়গুড়িয়া প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে নৌকাযোগে ও হাঁটিয়া মেলায় মোট প্রায় দশ-বার সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় সর্বপ্রকারের দেড়শত হইতে দুইশত দোকান-পাট বসে এবং কুড়ি-পচিশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয় বিভিন্ন গ্রাম হইতে এবং মথুরাপুর ও জয়নগর থানা হইতে প্রতি বৎসর মেলায় আসিয়া থাকেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি বিভিন্ন খাবারের দোকান ও পচিশ-ত্রিশটি মনিহারী দোকান বসে।

দোলযাত্রার মেলা

সোনাটিক্রি (৯নং) গ্রামে প্রতি বৎসর রাধাকৃষ্ণের দোল উৎসব উপলক্ষে ফাল্গুন পূর্ণিমা হইতে আট-দশদিন-ব্যাপী দেবোত্তর প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাঁচ সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় সত্তর-পঁচাত্তরটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে বিভিন্ন খাবারের দোকান ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত, মুদি দোকান, কারুশিল্পের দোকান ও অন্যান্য দোকানপাট বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচ, তরজাগান, কবিগান ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ ক্যানিং (মৌজা ঃ মাতলা)। ৭৫।২৫২০'৯০। (শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, মুচি, নমঃশূদ্র, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) পূর্ব রেলপথে শিয়ালদহ হইতে ক্যানিং পর্যন্ত একটি রেলপথ আছে। সম্প্রতি ক্যানিং-বারুইপুর রোড নির্মিত হওয়ায় কলিকাতা হইতে মোটরবাসে ক্যানিং-এ যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ক্যানিং শহরটি মাতলা নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় নৌকায় যাতায়াত এবং বিশেষ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের খুবই সুবিধা আছে।

(ঘ) ক্যানিং শহরে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা এবং ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সপ্তাহব্যাপী ব্রহ্মাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ষাট-সত্তর বৎসর আগে কোন এক সময় ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে ক্যানিং বাজারটি বিশেষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উহার পর বাজারের ব্যবসায়ী সমিতি কর্তৃক সাড়ম্বরে ব্রহ্মাপূজার প্রচলন করেন। উৎসবটি বর্তমানে প্রায় সমস্ত সুন্দরবন অঞ্চলের সর্বজনীন উৎসবরূপে পরিগণিত। সুন্দরবন অঞ্চলের বহু নরনারী উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। উৎসব কালে একদিন দরিদ্র ভোজন এবং কবিগান, ভাঁড়নাচ, সাইকেলরেস ও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। দুর্গাপূজাটি ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

ইহা ভিন্ন, বৎসরের বিভিন্ন সময়ে এই শহরে কালী, সরস্বতী, কার্তিক, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে।

(ঙ) ব্রহ্মাপূজার মেলা। প্রতি বৎসর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সাতদিন হইতে বারদিনব্যাপী মেলা চলে। মেলাটি পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ক্যানিং শহরে একটি চালাঘরে বনবিবির নির্দিষ্ট স্থান আছে। এই স্থানে নিয়মিত বনবিবির পূজাদি হয়।

শ্রীসত্যনারায়ণ ব্রহ্ম, ব্যবসায়,
ক্যানিং টাউন, ২৪-পরগণা।

ক্যানিং শহর—কলিকাতা হইতে ২৮ মাইল দূরে মাতলা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার উত্তরে বিদ্যাধরী প্রবাহিত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লর্ড ক্যানিং-এর সময়ে ভাগীরথী নদীতে বালি পড়ায় যখন কলিকাতা বন্দরের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নানা আশঙ্কা হইতেছিল, সেই সময়ই ক্যানিং টাউন বা পোর্ট ক্যানিং-এর সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য ভাগীরথীর বিশেষ কোন পরিবর্তন সূচিত না হওয়ায় কলিকাতা হইতে বন্দর স্থানান্তরিত করিতে হয় নাই; ফলে ক্যানিং শহরেরও তেমন কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। ক্যানিং হইতে মোটরলঞ্চে সুন্দরবনের বিভিন্ন লাট অঞ্চলে যাতায়াত করা হয়।

বর্তমানে ইহা একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। সুন্দরবন অঞ্চলের বহু পণ্যদ্রব্য এই স্থান দিয়াই প্রত্যহ যাতায়াত করে। ক্যানিং হইতে প্রচুর পরিমাণে ধান, চাউল, গরাণকাঠ, গোলপাতা, মাছ, রবিশস্য প্রভৃতি আমদানি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ক্যানিং-এর অপর পার হইতেই সুন্দরবন এলাকার আরম্ভ। এই শহরের অবস্থান অতি সুন্দর, নদীর জলোচ্ছ্বাস হইতে শহর রক্ষা করিবার জন্য নদীর তীর দিয়া একটি দীর্ঘ বাঁধ আছে। এই বাঁধের উপর হইতে নদীর দৃশ্য সত্যই মনোরম।

২। গ্রাম ঃ তালদি।৭৮।৮৫৮'৩৩।৫৩৯।২,৬৫৫

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে ঘোষপাড়া, দাস-পাড়া, বামুনপাড়া, সর্দারপাড়া, হালদারপাড়া, মণ্ডলপাড়া, বণিকপাড়া, প্রামাণিকপাড়া, কুমোরপাড়া, নাইয়াপাড়া, মাঁকুইপাড়া, বাগ্দীপাড়া, কাওরাপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে অনেকগুলি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) এই গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। নিকটবর্তী বিদ্যাধরী নদী দিয়া নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে গোষ্ঠ উৎসব, আশ্বিন মাসে দুইটি দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে কালীপূজা ও মহোৎসব এবং চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

দুর্গাপূজা দুইটি এবং গোষ্ঠ উৎসবটি ব্যক্তিবিশেষের। উৎসবগুলি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। ফাল্গুন মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

গোষ্ঠ উৎসবের মেলা। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন। গোষ্ঠ মেলাটি গ্রামের মধ্যস্থিত জেলা বোর্ডের একটি পুকুর পাড়ে বসে।

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি ঘরে কালী ব্যতীত বনবিবি, পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, শীতলা ও মনসা আছে।

শ্রীকান্ত চন্দ্র হালদার, শিক্ষক,
তালদি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ তালদি, ২৪-পরগণা।

৩। গ্রাম ঃ ডেভিস আবাদ।
৯৪।৮৫৭৯৪।৪৬১।২,৪৬১

(ক) পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নাপিত, রাজবংশী (তিয়র) ও মুসলমান। গ্রামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন তালদি হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে বৈশাখ মাসে গোষ্ঠ উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে রাধাকৃষ্ণের দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দোল উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। বর্তমান সেবায়েত কামিনী দাসী। সরস্বতীপূজাটি পনর বৎসরের প্রাচীন। অন্যান্য পূজাগুলি বহুকাল যাবৎ হইতেছে। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমার দিন মাত্র এক বেলার জন্য মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের তিয়রপাড়ায় সাধারণের একটি কালীঠাকুরের স্থান আছে। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে এই স্থানে পূজা হয়। পূজার সময় অনেকে কালীর নিকট ধূনা পোড়াইয়া, দণ্ডী খাটিয়া অথবা পাঁঠাবলি দিয়া মানত পূজা দিয়া থাকেন। গ্রামে কলেরা বা বসন্ত রোগ দেখা দিলে কালীর স্থানে পূজা দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত, গ্রামে পাঁচটি শিব, চারটি পঞ্চানন, ছয়টি বাবাঠাকুর, চারটি শীতলা ও পাঁচটি মনসার স্থান আছে।

কথিত আছে, ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে ডেভিড সাহেব নামক জনৈক ব্যক্তি এই স্থানে জঙ্গল কাটিয়া প্রথম গ্রাম পত্তন করেন। ডেভিড সাহেবের নামানুসারেই গ্রামের নাম ডেভিস আবাদ হয়।

শ্রীঅভয় চরণ নস্কর, শিক্ষক,
ডেভিস আবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ঠাকুরাণীবেড়িয়া, ২৪-পরগণা।

৪। গ্রাম ঃ রায়বাঘিনী (মৌজা ঃ কুমারসা চক)।
১২০।৮৫২৮০।৩২।১,৮১২

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ক্যানিং হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। বর্ষাকালে কিছুটা পথ নৌকায় চলাচল সম্ভব।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ভাদ্রসংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মাপূজা ও অরন্ধন, কার্তিক মাসে কালীপূজা, পৌষসংক্রান্তিতে বনবিবিপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উপলক্ষে শিবপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে দেল বা চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চড়ক উৎসবটি চৈত্রসংক্রান্তির এক সপ্তাহ পূর্ব হইতে আরম্ভ হয়। চড়ক বা দেল উৎসব উপলক্ষে লাঠিখেলা, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা ও হাস্য-কৌতুকমূলক প্রদর্শনী হয় এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়। ১লা ও ২রা বৈশাখ গোষ্ঠ উৎসব অনুষ্ঠিত হইবার পর চড়ক উৎসবের সমাপ্তি হয়। চড়ক ও গোষ্ঠ উৎসবটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন এবং বনবিবিরপূজা গ্রাম পত্তনের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে।

(ঙ) চড়কের মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তি হইতে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল ও খড়ের সাধারণ ছাউনীযুক্ত একটি মন্দিরে কালী, বিশালাক্ষী, শীতলা ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত, গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ ও পাঁচটি মনসা আছে।

শ্রীসুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
রায়বাঘিনী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
পোঃ ক্যানিং, ২৪-পরগণা।

৫। গ্রাম : ঘুটিয়ারী শরীফ (মৌজা : বাঁশড়া)।
১৮১।১৭৭৮'০৭।১,২১২।৬,১৯২

(ক) মুসলমান। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) পূর্ব রেলপথে শিয়ালদহ-ক্যানিং শাখায় এই গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের অম্বুবাচী তিথি হইতে সপ্তাহব্যাপী বড় খাঁ গাজী বা পীর মোবারক গাজীর আবির্ভাব এবং ১৭ই শ্রাবণ তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) পীর মোবারক গাজীর আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে মেলা। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে সপ্তাহব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এবং ইহা বাংলাদেশে ঘুটিয়া শরীফের মেলা নামে প্রসিদ্ধ।

পীর মোবারক গাজীর তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে মেলা। প্রতি বৎসর ১৭ই শ্রাবণ মেলা হয়। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং এই মেলা 'চন্দন মেলা' নামে খ্যাত।

(চ) গ্রামে পীর মোবারক গাজীর দরগাহ ও একটি মসজিদ আছে।

শ্রীললিত কুমার সিংহ, ব্যবসায়,
গ্রাম : কুমারসা চক, পোঃ টাংরাখালি,
২৪-পরগণা।

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব (গাজী মোবারক আলী)

প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের অম্বুবাচী তিথি হইতে ঘুটিয়ারী শরীফ গ্রামে চব্বিশ-পরগণা জেলার প্রখ্যাত পীর মোবারক গাজীর দরগাহে সপ্তাহব্যাপী সাড়ম্বরে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

পীর মোবারক গাজীর অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে নানা কিংবদন্তী এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। প্রাচীন 'রায়মঙ্গল কাব্যে' মুনশী বয়নদ্দিনের 'বনবিবির জহুরুনামা' পুঁথিতে এবং ও'ম্যালির ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বিখ্যাত ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের সহিত গাজী সাহেবের বিরোধ, যুদ্ধ এবং অবশেষে বনবিবির মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের বিচিত্র কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। চব্বিশ-পরগণা জেলার দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি হিন্দু-মুসলমানই গাজী সাহেবের নামে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন।

অম্বুবাচির প্রায় পক্ষকাল পূর্ব হইতে উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়। চব্বিশ-পরগণা জেলার বিভিন্ন থানা হইতে এবং কলিকাতা, মেদিনীপুর ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য নিয়মিত ট্রেন ব্যতীত এই সময় পূর্ব রেলপথের কর্তৃপক্ষ কয়েকটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

উৎসবকালে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পীরের দরগাহে ছোট ছোট মাটির সরায় চিনি-বাতাসা ও শিরনি দিয়া পূজা দিয়া থাকেন। মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক খাদেম পূজার ডালাগুলি পীরের নিকট নিবেদন করেন। মানসিকস্বরূপ ভক্তরা অনেকে পীরের দরগাহে খাসী ও মুরগী জবাই দেন। প্রধানতঃ ব্যাঘ্রভীতি নিবারণ ও রোগ-ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভের জন্য পীরের নিকট মানসিক করিয়া থাকেন।

আষাঢ় মাসে উৎসব ব্যতীত, প্রতি বৎসর ১৭ই শ্রাবণ তারিখে এই স্থানে ধূমধামের সহিত পীরের তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন পল্লীতে মোবারক গাজীর বেদী প্রতিষ্ঠিত আছে। এই অঞ্চলের কাঠুরিয়ারা গাজীর বেদীতে প্রার্থনা না জানাইয়া সুন্দরবনে কাঠ কাটিতে যায় না। গাজীর বংশধর বা সাকরেদ পরিচয় দিয়া একদল ফকির কাঠুরিয়াদের ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পূজাদি করিয়া থাকেন। প্রচলিত প্রথা এই যে, কাঠুরিয়ারা যে অঞ্চলে কাঠ কাটিবে বলিয়া স্থির করেন ফকিরদের কেহ তাঁহাদের সঙ্গে যাইয়া সেই স্থানে কিছু জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া মন্ত্র পড়িয়া একটি গণ্ডী কাটিয়া দেন। সেই গণ্ডীর মধ্যে লতাপাতা দিয়া ছোট ছোট

সাতটি কুটীর নির্মাণ করা হয়। উহার দক্ষিণদিক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমটিতে জগবন্ধু (Friend of the world), দ্বিতীয়টিতে প্রলয় দেবতারূপে মহাদেব এবং তৃতীয়টিতে সর্পদেবতা মনসাদেবীর নামে উৎসর্গ করা হয়। মনসাদেবীর কুটিরের পাশে রূপপরীর সম্মানার্থে একটি ছোট বেদী নির্মাণ করা হয়। রূপপরী জঙ্গলের অদৃশ্য আত্মা বলিয়া বিশ্বাস। পরের কুটিরটির মধ্যে দুইটি কোঠা থাকে, উহার একটিতে কালী এবং অপরটিতে কালীমাতার কন্যা কালিমায়া অধিষ্ঠান করেন। ইহার পাশে ওরপরীর জন্য একটি ছোট বেদী থাকে। ইহার পরের কুটিরটিও দুই ভাগে বিভক্ত—একটি দেবী কামেশ্বরীর অন্যটি বুড়িঠাকুরানীর। বুড়িঠাকুরানীর গৃহের পাশে কাণ্ডে সিন্দুরলিপ্ত একটি বৃক্ষ থাকে—উহা রক্ষাচণ্ডীর স্থান। অবশিষ্ট দুইটি কুটিরের একটিতে গাজী পীর ও তাঁহার ভ্রাতা কালু পীরের এবং অন্যটিতে গাজী পীরের পুত্র ছাওয়াল পীরের এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রাম গাজীর। সর্বশেষে কলাপাতায় বাস্তুদেবতার নামে নৈবেদ্য দেওয়া হয়। নৈবেদ্য খুবই সাধারণ—চাল, কলা, চিনি ইত্যাদি। তবে রক্ষাচণ্ডীর নিকট কোন নৈবেদ্য দেওয়া হয় না।

দেবদেবীর এই সকল গৃহ নির্মাণ করিবার পর ফকির স্বয়ং স্নান করেন এবং কাঠুরিয়ারা নূতন বস্ত্র পরিধান এবং কপালে ও বাহুতে সিন্দুর লেপন করিয়া পূজা প্রাঙ্গণে আসিয়া প্রার্থনা জানান। ইহার পর ফকির কাঠুরিয়াদের কনুই হইতে বিঘৎ মাপিয়া যদি হাতের যে-কোন আঙুলের সহিত বিঘতের অঙ্গুলি মিলিয়া না যায় তাহা হইলে আশপাশে কোথায়ও বাঘ আছে বলিয়া মনে করা হয়। ফকির তখন নিজেকে এবং কাঠুরিয়াদের রক্ষা করিবার জন্য পূজা ও নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করেন—"ধূলা, ধূলা, ধূলার গুড়া পড়ুক তোদের চক্ষে হে বাঘ-বাঘিণী" ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য মন্ত্র শক্তির দ্বারা কাঠুরিয়া এমন কি ফকির নিজেও যে, ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে জীবন্ত রক্ষা পায় না তাহার বহু প্রমাণও আছে। তথাপি বলা যায়, স্থানীয় কাঠুরিয়ারা বনে কাঠ কাটিতে যাইবার কালে এই সকল ফকিরদের উপরেই বেশী নির্ভর করে। কাঠুরিয়া সে হিন্দু অথবা মুসলমানই হউক গাজী পীর ও তাঁহার ভ্রাতা কালু গাজীর নামে ভক্তিতে মাথা নত করে।

বাংলায় ভ্রমণ: প্রথম খণ্ড, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে ঘুটিয়ারী শরীফের উৎসব বিষয়ে নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়।

কলিকাতা হইতে ২০ মাইল দূরে ঘুটিয়ারী শরীফ অবস্থিত। ইহা মুসলমানগণের একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। স্টেশনের নিকটেই সুবিখ্যাত পীর গাজী মোবারক আলি সাহেবের দরগাহ্ ও মস্‌জিদ অবস্থিত। গাজী সাহেবের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য বিশেষ কিছুই জানা যায় না, তবে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। যে স্থানে ঘুটিয়ারী শরীফ অবস্থিত উহা মদনমল পরগণার অন্তর্গত। পূর্বে এই অঞ্চল সুন্দরবনের অংশ বিশেষ ছিল। কথিত আছে যে গাজী সাহেব অদ্ভুত ক্ষমতাবলে বনের ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকে বশীভূত করিয়া এই অঞ্চলে মনুষ্যের বসতি স্থাপন করেন। তিনি ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। একবার স্থানীয় জনৈক নাবালক জমিদার বাদশাহ সরকারে সময়মত খাজনা না দিতে পারায় বাদশাহের আদেশে ধৃত হইয়া রাজধানীতে নীত হন। বালকের জননীর ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া গাজী সাহেব একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজধানীতে বাদশাহের দরবারে গিয়া উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য, বাদশাহ তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন ও বালককে মুক্ত করিয়া দেন। অতঃপর বাদশাহ গাজী সাহেবের নামে মদনমল পরগণার জমিদারী সনদ প্রদান করেন। সুন্দর বনের নিকটবর্তী বহু গ্রামে গাজী মোবারক আলি বা সংক্ষেপতঃ মোবারক গাজী ও তাঁহার ভ্রাতা কালু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূজিত হন। গাজী সাহেবের দেহত্যাগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাহিনীটি প্রচলিত আছে—

একবার ভীষণ অনাবৃষ্টি হইয়া অজন্মা উপস্থিত হইলে শিষ্যগণের অনুরোধে গাজী সাহেব খোদার দরবারে আরজি পেশ করিবার জন্য একটি গৃহের মধ্যে গিয়া উহার অর্গল বন্ধ করিয়া দেন এবং প্রত্যেককে সাবধান করিয়া বলেন যে যতক্ষণ তিনি ধ্যানস্থ থাকিবেন, ততক্ষণ যেন কেহ গৃহমধ্যে প্রবেশ না করে। ক্রমে ক্রমে তিন দিন চলিয়া গেল, গাজী সাহেবের বাহিরে আসার কিন্তু কোনই

লক্ষণ দেখা গেল না। তখন কয়েকজন ভক্ত নানারূপ আশঙ্কা করিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করে এবং দেখিতে পায় যে গাজী সাহেবের দেহ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে। তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন মনে করিয়া তাহারা সেই গৃহমধ্যেই কবর খুঁড়িয়া তাঁহাকে সমাহিত করে। সেই দিনই কিন্তু প্রবল বারিপাত হয় ও রাত্রে গাজী সাহেব জনৈক অনুরক্ত শিষ্যকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন যে, তাহার ধ্যানস্থ দেহকে ভুলবশতঃ মৃতদেহ মনে করিয়া কবর দেওয়া হইয়াছে। অম্বুবাচীর সময় এই ঘটনাটি ঘটে। ঘুটিয়ারী শরীফের সুন্দর ও বৃহৎ মসজিদটি গাজী সাহেবের সমাধির উপর নির্মিত।

প্রতি বৎসর আষাঢ় ও ভাদ্র মাসে গাজী সাহেবের স্মরণার্থে ঘুটিয়ারী শরীফে দুইটি বৃহৎ মেলা হয়। এই মেলায় বহু মুসলমান ও হিন্দু ভক্ত উপস্থিত হইয়া গাজী সাহেবের দরগাহে শিরণি দিয়া থাকেন। এখানে প্রতি শুক্রবার বহু লোকের সমাগম হয়। (পৃঃ ১৭৫-১৭৭)

শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয়ের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, উল্লিখিত কিংবদন্তীটি বারুইপুরের বিখ্যাত কায়স্থ জমিদার রায়চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ বলভদ্রের পুত্র মদনমোহনের জমিদারীপ্রাপ্তি সম্বন্ধে। মদনমোহনকে মুক্তি দিয়া নূতন জমিদারী দান করিতে গাজী সাহেব নবাব মুর্শীদকুলী খাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন এবং তদনুসারে নবাব মদনমোহনকে মুক্তি দিয়া দক্ষিণের জমিদারী দেন। শ্রীঘোষ আরও লিখিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর অম্বুবাচীর সময় এখানে বৃহৎ মেলা ও উৎসব হয় এবং উৎসবে হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান যাত্রীর সমাগম হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই গাজী সাহেবের দরগাহে শিরণি দিয়া থাকেন। এখনও উৎসবের সময় রায়চৌধুরীদের বাড়ি থেকে প্রথমে শিরণি দেওয়া হয়। (পৃঃ ৬১৮-৬১৯)

মেলা

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা (পীর মোবারক গাজী)

ঘুটিয়ারী শরীফ গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের ৬ই তারিখ হইতে সপ্তাহব্যাপী পীর মোবারক গাজীর আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে কুড়ি বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। হিন্দু-মুসলমান দৈনিক গড়ে কুড়ি হাজার লোক এই মেলায় অংশ গ্রহণ করেন। যাত্রীরা প্রধানতঃ বারুইপুর, ক্যানিং, জয়নগর, সোনারপুর, ভাঙ্গড়, ডায়মণ্ডহারবার, বসিরহাট প্রভৃতি অঞ্চল হইতে এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা হইতে আসেন। রেলপথই যাত্রীদের প্রধান যানবাহন।

বিক্রেতারা লক্ষ্মীকান্তপুর, জয়নগর, মগরাহাট ও কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসেন। মোট প্রায় চারশত দোকানপাট বসে ও একশতজন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানগুলির মধ্যে তেলেভাজা, ময়রা প্রভৃতি খাবারের দোকানই সর্বাধিক। ইহা ব্যতীত, তামা ও পিতলের বাসনপত্রের দোকান, মনিহারী জিনিসের দোকান, বই-ছবির দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, লাঙ্গল, জোয়াল, আঁকড়া, বাটুই প্রভৃতি বা কৃষি কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকানপাট দেখা যায়। জয়নগর হইতে বেতের ধামা, চাঙ্গারী, কুলো ; মাটির পুতুল, হাঁড়ি-কুড়ি ও বাঁশের খাঁচা, পিঁজরা প্রভৃতি জিনিসপত্র লইয়া বিক্রেতারা প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই গ্রামে প্রতি বৎসর ১৭ই শ্রাবণ অনুষ্ঠিত 'চন্দন মেলা'র বিবরণী উপরিউক্ত মেলার অনুরূপ। তবে চন্দন মেলায় উল্লিখিত মেলা অপেক্ষা দোকানপাটের সংখ্যা ও লোক সমাগম কিছু বেশী হয়।

কালীপূজার মেলা

তালদি গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে কালীপূজা উপলক্ষে কালীমন্দির প্রাঙ্গণে সাধারণের জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

এই গ্রামের তিন-চার মাইলের মধ্যে বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় আড়াই সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং দুই-চারজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ প্রতি বৎসর আশপাশের গ্রাম হইতে আসিয়া থাকেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি ময়রা, তেলেভাজা, কদমা ও ছাঁচ প্রভৃতি খাবারের দোকান বসে। ইহা ব্যতীত, মনিহারী দোকান, মাটির হাঁড়িকুড়ি, পুতুল ও খেলনার দোকানপাট বসে। অন্যান্য দোকানপত্রের মধ্যে চা-পান-বিড়ি ও বাঁশের বাঁশির দোকান বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান ও যাত্রাভিনয় হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই গ্রামে অনুষ্ঠিত গোষ্ঠ উৎসবের মেলাটিও উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

রায়বাঘিনী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক ও ১লা বৈশাখ গোষ্ঠযাত্রা উপলক্ষে চৈত্রসংক্রান্তি হইতে তিনদিনব্যাপী ব্যক্তিবিশেষের প্রায় তিন বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

কুমারসা চক, পরানীখেকো, টেঙ্গরাগালী, নিকারীঘাটা, ক্যানিং প্রভৃতি আশপাশের গ্রাম হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় চল্লিশ হইতে পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং আট-দশজন ফেরিওয়ালা আসেন। মেলার অধিকাংশ দোকানই খোলা জায়গায় বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ ক্যানিং শহর হইতে এবং আশপাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। সমস্ত দোকানপাটের মধ্যে প্রায় কুড়িটি ময়রা ও তেলেভাজার দোকান এবং চৌদ্দটি মনিহারী দোকান বসে। ইহা ব্যতীত, তালপাতার পাখা ও চ্যাটাই, খেজুর পাতার চ্যাটাই, মাদুর প্রভৃতির দোকান, বই-ছবির দোকান এবং শাকসব্জী, তালের গুড়, ডাব ও সরবতের দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচ, সঙনাচ ব্যতীত যাত্রাভিনয়েরও ব্যবস্থা থাকে এবং ঘোড়দৌড় ও লাঠিখেলা হয়। গ্রামের মোড়লরা ঘোড়দৌড় ও লাঠিখেলা প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং মেলা সুষ্ঠু পরিচালনা করিতে প্রশংসনীয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

দোলযাত্রার মেলা

ডেভিস আবাদ গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ-ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রা উপলক্ষে সাধারণের প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর মাত্র এক বেলার জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

বালোইঝাকা, ভলেয়া, হাটপুর, দাঁড়িয়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় প্রায় পাঁচ-ছয়শত লোকজন এবং বিক্রেতারা আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা ও ফুটকড়াইয়ের দোকানই বেশী। ইহা ব্যতীত, দশ-বারটি মনিহারী দোকান, মাটির পুতুল, হাঁড়িকুড়ি ও খেলনার দোকান এবং বই-ছবির দোকানপাট বসে। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয় হয়।

ব্রহ্মাপূজার মেলা

ক্যানিং-এ প্রতি বৎসর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ব্রহ্মাপূজা উপলক্ষে স্থানীয় বাজার ও বাজার সংলগ্ন প্রায় তিন-চার বিঘা জমির উপর সাত হইতে বারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রতিদিন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় আট হইতে দশ সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। প্রধানতঃ ক্যানিং, বারুইপুর ও ভাঙ্গড় থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় লোকজন আসিয়া থাকেন।

ক্যানিং বাজারের স্থায়ী দোকানপাট ব্যতীত মেলা উপলক্ষে আরও প্রায় একশত দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ ক্যানিং থানার দেড়িয়া, বাঁশড়া প্রভৃতি বহু ইউনিয়ন হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। মেলায় সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান প্রায় পঞ্চাশটি; মনিহারী দোকান প্রায় ত্রিশটি এবং প্রায় পঁচিশটি মিল ও তাঁতের কাপড়, লুঙ্গি, গামছা প্রভৃতির দোকান বসে। ইহা ব্যতীত, লোহার বাসনপত্রের দোকান, খেলনার দোকান, টোটকা ঔষধপত্র ও বই-ছবির দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, জুয়া ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। প্রতি বৎসর কলিকাতা হইতে দুই-তিনটি পেশাদারী যাত্রার দল আসে।

থানা ঃ বাসন্তী

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ আমঝাড়া। ৭৩।১,৫২২ ৩৭।৪৩৪।২,১০৫

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, বৈরাগী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বাগ্দী, কাওরা, মুচি, মুসলমান ও কিছু সংখ্যক উড়িষ্যাবাসী হিন্দুর বাস আছে। নস্করপাড়া, মুসলমানপাড়া, উৎকলপাড়া প্রভৃতি নামে গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ক্যানিং হইতে নৌকা-যোগে গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ নববর্ষ উৎসব এবং আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নববর্ষ উৎসবটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের এবং দুর্গাপূজাটি মাত্র নয় বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, দেশ স্বাধীন হইবার অব্যবহিত পর হইতেই এই গ্রামে প্রতি বৎসর ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) নববর্ষ উপলক্ষে মেলা। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে একদিন।

দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, শীতলা, মনসা ও দক্ষিণেশ্বর আছে।

শ্রীবসন্ত কুমার হালদার, শিক্ষক,
আমঝাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কাঁঠালবেড়িয়া, ২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ ভরতগড় (৪নং লট)।
১৫১।১৬৬৯ ৫২।৪৬৩।২,৪৪৩

(ক) হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, আদিবাসী এবং কয়েক ঘর উৎকলবাসী হিন্দুর বসবাস আছে। গ্রামটি ছয়টি অংশে বিভক্ত।

(খ) কৃষিকার্য ও মাছের ব্যবসায়।

(গ) ক্যানিং হইতে মোটরলঞ্চযোগে বাসন্তী গ্রামে নামিয়া সেখান হইতে পাঁচ মাইল হাঁটা পথে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে সাড়ম্বরে সর্বজনীন শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। টালির ছাওয়া একটি মাটির ঘরে শীতলা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শীতলার নিত্য পূজা হয়, পূজারী জাতিতে ব্রাহ্মণ।

(ঙ) শীতলাপূজার মেলা। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমার পর হইতে সপ্তাহব্যাপী। মেলাটি মাত্র গত চৌদ্দ-পনর বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি শীতলার মন্দির আছে।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সুন্দরবন অঞ্চলের নিবিড় বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গ্রামটির সৃষ্টি হয়। এখনও এই গ্রামের আশপাশ গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। গ্রাম পত্তন কালে এই স্থানে গভীর জঙ্গলের মধ্যে অতি প্রাচীন দ্বাদশ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও একটি দীঘির পাড় আবিষ্কৃত হয়। গ্রামবাসীগণ অনুমান করেন প্রাচীনকালে এই স্থানে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল এবং সম্পন্ন ব্যক্তিরা বসবাস করিতেন। প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হওয়ায় গ্রামটির নাম ভরতগড় রাখা হইয়াছে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১ নং ভরতগড়ের উত্তর সীমানায় মহেশপুর হাটখোলার সন্নিকটে বনবিবির একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ হইতে দুইদিনব্যাপী সাড়ম্বরে বনবিবির পূজা হয় এবং এই পূজায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই যোগদান করেন। উৎসব উপলক্ষে কবিগান, তরজা ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

শ্রীসতীশ চন্দ্র মণ্ডল, শিক্ষক,
ভরতগড় প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ভরতগড়, ২৪-পরগণা।

মেলা বিবরণী

নববর্ষের মেলা

আমঝাড়া গ্রামে নববর্ষ উপলক্ষে প্রতি ১লা বৈশাখ ব্যক্তিবিশেষের জমির উপর একটি মেলা বসে। সাধারণতঃ ঐদিন বিকালের দিকে মেলায় আশপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে ছয়-সাতশত নরনারী আসিয়া থাকেন। মেলায় প্রধানতঃ ময়রা, তেলেভাজা, চা-পান-বিড়ি প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রীর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচ ও যাত্রাভিনয় হয় এবং জুয়া ও লটারী খেলার দল আসে। আমোদ-প্রমোদের দলগুলি স্থানীয় এবং এই সকল অনুষ্ঠানে সাত-আটশত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আমঝাড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

শীতলাপূজার মেলা

ভরতগড় (৪ নং) গ্রামে প্রতি বৎসর দোলপূর্ণিমার পর শীতলাপূজা উপলক্ষে সাধারণের প্রায় দশ কাঠা জমির উপর সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র চৌদ্দ-পনর বৎসরের প্রাচীন।

মহেশপুর, রাণীগড়, শিবগঞ্জ, বাসন্তী প্রভৃতি আশ-পাশের গ্রাম হইতে মেলায় লোকজন ও বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন।

মেলাতে কেবলমাত্র ময়রা ও তেলেভাজার দোকান এবং চা-পান-বিড়ি প্রভৃতির দোকান বসে। মোট দোকানের সংখ্যা প্রায় ত্রিশটি। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

থানা : মগরাহাট

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : ইয়ারপুর। ৭।৭৬৮'৪৩।৭০৩।৩,৬৩৬

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ভেলী ও মুসলমান। গ্রামে নয়টি পাড়া আছে। যেমন—আচার্যপাড়া, হালদার-পাড়া, মণ্ডলপাড়া, লস্করপাড়া, সর্দারপাড়া, খামারুপাড়া, মিস্ত্রীপাড়া, সেখপাড়া ও মোল্লাপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মগরাহাট। সিরাকোল হইতে মোটরবাস পাওয়া যায়। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে। গ্রীষ্মকালে রিক্সা ও গরুর গাড়ী এবং বর্ষাকালে নিকটবর্তী খাল দিয়া সালতিতে যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা এবং আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি সর্বজনীন। রথযাত্রা উৎসবটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের এবং দুর্গাপূজাটি মাত্র সাত-আট বৎসর যাবৎ অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত, প্রতি বৎসর মুসলমান সম্প্রদায়ের ফতেহা-দোয়াজ-দাহম্ উৎসব উপলক্ষে মুসলমান ধর্মগুরু হজরৎ মহম্মদের জীবনী ও বাণী প্রচার করা হয়। ধর্মসভায় মুসলমান পণ্ডিতগণ বক্তৃতা দিয়া থাকেন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা দিবস মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীদাউদ আলি মিস্ত্রী, চাকুরী,
গ্রাম ও পোঃ ইয়ারপুর, ২৪-পরগণা।

২। গ্রাম : সালিকা (মৌজা : শ্যামপুর)। ৪৩।১,৮৪১'২৪।১,৪৫৯।৭,৯৩২

(ক) হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ধামুয়া হইতে গ্রামে যাতায়াতের একটি কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে সর্বজনীন চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি দুইশতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) ×

শ্রীযতীন্দ্র নাথ নস্কর, প্রধান শিক্ষক,
সালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মগরাহাট, ২৪-পরগণা।

৩। গ্রাম : ধনিরামের চক (মৌজা : শ্যামপুর)। ৪৩।১,৮৪১'২৪।১,৪৫৯।৭,৯৩২

(ক) ব্রাহ্মণ ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে। যেমন—সাঁপুইপাড়া, নস্করপাড়া, গায়েনপাড়া, সর্দারপাড়া ও মণ্ডলপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের প্রায় দেড় মাইল দূরে ধামুয়া রেলস্টেশন হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে সপ্তাহব্যাপী বিবিমার পূজা ও উৎসব হয়। বিবিমার নির্দিষ্ট স্থান আছে। ঐ স্থানে বিবিমায়ের সহিত শিব, দক্ষিণেশ্বর ও বাবাঠাকুরের পূজা হয়। চৈত্র পূর্ণিমার এক সপ্তাহ পূর্ব হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত পূজা প্রাঙ্গণে বিবিমার মাহাত্ম্যসূচক গান করা হয়। শেষ দিন এই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু নরনারী বিবিমার স্থানে পূজা ও হাজত দিতে আসেন। প্রধানতঃ বিবিমার স্থানে ধূনা পোড়ান মানত করা হয়। স্থানীয় 'মোল্লা' পদবীধারী মুসলমানগণ বিবিমার পূজা এবং উল্লিখিত অন্যান্য দেবতার পূজা ব্রাহ্মণেরা করিয়া থাকেন। উৎসবটি সর্বজনীন এবং দুই-শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) বিবিমার পূজা উপলক্ষে মেলা। চৈত্র পূর্ণিমার দিন। মেলাটি প্রায় দুইশতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির এবং শীতলা ও বিবিমার স্থান আছে।

শ্রীমন্মথ নাথ হালদার, শিক্ষক,
গ্রাম : বিহারী, পোঃ ধামুয়া,
২৪-পরগণা।

৪। গ্রাম : রঙ্গিলাবাদ। ৭৯।৬৩৭·১১।৩৫৯।১,৮২৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ক্ষত্রিয়, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ইত্যাদি। গ্রামে চব্বিশটি পাড়া আছে। যেমন—ব্যানার্জীপাড়া, গাঙ্গুলীপাড়া, বৈরাগীপাড়া, বস্তিপাড়া, হালদারপাড়া, বামুন-পাড়া, মান্নাপাড়া, মণ্ডলপাড়া, কুণ্ডুপাড়া, নস্করপাড়া, জানাপাড়া, সাউপাড়া, ময়রাপাড়া, স্যাকরাপাড়া, তেলী-পাড়া, মালীপাড়া, নাপিতপাড়া, কাওরাপাড়া, বাগ্দীপাড়া, কাজীপাড়া, হাতীপাড়া, কাঁকুয়াপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) রেলস্টেশন মগরাহাট হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া রিক্সায় অথবা জলপথে ডোঙ্গায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামের কাঁকুয়াপাড়ায় প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় সাড়ম্বরে শীতলার বাৎসরিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং দুইশতাধিক বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে শীতলার একটি প্রাচীন জীর্ণ মন্দির আছে। মন্দিরে ব্রাহ্মণ দ্বারা শীতলার নিত্য পূজা হয়। ইহা ব্যতীত, প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপূজা হয়। চড়ক উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) চড়কের মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তি হইতে তিনদিনব্যাপী মেলা চলে। মেলাটি প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শীতলামন্দিরে বাবাঠাকুর, মনসা ও দক্ষিণেশ্বরের পূজা হয়। বাবাঠাকুর, মনসা ও দক্ষিণেশ্বরের কোন মূর্তি নাই।

শ্রীমিহির কুমার মজুমদার, সহকারী শিক্ষক,
রঙ্গিলাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
২৪-পরগণা।

৫। গ্রাম : নাজরা। ৯৭।৫৬৩·২৫।৫৩৩।২,৮৫৬

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে উনিশটি পাড়া আছে। যেমন—ঘোষপাড়া, হালদারপাড়া, সর্দারপাড়া, মোড়লপাড়া, নাপিতপাড়া, বৈরাগীপাড়া, থাপাড়া, মিস্ত্রী-পাড়া, সেখপাড়া, মোল্লাপাড়া, ফকিরপাড়া গাজীপাড়া, পেয়াদাপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী, দিনমজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দেউলা হইতে জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) নাজরা গ্রামের মোড়লপাড়ায় প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক পূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের রাস উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে রাধাকৃষ্ণের দোল উৎসব এবং চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সরস্বতীপূজাটি সর্বজনীন। ইহা ব্যতীত, অন্যান্য উৎসবগুলি ব্যক্তিবিশেষের। উল্লিখিত উৎসব-পার্বণগুলি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের মোড়লপাড়ায় একটি দেবালয়ে পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, শীতলা, মনসা ও কালী মূর্তি এবং ঘোষপাড়ায় শীতলা, মনসা, পঞ্চানন্দ ও ষষ্ঠী মূর্তি ব্যতীত মোল্লাপাড়ায় একটি ও থাপাড়ায় একটি গাজী সাহেব পীরের দরগা আছে। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ গাজী সাহেবের দরগায় উৎসব হয়। ইহা ব্যতীত, গ্রামে একটি ভগ্ন শিব বিগ্রহ আছে।

শ্রী এ, কে, মহম্মদ আবদুল জব্বর, প্রধান শিক্ষক,
নাজরা-রাজারহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়,
২৪-পরগণা।

৬। গ্রাম : উত্তর কুসুম। ১০৫।৮১৮·২১।৭৩৭।৩,৬৩৬

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে বারটি পাড়া আছে। যেমন—গাজীপাড়া, মোল্লাপাড়া, মিরপাড়া, হালদারপাড়া, বস্তিপাড়া, পুরকাইতপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের পূর্বদিকে সংগ্রামপুর এবং পশ্চিমদিকে দেউলা রেলস্টেশন। দুইটি রেলস্টেশনই গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। নিকটবর্তী একটি খাল দিয়া ডোঙ্গায় গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় প্রতি বৎসর মহরম মাসের ১০ই তারিখে সাড়ম্বরে মহরম উৎসব পালন করিয়া

থাকেন। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন এবং এই অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্বজনীন উৎসব।

(ঙ) মহরমের মেলা। প্রতি বৎসর মহরম মাসের (শ্রাবণ-ভাদ্র) ১০ই তারিখ হইতে দুইদিনব্যাপী মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে 'কারবালা' নামে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। এই স্থানে মহরম উৎসব পালন করা হয়।

শ্রীবরহান আলী, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ উত্তর কুসুম,
২৪-পরগণা।

৭। গ্রাম ঃ উত্তর কলস। ১১৫।২২'১৮।৩৭৪।১,৭৪৮

(ক) গ্রামের অধিকাংশই মুসলমান। ইহা ব্যতীত, কয়েক ঘর নিম্ন হিন্দুর বসবাস আছে।

গ্রামটি উত্তর কলস ও দক্ষিণ কলস, এই দুই ভাগে বিভক্ত। গ্রামে সতরটি পাড়া আছে। যেমন—বিশ্বিপাড়া, মোল্লাপাড়া, গাজীপাড়া, খামারুপাড়া, মণ্ডলপাড়া, নস্করপাড়া, পোদপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য। স্থানীয় লোকেরা অনেকে মাছধরা জাল বুনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন।

(গ) গ্রামের প্রায় আড়াই মাইল দূরে অবস্থিত মগরাহাট রেলস্টেশন হইতে একটি সংকীর্ণ কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ৭ই চৈত্র মুন্সী পানাউল্লা শাহ পীরের তিরোভাব উৎসব। ইহা ব্যতীত, গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায় প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

(ঙ) মুন্সী পানাউল্লা পীরের মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে তিনদিন হইতে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মুন্সী পানাউল্লা শাহ পীরের একটি 'মাজাহর শরীফ' আছে।

শ্রীমদাব্বীর হোসেন, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ উত্তর কলস, ২৪-পরগণা।

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব (মুন্সী পানাউল্লা শাহ পীর)

উত্তর কলস গ্রামে প্রতি বৎসর ৭ই চৈত্র হইতে তিন-দিনব্যাপী সাড়ম্বরে মুন্সী পানাউল্লা শাহ পীরের তিরোভাব উৎসব পালিত হয়। উৎসব উপলক্ষে পীরের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বিভিন্ন অঞ্চল হইতে তাঁহার বহু ভক্ত ও শিষ্য এই গ্রামে অবস্থিত পীরের মাজাহর শরীফে সমবেত হন। উৎসবটি প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন এবং এই অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্বজনীন উৎসব।

মুন্সী পানাউল্লা শাহ পীর ৭ই ভাদ্র তারিখে দেহ-রক্ষা করেন। আদিতে তাঁহার ভক্তমণ্ডলী প্রতি বৎসর ৭ই ভাদ্র তারিখেই উৎসব পালন করিতেন। কিন্তু বর্ষাকালে উৎসব অনুষ্ঠানের নানা বিঘ্নের সৃষ্টি হইত এবং ভক্তমণ্ডলী তাঁহাদের আশানুরূপ জাঁকজমকের সহিত উৎসব পালন করিতে পারিতেন না। শোনা যায় ভক্তদের এই মনোবেদনার জন্য পীরের স্বপ্নাদেশ অনুসারে ৭ই ভাদ্রের পরিবর্তে প্রতি বৎসর ৭ই চৈত্র উৎসব পালনের দিন ধার্য হয়। এই কারণে বর্তমানে প্রতি বৎসর ৭ই চৈত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। মুন্সী পানাউল্লা শাহ পীরের দেহরক্ষা সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি আছে যে, তাঁহার মৃত্যু-কাল সমুপস্থিত হইলে তিনি স্বপ্নে একযোগে দূর-দূরান্তে অবস্থিত তাঁহার সকল বিশিষ্ট শিষ্যগণকে জানান। স্বপ্নাদেশ পাইয়া তাঁহার শিষ্যগণ পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া পীরের বাসস্থানে আসিয়া হাজির হন এবং পীরের মরদেহ মহা-সমারহে সমাধিস্থ করেন।

মুন্সী পানাউলা শাহ পীরের জীবনী সম্পর্কে জানা যায় যে, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন পরম উদার, দয়ালু, ধর্মপ্রাণ এবং নিরাসক্ত সংসারী। চিকিৎসা করা তাঁহার পেশা হইলেও জীবিকার জন্য তিনি কোনদিনই পীড়িতদের নিকট হইতে অর্থের দাবী করিতেন না। পীড়িতদের স্বেচ্ছার দানই তাঁহার জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ছিল। তাঁহার ভক্ত ও অনুরাগীদিগের মধ্যে কোরাণের

পবিত্র বাণী প্রচার করা এবং তাহাদিগকে পবিত্র ধর্মপথে পরিচালিত করাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ও সাধনা। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি এই গ্রামে বসবাস করিতেছেন।

উৎসবের প্রথম দিন প্রাতঃকালে পীরের মাজাহর শরীফ-এ কোরাণ পাঠ করিয়া উৎসবটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। তাহার পর তাঁহার ভক্ত-শিষ্যগণ মিলিয়া 'মিলাদ মহাফিল্' অনুষ্ঠান করেন ও পীর সাহেবের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই সময় সর্বক্ষণ উৎসব আঙ্গিনায় নহবতে সানাই বাজিতে থাকে। অপরাহ্ণে কলিকাতা হইতে একটি বৃহৎ 'ব্যাণ্ড পার্টি' দল উৎসবে যোগদানের উদ্দেশ্যে মগরাহাট হইতে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা প্রথমে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া মাজাহর শরীফটিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন। ইহার পর পীর সাহেবের শিষ্যগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে 'দরুদ শরীফ' বা পীর সাহেবের গুণগান করিতে করিতে গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির হন এবং ফিরিয়া আসিয়া পীর সাহেবের কবরের উপর পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং পাঁচ মিনিটকাল সকলে কবরের চারিদিকে নীরবে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া পীরের অমর আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। পরে কোরাণ হইতে 'আছড়ি' করিয়া পীরের আত্মার শুভ কামনা করেন। রাত্রে উৎসব প্রাঙ্গণে কলিকাতা হইতে আগত দুই-তিনটি দল কর্তৃক কাওয়ালিগান, নাথ ও ধর্ম সঙ্গীত হয়। কাওয়ালিগান সারারাতব্যাপী চলে। পরের দিন প্রাতঃকালে কোরাণ পাঠ, মিলাদ মহাফিল্ সানাই ইত্যাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা দ্বিতীয় দিনের উৎসব আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্নে শাস্ত্র আলোচনা এবং রাত্রে পুনরায় ধর্ম সঙ্গীত ও কাওয়ালিগান অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় দিনের উৎসবে উল্লিখিত দুইদিনের অনুরূপ অনুষ্ঠানাদি হয়। তবে ধর্ম সঙ্গীত হয় না, রাত্রে পীরের জীবনী আলোচনা করা হয়। চতুর্থ দিন প্রাতঃকালে সমবেত ভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করিতে করিতে পীরের মাজাহর প্রদক্ষিণ করা হয় এবং যতক্ষণ দরুদ শরীফ পাঠ শেষ না হয় ততক্ষণ পীরের মাজাহরে চন্দন লেপন করা হয়। পরিশেষে ভক্তরা পরস্পরের সহিত আলিঙ্গন করেন এবং পীরের শিরনি বিতরণ করিয়া উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

পীরের নিকট প্রধানতঃ খাসী, মোরগ, রান্না পোলাও, ক্ষীর ও অন্যান্য মিষ্টান্ন মানত দেওয়া হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নে মানতের পশু-পক্ষীর মাংস রান্না করিয়া মানতকারীগণ গৃহ হইতে বাদ্য-বাজনাসহ পীরের মাজাহরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং উক্ত খাদ্যবস্তুগুলি পীরের নিকট নিবেদন করিয়া মাজাহরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ধূলিতে গড়াগড়ি দেন। পীরের প্রধান সেবায়েত মানতকারীর দেহে পুণ্যবারি সিঞ্চন করিয়া মানতকারীর ইচ্ছা পূরণের জন্য পীরের এবং ঈশ্বরের নিকট 'দোয়া' ভিক্ষা করেন। এই গ্রামে বসবাসকারী মুন্সী পানাউল্লা শাহ পীরের বংশধরগণই বর্তমানে সেবায়েত বা খাদেমরূপে কার্যাদি পরিচালনা করিয়া থাকেন।

পীরের মাজাহর শরীফটি উপযুক্ত রক্ষনাবেক্ষণ ও সুষ্ঠুভাবে উৎসব পরিচালনার জন্য গ্রামে "মুন্সী পানাউল্লা শাহ মাজাহর শরীফ কমিটি" নামে একটি স্থায়ী কমিটি আছে।

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা (মুন্সী পানাউল্লা)

উত্তর কলস গ্রামে প্রতি বৎসর ৭ই চৈত্র তারিখে মুন্সী পানাউল্লা শাহ পীরের তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে পীরের মাজাহর সংলগ্ন প্রায় চার বিঘা জমির উপর তিনদিন হইতে সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলার জমি পীরের বংশধরগণের। মেলাটি প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন এবং প্রতিদিন বিকালের দিকেই মেলায় লোক সমাগম ও বেচা-কেনা হয়।

আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে এবং কলিকাতা হইতে মেলায় প্রায় ছয় হইতে সাত সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান এবং স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যাই বেশী। যাত্রীরা মগরাহাট স্টেশন হইতে রিক্সা অথবা হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় প্রায় আড়াইশত হইতে তিনশত দোকানপাট বসে এবং চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। উহার মধ্যে প্রায় দেড়শত দোকানপাট খোলা জায়গায় বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ মগরাহাট, খোনকারের বাজার, চাগদারহাট, সংগ্রামপুর, সিরাকোল প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর মেলায় আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে প্রায় একশতটি খাবারের দোকান ও ষাটটি মনিহারী দোকান বসে। ইহা ব্যতীত, বাসনকোসনের দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, কৃষিযন্ত্রপাতি, রাজমিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি, ছুতারমিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি, ছুরি, বঁটি, কাঁচির দোকান, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও পুতুলের দোকান, বেতের ধামা, কুলো, চাঙ্গারী ইত্যাদির দোকান, বই-ছবি ও ঔষধপত্রের দোকান, মাছ-মাংস, শাকসব্জী ও মুদির দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক, সার্কাস, নাগরদোলা, লটারী খেলা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে। মেলার শেষ দিন তিন-চারঘণ্টাব্যাপী নানারকম আতশবাজি পোড়ান হয়। ইহা ব্যতীত, কোন কোন বৎসর মেলার ব্যবসায়ী সঙ্ঘ কর্তৃক যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। মেলাটি সুষ্ঠু পরিচালনার ভার "মুন্সী পানাউল্লা শাহ মাজাহর শরীফ কমিটি" নামক একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পিত আছে।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

সালিকা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব উপলক্ষে সংক্রান্তির দিন বৈকালে স্থানীয় ব্যক্তিবিশেষের জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি দুইশতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবি করা হয়।

মেলায় রঙ্গনবেড়িয়া, মহেশপুর, আলাবেড়িয়া, রামনাথপুর, মোরকবেড়িয়া, মাধবপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে সর্বশ্রেণীর মোট প্রায় দুই সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

উপরে উল্লিখিত গ্রামগুলি হইতেই প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। দোকানপাটগুলি সমস্তই খোলা জায়গায় বসে। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকানের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশটি এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যা প্রায় কুড়ি-পচিশটি। ইহা ব্যতীত, মাটির পুতুল ও খেলনা; বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলো, ঝুড়ি; লোহার তৈয়ারী কাস্তে, বঁটি, ছুরি এবং শাকসব্জীর দোকানপাট বসে। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই।

রঙ্গিলাবাদ গ্রামে বটতলায় বিশালাক্ষীর নামে উৎসর্গকৃত দেবোত্তর প্রায় পাচ বিঘা জমির উপর প্রতি বৎসর চড়ক উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

পদ্মপুকুর, শিবপুর, মহেশদাড়ী, গড়খালি, আলমপুর, কামালপুর, বেলে, চাকদহ, হাসুড়ী, রাজবল্লভপুর, সাতহাতি, বলরামপুর, মহেশ্বরা প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলা দেখিতে ও মেলায় জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে লোকজন আসেন। মেলা দেখিতে প্রায় সাত শত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় একশত দোকানপাট এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। অধিকাংশ দোকানই খোলা জায়গায় বসে। প্রায় পঞ্চাশটি ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান ব্যতীত দশ-বারটি মনিহারী দোকান, ছয়-সাতটি কাপড়চোপড়ের দোকান, চার-পাচটি বাসনকোসনের দোকান এবং কয়েকটি দা, কোদাল, মাটির পুতুল, খেলনা, চুবড়ী, বই-ছবি ও মাছের দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের লাঠিখেলা এবং কাওরা সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের সংনাচ বিশেষ উপভোগ্য। ইহা ভিন্ন, পুতুলনাচের দল আসে।

নাজরা গ্রামের মোড়লপাড়ার দক্ষিণ দিকে সাধারণের প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়কের মেলা বসে। ইহা প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং সংক্রান্তির দিন বৈকালে মেলায় বেচাকেনা ও লোকসমাগম হয়।

আশপাশের গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়

এবং প্রায় চল্লিশটি দোকান বসে ও পাঁচ-সাতজন ফেরি-ওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা সকলেই স্থানীয়। মেলায় ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, কাঁচ ও পিতলের বাসনপত্রের দোকান, মনিহারী দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, লোহার তৈয়ারী কোদাল, কাস্তে, নিড়ানী, খুরপি, ছুরি, কাঁচি, বঁটি, লাঙ্গল ও দা প্রভৃতি জিনিসপত্রের দোকান, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী চ্যাঙ্গারী, ধামা, কুলো, মোড়া প্রভৃতির দোকান; মাটির পুতুল, হাঁড়ি-কলসী, খেলনা প্রভৃতির দোকান এবং দুই-একটি বই-ছবি ও ঔষধপত্রের দোকান বসে। মেলায় আমোদপ্রমোদের কোন ব্যবস্থা নাই।

বিবিমার পূজা উপলক্ষে মেলা

ধনিরামের চক গ্রামে বিবিমার পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর চৈত্র পূর্ণিমার দিন সাধারণের জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি দুইশতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

কালাপাহাড়ের চক, শ্যামপুর, রাধানগর প্রভৃতি গ্রাম হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দুই-তিন সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি তেলেভাজার দোকান বসে। ইহা ব্যতীত, কয়েকটি ময়রার দোকান, মনিহারী দোকান এবং মাটি ও কাঁচের পুতুলের দোকান বসে।

কোন কোন বৎসর মেলায় কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

মহরমের মেলা

উত্তর কুসুম গ্রামে 'কারবালা' নামক নির্দিষ্ট স্থানে প্রতি বৎসর মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উপলক্ষে দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলার জমি সাধারণের এবং প্রতিদিন বিকালের দিকেই মেলায় বেচাকেনা চলে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

ইযারপুর, শেরপুর, মন্দিরবাজার, ডায়মণ্ডহারবার, মগরাহাট প্রভৃতি স্থান হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় সাত সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। সাধারণতঃ গরুর গাড়ী, সাইকেল-রিক্সা ও হাটিয়া যাত্রীরা আসেন।

মেলায় প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে এবং পঞ্চাশ-জন ফেরিওয়ালা আসেন। উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন স্থান হইতেই প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে সামান্য তোলা আদায় করা হয়। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, ও অন্যান্য খাবারের দোকানের সংখ্যাই শতাধিক। ইহা ব্যতীত, কিছু কিছু বাসনকোসনের দোকান, মনিহারী দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, শিল্পসামগ্রী ও কারুশিল্পের দোকান এবং বই-ছবি ও ঔষধপত্রের দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের মধ্যে সার্কাস, নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে। ইহা ভিন্ন, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা এবং জুয়া ও লটারী খেলা হয়।

রথযাত্রার মেলা

ইযারপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে রথযাত্রার দিন এবং পুনর্যাত্রার দিন দেবোত্তর প্রায় চার বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন এবং প্রতিদিন বৈকাল হইতে রাত্রি অবধি মেলায় বেচাকেনা চলে।

মেলায় ধনধন্যা, দস্তরা, চকরায়পুর, চকহাটুরিয়া, সাপমারা, চকদেবুঘোষ, হরেকৃষ্ণপুর, সাতহাতি, মহেশ্বরা, রামনাথপুর, রাজবল্লভপুর প্রভৃতি আশপাশের গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় তিন সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

গ্রামের ব্যবসায়ীরা ভিন্ন দস্তরা, ধনধন্যা ও চকরায়পুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে মেলায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। মোট প্রায় সত্তরটি দোকানপাট বসে এবং পাঁচ-ছয়জন ফেরিওয়ালা আসেন। প্রায় কুড়িটি দোকান খোলা জায়গায় বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান গ্রহণ করা হয়। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে প্রায় কুড়িটি বিভিন্ন খাবারের দোকান এবং পনরটি মনিহারী দোকান ব্যতীত মেলায় বাসনকোসনের দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, কারুশিল্পের দোকান, কৃষিযন্ত্রপাতির দোকান এবং বই-ছবি ও ঔষধপত্রের দোকান বসে। মেলায় আমোদপ্রমোদের কোন ব্যবস্থা নাই।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ সিদ্ধেশ্বরপুর। ৭৮।১৬৩০৪।১২২।৭০২

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কামার, ধোপা, ও মুসলমান। গ্রামে এগারটি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, হালদারপাড়া, মণ্ডলপাড়া, পুরকাইতপাড়া, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়পাড়া, কামারপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল পূর্বদিকে লক্ষ্মীকান্তপুর রেলস্টেশন। স্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াতের একটি কাঁচা রাস্তা আছে। গ্রামের প্রায় এক মাইল দক্ষিণদিক দিয়া জেলা বোর্ডের একটি পাকা রাস্তা কুলপী হইতে বিষ্ণুপুর গিয়াছে। গ্রামের দক্ষিণদিকে একটি মজা খাল দিয়া বর্ষাকালে ডোঙ্গা ও শালতিতে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ গোষ্ঠ উৎসব, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও রাস উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব এবং চৈত্র মাসের ২৬শে হইতে গাজন উৎসব শুরু হয়। গাজন উপলক্ষে চৈত্রসংক্রান্তি তিথিতে চড়ক এবং ১লা বৈশাখ গোষ্ঠযাত্রা পর অনুষ্ঠিত হয়। জন্মাষ্টমী, রাস, দোল ও গাজন উৎসব গ্রামের পুরকাইত পরিবার কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। পুরকাইতদিগের ঠাকুরবাড়ীতে একটি চণ্ডীমণ্ডপ ও একটি ঠাকুরঘর আছে। গ্রামের সকল পূজা-পার্বণই সাধারণতঃ এই চণ্ডীমণ্ডপেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ঠাকুরঘরে শ্রীধর বিষ্ণু নামে শালগ্রামশিলা, শিব এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উল্লিখিত দেবদেবীর নিত্য পূজার জন্য পুরকাইতগণ কর্তৃক প্রদত্ত ২৯ বিঘা দেবোত্তর জমি আছে। গাজন উপলক্ষে শিবলিঙ্গটিকে গ্রামের শিবমন্দিরে স্থাপন করিয়া চার-পাঁচদিনব্যাপী উৎসব পালনের পর পুনরায় ঠাকুরঘরে আনিয়া রাখা হয়। শিবমন্দিরটি খুবই প্রাচীন এবং জীর্ণদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, অন্যান্য পূজা-পার্বণগুলি সর্বজনীন এবং বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

(ঙ) গোষ্ঠযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের পুরকাইতপাড়ায় একটি শীতলা, একটি মনসা এবং একটি পাঁচপীর ও সাতবিবির স্থান, ধোপাপাড়ায় ও মণ্ডলপাড়ায় একটি মনসার স্থান, মুসলমানপাড়ায় একটি পাঁচপীর ও সাতবিবির স্থান এবং হাটের দক্ষিণদিকে একটি ও উত্তর-পশ্চিমদিকে একটি পঞ্চানন্দের স্থান আছে। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে উল্লিখিত দেবদেবীর নিকট মানত পূজাদি হইয়া থাকে।

গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণদিকে একটি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। ঐ স্থানে সিদ্ধেশ্বরীদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া জানা যায়। সিদ্ধেশ্বরীদেবীর নামানুসারেই গ্রামের নাম সিদ্ধেশ্বরপুর হইয়াছে।

শ্রীকালিপদ পুরকাইত, প্রধান শিক্ষক,
সিদ্ধেশ্বরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সিদ্ধেশ্বরপুর, ২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ বিদ্যাধরপুর। ৮৭।৩৪০৭১।১৬৮।৮৩৩

(ক) ব্রাহ্মণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কামার, ধোপা, কাওরা, ও মুচি। গ্রামে দশটি পাড়া আছে। যেমন—হালদারপাড়া, সর্দারপাড়া, মণ্ডলপাড়া, পুরকাইতপাড়া, কামারপাড়া, ধোপাপাড়া, বেনেপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে লক্ষ্মীকান্তপুর রেলস্টেশন। স্টেশন হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। বর্ষাকালে শালতিতে যাতায়াত করা সম্ভব।

(ঘ) গ্রামে হালদারদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দিরে গোপীনাথবল্লভের দারুময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা ও ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত, মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে স্থানীয় বিদ্যালয়ে সরস্বতীপূজা হইয়া থাকে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে কালী, চণ্ডী ও বিশ্বকর্মা ব্যতীত তিনটি পঞ্চানন্দ, দুইটি বাবাঠাকুর, দুইটি শীতলা, এগারটি মনসা,

একটি নারায়ণী ও একটি পীরের স্থান আছে। বৎসরের বিভিন্ন সময় ঐ সকল দেবদেবীর মানত পূজাদি হইয়া থাকে। মনসার নিকট হাঁস এবং পঞ্চানন্দ, কালী ও নারায়ণীর নিকট পাঁঠাবলি মানত দেওয়া হয়।

শ্রীঅজিত কুমার হালদার, প্রধান শিক্ষক,
বিদ্যাধরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ঘাটেশ্বর, ২৪-পরগণা।

৩। গ্রাম : পূর্ব গোপালনগর।

১০১।৪০১'৫৮।৪৩৭।২,০৫১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, গোপ, কুমার, স্বর্ণকার, নাপিত, কাওরা, মুচি ও মুসলমান। গ্রামে এগারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মথুরাপুর রোড হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। গ্রামের পূর্ব সীমানায় জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়া মোটরবাস এবং খাল দিয়া নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ গোষ্ঠ উৎসব এবং বৈশাখী পূর্ণিমাতে ধর্মরাজপূজা উপলক্ষে চড়ক অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মরাজপূজাটি এই গ্রামের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব উৎসব। উৎসব দুইটিই বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ গোষ্ঠ উপলক্ষে এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজপূজা উপলক্ষে উৎসব প্রাঙ্গণে কয়েকটি ময়রা, তেলেভাজা ও মনিহারী দ্রব্যের দোকান বসে।

(চ) গ্রামে তিনটি পঞ্চানন্দ, শীতলা ও মনসা আছে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র হালদার, শিক্ষক,
গ্রাম : পূর্ব-গোপালনগর,
পোঃ দক্ষিণ বিষ্ণুপুর, ২৪-পরগণা।

৪। গ্রাম : পূর্ব বিষ্ণুপুর।

২০৯।১,৪০৬'৬০।৯১৪।৪,৭৫৬

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ ও কাওরা। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, মাহিষ্য-পাড়া ও কাওরাপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন মথুরাপুর রোড। গড়িয়া হইতে ৮০ নং মোটরবাসে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, পৌষ মাসে পৌষপার্বণ, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব এবং গঙ্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পৌষপার্বণ ও দোলযাত্রা উৎসব সর্বজনীন এবং শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) পৌষপার্বণের মেলা। পৌষ মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি দোলমন্দির আছে। তাহা ছাড়া, তিনটি শিবের, তিনটি পঞ্চানন্দের, একটি বাবাঠাকুরের, পাঁচটি শীতলার এবং পাঁচটি মনসার স্থান আছে।

শ্রীদ্বিজেন চক্রবর্তী,
পূর্ব বিষ্ণুপুর, ২৪-পরগণা।

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত মন্দিরবাজার ও জগদীশপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ ও মেলা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

মন্দিরবাজার

শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর রেলপথে মথুরাপুর রোড স্টেশন হইতে প্রায় ছয় মাইল পশ্চিমে মন্দিরবাজার গ্রামটি অবস্থিত। রেলস্টেশন হইতে অথবা গড়িয়া হইতে বিষ্ণুপুর হইয়া মোটরবাসে সরাসরি মন্দিরবাজারে যাতায়াত করিতে পারা যায়। গ্রামে যাতায়াতের রাস্তাটি পাকা এবং ইহার পাশ দিয়া একটি সংকীর্ণ খাল মন্দিরবাজার অবধি গিয়াছে। ১৯৬২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত মন্দিরবাজারেই একটি থানা স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামে হাটের মধ্যস্থলে সুবৃহৎ কেশবেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত থাকায় এই স্থান মন্দিরবাজার নামে খ্যাত হয়। ১৬৭০ শকাব্দে কেশব চন্দ্র রায়চৌধুরী নিজের নামেই কেশবেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বলা হয়, কেশব চন্দ্র রায়চৌধুরী সুন্দরবন অঞ্চলে একজন ভূঁইয়া রাজা ছিলেন এবং

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত সরিষার নিকটবর্তী পাটদহ মুড়াগাছা গ্রামে বসবাস করিতেন। পাটদহে তাঁহার বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলীনিরূপে পটেশ্বরী মাতা প্রতিষ্ঠিত আছেন।

কেশবেশ্বর মন্দিরটি ইষ্টক নির্মিত এবং দক্ষিণমুখী। মন্দিরটি আটচালা গঠনে নির্মিত হইলেও সাধারণ রীতি অনুযায়ী ইহার নীচের চালাগুলি মূল মন্দিরঘরের দেওয়াল-গাত্র সংযুক্ত হইয়া সরাসরি না নামিয়া মন্দিরের চারিদিকের বারান্দার উপর সমতল ছাদ সৃষ্টি করিয়া চালা আকারে নামিয়াছে। সমতল হইতে সুউচ্চ রোয়াকের উপর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। ইহার চারিদিকে রোয়াক এবং পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে বারান্দাসংযুক্ত। দক্ষিণদিকে অনেকগুলি সোপান বাহিয়া মন্দিরে আরোহণ করিতে হয়। মন্দিরের চূড়ায় ত্রিশূলযুক্ত কলস এবং পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণদিকের দেওয়ালগাত্রে সুন্দর পোড়ামাটির শিল্পদ্বারা অলঙ্কৃত।

ইহার দেওয়ালগাত্রে মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিম্নলিখিত লিপি উৎকীর্ণ আছে—

"আকাশাব্দি রসঃ ক্ষৌণীমিতে শাকে শিবালয়ং।
ভূপঃ শ্রীকেশবোকার্ষীদ্বাসুদেবেন শিল্পিনা॥"

দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এইরূপ সুবিশাল আটচালা মন্দির দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে আর দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে স্থানীয় গ্রামবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতায় মন্দিরটি বিশেষভাবে সংস্কার করা হইয়াছে। যদিও মন্দিরটি অদ্যাপি বেশ সুগঠিত আছে, তথাপি স্থানীয় লোকেরা বলেন যে, ইহা ধীরে ধীরে ভূগর্ভে বসিয়া যাইতেছে এবং ইহার অনেকগুলি সোপান ইতিমধ্যে মাটির নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

মন্দিরাভ্যন্তরের মেঝে শ্বেত প্রস্তর মণ্ডিত এবং একটি অষ্টকোণাকৃতি বেদীর উপর প্রায় আড়াই ফুট উচ্চ উত্তর-দিকে প্রসারিত গৌরীপট্ট-সংযুক্ত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবলিঙ্গের গায়ে রৌপ্য নির্মিত চক্ষু গ্রথিত আছে এবং উহাকে বেষ্টন করিয়া রৌপ্য নির্মিত একটি সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেত প্রস্তর নির্মিত প্রায় দেড় ফুট উচ্চ উক্ত বেদীটি রামব্রহ্ম সর্দার ও তাঁহার পত্নী শিবরাণী দেবী কর্তৃক নির্মিত। ইহা ভিন্ন, মন্দির অভ্যন্তরে পাঁচটি প্রস্তর নির্মিত খণ্ড আছে।

জনশ্রুতি রাজা কেশব এক স্বপ্নাদেশ অনুসারে কাশী-ধামের গঙ্গাগর্ভে শিবলিঙ্গ পাইয়া সেখান হইতে বায়ু পথে রাতারাতি উক্ত শিবলিঙ্গ আনিয়া এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। আরও বলা হয় যে, কেশবেশ্বরের এই সুবিশাল মন্দিরটি নিকটবর্তী রামচন্দ্রপুর গ্রামে জনৈক ময়রার গৃহে ভৃত্যরূপে পালিত দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার প্রিয় পাত্র কৈবর্ত সম্প্রদায়ভুক্ত বাসুদেব নামে জনৈক মিস্ত্রী কর্তৃক নির্মিত এবং দৈবাদেশেই মন্দির অভিষেক উৎসবের পৌরহিত্য করেন বোলসিদ্ধি গ্রামের বাণেশ্বর ন্যায়রত্ন মহাশয়। এই অভিষেক অনুষ্ঠানে বঙ্গদেশের তৎকালীন শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বহু পণ্ডিতদিগকে আমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল। এমন কি হালি-শহরের মাতৃসাধক রামপ্রসাদ সশরীরে উপস্থিত হইতে না পারিয়া ভাব শরীরে এই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন বলিয়াও জনশ্রুতি আছে।

কেশবেশ্বর শিবের যথারীতি নিত্য সেবাপূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে মহাধূমধামের সহিত গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসর ১৬ই চৈত্র মন্দিরে পাঁচটি ডাবসহ পঞ্চঘট স্থাপন করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে গাজন উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। ২৬শে দুইজন মূল সন্ন্যাসীসহ অন্যান্য ব্যক্তিদের শিব গোত্রান্তরিত করিয়া গলায় শিবের নিকট উৎসর্গকৃত উত্তরীয় এবং হাতে বেতের ছড়ি ও ত্রিশূল দিয়া গাজন সন্ন্যাসীরূপে ব্রত পালনের অধিকার দেওয়া হয়। সর্বসম্প্রদায়ের লোকজনই সন্ন্যাসব্রত পালন করিতে পারেন। ২৬শে ভিন্ন ২৭শে তারিখেও সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করা চলে। ডায়মণ্ডহারবার ও সদর মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন থানা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার নরনারী সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। বর্তমানে শ্রীহারাণ পুরকাইত ও শ্রীফটিক পুরকাইত মূল সন্ন্যাসীর কার্য করিতেছেন। এই পরিবার হইতে মাত্র গত দুই পুরুষ ধরিয়া মূল সন্ন্যাসী হইতেছে।

উৎসবকালে যথারীতি হোম-যজ্ঞসহ সাড়ম্বরে শিবপূজা ব্যতীত ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে তারিখে রাত্রিকালে শিবের নিকট পরমান্ন ভোগ নিবেদন করিয়া উহা বাজনা-

বাদ্য সহকারে মন্দিরের পশ্চিমদিকে 'শিবগঙ্গা' নামক পুষ্করিণীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। ২৮শে তারিখে সন্ন্যাসীদের 'ঝাঁপ' পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন বিভিন্ন স্থান হইতে অগণিত গাজন সন্ন্যাসী ঢাক-ঢোলের বাজনাসহ মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হন। 'ঝাঁপ' পর্বের পূর্বে শিবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া কেশবেশ্বর শিব-লিঙ্গের মস্তকোপরি ফুল-বিল্বপত্র স্থাপন করা হয়। কথিত আছে, এই সময় হর-পার্বতী শঙ্খচিলের রূপ ধারণ করিয়া মন্দিরের চূড়ায় আসিয়া বসেন। ইহার পর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রার্থনারত পুরোহিতের হাতে উক্ত বিল্বপত্রাদি আপনি ঝরিয়া পড়িলে শিবের আশীর্বাদস্বরূপ ঐ বিল্বপত্র মূল সন্ন্যাসী মস্তকে ধারণ করিয়া প্রথম পাট ফুলের (লোহার কাটা বিশেষ) উপর ঝাঁপ দেন। ইহার পর অন্যান্য সন্ন্যাসীদের 'ঝাঁপ' পর্ব শুরু হয়।

২৯শে অর্থাৎ সংক্রান্তির পূর্বদিন নীলপূজা উপলক্ষে সন্ধ্যাকালে গাজন সন্ন্যাসী ভিন্ন প্রায় সাত-আট হাজার গৃহস্থ নরনারী মন্দিরে নীলের বাতি দিতে আসেন। এই দিন ঢাক-ঢোলের আওয়াজে, গাজন সন্ন্যাসীদের মুহুর্মুহুঃ শিবের জয়ধ্বনিতে এবং অগণিত দর্শকের কলরবে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। শোনা যায়, এই সময় শিবলিঙ্গ হইতে এক দিব্য জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইয়া মন্দিরে পূজারত পুরোহিতের দেহোপরি আসিয়া পড়ে। অনেকে এইরূপ জ্যোতি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন। রাত্রিকালে লীলাবতীর বিবাহঘটিত পূজাদি হয়। ইহা ভিন্ন, এইদিন মন্দিরে 'দুধপোতা' নামে একটি অনুষ্ঠান হয়। বন্ধ্যা নারী সন্তান কামনায় মাটির পাত্রে কাঁচা গোদুগ্ধ আনিয়া শিবের নিকট নিবেদন করেন এবং পুরোহিত উহা শিবের নিকট উৎসর্গ করিয়া মন্ত্রাভিষিক্ত করিয়া দেন। বিশ্বাস পরের দিন ঐ দুগ্ধ আপনা হইতেই উথলাইয়া উঠিলে সন্তানলাভ অবশ্যম্ভাবী। এই 'দুধপোতা' অনুষ্ঠান কেবলমাত্র নীলপূজার রাত্রেই অনুষ্ঠিত হয়।

৩০শে চৈত্রসংক্রান্তি তিথিতে গাজন সন্ন্যাসীরা শিবের নিকট ষোড়শোপচারে পূজাদি দিয়া 'আগুন ঝাঁপ' পর্ব পালন করেন এবং ইহার পর শিবগঙ্গায় উত্তরীয় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত হইতে মুক্তিলাভ করেন। ১লা বৈশাখ প্রাতঃকালে মূল সন্ন্যাসী গাজন উপলক্ষে স্থাপিত পঞ্চঘট বিসর্জন দিবার পর এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

কেশবেশ্বর শিব বিশেষ জাগ্রত দেবতা বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। ইঁহার মাহাত্ম্য সম্পর্কে এই অঞ্চলে নানাপ্রকার কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ এক কিংবদন্তী অনুসারে বলা হয় যে, একদা জনৈক মুসলমান চাষী শিবমন্দিরে দুধ দিয়া পূজা দিতে আসিলে পুরোহিত তাহার পূজা প্রত্যাখ্যান করেন ; কিন্তু ভক্তের মনোবেদনায় কাতর হইয়া পথে শিবঠাকুর মানবদেহ ধারণ করিয়া মুসলমানের পাত্র হইতে স্বয়ং দুগ্ধ পান করেন। যক্ষ্মা, হাঁপানী, শূল বেদনা, বন্ধ্যাত্ব খণ্ডন প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিরাময়ের জন্য প্রতিদিন মন্দিরে বহু নরনারী শান্তি-স্বস্ত্যায়ণ করেন বা দৈব কবচাদি ধারণ করেন। বিশেষতঃ সোমবারে ও শুক্রবারে মানতকারীদের অধিক সমাগম হয়। সাধারণতঃ অর্থ, বস্ত্র, অলঙ্কার, সিদ্ধি, কলিকাসহ গঞ্জিকা ইত্যাদি মানত করা হয়। চক্রবর্তী পদবীধারী মৈত্রায়ণ গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণগণ শিবের নিত্য পূজাদি করেন। নিত্য পূজাদির জন্য দেবোত্তর প্রায় বাহান্ন বিঘা জমি আছে। বাসকহরিরূপে স্থানীয় প্রামাণিকেরা মন্দির ও পূজার তৈজসপত্রাদি পরিষ্কার করেন এবং শিবপূজার প্রয়োজনীয় ফুল-বিল্বপত্রাদি সরবরাহ করিয়া থাকেন। বর্তমানে মন্দিরের ঢাকি শ্রীকার্ণ দাস। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে কেশবেশ্বর শিবমন্দিরে ঢাক বাজাইয়া থাকেন। এই কারণে তাঁহাদিগকে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি দান করা হইয়াছে। কৃষ্ণদেবপুরের শ্রীমতি সরলা দেবী, শ্রীকৃষ্ণ চরণ রায় এবং মল্লিকপুরের শ্রীবসন্ত কুমার ধর প্রমুখেরা বর্তমানে কেশবেশ্বর মন্দিরের সেবায়েত।

১লা বৈশাখ অপরাহ্নে কেশবেশ্বর শিবমন্দির প্রাঙ্গণে মহাধূমধামের সহিত গোষ্ঠবিহার উৎসব ও তদুপলক্ষে একটি মেলা বসে। আশপাশের প্রাণবল্লভপুর, শিবপুর, আঁচনা, বিদ্যাধরপুর, মল্লিকপুর ও ধনঞ্জয়পুর গ্রামের হালদারদিগের ; শঙ্করপুর গ্রামের পুরকাইতদিগের ; চৌঘরি গ্রামের হালদার ও মণ্ডলদিগের ; রামনাথপুর গ্রামের নস্কর ও সর্দারদিগের ; ছকুরহাট গ্রামের সর্দারদিগের ; দুলালপুর গ্রামের ভট্টাচার্যদিগের এবং পার্শ্ববর্তী জগদীশপুর গ্রামের হালদার, পুরকাইত ও নস্করদিগের গৃহে পূজিত বিভিন্ন

নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি বাজনা-বাদ্যসহ সাড়ম্বরে শোভাযাত্রা করিয়া গোষ্ঠবিহার উৎসবে যোগদান করেন এবং কেশবেশ্বর মন্দির চত্বরে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে উল্লিখিত বিগ্রহাদির যথারীতি পূজা ও আরতির পর রাত্রিকালে পুনরায় শোভাযাত্রা করিয়া নিজ নিজ মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। পূর্বে এই উৎসবে আরও ধুমধাম হইত এবং বিভিন্ন পল্লীর গৃহস্থদের গৃহ হইতে শতাধিক রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ আসিত। গোষ্ঠ উৎসবের পূর্ব আড়ম্বর না থাকিলেও অদ্যাপি প্রায় পনর সহস্র নরনারী ইহাতে যোগদান করিয়া থাকেন এবং সন্ধ্যাকালে প্রচুর টাকার আতশবাজি পোড়ান হয়। মন্দিরবাজারে গোষ্ঠবিহার উৎসবে জগদীশপুরের নস্করদিগের কুলদেবতা দারুনির্মিত মদনমোহন বিগ্রহই প্রধান দেবতারূপে সম্মানিত হইয়া থাকেন। এইদিন নস্কর মহাশয়ের গৃহে একটি পিতলের কলস পূজা করিবার পর মদনমোহন বিগ্রহকে লইয়া খোল-করতালের বাজনাসহ শোভাযাত্রা করিয়া গোষ্ঠবিহারে যাত্রা করেন। গোষ্ঠ-বিহার যাত্রাকালে মদনমোহন বিগ্রহের নাম পরিবর্তন করা হয়; তখন তিনি 'শ্যামরায়' বিগ্রহ নামে খ্যাত হন। শ্যামরায় গোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলে পর অন্য কোন বিগ্রহকে আর গোষ্ঠ উৎসবে যোগদান করিতে দেওয়া হয় না। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মুসলমান যুগে দক্ষিণবঙ্গে রামচন্দ্র খাঁ নামে জনৈক ক্ষত্রিয় সামন্ত রাজা ছিলেন। ইনিই ছত্রভোগ হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীক্ষেত্র গমনে ব্যবস্থা করিয়া দেন। জগদীশপুরের নস্করেরা রামচন্দ্র খাঁর জ্ঞাতি তথা দেওয়ান বংশ বলিয়া প্রবাদ আছে এবং এই কারণে তাঁহার স্থানীয় সামাজিক অনুষ্ঠানে অদ্যাপি সম্মানচিহ্নস্বরূপ মালা-চন্দন পাইয়া থাকেন। শোনা যায়, রামচন্দ্র খাঁ গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে উল্লিখিত সম্মানসূচক পিতলের কলস পাইয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রাজস্থানের রাণা প্রভৃতি কতিপয় ক্ষত্রিয় বংশের পূর্বপুরুষদিগের নিকট সম্মানসূচক পিতলের কলস থাকিত এবং সেই প্রথা অনুসারেই রামচন্দ্র খাঁর নিকট উক্ত সম্মানসূচক কলস ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

জগদীশপুর

মন্দিরবাজার সংলগ্ন জগদীশপুর মৌজার অন্তর্গত হাউড়ির হাট নামে একটি প্রাচীন হাট আছে। কথিত আছে, হাউড়ি নামে জনৈক মহিলা কর্তৃক প্রায় তিন শতাধিক বৎসর পূর্বে এই হাট স্থাপিত হয়। ইহা নিতান্তই জনশ্রুতি মাত্র, ইহার সমর্থনে কোনরূপ তথ্য পাওয়া যায় না। তবে হাউড়ির হাট প্রাচীন এবং এই অঞ্চলে একটি বড় ও প্রসিদ্ধ হাটরূপে পরিচিত ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্থানীয় বৃদ্ধেরা কথার কথা হিসাবে বলেন যে, আগে এই অঞ্চলে বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে তিথি-নক্ষত্র দেখিবার জন্য পঞ্জিকার প্রয়োজন হইত না; বৃহস্পতিবার হাউড়ির হাট, অতএব শুক্রবার বিবাহের দিন স্থির করা হইত। প্রাচীন দলিলপত্রে পুরাতন হাউড়ির হাটের সীমানা প্রায় উনত্রিশ বিঘা সাড়ে এগার কাঠা নিস্কর লাখেরাজ সম্পত্তিরূপে উল্লেখ আছে। বর্তমানে মাত্র এক বিঘা জমির উপরে প্রতি বৃহস্পতিবার ও রবিবার হাট বসিতেছে। হাউড়ির হাট সীমানার মধ্যে একটি বিদ্যালয়, দুইটি প্রাচীন শিবমন্দির এবং 'ভট্টাচার্যপুকুর' নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। ভট্টাচার্য পুষ্করিণী খুবই প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহার চারিপাশের পাড় ভাঙ্গিয়া পাশের জমির সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। ইহার পূর্বপাড়ে প্রশস্ত বাঁধান ঘাটটি পুরাতন পাতলা ইষ্টক দ্বারা নির্মিত। উল্লিখিত রেখ দেউলাকৃতি সুবৃহৎ শিবমন্দির দুইটির মধ্যে বর্তমানে একটি মন্দির কয়েক বৎসর হইল সম্পূর্ণই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত পদ্মখচিত কৃষ্ণ প্রস্তরের আসনের উপর প্রায় আড়াই হাত উচ্চ কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গটিকে বর্তমানে একটি নবনির্মিত ঘরে স্থাপন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্দিরটিতে অদ্যাপি অনুরূপ একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির সংস্কারের সুবিধার জন্য উক্ত শিব মন্দিরের সুউচ্চ চূড়া হইতে একটি মোটা লোহার শিকল প্রলম্বিত আছে। শিবমন্দির দুইটি যে খুবই প্রাচীন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে কাঁহার দ্বারা এবং

ঠিক কবে যে মন্দির দুইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে বলা সম্ভব না হইলেও ইহারা মন্দিরবাজারের কেশবেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। হাউড়ির হাটের স্বত্বাধিকার বহুবার হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে নানা মামলা-মোকদ্দমাও হইয়াছে। প্রাচীন নথীপত্রে দেখা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে হাউড়ির হাট সম্পত্তি বাবদ টাকা ১,৩৫৫।৷০ "সায়ের কম্পেনসেশন" ধার্য করা হইয়াছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের এক মামলায় হাউড়ির হাটকে "Rent free property" বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। যতদূর জানা যায় কলিকাতার হাট-খোলার 'দত্ত পরিবার' তাঁহাদের 'গুরু বংশ' আহিরী-টোলার ভট্টাচার্যদিগকে (বলরাম ভট্টাচার্য) হাউড়ির হাট ও তৎসংলগ্ন শিবমন্দিরের নিত্য সেবা-পূজার জন্য দান করেন। অনেকে অনুমান করেন, হাটখোলার দত্তরাই উক্ত শিব মন্দিরদ্বয় প্রতিষ্ঠা করেন। দত্ত পরিবারের মদনমোহন দত্ত মহাশয় উক্ত দেবসেবার নিমিত্ত প্রায় দুইশত বিঘা জমি দান করেন। ঐ দেবোত্তর জমি বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে পড়িয়াছে। 'রোড সেস' কর বাকী পড়ার দায়ে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ৩রা এপ্রিল আদালতের এক রায়ে আহিরীটোলার ভট্টাচার্যদিগের নিকট হইতে নীলামে কলিকাতার খিদিরপুরের মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা (চন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও দময়ন্তী দেবী) মাত্র ৩০৫৲ টাকায় হাউড়ির হাট সম্পত্তি ক্রয় করেন। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে খিদিরপুরের মুখোপাধ্যায়দিগের নিকট হইতে স্থানীয় জগদীশপুরের নস্করেরা হাউড়ির হাটের 'মৌরশী পাট্টা' গ্রহণ করেন। তদবধি এই নস্কর পরিবারই হাউড়ির হাটের খাজনা আদায় করিতেছেন এবং শিবের সেবায়েতরূপে কার্য পরিচালনা করিতেছেন। নিকটবর্তী কৃষ্ণদেবপুরের চক্রবর্তীরা (বর্তমানে শ্রীজহর চক্রবর্তী) মাসিক বেতনে শিবের নিত্য পূজাদি করিতেছেন।

ইহা ভিন্ন, জগদীশপুর গ্রামে নস্করদিগের আরাধিত জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বিগ্রহদিগকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও তদুপলক্ষে সপ্তাহ-ব্যাপী একটি মেলা বসে। রথযাত্রা উৎসবটি প্রায় আশি বৎসরের প্রাচীন। নস্করদিগের উল্লিখিত বিগ্রহাদি স্থানীয় শ্রীবরদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তথায় নিত্য পূজাদি হয়। উৎসব-কালে খোল-করতালের বাজনাসহ উক্ত বিগ্রহাদি একটি বৃহৎ কাষ্ঠ নির্মিত রথে স্থাপন করিয়া রথ টানা হয়। এই উৎসব ও মেলায় প্রতি বৎসর প্রায় দশ-বার হাজার নরনারী যোগদান করেন এবং বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে। পূর্বে জগন্নাথদেবের পৃথক রথ বাহির হইত। প্রায় বিশ বৎসর হইল জগন্নাথের রথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নস্করদিগের অবস্থা হীন হইয়া পড়ায় পূর্বের ন্যায় রথযাত্রা উৎসবের সমারোহ হয় না। ইঁহাদের গৃহে প্রতি বৎসর শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

হাউড়ির হাট বিদ্যালয়ের পশ্চাতে ডায়মণ্ডহারবার-রায়দীঘি রোডে দক্ষিণ ধারে টালীর চালাযুক্ত একটি পাকা ঘরে বিবিমার প্রতীকস্বরূপ আটটি মাটির ঢিবি বা স্তূপ আছে। তাহা ছাড়া, এই ঘরে শ্মশ্রুধারী জুতো ও মোজা পরিহিত অশ্ববাহন গাজী সাহেব এবং ক্রোড়ে শিশুসহ পা-মুড়িয়া উপবিষ্টা কয়েকটি বিবিমার শলন মূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরবাজার-মল্লিকপুর নিবাসী শ্রীচাদের ফকির বর্তমানে বিবিমার খাদেম। প্রতি বৎসর মাঘ-ফাল্গুন মাসে বিবিমার নিকট হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকজন 'মাঙ্গন পূজা' দিয়া থাকেন। বিবিমার মন্দিরের পাশেই একটি পুষ্করিণীর ধারে অনুরূপ আরেকটি ঘরে মৃন্ময় কালী মূর্তিসহ মনসা এবং যজ্ঞোপবীতধারী ত্রিনয়ন রক্তবর্ণ পঞ্চাননের দণ্ডায়মান মূর্তি আছে।

মেলা বিবরণী

গোষ্ঠযাত্রার মেলা

সিদ্ধেশ্বরপুর গ্রামে প্রতি বৎসর একযোগে গাজন ও গোষ্ঠযাত্রা উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় পুরকাইতদের ঠাকুর-বাড়ী প্রাঙ্গণে ১লা বৈশাখ হইতে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় নবীনাথপুর, কলারচক, বাহাদুরচক, রামনগর, চকসুবুদ্ধিপুর, পাঁচনা, ধনুরহাট, খোদসদাশিবপুর, রামচন্দ্র-পুর, কলিঙ্গ, শিবপুর, নীলাম্বরপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পাচশত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকানপাট বসে এবং পাঁচ-সাতজন ফেরিওয়ালা আসেন। উহার মধ্যে প্রায় ত্রিশটি ময়রা, তেলেভাজা, আইস্ক্রীম প্রভৃতি খাবারের দোকান। ইহা ব্যতীত, মনিহারী দোকান, লোহার বাসনপত্রের দোকান, মিল ও তাঁতের কাপড়, কাটাকাপড়, গামছার দোকান; লাঙ্গল, কাস্তে, কোদাল, কুড়াল, ছুরি, কাঁচি, বঁটি, বেড়ি, হাতা প্রভৃতি কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, বাঁশের ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলো ইত্যাদির দোকান, মাটির পুতুল, খেলনা ও হাঁড়ি-কলসীর দোকান, জুতা ও বই-ছবির দোকান বসে। তাঁতের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রধানতঃ নবীনাথপুর, সিদ্ধেশ্বরপুর, রামনগর, শিবপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে; বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র কলিঙ্গ, পাচনা প্রভৃতি গ্রাম হইতে এবং মাটির তৈয়ারী জিনিসপত্র গাববেড়িয়া, তাঁতিরহাট প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় আসিয়া থাকে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচ, জুয়াখেলা, কবিগান এবং থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়। গদা-মথুরাপুর, কয়েমুড়ি, চাউলগোলা প্রভৃতি গ্রাম হইতে যাত্রার দল এবং রাঙ্গাবেড়িয়া, শ্যামবসুরচক, আঁকড়া-বেড়িয়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে পুতুলনাচের দল আসে। কোন কোন বৎসর মেলায় ম্যাজিক ও সার্কাসের দল আসে। গ্রামে একটি সঙের দল আছে। সহস্রাধিক নরনারী এই সকল আমোদপ্রমোদে যোগদান করিয়া থাকেন।

পৌষপার্বণের মেলা

পূর্ব বিষ্ণুপুর গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে পৌষপার্বণ উপলক্ষে নিকটবর্তী গঙ্গার তীরে তিনদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং হাওড়া ও হুগলী জেলা হইতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বহু নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ প্রধানতঃ মোটরবাস, রিক্সা, ট্রেনে করিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন। দোকানপাট বসে প্রায় তিনশত এবং ফেরিওয়ালা আসে প্রায় পঞ্চাশজন। দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, মিষ্টান্ন, তামা, পিতল, কাঁচের জিনিসপত্র প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই অধিক। তাহা ছাড়া, মনিহারী, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, শিল্পসামগ্রী প্রভৃতির দোকানপাটও বসে।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ মামুদপুর। ৯।৩৮৭'৯৩।২৬৮।২,৫৯৩

(ক) বাগ্দী, বৈরাগী, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, তাঁতী, নাপিত, কাওরা, ব্রাহ্মণ, ডোম ও মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) কলিকাতা হইতে ফলতা পর্যন্ত মোটরবাস চলাচল করে। হুগলী নদী দিয়া নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে চারদিনব্যাপী ধর্মরাজঠাকুরের সাড়ম্বরে পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মাটির দেওয়াল ও খোলার ছাউনীযুক্ত সাধারণের একটি দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রস্তর খণ্ডকে ধর্মরাজ জ্ঞানে পূজা করা হয়। ধর্মরাজপূজা উপলক্ষে ভক্তরা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। উৎসবের সময় সন্ন্যাসীরা মন্দিরের সম্মুখে ধর্মরাজের নামে 'বঁটি ঝাঁপ' দিয়া থাকেন। ধর্মরাজের সেবায়েত ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত, ইঁহারা কাশ্যপ গোত্রীয় এবং পণ্ডিত পদবীধারী। ভক্তরা ধর্মরাজের মন্দিরে দণ্ডী খাটা ও মাথার উপর আগুনের মালসা স্থাপন করিয়া ধুনা পোড়ান ইত্যাদি মানত করিয়া থাকেন। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন এবং এই অঞ্চলের সর্বজনীন উৎসব।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে চারদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ধর্মরাজের মন্দির ব্যতীত চারটি পঞ্চানন্দ ও দুইটি পীরের স্থান আছে।

শ্রীঅবনী ভূষণ নন্দী, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ শ্রীবল্লভপুর, পোঃ বুড়ুল,
২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ পদ্মপুর। ১৪।১৯৯'৬৭।১৭০।৮০২

(ক) মাহিষ্য ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কলিকাতা হইতে মোটরবাসে ফলতা নামিয়া সেখান হইতে হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ হইতে সপ্তাহব্যাপী গঙ্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন ও বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) গঙ্গাপূজার মেলা। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ হইতে সপ্তাহব্যাপী। মেলাটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) ×

শ্রীগৌরহরি মিত্র, গ্রামসেবক,
ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিস, ফলতা,
২৪-পরগণা।

৩। গ্রাম ঃ সহরা। ২৩।৩২২'৩'১৬।৩৫০।১,৯০০

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, বাগ্দী, কাওরা, কোরেঙ্গা, যোগী, কলু, ধোপা, নাপিত। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কলিকাতা হইতে মোটরবাসে ফলতা নামিয়া সেখান হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে একটি স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির আটদিন পূর্ব হইতে ১লা বৈশাখ পর্যন্ত সাড়ম্বরে সর্বজনীন চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে 'বঁটি ঝাঁপ', 'কাঁটা ঝাঁপ', 'কালকে-পাতারীনাচ' (অবিরাম নৃত্য) অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। গাজনের মূল সন্ন্যাসী শ্রীসুধীর চন্দ্র দলুই, সেবায়েত শ্রীবীরেন্দ্র নাথ হালদার এবং পূজারী শ্রীজীতেন্দ্র নাথ শিরাণী।

(ঙ) চড়কের মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তি হইতে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিব ও একটি কালী মন্দির ব্যতীত পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, শীতলা, তিনটি মনসা ও তিনটি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তি আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন বর্মন, চাকুরী,
ফলতা স্টেজ ১নং ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিস,
২৪-পরগণা।

৪। গ্রাম ঃ জগন্নাথপুর। ২৭৷২২৯৭৪৷১১৭৷৭৩০

(ক) ব্রাহ্মণ, কাওরা ও সদ্‌গোপ সম্প্রদায়। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) কলিকাতা হইতে ফলতা পর্যন্ত মোটরবাস চলাচল করে। নিকটবর্তী পি. ডব্লু. ডি.-র রাস্তা হইতে একটি কাঁচা রাস্তা গ্রামের মধ্যে গিয়াছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে স্নানযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) স্নানযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন একটি পঞ্চাননের স্থান আছে। পঞ্চাননঠাকুর জাগ্রত দেবতা বলিয়া বিশ্বাস। সপ্তাহের প্রতি শনি-মঙ্গলবার পঞ্চাননের স্থানে মানসিক পূজা দিতে আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু লোক আসেন এবং পূজা প্রাঙ্গণে খাবার, মনিহারী, মাটির খেলনা-পুতুল ইত্যাদি জিনিসপত্রের অনেকগুলি দোকানপাট বসে।

শ্রীমনোরঞ্জন বর্মন, চাকুরী,
ফলতা স্টেজ ১নং ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস,
২৪-পরগণা।

৫। গ্রাম ঃ বেলসিংহা। ২৮৷২৭৬৬৮৷৩০৷২,২৬১

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, স্বর্ণকার, বাগ্দী ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও মজুরী।

(গ) ফলতা হইতে পি. ডব্লু. ডি.-র রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় আশী বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় আশী বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি পঞ্চানন, একটি শীতলা এবং একটি মনসা আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন বর্মন, চাকুরী,
ফলতা স্টেজ ১নং ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস,
২৪-পরগণা।

৬। গ্রাম ঃ রসুলপুর। ৪৩৷৩৬০৫৷২৩৫৷১,৩৪৭

(ক) কায়স্থ, মাহিষ্য, বাগ্দী, কাওরা, যুগী, স্বর্ণকার, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও মুসলমান। গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী, মজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে তিন-দিনব্যাপী সাড়ম্বরে গোষ্ঠ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গোষ্ঠযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে লক্ষ্মীজনার্দ্দন, সত্যনারায়ণ, শিব, বাবাঠাকুর, পঞ্চানন্দ, শীতলা ও মনসা আছে। বৈশাখ মাসের যে-কোন একদিন পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, মনসা ও শীতলার একযোগে পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীমনোরঞ্জন বর্মন, চাকুরী,
ফলতা স্টেজ ১নং ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস,
২৪-পরগণা।

৭। গ্রাম ঃ দলুইপুর। ৫৪৷২৪৪৫৩৷১১৫৷৬৫০

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কায়স্থ, ধোপা। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের অতি নিকটেই ফলতাগামী বাস রাস্তা। ফলতা রাস্তা দিয়া মোটরবাসযোগে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। ফলতা রোড হইতে একটি রাস্তা বাহির হইয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা ব্যতীত কার্তিক পূর্ণিমা হইতে সপ্তাহব্যাপী রাধাকৃষ্ণের রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন। রাস উৎসবটি প্রায় কুড়ি বৎসরের প্রাচীন। শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে কয়েকটি দোকান-পাট বসে।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে রাসপূর্ণিমা হইতে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি মাত্র কুড়ি বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি পঞ্চানন্দ ভিন্ন শীতলা ও মনসা আছে এবং রাস উৎসবের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীজ্যোতি প্রকাশ নস্কর, শিক্ষক,
গ্রাম : দলুইপুর, পোঃ চাঁদপাল,
২৪-পরগণা।

৮। গ্রাম : কুখিয়া। ৬১।১৬৭'৩৬।১২৯।৭৫৫

(ক) মুসলমান। গ্রামে মল্লিকপাড়া, শেখপাড়া, মোল্লাপাড়া নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও তাঁত ব্যবসায়।

(গ) একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং আশপাশের গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় ইহাতে যোগদান করেন।

(ঙ) মহরমের মেলা। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীবিষ্ণুপদ মুখার্জী, গ্রামসেবক,
পশ্চিম গোপালপুর ইউনিয়ন,
পোঃ মহিরামপুর, ২৪-পরগণা।

৯। গ্রাম : দোস্তপুর। ৮৫।২০৬'৬৫।১৮০।১,০০১

(ক) ব্রাহ্মণ ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণপাড়া, বিশ্বাস-পাড়া, মণ্ডলপাড়া প্রভৃতি নামে গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ডায়মণ্ডহারবার। গ্রামটি ডায়মণ্ডহারবার রোডের পাশেই অবস্থিত বলিয়া কলিকাতা হইতে মোটরবাসেও যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ তারিখে গঙ্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে অস্থায়ী মণ্ডপে ভগীরথ ও জহ্নুমুনিসহ হাঙ্গরবাহিনী গঙ্গাদেবীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করা হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন এবং সর্বজনীন।

(ঙ) গঙ্গাপূজার মেলা। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ হইতে চার-পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মনসা, শীতলা, পঞ্চানন ও বিবিমার স্থান আছে।

শ্রীবসন্ত কুমার কয়াল, প্রধান শিক্ষক,
দোস্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সাহাপুর, ২৪-পরগণা।

১০। গ্রাম : কোদালিয়া। ৮৭।১৮৭'১৪।১৬৫।৯৫৭

(ক) ব্রাহ্মণ ও মাহিষ্য। ব্রাহ্মণপাড়া, মাহিষ্যপাড়া ও ভট্টপাড়া নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও কুটীর শিল্প।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ডায়মণ্ডহারবার। কলিকাতা হইতে মোটরবাসে ডায়মণ্ডহারবার আসিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর গোষ্ঠযাত্রা উৎসব উপলক্ষে ১লা বৈশাখ হইতে ছয়দিনব্যাপী সাড়ম্বরে দ্বাদশ গোপাল-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আদিতে উৎসবটি ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সূচিত হইলেও বর্তমানে ইহা আঞ্চলিক সর্বজনীন উৎসব বলা যাইতে পারে। ইহা শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গোষ্ঠযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে ছয়দিনব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালীমন্দির আছে। কালীর নিত্য পূজা ব্যতীত বৎসরের যে-কোন সময় একবার বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, গ্রামে শীতলা, মনসা, পঞ্চানন্দ ও রাখালচণ্ডী আছে। ভাদ্রসংক্রান্তিতে মনসা-পূজা হয়। রাখালচণ্ডী সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, বহুকাল পূর্বে একটি রাখাল বালক খেলার ছলে চণ্ডীর নাম স্মরণ করিয়া অপর একটি রাখাল বালকের স্কন্ধে তালপাতার খড়্গের দ্বারা আঘাত করিবামাত্র রাখাল বালকটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। পরে চণ্ডীদেবীর কৃপায় বালকটি পুনর্জীবন লাভ করে। সেই সময় হইতেই গ্রামে রাখালচণ্ডীর পূজা আরম্ভ হয়। বিভিন্ন সময় আশপাশের বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসীরা রাখালচণ্ডীর নিকট মানসিক পূজা দিতে আসেন। বৎসরের যে-কোন সময় একবার বাৎসরিক পূজার আয়োজন করা হয়।

শ্রীননীলাল জাড়ুই, কৃষিকার্য,
গ্রাম : কোদালিয়া, পোঃ সাহাপুর,
২৪-পরগণা।

১১। গ্রাম : ফতেপুর। ১২৩।৬৮১'৭০।৭৯০।৪,২৪৮

(ক) মাহিষ্য, বাগ্দী, নাপিত ও স্বর্ণকার। গ্রামে বারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন ডায়মণ্ডহারবার। কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার রোড দিয়া মোটরবাসে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে ছয়দিন-ব্যাপী গোষ্ঠযাত্রা উৎসব উপলক্ষে দ্বাদশ গোপালপূজা এবং আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি ব্যক্তিবিশেষের হইলেও গ্রামবাসী সকলেই ইহাতে যোগদান করেন। দুইটি উৎসবই প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গোষ্ঠযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে ছয়দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীসন্তোষ কুমার দাস, গ্রামসেবক,
ফতেপুর ইউনিয়ন নং ৭, পোঃ সাহাপুর,
২৪-পরগণা।

১২। গ্রাম : হাসিমনগর। ১২৬।৫৪১'২৪।৫৩৭।২,২৪৪

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কাওরা, ধোপা, বর্গক্ষত্রিয় ও মুসলমান। গ্রামে মণ্ডলপাড়া, করপাড়া কুঁতিপাড়া, পাত্রপাড়া, শাউপাড়া, মাইতিপাড়া, কাওরা-পাড়া, বর্গক্ষত্রিয়পাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ডায়মণ্ডহারবার।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে ৩রা বৈশাখ পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী শিবের গাজন ও তৎসহ গোষ্ঠযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন এবং আঞ্চলিক সর্বজনীন উৎসবরূপে পরিচিত।

(ঙ) শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা। ১লা বৈশাখ হইতে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে পঞ্চানন্দ ও রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে এবং অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের নীচে রক্ষিত একটি প্রস্তর খণ্ডকে শিব জ্ঞানে পূজা করা হয়।

শ্রীঅনিল কুমার মজুমদার, গ্রামসেবক,
বঙ্গনগর,
২৪-পরগণা।

মেলা বিবরণী

গঙ্গাপূজার মেলা

পদ্মপুর গ্রামে গঙ্গাপূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ হইতে সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি দুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মেলায় প্রায় সত্তরটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত, মনিহারী, শিল্পসামগ্রী, কাপড়চোপড়, বাসন-কোসন এবং বই-ছবি ইত্যাদি আমদানী হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচ ও নাগরদোলার দল আসে এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

দোস্তপুর গ্রামে গঙ্গাপূজা উপলক্ষে সাধারণের প্রায় তিন বিঘা পরিমাণ একটি মাঠে ১লা মাঘ হইতে চার-পাঁচ-দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং প্রতিদিন বিকালের দিকে মেলায় লোকসমাগম ও বেচাকেনা হয়।

মনসারহাট, চেওড়া, মধুবাটী, ফতেপুর, পাটীকেঘাটা, গাজীপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় এক সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী।

মেলায় পঞ্চাশ হইতে ষাটটি দোকানপাট বসে এবং দশ-পনরজন ফেরিওয়ালা আসেন। স্থানীয় বিক্রেতা ভিন্ন মধুবাটী, ফতেপুর, মশাট প্রভৃতি গ্রাম হইতে বিক্রেতারা প্রতি বৎসর মেলায় আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী ও শাকসব্জী প্রভৃতির দোকান বেশী আসে। ইহা ব্যতীত, বাসনকোসনের দোকান,

কাপড়চোপড়ের দোকান, কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, ঔষধপত্র ও বই-ছবির দোকান এবং মাটির পুতুল, খেলনা, হাঁড়ি-কলসী ও বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকান বসে। মাটির ও বাঁশের দ্রব্যসামগ্রীগুলি প্রতি বৎসর পার্শ্ববর্তী তাজপুর, মশাট ও চালুয়ারী গ্রাম হইতে আসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচ, কবিগান ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

গোষ্ঠযাত্রার মেলা

ফতেপুর গ্রামে গোষ্ঠযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে ছয়দিনব্যাপী সাধারণের প্রায় পনর বিঘা জমির উপর প্রতিদিন বৈকালে মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় আশপাশের দশ-পনর মাইলের মধ্যবর্তী বিভিন্ন গ্রামসমূহ হইতে সকল শ্রেণীর প্রায় আট সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা প্রধানতঃ বাসে আসেন।

মেলায় প্রায় দুইশত দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। বহু ফেরিওয়ালাও আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি বিভিন্ন খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত, বাসনকোসন, মনিহারী, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়-চোপড়, দা, কোদাল, কাস্তে, নিড়ানী ইত্যাদি কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র আমদানী হয়। শিল্পসামগ্রীর দোকানগুলি প্রতি বৎসর তাজপুর, ফতেপুর, চালুয়ারী প্রভৃতি গ্রাম হইতে আসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, জুয়া ও লটারী খেলার দল আসে এবং প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার আয়োজন করা হয়।

কোদালিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর গোষ্ঠযাত্রা উপলক্ষে ১লা বৈশাখ হইতে ছয়দিনব্যাপী সাধারণের প্রায় তিন বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এবং প্রতিদিন বিকালের দিকে মেলায় লোকসমাগম ও বেচাকেনা হয়। আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় সর্বশ্রেণীর মোট প্রায় এক সহস্র নর-নারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সকলেই পদব্রজে আসেন।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, বাসনকোসন, মনিহারী, তৈয়ারী জামাকাপড়, মাটির খেলনা, পুতুল, হাঁড়ি-কলসী, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলা ইত্যাদির ত্রিশ-চল্লিশটি দোকান বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। নিকটবর্তী হাটবাজারের ব্যবসায়ীরা মেলায় দোকান দেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচের দল আসে এবং থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। স্থানীয় যাত্রার দল ব্যতীত কোন কোন বৎসর পেশাদারী যাত্রার দল আসে।

রসুলপুর গ্রামে গোষ্ঠযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে তিনদিনব্যাপী সাধারণের প্রায় তিন বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং প্রতিদিন বিকালের দিকে মেলায় অধিক লোক সমাগম হয়। আশপাশের তিন-চারটি গ্রাম হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় বারশত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন, জামাকাপড়, লোহার তৈয়ারী জিনিসপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল, এবং বই-ছবির দোকান বসে। নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতেই প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক ও লটারী খেলার দল আসে এবং কবিগান ও যাত্রাভিনয় হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

সহরা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় কালীমন্দির প্রাঙ্গণে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী বৈকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন। ডায়মণ্ডহারবার ও কলতা থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় দেড় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। যাত্রীরা প্রায় সকলেই পদব্রজে আসিয়া থাকেন।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, কাপড়চোপড়, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল, কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, বই-ছবি ইত্যাদির পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক, নাগরদোলা ও পুতুল-নাচের দল আসে এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই পুতুলনাচের দল আছে।

হাসিমনগর গ্রামে শিবের গাজন ও তৎসহ গোষ্ঠযাত্রা উপলক্ষে উৎসব প্রাঙ্গণে প্রায় দুই বিঘা দেবোত্তর জমির উপর ১লা বৈশাখ হইতে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন এবং আশপাশের বিভিন্ন থানা হইতে প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় বিভিন্ন প্রকার খাবার, মনিহারী, বাসনপত্র, খেলনা-পুতুল ও শিল্পসামগ্রীর প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। বঙ্গনগর ও মগরাহাট বাজার হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসেন। অধিকাংশ দোকানপাটই খোলা জায়গায় বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাসের দল আসে এবং প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা জলসা, থিয়েটার বা যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

ধর্মরাজপুজার মেলা

মামুদপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজ-পূজা উপলক্ষে ধর্মরাজমন্দিরের সম্মুখে প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী বৈকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলার জমি ধর্মরাজঠাকুরের সেবায়েতের। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। আস্তা, কলাগাছিয়া, গুঠারী, বকুলতলা, বড়আস্তা, পুতুড়ে, মল্লিকপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় প্রায় পাঁচ-ছয়শত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, শাকসব্জী, ফলমূল, মনিহারী, মাটির হাঁড়ি-কলসী, খেলনা-পুতুল এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি দোকান বসে। ব্যবসায়ীরা স্থানীয় গ্রামাঞ্চলের।

মহরমের মেলা

রুখিয়া গোপালপুরহাট গ্রামে প্রতি বৎসর মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব উপলক্ষে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং ইহাতে আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় ছয়-সাত হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের অধিকাংশই মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক।

মেলায় শতাধিক দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। বিভিন্ন প্রকার খাবারের দোকানই মেলায় বেশী আমদানী হয়। ইহা ভিন্ন, বাসনকোসন, মনিহারী, তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির খেলনা-পুতুল এবং বই-ছবি ইত্যাদির দোকান বসে। মেলায় লাঠিখেলা ও কুস্তী প্রতিযোগিতা হয়।

রথযাত্রার মেলা

বেলসিং গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে গ্রামের পূর্ব প্রান্তে পাল পরিবারের প্রায় তিন বিঘা জমির উপর বিকাল বেলায় একটি মেলা বসে। মেলাটি আশি বৎসরের প্রাচীন। আশপাশের পাঁচ-ছয়টি ইউনিয়ন হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় সতরশত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। যাত্রীরা পদব্রজে, বাসে ও সাইকেল রিক্সায় আসেন।

বিক্রেতারা সাধারণতঃ বারুইপুর, আমতলা ও নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর মেলায় আসেন। প্রায় একশত দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। খাবারের দোকান ব্যতীত, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, মাটির খেলনা-পুতুল ও হাঁড়ি-কলসী, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী শিল্পসামগ্রী, বই-ছবি এবং আম, কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি ফল ও চারাগাছ আমদানী হয়। মেলায় নাগরদোলা ও লটারী খেলার দল আসে।

ফতেপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে সাধারণের প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর

একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং কেবলমাত্র রথের দিনই মেলা বসে।

মেলায় আশপাশের দশ-পনর মাইলের মধ্যবর্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্বশ্রেণীর প্রায় চার সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী।

শতাধিক দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসনপত্র, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, মাটির খেলনা-পুতুল এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী শিল্পসামগ্রী আমদানী হয়। শেষোক্ত শিল্পসামগ্রীগুলি তাজপুর, ফতেপুর ও চালুয়ারী গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক ও লটারী খেলার দল আসে এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়।

রাসযাত্রার মেলা

দলুইপুর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে রাসপূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের রাস উৎসব উপলক্ষে সাধারণের প্রায় ছয়-সাত বিঘা পতিত জমিতে বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র কুড়ি বৎসরের প্রাচীন।

ফলতা থানার ৪, ৫, ৬ ও ৭নং ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় পনর হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

বিক্রেতারা প্রধানতঃ চব্বিশ-পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে এবং ত্রিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে মনিহারী, ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকানের সংখ্যাই অধিক। ইহা ব্যতীত, কাপড়চোপড়ের দোকান, শিল্প-সামগ্রীর দোকান, মাটির খেলনা-পুতুল, হাঁড়ি-কলসী প্রভৃতির দোকান, বই-ছবির দোকান, কাঠের জিনিসপত্রের দোকান এবং বাঁশের তৈয়ারী শিল্পসামগ্রীর দোকান বসে। শিল্পসামগ্রীর দোকানগুলি প্রধানতঃ নিকটবর্তী জাগনা ও চাঁদপাল গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসে। ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, পুতুলনাচ ও লটারী খেলার দল আসে এবং জলসা ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় আট সহস্র দর্শকের সমাগম হয়।

স্নানযাত্রার মেলা

জগন্নাথপুর গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে স্নানযাত্রা উৎসব উপলক্ষে প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। ফলতা থানার বিভিন্ন ইউনিয়ন হইতে এবং বিষ্ণুপুর ও ডায়মণ্ডহারবার হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় দুই সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। তন্মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকান ব্যতীত, মনিহারী, বাসনকোসন, পোষাক-পরিচ্ছদ, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল এবং আম, কাঁঠাল, তরমুজ ইত্যাদি ফলাদির দোকানপাট বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার আয়োজন করা হয় এবং লটারী খেলার দল আসে।

থানা : ডায়মণ্ডহারবার

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : দক্ষিণ সিমলা। ৪৪।১৭৪'৮০।১৫৫।৭৯৮

(ক) মাহিষ্য, যোগী ও মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন ডায়মণ্ডহারবার হইতে সিমলা রোড দিয়া গ্রামে পৌছান যায়। কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার রোড দিয়া মোটরবাসে অথবা সাধুরহাট হইতে নৌকায় যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা, ফাল্গুন মাসে শীতলাপূজা ব্যতীত, মুসলমান সম্প্রদায়ের ফতেহা-দোয়াজ্-দাহম্, ঈদলফেতর ও ঈদোজ্জোহা প্রভৃতি উৎসব হইয়া থাকে। উৎসবগুলি মাত্র পঁচিশ বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি শীতলা মূর্তি এবং ব্যক্তি-বিশেষের গৃহে কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীসৈয়দ রহমন আলী, শিক্ষক,
পোঃ ভাণ্ডড়া, ২৪-পরগণা।

২। গ্রাম : কুলটিকরী। ৫৩।২৫'৭১।৭৯।৫১৭

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নাপিত। গ্রামে তুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে ডায়মণ্ড-হারবার রেলস্টেশন অবস্থিত। কলিকাতার মমিনপুর হইতে ডায়মণ্ডহারবার রোড দিয়া মোটরবাসে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনের নিকট নামিয়া রিক্সায় হুগলী পয়েন্ট রোড দিয়া গ্রামে পৌছান যায়। গ্রামের প্রায় এক মাইল দক্ষিণ দিয়া হুগলী নদী প্রবাহিত।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষের মঙ্গলবার হইতে চৈত্র মাসের বারুণীস্নান পর্যন্ত বড়খাঁ পীর সহ বিবিমার পূজা ও উৎসব এবং চৈত্র মাসের শেষে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) বারুণীস্নানের মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চারদিনব্যাপী মেলা হয়। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি বিবিমার ঘর, দক্ষিণ-রায় ও রাখালঠাকুরের স্থান আছে। ইহা ব্যতীত, পঞ্চ-দেবতা যথা—শিব, ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা ও পঞ্চানন্দের স্থান আছে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই গ্রামের তুই মাইল উত্তরে আস্থরালি (মৌজা নং ৪০) নামে একটি গ্রাম আছে। গ্রামে প্রায় পঞ্চাশ বিঘা পরিমাণ জমির উপর একটি দীঘি আছে। কিংবদন্তী দীঘিটি অসুর কর্তৃক খনিত। দীঘির পাড়ে কয়েকটি প্রাচীন ভগ্ন পাথরের মূর্তিকে জয়চণ্ডী জ্ঞানে পূজা করা হয়। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ তারিখে জয়চণ্ডীর বার্ষিক উৎসব হয়।

শ্রীপরেশ নাথ সর্দার, শিক্ষক,
গোবিন্দপুর কে. সি. উচ্চ বিদ্যালয়,
গ্রাম : কুলটিকারী, পোঃ গোয়ানারা গোবিন্দপুর,
২৪-পরগণা।

৩। গ্রাম : পারুলিয়া। ৮১।১৬৬'৬৫।২১৮।১,৩২১

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, পোদ, নাপিত, ধোপা, বাগ্দী, কাওরা ও মুসলমান। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন ডায়মণ্ডহারবার এবং গ্রামের নিকট দিয়া পাকা রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে। গ্রামের মধ্যে চলাচলের জন্য তুইটি কাঁচা রাস্তা আছে। তাহা ছাড়া, হুগলী নদী দিয়া নৌকায় গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে গোষ্ঠযাত্রা, আশ্বিন মাসে তুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে চড়ক ও পঞ্চানন্দপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) পঞ্চানন্দপূজার মেলা। চৈত্র মাসে আট-দশদিন-ব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে পাঁচটি পঞ্চানন্দ, ছয়টি শীতলা এবং মনসা প্রভৃতি গ্রাম্য দেব-দেবীর মন্দির আছে।

শোনা যায়, প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে এই স্থানে জনবসতি গড়িয়া উঠে; তৎপূর্বে সুন্দরবন এলাকার অংশ ও এই অঞ্চলটি ঘন জঙ্গলে আবৃত ছিল।

শ্রীমহম্মদ আসাতুল্লারাজ, শিক্ষক,
গ্রাম : পারুলিয়া, পোঃ দরিকৃষ্ণনগর,
২৪-পরগণা।

৪। গ্রাম : হরিণডাঙ্গা। ৯৭।১২৩'৩৫।১৬৬।১,০০০

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, নারুই, ধোপা ও কাওরা। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে ডায়মণ্ডহারবার রেলস্টেশন। গ্রামে যাতায়াতের জন্য দুইটি জেলা বোর্ডের রাস্তা আছে। ঐ রাস্তায় রিক্সা ও গরুর গাড়ী চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে শেষ শনি অথবা মঙ্গলবার রক্ষাকালীর পূজা ও উৎসব হয়। ইহা ব্যতীত, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা হইয়া থাকে।

(ঙ) রক্ষাকালীপূজার মেলা। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে চার-পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত চব্বিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে পাঁচটি পঞ্চানন্দ, শীতলা, মনসা, বিশালাক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবীর স্থান আছে।

শ্রীগিরীশ চন্দ্র বেরা, প্রধান শিক্ষক,
হরিণডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ডায়মণ্ডহারবার, ২৪-পরগণা।

৫। গ্রাম : মশাট। ১২৯।৪২২'১১।৫০০।২,৮২০

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ডায়মণ্ডহারবার। রিক্সায় গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্বজনীন মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মহরমের মেলা। প্রতি বৎসর মহরম মাসের ১০ই তারিখে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং মাত্র একবেলা স্থায়ী হয়।

(চ) গ্রামে তিনটি পঞ্চানন্দ, একটি বাবাঠাকুর, একটি শীতলা এবং দুইটি মনসার স্থান আছে। ইহা ব্যতীত, গ্রামে একটি বৃহৎ দীঘির পাড়ে মাইবিবির স্থান আছে। মাইবিবির কোনো মূর্তি নাই। কিংবদন্তী আছে গ্রামে কোন বৃহৎ ভোজের জন্য তৈজসপত্রের প্রয়োজন হইলে মাইবিবির নিকট মানত করিলে উল্লিখিত দীঘির কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান হইতে ঐ সকল তৈজসপত্র পাওয়া যাইত। কিন্তু নিয়ম ছিল কার্য শেষে ঐ সকল তৈজস-পত্র পুনরায় দীঘির জলে নিক্ষেপ করিতে হইবে। এই কারণে এই অঞ্চলে মাইবিবি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু কোন এক সময় জনৈক অসাধু ব্যক্তি কর্তৃক ঐ সকল তৈজসপত্র আত্মসাৎ করায় মাইবিবির কৃপাপ্রসূত ঐরূপ তৈজসপত্র আর পাওয়া যায় না।

শ্রীনকুল চন্দ্র মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক,
মশাট প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মশাট, ২৪-পরগণা।

৬। গ্রাম : লালবাটী (মৌজা : দুর্গানগর)। ১৪২।৬৫৭'৪২।৩৭৩।২,৩০৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, ধোপা, নাপিত, বাগদী।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ডায়মণ্ডহারবার। গ্রামে যাতায়াতের সংকীর্ণ কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে মহিষমর্দিনী চণ্ডীর পূজা ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি পুষ্করিণীর পাড়ে প্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে চণ্ডীর প্রস্তর মূর্তি স্থাপিত আছে। দশভুজা চণ্ডী অসুরের উপর দণ্ডায়মানা। পদতলে কার্তিক স্কন্ধে একটি মহিষ আছে। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে পুষ্করিণী খননকালে উক্ত চণ্ডী মূর্তিটি পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে চণ্ডীর সর্বজনীন পূজা হয়। পূজারী ব্রাহ্মণ। চণ্ডীপূজার দিন অষ্টপ্রহরব্যাপী অখণ্ড নামকীর্তন হয়। দেবীর নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। ফাল্গুন মাসে পূজার দিন উৎসবের স্থানে কয়েকটি দোকানপাট বসে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি শিবালয়, তিনটি পঞ্চানন্দ, তিনটি বাবাঠাকুর, তিনটি মনসা ও শীতলা আছে।

শ্যামলবিহারী মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক,
২৪-পরগণা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দূরে কলিকাতা ডায়মণ্ডহারবার রেলপথে বাসুলডাঙ্গা হইতে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণদিকে বোলসিদ্ধি (মৌজা নং ১৫৪) নামক গ্রামে এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছে। গ্রামের এক প্রান্তে একটি উচ্চ ভূখণ্ডের উপর শিবমন্দির অবস্থিত। কবে কাহার দ্বারা এই শিব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। স্থানীয় লোকে ইহাকে অনাদিলিঙ্গ বলিয়া মনে করেন। শিবের মন্দিরের চতুর্দিকে কতকগুলি প্রাচীন অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষের চিহ্ন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, পূর্বে এই স্থান জঙ্গলের দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল। একজন সন্ন্যাসী তথায় বাস করিয়া শিবের অর্চনা করিতেন। সন্ন্যাসী বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন; তিনি যাহাকে যাহা বলিতেন তাহাই ফলিত। এইজন্য এই গ্রামের নাম বাক্‌সিদ্ধি বা বোলসিদ্ধি হয়। গাজন ও শিবরাত্রির সময় শিবমন্দিরে বহুযাত্রীর সমাগম হয়। (বাংলায় ভ্রমণ, প্রথম খণ্ড অবলম্বনে)

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা

হরিণডাঙ্গা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের শেষ শনি অথবা মঙ্গলবার সাড়ম্বরে রক্ষাকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে ১২৪০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে গ্রামটি বানের জলে প্লাবিত হয় এবং প্লাবনের পর কলেরা রোগের আক্রমণে বহু গ্রামবাসীর প্রাণ হানি হয়। মহামারীর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গ্রামবাসীরা রক্ষাকালী-পূজার আয়োজন করেন এবং তদবধি এই পূজা চলিয়া আসিতেছে। গ্রামে শিবের বক্ষোপরি দণ্ডায়মানা দ্বিভুজা, রৌপ্য ও স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা রক্ষাকালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইনি সাধারণের দেবী।

প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে মহোৎসব এবং পরের শনি অথবা মঙ্গলবার সাড়ম্বরে রক্ষাকালীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বহু লোকজন দেবীর নিকট পূজাদি দিতে আসেন। মানত হিসাবে স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার দেওয়া হয় এবং অনেকে মেষ এমন কি মহিষ বলিও দিয়া থাকেন। উৎসবের দিন প্রায় একশত বলি পড়ে। স্থানীয় কাশ্যপ গোত্রীয় ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ কালীপূজা করেন। উৎসবটি সর্বজনীন।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

কুলটিকরী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ তিন-দিন সাড়ম্বরে সর্বজনীন শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। গ্রামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বুড়াশিব, ষষ্ঠী, মনসা, শীতলা ও পঞ্চানন্দ—এই পঞ্চদেবতা আছে। গাজনের সময় বুড়াশিবসহ উক্ত পঞ্চদেবতার পূজাদি হইয়া থাকে।

চৈত্রসংক্রান্তির তিনদিন পূর্ব হইতে অনেকে মানত করিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসব্রতীরা পঞ্চদেবতার স্থানে এবং গ্রামের দক্ষিণরায় দেবতার নির্দিষ্ট স্থানে বাঁশের মাচা বাঁধিয়া তাহার নীচে রক্ষিত কাঁটা ও ধারাল অস্ত্রের উপর ঝাঁপ দিয়া থাকেন এবং 'মাণিকচোর ধরা' নামে একটি পর্ব পালন করিয়া থাকেন। সংক্রান্তি তিথিতে প্রাচীন রীতি অনুসারে স্থানীয় প্রামাণিকদিগের গৃহে সন্ন্যাসব্রতীরা চিড়া-দৈ আহার করেন। এই কারণে গ্রামের একটি নির্দিষ্ট প্রামাণিক পরিবারকে কিছু দেবোত্তর ভূসম্পত্তি দান করা আছে। উৎসবের তিনদিন সাড়ম্বরে যথারীতি পঞ্চদেবতার পূজা হয় এবং প্রতিদিন গাজনের সঙ বাহির হয়। কুলটিকরী গ্রামের গাজনের সঙের বিশেষ খ্যাতি আছে। উৎসবে আশপাশের বিভিন্ন গ্রামের লোকজন যোগদান করিয়া থাকেন। জনৈক উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ শিবপূজা করিয়া থাকেন।

বিবিমার পূজা

কুলটিকরী গ্রামে সাধারণের একটি ঘরে বিবিমা ও বড়খাঁ গাজীর পূজা হইয়া থাকে। এই গ্রামের বিবিমা

প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং জাগ্রত দেবী বলিয়া বিশ্বাস।

প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের মঙ্গলবার হইতে চৈত্র মাসের বারুণী তিথি পর্যন্ত প্রতি শনি-মঙ্গলবার বিবিমা ও বড়খাঁ গাজীর বিশেষ হাজত পূজা ও উৎসব হইয়া থাকে এবং বারুণী তিথিতে পূজা ও পুণ্যস্নানের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় বিশ সহস্র নরনারী উৎসবে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন স্থান হইতে আগত কীর্তনীয়ার দল প্রতি শনি-মঙ্গলবার উৎসব প্রাঙ্গণে কীর্তনগান করিয়া থাকেন। আতপচালসহ ফল-মিষ্টির নৈবেদ্য এবং তুলসীপাতা ও বিশেষ করিয়া 'মোরগ জটা' ফুল দিয়া বিবিমার নিকট পূজা দেওয়া হয়। মানতস্বরূপ ভক্তরা কেহ কেহ ধূনা পোড়াইয়া থাকেন এবং কেহ কেহ একটি নির্দিষ্ট পুকুরে স্নান করিয়া দণ্ডী খাটেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি বিবিমা ও বড়খাঁ গাজীর খাদেমরূপে পূজাদি করিয়া থাকেন। শোনা যায় বহুকাল পূর্বে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক হিন্দু বিবিমার সেবায়েত ছিলেন।

ইহা ভিন্ন, প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের যে-কোন একদিন ভক্তরা বিবিমার নিকট রুটি ও রান্না করা মুরগীর মাংস দিয়া পূজা দেন এবং এই দিনই গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরা বিবিমার ঘরের আশপাশে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া উহা পরস্পরের সহিত বিনিময় করিয়া খাওয়া-দাওয়া করেন। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে 'বিলভাত' পর্ব বলেন।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

হরিণডাঙ্গা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে রক্ষাকালী-পূজা উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় তিন কাঠা জমির উপর চার-পাঁচদিনব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত চব্বিশ বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় মোট প্রায় দেড় সহস্র নরনারীর সমাগম হয় এবং ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, খেলনা-পুতুল, ঔষধপত্র ইত্যাদির কয়েকটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা অধিকাংশই স্থানীয়।

পঞ্চানন্দপূজার মেলা

পারুলিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত পঞ্চানন্দঠাকুরের পূজা উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় চার বিঘা জমির উপর আট-দশদিনব্যাপী মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এবং সাধারণতঃ বিকালের দিকেই লোকসমাগম হয়।

নিকটবর্তী বসন্তপুর, মোহনপুর, কামারপোল, মাঝের-হাট, আমতলা, মগরাহাট প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় সাত-আট হাজার নরনারী ট্রেণ ও মোটরযোগে মেলায় আসেন।

স্থানীয় বিক্রেতাগণ ছাড়াও মাঝেরহাট, কামারপোল, ডায়মণ্ডহারবার, সরিষা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী প্রায় প্রতি বৎসরই মেলায় দোকানপাট দিয়া থাকেন। প্রায় একশতটি দোকানপাটের মধ্যে অধিকাংশই মিষ্টান্নের দোকান। অন্যান্য দোকানের মধ্যে মনিহারী, মাটি ও কাঁচের বাসনকোসন, বই-ছবি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতির দোকান উল্লেখযোগ্য। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক প্রদর্শনী, পুতুলনাচ, কবিগান এবং যাত্রাভিনয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। কলিকাতা হইতে প্রায় প্রতি বৎসর খ্যাতনামা পেশাদারী যাত্রার দল আনা হয়। এই সকল আনন্দানুষ্ঠানে অসংখ্য নরনারীর সমাবেশ ঘটে।

বারুণীস্নানের মেলা

কুলটিকরী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বারুণীস্নান উপলক্ষে বিবিমার নামে উৎসর্গকৃত প্রায় দশ কাঠা জমিতে চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিবিমার উৎসব উপলক্ষে অগ্রহায়ণ

মাসের শুক্লপক্ষ হইতে চৈত্র মাসের বারুণী তিথি পর্যন্ত প্রতি শনি-মঙ্গলবার এই স্থানে মেলা বসে, তবে বারুণীস্নান উপলক্ষে চারদিনব্যাপী মেলার জাঁকজমক বেশী হয়। এই কারণে মেলাটি 'বারুণীস্নানের' মেলা বলিয়া পরিচিত। ইহা দুইশতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের চার-পাঁচটি ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রতিদিন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গড়ে প্রায় ছয়-সাতশত নরনারীর সমাগম হয় এবং প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে ও দুই-চারিজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয়। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, মাটির ও কাঁচের বাসনপত্র, কাপড়চোপড়, কৃষিযন্ত্রপাতি, বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, খেলনা, বই-ছবি ইত্যাদি আমদানী হয় এবং কয়েকটি ফল ও চা-পান-বিড়ির দোকান বসে। বিক্রেতাদের নিকট তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচের দল আসে এবং কোন কোন বৎসর তরজাগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

মহরমের মেলা

মশাট গ্রামে অবস্থিত একটি বিরাট দীঘির পাড়ে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় এক বিঘা জমির উপর মহরম উৎসবের দিন বিকালে কয়েক ঘণ্টার জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

আশপাশের ইউনিয়নগুলি হইতে মেলায় প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারীর সমাগম হয় এবং প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে ও কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা সকলেই স্থানীয়। মেলায় প্রধানতঃ ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান এবং শাকসব্জী ও ফলমূলের দোকানপাট বসে।



গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ দেরিয়া। ২১।২০৮·৬৫।২৯৮।১,৭১৮

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কামার, কুমার, নাপিত, ধোপা ও মুসলমান। গ্রামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) ডায়মণ্ডহারবার রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে সপ্তাহ-ব্যাপী গোষ্ঠযাত্রা উৎসব, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল ও চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহব্যাপী শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে আটদিনব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের মধ্যস্থলে এবং দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্তে সাধারণের শিবমন্দির আছে। মন্দিরগুলিতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত, গ্রামে আটটি পঞ্চানন্দ এবং শীতলা আছে।

শ্রীবিভূতি ভূষণ হালদার, পধান শিক্ষক,
দেরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ দেরিয়া, ২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ শ্যামবসুর চক (মৌজা ঃ ছোট মনোহরপুর)। ৩৮।৬৪·১০।১১০।১,০৩০

(ক) মাহিষ্য, ধোপা, নাপিত, কাওরা ও মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের প্রায় পাঁচ মাইল দূরে লক্ষ্মীকান্তপুর রেলস্টেশন হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া যাতায়াত করা হয় এবং গ্রামের পশ্চিমদিকে প্রায় নয় মাইল দূরে ডায়মণ্ডহারবার-কাকদ্বীপ রোড দিয়া মোটরবাসে ও পশ্চিমদিকে প্রায় দুই মাইলের মধ্যে প্রবাহিত হুগলী নদী দিয়া নৌকায় যাতায়াত করিতে পারা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজপূজা উপলক্ষে চড়ক, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, মাঘ মাসে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের চড়ক উৎসবটি গ্রামের মণ্ডল পরিবার এবং চৈত্রসংক্রান্তির চড়ক উৎসব ও রথযাত্রা উৎসবটি গ্রামের ভাণ্ডারী পরিবার কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি ব্যক্তিবিশেষের হইলেও গ্রামবাসী সকলেই উৎসবে যোগদান করেন। চৈত্র মাসের চড়ক উপলক্ষে কোন দেবদেবীর মূর্তি পূজা করা হয় না; কেবলমাত্র চড়ক-গাছটিকে পূজা করা হয়।

(ঙ) চড়কের (ধর্মরাজপূজার) মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন।

চড়কের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি গ্রামের উত্তরদিকে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় চার-পাঁচ বিঘা জমির উপর বসে।

(চ) গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের একটি কালীঠাকুরের স্থান আছে। কালীর কোন মূর্তি নাই, প্রতি শনি-মঙ্গলবার দেবীর পূজা হয় এবং মানত ও পূজা দিতে আশপাশের গ্রাম হইতে অনেক নরনারী আসেন। ইহা ব্যতীত, গ্রামে একটি পঞ্চানন, তিনটি মনসা এবং একটি বিবিমার স্থান আছে।

শ্যামসুন্দর বসু নামক জনৈক চকদারের নামানুসারে গ্রামের নাম শ্যামবসুর চক হইয়াছে।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মণ্ডল, শিক্ষক,
শ্যামবসুর চক প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কুলপী, ২৪-পরগণা।

৩। গ্রাম ঃ উদয়রামপুর। ১৩৯।৪৭৬·৯২।২০২।১,০৩৭

(ক) কায়স্থ, সদ্‌গোপ, ধোপা, ক্ষত্রিয় ও মুসলমান। গ্রামে ঘোষপাড়া, কায়স্থপাড়া, হালদারপাড়া, নস্করপাড়া,

মিস্ত্রীপাড়া, পাইকপাড়া ও গাজীপাড়া নামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন লক্ষ্মীকান্তপুর হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন এবং সর্বজনীন। উৎসবে আশপাশের গ্রামবাসীরা যোগদান করেন।

(ঙ) চড়কের মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পঞ্চানন, একটি বিবিমা, একটি শীতলা ও পাঁচটি মনসা আছে।

শ্রীঅমূল্য চরণ কয়েল, পধান শিক্ষক,
উদয়রামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সিদ্ধেশ্বরপুর, ২৪-পরগণা।

৪। গ্রামঃ দুর্গানগর। ১৮৫।৮৭৩'৯১।৩১১।১,৬৮৪

(ক) মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ধোপা, নাপিত, বাগ্দী। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন লক্ষ্মীকান্তপুর হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। কুলপী হইতে মোটরবাসে এবং মশামারির ঘাট হইতে নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের ২৬শে হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী সাড়ম্বরে সর্বজনীন শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছে। প্রতি বৎসর উৎসবের সময় উক্ত শিবলিঙ্গের যথারীতি পূজাদি এবং চৈত্রসংক্রান্তির পূর্বদিন নীলপূজা হয়। নীলপূজার দিন আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে অনেক যাত্রী মন্দিরে নীলের বাতি দিতে আসেন। গাজন সন্ন্যাসীরা অনেকে দেহে বান অর্থাৎ লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া থাকেন। উৎসবটি প্রাচীন।

(ঙ) শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তি হইতে দুই-তিনদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) প্রাচীন একটি শিবমন্দির ব্যতীত মাত্র তিন-চার বৎসর হইল ফুলমনি দাসী নাম্নী জনৈকা বিধবা স্ত্রীলোক গ্রামে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মন্দিরে শিবলিঙ্গ আছে, ইঁহার নিত্য পূজা হয়। ইহা ভিন্ন, গ্রামে দুইটি পঞ্চানন্দ, চারটি বাবাঠাকুর, দুইটি শীতলা, দুইটি মনসা, একটি হরিবাসর ও একটি বিবিমার স্থান আছে। বৎসরে একবার দুইদিনব্যাপী বিবিমার পূজা বা হাজত হয়। গ্রামের জনৈক মুসলমান বিবিমার পূজা করেন। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বিবিমার পূজা দেন।

শ্রীহৃষীকেশ বাগ, শিক্ষক,
গ্রাম: তাঁতিরহাট (সীতারামপুর),
পোঃ কুলপী, ২৪-পরগণা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—লক্ষ্মীকান্তপুর হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরবর্তী ভাগীরথীর তীরে কুলপী (মৌজা নং ১৮৩) গ্রাম অবস্থিত। নদীর ধারে একটি উচ্চ মন্দির আকৃতির কবর আছে। ইহা মনি বিবির কবর নামে অভিহিত এবং নাবিকদিগের নিকট কুলপী প্যাগোডা নামে পরিচিত। পূর্বে কুলপীর নিকট জাহাজের একটি নঙ্গর ফেলিবার স্থল ছিল। কবরটি একটি ইংরাজ মহিলার কবর বলিয়া কথিত।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

শ্যামবসুর চক গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজের চড়ক উৎসব উপলক্ষে গ্রামের পূর্বদিকে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর মাত্র একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় চার-পাঁচ সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। বিক্রেতারাও নিকটবর্তী গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী।

ইহা ব্যতীত, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, কৃষি যন্ত্রপাতি, বই-ছবি ও শিল্পসামগ্রীর দোকানপাট বসে। জামতলা ও কলিঙ্গার ডোমদিগের তৈয়ারী শিল্পসামগ্রীর দোকানগুলি প্রতি বৎসরই আসে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—শ্যামবসুর চক গ্রামে অনুষ্ঠিত আষাঢ় মাসে রথযাত্রা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক মেলার বিবরণী উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

উদয়রামপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব উপলক্ষে একটি খোলা মাঠের উপর মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের চার-পাচশত নরনারীর সমাগম হয় এবং ময়রা ও তেলেভাজা, কাঁচ ও মাটির বাসনপত্র, মনিহারী, কাপড়চোপড়, শিল্পসামগ্রী, বই-ছবি ও কয়েকটি চা-পান-বিড়ির দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সংনাচ, পুতুলনাচ, কবিগান ও যাত্রাভিনয় হয়। যাত্রার দল প্রতি বৎসর ভিন্ন গ্রাম হইতে আসে।

দুর্গানগর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন ব্যক্তিবিশেষের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর দুই-তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। প্রতিদিন বিকালের দিকে মেলায় লোক সমাগম হয়।

কুলপী, মশামারি, ভগবানপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় আটশত নর-নারী মেলায় আসেন।

মেলায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। ইহা ভিন্ন, আট-দশজন ফেরিওয়ালা আসেন। প্রধানতঃ কুলপী ও তাঁতীরহাট গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে প্রায় কুড়িটি ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান ব্যতীত, মনিহারী, গামছা ও কাটাকাপড়, মাটির পুতুল ও হাঁড়িকুড়ি, বই-ছবি, তেল ও মসলাপাতি, মাটির তৈজসপত্র ইত্যাদির দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক ও পুতুলনাচের ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ব্যতীত, বিভিন্ন গ্রাম হইতে গাজনের দল আসে। এই অঞ্চলে অধিকাংশ গ্রামেই গাজন উৎসব হয়। ঐ সকল গ্রামের গাজনের দল পরস্পর পরস্পরের গ্রামে আসিয়া গান গাহিয়া আমোদপ্রমোদ করিয়া থাকেন। এই গ্রামেও গাজনের দল আছে। প্রধানতঃ সমাজের নানারূপ দুর্নীতি ও ব্যভিচারের প্রতি কটাক্ষ করিয়া গাজনের গান রচনা করা হয়।

রথযাত্রার মেলা

দেরিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে ঘোষপাড়ায় প্রায় আট বিঘা জমির উপর আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

জামবেড়িয়া, বকচর, রামকৃষ্ণপুর, রামকিশোরপুর, মুকুন্দপুর, হাঁড়া, বড় বেড়িয়া, রামরামপুর, নারায়ণপুর, বাহাদুরপুর, রাজারামপুর, কানপুর প্রভৃতি আশপাশের গ্রাম হইতে মেলায় সহস্রাধিক নরনারার সমাগম হয় ও প্রতি বৎসর ব্যবসায়ীরা আসিয়া থাকেন।

মেলায় প্রায় একশত দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। উহাদের মধ্যে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকান খোলা জায়গায় বসে। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকানের সংখ্যাই অধিক। ইহা ব্যতীত, মনিহারী দোকান, বাসনকোসনের দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, লাঙ্গল, কাস্তে, কোদাল প্রভৃতি কৃষিযন্ত্রপাতির দোকান, তাঁত বোনা ও শাঁখ কাটা যন্ত্রপাতির দোকান, শিল্পসামগ্রীর দোকান এবং কয়েকটি বই-ছবি, ঔষধপত্র ও শাকসব্জীর দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কথকতা, কবিগান, জলসা এবং থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামের যাত্রার দল ব্যতীত কোন কোন বৎসর ভিন্ন গ্রাম হইতেও দল আসে।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ উত্তর গোবিন্দপুর। ৯।১৮৮'৬৮।৯৩।৪৭৪

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, সংচাষী। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) পশ্চিমদিকে প্রায় তিন মাইল দূরে রেলস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াতের একটি পাকা রাস্তা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে গোষ্ঠযাত্রা উৎসব উপলক্ষে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দ ও নারায়ণ শিলার পূজার্চনা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন। ইহা ব্যতীত, প্রতি বৎসর পৌষ মাসে ব্যক্তিবিশেষের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণরায় এবং চৈত্র মাসের সংক্রান্তির পাঁচ-দিন পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়া সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত বুড়া-শিবের গাজন উৎসব পালিত হয়। পৌষ মাসে দক্ষিণ-রায়ের বার্ষিক পূজা উপলক্ষে এক যোগে গ্রামের অন্যান্য গ্রাম্য দেবদেবীরও পূজা হয় এবং পূজা প্রাঙ্গণে নামকীর্তন ও সর্বজনীন ভোজের আয়োজন করা হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

(ঙ) গোষ্ঠযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে। মেলাটি মাত্র পনর বৎসর আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি মাটির ঘরে দক্ষিণরায়-এর মৃন্ময় মূর্তি ও একটি নির্দিষ্ট স্থানে বুড়াশিবের শিলা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, গ্রামে দুইটি পঞ্চানন্দ, একটি বাবাঠাকুর, শীতলা ও মহাদেব, তিনটি রাধাগোবিন্দ ও বিষ্ণু, দুইটি মনসা, গাজী সাহেব ও সাতবিবির স্থান আছে।

শ্রীমৃণাল কৃষ্ণ নাইয়া, প্রধান শিক্ষক,
গোবিন্দপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মথুরাপুর, ২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ গিলার ছাট।
১১৯।৪,১২৫'০৭।২,০৬৮।১১,৫৫৪

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, দলুই, কাওরা, ধোপা, নাপিত ও কামার। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মথুরাপুর রোড। গ্রাম হইতে পাঁচ মাইল দূরে কাশীনগর হইতে মোটরবাস যাতায়াত করে।

(ঘ) গ্রামে ১লা বৈশাখ নববর্ষ উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে অন্নপূর্ণা পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) নববর্ষের মেলা। ১লা বৈশাখ হইতে পাঁচ-দিন। মেলাটি পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শীতলা, মনসা ও বিবিমার নির্দিষ্ট স্থান আছে। প্রতি বৎসর মাঘ-ফাল্গুন মাসে উল্লিখিত দেবীত্রয়ের এক যোগে পূজা হয়।

শ্রীবলাই চাঁদ হালদার, প্রধান শিক্ষক,
গিলার ছাট নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
পোঃ গিলার ছাট, ২৪-পরগণা।

[ছত্রভোগ অঞ্চলের অন্তর্গত ছত্রভোগ, বড়াশী, কাশীনগর, খাড়ী ও কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ ও মেলা সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

ছত্রভোগ

ছত্রভোগের প্রাচীন ইতিহাসালোচনায় জয়নগর-মজিলপুর নিবাসী শ্রীকালিদাস দত্ত মহাশয়ের 'ছত্রভোগ' শীর্ষক প্রবন্ধটি একটি মূল্যবান রচনা। রচনাটি প্রবাসী পত্রিকায়, মাঘ ১৩৫৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ছত্রভোগের বর্তমান পূজা-পার্বণ সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বে আমরা শ্রীদত্তের প্রবন্ধটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম-

পশ্চিমবঙ্গে চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণে যে সকল প্রাচীন স্থান আছে ছত্রভোগ তন্মধ্যে অন্যতম। খ্রীষ্টীয়

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল গমনকালে সেখানে একরাত্রি কীর্ত্তনানন্দে যাপন করেন। সেকারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের নিকটও উহা একটি তীর্থক্ষেত্র বিশেষ।

অধুনা ঐ স্থানটি ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অধীন মথুরাপুর থানার মধ্যে একটি সামান্য পল্লীরূপে অবস্থিত, কিন্তু চৈতন্যভাগবতাদি পুরাতন বাংলা গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে উহা আয়তনে অনেক বড় ও যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল এবং এখন উহার উত্তরে জলঘাটা ও দক্ষিণে কৃষ্ণচন্দ্রপুর, কাটানদীঘি, বড়াশী, মাদপুর, কাশীনগর প্রভৃতি যে সকল গ্রাম আছে সেগুলিকেও লোকে তখন ছত্রভোগ বলিত। অধুনা কাশীনগরের প্রায় তিন-চার ক্রোশ দক্ষিণে, ২২ নম্বর লটের শেষ সীমায়, ছুতরভোগ নামে একটি নদী আছে। পূর্ব্বে উহারও নাম ছিল ছত্রভোগ নদী*। উহা হইতে বোধ হয় প্রাচীনকালে দক্ষিণে ঐ নদী পর্য্যন্ত ভূভাগ ছত্রভোগ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

উল্লিখিতরূপ বিস্তীর্ণ ছত্রভোগ নগরের সমৃদ্ধির কারণ ছিল উহার উত্তর ও পূর্বসীমা দিয়া প্রবাহিত অধুনালুপ্ত আদিগঙ্গা নদী। উহার শুষ্ক খাদ এখনও সেখানে মজাগঙ্গা বা গঙ্গার বাদা নামে এক বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া বর্ত্তমান আছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কতকগুলি মনসার ভাসান ও চণ্ডীর গানের পুঁথি হইতে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে গঙ্গানদীর উপর ছত্রভোগ একটি সমৃদ্ধ বন্দররূপে প্রসিদ্ধ ছিল এবং লোকে তখন ভাগীরথী-পথে ঐ স্থান দিয়াই সমুদ্রে যাতায়াত করিত।

ছত্রভোগের প্রাচীনত্ব এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে বঙ্গদেশ মুসলমান অধিকারে আসিবার পূর্ব্বেও যে সেখানে সমৃদ্ধ লোকালয় ছিল তাহা জানা যায় সেখানকার ভূগর্ভে আবিষ্কৃত পাল ও সেন রাজগণের আমলের অনেকগুলি কালো প্রস্তরের হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং কয়েকটি কারু-কার্য্যমণ্ডিত দ্বারফলক ও স্তম্ভাদি হইতে।

* ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত এলিসনের সুন্দরবনের মানচিত্র দ্রষ্টব্য। উহাতে ঐ নদীর নাম ছতরভোগ লিখিত আছে। উক্ত ছতরভোগ যে ছত্রভোগের নামান্তর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উহার বর্ত্তমান নাম ছুতরভোগ ঐ ছতরভোগ নামেরই অপভ্রংশ।

২২ নম্বর লট বকুলতলায় ও দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামে মহারাজা লক্ষ্মণসেন দেবের যে দুইখানি তাম্রপট্টে খোদিত ভূমিদান সনন্দ পাওয়া গিয়াছে তাহা পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, সেন-রাজত্বকালে শাসন-সৌকার্য্যার্থ আদিগঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী ছত্রভোগ প্রভৃতি স্থান বর্দ্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ড চতুরকের অধীন ছিল। কিন্তু ঐ প্রদেশের তৎকালীন অন্যান্য বিবরণ অজ্ঞাত। উহার পরবর্ত্তী পাঠান সুলতানদের শাসন সময়ের তথাকার সামান্য পরিচয় বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়। উহাতে উল্লিখিত আছে যে, সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে (খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে) রামচন্দ্র খাঁ নামক এক ব্যক্তির উপর দক্ষিণবঙ্গের শাসন-ভার ন্যস্ত ছিল এবং তিনি ছত্রভোগে থাকিতেন।

প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে দেখা যায় যে, তৎকালে গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের অধীনে অনেক হিন্দু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দবির খাস বা রূপ গোস্বামী, সাকার মল্লিক বা সনাতন গোস্বামী ও পুরন্দর খাঁ বা গোপীনাথ বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। অধুনা ছত্রভোগের প্রায় বার ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে সোনারপুর থানার অধীন মাহিনগর নামে একটা গ্রাম আছে। প্রবাদ, ঐ সময় সেখানে উপরোক্ত গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁর নিবাস ছিল। তিনি হোসেন শাহের উজীর ছিলেন, তাঁহার ও তদ্বংশীয়গণের উপাধি খাঁ ছিল।** ছত্রভোগের শাসনকর্ত্তা চৈতন্য-ভাগবতোক্ত রামচন্দ্র খাঁ কে ছিলেন তাহার কোন উল্লেখ কোথাও নাই। তিনি উক্ত পুরন্দর খাঁর বংশের কেহ হওয়া অসম্ভব নহে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাচীন ছত্রভোগ নগরের স্থান এখন জলঘাটা, ছত্রভোগ, কৃষ্ণচন্দ্রপুর ও বড়াশী প্রভৃতি নামে অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রাম অধিকার করিয়া আছে। ঐ সমস্ত গ্রামেই ভূগর্ভ খননকালে কিছু কিছু পুরাবস্তু পাওয়া গিয়াছে। উহা ভিন্ন অনেক প্রাচীন গৃহ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং কয়েকটি দেবতাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ছত্রভোগে দেবী ত্রিপুরা-

**বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুন্দরী ও বড়াশীতে অম্বুলিঙ্গের নাম সবিশেষ প্রসিদ্ধ। কতকগুলি প্রাচীন বাংলা-পুঁথিতেও ঐ দেবতা দুইটির উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর কিছুদিন পূর্ব্বে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে দেবীর যন্ত্র-মূর্ত্তিটি রাখিয়া পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই নবনির্ম্মিত গৃহের পশ্চাতে প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নভিত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে। উহার সংলগ্ন ভূখণ্ড খননকালে একটি কালো প্রস্তরের নৃসিংহ মূর্ত্তি, একটি শিবলিঙ্গ ও কয়েকটি চতুষ্কোণ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডও পাওয়া গিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীকাব্যে উক্ত গ্রন্থের নায়ক ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগরের আদিগঙ্গা পথে সিংহলে বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে ছত্রভোগের উক্ত ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর যে উল্লেখ আছে তাহা এই :

"বালীঘাটা এড়াইল বেনের নন্দন।
কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন॥
তীরের প্রমাণ যেন চলে তরিবর।
তাহার মেলানি বহে মাইনগর॥
নাচনগাছা বৈষ্ণবঘাটা বামদিকে থুইয়া।
দক্ষিণেতে বারাসাত গ্রাম এড়াইয়া॥
ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা।
ছত্রভোগে উত্তরিলা অবসান বেলা॥
ত্রিপুরা পূজিয়া সাধু চলিল সত্বর।
অম্বুলিঙ্গে গিয়া উত্তরিলা সদাগর॥"

ছত্রভোগে ঐ সকল দেবালয় থাকায় উহা তৎকালে একটি তীর্থক্ষেত্র বলিয়াও গণ্য হইত। সেকারণও হিন্দুগণ ভাগীরথী-পথে সমুদ্রে যাইবার সময় সেখানে নামিয়া তীর্থকার্য্যাদি সম্পন্ন করিতেন ও বদরিকা কুণ্ডের জল নৌকায় লইতেন। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বটগ্রাম নিবাসী বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তী তাঁহার মনসার ভাসানে উহার এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন :

"কালীঘাটে চাঁদ রাজা কালীকা পূজিয়া।
চূড়াঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া॥
ধনস্থান এড়াইল বড় কুতুহলে।
বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে॥
ছলিয়ার গাঙ্গ বাহি চলিল ত্বরিত।
ছত্রভোগে গিয়া রাজা চাপায় বুহিত॥
তীর্থকার্য চাঁদ রাজা করিল তথায়।
বদরিকা কুণ্ডজল লইল নৌকায়॥"*

ছত্রভোগে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দিরের প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে পূর্ব্বোল্লিখিত বড়াশী গ্রামে উক্ত বদরিকানাথ বা অম্বুলিঙ্গের বর্ত্তমান মন্দির ভাগীরথীর শুষ্ক খাদের পশ্চিমে এক উচ্চ ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত। সেখানেও একটি প্রাচীন মন্দির ছিল। উহার ধ্বংসাবশেষ উক্ত উচ্চ ভূখণ্ডের মধ্যে নিহিত আছে। বর্ত্তমান মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ কালো প্রস্তরের গৌরীপট্ট পড়িয়া আছে। সম্ভবতঃ পূর্ব্বে উহা অম্বুলিঙ্গের প্রাচীন মূর্ত্তির অঙ্গীভূত ছিল।

অম্বুলিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল তাহা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে রচিত চৈতন্য-ভাগবতে এইরূপে উল্লিখিত আছে।

"অম্বুলিঙ্গ শঙ্কর হইলা যে নিমিত্ত।
সেই কথা কহি শুন হই এক চিত্ত॥
পূর্বে ভাগীরথ করি গঙ্গা আরাধন।
গঙ্গা আনিলেন বংশ উদ্ধার কারণ॥
গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া।
শিব আইলেন শেষে গঙ্গা স্মরাইয়া॥
গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভোগে।
বিহ্বল হইলা অতি গঙ্গা অনুরাগে॥
গঙ্গা দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িলা।
জলরূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইলা॥
* * *
জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে।
অম্বুলিঙ্গ ঘাট বলি ঘোষে সর্বজনে॥"**

*বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তীর মনসার ভাসান ছাপা হয় নাই। উহার দুইখানি পুরাতন নকল বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় আছে। উক্ত পুঁথির বিশদ পরিচয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার নিম্নলিখিত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে : ১৩৪৩ সাল, ২য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৭।

**চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ২য় অধ্যায়।

ইদানীং অম্বুলিঙ্গের মন্দিরের সন্নিকটে ভাগীরথীর শুষ্ক খাদের উপর চক্রতীর্থ নামে একটি তীর্থস্থান আছে। প্রবাদ, ভগীরথ গঙ্গাকে লইয়া যাইতে যাইতে সেখানে তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, সেকারণ গঙ্গাদেবী তথায় ভগীরথকে তাঁহার হস্তস্থিত চক্র দেখাইয়া নিজ স্থান নির্দ্দেশ করেন।

প্রাচীনকালে উক্ত তীর্থটিও প্রসিদ্ধ ছিল। বরাহ-পুরাণে উহার উল্লেখ পাওয়া যায়।* অধুনা ভাগীরথীর শুষ্ক খাদের উপর ঐ তীর্থস্থানটি গোপালকুণ্ড, চক্রকুণ্ড ও মণিকুণ্ড নামে তিনটি পুষ্করিণীরূপে বিদ্যমান। ঐ পুষ্করিণী কয়টিতে স্নান উপলক্ষে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে নন্দার মেলা নামে একটি বিখ্যাত মেলা হয়। প্রাচীনকাল হইতে যে এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা জানা যায় খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে রচিত কবি কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল কাব্যের এই অংশ হইতে :

"অম্বুলিঙ্গ মহাস্নান, নাহি যার উপমান,
তথায় বন্দিল বিশ্বনাথ।
বাদ্য বাজে সুমধুর, বাহিয়া রাজা বিষ্ণুপুর
জয়নগর করিলা পশ্চাৎ॥"

চৈতন্যভাগবত পাঠে আরও জানা যায় যে ছত্রভোগের দক্ষিণে গঙ্গা বহু শাখায় বিভক্ত ছিল বলিয়া তখন শতমুখী গঙ্গা নামে অভিহিত হইত এবং উক্ত অম্বুলিঙ্গের মন্দিরের নিকটে গঙ্গার উপর অম্বুলিঙ্গ নামে একটি প্রসিদ্ধ ঘাট ছিল। যথা—

"সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হইয়া শতমুখী।
বহিতে আছয়ে সর্ব্বলোকে করে সুখী॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
অম্বুলিঙ্গ ঘাট বলি ঘোষে সর্ব্বজনে॥"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল গমনকালে ছত্রভোগে এক রাত্রি অতিবাহিত করেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে উহার পরিচয় আছে। উহাতে দেখা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেব প্রথমে শান্তিপুর হইতে যাত্রা করিয়া আটিসারা গ্রামে আগমন করেন।** সেখানে অনন্ত পণ্ডিত নামে একজন বৈষ্ণব ভক্তকে কৃপাকরতঃ গঙ্গাতীর অবলম্বনে প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় ছত্রভোগে উপনীত হন। বৃন্দাবন দাস ঐ সময় তাঁহার ঐরূপে ছত্রভোগে আগমনের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই :

"নিরবধি জগন্নাথ প্রতি আর্ত্তি করি।
আইসেন সর্ব্বপথ আপনা পাসরি॥
কারে বলি রাত্রিদিন পথের সঞ্চার।
কিবা জল কিবা স্থল পার বা ওপার॥
কিছুই না জানে প্রভু ডুবি ভক্তিরসে।
প্রিয়বর্গ রাখে দেহ রহি চারিপাশে॥
* * *
এই মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগে মহাকুতূহলে॥"

এইভাবে গঙ্গাতীর অবলম্বনে অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ সহ ছত্রভোগে আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেব অম্বুলিঙ্গ ঘাটে উপনীত হন এবং তথা হইতে শতমুখী গঙ্গা দর্শনে আনন্দে অধীর হইয়া হরিধ্বনিতে সেই স্থান মুখরিত করেন :

"ছত্রভোগে গেলা প্রভু অম্বুলিঙ্গ ঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে॥
দেখিয়া হইলা প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
হরিধ্বনি হুঙ্কার করেন কোলাহল॥"

ঐ সময়ের কিছু পরে দক্ষিণদেশের তৎকালীন শাসন-কর্ত্তা পূর্ব্বোক্ত রামচন্দ্র খাঁ দোলায় চড়িয়া অম্বুলিঙ্গ ঘাটের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি সেখানে শ্রীচৈতন্য-দেবকে দেখিতে পান এবং দোলা হইতে নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন। কিন্তু তখন শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথ দর্শনের আশায় অধীর হইয়া ভূমিতে পতিত ও ক্রন্দনরত ছিলেন। সেই করুণ দৃশ্য রামচন্দ্র খাঁকে এরূপ বিচলিত করিয়া তুলে যে, তিনি তাহা দেখিয়া কি উপায়ে তাঁহাকে শান্ত করিবেন এই চিন্তায় আকুল হইয়া উঠেন। বৃন্দাবন দাস উহা এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন :

"আনন্দ আবেশে প্রভু সর্ব্বগণ লইয়া।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সুখী হইয়া॥
* * *

---

*বরাহপুরাণ (বঙ্গবাসী সংস্করণ), ১৩০ অধ্যায়।

**বর্ত্তমানে বারুইপুর বাজারের দক্ষিণে উক্ত আটিসারা পল্লী ভাগীরথী তীরে অবস্থিত ছিল। ঐ স্থান সেকারণ মহাপ্রভুর বাটি নামে প্রসিদ্ধ। অনন্ত পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন দারুময় শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ মূর্ত্তি এখনও সেখানে বর্ত্তমান আছে।

সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র খান।
যদ্যাপি বিষয়ী তবু মহাভাগ্যবান॥
অন্যথা প্রভুর সঙ্গে তান দেখা কেনে।
দৈবগতি আসিয়া মিলিলা সেই স্থানে॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ ভয় হইলা মনে।
দোলা হইতে সত্বর নামিলা সেই ক্ষণে॥
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা ভূমিতলে।
প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দ জলে॥

* * *

হাহা প্রভু জগন্নাথ প্রভু বলে ঘনে ঘন।
পৃথিবীতে পড়ি ঘন করয়ে ক্রন্দন॥
দেখিয়া প্রভুর আর্ত্তি রামচন্দ্র খান।
অন্তরে বিদীর্ণ হইল সজ্জনের প্রাণ॥
কোনমতে এ আর্ত্তির হয় সম্বরণ।
কান্দে আর এই মত চিন্তে মনে মন॥"

এই অবস্থায় কিছুক্ষণ অতীত হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের কিছু বাহ্যস্ফূর্ত্তি হয়। তিনি রামচন্দ্র খাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন এবং তথায় সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট হইতে তাঁহাকে দক্ষিণদেশের অধিকারী বলিয়া জানিতে পারেন। তখন,

"প্রভু বলে তুমি অধিকারি বড় ভাল।
নীলাচলে যাই আমি কেমতে সকাল॥
বহয়ে আনন্দধারা কহিতে কহিতে।
নীলাচলচন্দ্র বলি পড়িলা ভূমিতে॥"

ঐ সময় গৌড়ের সুলতানের সহিত উৎকল-রাজের কলহ চলিতেছিল। সে কারণ গৌড়রাজ্য হইতে কাহাকেও উৎকলে যাইতে দেওয়া হইত না এবং উভয় রাজ্যে লোক যাতায়াত বন্ধ ঘোষণা করিয়া চারিদিকে ত্রিশূল প্রোথিত হইয়াছিল।* এইরূপ রাজাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তৎকালে রামচন্দ্র খাঁ শ্রীচৈতন্যদেবের অদ্ভুত প্রেমোন্মাদ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বলেন:

"যে আজ্ঞা তোমার সেই কর্ত্তব্য নিশ্চয়।
সবে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়॥
সে-দেশে এ-দেশে কেহ পথ নাহি বয়॥
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে জাসু বলি লয় প্রাণে॥
কোন্ দিগ্ দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া।
তাহাতে ডরাঙ প্রভু! শুন মন দিয়া॥
মুঞি সে নস্কর হেথাকার মোর ভার।
নাগালি পাইলে আগে সংশয় আমার॥
তথাপিহ যেতে কেনে প্রভু মোর নয়।
যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিমু নিশ্চয়॥"

রামচন্দ্র খাঁর এই সকল বাক্যে শ্রীচৈতন্যদেব আনন্দিত হন এবং সেই রাত্রি ছত্রভোগে এক ব্রাহ্মণগৃহে থাকিয়া রাত্রির অধিকাংশ ভাগই সংকীর্ত্তনে অতিবাহিত করেন। ছত্রভোগবাসিগণ তখন সংকীর্ত্তনানন্দে বিভোর, তাঁহার লাবণ্যময় সুন্দর দেহে কম্প ও পুলকাদি মহাভাবের বিচিত্র বিকাশ ও পদ্মপলাশলোচনদ্বয়ে অদ্ভুত প্রেমাশ্রুপাত দর্শনে মুগ্ধ হইয়া রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সেই কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করেন। চৈতন্যভাগবতকার ঐ সময়ের যে সুন্দর আলেখ্য রচনা করিয়াছেন তাহা এই:

"দৃষ্টিমাত্র তাঁর সর্ব্ব বন্ধক্ষয় করি।
ব্রাহ্মণ আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি॥

* * *

নানাযত্নে দৃঢ় ভক্তিযোগ চিত্ত হইয়া।
প্রভুর রন্ধন বিপ্র করিলেন গিয়া॥

* * *

নিত্যানন্দ আদি সর্ব্ব প্রিয়বর্গ লইয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥
কিছুমাত্র অন্ন প্রভু পরিগ্রহ করি।
উঠিলেন হুঙ্কার করিয়া গৌরহরি॥

* * *

মুকুন্দ লাগিল মাত্র কীর্ত্তন করিতে।
আরম্ভিলা বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর নাচিতে॥
পুণ্যবন্ত যত যত ছত্রভোগবাসী।
সভে দেখে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ বিলাসী॥

* ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে উৎকল-রাজ প্রতাপরুদ্রদেবের সহিত গৌড়-সুলতান হোসেন শাহের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এখানে সম্ভবতঃ তাহারই কথা উল্লিখিত আছে।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, পুলক, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম।
কত হয় কে জানে সে বিকারের মর্ম্ম॥
কিবা সে নয়নের অদ্ভুত প্রেমধার।
ভাদ্র মাসে যে হেন গঙ্গার অবতার॥

*　　*　　*

এই মত গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্থির হইলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥
হেনই সময়ে কহে রামচন্দ্র খান।
নৌকা আসি ঘাটে প্রভু হৈল বিদ্যমান॥"

ঘাটে নৌকা আসিবার এই সংবাদ পাইবামাত্র শ্রীচৈতন্যদেব সপারিষদ নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গার তীরে উপনীত হন এবং নৌকাতে আরোহণ পূর্ব্বক নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করেন।

এই সকল বিবরণ হইতে জানা যায়, মুসলমান রাজত্বকালের প্রথম ভাগেও ছত্রভোগে সমৃদ্ধ লোকালয় ছিল। কিন্তু চৈতন্যভাগবতে প্রদত্ত শ্রীচৈতন্যের ছত্রভোগ হইতে নীলাচল গমনের উক্ত বিবরণের পরবর্ত্তী অংশে দেখা যায় যে, ঐ সময়ের পূর্বেই ছত্রভোগের দক্ষিণাংশ প্রদেশ বনময় হইয়া গিয়াছিল। সেহেতু বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন যে, ছত্রভোগের দক্ষিণে গিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদগণ নৌকাতে কীর্ত্তন করিতে থাকিলে মাঝি তাঁহাদের উহা বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলেন :

অবুধ নাইয়া বোলে, "হইল সংশয়।
বুঝিলাও আজি আর প্রাণ নাহি রয়॥
কুলে উঠিলে সে বাঘে লইয়া পালায়।
জলে পড়িলে সে বোল কুম্ভীরেই খায়॥
নিরন্তর এই পানিতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন-প্রাণ দুই নাশ করে॥
এতেক যাবত উড়িয়ার দেশ পাই।
তাবত নীরব হও সকল গোসাঞি॥"

মুসলমান আমলের শেষ ভাগে কি জন্য ছত্রভোগের প্রাচীন সমৃদ্ধির বিলোপ ঘটে এবং উহা একটি নগণ্য পল্লীতে পর্য্যবসিত হয় তাহা অজ্ঞাত। প্রবাদ, ভাগীরথী নদীর অন্তর্ধান ও মগ, পর্ত্তুগীজদের অত্যাচারই উহার কারণ। পরে সেখানে নীলকরেরাও ঘাঁটি স্থাপন করে। উহার নিদর্শন-স্বরূপ অনেকগুলি নীল প্রস্তুত করিবার গৃহ ও চৌবাচ্চার ধ্বংশাবশেষ এখনও ছত্রভোগ ও কাটান দীঘিতে দেখিতে পাওয়া যায়। (ছত্রভোগ)

চব্বিশ-পরগণা জেলার মথুরাপুর থানার অন্তর্গত প্রাচীন ছত্রভোগ (মৌজা নং ৪১) নগরী আজ একটি নগণ্য গ্রাম মাত্র। শতমুখী গঙ্গা কেন আজ এই স্থানে গঙ্গা প্রবাহেরই কোন চিহ্ন মাত্র নাই। ছত্রভোগের উত্তর ও পূর্ব সীমানা দিয়া প্রবাহিত অধুনালুপ্ত আদিগঙ্গা গঙ্গাবাদা নামে ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, প্রাচীনকালে ছত্রভোগ কেবল মাত্র আয়তনেই বৃহৎ ছিল না, একটি সমৃদ্ধশালী জনপদরূপেও পরিচিত ছিল। এই জনপদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন ত্রিপুরাসুন্দরী। ইহা একটি পীঠস্থান বলিয়া দাবী করা হয়।

বর্তমান ছত্রভোগ গ্রামে ব্রাহ্মণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, কুমার, তেলী, নাপিত, কাওরা, বাগ্দী ও মুসলমান পরিবারের বসবাস আছে। মোটরবাসে রায়দীঘি রোডের কৃষ্ণচন্দ্রপুরের মোড়ে নামিয়া একটি অপ্রশস্ত কাঁচা রাস্তা ধরিয়া প্রায় অর্ধ মাইল অগ্রসর হইলে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দিরে পৌছান যায়। গ্রামের প্রান্তে সমতল ছাদ্ বিশিষ্ট ও চারিদিকে বারান্দাযুক্ত দক্ষিণমুখী ইষ্টক নির্মিত একটি গৃহ ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দির বলিয়া পরিচিত। মন্দিরাভ্যন্তরে কাষ্ঠ মঞ্চের উপর ত্রিনয়নী, চতুর্ভুজা, রক্তবর্ণা দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর দণ্ডায়মানা ষোড়শী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। দেবী বস্ত্র পরিহিতা এবং মস্তকে শোলার মুকুট শোভা পাইতেছে। মন্দিরে লাল শালু কাপড়ে জড়ান শিলায় খোদিত দেবীযন্ত্র আছে। পুরোহিত ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট ইহা দর্শনীয় নহে। এই দেবযন্ত্রেই ত্রিপুরাসুন্দরীর উদ্দেশ্যে যথারীতি পূজা হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন, মন্দিরে একটি ছোট শিবলিঙ্গ আছে। বড়াশী গ্রামের অম্বুলিঙ্গ মহাদেব দেবীর ভৈরব বলিয়া পরিচিত।

প্রায় আশী বৎসর পূর্বে কাকদ্বীপ (১নং) নিবাসী ঈশান চন্দ্র কর্মকার নামে জনৈক ব্যক্তি বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন বলিয়া জানা যায়। মাঝে একবার নিকটবর্তী বিষ্ণুপুর গ্রামের ডঃ তুলসী চরণ বাচস্পতি মহাশয় ইহার

সংস্কার করান। এই মন্দির নির্মাণের পূর্বে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী যে-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাহা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বর্তমান মন্দিরের পশ্চাৎভাগে উহার ভিত্‌ ও ভগ্ন দেওয়ালাদি দেখিলে মনে হয় যে, প্রাচীন মন্দিরটি আয়তনে বৃহৎ ছিল। একটি জনশ্রুতি হিসাবে বলা হয় আদিতে নিকটবর্তী কাটানদীঘি গ্রামের মোল্লাপাড়ায় চালধোয়া পুকুরের নিকট একটি মন্দিরে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তথায় নিত্য পূজাদির ত্রুটি হইতেছে এইরূপ স্বপ্নাদেশ পাইয়া দেবী মূর্তি এই স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়।

ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর অন্নভোগ দ্বারা নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দেবীর যাত্‌ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে যাত্‌ উপলক্ষে পূর্ণিমা তিথির আট দিন পূর্ব হইতে মন্দিরে নিয়মিত চণ্ডীপাঠ, চতুর্দ্দশী তিথিতে সাধারণের মধ্যে অন্নভোগ বিতরণ এবং পূর্ণিমা তিথিতে বহু পাঠাবলিসহ সাড়ম্বরে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর পূজা হইয়া থাকে। এইদিন দেবীর নিকট প্রদত্ত বলির পাঠাগুলিকে উপস্থিত দর্শকেরা কাড়াকাড়ি করিয়া যে যাহার মত লইয়া যান। কিছুকাল পূর্বেও বড়িষার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদিগের নামে একটি সরকারী বলি হইত। অদ্যাপি জ্যৈষ্ঠ মাসের উৎসবে তাঁহাদের বাড়ী হইতে পূজার নৈবেদ্য আসে। দেবীর নিত্য পূজার জন্য চৌধুরীদিগের প্রদত্ত কিছু দেবোত্তর জমি আছে। উৎসব-কালে মন্দিরে প্রায় তিন হাজার ভক্ত ও দর্শকের সমাগম হয়। নানারূপ কামনা-বাসনা জানাইয়া অনেকে দেবীর নিকট মানসিক পূজা দিয়া থাকেন। পাঠাবলি ব্যতীত স্বর্ণ ও রৌপ্য অলংকার, তামা, পিতল ও পাথরের বাসন-পত্র এবং ষোড়শোপচারে পূজা মানসিক করা হয়। স্থানীয় মতিলাল পদবীধারী বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজাদি করেন। এই উৎসব উপলক্ষে মন্দির সম্মুখস্থ ধান জমিতে নানাবিধ জিনিসপত্রের অনেকগুলি দোকানপাট বসে। ইহা ব্যতীত, চৈত্রসংক্রান্তি তিথিতে আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে দলে দলে গাজন সন্ন্যাসীরা মন্দিরে প্রণাম জানাইতে আসেন এবং মন্দির প্রাঙ্গণে 'ঝাঁপ' পর্ব পালন করেন। তদুপলক্ষেও এই স্থানে একটি মেলা বসিয়া থাকে।

বড়াশী

কলিকাতা হইতে প্রায় ৩৫ মাইল দূরে শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর রেলপথে মথুরাপুর রোড স্টেশনের প্রায় চার মাইল পূর্ব-দক্ষিণ কোণে প্রাচীন ছত্রভোগ অঞ্চলের অন্তর্গত বড়াশী (মৌজা নং ৪৬) গ্রাম অবস্থিত। বড়াশী হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে ছত্রভোগে প্রাচীন ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মথুরাপুর রোড স্টেশন হইতে অথবা কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত গড়িয়া হইতে মোটরবাসে বড়াশী গ্রামে যাতায়াত করিতে পারা যায়। বর্তমানে গ্রামে ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কুমার, নাপিত, যোগী, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বসবাস আছে।

বড়াশীতে অতি প্রাচীনকাল হইতে বদরিকানাথ নামে এক স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ আছে। ইহার প্রাচীন নাম অম্বুলিঙ্গ। বদরিকানাথ শিবমন্দিরটি দক্ষিণমুখী এবং আটচালা গঠনে নির্মিত। ইষ্টক নির্মিত এই উচ্চ মন্দিরের চূড়ায় পাশাপাশি তিনটি কলস স্থাপিত এবং ইহার চারিদিকের রোয়াক্ করগেট টিনের চালা দ্বারা আচ্ছাদিত। বাহির হইতে মন্দিরটি খুব জীর্ণ বলিয়া মনে না হইলেও ইহার অভ্যন্তরভাগের দেওয়াল গাত্রে বড় বড় ফাটল দেখিতে পাওয়া যায়। সম্মুখে প্রশস্ত নাটমন্দিরের গাত্রে রামায়ন, মহাভারত ও পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে সিমেন্ট-বালি দ্বারা জমান মূর্তি নির্মাণ করিয়া রং দ্বারা চিত্রিত করা হইয়াছে। পার্শ্ববর্তী কাশীনগর গ্রাম নিবাসী শ্রীজ্যোতিশ চন্দ্র মালি নামে জনৈক শিল্পী দ্বারা উক্ত শিল্পকর্ম সাধিত হইয়াছে। মন্দিরের পূর্বদিকে বাঁধা ঘাট সহ 'শিবকুণ্ড' নামে একটি পবিত্র পুষ্করিণী আছে।

মন্দির অভ্যন্তরের মেঝে ভেদ করিয়া একটি প্রস্তর লিঙ্গ উঠিয়াছে। উহার চারিপাশে বেষ্টন করিয়া সিমেন্ট দ্বারা নির্মিত গৌরীপট্ট স্থাপিত। ইহাই অম্বুলিঙ্গ তথা বদরিকানাথ শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের উভয় পার্শ্বে একটি কৃষ্ণ প্রস্তর এবং একটি শ্বেত প্রস্তর নির্মিত ষণ্ড মূর্তি ব্যতীত

একটি কষ্টি পাথরের গোপাল মূর্তি এবং একটি শালগ্রাম শিলা আছে।

বদরিকানাথ শিবের নিত্য পূজাদি হয়। বর্তমান উত্তর কাশীপুর নিবাসী কাশ্যপ গোত্রীয় চক্রবর্তী ব্রাহ্মণেরা বংশপরম্পরায় শিবের পূজাদি করিতেছেন। প্রতি সোম-শুক্রবার নানা স্থান হইতে ভক্তরা শিবের নিকট মানসিক পূজাদি দিতে আসেন। প্রধানতঃ ভক্তরা ক্ষয়কাশ, হাঁপানী, অম্ল, একশিরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগ মুক্তি ও বন্ধ্যাত্ব অপসারণের জন্য শিবের নিকট মানসিক করিয়া থাকেন। ষোড়শোপচারে পূজা, অর্থ-অলঙ্কার ইত্যাদি দিয়া ভক্তরা মানসিক শোধ করেন। মানত জানাইয়া কেহ কেহ মন্দিরে শিশুর মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকেন।

প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি উপলক্ষে এবং চৈত্র মাসে চড়ক উপলক্ষে বদরিকানাথ শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া সাড়ম্বরে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শিবরাত্রির সময় মন্দির প্রাঙ্গণে দুইদিন-ব্যাপী একটি মেলায় বিভিন্ন জিনিসপত্রের পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে। রাত্রিকালে যাত্রাভিনয় হয়।

চৈত্র মাসের ১৫ই তারিখ হইতে গাজন উৎসব আরম্ভ হয়। এইদিন মূল সন্ন্যাসী সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। চাঁদভাষা গ্রামের মাহিষ্য সম্প্রদায়েরা বংশ পরম্পরায় বদরিকানাথ শিবের গাজন উৎসবে মূল সন্ন্যাসীর ব্রত পালন করিতেছেন। তবে গত দশ বৎসর যাবত রায়দীঘি গ্রাম নিবাসী তাঁহাদের দৌহিত্র পরিবারের শ্রীভূষণ হালদার মূল সন্ন্যাসী হইতেছেন। ২৬শে ও ২৭শে তারিখে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ মন্দিরের পুরোহিতের নিকট সামান্য অর্থ দক্ষিণা দিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। ব্রত গ্রহণের পূর্বে ভক্তরা ক্ষৌর-কর্ম সম্পাদন করেন। বড়াশী নিবাসী শ্রীকবিরাম প্রামাণিক ও শ্রীশঙ্কর প্রামাণিক গাজন সন্ন্যাসীদের ক্ষৌরকার্য করেন এবং সারা বৎসর মানতকারী শিশুদের মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকেন। ইহারাও বংশানুক্রমে এই কার্য করিতেছেন। এই দুইদিনে প্রায় আড়াই হাজার নরনারী সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকালে ভক্তদের শিব গোত্রান্তরিত করা হয় এবং তাঁহারা চৈত্র সংক্রান্তি পর্যন্ত দিনান্তে এক বেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও শুদ্ধাচারে জীবন-যাপন করেন। কেবল নীলপূজার দিন গাজন সন্ন্যাসীদের নিরম্বু উপবাস পালন করিতে হয়।

উৎসবকালে প্রতিদিন মন্দিরে পূজারী ব্রাহ্মণ যথারীতি পূজাদি করিয়া থাকেন এবং সন্ন্যাসীরা নানারূপ আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। ১৫ই তারিখ হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত মূল সন্ন্যাসী মন্দিরের বাহিরে নূতন মাটির মালসায় এক প্রকার ভোগ রন্ধন করেন এবং ঐ ভোগ পুরোহিত কর্তৃক শিবের উদ্দেশে নিবেদিত হয়।

সংক্রান্তির পূর্বদিন নীলপূজা উপলক্ষে সন্ধ্যাকালে বহু স্ত্রীলোক মন্দিরে নীলের বাতি দিতে আসেন। রাত্রিকালে মন্দিরে হর-পার্বতীর পূজা হয়।

৩০শে চৈত্র অর্থাৎ সংক্রান্তির দিন চড়কপূজা ও গাজন সন্ন্যাসীদের 'ঝাঁপ' পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। 'ঝাঁপ' পর্বের পূর্বে শিবের অনুমতির জন্য মন্দিরাভ্যন্তরে শিবলিঙ্গের উপরিভাগে পুরোহিত ফুল-বেলপাতা চাপান। শিবের অনুমতিসূচক উক্ত ফুল-বেলপাতা আপনি পুরোহিতের হাতে খসিয়া পড়িলে সন্ন্যাসীরা চাল, ডাব, শশা, আম প্রভৃতি সংগৃহীত ফলাদি কোঁমরে বাঁধিয়া প্রথমে মন্দির প্রদক্ষিণ করেন এবং পরে বাঁশের মাচা হইতে নীচে রক্ষিত কাঁটা, আগুন বা ধারাল অস্ত্রের উপর ঝাঁপ দেন। ইহার পূর্বে তাঁহারা মন্দিরের নিকট মনসার স্থানে এবং গ্রামের হালদার পাড়ায় নিম ও বটগাছের নীচে পঞ্চাননের নির্দিষ্ট স্থানে প্রণাম জানান। ঐ স্থানে পঞ্চাননের প্রতীকস্বরূপ একটি পাথর খণ্ড ও একটি ঘট স্থাপিত আছে। সায়াহ্নে চড়কগাছে পাক্ খাইয়া থাকেন। চড়কগাছটি সারা বৎসর শিবকুণ্ডের জলে ডুবান থাকে। এইদিন ঢাক-ঢোলের বাজনাসহ চড়কগাছটি জল হইতে তুলিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পূজাদি করা হয়। বদরিকানাথ শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব প্রত্যক্ষ করিতে ও পূজাদি দিতে আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারীর সমাগম হয়। ১লা বৈশাখ ভক্তরা সন্ন্যাসব্রত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আরম্ভ করেন এবং গাজন উৎসবের সমাপ্তি হয়।

শিবের নিত্য পূজাদির জন্য দেবোত্তর জমি আছে। পূর্বে এই শিবমন্দির কলিকাতার বরদাকান্ত রায়চৌধুরী-দিগের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কথিত আছে, বর্তমান মন্দিরটি বরদাকান্ত রায়চৌধুরী কর্তৃক নির্মিত। তাহা

ছাড়া, নবাব আলীবর্দী শিবপূজার নিমিত্তে বহু জমি দান করেন বলিয়া শোনা যায়। কিংবদন্তী আছে বদরিকানাথ শিবের অলৌকিক মাহাত্ম্য পরীক্ষা করিতে তিনি স্বয়ং একদা গাজন উৎসবের সময় এখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং একটি তীক্ষ্ণ ও ধারাল বর্শা স্থাপন করিয়া তাহার উপর গাজন সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ দিতে আহ্বান করেন। শোনা যায়, গাজন সন্ন্যাসীদের এই সঙ্কট মুহূর্তে স্বয়ং মহাদেব শঙ্খচিলের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের সহায়তা করেন। যাহার ফলে সন্ন্যাসীরা শঙ্খচিলের ইঙ্গিত পাইবা মাত্র মুখে শিবের জয়ধ্বনি দিয়া অকুতভয়ে উক্ত বর্শার উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িলে বর্শাটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। অনেকে বলেন, এই কারণে গ্রামের নাম 'বর্শাভঙ্গ' হয় এবং বর্শাভঙ্গ অপভ্রংশে বড়াশী হইয়াছে।

অম্বুলিঙ্গ তথা বদরিকানাথ শিব সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভগীরথ যখন মহাদেবের জটা হইতে গঙ্গাকে মুক্ত করিয়া পিতৃপুরুষের উদ্ধারের জন্য কপিলাশ্রম অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তখন মহাদেব দীর্ঘকাল গঙ্গার বিরহে অধীর হইয়া তাঁহার অনুসরণ করেন এবং ছত্রভোগের নিকট আসিয়া জলরূপে গঙ্গার সহিত মিলিত হন। জনশ্রুতি, গঙ্গার স্রোত রুদ্ধ হইবার পর জলময় শিব পাষাণময় শিবলিঙ্গরূপে স্থলভাগে আবির্ভূত হন। তদবধি বদরিকানাথ শিবের পূজা চলিতেছে। বদরিকানাথ শিবমন্দিরের অতি নিকটে বর্তমান রায়দীঘি রোডের পশ্চিমে প্রাচীন ভাগীরথীর গর্ভে নন্দা পুষ্করিণী বা চক্রতীর্থ অবস্থিত। কথিত আছে, শিবের সহিত গঙ্গার মিলনকালে জলস্রোতের গর্জন স্তব্ধ হইলে অগ্রগামী ভগীরথ সংশয়াকুল-চিত্তে পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনি করিতে থাকেন, তখন গঙ্গাদেবী মকরস্থিত জ্যোতির্ময় চক্র উত্তোলন করিয়া ভগীরথকে তাঁহার অবস্থান নির্দেশ করেন। শিবগঙ্গার মিলনস্থলে এই চক্র প্রদর্শিত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থান চক্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

চৈত্র মাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। প্রতিপদ, ষষ্ঠী ও একাদশী এই তিন তিথিকে নন্দা বলে। এইজন্য চক্রতীর্থের অপর এক নাম নন্দা। বর্তমানে নন্দা বা চক্রতীর্থ একটি সাধারণ পুষ্করিণী মাত্র। ইহার চারিপাশ ঘিরিয়া কয়েকটি প্রাচীন শিরিষ, বট ও অশ্বত্থ গাছ দেখিতে পাওয়া যায় এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে দুইটি প্রশস্ত বাঁধাঘাট আছে। ভারতের অন্যান্য স্থানেও 'চক্রতীর্থ' এই নামে তীর্থ আছে। পুরী, কাশী, প্রভাস ও বৃন্দাবনেও এক একটি চক্রতীর্থ আছে। এই অঞ্চলের অধিবাসীগণের বিশ্বাস যে, পুরাণ বর্ণিত চক্রতীর্থ ছত্রভোগেই অবস্থিত। তাঁহারা বলেন যে গঙ্গা, সঙ্কেতমাধব, অম্বুলিঙ্গ শিব ও ত্রিপুরাসুন্দরী শক্তি—এই চতুর্ব্যূহ-মহাশক্তির অধিষ্ঠানের জন্য প্রাচীন ছত্রভোগই প্রকৃত চক্রতীর্থ। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাড়াশী গ্রাম সংলগ্ন মাধবপুরে (পশ্চিমদিকে আধ মাইলের মধ্যে) জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে 'সঙ্কেত মাধব' নামে খ্যাত কষ্ঠিপাথর নির্মিত অতি সুন্দর চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তি পূজিত হইত। ১৩৭১-৭২ বঙ্গাব্দে উক্ত ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে জয়নগরের দত্তরা বিগ্রহটি ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। মাধবপুর গ্রামে শ্মশানের পশ্চিম ধারে একটি মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আছে। লোকে বলেন ইহা মাধব মন্দিরের ভগ্নস্তূপ ; অতি প্রাচীনকালে এই মন্দিরে মাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইস্থানে 'চালধোয়া পুকুর', 'ভোগধোয়া পুকুর' নামে দুইটি পুষ্করিণী আছে। 'চালধোয়া পুকুর', 'ভোগধোয়া পুকুর' হইতে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ।

পুরাণে বর্ণিত আছে যে, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য কর্মফলে অতি দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া মহাপাতকের ভাগী হন। পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ পর্যটন করিয়াও তাঁহার পাপ ক্ষয় হইল না। তখন শিবের নির্দেশমত চক্রতীর্থে স্নান করিয়া তিনি মহাপাতক হইতে মুক্তিলাভ করেন। কথিত আছে, শুক্রাচার্য্য যে-দিন এইস্থানে স্নান করেন, সেদিন নন্দা তিথির সহিত শুক্রবারের সংযোগে ঘটিয়াছিল। এই বিশেষ যোগের নাম ভৃগুনন্দা। এখনও যদি চৈত্রমাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথি শুক্রবারে হয় তাহা হইলে এখানে যাত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। প্রতি বৎসর নন্দা তিথিতে পঁচিশ হইতে ত্রিশ হাজার নরনারী এইস্থানে পুণ্যস্নান করিয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে যাত্রীরা আসেন। নন্দাস্নান উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় চৌদ্দ বিঘা জমির উপর এবং রায়দীঘি সড়কের ধারে তিনদিনব্যাপী একটি বৃহৎ মেলা বসে। মেলা নিলামে ডাক হয় এবং

বিবিধ জিনিসপত্রের প্রায় তিনশত দোকানপাট বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও সার্কাসের দল আসে এবং মেলায় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

ইহা ভিন্ন, বদরিকানাথ শিবমন্দির প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসর ১০ই বৈশাখ তারিখে সাড়ম্বরে গোষ্ঠযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোষ্ঠযাত্রা উপলক্ষে আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বিকালে বাজনাদিসহ শোভাযাত্রা করিয়া প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জোড়া রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আনিয়া শিবমন্দিরের বারান্দায় স্থাপন করা হয় এবং যথারীতি উৎসব অন্তে রাত্রি প্রায় বার ঘটিকায় উক্ত বিগ্রহাদি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন। উৎসব প্রত্যক্ষ করিতে বহু লোকজনের সমাগম হয় এবং সং নাচের দল আমোদপ্রমোদ করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে শিবের নাটমন্দিরে সর্বজনীন শারদীয়া দুর্গোৎসব পালন করা হয়।

চক্রতীর্থ হইতে অতি নিকটে কাশীনগর বাজারে কয়েকটি দেবদেবীর প্রাচীন মন্দির বা স্থান আছে। কাশীনগর অঞ্চল কলিকাতার বরদাকান্ত রায়চৌধুরীদিগের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাঁহারাই এই বাজারের প্রবর্তন করেন। বাজার প্রচলনের পূর্বেই এই স্থানে 'মাই বিবির' নির্দিষ্ট স্থান ছিল। তাই এই বাজার 'মাই বিবির বাজার' নামে এই অঞ্চলে খ্যাত হয়। ইহা রায়-দীঘি রোডের ধারেই অবস্থিত। বাজারের মধ্যে চারিদিকে বারান্দাযুক্ত পূর্বমুখী একটি ঘরে মাই বিবির দ্বিভুজা বিশাল মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবী ডান পা ঝুলাইয়া এবং বাঁ পা মুড়িয়া ডান পায়ের হাঁটুর উপরে তোলা অবস্থায় উপবিষ্টা। পায়ে জুতা, মাথায় মুকুট এবং বস্ত্র পরিহিতা। ইহা ভিন্ন, এই ঘরে কোলে শিশু সহ দেবীর মৃন্ময় শলন মূর্তিও আছে। পূর্বে একটি মাটির চালা ঘরে দেবী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরে একটি টিনের ঘরে এবং অবশেষে ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ২৫শে ফাল্গুন জয়নগর তিলিপাড়ার শ্রীমনিলাল নন্দী ও শ্রীভদ্রেশ্বর নন্দী ইষ্টক নির্মিত বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করান। মাই বিবির নিত্য পূজা হয়; তবে প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার বিশেষ পূজা এবং অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে মাঙ্গন পূজা উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু লোকজনের সমাগম হইয়া থাকে। স্থানীয় বাগ পরিবার দেবীর সেবায়েত এবং পার্শ্ববর্তী খাড়ী গ্রামের মুসলমান ফকিরেরা পূজাদি করিয়া থাকেন। প্রধানতঃ কলেরা ও বসন্ত রোগের জন্যই মাই বিবির নিকট মানত পূজা দেওয়া হয়।

মাই বিবি বাজার সংলগ্ন খাড়ির তীরে পাকা ঘাট ও স্নানঘরসহ চারচালা গঠনের একটি প্রাচীন শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। স্থানীয় প্রিয়নাথ ময়রা নামে জনৈক ব্যক্তি উক্ত মন্দির স্থাপন করেন এবং বর্তমানে শ্রীবিজয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী মহাশয় নিত্য পূজাদি করিয়া থাকেন। চৈত্র মাসে এই মন্দিরে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কাশীনগর পশ্চিম পাড়ায় টিনের চালাযুক্ত একটি মাটির ঘরে সিমেন্ট জমান পঞ্চাননের মূর্তি আছে। শ্রীকৃপাসিন্ধু পাঠক ইঁহার নিত্য পূজা করেন। চৈত্র মাসে চড়ক ও গাজন হয়। ইহা ভিন্ন, বাজারে একটি টিনের চালা ঘরে পেঁচক বাহন বিকট মনুষ্যমুখাকৃতি মৃন্ময় পঞ্চানন মূর্তি স্থাপিত আছে। মূর্তিটি সামনের দুই হাতে ভর দিয়া হাঁটু মুড়িয়া বসা। পাশে ষড়ভুজ ও ত্রিমুখ বিশিষ্ট জরাসুর এবং মনসা, শীতলা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবদেবীর মৃন্ময় মূর্তি আছে। কাশীনগরের দ্বারিকা নাথ বাগ মহাশয় এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এবং নিত্য পূজা করেন শ্রীঘনশ্যাম চক্রবর্তী। ইহা ভিন্ন, বাজারে পশ্চিমমুখী একটি হরিবাসর মন্দিরে ক্ষুদ্র ও বৃহদাকারের অনেকগুলি রাধাকৃষ্ণের মূর্তি সারিবদ্ধভাবে সাজান আছে। মন্দিরের মেঝে শ্বেত প্রস্তর মণ্ডিত এবং সম্মুখের বারান্দা টালির চালাযুক্ত। খাড়ী গ্রামের প্রিয়নাথ ময়রা ১৩২৩ বঙ্গাব্দে এই হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান সেবায়েত শ্রীরণজিৎ ময়রা। নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর কার্তিক ও চৈত্র মাসে মালসা-ভোগসহ অষ্টমপ্রহরব্যাপী নামসংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নামকীর্তন উপলক্ষে বিভিন্ন কীর্তনীয়ার দল আসে।

('বাংলায় ভ্রমণ' গ্রন্থ অবলম্বনে)

খাড়ী

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত খাড়ী (মৌজা নং ৪৯) একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রামরূপে পরিচিত ছিল। 'খাড়ী' নামক একটি প্রবন্ধে শ্রীকালিদাস দত্ত মহাশয় ইহার অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। খাড়ী গ্রামে বর্তমান পূজা-পাবণ সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বে আমরা উক্ত প্রবন্ধের অংশ বিশেষ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণায় ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার মধ্যে যে সমস্ত প্রাচীন স্থান আছে, খাড়ী তন্মধ্যে একটি। এ নাগাৎ ঐ স্থানটির পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধান হয় নাই। বর্তমান সময় উহা মথুরাপুর থানার অধীনে একটি সামান্য পল্লীরূপে পরিচিত। প্রাচীনকালে কিন্তু উহার ঐরূপ অবস্থা ছিল না। ঐ সময় আদিগঙ্গানদী উহার পশ্চিম সীমা দিয়া প্রবাহিত হইত। ঐ গঙ্গা প্রবাহের শুষ্কখাত এবং একটি শাখা সংকীর্ণ খালের আকারে এখনও সেখানে বিদ্যমান আছে। প্রবাদ উক্ত শাখাটির জন্য ঐ স্থান খাড়ী আখ্যা লাভ করে।

প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে রচিত ডাকর্ণব নামক একখানি পুঁথিতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের চৌষট্টি পীঠস্থানের মধ্যে একটি পীঠস্থানরূপে উহার নাম দেখা যায়। উহা ব্যতীত মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের সুন্দরবন তাম্রশাসনেও উহার উল্লেখ আছে। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ঐ তাম্রশাসনখানি ঐ স্থানের ৫।৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ২২ নম্বর লাটের অন্তর্গত বকুলতলা গ্রামে একটি পুষ্করিণী খননকালে আবিষ্কৃত হয়। উক্ত লিপি পাঠে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে সেনরাজগণের শাসনকালে (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীতে) উহা তৎকালীন শাসনবিভাগ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির মধ্যে খাড়ী মণ্ডলের সদর স্থান ছিল এবং উহার অধীন মণ্ডলগ্রামে মহারাজা লক্ষ্মণ সেন ব্যাসদেব শর্মা নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করেন।

হিন্দুরাজত্ব কালে শাসন সৌকর্য্যার্থ বঙ্গদেশ ভুক্তি নামে কয়েকটি বড় বড় বিভাগে ও তদধীনে মণ্ডল নামে বহু ছোট ছোট বিভাগে বিভক্ত ছিল। রাজার অধীনে তখন ভুক্তির শাসনকর্ত্তারা ভুক্তীশ্বর ও মণ্ডলের শাসনকর্ত্তারা মণ্ডলেশ্বর বা মণ্ডলাধিপ নামে ঐ সকল ভুক্তি ও মণ্ডলের রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও কামন্দকীয় নীতিসারে উল্লিখিত আছে যে এক একটি মণ্ডলের বিস্তার চারিশত যোজন (৩২০০ মাইল) ছিল এবং উহার শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মণ্ডলেশ্বরেরও কোষ, দণ্ড, অমাত্য ও দুর্গ থাকিত*।

উহা হইতে বোঝা যায় যে খাড়ী মণ্ডলও আয়তনে এরূপ ছিল। ঐ সময় আদি গঙ্গানদীর পূর্বে অবস্থিত সমগ্র পশ্চিম সুন্দরবন উহার অন্তর্ভুক্ত থাকা সম্ভব। অধুনা উহার উত্তর ও পূর্ব পার্শ্বস্থ ৩০, ৩২, ৩৩, ২৮, ২৯, ২৭, ২৪, ২৬, ১১৬ ও ১২২ নম্বর লাট হাসিলকালে জঙ্গল মধ্য হইতে যে সমস্ত প্রস্তর, ধাতব ও মৃন্ময় দেবদেবীর মূর্ত্তি ও তৈজসাদি এবং মন্দির ও গৃহাদির ভগ্নাবশেষ, মজা পুষ্করিণী ও গড় প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে তদসমুদয় উক্ত মণ্ডলেরই প্রাচীন গ্রাম নগরাদির নিদর্শন বলিয়া বোধ হয়।

ইদানীন্তন কালে খাড়ীতে যে লোকালয় আছে উহা বিগত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপূর্বে ঐ স্থানটিও জঙ্গলময় ছিল। জঙ্গল হাসিলের পরে উহার নানাস্থানে অনেকগুলি ইষ্টকের গৃহ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং কাল প্রস্তরের হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। ঐ সকল মূর্ত্তির অধিকাংশ এখন স্থানান্তরিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমি ঐ গ্রামের দক্ষিণাংশে অবস্থিত গজস্থড়ী পল্লী হইতে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর একটি ছোট বিষ্ণুমূর্ত্তি সংগ্রহ করি। উহা এখন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় আছে। উক্ত সমিতির ১৯২৯।৩০ খ্রীষ্টাব্দের কার্য্যবিবরণীতে উহার সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা ভিন্ন ঐ স্থানে আমি আরও চারিটি খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর কাল প্রস্তরের কারুকার্য্য মণ্ডিত মন্দিরের window frame পাইয়াছি। এগুলিরও সচিত্র পরিচয় বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির

---

*Varendra Research Societies Monographs, No. 3, pp. 1-2

১৯২৮।২৯ খ্রীষ্টাব্দের কার্য্যবিবরণীতে উল্লিখিত Antiquities of khari নামক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময় আরও একটি কাল প্রস্তরের তিন ফুট উচ্চ বিষ্ণুমূর্ত্তি সেখানে ৺যদুনাথ ঠাকুরের বাটিতে পূজিত হইতেছে। গঠন পদ্ধতি হইতে ঐ মূর্ত্তিটিও খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর বলিয়া বুঝা যায়।

পুরাতন রেভিনিউ সার্ভে রিপোর্টে দেখা যায় যে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দেও ঐ স্থানের দক্ষিণে জঙ্গল মধ্যে কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং ৩০ হইতে ৪০ ফিট উচ্চ বাঁধ দ্বারা বেষ্টিত দুইটি বৃহৎ পুষ্করিণীর মজাগর্ভ জঙ্গলময় হইয়া বিদ্যমান ছিল* ।

এখন সেখানে অন্যান্য যে সমস্ত পুরাবস্তু আছে তন্মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় মনুষ্য প্রমাণ একটি কাষ্ঠনির্মিত বড়খাঁ গাজীর মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। উহা তথায় মসজিদের ন্যায় একটি পুরাতন ইষ্টক নির্মিত গৃহের মধ্যে রক্ষিত আছে।

প্রাচীন বিবরণাদি পাঠে জানা যায় যে নিম্নবঙ্গে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল পীর এতদ্ অঞ্চলে আসিয়া মুসলিম ধর্ম বিস্তার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন উক্ত বড়খাঁ গাজী ছিলেন তন্মধ্যে একজন প্রধান। আজিও তাঁহার কার্য্যকলাপ ও শক্তির পরিচয় নিম্নবঙ্গের নানা স্থানে লোক সঙ্গীতে শুনিতে পাওয়া যায়। ২৪-পরগণায় তিনি বহু হিন্দুকে মুসলমান করেন। প্রবাদ খাড়ীতেও তাহার একটি আস্তানা ছিল।

রায়মঙ্গলে উল্লিখিত আছে যে ঐ সময় খাড়ীতে দক্ষিণ-রায় নামেও একজন শক্তিশালী ব্যক্তি থাকিতেন। তিনি তৎকালীন অরাজকতায় উৎপীড়িত হিন্দুদের নানাপ্রকারে রক্ষা করিতেন। হিন্দুদের ধর্মান্তকরণেও তিনি খুব বাধা দিতেন ও উহার বিপক্ষে ছিলেন। সেকারন তাঁহার সহিত জড়িত বড়খাঁ গাজীর মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ হইত। জয়নগর থানার অধীন খনিয়াতে ঐরূপ একটি যুদ্ধের বিবরণও রায়মঙ্গলে আছে। উহাতে দক্ষিণরায়ের খাড়ীতে থাকিবার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা এইরূপ,

"খাড়ীর বাড়িতে রায় লইয়া পরিবার।
বটবেনে আসিয়া কহিল সমাচার ॥"

*Statistical Account of Bengal, by W. W. Hunter, Vol. I, p. 235

উক্ত দক্ষিণরায়ই তাঁহার অসাধারণ শক্তি, পরহিতৈষিণা এবং সধর্ম ও স্বজাতি প্রীতির নিমিত্ত পরে হিন্দুদের দেবতায় পরিণত হন। আজিও নিম্নবঙ্গের নানাস্থানে তাঁহার যোদ্ধাবেশী মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। ঐ অঞ্চলে তাঁহার ঐরূপ যে সমস্ত মূর্ত্তি আছে তন্মধ্যে বারুইপুর থানার ধপ্ধপি গ্রামের মূর্ত্তিটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে মুসলমানদের বঙ্গদেশ অধিকার করিবার পূর্বে সেনরাজগণের রাজত্বকালে পশ্চিম সুন্দরবন খাড়ী মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে উহার যে অংশের উপর লোকালয় ছিল তাহা লইয়া মুসলমান আমলে খাড়ী পরগণার সৃষ্টি হয়। আইন-ই-আকবরীতে সুবাবাংলার পশ্চিমসীমা রূপে উহার উল্লেখ দেখা যায়।

হাণ্টার সাহেব ঐ পরগণাটির যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন তাহা এই—

"**Khari**—Area 10·96 square miles. A small fiscal Division, situated in the south-east corner of North Hatiagarh, and bordering on the Sundarbans. The principal village is Khari, which contained a church and an English School in 1857"✝. (খাড়ী)

হুগলী জেলার ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম হইতে কলিকাতার চিৎপুর, কালীঘাট দিয়া চব্বিশ-পরগণা জেলার বৈষ্ণবঘাটা বারুইপুর, ছত্রভোগ, বড়াশী হইয়া খাড়ী গ্রাম পর্যন্ত মজিয়া যাওয়া আদিগঙ্গা প্রবাহের একটি সুনির্দিষ্ট পথ অদ্যাপি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু খাড়ী গ্রাম হইতে কোন পথ ধরিয়া গঙ্গার মূল প্রবাহ অতীতকালে সাগরাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল সে-সম্পর্কে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। কেন যে নিম্নবঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত বহু প্রসিদ্ধ জনপদ ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম জনশূন্য হইয়া হিংস্র ব্যাঘ্র-শ্বাপদ সংকুল গভীর অরণ্যে পর্যবসিত হয় তাহার সঠিক কারণও অজ্ঞাত। অনেকে অনুমান করেন প্রাকৃতিক দুর্যোগই ইহার অন্যতম কারণ। অথবা গঙ্গার প্রবাহ মজিয়া যাওয়ায় ইহার তীরবর্তী বাণিজ্যভিত্তিক নগর ও জনবহুল গ্রামগুলি ক্রমেই সমৃদ্ধিহীন হইয়া নগণ্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে। কোথাও বা ম্যালেরিয়া আদি রোগের প্রকোপে জনশূন্য হইয়া বন-

✝Statistical Account of Bengal, by W. W. Hunter, Vol. I, p. 235

জঙ্গলে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন খাড়ীগ্রামও বোধ হয় এই সকল কারণেই পূর্ব গৌরব হারাইয়া শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। অতীতের সাক্ষী বহন করিয়া একটি শীর্ণকায় খাল বা গঙ্গা নদীর খাঁড়ি এই গ্রামের প্রান্তর দিয়া আজিও প্রবাহিত হইতেছে। এই গঙ্গা নদীর খাঁড়ি হইতেই এই স্থান খাড়ী গ্রাম নামে পরিচিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। আবার স্থানীয় জনশ্রুতি আছে যে,এই স্থানে আদি বাসিন্দারা 'খাড়াশী' কাজ অর্থাৎ লবণ তৈয়ারীর কাজ করিতেন বলিয়া ইহার নাম খাড়ীগ্রাম হয়।

ইহাদের অতীত ইতিহাসের ক্ষীণ ধারার নানাস্থানে ছেদ পড়িলেও বর্তমানে অনেক পণ্ডিত ও গবেষকগণ অনুমান করেন যে, সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের মধ্যে বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক সমৃদ্ধশালী ইতিহাসের অধ্যায় লুক্কায়িত আছে। তাঁহারা ইহার কিছু কিছু নিদর্শনও অনুসন্ধান করিয়া আবিস্কার করিয়াছেন।

বর্তমানে খাড়ীগ্রাম পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রধান। তাহা ছাড়া, কয়েক ঘর বাগদী, কাওরা, যোগী (নাথ) ও এক ঘর ব্রাহ্মণ পরিবারের বসবাস আছে। মথুরাপুর-রায়দীঘি পাকা সড়কের দক্ষিণপার্শ্বে কাশীনগর মাইবিবির হাট এবং উত্তর পার্শ্বে খাড়ী গ্রাম অবস্থিত। রায়দীঘি রোড হইতে একটি কাঁচা রাস্তা খাড়ী গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মথুরাপুর রোড রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে অথবা কলিকাতা হইতে সরাসরি মোটরবাসে এইস্থানে যাতায়াত করিতে পারা যায়। খাড়ী গ্রামে প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে আজ অবশিষ্ট আছে কেবল বড়খাঁ গাজীর আস্তানা এবং নারায়ণী দেবীর মন্দির। ইহা ব্যতীত, একটি হরিমন্দির ও নবনির্মিত রাধাবল্লভজীউর মন্দির।

গ্রামে একটি প্রাচীন বৃহৎ পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব পাড়ে বড়খাঁ গাজীর আস্তানাটি অবস্থিত। পুষ্করিণীটির উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম পাড়ে বাঁধানো প্রশস্ত ঘাট আছে। ইষ্টক নির্মিত আস্তানা ঘরটি দক্ষিণমুখী; সম্মুখে বারান্দাযুক্ত ও উপরে গম্বুজ বিশিষ্ট। সংস্কার অভাবে ঘরটি জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ঘরের মধ্যে মাথায় পাগড়ী বাঁধা, মুখে চাপদাড়ি, পায়ে জুতা এবং দক্ষিণ হস্ত উর্ধে তুলিয়া যোদ্ধাবেশী অশ্বারোহী বড়খাঁ গাজী সাহেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিটি মনুষ্য প্রমাণ হইবে। ইহা ভিন্ন, ঘরের পশ্চিমধারে একটি বেদীর উপর মাটির ছোট ছোট সাতটি স্তূপ আছে; ইহা বিবিমার স্থান এবং ছোট বড় আরও অনেকগুলি গাজী সাহেব ও বিবিমার মৃন্ময় শলন মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি মূর্তির দক্ষিণ হস্তে ধৃত শ্বেত পতাকা শোভা পাইতেছে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেবলমাত্র একটি হরিণবাহন বিবিমার শলন মূর্তি। বড়খাঁ গাজীর নিয়মিত নিত্য পূজা হয় না। ভক্তরা যে যখন পূজা দিতে আসেন তখনই পূজার আয়োজন করা হয়। সুন্দরবনে যাঁহারা কাঠ কাটিতে অথবা মধু সংগ্রহ করিতে যান তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই বড়খাঁ গাজীর আস্তানায় হাজত পূজা দিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন, প্রতি বৎসর নন্দাস্নান উপলক্ষে যে-সকল যাত্রী চক্রতীর্থে আসেন, তাহারা খাড়ীতে স্নান সারিয়া গাজীর উদ্দেশ্যে পূজা দিয়া যান। বর্তমানে এই গ্রামের মোল্লাপাড়া নিবাসী শ্রীযুগবার মোল্লা ও শ্রীআশের মোল্লা বড়খাঁ গাজীর খাদেম বা সেবায়েতের কাজ করেন। স্থানীয় জমিদাররূপে পরিচিত কলিকাতা নিবাসী কুমার মন্মথ নাথ মিত্রদিগের প্রদত্ত কিছু পীরোত্তর জমি আছে।

উল্লিখিত পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ে বড়খাঁ গাজীর আস্তানার অনুরূপ একটি ঘরে নারায়ণী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পার্থক্যের মধ্যে কেবলমাত্র নারায়ণী মন্দিরের চারিদিকে রোয়াক দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরাভ্যন্তরে একটি বাঁধান বেদীর উপর সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী নারায়ণী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, দেবী বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিতা। এই একই বেদীর উপর বড়খাঁ গাজীর মূর্তি,প্রায় দুই ফুট উচ্চ একটি প্রস্তর স্তম্ভ ও নারায়ণ শীলা আছে। ইহা ভিন্ন মন্দির ঘরের মধ্যে আরও অনেকগুলি গাজীর শলন মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। নারায়ণী মন্দিরটিও প্রাচীন এবং জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত। প্রবেশ দ্বারের উপর মন্দির গাত্রে একটি প্রতিষ্ঠা ফলক ছিল; কিন্তু বহুকাল পূর্বেই উহা কেহ তুলিয়া গিয়াছেন। মন্দিরের সম্মুখে টিনের চালাযুক্ত একটি পাকা নাটমন্দির আছে। নারায়ণী দেবীর নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় সাড়ম্বরে যাতাল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নিকটবর্তী মাধবপুরের চক্রবর্তী পদবীধারী ব্রাহ্মণগণ

নারায়ণী দেবীর নিত্যপূজাদি করিয়া থাকেন। দেবীর নিত্যপূজাদির জন্য স্থানীয় জমিদার মিত্রদিগের প্রদত্ত সামান্য কিছু দেবোত্তর জমি আছে।

নারায়ণী মন্দিরের পশ্চিম পাশে দক্ষিণমুখী অনুরূপ একটি মন্দিরে বিভিন্ন পারিষদ সহ মধ্যস্থলে মৃন্ময় ষড়ভুজ গৌরাঙ্গদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিগুলি দুইটি সারিতে থাক দিয়া সাজান। মন্দিরাভ্যন্তরে মেঝে ও বারান্দা শ্বেতপ্রস্তর মণ্ডিত এবং ঘরের অভ্যন্তরের দেওয়াল রঙিন সিমেন্টের টালির দ্বারা সজ্জিত। চারিদিকের রোয়াক মোজাইক করা। খাড়ী গ্রামের হরিপদ পাল মহাশয় ১৩৪১ বঙ্গাব্দে এই হরিমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্তিগুলি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং মন্দিরটি অপ্রাচীন হইলেও অযত্নে ইতিমধ্যেই জীর্ণদশা প্রাপ্ত হইয়াছে; কোনরকমে গৌরাঙ্গদেবের নিত্য পূজা হয় মাত্র।

এই গ্রামের রাধাবল্লভজীউর মন্দিরটি ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় শ্রীমাখন চন্দ্র নস্কর মহাশয় কর্তৃক স্থাপিত এবং বর্তমানে তিনি নিজেই মন্দিরের সেবায়েত ও পূজারী। চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে উপরে গম্বুজযুক্ত রাধাবল্লভজীউর সুউচ্চ পাকা মন্দির অবস্থিত। মন্দিরাভ্যন্তরে একটি কাষ্ঠ মঞ্চে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি এবং শ্বেত প্রস্তর নির্মিত রাধিকা মূর্তি স্থাপিত আছে। এই যুগল মূর্তিই রাধাবল্লভ-জীউ নামে খ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিটি ভগ্ন। মন্দিরে চারিদিকে দালান এবং সম্মুখে একটি পাকা নাটমন্দির আছে। নবনির্মিত মন্দিরটির ভিত্ খননকালে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়; বর্তমান মন্দিরটি উক্ত প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কথিত আছে বর্তমান জয়নগরে পূজিত রাধাবল্লভজীউর বিগ্রহ ভূগর্ভস্থ ঐ প্রাচীন মন্দিরে একদা প্রতিষ্ঠিত ছিল (জয়নগর পৃঃ ১৮০ দ্রষ্টব্য)।

রাধাবল্লভজীউর মন্দিরের পশ্চিম পাশে সমতল ছাদ বিশিষ্ট একটি পৃথক মন্দিরে দক্ষিণা কালীর প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাও শ্রীমাখন চন্দ্র নস্কর মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার দ্বারাই নিত্যপূজাদি হইয়া থাকে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, খাড়ী গ্রাম হইতে প্রায় সাত মাইল দূরে সুন্দরবনের ১১৬ নং লাটে ধানবাদার মধ্যে উড়িষ্যা স্থাপত্য রীতিতে গঠিত প্রায় ষাট হাত উচ্চ একটি প্রাচীন মন্দির আছে। ইহা 'জটার দেউল' নামে খ্যাত এবং বর্তমানে শিবমন্দিররূপে পরিচিত। তবে কেহ কেহ অনুমান করেন ইহা আদিতে একটি বৌদ্ধ চৈত্য ছিল। মন্দিরটি কোন সময় নির্মাণ করা হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে জানা যায় নাই। ইহার নিকটবর্তী ১২৭ ও ১২৮ নং লাটে বিরিঞ্চির মন্দির, ভরতরাজার মন্দির ও ভরতগড় নামে ধ্বংসাবশেষ আছে। পূর্বে সুন্দরবন অঞ্চলে ভরত নামে প্রসিদ্ধ কোন রাজা বাস করিতেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। ইহা ভিন্ন, জটার দেউলের নিকটে হাতিয়াগড়ে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বর্ণিত আছে যে, ধনপতি সদাগর 'হাত্যে-ঘরে' অম্বুলিঙ্গ শিব ও নীলমাধবের পূজা করিয়াছিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে খাড়ী ফৌজদারতলায় সর্বমঙ্গলা দেবীর বার্ষিক পূজা ও তদুপলক্ষে একটি মেলা বসে। এই বিষয়ে আমাদের সংবাদদাতা শ্রীনলিনী কান্ত নাথ, শিক্ষক, গ্রাম: খাড়ী ঘোষের চক, পোঃ কাশীনগর কর্তৃক প্রেরিত বিস্তারিত তথ্য 'মেলা বিবরণী' অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।

কৃষ্ণচন্দ্রপুর

বড়াশী গ্রামের নিকটেই রায়দীঘি রোডের পাশে কৃষ্ণচন্দ্রপুর (মৌজা নং ৩৬) গ্রামটি অবস্থিত। মথুরাপুর রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। এই গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও কামার ব্যতীত মাত্র এক ঘর কায়স্থ আছেন। কায়স্থ পরিবারটি নবাগত।

কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে অন্ধমুনি নামে জনৈক বৈষ্ণব সাধকের একটি মন্দির আছে। ইনি জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া

সাধারণের নিকট অন্ধমুনি নামে খ্যাত হন। শোনা যায়, ইঁহাদের আদিবাস খুলনা জিলায় এবং ইঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে একটি কুড়ে ঘর নির্মাণ করিয়া তিনি নির্জনে সাধন-ভজন করিতেন। তাঁহার সহজ, সরল জীবনযাত্রা ও মুনিজনোচিত চরিত্রের জন্য গ্রামবাসীরা তাঁহাকে অন্ধমুনি নামে আখ্যায়িত করেন এবং অনেকেই তাঁহার শিষ্য ও অনুরাগী হইয়া পড়েন। চব্বিশ-পরগণা জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে এবং পূর্ববঙ্গে তাঁহার বহু ভক্ত ও অনুরাগী আছেন। অন্ধমুনি দেহরক্ষা করিলে পর ভক্তরা তাঁহার মরদেহ এই গ্রামে সমাধিস্থ করিয়া তাহার উপর একটি খড়ের চালাযুক্ত ঘর নির্মাণ করেন এবং উক্ত সমাধি স্থলে তাঁহার ব্যবহৃত কাষ্ঠ পাদুকা স্থাপন করিয়া নিত্য পূজাদির ব্যবস্থা করেন। পরে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে দক্ষিণ বারাসত নিবাসী শ্রীমতি বিদ্যাসুন্দরী দেবী চারিদিকে রোয়াক ও সম্মুখে দালানযুক্ত দক্ষিণমুখী বর্তমান পাকা মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়া দেন। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে বড়াশী গ্রামের শ্রীদেবেন নাইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে সিমেন্ট-বালি জমান অন্ধমুনির একটি প্রতিমূর্তি স্থাপন করেন এবং নিত্য পূজাদির জন্য ভবানীপুরের শ্রীধরণী মোহন ধর মহাশয় সামান্য কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। মন্দিরে নামাবলি জড়িত অন্ধমুনির প্রতিমূর্তি ও তাঁহার ব্যবহৃত কাষ্ঠ পাদুকা ব্যতীত ভক্তদের প্রদত্ত আরও অনেকগুলি কাষ্ঠ পাদুকা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিদিন মধ্যাহ্নে খৈ, দুধ ও সন্দেশের নৈবেদ্যসহ তামাক ও পান সাজিয়া দিয়া অন্ধমুনির পূজা এবং সন্ধ্যায় শীতল ভোগ ও আরতি হয়। চক্ষু রোগের নিরাময়ের জন্য প্রধানতঃ ভক্তরা অন্ধ-মুনির নিকট মানসিক করেন। শোনা যায় অন্ধমুনির কৃপায় অনেকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন। মানত স্বরূপ প্রধানতঃ সোনা বা রূপার চক্ষু এবং পৈতা, কাষ্ঠ পাদুকা, তামাক খাইবার গড়গড়া ও মালসাভোগ দিয়া মন্দিরে পূজা দিয়া থাকেন। মানতকারীরা মন্দিরের জানালায় সূতায় ইটের টুকরা বাঁধিয়া মনস্কামনা জানাইয়া যান। অন্ধমুনির অধস্তন পঞ্চম পুরুষ শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বৈরাগী বর্তমানে মন্দিরের পূজারী।

নিত্য পূজা ব্যতীত বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ মাসের প্রতিদিন সন্ধ্যায় মন্দিরে কীর্তনগান হয়। পৌষসংক্রান্তি তিথিতে উৎসব এবং মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে নামকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহোৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতি বৎসর পনর-কুড়ি হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং তিন-চারদিনব্যাপী মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসে। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, পোষাক-পরিচ্ছদ, জুতা, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, মাদুর, ধামা, কুলো, পাথরের বাসনপত্র, বই-ছবি, ফলাদি ও চা-পান-বিড়ি ইত্যাদির দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ বারুইপুর, ডায়মণ্ডহারবার, জয়নগর, মন্দির-বাজার, বিষ্ণুপুর, কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসিয়া থাকেন। মেলায় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা আসে।

মেলা বিবরণী

গোষ্ঠযাত্রার মেলা

গোবিন্দপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গোষ্ঠযাত্রা উৎসব উপলক্ষে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ব্যক্তিবিশেষের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র পনর বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। তাজপুর, মুরারীপুর, গুঞ্জিরপুর, রঘুনাথপুর, শিবপুর, শেখপুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহ হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় এক হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

খোলা জায়গায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বই-ছবি ইত্যাদির প্রায় পঁচিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। উৎসব প্রাঙ্গণে হরিনাম কীর্তন হয়।

নববর্ষের মেলা

গিলারছাট গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ নববর্ষ উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় চার বিঘা পরিমাণ জমির উপর পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। সাধারণতঃ

বিকালের দিকে নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে মোট প্রায় আড়াই হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় মনিহারী, খাবার, তামা, লোহা, কাঁচ ও মাটির বাসনকোসন, মিল ও তাঁতের কাপড়চোপড়, বই-ছবি এবং কাঁচা আনাজপত্র প্রভৃতির প্রায় চল্লিশটি দোকান বসে ও কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচের দল আসে এবং কবিগান ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। গ্রামেই যাত্রার দল আছে; অধিকারীর নাম শ্রীকালিপদ হালদার।

সর্বমঙ্গলাপূজার মেলা

খাড়ী ফৌজদারতলায় প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে সর্বমঙ্গলা দেবীর বার্ষিক পূজা উপলক্ষে স্থানীয় হাট সংলগ্ন প্রায় আট-দশ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং ছয়-সাত-দিন স্থায়ী হয়। আশপাশের গ্রাম হইতে মোটরবাস, রিক্সা ও নৌকাযোগে প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী আসিয়া থাকেন। হাটের ব্যবসায়ীরা ব্যতীত নিকটবর্তী গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। শতাধিক দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। ইহা ভিন্ন, মনিহারী দ্রব্য, মাটির পুতুল, হাঁড়ী-কলসী, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, কৃষি-যন্ত্রপাতি, বই-ছবি ইত্যাদি আমদানী হইয়া থাকে। ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিকের দল আসে এবং কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি বৎসর কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রাদল আসে।



থানা ঃ পাথর প্রতিমা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ দিগাম্বরপুর।

১৪৩।১,৯৪৪·৬৮।৩০৯।২,৪৩৪

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, তাঁতী, ধোপা, স্বর্ণকার, পোদ, গোয়ালা, জেলে, কুমার, বাগ্দী, তেলি, কায়স্থ, নাপিত, দলুই ও মুচি। গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) মথুরাপুর রোড রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে রায়দীঘি পর্যন্ত আসিয়া সেখান হইতে পদব্রজে বা নৌকায় গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে নারায়ণীপূজা, রক্ষাকালীপূজা ও দোলযাত্রা উৎসব এবং শিবচতুর্দশীতে ব্যক্তিবিশেষের শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) নারায়ণীপূজার মেলা। ফাল্গুন মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে নারায়ণীর পিতলের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

এই গ্রামের প্রথম লাটদার দিগম্বর নন্দী বিদ্যা-নিধির নামানুসারেই গ্রামের নাম 'দিগম্বরপুর' হইয়াছে।

শ্রীরাখালরাজ গিরি,
দিগম্বরপুর, ২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ কামদেবপুর।

১৮৫।১,৩১৮·৪৬।১৮০।১,০৫০

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, তাঁতী, জেলে, বাগ্দী, দলুই ও সাঁওতাল। গ্রামটি তিনটি পাড়ায় বিভক্ত।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) মথুরাপুর রোড রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে রায়দীঘি এবং সেখান হইতে মোটরলঞ্চে বিষ্ণুপুর হইয়া প্রায় দুই মাইল হাঁটাপথে কামদেবপুর পৌছান যায়। ইহা ভিন্ন, ডায়মণ্ডহারবার হইতে মোটরবাসে কাকদ্বীপ পৌছাইয়া মোটরলঞ্চে বনশ্যামনগর হইয়াও গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ব্যক্তিবিশেষের চন্দনী উৎসব, আষাঢ় মাসে মনসাপূজা, কার্তিক মাসে একটি ব্যক্তিবিশেষের ও একটি সর্বজনীন রাসোৎসব, মাঘ মাসে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সর্বজনীন সরস্বতী-পূজা, ফাল্গুন মাসে একটি ব্যক্তিবিশেষের ও একটি সর্বজনীন দোল উৎসব এবং চৈত্র মাসে রাধাকৃষ্ণজীউর সর্বজনীন গোষ্ঠযাত্রা ও অষ্টমপ্রহরব্যাপী অখণ্ড নামকীর্তন উৎসব হয়। গোষ্ঠপূজা উপলক্ষে গ্রামের একটি নির্দিষ্ট স্থানে অস্থায়ী পূজা মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া তাহাতে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া উৎসব পালন করা হয়।

(ঙ) চন্দনী উৎসবের মেলা। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া হইতে তিন-চারদিনব্যাপী। মেলাটি ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল ও টালীর ছাউনীযুক্ত একটি মন্দিরে কৈলাস চন্দ্র মাইতি মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শিব ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ আছে। এই মন্দিরে রাস, দোল ও চন্দনী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ভিন্ন, গ্রামের রাখাল ঘেরী, পদ্মাবতী ঘেরী ও মণ্ডলদের মন্দিরে বিশালাক্ষী ও শীতলা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সাধারণতঃ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই উক্ত মন্দিরগুলিতে বিশালাক্ষী ও শীতলার পূজা হয়। মনসার নির্দিষ্ট স্থান আছে। সুন্দরবনের ১৩নং এল প্লট ইউনিয়নের অন্তর্গত ৯-খণ্ডে বিভক্ত আই প্লটটি একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের ৬ষ্ঠ অংশ লাট। উপনিবেশ গড়িয়া উঠিবার পূর্বে এই স্থানটি গরান, গেঁওয়া, কেওড়া, বকরা, বাণী, চাঁদাহেতাল প্রভৃতি বনজাত বৃক্ষে পরিপূর্ণ ও হিংস্র জীবজন্তুর আবাসস্থল ছিল। মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার বোয়াল গ্রামের কামদেব প্রধান নামক জনৈক ব্যক্তি ১৩২৯ বঙ্গাব্দে জঙ্গলাদি কাটিয়া এই স্থানটি চাষ ও বসবাসের উপযোগী করেন। তাঁহার নামানুসারেই গ্রামের নাম কামদেবপুর হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কামদেবপুর গ্রামে পুষ্করিণী খননকালে একটি পাকা ঘাটের সিঁড়ি, পোড়ামাটির পাত্র এবং একটি ছোট পাকা

মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। মন্দিরটির আয়তন দৈর্ঘ্য ৫ হাত × প্রস্থ ৫ হাত × উচ্চতা ১ হাত। মন্দির সংলগ্ন দালানটির দৈর্ঘ্য ৭ হাত × প্রস্থ ৫ হাত। ইটগুলি চার-কোণ বিশিষ্ট এবং আয়তন ১৬´´ × ১৬´´ × ১½´´।

শ্রীসুধাংশুশেখর হালদার, প্রধান শিক্ষক,
কামদেবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ লক্ষ্মীজনার্দনপুর, ২৪-পরগণা।

৩। গ্রাম : শ্রীধরনগর।২০১।২,৩৪৭·৩৭।৩৭৬।২,৩৩৫

(ক) ব্রাহ্মণ, তাঁতী, কামার, ছুতার, কলু, জেলে, নাপিত, মুচি ও নমঃশূদ্র।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কাকদ্বীপ হইতে মোটরলঞ্চ বা নৌকাযোগে গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে জ্যৈষ্ঠ মাসে গঙ্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, চন্দনমাতাপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব এবং ফাল্গুন মাসে যে-কোন শনি বা মঙ্গলবার সাড়ম্বরে বিশালাক্ষীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে বিশালাক্ষীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া যথারীতি পূজার্চনা করা হয় এবং পরের দিন দেবী প্রতিমা শোভাযাত্রা সহকারে নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। এই উৎসবটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন এবং উৎসব উপলক্ষে নিকটবর্তী গ্রামের লোকজন যোগদান করেন। উৎসবের দিন রাত্রে পূজামণ্ডপে চণ্ডীপাঠ ও যাত্রাভিনয় হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) বিশালাক্ষীপূজার মেলা। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে একদিন। পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) কথিত আছে যে, চেতলার জমিদার রাখাল দাস আঢ্য মহাশয় শ্রীধরজীউ নামক ঠাকুরের নামানুসারে এই লাট আবাদ করিয়া গ্রাম পত্তন করেন। সেই হেতু গ্রামের নাম শ্রীধরনগর হইয়াছে।

শ্রীকার্তিক চন্দ্র দাস, শিক্ষক,
শ্রীধরনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বনশ্যামনগর, ২৪-পরগণা।

৪। গ্রাম : ইন্দ্রপুর।২১১।১,৯০২·২৯।২২৩।১,৬৫৮

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, তাঁতী, বাগ্দী ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে ছাপান্ন মাইল দূরে ডায়মণ্ডহারবার রেলস্টেশন এবং কাকদ্বীপ প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামে নদীপথে নৌকায় যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে সাধারণের একটি পাকা মন্দিরে শবরূপী শিবের বক্ষস্থলে দণ্ডায়মান হস্তে খড়্গ ও কণ্ঠে মুণ্ডমালা শোভিত বিশালাক্ষীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমা হইতে তিনদিনব্যাপী দেবীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিনে অষ্টপ্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন, দ্বিতীয় দিনে যথারীতি ষোড়শোপচারে বিশালাক্ষী দেবীর পূজা এবং তৃতীয় দিনে গোষ্ঠযাত্রা উৎসব পালন করা হয়। উৎসবটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন এবং সর্বজনীন।

(ঙ) বিশালাক্ষীপূজার মেলা। মাঘী পূর্ণিমা হইতে তিনদিন। প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির ব্যতীত ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিষ্ঠিত একটি ভদ্রকালীর পাকা মন্দির আছে। গ্রামের আদি জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ হাজরা মহাশয়ের নামানুসারে গ্রামের নাম ইন্দ্রপুর হইয়াছে।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস, শিক্ষক,
ইন্দ্রপুর বিদ্যালয়,
পোঃ দাসপুর, ২৪-পরগণা।

মেলা বিবরণী

চন্দনী মেলা

কামদেবপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন চন্দনী উৎসব উপলক্ষে গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখে ও একটি শিবমন্দির প্রাঙ্গণে দেবোত্তর প্রায় চার বিঘা জমির উপর তিন-চারদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। ইহা ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ হইতে শুরু হইয়াছে। সাধারণতঃ লক্ষ্মীপুর, বিষ্ণুপুর, অচিন্তনগর, মহেশপুর, কুমারপুর, লক্ষ্মীজনার্দনপুর, চিন্তামনিপুর প্রভৃতি

অঞ্চল হইতে নৌকায় ও পদব্রজে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

স্থানীয় বিক্রেতা ভিন্ন পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী দ্রব্য, লোহা, কাঁচের বাসনপত্র, মাটির হাঁড়ি-কলসী, পুতুল, কৃষি যন্ত্রপাতি বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির প্রায় পঞ্চাশটি দোকানের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। ইহা ছাড়া, প্রায় দশ-বারজন ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়।

মেলাস্থানের নিকটবর্তী 'কৈলাস সরোবর' বা 'বড় পুকুর' নামক পুষ্করিণীতে নৌকার মধ্যে স্থানীয় জমিদারের উপাস্য দেবতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণদেব-এর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া 'কমলে কামিনী' উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয় এবং রাত্রিকালে প্রচুর বাজী পোড়ান হয়। তাহা ছাড়া, চারনগান, কবিগান, হরিনাম সংকীর্তন ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। কীর্তনদলের অধিকারীর নাম, শ্রীউপেন্দ্র নাথ জানা; তিনি এই গ্রামেই বসবাস করেন।

নারায়ণীপূজার মেলা

দিগাম্বরপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে অনুষ্ঠিত নারায়ণীপূজা উপলক্ষে নারায়ণীমন্দির সংলগ্ন ব্যক্তিবিশেষের প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু সংখ্যক নরনারীর সমাগম হয়। প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী এবং পান-বিড়ির দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া, তেলেভাজা, তামা-পিতল-লোহা-কাঁচ-মাটির বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড় প্রভৃতির দোকানপাটও বসে। বিক্রেতারা আশপাশের গ্রাম হইতে আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য অনুষ্ঠিত যাত্রাভিনয় দেখিতে বহু দর্শকের সমাগম হয়।

বিশালাক্ষীপূজার মেলা

শ্রীধরনগর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে বিশালাক্ষী-পূজা উপলক্ষে একটি মেলা হয়। এই মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন এবং মাত্র একদিনই স্থায়ী হয়। নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে পদব্রজে মোট প্রায় সাত-আটশত যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

মেলায় কেবলমাত্র স্থানীয় বিক্রেতারাই দোকানপাট লইয়া আসেন। যাতায়াত ভাল ব্যবস্থা না থাকায় দূর হইতে কোন বিক্রেতা আসেন না। খাবার, মনিহারী, বাসনকোসন, মাটির হাঁড়ি, কলসী ও খেলনা, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদের কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট ব্যতীত কয়েকটি কাঁচা আনাজপত্রের দোকান বসে। মেলা উপলক্ষে যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

ইন্দ্রপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় বিশালাক্ষী দেবীর পূজা উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী দেবত্তোর প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন। মথুরাপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে মোট প্রায় দুই হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

আশপাশের গ্রাম ব্যতীত কাকদ্বীপ শহর হইতে প্রতি বৎসর মেলায় ব্যবসায়ী ও ফেরিওয়ালা আসেন। প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাটের মধ্যে মনিহারী ও পোষাক-পরিচ্ছদের দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া, তামা, পিতল, লোহা ও কাঁচের বাসনপত্র, কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, খেলনা-পুতুল, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, বইছবি, কবিরাজী ঔষধ এবং শাকসব্জীর দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস ও যাত্রাভিনয় হয়। স্থানীয় "ভদ্রকালী এ্যামেচার ক্লাব" যাত্রাভিনয় করিয়া থাকে। এই সকল আমোদপ্রমোদে মোট প্রায় দুই হাজার দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হইয়া থাকে।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ সীতারামপুর।

৭।১,৮৫৩·৯০।৬৪৮।৩,৮২১

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) ডায়মণ্ডহারবার অথবা লক্ষ্মীকান্তপুর রেলস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

এই গ্রামের মধ্য দিয়া ডায়মণ্ডহারবার-কাকদ্বীপ রোড গিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া মোটরবাস চলাচল করে। ইহা ভিন্ন, গ্রাম হইতে প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে হুগলী নদী প্রবাহিত। নিকটবর্তী শম্ভুচন্দ্রপুর ঘাট হইতে হুগলী নদী দিয়া নৌকায় হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় যাতায়াত চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে গ্রামের হরিমন্দিরে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি হইতে তিন-চারদিনব্যাপী। উৎসবটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে তিনটি বিশালাক্ষীমন্দির, দুইটি পঞ্চদেবতা-মন্দির, একটি শীতলামন্দির ও পাঁচটি হরিবাসর আছে। বৎসরে যে-কোন সময় উল্লিখিত দেবদেবীর মন্দিরে বার্ষিক পূজা হয়।

এই গ্রামের আদি জমিদার কুলপী থানার বেলপুকুর নিবাসী স্বর্গীয় জয়নারায়ণ পাত্র মহাশয়ের গৃহদেবতা সীতারামজীউর নামে এই গ্রামটির নাম সীতারামপুর হইয়াছে।

শ্রীকালীপদ গায়েন, প্রধান শিক্ষক,
সীতারামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নিশ্চিন্তপুর, ২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ মাধবনগর (মৌজা ঃ শ্রীনগর)।

৮।২,৯২২·৩৮।৮০২।৪,৪৬১

(ক) ব্রাহ্মণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কাওরা, ধোপা ও নাপিত। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন লক্ষ্মীকান্তপুর। কলিকাতা হইতে মোটরবাসেও যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে সপ্তাহব্যাপী গোষ্ঠযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি ব্যক্তিবিশেষের হইলেও গ্রামবাসী সকলেই ইহাতে যোগদান করেন। ইহা প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গোষ্ঠযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে সপ্তাহব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন জীর্ণ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ছাড়া, গ্রামে পঞ্চানন্দ, শীতলা, মনসা এবং গাজী সাহেবের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

গ্রামের আদি জমিদার মাধব দত্তের নামানুসারে গ্রামের নাম মাধবপুর হইয়াছে।

শ্রীপঞ্চানন মান্না, চাকুরী,
রঘুনাথপুর, ২৪-পরগণা।

৩। গ্রাম ঃ মন্মথপুর। ১৭।২,৩০২·৫৬।৪৯৯।২,৭৩৭

(ক) মাহিষ্য, গোয়ালা, তাঁতী, ছুতার, কুমার, নমঃশূদ্র, বাগ্দী, মুচি, মুণ্ডা প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন লক্ষ্মীকান্তপুর।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে আটেশ্বর শিব ব্যতীত নয়টি শীতলা ও পাঁচটি মনসার স্থান আছে। ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে উল্লিখিত দেবদেবীর স্থানে পূজা হয়।

শ্রীভবতারণ দাস, প্রধান শিক্ষক,
মন্মথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মন্মথপুর, ২৪-পরগণা।

৪। গ্রাম ঃ মৃনালনগর। ২৮।২,৪৭৯·২৮।৪৫৬।২,৬৮০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, জেলে, গোয়ালা, নাপিত, ধোপা, মুচি ও মুণ্ডা।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় বিশ মাইল দূরে লক্ষ্মীকান্তপুর রেলস্টেশন। কাকদ্বীপ হইতে মোটরবাস চলাচল করে। গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিমদিক দিয়া প্রবাহিত নদীপথে নৌকায় যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমায় বিশালাক্ষী দেবীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) মাটির দেওয়াল ও টালির ছাউনী দেওয়া একটি ঘরে বিশালাক্ষী, শীতলা ও চণ্ডী মূর্তি আছে। গ্রামে সাতটি পঞ্চানন্দ, দশটি শীতলা ও তিনটি মনসা আছে।

শ্রীশরৎ চন্দ্র মাইতি, শিক্ষক,
মৃনালনগর, পোঃ মন্মথপুর,
২৪-পরগণা।

৫। গ্রাম ঃ মণিপুর (মৌজা ঃ হরেন্দ্রনগর)।
৩৩।১,৭৫৫·৬০।২৫৫।১,৪২২

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, বৈরাগী, চামার, নাপিত, রাজু, মুসলমান প্রভৃতি। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ডায়মণ্ডহারবার হইতে কাকদ্বীপ হইয়া মোটরলঞ্চে মণিপুর গ্রামে পৌছানো যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি হইতে সপ্তাহব্যাপী গঙ্গাপূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জমিদার স্বর্গীয় মনীন্দ্র মাইতি মহাশয় কর্তৃক ১৩১৪ বঙ্গাব্দে গঙ্গা দেবীর মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সময় হইতে এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে। উৎসবটি ব্যক্তিবিশেষের হইলেও গ্রামবাসী সকলেই এই উৎসবে সহযোগিতা ও যোগদান করেন। পূজারী উৎকল নিবাসী কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পদবী পাণ্ডা। গঙ্গাদেবীর মন্দিরটি নদীকূলে অবস্থিত। পৌষসংক্রান্তির দিন প্রত্যুষে বহু নরনারী নদীতে মকরস্নান করেন এবং গঙ্গাদেবীর পূজা দেন।

(ঙ) গঙ্গাপূজার মেলা। পৌষসংক্রান্তি হইতে সপ্তাহ-ব্যাপী। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে গঙ্গাদেবীর মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনীযুক্ত একটি মন্দির আছে। ইহা ভিন্ন, গ্রামে পাঁচটি বাবাঠাকুর, তিনটি শীতলা, তিনটি মনসা, দুইটি পঞ্চানন্দ, বিশালাক্ষী, ঘণ্টাকর্ণ ও গণেশ আছে।

গ্রামের আদি জমিদার মেদিনীপুর জেলার কাঁথির অন্তর্গত কৃষ্ণনগর গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় মনীন্দ্র নাথ মাইতি মহাশয়ের নামানুসারেই গ্রামের নাম মণিপুর হইয়াছে।

শ্রীসতীশ চন্দ্র সাঁতরা, শিক্ষক,
গঙ্গাধরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
২৪-পরগণা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আমাদের সংবাদদাতা শ্রীরোহিতাশ্ব প্রামাণিক (গ্রাম ঃ ধল, পোঃ রামচন্দ্রপুর) প্রেরিত সংবাদ অনুসারে জানা যায় যে, উত্তর দুর্গাপুর (মৌজা নং ২৬) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের ১০ই তারিখ হইতে সাতদিনব্যাপী সাড়ম্বরে গোরাচাঁদ পীরের তিরোধান উৎসব এবং তদুপলক্ষে স্থানীয় পাল মহাশয়দের জমিতে একটি ছোট মেলা বসে। চব্বিশ-পরগণায় গোরাচাঁদ পীরের একটি দরগাহ আছে এবং ফাল্গুন মাসে উৎসব উপলক্ষে পীরের দরগায় হাজত পূজা দিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু নরনারীর সমাগম হয়।

উৎসব বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

মন্মথপুর গ্রামে চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহব্যাপী শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন এবং আদিতে ইহা স্থানীয় হালদার পরিবার কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল। বর্তমানে গ্রামবাসীগণই উৎসব পরিচালনা করিয়া থাকেন। গ্রামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত একটি শীলাখণ্ডকে শিব জ্ঞানে পূজা করা হয়। উৎসবকালে এইস্থানে একটি পূজামণ্ডপ নির্মাণ করিয়া যথারীতি পূজাদি করা হয়। উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ শিবের পূজা করিয়া থাকেন। শিবপূজার নিমিত্ত হালদারেরা ছয় বিঘা জমি দেবোত্তর করিয়া দিয়াছেন।

চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ হইতেই ভক্তরা শিবের নামে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন এবং সপ্তাহব্যাপী পবিত্র জীবন যাপন করিয়া শিবের আরাধনা করেন। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে সন্ন্যাসগ্রহণকারী ভক্তরা বঁটী ঝাঁপ এবং চতুর্থ দিনে আগুন ঝাঁপ এবং ৩০শে চৈত্র চড়কগাছে পাক খান। ঝাঁপ ও চড়কগাছে পাক খাওয়া দেখিতে বহু লোকের সমাগম হয়। উৎসবের প্রথম দিন হইতেই গ্রামে গাজনের সঙ বাহির হয়। নানারূপ পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সঙ-এর দল গাজনের ছড়া কাটিয়া গ্রামে ঘুড়িয়া বেড়ান।

বিশালাক্ষীপূজা

মৃনালনগর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল-পূর্ণিমা হইতে সাতদিনব্যাপী সাড়ম্বরে বিশালাক্ষীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর নিকটে মাটির দেওয়াল ও টালির চালাযুক্ত ঘরে বিশালাক্ষীসহ চণ্ডী ও শীতলা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বিশালাক্ষীর মন্দিরটি সাধারণের।

উৎসবের প্রথম দিন বিশালাক্ষী, শীতলা ও চণ্ডীর পূজা, দ্বিতীয় দিনে অষ্টমপ্রহরব্যাপী নামযজ্ঞ আরম্ভ হইয়া তৃতীয় দিনে মহোৎসব, চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে বিশালাক্ষীর সাড়ম্বরে পূজা, ষষ্ঠ দিনে গোষ্ঠপূজা এবং সপ্তম দিনে সর্বজনীন অন্নভোগ বিতরণ করা হয়। উৎসবের চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে মন্দির প্রাঙ্গণে যাত্রাভিনয় হয়। উৎসবটি সর্বজনীন ও প্রাচীন। পূজারী ব্রাহ্মণ, পদবী মিশ্র।

মহোৎসব

সীতারামপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বাদশী হইতে দুইদিনব্যাপী সাড়ম্বরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত হরিবাসরমন্দিরে শ্রীহরিপূজা ও অখণ্ড নামকীর্তন মহোৎসব পালিত হয়। প্রায় সত্তর-বাহাত্তর বৎসর পূর্বে স্থানীয় দাস পরিবার কর্তৃক এই হরিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে উৎসবটি সর্বজনীন এবং গ্রামবাসী সকলেই এই উৎসবে যোগদান করেন। উৎসবে পৌরহিত্য করেন মেদিনীপুর জেলার জনৈক বৈষ্ণব শ্রীবিষ্ণুপদ অধিকারী মহাশয়।

উৎসব উপলক্ষে গ্রামে অবস্থিত অপর পাঁচটি হরিমন্দিরে নামকীর্তন করা হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিন পূজা প্রাঙ্গণে প্রায় তিন-চার মন বাতাসা ও সন্দেশ লুট হয়। লুটের বাতাসা সংগ্রহের জন্য গ্রামবাসী সকলেই মণ্ডপে সমবেত হন। মহোৎসব উপলক্ষে ভক্তরা হরিঠাকুরের নিকট মালসাভোগ নিবেদন করিয়া থাকেন। চিড়া, দধি, বাতাসা, পেস্তা ও বাদাম দিয়া কাঁচা মালসাভোগ অথবা লুচি, সন্দেশ, মিষ্টান্ন ইত্যাদি দিয়া পাকা মালসাভোগ দেওয়া হয়।

মেলা বিবরণী

গঙ্গাপূজার মেলা

প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তিতে গঙ্গাপূজা উপলক্ষে হরেন্দ্রনগর গ্রামের উত্তর-পশ্চিম অংশে গণ্ডাকাটা নামক স্থানে দেবোত্তর প্রায় চার-পাঁচ বিঘা জমির উপর সপ্তাহ-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

দুর্বাচটী, কালিয়াবাদ, পূর্ণচন্দ্রপুর, মৃনালনগর, মন্মথপুর, গঙ্গাপুর, মাধবনগর, গোবিন্দরামপুর, ফটিকপুর, কেদো, ভাজনা, কুয়াবেড়ে, শিবনগর, ধল, বালিখালি প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতিদিন মেলায় প্রায় আট-নয়শত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা নৌকা, লঞ্চ ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় মোট প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে এবং পঁচিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। উহার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটি দোকান খোলা জায়গায় বসে। ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান ; পিতল, লোহা ও কাঁচের বাসন-পত্রের দোকান ; মনিহারী দোকান ; মিল ও তাঁতের কাপড়, গামছা-লুঙ্গী ও তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদের দোকান ; কবিরাজী ঔষধপত্রের দোকান ; বেত ও বাঁশের ধামা, কুলোর দোকান ; বই-ছবির দোকান ; মাটির হাঁড়ি-

কুড়ি, পুতুল ও খেলনার দোকান বসে। মেদিনীপুর জেলা হইতে বেতের ধামা-কুলো ইত্যাদি, কাকদ্বীপ, মৃনালনগর ও গঙ্গাধরপুর হইতে মাটির পুতুল ও হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি প্রতি বৎসর মেলায় আসে। ইহা ব্যতীত, দুর্বাচটী, পাথরপ্রতিমা, মাধবনগর, মন্মথপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতেও বিক্রেতারা প্রতি বৎসর মেলায় আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে কাপড়চোপড় এবং ময়রা ও তেলেভাজার দোকানের সংখ্যাই বেশী।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ঘুড়ি প্রতিযোগিতা, সার্কাস ও চার-পাঁচ রাত্রিব্যাপী থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়। মেলায় হরেন্দ্রনগর মৌজা, কাকদ্বীপ থানার গঙ্গাধরপুর মৌজা ও মেদিনীপুর জেলা হইতে যাত্রা ও থিয়েটারের দল আসে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় সাত-আটশত লোক ঐ সকল আমোদপ্রমোদের আনন্দ উপভোগ করেন।

গোষ্ঠযাত্রার মেলা

শ্রীনগর গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রা উৎসব উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের সম্মুখে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় তিন বিঘা জমির উপর সপ্তাহব্যাপী মেলা বসে। সাধারণতঃ বিকালের দিকেই মেলায় ক্রয়-বিক্রয় হয়। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় কাকদ্বীপ থানার বিভিন্ন ইউনিয়ন হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় এক হাজার নর-নারীর সমাগম হয়।

প্রধানতঃ কাকদ্বীপ থানার ১নং ও ২নং ইউনিয়ন হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসেন। প্রায় ত্রিশটি দোকানপাটের মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকান; মনিহারী দোকান; পিতল, কাঁসার ও কাঁচের বাসনপত্রের দোকান; কাটাকাপড়, গামছা-লুঙ্গি ইত্যাদি পোষাক-পরিচ্ছদের দোকান; বই-ছবির দোকান এবং মাটির পুতুল ও হাঁড়ি-কুড়ির দোকানপাট বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচের দল আসে ও যাত্রাভিনয় হয়। কেহ কেহ জুয়া খেলিয়া থাকেন। গ্রামেই যাত্রার দল আছে।

মহোৎসবের মেলা

সীতারামপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি হইতে মহোৎসব উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় তিন বিঘা জমির উপর তিন-চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। সাধারণতঃ বিকেলের দিকেই মেলায় বেচাকেনা ও লোক সমাগম হয়।

কাকদ্বীপ থানার রামতনুনগর ও মাধবনগর ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে এবং কুলপী থানার ৯নং বেল-পুকুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় তিন-চার হাজার নর-নারী ও ব্যবসায়ীরা আসিয়া থাকেন।

মোট প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাটের মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকানের সংখ্যাই বেশী, ইহা ভিন্ন, মনিহারী দ্রব্য, তৈয়ারী জামা-কাপড়, কাঁচা আনাজ ইত্যাদি আমদানী হয় এবং কয়েকটি পান-বিড়ি ও বিস্কুটের দোকান বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান ও তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় পুতুলনাচের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়। এই আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠানে চার-পাঁচ হাজার লোকের সমাগম হয়।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম: অমরাবতী। ৭০।১,২২১'৩৮।২৭৮।১,৫৯৯

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, দলুই, কামার, ধোপা, নাপিত, হাড়ী, কাওরা প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন ডায়মণ্ডহারবার হইতে মোটরবাসে কাকদ্বীপে পৌছাইয়া সেখান হইতে মোটরলঞ্চ অথবা নৌকা-যোগে অমরাবতী গ্রামে পৌছান যায়। ফ্রেজার সাহেব নির্মিত একটি রাস্তা দিয়া গ্রামের মধ্যে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, পৌষসংক্রান্তিতে মকরস্নান ও গঙ্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজাটি প্রায় দুইশত বৎসরের এবং গঙ্গাপূজাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) মকরস্নানের মেলা। পৌষসংক্রান্তি হইতে তিনদিনব্যাপী। প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি বিশালাক্ষীর বার্ষিক পূজা হয়।

বঙ্গোপসাগরের উত্তর তীরবর্তী এই গ্রামটি পূর্বে জঙ্গলাকীর্ণ বনভূমি ছিল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ফ্রেজার সাহেব ঐ নিবিড় জঙ্গল কাটাইয়া গ্রাম পত্তন করেন। সাহেবের নামানুসারে ফ্রেজারগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত •আটটি গ্রামের মধ্যে অমরাবতী একটি।

শ্রীকান্ত চরণ মাইতি, চাকুরী,
অমরাবতী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ফ্রেজারগঞ্জ, ২৪-পরগণা।

মেলা বিবরণী

মকরস্নানের মেলা

অমরাবতী গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তিতে মকরস্নান উপলক্ষে সমুদ্রের তীরে বালুচরার উপর তিন-দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রায় ছয়-সাত হাজার নরনারীর সমাগম হয়। আশপাশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে নৌকায়, ডিঙ্গিতে ও পদব্রজে প্রতি বৎসর মেলায় নরনারী আসিয়া থাকেন।

মেলায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে এবং দশ-বারোজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ কুমারহাট, কামারহাট, ডোমহাট, ৮নং ও ৯নং ইউনিয়ন হইতে এবং কাকদ্বীপ হইতে বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ছাড়া, মনিহারী, বাসনপত্র, তাঁতের কাপড়, জামা, গামছা, মশারী ইত্যাদি, ঔষধপত্র, বই-ছবি এবং লাঙ্গল, কোদাল, নিড়ানী ইত্যাদি কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিষপত্রের আমদানী হয়। তাঁতের কাপড়, গামছা, মশারী ইত্যাদির বিক্রেতারা প্রতি বৎসর কামারহাট, কুমারহাট ও ডোমহাট হইতে আসিয়া থাকেন। আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচ, কবিগান ও যাত্রাভিনয় হয়।

থানা ঃ সাগর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ শিলপাড়া (মৌজা ঃ মুড়িগঙ্গা)।

৭।১,২৩১.১২।৩২৫।১,৫৫০

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, দলুই, জেলে ও নমঃশূদ্র। গ্রামে দাসপাড়া, সর্দারপাড়া, মণ্ডলপাড়া, দলুইপাড়া প্রভৃতি নামে ছয়-সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও দিনমজুরী।

(গ) গঙ্গাসাগর রোড হইতে পাখীরাখা গ্রামের মধ্য দিয়া পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইলে এই গ্রামে পৌছান যায়। ইহা ব্যতীত, জলপথে কাকদ্বীপ হইতে মুড়িগঙ্গা অথবা কচুবেড়িয়া ঘাট পর্যন্ত নৌকাযোগে আসিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তিতে সপ্তাহকাল-ব্যাপী। প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে চারটি শীতলা ও দুইটি মনসা আছে।

শোনা যায়, আদিতে মেদিনীপুর জেলা হইতে কতিপয় পরিবার এই স্থানের বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া প্রথম বসবাস স্থাপন করেন। সেই সময় এক স্বপ্নাদেশ অনুসারে একটি শিব মূর্তি পাওয়া যায়। উক্ত শিব মূর্তিটি যথারীতি প্রতিষ্ঠা করিয়া অদ্যাপি পূজা-অর্চনা করা হইতেছে। এই কারণে প্রথম দিকে গ্রামটি শিবপাড়া নামে খ্যাত হয়। শিবপাড়া পরবর্তীকালে শিলপাড়া নামে পরিচিত হইয়াছে।

শ্রীবিহারীলাল দাস, প্রধান শিক্ষক,
বামনখালী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মুড়িগঙ্গা, ২৪-পরগণা।

২। গ্রাম ঃ মৃত্যুঞ্জয়নগর।

২১।১,২১৯.২৮।২০৬।১,১২৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, কুমার, তাঁতী, জেলে, নমঃশূদ্র, ধোপা, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও মুসলমান। গ্রামে প্রায় ছয়টি পাড়া আছে। যেমন—কুমারপাড়া, মাহিষ্যপাড়া, ধোপাপাড়া, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও মুসলমানপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) ×

(ঘ) গ্রামে শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ও শিবরাত্রি উৎসব। ইহা ছাড়া, বিশালাক্ষীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে চারদিন। বাইশ-তেইশ বৎসর হইল মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে মনসাপূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে মেদিনীপুর জেলার রাখালরাজ গায়েন নামে জনৈক ব্যক্তি সরকারের নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়া এই স্থানের বন-জঙ্গল কাটাইয়া গ্রামের পত্তন করেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃত্যুঞ্জয়ের নাম অনুসারে গ্রামটির নামকরণ করেন মৃত্যুঞ্জয়নগর।

শ্রীরুধির চন্দ্র বর্মণ, প্রধান শিক্ষক,
মৃত্যুঞ্জয়নগর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মৃত্যুঞ্জয়নগর, ২৪-পরগণা।

৩। গ্রাম ঃ সুমতীনগর।

২২।১,৪৯৫.৮৮।২৯১।১,৬০৩

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কুমার, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মুচি, তেলি ও মুসলমান। গ্রামটি ছয়টি পাড়ায় বিভক্ত।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ডায়মণ্ডহারবার। মোটর-বাসে কাকদ্বীপ হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। নৌকায় যাতায়াতেরও সুবিধা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও চৈত্র মাসে বাসন্তী-পূজা।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে পাঁচদিন। মাত্র ছয় বৎসর হইল মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল ও টিনের চালাযুক্ত সাধারণের একটি দুর্গামণ্ডপ আছে।

শ্রীসর্বেশ্বর মাইতি, শিক্ষক,
মৃত্যুঞ্জয়নগর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মৃত্যুঞ্জয়নগর, ২৪-পরগণা।

৪। গ্রাম ঃ লালপুর (মৌজা ঃ মনসাদ্বীপ, ২য় খণ্ড)। ২৪।২,৮৪৯˙১৫।২৯৫।১,৯২৮

(ক) হিন্দু, মাহিষ্য, করণ, গোয়ালা, তাঁতী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ডায়মণ্ডহারবার।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা ও চৈত্র মাসে শিবপূজা।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে ছয়দিন। মাত্র চৌদ্দ বৎসর মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে দুইদিন। গত সাত বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে আটদিন। মাত্র আট বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

শিবপূজার মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। সাত বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ আছে।

কলিকাতার শিকদারপাড়ার শিব প্রসাদ দত্ত মহাশয় ইংরাজদের নিকট হইতে বন-জঙ্গল পরিপূর্ণ এই স্থানের বন্দোবস্ত লইয়া গ্রাম পত্তন করেন এবং ইহাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া নিজের নামে শিবপুর, পুত্র লালবিহারীর নামে লালপুর, কন্যা সাবিকাসুন্দরীর নামে সাবিকাপুর, পৌত্রের নামে গোলকপুর এবং তাঁহার আরাধ্য বিশালাক্ষী দেবীর নামানুসারে বিশালাক্ষীপুর রাখেন।

শ্রীহরিশ চন্দ্র মাইতি, শিক্ষক,
গ্রাম : লালপুর, পোঃ মনসাদ্বীপ,
২৪-পরগণা।

৫। গ্রাম ঃ বেণ্ডয়াখালী। ৩৬।১,৬০৩˙৯৯।৩৮৭।২,০৪৭

(ক) পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কাওরা, মেথর, মাহিষ্য, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ডায়মণ্ডহারবার। কাকদ্বীপ হইতে নৌকায় যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ধর্মরাজের গাজন, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি এবং দোল পূর্ণিমার পরদিবস নাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া, বিশালাক্ষী, কালী, শীতলা, মনসা, গোষ্ঠপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে তিনটি শীতলামন্দির, তিনটি বিশালাক্ষী-মন্দির, দুইটি কালীমন্দির ও একটি শিবমন্দির আছে।

শ্রীশ্রীমন্ত কুমার দাস, শিক্ষক,
পোঃ বেণ্ডয়াখালী, ২৪-পরগণা।

মেলা বিবরণী

দুর্গাপূজার মেলা

সুমতীনগর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে সাধারণের প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। সাধারণতঃ বিকালের দিকে মেলায় বেচাকেনা হয় এবং আশপাশের গ্রাম হইতে প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার নরনারী আসেন। মেলাটি মাত্র ছয় বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী ভিন্ন নিকটবর্তী শহরাঞ্চল হইতে দোকানদার আসিয়া থাকেন। মেলায় মনিহারী দোকানের সংখ্যাই অধিক দেখা যায়। ইহা ছাড়া, বিভিন্ন প্রকার খাবার ও পোষাক-পরিচ্ছদ, খেলনা-পুতুল, ধামা, কুলো, চ্যাঙ্গারী, বই-ছবি ও ঔষধপত্র আমদানী হইয়া থাকে। প্রায় সত্তর-আশীটি দোকানপাট বসে। আমোদপ্রমোদ উপলক্ষে পুতুলনাচ, যাত্রাভিনয় ও বাজী পোড়ান হয়।

লালপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় চার বিঘা পরিমাণ জমির উপর ছয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র গত চৌদ্দ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে এবং সাধারণতঃ প্রতিদিন বিকালের দিকেই মেলায় লোকসমাগম হইতে দেখা যায়।

বেগুয়াখালী, মনসাদ্বীপ, মগরা, কমলপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ছয়শত নারীর সমাগম হইয়া থাকে। যাত্রীগণ প্রধানতঃ পদব্রজেই আসিয়া থাকেন।

স্থানীয় অঞ্চলের লোকজন ব্যতীত কাকদ্বীপ হইতে প্রতি বৎসর মেলায় ব্যবসায়ী ও ফেরিওয়ালারা আসেন। প্রায় একশত দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি বিভিন্ন খাবার দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ছাড়া, মনিহারী, বাসনপত্র, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, শস্যবীজ, ঔষধপত্র, বই-ছবি ইত্যাদি আমদানী হইয়া থাকে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কীর্তন, কবিগান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। গ্রামেই যাত্রাদল আছে; অধিকারী শ্রীপূর্ণ জানা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই গ্রামে অনুষ্ঠিত রাসযাত্রার মেলা, কালীপূজার মেলা ও শিবপূজার মেলার বর্ণনা উপরোক্ত মেলার অনুরূপ।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

শিলপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব উপলক্ষে শিলপাড়া ও হেন্দলকেটকী গ্রামের সংযোগস্থলে বিশ্বেশ্বর মহাদেবের পূজামণ্ডপের সম্মুখস্থ ময়দানে দেবোত্তর প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন এবং ইহাতে আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে মোট প্রায় কুড়ি হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা প্রধানতঃ পদব্রজে ও নৌকায় করিয়া মেলায় আসেন।

কাকদ্বীপ, গেঁওখালি, মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম, তেখালি প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ছাড়া, বাসনকোসনের দোকান; লোহার জিনিসপত্রের দোকান; কবিরাজী ও হাকিমী ঔষধপত্রের দোকান; বই-ছবির দোকান; মিল ও তাঁতের কাপড়-চোপড়ের দোকান; কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির দোকান; বেত ও বাঁশের তৈয়ারী ধামা, কুলো, চ্যাঙ্গারী ইত্যাদির দোকান বসিয়া থাকে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং কবিগান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। গ্রামেই অভিনয়ের দল আছে। কোন কোন বৎসর মেদিনীপুর হইতেও থিয়েটারের দল আসিয়া থাকে। এই সকল আনন্দানুষ্ঠানে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ হাজার দর্শকের সমাগম হয়।

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংকলিত গঙ্গাসাগর সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

গঙ্গাসাগর মেলা

"সর্বতীর্থ বার বার
গঙ্গা সাগর একবার।"

বাংলার দক্ষিণ সীমান্তে চব্বিশ-পরগণা জেলার সাগর থানার অন্তর্গত সাগরদ্বীপ। গঙ্গাসাগর সঙ্গম মুখে প্রায় নির্জন, নিসঙ্গ, বালুকাময় বিস্তীর্ণ সাগরদ্বীপের বেলাভূমি। প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে সাগরদ্বীপে ছুটে আসেন ভারতের নানাদিক থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যকামী নরনারী। সারা বৎসর অবহেলায় পরিত্যক্ত সাগরসৈকত বহু মানুষের সমাগমে মুখরিত হয়ে উঠে—পরিণত হয় মহানগরে, মহা-মেলায়। তারপর—? তারপর যেন যাদুকরের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ গজিয়ে উঠা এই স্বল্পায়ু জনপদ আবার একদিন হঠাৎ-ই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। শুধু শোনা যায় নির্জন সাগরসৈকতে আছড়ে পড়া বিরামবিহীন জলোচ্ছ্বাসের একটানা গর্জন।

সুন্দরবনের অন্তর্গত গভীর বন-জঙ্গল অধ্যুষিত সাগর-দ্বীপে মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইংরাজ সরকারের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে জনবসতি। এ সম্পর্কে শ্রীঅশোক মিত্র মহাশয় তাঁর ১৯৫১ সালের 'District Handbook, 24-Parganas' গ্রন্থে লিখেছেন—

"The reclamation of the island from jungle was started early in the nineteenth century. In 1811, a Mr. Beaumont applied for permission to hold a hundred acres of land in the island for the purpose of establishing a manufactory of buff leather, and asked that all tiger-skins brought to the Collector's office might be made over to him for this purpose. His application for land was granted by the Board of Revenue in November 1811; and in the following year, in consequence of a Government resolution offering favourable terms for the cultivation of Sāgār Island, Mr. Beaumont applied for a grant of land on a cultivating tenure. This application was rejected on the ground that Government had decided not to grant leases to Europeans for cultivation. Leases of the island were offered to Indians only, and many proposals were received from them, but this scheme of colonization was a complete failure. The island was subsequently leased to an association composed of Europeans as well as Indians, free of rent, for thirty years, and to pay only four annas per bigha ever after. The undertaking was begun with vigour, but so many unforeseen difficulties occurred that up to the 1st September 1820 not more than four square miles had been effectually cleared. Amongst other obstacles it was found that as the woods were cut down, the sea encroached, the sandy beach not having sufficient tenacity to resist its invasion. Twenty-five families of Maghs from Arakan were settled at the confluence of two creeks, and a road constructed for the accommodation of pilgrims to the temple of Kapila.

In 1819, Mr. Trower, Collector of the 24-Parganas, originated a company, called the Saugor Island Society, for the systematic reclamation and development of the island; he himself was a considerable share-holder, and the central part of the island was called Trowerland after him. The company obtained a grant of the whole island, subject to certain conditions (the breach of which entailed forfeiture of the grant) and carried on operations vigorously until 1833, when their work was destroyed by a cyclone and they abandoned the project. Their interest in the northern part of the island was then taken over by four European gentlemen, who combined the manufacture of salt with the cultivation of rice. The progress of the island was again interrupted by the cyclone of 1864, when 4,137 persons or three-fourths of the population perished, only 1,488 being left. Since then considerable progress has been made in reclaiming the waste, and the north of the island is under cultivation, but the south is still dense jungle." (p. cvii-cviii)

কিছুকাল আগেও সাধারণ মানুষ তথা বহু বিদ্বজ্জন মনে করতেন বঙ্গোপসাগরের সীমান্তবর্তী গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ-গুলি বয়সে নবীন এবং গঙ্গানদীর পলি জমে অল্পকালের মধ্যে এর সৃষ্টি। কিন্তু ইংরাজগণ কর্তৃক বন হাসিল করে এই স্থানে জনবসতি স্থাপন কালে যে-সকল পুরাকীর্তির নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে তার থেকে বর্তমান পণ্ডিতগণ মনে করেন চব্বিশ-পরগণার দক্ষিণ সীমান্তবর্তী এই সকল অঞ্চল বয়সে তো মোটেই নবীন নয়; বরং অতীতকালে এই অঞ্চলে বহু সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। জয়নগর-মজিলপুর নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীকালিদাস দত্ত মহাশয় তাঁহার "চব্বিশ-পরগণার অতীত প্রাচীনযুগ" নামক একটি মূল্যবান প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। ঐ সুদীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ নীচে লিপিবদ্ধ করা হল—

"চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশ বর্তমান সময় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা নামে পরিচিত এবং শাসন সৌকর্য্যার্থ ডায়মণ্ডহারবার, আলিপুর ও বসিরহাট মহকুমার অধীন সাগর, কাকদ্বীপ, কুলপী, মথুরাপুর, জয়নগর, ক্যানিং,

হাড়োয়া, হাসনাবাদ ও সন্দেশখালি এই নয়টি থানার অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীনকালে গঙ্গানদী ঐ প্রদেশে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইত। বাল্মীকির রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায় যে, তজ্জন্য সুদূর অতীতযুগ হইতে উহা কপিলাশ্রম ও গঙ্গাসাগর সঙ্গমতীর্থরূপে প্রসিদ্ধ লাভ করে।

অধুনা গঙ্গানদী সেখানে স্থানে স্থানে লুপ্ত হইলেও উহার শাখানদীগুলি এখনও ঐ অঞ্চলে প্রবাহিত হইতেছে। প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের গঙ্গাসাগর সঙ্গমে তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে পঞ্চশত নদী নামে সর্ব্বপ্রথম উহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সংখ্যায় অধিক থাকায় বোধ হয় মহাভারতকার ঐরূপে উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। উহার জন্যই সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীকালেও পুরাতন বাংলা সাহিত্যে শতমুখী গঙ্গা নামে উহাদের উল্লেখ আছে।......

কৃত্তিবাস বর্ণিত এই কিংবদন্তী পাঠে জানিতে পারা যায়, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে বিহরোদের ঘাট নামক স্থানের অনতিদূর হইতে গঙ্গার শাখানদীগুলি দক্ষিণ ২৪-পরগণার চারিদিকে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু উক্ত বিহরোদের ঘাটের অবস্থান এখন অজ্ঞাত। কৃত্তিবাসের পরবর্তীকালে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে রচিত, শ্রীচৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত আছে যে, সেই সময় ইদানীন্তন ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত মথুরাপুর থানার অধীন ছত্রভোগ গ্রামের সান্নিধ্যে গঙ্গা ঐরূপে বিভক্ত ছিল এবং শ্রীচৈতন্যদেব তৎকালে গঙ্গাতীর দিয়া নীলাচল গমনকালে ছত্রভোগে আসিয়া গঙ্গার ঐসকল শাখা দর্শন করেন।

ঐরূপ শতমুখী গঙ্গা অধ্যুষিত ভারতবিখ্যাত কপিলাশ্রম ও গঙ্গাসাগর সঙ্গমতীর্থের প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পুরাবৃত্ত আজিও সঙ্কলিত হয় নাই। ইউরোপীয় পর্য্যটক ও মুসলমান লেখকগণের খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থাদি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সময় ঐ প্রদেশের অধিকাংশ স্থান বনময় হইয়া সুন্দরবন নামে ব্যাঘ্র ও গণ্ডার প্রভৃতি ভীষণ শ্বাপদকুলের বাসভূমি ছিল এবং ঐ সকল নদীতেও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের ঘাটি ছিল।

ঐ সময় কি কারণে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ঐ প্রকার অবস্থা ঘটে তাহা অজ্ঞাত। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে ঐ অঞ্চলে বন ক্রমশঃ হাসিল হইয়া আবাদ হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতদিনেও উহা সম্পূর্ণরূপে আবাদে পরিণত হয় নাই এবং উহার পূর্ব্বাংশে এখনও শ্বাপদসঙ্কুল গভীর বন বিরাজ করিতেছে।

পূর্ব্বে ইউরোপীয়গণ সিদ্ধান্ত করেন যে, সৃষ্টিকাল অবধি ঐ প্রদেশ ঐ অবস্থায় ছিল এবং বাংলাদেশ ইংরাজ অধিকারে আসিলে সেখানে সর্ব্বপ্রথম আবাদ আরম্ভ হয়। ভূতত্ত্ববিদগণও গাঙ্গেয় ব-দ্বীপকে বয়সে নবীন বলায় অনেকের ইহাও ধারণা হয় যে খুব প্রাচীনকালে ঐ অঞ্চলের অস্তিত্ব ছিল না এবং বঙ্গোপসাগরে গঙ্গানদীর পলিতে দ্বীপসমূহ গঠিত হইয়া কিছুকাল পূর্ব্বে উহার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বন হাসিলের পর সেখানে বনমধ্য হইতে যে সমস্ত ভগ্ন মন্দির গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ, গড়, মজা পুষ্করিণী এবং পুষ্করিণী ও খানা খননকালে ভূগর্ভের উচ্চস্তর হইতে এনাগাং যে সকল তাম্রপট্টলিপি, মৃন্ময়, ধাতব ও প্রস্তরের দেবদেবীর মূর্ত্তি ও তৈজসাদি এবং রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রভৃতি বহুসংখ্যক পুরাকীর্ত্তি নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তদসমুদয় হইতে জানা গিয়াছে যে, উপরোক্তরূপ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত ও লোকের ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক এবং অতীতযুগে সেখানে অনেক সমৃদ্ধ গ্রাম ও নগরাদি ছিল।

কোন সময় কি প্রকারে ঐ সমস্ত লোকালয় ধ্বংস হইয়া ঐ প্রদেশ উল্লিখিতরূপ বনময় অবস্থায় পরিণত হয় তাহা ঠিক জানা যায় না। কেহ কেহ ভূমিকম্পকে উহার কারণ বলিয়াছেন। প্রাচীনকালে ঐরূপ নৈসর্গিক বিপ্লবে যে ঐ প্রদেশের ভূমি নিমজ্জিত হইয়াছে তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে সেখানকার বিভিন্ন স্থান খননকালে ভূ-পৃষ্ঠের নিম্নদেশে আবিষ্কৃত সুন্দরীবৃক্ষের প্রচুর শিকড়সহ মৃত্তিকাস্তর (peat-bed) হইতে। ঐ অঞ্চলের যে সকল নিম্ন স্থান নদীর জোয়ারের জলে ডুবিয়া যায় সুন্দরীবৃক্ষগুলি তাহারই উপরিভাগে জন্মাইয়া থাকে। সুতরাং সেখানে ভূ-পৃষ্ঠের নিম্নাংশে প্রচুর পরিমাণে ঐরূপ মৃত্তিকাস্তরের আবিষ্কারে প্রতিপন্ন হয় যে ভূগর্ভে উক্ত বৃক্ষমূলের পতন কোন সময় ভূমিকম্পে সেখানকার ভূমি নিমজ্জনের কালেই সংঘটিত হইয়াছিল।"

পৌষসংক্রান্তি তিথিতে পুণ্যস্নান উপলক্ষে সম্প্রতিকালে প্রতি বৎসর গড়ে তিন থেকে চার লক্ষ নরনারী সাগর-

তীর্থে এসে হাজির হন। পশ্চিমবঙ্গে এই একটিমাত্র মেলা যাকে সর্বভারতীয় মেলা বলে চিহ্নিত করা যায় এবং নাসিক, হরিদ্বার বা প্রয়াগতীর্থে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলার সঙ্গে এর একমাত্র তুলনা করা চলে। ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি রাজ্য থেকে এই বিপুল তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। ঠিক কোন প্রদেশ থেকে প্রতি বৎসর কত লোকজন আসেন সেকথা বলা খুব কঠিন। তবু অনুমান করা হয়, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থান থেকে যাত্রী সমাগম বেশী হয়। তাছাড়া, প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, সিকিম, এমন কি ব্রহ্মদেশ থেকেও কিছু কিছু যাত্রী এসে থাকেন। তবে, যে বৎসর 'কুম্ভযোগ', 'খরা' বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয় সে বৎসর স্বভাবতই লোকসমাগমের কিছু তারতম্য ঘটে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে ১৯৫৯ সালে এই মেলায় তিন লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়; কিন্তু ১৯৬০ সালে প্রয়াগে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হওয়ায় গঙ্গাসাগরের যাত্রীসংখ্যা কমে গিয়ে প্রায় অর্ধেকে দাঁড়ায়। আবার ১৯৬১ সালে ভাল ফসল হওয়ায় গ্রামীণ কৃষিজীবি লোকেদের সমাগম বেশী হয়; ফলে গঙ্গাসাগর মেলায় লোকসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার লক্ষ। ১৯৬২ সালে অষ্টগ্রহ সম্মেলনের কাল্পনিক ভীতিতে গঙ্গাসাগরে যাত্রীর সংখ্যা বেশ কমে যায়।

শতাধিক বৎসর আগে গঙ্গাসাগরে জনপ্রিয়তা ও জনসমাগম সম্পর্কে শ্রীঅশোক মিত্র মহাশয় তাঁর ১৯৫১ সালের 'District Handbook, 24-Parganas' গ্রন্থে প্রাচীন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাদি থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন নীচে তাহা লিপিবদ্ধ করা হলো—

"The estimates of the number of persons attending the festival vary very widely. Ninety years ago Wilson wrote :—'Some years ago they were considered to average about 100,000 ; but I have been informed by high authority that latterly the number has increased to double that amount'. Hunter put the number somewhat vaguely at 'hundreds of thousands', and Wilkins in *Modern Hinduism* at the more modest figure of 150,000. On the other hand, Mr. F. E. Pargiter, I.C.S., then Commissioner in the Sundarbans, in an article on the Sundarbans published in the *Calcutta Review* for October 1889 and printed elsewhere in this volume, wrote :—'The festival is decaying, unless excursion steamers should resuscitate it as a pleasure trip ; and the numbers who attend it are far below the estimates often made. I doubt if the number exceeds 5,000, though it is popularly stated to be something like ten times as many'. The festival appears to have gained greater popularity estimated at 30,000 to 50,000." (p. cvii)

কাশ্মীর থেকে কুমারিকা, আসাম থেকে গুজরাট—এই আসমুদ্র হিমাচল থেকে যে তীর্থযাত্রীরা আসেন তাঁদের কলিকাতা অবধি যানবাহনের প্রধান অবলম্বন অবশ্যই ট্রেন। তারপর, কলিকাতা থেকে যাত্রা শুরু হয় সরকারী মোটর-বাসে, শিয়ালদহ থেকে ডায়মণ্ডহারবার ট্রেনে অথবা হুগলী নদী পথে স্টীমার, লঞ্চ বা নৌকায়। ২৫।৩০ মাইল পায়ে হেঁটে এবং চব্বিশ-পরগণার দক্ষিণ অঞ্চল, মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা প্রদেশ থেকে নৌকাযোগে অনেক যাত্রী সাগরে যাতায়াত করেন। মেলা উপলক্ষে সরকারী উদ্যোগে হাওড়া স্টেশন থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত প্রায় ৬০ মাইল রাস্তা তীর্থযাত্রী নিয়ে প্রায় একশত মোটরবাস কয়েকদিন নিয়মিত যাতায়াত করে। ১৯৬১ সালে কেবলমাত্র সরকারী বাসে ভ্রমণকারী তীর্থযাত্রীদের একটা হিসাব ১৪ই জানুয়ারী তারিখের 'The Statesman' পত্রিকায় পাওয়া যায়—

"The Calcutta State Transport Corporation, which has opened a special service for Gangasagar pilgrims, carried more than 20,000 people from the city to Kakdwip, a distance of 60 miles, during the past three days. For travel between Kakdwip and Kapilmuni's Temple, they are to make their own arrangements.

The heaviest rush was on Friday, when about 13,000 people took advantage of the service. Only tickets for both journeys were issued, the fare being Rs. 8. Return trips will begin on Saturday night and continue at least till Monday."......

কাকদ্বীপ থেকে নৌকায় নদী পার হয়ে সাগরদ্বীপের উত্তরে কচুবেড়িয়ায় এসে প্রায় আঠারো মাইল রাস্তা খাল,

নদী, নালা পেরিয়ে যাত্রীরা সাগরদ্বীপে এসে হাজির হন। কচুবেড়িয়া থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত এই কাঁচা রাস্তাটি পাকা করার পরিকল্পনা অনেক দিনের। কিন্তু আজও তা সম্পূর্ণ হয়নি। এ যাবত মাত্র তিনটি সেতু ও বারোটি কালভার্ট তৈরী করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, অন্তত: আরও পাঁচটি সেতু ও দশটি কালভার্ট নির্মাণ করে রাস্তাটিকে পাকা করতে পারলে তীর্থযাত্রীরা সরাসরি মোটরবাসে সাগরদ্বীপে এসে নামতে পারবেন। ট্রেনে ডায়মণ্ডহারবার এসে সেখান থেকে বেসরকারী মোটরবাসে কাকদ্বীপ হয়ে বহু যাত্রী মেলায় আসেন। তাছাড়া কলিকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার হয়ে কাকদ্বীপ পর্যন্ত নিয়মিত বেসরকারী মোটরবাসও যাতায়াত করে। এই সময় শিয়ালদহ-ডায়মণ্ডহারবার রেলপথে নিয়মিত ট্রেন ব্যতীত তীর্থযাত্রী বহনের জন্য কয়েকটি অতিরিক্ত ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। ত্রিপুরা ও মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রতি বৎসর আগরতলা থেকে কলিকাতা পর্যন্ত কয়েকটি অতিরিক্ত প্লেন যাতায়াত করে। এমন কি ১৯৬১ সাল থেকে কয়েকটি বেসরকারী চার্টার্ড প্লেন কলিকাতা থেকে তীর্থযাত্রী নিয়ে সরাসরি সাগরদ্বীপে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এ বিষয়ে ১৯৬১ সালের ১৪ই জানুয়ারী 'The Statesman' পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদ পরিবেশিত হয়—

"A private company operating non-scheduled air services from and to Calcutta has carried four jeeps from Calcutta and eight cycle-rickshaws from Midnapore to carry its passengers between the improvised air-strip in a paddyfield and the Mela site, a distance of about two miles."

হাওড়া স্টেশন থেকে 'সাগর স্পেশাল' বাস ছাড়ে। কাতারে কাতারে তীর্থযাত্রীরা এসে ভীড় করে দাঁড়ান বাসষ্ট্যাণ্ডে। যাত্রীর তুলনায় বাসের সংখ্যা কম, তাই কে কার আগে বাসে উঠে জায়গা নিয়ে বসতে পারবেন তার জন্য হুড়াহুড়ি পড়ে যায়; অনেক সময় কথা কাটাকাটির থেকে হাতাহাতিতে গিয়েও পৌছায়। তবু এক সময় বাস ছাড়ে, যাত্রা আরম্ভ হয়। বাসে সাগরসঙ্গম যাত্রী "মধুকর" ছদ্মনামে জনৈক ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৬১ সালে 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তার অংশ বিশেষ নীচে উদ্ধৃত করা হল—

"সেই যাত্রা শুরু হল আমাদের উৎস থেকে না। নগর থেকে সাগরে। কেমন করে যে একজন অনেক হয়ে গেলাম ভাবতে অবাক লাগে। অপরিচয়ের ব্যবধান আর কতক্ষণ টেকে? টেকে না। মুখের ভাষা অজানা হোক, প্রাণের ভাষা যে অচেনা থাকে না কারো। সে যে এক। একটা কথাই গুণগুণিয়ে চলেছে মন। আমরা যাবো, সমুদ্রে! মহামানবের মহাসঙ্গমে! মুক্তির মহাতীর্থে! সব পাপ, সমস্ত কালি ধুয়ে মুছে যে তীর্থ-সলিল অনন্তে মিশে একাকার হয়েছে সেইখানেই যে চলেছি সবাই। সুতরাং আর আমাদের জাত নেই, দেশ নেই। এখন একটা জাত আমাদের। পরিচয় একটাই। আমরা যাত্রী। চলেছি মহামানবের মেলায়। সাগরসঙ্গমে।

হাওড়া স্টেশন থেকে ছিল সরকারী বাস। একটানা কাকদ্বীপ অবধি। এক সঙ্গে আসা-যাওয়ার টিকিট মেলে। ভাড়া আট টাকা।

বাস চলেছে। আমাদের পাশে পাশে বয়ে চলেছে নদী। এ গঙ্গা কলিকাতায় দেখা ভাগীরথী না। তটের বহুপাপমুক্ত বিশাল, বিপুলা স্রোতস্বিনী। অনন্তে মেশার আবেগে অথৈ, অধীর। দেখে নেশা লাগে। ভয় হয়। বহু দূরে কাজলের রেখার মত স্থির নিস্পন্দ তরুশ্রেণী। ছেলেবেলা কেটেছে পদ্মা, মেঘনার জল দেখে। যেতে যেতে সেই দিনগুলিরই কথাই ভাবি। নদী তো না, ঢেউ-তোলা করোগেটের টিন। আকাশ উপুড়-করা আলো ঝরে পড়েছে জলে। চোখের সামনে ঝিকমিক করছে ছোট ছোট অসংখ্য ঢেউ। আষাঢ়-শ্রাবণে এ নদীর রূপ যাবে বদলে। সেই ভয়ঙ্করীর দিকে তাকিয়ে এমন মন ভোলানো রূপের কথা ভাবা যাবে না। যেমন এই সুন্দর শীতের দুপুরে কল্পনা করা যাচ্ছে না সেই উন্মাদিনীর কথা। তখন সমুদ্রকে ঘরের কাছে ডেকে আনে এই নদী যাকে দেখে এই মুহূর্তে চোখ ঘোরানো দায়।

তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবে বিভোর কিনা জানিনে হঠাৎ চমকে উঠি। বালিয়া জেলার রামস্বরূপ

সিংয়ের সঙ্গে জায়গা নিয়ে হাতাহাতি শুরু হয়েছে ছাপরার বিদ্যাধর তেওয়ারীর। অপরাধ বলা চলে না। বাসের ঝাঁকুনি সইতে পারেনি রামস্বরূপ। নইলে ভগবতীয়ার গায়ের ওপর ঢলে পড়ার মত সাহস কিম্বা সাধ ছিল না তার মোটেই। তাই কি শোনে বিদ্যাধর! গালে চড় মেরে নিচে মোটঘাট নিয়ে বস। মেয়েদের ঘাড়ের ওপরেই কাত করে ফেলে দিয়েছে ওকে। তাইতে তুমুল কাণ্ড বেঁধে গেছে বাসের ভেতরে।

জানালার দিকে চোখ ফেরাই। কী আশ্চর্য। নদীটা হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেছে। চোখের আড়াল হয়ে গেছে কখন টের পাইনি। দু'পাশে ধূলো উড়িয়ে আমাদের বাসটা এখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। আমাদের ডাইনে-বাঁয়ে অফুরন্ত মাঠ-গ্রাম-জনপদ। মাঝে মাঝে নারিকেলের সারি। কোথাও হাট বসেছে। আলপথে পিঁপড়ের সারির মত চলেছে হাটুরে মানুষ। দেখতে দেখতে কাকদ্বীপে পৌঁছে গেলাম। আবার সেই নদীটার সঙ্গে দেখা। এখান থেকে পাড়ি জমাবো সমুদ্রে।

ছোট একটা দোকানে বসে চা খেয়ে নিলাম। পাথেয় বলতে কিছু নেই। তবুও পেটের কথা কেমন করে ভুলি। রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট দোকান। চা আছে। মিষ্টি-খাবার আছে। গ্রামের মানুষেরা এসেছে যে যার বেসাতি নিয়ে। ডাব দেখি থরে থরে সাজানো। কিন্তু দর সেই কলিকাতার সঙ্গে মেলানো। বরং দু'চার পয়সা বেশী। লেবু আছে। কলার দাম আগুন। বারো আনা থেকে দেড় টাকা ডজন।

কিন্তু বিধি বাম। ঘাটে এসে শুনি লঞ্চ যাবে না। স্ট্রাইক চলছে। কারণ? পুলিশের সঙ্গে লঞ্চের কর্মচারীদের মারামারি হয়ে গেছে ঘণ্টা দুয়েক আগে। বিশদ করে বুঝিয়ে বললেন একজন স্বেচ্ছাসেবক। অগত্যা কি করা যায় তাই ভাবনা। এক টাকা ভাড়া দিলে নৌকো পাওয়া যায়। ঘাটে এসে বসে থাকা অস্বস্তিকর। সুতরাং এক হাঁটু কাদা ভেঙে নৌকোতেই ওঠা গেল। তাই কি সহজ ব্যাপার।

নৌকো ছাড়তে-ছাড়তে সন্ধ্যা উতরে যায়। অন্ধকারে একাকার হয়ে যায় চারিদিক। আকাশে একটি-দুটি করে তারা ফুটতে থাকে। এক সময়ে খৈয়ের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে সমস্ত আকাশে। শীতের রাত। সঙ্গে যৎসামান্য গরম কাপড়ও আছে। কিন্তু গায়ে জড়ানোর তাগিদ বোধ করিনে তেমন। নৌকোর ভেতরে এখন অসহ্য গুমোট। প্রায় শ'দেড়েক মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে বসেছি। আশপাশের গ্রাম ছাড়াও দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এসেছে। প্রায় গোটা সংসারকেই উপড়ে নিয়ে চলেছে কেউ কেউ। জয়নগর থেকে এসেছেন রাখহরি পাণ্ডা। তাঁর সঙ্গে পনেরো জন মেয়ে-পুরুষের একটা দঙ্গল। এবার নিয়ে সাতবার সাগরে যাওয়া হবে তাঁর। বেশ গর্ব করেই কথাটা শোনালেন রাখহরি।

ঘুম নেই আমার চোখে। মাথার ওপরে হেরিকেনটা দুলছে। কানের কাছে নাক ডাকাচ্ছে বিহারী বৃদ্ধটি। প্রায় অথর্ব। টেনে-হিঁচড়ে নৌকোয় তুলেছে সঙ্গীরা। সাগরে যাচ্ছে রোগ মুক্তির আশায়। বাড়ির পুরুত ঠাকুর নাকি বলেছে সাগরে গেলে ভাল হয়ে যাবে। বৃদ্ধ সেই আশায় চলেছে। কোমরে গেঁজলের বাঁধা ছোট ছোট নয়া পয়সা। সাগরে স্নান সেরে সাধু-ফকির-ভিখিরীদের দান করবে। লঙ্কার কারবারে বিস্তর পয়সা করেছে।

কখন আবার চলতে সুরু করেছি জানিনে। খেয়াল করিনি একবারও। শতমুখীর কাছে এসে খেয়াল হল। নৌকোটা থেমে গেল আবার। না, এবার আর চড়ায় ঠেকিনি আমরা। সরকারী লোকেরা এসেছে জল মাসুল আদায় করতে। মাথা পিছু এক টাকা। মাঝিরা বললে, নৌকো এখন এখানেই থাকবে। ভোরবেলা সাগরে পৌঁছবো। আমরা বাইরে বেরিয়ে চারদিকে তাকাই। নদী এখানে অতল অপাড়। শতমুখী। অসংখ্য, অগণ্য নদী এসে মিলেছে এইখানে। নদী সমুদ্র হয়ে গেছে। পূর্ব দিকে কুমড়োর ফালির মত চাঁদ দেখা দিয়েছে এইবার। জল চিক-চিক করছে। দু'একখানা নৌকো তবু সাগরে চলেছে। বৈঠের ছপ-ছপ শব্দ শোনা যাচ্ছে। জলে জোনাকি জ্বলছে মনে হয়। ওগুলি ফসফরাস। না জানলে মনে হবে, দীপের মালা ভাসছে জলে। বিস্ময়, বিমুগ্ধ চোখে এই ভয়ঙ্কর সুন্দরের দিকে চেয়ে থাকি।

ডান দিকে চোখ পড়তেই টের পাই। সাগরদ্বীপ। আকাশটা ওখানে আলোয় আলো হয়ে আছে। মণি-মুক্তোর মত জ্বলছে সারি সারি আলো। বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত

সেই আলোর দিকে চেয়ে সকালের প্রতীক্ষা করি। কখন ভোর হবে, কখন? কবে ঐ বিপুল মেলায় পৌছুবো?

গলা ছেড়ে রামপ্রসাদী গাইছেন রতনদি। নৌকোয় উঠে আলাপ। আলাপ এখন আত্মীয়তায় এসে পৌছেচে। আমাকে বলে যখন কিছু হল না তখন আবার কমলাকান্তের পদ ধরলেন, 'কী গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাবো'।

গান শুনতে শুনতে আকাশ ফরসা হয়ে গেল। রাতের তারারা ডুবে গেল দিনের আলোর গভীরে। একে একে জেগে উঠল সবাই। আমাদের নৌকো নোঙর তুলল ফের। আধ ঘণ্টা পরেই আমরা পৌছে গেলাম সাগরে। সাগরসঙ্গমে।"

কলিকাতার প্রিন্সসেপ ঘাট, আউটরাম ঘাট, ম্যান অব্ ওয়ার জেটী থেকে যাত্রী নিয়ে যে সকল স্টীমার মেলায় যাতায়াত করে সে সম্বন্ধে যাত্রীদের বহু অভিযোগ আছে। সংবাদপত্রে প্রচারের মাধ্যমে অথবা গ্রামাঞ্চলে দালাল পাঠিয়ে যাত্রীদের স্টীমারে নিয়ে যাবার প্রলোভন দেখালেও আসলে ঐগুলি মোটেই স্টীমার নয়। ছ'টা, আট'টা গাদাবোটের প্রায় অন্ধকার খোলে পুরে এবং উপরে বাঁশের ফ্রেম তৈরী করে তার উপর ত্রিপল খাটিয়ে যাত্রী নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়। এই রকম ছ'টা বা আট'টা গাদাবোটকে একটা লঞ্চের পাশাপাশি দু'পাশে দড়ি বেঁধে জুড়ে দেওয়া হয়। এতে না আছে ভাল খাবারের ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় পানীয় জল, পর্যাপ্ত আলো বা শোয়া-বসার সুষ্ঠু ব্যবস্থা। আসলে এগুলির অধিকাংশই কোন স্টীমার কোম্পানী নয়; মেলা উপলক্ষে কিছু পয়সা কামিয়ে নেবার ধান্দায় প্রতি বৎসর একদল ব্যবসায়ী এই ব্যবস্থা করে থাকেন। হঠাৎ গজিয়ে উঠা এই সকল স্টীমার কোম্পনীগুলির অনভিজ্ঞ মাঝি-সারেঙ্গদের অদূরদর্শিতার ফলে প্রায় প্রতি বৎসরই কিছু কিছু যাত্রী দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। সম্প্রতিকালের ঘটনা উল্লেখ করে দু'একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যেমন ১৯৫৯ সালের ১৪ই জানুয়ারী সাগরযাত্রী এক স্টীমার দুর্ঘটনা সম্পর্কে পরের দিন 'যুগান্তর' পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়—

"সাগরদ্বীপ,—১৪ই জানুয়ারী—আজ ভোরে এখান হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে অকল্যাণ্ড বয়ারে ধাক্কা খাইয়া একটি স্টীমার ডুবিয়া যাওয়ার এক ঘটনা জানা গিয়াছে।

কলিকাতা হইতে আগত এই স্টীমারটির সঙ্গে তিনটি বজরা ছিল। এই তিনটি বজরায় প্রায় আটশত যাত্রী ছিলেন। যাত্রীদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

প্রকাশ, স্টীমারটি ডুবিয়া গেলেও সৌভাগ্যবশতঃ বজরা তিনটি স্টীমার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া রক্ষা পায়। এই বজরায় যাত্রীরা ছিলেন। শেষ রাত্রের অন্ধকারে অসহায়-ভাবে যাত্রীরা এই বজরায় ভাসিতেছিলেন। অন্ধকার কাটিয়া যাওয়ার পরে কলিকাতা হইতে যাত্রী লইয়া সাগর-দ্বীপের দিকে অগ্রসরমান একটি স্টীমারকে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন বজরার অসহায় যাত্রীরা তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য চীৎকার করিতে থাকেন। যাত্রীরা নিজেদের কাপড় উড়াইয়া স্টীমারটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উক্ত স্টীমার ঐ যাত্রীদের খবর সাগর মেলায় পৌছাইয়া দেয়। অতঃপর 'ইউনিকর্ণ' ও 'মামিয়া' নামক দুইটি স্টীমার সাগর হইতে ঐ যাত্রীদের আনার জন্য পাঠান হয়। তাঁহাদের এখানে অদ্য বেলা আড়াইটার সময় আনা হইয়াছে। তাঁহাদের অসহায় অবস্থা বর্ণনাতীত। সংবাদ প্রেরণের সময় পর্যন্ত এই ঘটনায় জীবনহানির কোন সংবাদ জানা যায় নাই।"

১৯৬১ সালের ১৬ই জানুয়ারী 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত সংবাদ হইতে যাত্রীগণের দুর্ভোগের আর একটি চিত্র পাওয়া যায়—

"প্রায় বার শত তীর্থযাত্রী বোঝাই স্টীমার 'শ্যামলী' বজবজ হইতে মাইল তিন দূরে গঙ্গা নদীর উপর প্রায় ২১ ঘণ্টা মাঝ গঙ্গায় আটক পড়িয়া থাকে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই ছোট স্টীমারটির সঙ্গে চারটি গাধাবোটও ছিল।

গঙ্গাসাগরের যাত্রী লইয়া স্টীমারটি কলিকাতার দিকে রওনা হয় এবং শনিবার শেষ রাত্রি দু'টার সময় নদীবক্ষে আটকা পড়িয়া যায়। একটি প্রাইভেট কোম্পানী ঐ স্টীমলঞ্চ ভাড়া করিয়াছিল। সংবাদ পাইয়া অন্য তিনটি স্টীমার যাত্রীদের ত্রাণকার্যে ছুটিয়া যায়, কিন্তু প্রকাশ, রবিবার রাত ১১টা পর্যন্ত স্টীমলঞ্চ আটকা পড়িয়াই থাকে।

অবশেষে এইদিন রাত ১১টার পর জোয়ারের জল আসিলে 'শ্যামলী' পুনরায় জলযাত্রা শুরু করে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়।"

অনভিজ্ঞ সারেঙ্গ-মাঝিদের কর্মফলে সাধারণ যাত্রীদের মর্মান্তিক দুর্ভোগের আর একটি দৃষ্টান্ত ১৯৬২ সালের ১২ই জানুয়ারী 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়—

"বুধবার শেষ রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটার সময় গঙ্গা-সাগর তীর্থযাত্রী বোঝাই একটি নৌকা ডায়মণ্ডহারবার হইতে তিন মাইল দূরে হারা-মুকুন্দপুরে একটি ষ্টীমারের সহিত ধাক্কায় নিমজ্জিত হইলে এক মর্মন্তুদ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ঐ নৌকায় মাঝি-মাল্লাসহ প্রায় ৯০ জন যাত্রী ছিলেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে ৭৫ জনকে উদ্ধার করা হয়। অবশিষ্ট ১৫ জনের (তন্মধ্যে ৫জন মাঝি-মাল্লা) অধিক রাত্রি পর্যন্তও কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। এবার সাগর যাত্রীদের মধ্যে ইহারাই প্রথম দুর্ঘটনার বলি বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

ঐ শোচনীয় দুর্ঘটনা সম্পর্কে প্রাপ্ত বিবরণে প্রকাশ, ঘন অন্ধকার ও কুয়াশায় আচ্ছন্ন নদীবক্ষে সম্মুখের কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। একটি ষ্টীমার (সম্ভবত কলিকাতাগামী) অকস্মাৎ চলমান নৌকাটির উপর আসিয়া পড়ে। ফলে নৌকাটি ডুবিয়া যায়।

ঘন কুয়াশার যবনিকা ছিন্ন করিয়া ঐ অঞ্চলে নিমজ্জ-মান যাত্রীদের করুণ আর্তনাদে মুখরিত হইয়া উঠে। ইহা শুনিয়া জেলে-নৌকার মাঝি এবং নিকটস্থ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটিয়া যান। সংবাদ পাইয়া পুলিশও সেখানে উপস্থিত হয়। তবে তাহারা কিছু বিলম্বে পৌঁছায় বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কর্মী, জেলে-নৌকা, স্থানীয় লোক এবং পুলিশ লঞ্চের সাহায্যে খোঁজাখুঁজি সুরু করেন। কিছু কিছু যাত্রী সাঁতরাইয়া তীরে উঠেন। উল্লিখিত ১৫ জন বাদে অবশিষ্ট যাত্রীদিগকে উদ্ধার করিয়া ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে (৭৩ জন) রাখা হয়। দু'জন যাত্রীকে গুরুতর আহত অবস্থায় ডায়মণ্ডহারবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।"

তাছাড়া এই সকল তথাকথিত ষ্টীমারগুলি ছাড়ার বা পৌঁছবার কোন নির্ধারিত সময় না থাকায় বহু যাত্রীকে দুর্ভোগ ভুগতে হয়। সাধারণতঃ কলকাতা থেকে জলপথে ষ্টীমারে সাগরদ্বীপ পৌঁছতে ১০।১২ ঘণ্টার বেশী সময় লাগার কথা নয়। অথচ এই সকল ষ্টীমারগুলি সাগরদ্বীপে পৌঁছুতে প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। আনন্দের কথা, যাত্রীদের দীর্ঘদিনের এই অভিযোগের প্রতিকারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৯ সাল থেকে জলযানে গঙ্গাসাগর যাত্রীদের টিকিটের সঙ্গে একটা করে 'এম্‌বার্কেশন কার্ড' দেওয়ার রীতি চালু করেছেন। এ সম্পর্কে ১৯৫৯ সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখে 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' নিম্নলিখিত সংবাদ পরিবেশিত হয়—

"এই বৎসর গঙ্গাসাগরগামী ষ্টীমার, ফ্ল্যাট, বার্জ প্রভৃতি জলযানে যাহাতে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই না হইতে পারে তাহার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রত্যেক যাত্রীকে টিকিটের সঙ্গে একখানি করিয়া 'এম্‌বার্কেশন কার্ড' অর্থাৎ জলযানে উঠিবার অনুমতিপত্র দেওয়া হইবে। এই অনুমতিপত্র ব্যতিরেকে পুলিশ কোনও যাত্রীকেই কলিকাতায় জাহাজঘাটা হইতে গঙ্গাসাগরগামী জলযানে উঠিতে দিবে না। প্রকাশ যে, অতিরিক্ত যাত্রী বহন করা হইতেছে—প্রায়শঃই এই অভিযোগে পুলিশ ও ষ্টীমার কোম্পানীগুলির মধ্যে অতীতে প্রতি বৎসর যে বিরোধ ও বিতর্কের সৃষ্টি হইত, এই ব্যবস্থায় তাহার অবসান ঘটিবে বলিয়া ষ্টীমার কোম্পানীগুলি আশা করিতেছেন। ষ্টীমার কোম্পানীগুলিই নাকি এইরূপ 'এম্‌বার্কেশন কার্ড' দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং এই কার্ডের ভিত্তিতে প্রতি জলযানের যাত্রীদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণে পুলিশের সুবিধা হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে জলযানগুলিকে আরও কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কলিকাতাস্থিত মার্কেন্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্টের প্রধান অফিসারের নিকট হইতে সমস্ত জলযানগুলিকে যাত্রীবহনের জন্য লাইসেন্স লইতে হইবে। প্রকাশ যে, জলযানগুলির কলিকাতা হইতে যাত্রা করিবার পূর্ণ তিন দিন পূর্বে এই লাইসেন্স লইতে হইবে বলিয়া তিনি নির্দেশনামা জারী করিয়াছেন। তিনি লাইসেন্স দিলেই তবে কলিকাতা বন্দরের হেল্‌থ অফিসার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। জল-যানগুলিতে যাত্রীদের সংখ্যানুপাতে শৌচাগার, জল, আলো, চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি আছে কি না। তিনি সন্তুষ্ট হইলে অনুমতিপত্র দিবেন এবং তাহার

ভিত্তিতে ২৪ পরগণা জেলা বোর্ড হইতে আর এক অনুমতি-পত্র দেওয়া হইবে। অতঃপর পোর্ট কমিশন হইতে জলযানগুলি গঙ্গায় নোঙর করিতে দেওয়া হইবে।"

নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আজও কিন্তু অধিকাংশ যাত্রী জলপথেই গঙ্গাসাগর যাতায়াত করেন—বিশেষ করে প্রাচীন পন্থীরা। প্রাচীন পন্থীরা "কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না" এই আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস করে আজও হয়ত এইভাবে কষ্ট স্বীকার করেই তীর্থদর্শন পছন্দ করেন। তাছাড়া বাসে বা ট্রেনে যাতায়াত করলে একাধিকবার নামা-উঠা করতে হয়; ষ্টীমারে সে-ঝঞ্ঝাট নেই। এই সুবিধাটুকুর জন্যও অনেকে ষ্টীমারেই যাতায়াত করেন। সত্যি কথা বলতে কি ষ্টীমারে যাতায়াত না করলে গঙ্গাসাগর যাবার আসল উদ্দেশ্যই বোধহয় ব্যর্থ হয়। মোটরবাসে বা প্লেনে করে স্বল্প সময়ের মধ্যে বুড়ি ছোঁয়া তীর্থ সেরে এসে হয়ত আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়; কিন্তু ধীর-মন্থর গতি গাদাবোটের খোলে ভাসতে ভাসতে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিচ্ছদে সজ্জিত জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত অগণিত ভারতবাসীর পাশে বসে তীর্থযাত্রার আনন্দ ও তৃপ্তি বড় কম নয়; তার জন্য বাড়তি কষ্টটুকু কষ্ট বলেই মনে হয় না।

সাগর যাত্রার কয়েকদিন আগের থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অগণিত যাত্রী, সাধু-সন্ত, ভিখারীর দল এসে জড়ো হন কলিকাতায়। কলিকাতায় যাদের আত্মীয়-স্বজন আছেন তাঁরা আত্মীয়-স্বজনের গৃহেই আশ্রয় নেন, তারপর যাঁদের উপায় আছে তাঁরা হোটেলে, যাত্রী-নিবাসে ও ধর্মশালায় গিয়ে আশ্রয় নেন, আর বাকিদের আশ্রয় নিতে হয় রাস্তার ফুটপাতে। হাওড়ার পুল থেকে আউটরাম ঘাটের আশপাশে গঙ্গার ধারে পোটলা-পুঁটলি নিয়ে দু'তিন রাত্রি ফুটপাতে কাটিয়ে দেন কয়েক সহস্র যাত্রী। এই সুযোগে বহু যাত্রী কালীঘাটের মন্দির, পরেশনাথের মন্দির, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির, বেলুড়মঠ প্রভৃতি কলিকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়ান।

স্থলপথে গঙ্গাসাগর যাত্রার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। জলপথে গঙ্গাসাগর যাত্রার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে ১৯৫৯ সালে ১৭শে জানুয়ারী 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক ষ্টাফ রিপোর্টারের লেখা থেকে —"গাদা-নৌকোয় মাল বোঝাই ক'রেই যে-সমস্ত জাহাজ কোম্পানী হাত পাকালেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই হাতে মানুষ নিয়ে যাবার দায়িত্ব সঁপে দিলে যে সেই সমস্ত মানুষের দুর্গতির সীমা থাকে না—এমন কি জীবনহানিরও খুব শঙ্কা জাগে—প্রতি বৎসর গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে তার বেশ দৃষ্টান্ত মিলছে, এ বৎসরও মিলেছে। এই সমস্ত কোম্পানী ষ্টীমারের ডাইনে, বাঁয়ে, পেছনে গাদা-নৌকা বেঁধে তাতে যাত্রীদের তুলে গঙ্গাসাগরে পাড়ি জমিয়েছেন। গাদা-নৌকোর ওপরে বাঁশের খুঁটিতে তেরপলের ছাউনি দিয়ে তারা যেন রিফিউজি ক্যাম্প বানিয়েছেন। ভেতরে টিম-টিম করে জ্বলছে গোটাকতক পেট্রোম্যাক্স। গাদা-নৌকোর খোলের ভেতরে আর ওপরে যাত্রীরা পোটলা-পুঁটুলি নিয়ে জড়সড় হয়ে বসে। জলের ট্যাঙ্ক যেখানে বসানো, সেখানে বিপুলসংখ্যক যাত্রীর অনবরত জল নেবার ফলে সমস্ত জায়গাটা ভিজে কাদায় পিছল। এরও ওপরে মানুষ বসে আছে, বিছানা পেতে শুয়েছে, পোটলা-পুঁটুলি থেকে মুড়ি, চিড়ে খুলে খাচ্ছে। কিন্তু রেহাই এইটুকুতেই নয়। পাশ দিয়ে প্রকাণ্ড যাত্রীবাহী ষ্টীমার একখানা হুস্‌হুস্ করে চলে গেল, কুছপরোয়া না করে। প্রকাণ্ড ষ্টীমারখানার সদম্ভ গতিতে চারিদিকে যে তুফান উঠলো, ধীর মন্থর গতি বেচারা গাদা-নৌকোদের সাধ্যি নেই তাকে কাটিয়ে উঠে স্থির থাকার। টলমল করে উঠে গাদা-নৌকো—যাত্রীরাও হাঁড়ি-কলসীর মত কিংবা ছাগল-ভেড়ারই মত এ ওর গায়ে হুড়মুড় করে পড়ে। চেঁচামিচি হৈ-হল্লা চলে। কখনও কখনও গাদা-নৌকোরা চড়ায় আটকেও যায়, দুম করে গিয়ে একে অন্যের গায়ে ধাক্কা মারে। অন্ধকার রাত্রে অতর্কিতে ধাক্কা খেয়ে ক্লান্ত, বসে বসে ঢুলন্ত, (শুতে যারা পায় তাদের সংখ্যা আঙুলে গুণে নেওয়া যায় ব'ল্লে কি অত্যুক্তি হবে?) যাত্রীরা সচকিত হ'য়ে ওঠে, প্রাণপাখী খাঁচায় থাকতে থাকতে গঙ্গাসাগরে কিম্বা বাড়ীতে পৌছুতে পারবে কিনা তা আকুল হ'য়ে ভাবে। এ-হাল গাদা-নৌকোর যাত্রীদের কপালে প্রতি বৎসর ঘটে, এ বৎসরও ঘটেছে এবং তা ঘটেছে এ বৎসর বহুল পরিমাণে। এরকম অনেক অভিযোগ গাদা-নৌকার গাদা গাদা যাত্রীদের কাছ থেকে এ বৎসর শোনা গেছে। তারা সাংবাদিকদের কাছে

জিজ্ঞেস ক'রেছে, তারা মানুষ না বেওয়ারিশ মাল ? তা না হ'লে এমন হতচ্ছেদ্দা ক'রে তাদের নিয়ে যাওয়া হবে কেন ?

এ-বৎসর ষ্টীমার, গাদা-নৌকো, ফ্ল্যাট প্রভৃতিতে শৌচাগার, পানীয় জল, ঔষধপত্র, ডাক্তার প্রভৃতি ব্যবস্থার ওপরে অবশ্য সরকারী নজরটা অন্য বৎসরের চাইতে একটু বেশী কড়া রকমেরই ছিল। অনেক কোম্পানী নিজেদের জলযানে যাত্রীদের সংখ্যানুপাতিক প্রয়োজনমত পানীয় জল রাখার ব্যবস্থা প্রথমে করতে পারেননি। সতর্ক কর্তৃপক্ষের চোখে এ-ব্যাপার ধরা প'ড়েছিল, তারা তাঁদের নির্দিষ্ট সময়ে আউটরাম ঘাট থেকে জলযানগুলিকে যেতে দেননি।"

ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু-সন্ন্যাসীর দল গঙ্গাসাগর যাত্রার উদ্দেশ্যে পৌষ সংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতায় এসে হাজির হয়েই দলে দলে বেরিয়ে পড়েন কলিকাতার ধনী মহাজনদের দরজায় দরজায় ঘুরে তীর্থযাত্রার পাথেয় সংগ্রহের আশায়। কলিকাতার বহু ধনী মহাজন প্রতি বৎসর এই সকল সাধু-সন্তদের আর্থিক সাহায্য করেও থাকেন। অবশ্য এই সকল সাধু-সন্তদের অধিকাংশই বিনা টিকিটে ট্রেন ভ্রমন করেন। এবং 'তীর্থযাত্রা কর'ও এঁদের দিতে হয় না। ১৯৬১ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে এই প্রসংঙ্গে প্রকাশিত 'The Statesman' পত্রিকা থেকে কয়েকটি পঙ্ক্তি নিচে উদ্ধৃত করা হল—

"In the city rich business men sometimes provide some with the boat fare. Many beg for a free lift which is usually given. Quite a number walk from Calcutta to Kakdwip.

Named Matilal, the 35 years old Sadhu left his home, of which he has only a faint recollection, when a child. He has visited many holy places. He boarded a train about a fortnight ago at Nagpur, without any ticket of course, and arrived in Calcutta.

Along with several hundred other Sadhus he has found shelter on the pavement under Howrah Bridge. Food is no problem because benevolent Calcutta merchants pay for his chapatis and halua.

The pavement itself has become a mela site, with burning logs and Sadhus chanting mystics hymns. At intervals, they shout in chorus, 'Bom, Bom', and the whole scene becomes awe-inspiring."

এই সকল সাধু-সন্তদের মধ্যে অনেকে যেমন সুদূর হিমালয় থেকে বন্ধুর পথ বেয়ে তীর্থ দর্শনের আকুতি নিয়ে এখানে এসে হাজির হন, তেমনই আবার অনেকে সহযাত্রীদের ঠকাবার জন্য সাধুবেশ ধারণ করেন। ঐ একই দিনে 'The Statesman' পত্রিকা থেকে তার একটু নমুনা তুলে ধরা যেতে পারে –

"On Wednesday, a Sadhu from the Himalayas persuaded a boatman to give him a free ride but as the boat was packed to capacity with paying passengers it left Mullick Ghat, Calcutta, without him. In desperation he jumped with his bundle into the Hooghly, shouting to the boatman to stop. Passengers in the boat appealed on his behalf but the boatman refused to stop."

অন্যদিকে এই পত্রিকার প্রতিনিধিকে জনৈক গঙ্গাসাগর যাত্রী সাধু জানান—

"There are many fakes who pose as Sadhus and cheat innocent men and even genuine Sadhus," he said.

Only that morning, one of his disciples had offered him a brass pitcher, a piece of cloth and Rs. 20. Later he asked another Sadhu sitting nearby to look after his belongings and went to the river. When he returned the Sadhu had disappeared with his bundle. He would not go to the police because of their 'cumbersome' methods.

(The Statesman—12.1.61)

বিশ্বাস তীর্থক্ষেত্রে তিনদিন তিনরাত্রি বাস করতে না পারলে এবং সংক্রান্তির দিন ও আগে-পরের দু'দিন সাগর সঙ্গমে স্নান না করলে পূণ্য অর্জন হয় না। তাই সাধারণত সংক্রান্তির দু'দিন আগে থেকেই দলে দলে যাত্রী সাগরদ্বীপে এসে হাজির হন। আর এই অসংখ্য যাত্রীর সমাগমে নির্জন সাগরদ্বীপ পরিণত হয় এক মহামেলায়।

সাগরদ্বীপকে বেষ্টন করে ফুলের মালায়, রঙিন কাপড় ও কাগজের শিকলিতে সজ্জিত অগণিত পাল তোলা নৌকা, মটরলঞ্চ, স্টীমার এসে নোঙর করে দাঁড়ায়। রাত্রি বেলায় নৌকা ও স্টীমারগুলির মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হ্যারিকেন ও পেট্রোম্যাক্সের আলোয় সাগরের জল ঝলমল করে। দিনের বেলায় বহুদূর থেকে দেখা যায় স্টীমার ও নৌকাগুলির মাস্তলে জড়ান লাল, হলুদ, সবুজ প্রভৃতি নানা রঙের পতাকাগুলি। সাগরদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তবর্তী প্রায় তিন মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ড মাঝিমাল্লার হাঁকাহাঁকিতে, স্টীমারের ভোঁ-য়ে, জনসমাগমে, জনকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠে। সব মিলিয়ে সে এক মহাসমারোহপূর্ণ ব্যাপার।

যাত্রীদের এই কয়দিন থাকবার জন্য হোগলা দিয়ে ছোট-বড় অসংখ্য অস্থায়ী ঘর নির্মাণ করা হয়। ঘর নির্মাণের জন্য ইজারাদার থাকেন; আগে থেকেই তাঁরা এসব ঘর নির্মাণ করে রাখেন। ঘর অবশ্য নামেই। এক-রকম প্রায় হামাগুড়ি দিয়েই ঘরে প্রবেশ করতে হয়; আর ঘরের মধ্যে বালির বিছানার উপর চাদর বিছিয়ে শুয়ে শুয়েই উপরে আচ্ছাদিত হোগলার ফাঁক দিয়ে রাত্রিবেলায় আকাশের তারা দেখতে পাওয়া যায়; দিনের বেলায় রৌদ্র এসে গায়ে পড়ে—বেলা বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে বালিও উত্তপ্ত হয়ে উঠে, পৌষের হাড় কাঁপানো শীতে তা নিতান্ত মন্দ লাগে না। উঠে দাঁড়ালে উপরে চালায় মাথা ঠেকে দু'জন থাকার মত এই রকম একটা ঘরের ভাড়া ছ'টাকার কম নয়। ঘরের আয়তনের (উচ্চতায় নয়) তারতম্য অনুসারে ঘর ভাড়াও বৃদ্ধি পায়। সাধারণের থাকার জন্য এই সব ঘর ব্যতীত মেলা উপলক্ষে আগত সরকারী কর্মচারী ও পুলিশ-বাহিনীর জন্য টিন বা দরমা দিয়ে ঘর নির্মাণ করা হয়। এ ছাড়া আছে ডাকঘর, তারঘর, হাসপাতাল, এ্যাম্বুলেন্স, দমকল, সরকারী অফিস, থানা, আদালত, গারোদখানা এবং বিরাট পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর শিবির। ১৯৬২ সালে প্রথম সাগরদ্বীপ থেকে ট্রাঙ্ক টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হয়। অস্থায়ী উপনগরীর এ সবই অস্থায়ী ব্যবস্থা। এই সকল ঘরবাড়ী, অফিস-আদালতের আশপাশ দিয়ে যাতায়াতের জন্য দেশবরেণ্য নেতাদের নামে রাস্তাঘাটও করা হয়। যদিও এই সব রাস্তা দিয়ে চলতে গেলে বালির মধ্যে পা ডুবে যায়। রাস্তাঘাটের পাশ দিয়ে নতুন পাইপ বিছিয়ে একটি সংরক্ষিত পুষ্করিণী থেকে ক্লোরিন ইত্যাদি মিশিয়ে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। রাত্রিবেলায় যাতায়াতের সুবিধার জন্যে রাস্তার ধারে ধারে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত 'পেট্রোম্যাক্সের' আলোর ব্যবস্থা করা হত। গত ১৯৬০ সাল থেকে জেনারেটরের সাহায্যে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেলার একপ্রান্তে প্রায় ৪৮ ফুট উচ্চ শাল খুঁটির মাচার উপর টিনের ছাউনি দেওয়া একটি ঘর আছে। ঐ ঘরটিকে বলা হয়, 'টাওয়ার হাউস'। মেলার ক'দিন টাওয়ার হাউসের উপর দাঁড়িয়ে স্বেচ্ছা-সেবকরা পালাক্রমে দিনরাত্রি পাহারা দেন, নজর রাখেন মেলার কোনখানে কোন দুর্ঘটনা ঘটছে কি না? কোন দুর্ঘটনা চোখে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গেই সেখান থেকে ঘণ্টা ধ্বনি দিয়ে সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। 'টাওয়ার'-টি অবশ্য স্থায়ী এবং বর্তমানে জীর্ণদশাপ্রাপ্ত।

বৈদিকযুগে সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তা মহামুনি কপিল বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী সাগরদ্বীপে আশ্রম নির্মাণ করে সাধনভজনে লিপ্ত ছিলেন বলে শোনা যায়। পুরাণে উল্লেখ আছে, ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা সগর একদা অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাতে ভীত হয়ে যজ্ঞের অশ্বটিকে অপহরণ করে কপিলমুনির অজ্ঞাতসারে তাঁর আশ্রমে বেঁধে রেখে আসেন। এদিকে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র ঐ যজ্ঞ-অশ্ব অন্বেষণে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে কপিলমুনির আশ্রমে এসে অশ্বের সন্ধান পান এবং মহামুনি কপিলকে যজ্ঞ-অশ্ব অপহরণকারী বলে সন্দেহ করেন। ফলে, সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র মহামুনির ক্রোধবহ্নিতে ভস্মীভূত হন। পরে ঐ বংশের রাজা দিলীপের পুত্র এবং সগর রাজার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ ভগীরথ শিবকে সন্তুষ্ট করে বিষ্ণুপদী পতিতপাবনী গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্তে এনে পূর্বপুরুষদের শাপমোচন করেন। গঙ্গাধারার পবিত্র স্পর্শে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র পুনর্জীবন লাভ করে সশরীরে স্বর্গারোহন করেন। এই হচ্ছে সাগরদ্বীপের তীর্থ মাহাত্ম্য। সেই কারণে গঙ্গাসাগর হিন্দুদের কাছে পবিত্র তীর্থস্থান রূপে পরিগণিত এবং এই কারণে প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে লক্ষ লক্ষ ভক্ত নরনারী পুণ্যার্জনের লোভে ও স্বর্গগত পিতৃপুরুষের আত্মার তৃপ্তির জন্য তর্পণাদি করতে ছুটে আসেন সাগরসঙ্গমে।

মহাভারতের মহারাজ যুধিষ্ঠির তীর্থ করতে সাগরসঙ্গমে আসেন বলে জানা যায়। বাল্মিকীর রামায়ণেও ভগীরথ কর্তৃক স্বর্গ থেকে মর্তে গঙ্গা আনয়নের কাহিনীর উল্লেখ আছে এবং সগর রাজা অযোধ্যার শ্রীরামচন্দ্রের ত্রয়োদশ পূর্বপুরুষ বলে বিবেচিত। তবে, এই সকল কিংবদন্তী বা উপাখ্যান অনুসারে জনসমাজে গঙ্গাসাগর তীর্থমাহাত্ম্য কতকালের প্রাচীন এবং কবে এই দ্বীপে কপিলমুনির উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলা বসতে আরম্ভ করলো তা' সঠিকভাবে বলা আজ বোধ হয় আর সম্ভব নয়। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মতে ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়নের বহু পূর্ব থেকেই সাগরতীর্থ বর্তমান ছিল। কথিত আছে, শ্বেতদ্বীপের অধিপতি রাজা মাধব বঙ্গোপসাগরের তীরে এক বিশাল বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিষ্ণুমন্দিরের মাহাত্ম্য সর্বভারতে প্রচারিতও হয়। সেই বিষ্ণুমন্দির ঠিক কোথায় ছিল এবং থাকলেও সমুদ্র তাকে কবে গ্রাস করেছে সেকথাও ঐতিহাসিকগণ সঠিকভাবে বলতে পারেন না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অতীতে সাগর-দ্বীপের যে-স্থানে কপিলমুনির মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই পুরাতন স্থানটি সমুদ্র বহুকাল আগেই গ্রাস করেছে। সাগরদ্বীপে কপিলমুনির পূজাদি সম্পর্কে ১৮৩৭ সালে 'হরকরা' নামক পত্রিকায় নিম্ন উদ্ধৃত সংবাদটি পরিবেশিত হয়—

"ঐ স্থানে (গঙ্গাসাগরে) যে এক মন্দির আছে তাহা লোকে কহে যে ১৪০০ বৎসর হইল গ্রথিত হইয়াছে। ঐ মন্দিরে কপিল মুনি নামে প্রসিদ্ধ দেবরূপ এক সিদ্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। রামায়ত্ত বৈরাগি ও সন্ন্যাসিদের মধ্যে অন্যান্য জাতীয়েরা তাঁহাকে অতিপূজ্য করিয়া মানেন। ইঙ্গরেজী ৪৩৭ সালে ঐ মন্দির গ্রথিত হইলে জয়পুর রাজ্যস্থ গুরুসংপ্রদায়কর্তৃক উক্ত সিদ্ধর্ষি প্রতিষ্ঠিত হন। এবং উক্ত মন্দিরে ৪০ বৎসরে দর্শনীয় যত টাকা পড়ে তাহা পর্য্যায়ক্রমে জয়পুরস্থ রামানন্দনামক এক ব্যক্তি গুরুর অধিকৃত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে ঐ অধিকার রাজগুরু শিবানন্দের হইল। তিনি বাঙ্গলা ১২৩৩ সালে ঐ মন্দির দর্শন করিতে আইসেন। এবং মেলার যোগের পরে কলিকাতায় আসিয়া একটি বন্দোবস্ত করত মেলার বার্ষিক উৎপন্ন টাকা সাত আকড়া অর্থাৎ দিগম্বর ও খাকি ও সন্তকি ও নির্ম্মহী ও নির্ব্বাণী ও মহানির্ব্বাণী এবং নিরালম্বীতে এক এক শত করিয়া বিভাগ করিয়া দেন। এবং এমত হুকুম করেন যদি ইহার অতিরিক্ত কিছু থাকে তবে ঐ মন্দিরের মেরামতে ব্যয় করা যায়।"

(সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ৩য় খণ্ড)

পৌষ সংক্রান্তির ব্রাহ্মমূহূর্তে পুণ্যস্নানের জন্য শীতের জড়তাকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার নরনারী সমবেত-ভাবে ডুব দেন সাগরের জলে। প্রত্যুষে নির্জন সাগরদ্বীপের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে লক্ষ নরনারীর "গঙ্গা মাই কী জয়", "কপিল মহারাজ কী জয়" ধ্বনিতে। পূর্ব আকাশে কুয়াশার আবরণ ভেদ করে ধীরে ধীরে জেগে উঠেন মহাজ্যোতি মহাসূর্য! সাগরতীরে দাঁড়িয়ে সিক্ত বস্ত্রে সদ্যস্নাত হাজার হাজার ভক্তর দল সেই 'জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্'-কে আবাহন জানান, পাঠ করেন গঙ্গাস্তব, সূর্যবন্দনা। ভারতের নানা প্রান্তের লোকের নানা ভাষায় উচ্চারিত স্তবমন্ত্রাদি পাঠে সৃষ্টি হয় এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ। মহামিলনের মহাক্ষেত্রে সমবেত হয়ে এই বিপুল জনতা ভক্তিসূত্রে পরিণত হয় এক অখণ্ড জনসত্তায়। পুণ্যস্নান শেষে সাগরতীরে তিল-যব-তুলসীপত্র হাতে নিয়ে দলে দলে লোকজন বসে যান 'আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়' স্বর্গগত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণাদির জন্য। অনেকে আবার 'বৈতরণী পার' অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বিশ্বাস মৃত্যুর পর প্রতিটি মানুষকেই তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ মহাবিপদ সংকুল বৈতরণী নদী পার হতে হয়। কিন্তু পাপীর পক্ষে সংসারের কামনা-বাসনার ধূলামাটি মেখে বৈতরণী পার হওয়া মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। শাস্ত্রে বিধান আছে তীর্থক্ষেত্রে গাভীর লেজ ধরে মন্ত্রোচ্চারণ করে সবৎসা সেই গাভী ব্রাহ্মণকে দান করলে মৃত্যুর পর বৈতরণী পারের পথ সুগম হয়। সাগরতীর্থ ব্যতীত গয়া প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রেও এইরূপ ধর্মাচরণ পালন করা হয়। তাই বহু পুণ্যলোভী নরনারী সাগরতীর্থে এসে বৈতরণী পারের অনুষ্ঠানটি সেরে যান। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণেরা এবং দেখা যায় প্রধানতঃ অবাঙ্গালীরাই এতে বেশী সংখ্যায় যোগদান করেন। গলায় ফুলের মালা ও ঘন্টি ঝোলান নধরকান্তি গাভীগুলির লেজ ধরে সাগরতীরে জলের মধ্যে দলে দলে ভক্ত নরনারী

বসে যান বৈতরণী পারের আয়োজনে, হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপাঠ করান। ভক্তরা গোদানের পরিবর্তে কিছু অর্থ ধরে দেন পুরোহিতদের হাতে। এই শত শত গাভী আসে কাকদ্বীপ, ডায়মণ্ডহারবার এমনকি মেদিনীপুর জেলা থেকেও। সাধারণ কৃষক তা সে হিন্দু বা মুসলমান যে কেউ হউক দু'-তিন দিনের জন্য তাঁদের গৃহপালিত গাভীগুলিকে হিন্দুস্থানী পুরোহিতদের হাতে তুলে দিয়ে এই সুযোগে কিছু টাকা উপরি রোজগার করে নেন। শোনা যায় গাভী পিছু ৫৲ থেকে ১০৲ টাকা পর্যন্ত তাঁরা পেয়ে থাকেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মানসিক করে সাগরে সন্তান বিসর্জন দেওয়া এককালে বহুল প্রচলিত রীতি ছিল। কিন্তু ইংরাজ আমলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আইন করে এই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে শ্রীযুত অশোক মিত্র মহাশয় তাঁর ১৯৫১ সালের 'District Handbook, 24-Parganas' গ্রন্থে লিখেছেন —"Formerly suicides and the destruction of children were features of the festival, many of the pilgrims making voluntary sacrifices of themselves or throwing their children to the sharks and alligators. 'On shore', it was said, 'the jungles swarm with tigers of the largest and most ferocious sort, so that both elements are equally dangerous'. It is said that, in 1801; 23 persons were exposed or drowned in one month, but next year this horrible practice was suppressed by the Marquess Wellesley. It was not, like the oblation of fruits or jewels, intended to obtain instance, a childless woman would make a vow to offer her first born at Ganga Sāgar, in the hope that such an offering would secure for her additional pregeny. (p. cvii)

গঙ্গাসাগরে আজ আর সন্তান বিসর্জনের কথা শোনা যায় না; তবে নদীপথে ষ্টীমারে করে যাঁরা সাগরতীর্থে যান তাঁরা আজও নিশ্চয় দেখতে পাবেন ডায়মণ্ডহারবার ছাড়িয়ে মোহনার দিকে এগিয়ে চললে বহু ষ্টীমার যাত্রী মানত করে অর্থ, স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কার, গোটা ফল বিশেষ করে নারিকেল নদী গর্ভে নিক্ষেপ করতে। অনেকে আবার ডাব-সিঁদুরের সঙ্গে ঘটি ঘটি সরিষার তেলও ঢেলে দেন। কেউ কেউ কাঁসর-ঘণ্টা বাজান, হুলুধ্বনি দেন ও গঙ্গা-স্তব পাঠ করেন।

১৯৬১ সালের পূর্বে যাঁরা গঙ্গাসাগর গিয়েছেন তাঁরা অবশ্যই প্রত্যক্ষ করেছেন কাঠের তৈরী জীর্ণ কপিল মন্দিরটিকে; যে মন্দিরটি ভীড়ের চাপে যে-কোন সময়েই ভেঙ্গে পড়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটাতে পারতো। ১৯৬১ সালে অবশ্য ঐ পুরাতন মন্দিরটিকে ভেঙ্গে তারই প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে বিশ হাজার টাকা ব্যয় করে একটা নতুন মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে; যার জন্য পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গগত ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রায় ১১ হাজার টাকা চাঁদাও তুলে দিয়েছেন। তথাপি যাকে কেন্দ্র করে এই মহামেলার আয়োজন সেই নবনির্মিত কপিলমুনির মন্দিরটি দেখে দর্শক মাত্রই হতাশ হবেন। মন্দিরটির গঠনভঙ্গী অতি স্থূল ও শ্রীহীন। একটি টিনের সেডের মধ্যস্থলে এ্যালুমিনিয়মের সিট্ দিয়ে তৈরী করা হয়েছে গম্বুজের মত মন্দিরের চূড়া। এই হলো নবনির্মিত কপিলমন্দির এবং তৈরী হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ আনুকুল্যেই। এই মন্দির দেখে যদি কেউ সখেদে বলেন "সাহিত্যে, শিল্পে, ভাস্কর্যে যে বাংলাদেশ এত প্রতিভার জন্ম দিয়েছে, স্থাপত্যে তার এই বন্ধ্যাত্ব সত্যই বিস্ময়কর," তাহলে বোধ করি কিছু উত্তর দেবার থাকে না। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রায় দুই হাত উঁচু পাশাপাশি তিনটি শীলায় খোদিত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তার একটি চতুর্ভুজা মকরবাহিনী গঙ্গামূর্তি কোলে ভগীরথ; অপর দুইটির মধ্যে একটি কপিলমুনির মূর্তি ও অন্যটি সগররাজার মূর্তি। কপিলমুনি ও সগর-রাজা দু'জনেই বিস্ফারিত নেত্রে যোগাসনে উপবিষ্ট এবং দীর্ঘ শুশ্রুধারী। কপিলমুনির মাথার উপর পঞ্চনাগছত্র বিস্তারিত, বাম হাতে কমণ্ডুল এবং উর্ধে তোলা ডান হাতে জপের মালা। মূর্তি তিনটির শিল্প সৌন্দর্য স্থূল এবং সর্বাঙ্গে সিন্দুর লিপ্ত। কপিলমুনির প্রাচীন মন্দির ও মূর্তি সম্পর্কে শ্রীযুত অশোক মিত্র মহাশয়ের রচিত ১৯৫১ সালের 'District Handbook, 24-Parganas' গ্রন্থে নিম্ন-লিখিত বর্ণনা পাওয়া যায়—

"The image of Kapila is a shapeless block of stone daubed with red paint During the

greater part of the year it is kept in Calcutta; but a week or two before the festival it is handed over to the priests, who take charge of it during the festival, and receive a share of the pilgrim's gifts. It is placed in a temporary temple, as the old one has been washed away by the encroaching sea, and stands on a platform of sand about four feet high. A bamboo railing in fornt keeps off the crowds, who go past it from day light till dark. According to Wilson: 'In front of the temple was a banian (*bar*) tree, beneath which were images of Rāma and Hanumnān. The pilgrims commonly wrote their names on the walls of the temple, with a short prayer to Kapila, or suspended a piece of earth or brick to a bough of the tree, with some solicitation, as for health, or affluence, or offspring, and promised, if their prayers are granted, to make a gift to some divinity. Behind the temple was a small excavation termed Sitākund, filled with fresh water, of which the pilgrim was allowed to sip a small quantity, on paying a fee to the manager of the temple*." (p. cvii)

কপিল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত উক্ত বিগ্রহাদির উৎসবকালে পূজা-অর্চনা করেন অবাঙ্গালী রামানন্দ পন্থী তিন-চারজন মোহন্ত। উত্তর প্রদেশে অযোধ্যা নগরে রামানন্দ পন্থীদিগের প্রখ্যাত মঠ হনুমানগড়ি থেকে এই সকল মোহন্তরা আসেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কয়েক শতাব্দী পূর্বে এই মঠের জনৈক সাধু সাগরদ্বীপে এসে সাগরতীর্থের প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং অদ্যাপিও সাগরতীর্থের মালিকানা ঐ রামানন্দ পন্থী সাধুদের হাতেই আছে। উৎসব উপলক্ষে 'প্রণামী' বাবদ যে-সকল স্বর্ণালঙ্কার, টাকাকড়ি ও বস্ত্রাদি সংগৃহীত হয় তা ঐ মঠেই জমা দেওয়া হয়। সাগরদ্বীপের মোহন্তগণের আবার নিয়োগ-বদলীর রীতি প্রচলিত আছে এবং সাগরদ্বীপ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য তীর্থস্থানেও এই মঠের কর্তৃত্বাধীনে অনেকগুলি আশ্রমাদি আছে। সাগরতীর্থের মালিকানা যে কি সূত্রে এই অবাঙ্গালী রামানন্দপন্থীদের হাতে গিয়েছে সে-সম্পর্কে কেউই কিছু বলতে পারেন না। তবে সাগরদ্বীপে কপিলমুনির মন্দিরের মালিকানা নিয়ে বর্তমানে যে বেশ গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬০ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত একটি সংবাদে। উহা এইরূপ—

"সাগরমেলা, ১৩ই জানুয়ারী—সাগরমেলা উপলক্ষে কপিলমুনির মন্দিরের প্রণামী সংগ্রহ করার অধিকার সম্বন্ধে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল, সীতারামজী ও তাঁহার দলবল এবং গোপাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার লোকজনকে সংযত করিয়া ডায়মণ্ডহারবারের মহকুমা অফিসার শ্রী এ. সেন আজ ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন।

সাগর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীহরিসাধন ঘোষের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া মহকুমা কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

পুনরাদেশ জারী না হওয়া পর্যন্ত ডায়মণ্ডহারবারের সার্কেল ইনস্পেকটর শ্রীহরিসাধন মিত্রকে শীল করা ব্যাগে সংগৃহীত প্রণামী তাঁহার হেপাজতে রাখার জন্য মহকুমা অফিসার শ্রী সেন নির্দেশ দিয়াছেন।

কপিলমুনির মন্দিরে প্রণামী সংগ্রহ সম্বন্ধে ১৪৪ ধারা জারী করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কুমার চ্যাটার্জী আবেদন জানাইয়াছিলেন। ইহার ভিত্তিতে মহকুমা অফিসারের নির্দেশে সাগর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার তদন্ত করেন। তিনি রিপোর্ট দেন যে, প্রণামী সংগ্রহের অধিকার লইয়া শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা রহিয়াছে। এই কারণে উপরিউক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।" এ বিষয়ে বিরোধী পক্ষের বক্তব্য ১৯৬০ সালে ৮ই জানুয়ারী তারিখের 'যুগান্তর' পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করা গেল—

"পৌষ সংক্রান্তির দিন গঙ্গাসাগর মেলার তীর্থযাত্রীদের নিকট হইতে অবৈধভাবে (দক্ষিণা) অর্থ আদায় বন্ধের জন্য সীতারামজী ও তাহার লোকজন এবং গোপাল মুখার্জী ও অন্যান্যদের উপর ১৪৪ ধারা অনুসারে ইনজাংশন জারীর প্রার্থনা জানাইয়া এডভোকেট ডাঃ এইচ এন দাশগুপ্ত বুধবার কালীঘাটের শ্রীকৃষ্ণকুমার চ্যাটার্জির পক্ষে ডায়মণ্ড-

*H. H. Wilson, Essays on the Religion of the Hindus (1862, vol. II)

হারবারের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী এস আর সেনগুপ্তের আদালতে একটি দরখাস্ত পেশ করেন।

ধর্মপ্রাণ নর-নারীরা যে অর্থ দিবেন তাহা সরকারী কর্মচারী কর্তৃক সংগ্রহের জন্যও আদেশ দিতে দরখাস্তকারী আবেদন করেন। এইভাবে সংগৃহীত অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে অথবা তাঁহার নির্দেশ মত অপর কোন তহবিলে প্রেরণ করিতে হইবে।

দরখাস্তকারী বলেন যে, সীতারামজী ও তাহার লোক-জনের সাগর দ্বীপের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। বৎসরের মধ্যে ১১ মাস তাহারা সেখানে থাকেও না। গোপাল মুখার্জী সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা যায়। তাহারা পৌষ মাসের শেষের দিকে সাগর দ্বীপে আসে। তাহারা কপিল মুনির মূর্তির পাদদেশে বসিয়া থাকে।

যাত্রীদের নিকট হইতে দক্ষিণা বাবদ অর্থ আদায়ের কোন অধিকার তাহাদের না থাকিলেও তাহারা উহা আদায় করে এবং ঐ টাকা লইয়া চলিয়া যায়।

দরখাস্তকারী বলেন যে, এইভাবে সংগৃহীত অর্থ জনহিতকর কাজে ব্যবহার করাই উচিত।

ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার আদেশে বলেন যে, বিষয়টি জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট। ৮ই জানুয়ারী ডায়মণ্ডহারবারের মহকুমা হাকিমের নিকট বিষয়টি পেশ করা হউক কারণ, গঙ্গাসাগর স্নান সংক্রান্ত ব্যাপারের ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত।"

স্নান-তর্পণাদির পর বিগ্রহ দর্শন এবং অর্ঘ ও অঞ্জলি দেবার জন্য কাতারে কাতারে নরনারী কপিলমন্দিরে প্রবেশের জন্য ভীড় করে দাঁড়ান। মন্দিরে প্রবেশ সহজ ব্যাপার নয়। নারীপুরুষ ভাগে শাল খুঁটির বেড়া দিয়ে ঘেরা কয়েকটি অপ্রশস্ত পথ দিয়ে মন্দিরে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়। আট-দশ ঘণ্টা লাইন দিয়েও শেষ পর্যন্ত অনেক যাত্রীর ভাগ্যেই বিগ্রহ দর্শন ঘটে ওঠে না। অবশ্য যাত্রীদের মন্দির প্রবেশের সুবিধা করে দেবার জন্য পুলিশবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী অক্লান্ত পরিশ্রম করে থাকেন।

মন্দিরে লক্ষ লক্ষ ভক্তের ছুঁড়ে দেওয়া ফুল-বেলপাতা, গোটা ফল, সন্দেশ, টাকা-পয়সা, কাপড় ও সোনা-রূপার অলংকারে এক বিরাট স্তূপ জমে ওঠে। উৎসবের তিনদিন ধরে এই স্তূপ ক্রমশই আকারে বৃদ্ধি পায়; উৎসবের শেষে ঐ স্তূপ ঘেঁটে টাকা-পয়সা, কাপড়, সোনাদানা বাছাই করে মোহন্তরা নিয়ে যান অযোধ্যার হনুমানগড়ি মঠে।

তীর্থক্ষেত্রে এসে অনাথ-আতুর, সাধু-সন্তদিগকে দান-ধ্যান করা পবিত্র কর্ম বলে বিবেচিত। সাগর সঙ্গমে পুণ্য-স্নান করে মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন ও পূজাপাঠ সেরে যাত্রীরা দান-ধ্যানের কাজে মন দেন। প্রধানতঃ টাকা-পয়সা, বস্ত্র, কম্বল, চাল-ডাল প্রভৃতি বিতরণ করা হয়। কেউ বা মেলা থেকে কিনে মন মন ওজনের পুরী, জিলিপী, লাড্ডু বিতরণ করেন। মেলার চারিদিকে রাস্তার ধারে অসংখ্য অথর্ব, বৃদ্ধ, পঙ্গু, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ ভিখারীদের সঙ্গে সাধু-সন্ন্যাসীর দলও বসে যান প্রাপ্তির আশায়। এই বিপুল ভিখারী-দলের একটানা গোঙানি ও কাতর অনুনয়-বিনয় অনেক সময় দাতার হৃদয়ে করুণা অপেক্ষা বিরক্তির উদ্রেক করে। সরকারী কর্মচারীদের সতর্ক দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও এত সংক্রামক রোগগ্রস্থ লোক কি করে মেলায় এসে হাজির হন এ প্রশ্ন অনেকের। তবে আশার কথা এই যে, এই সকল কুষ্ঠব্যাধি রোগগ্রস্থ ভিখারীদের অধিকাংশই নাকি নকল রোগী, মেলায় ভিক্ষা করে কিছু পয়সা উপার্জন করার জন্য দেহে কৃত্রিম ক্ষতের সৃষ্টি করে নেন এবং মেলা ফুরিয়ে গেলেই সাজ-পোষাক পরে যে-যার মত ঘরে ফেরেন।

সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ শীর্ষাসনে, কেউ যোগাসনে, কেউ কণ্টক শয্যায় শুয়ে, কেউ বালির মধ্যে সারা দেহ ঢুকিয়ে দিয়ে উর্ধমুখে, কেউ উর্ধপদে, কেউ সরবে, কেউ নীরবে বসে নানা ছলাকলায় দাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আরো দেখা যায়, যেমন দু'টি কিশোর-কিশোরী একটা গাছের ডাল পুঁতে তার নীচে রাধা-কৃষ্ণের বেশ ধ'রে যুগল মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। আবার কোনখানে দেখা যায় হাতে তীর-ধনুক নিয়ে রাম-লক্ষ্মণের বেশে দু'জন বালক দাঁড়িয়ে আছে, তাঁদের পদতলে হনুমান সেজে কাঁধে গদা নিয়ে বসে আছেন আর একজন। দেখলে আশ্চর্য হ'তে হয় কিভাবে এই সব লোকগুলি নির্বিকার পাথর প্রতিমার মত একইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছেন। তাছাড়া, বাউল-বৈরাগীরা তাঁদের পূজিত গৌর-নিতাই, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি দেব-বিগ্রহাদি সাজিয়ে নিয়েও বসে গেছেন অর্থ-প্রাপ্তির আশায়।

সাধু-সন্ন্যাসী ছাড়া পুলিশ দপ্তরকে ফাঁকি দিয়ে প্রতি বৎসরই চোর, ছিনতাই-পকেটমার, প্রভৃতি সমাজ-বিরোধীর দল এসে হাজির হন সাগরমেলায় এবং প্রতি বৎসরই বেশ কিছু সংখ্যক দুর্বৃত্ত ধরা পড়ে শাস্তিও পায়। সাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে এর অনেক নজির দেওয়া যায়। তবে বোধকরি তার দরকার হবে না; এখানে কেবলমাত্র ১৯৬০ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখের 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা' থেকে একটা ছোট্ট উদ্ধৃতি দেওয়া হলো: "সাগরমেলা, ১৪ই জানুয়ারী—বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা! সাগর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের জ্যাঠাইমা আজ যখন কপিলমুনির মন্দিরে পূজা দিবার জন্য দরজার সম্মুখে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁহার গলা হইতে সাড়ে ছয় তোলা ওজনের সোনার নেকলেস ছিনাইয়া লইয়া যায়। এখনও পর্যন্ত তাহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।"

প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে সাগর সঙ্গমে পুণ্যস্নান উপলক্ষে সাগরদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তবর্তী তটভূমিতে প্রায় আড়াই মাইলব্যাপী ভূখণ্ড জুড়ে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি মূলত: তিনদিনের জন্য বসলেও, মেলা বসতে ও ভাঙ্গতে প্রায় সপ্তাহকাল লাগে। ১৯৫৩ সালে 'গঙ্গাসাগর মেলা অ্যাক্ট' অনুসারে বর্তমানে এই মেলার পরিচালনার ভার "চব্বিশ-পরগণা জেলাবোর্ডের" উপর অর্পিত হয়েছে। এমনকি ১৯৬১ সাল থেকে জেলা-বোর্ড কর্তৃপক্ষের উপরই 'তীর্থকর' আদায়ের ভার দেওয়া হয়েছিল, সম্প্রতি 'তীর্থকর' আদায়ের রীতি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পূর্বে প্রতি বৎসর জেলাবোর্ড মেলার জন্য নিলাম ডাকতেন এবং সর্বোচ্চ মূল্যের 'ডাক' গ্রহণকারী ব্যক্তিকে মেলার 'ইজারা' দেওয়া হত। প্রতি বৎসর প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা 'ডাক' উঠত বলে জানা যায়। 'ডাক' গ্রহণকারী ব্যক্তি তীর্থকর আদায় এবং মেলায় বিক্রেতাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে মুনাফা করতেন। শোনা যায়, অতীতে কলিকাতা চেতলার "আড্ডী" পরিবার বহুবার গঙ্গাসাগরের 'ডাক' ধরেছেন। বর্তমানে গঙ্গাসাগর মেলা থেকে জেলাবোর্ডের যে আয় হয় তার একটা আনুমানিক হিসাব পাওয়া যায় জনৈক শ্রীকৃষ্ণ কুমার ব্যানার্জী কর্তৃক "আনন্দবাজার পত্রিকা"-র ষ্টাফ রিপোর্টারের নিকট প্রদত্ত নিম্ন উদ্ধৃত বিবরণী থেকে—

"শ্রীকৃষ্ণ কুমার ব্যানার্জীর মতে এবারে ফেলে-ছেড়েও ৩,৪৮,০০০ টাকার মত আয় জেলা বোর্ডের হবে। অন্তত হওয়া উচিত। তাঁর হিসাবে (২॥ লক্ষ যাত্রীর হিসাবে): তীর্থকর বাবদ আয় মাথাপিছু এক টাকা হিসাবে ২,৫০,০০০ টাকা। জলকর (মাথা পিছু এক আনা): ১৫,০০০ টাকা, নৌকার আদায় (নৌকাপিছু গড়ে ১১ টাকা): ৩৩,০০০ টাকা, দোকান বাজারের খাজনা: ৫০,০০০ টাকা, একুনে ৩,৪৮,০০০ টাকা। শ্রী ব্যানার্জীর হিসাবে মেলার জন্য জেলাবোর্ডকে ব্যয় করিতে হয় ৪৮ হাজার টাকা। তিনি যে হিসাব দেন তাতে জানা যায় যে, পায়খানা প্রস্রাবখানা নির্মাণ বাবদ (১,২০০ পায়খানা এবং প্রস্রাবখানা নির্মিত হইয়াছে) ১২,০০০ টাকা, মেথর, ধাঙ্গড় বাবদ ৭,০০০ টাকা, আলো বাবদ ১,৪০০ টাকা এবং জল সরবরাহ বাবদ ১৫,০০০ টাকা, একুনে ৪৮ হাজার টাকা। আয় থেকে ব্যয় বাদ দিলে পরিষ্কার তিন লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা—১৬.১.৬১)

মেলায় বিক্রেতারা প্রধানত: পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা, চব্বিশ-পরগণা, মেদিনীপুর, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া প্রভৃতি জেলা হইতে এবং উত্তর প্রদেশের কাশী, বিহারের দুমকা জেলা হইতে পাথরের তৈরী নানাপ্রকার জিনিসপত্র, রাজস্থানের কাঠের পুতুল ও উড়িষ্যা হইতে বিবিধ শিল্প সামগ্রী লইয়া আসেন।

মেলায় সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও হোটেল জাতীয় খাবারের দোকান এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ছাড়া লৌহ ও পিতলের বাসনকোসন, তৈরী জামাকাপড়, গামছা-সতরঞ্চী, কাঠের, মাটির ও প্লাষ্টিকের তৈরী খেলনা-পুতুল, জুতা, লোহার নোয়া, কার-ঘুনসি, কাঁচের চুড়ি, শাঁখা, রুদ্রাক্ষ ও তুলসীর মালা, শঙ্খ, মাদুর, শিল্প সামগ্রী ও কারুশিল্পের দোকান, সস্তার বই-ছবি (গঙ্গা মাহাত্ম্য, কপিলমুনির কাহিনী প্রভৃতি), নারিকেল, ডাব, কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফলের দোকান, শাকসব্জীর দোকান, চাল-ডাল প্রভৃতি মুদির দোকান, চিড়া-মুড়কী, তিলের নাড়ু, তিলের খাজা, দই ইত্যাদির দোকান, মাটির হাঁড়ি-কলসীর দোকান, হাকিমী-কবিরাজী প্রভৃতি সস্তা ঔষধপত্রের দোকান, চা-পান-বিড়ির

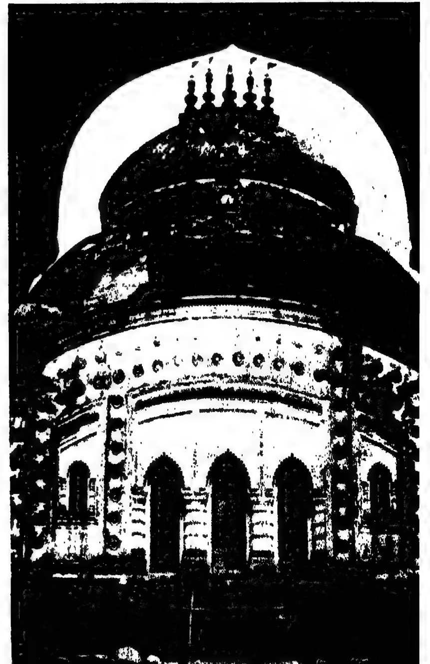
দোকান এবং পূজার উপাচারের জন্য ফুল, বেলপাতা, মালা ও নৈবেদ্যাদির দোকানপাট বসে।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, পৌষসংক্রান্তি তিথি হিন্দুস্থানী-দের নিকট তিল সংক্রান্তি নামে পরিচিত এবং তাঁহারা এইদিন তিল সংক্রান্তি ব্রত পালন করে চিড়া-দৈ, তিলের নাড়ু ও তিলের খাজা আহার করেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক, নাগরদোলা প্রভৃতির আয়োজন দেখা যায়। তা' ছাড়া কয়েকটি জুয়ার দলও আসে।

মেলার ভীড় নিয়ন্ত্রণ, মালপত্রসহ স্টীমারে উঠা-নামার জন্য যাত্রীদের সাহায্য করা, নিখোঁজ ব্যক্তিদের অনুসন্ধান, প্রাথমিক চিকিৎসা, যাত্রীনিবাসে যাত্রীদের আশ্রয় দান প্রভৃতি নানারকম জনহিতকর কাজে ভারত সেবা সঙ্ঘ, সেন্ট জন এ্যাম্বুলেন্স, দমকলবাহিনী, সুন্দরবন জনকল্যাণ সঙ্ঘ, বজরঙ্গ পরিষদ, কলিকাতা যুবক সঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ রেডক্রস্, মণ্ডল কংগ্রেস সেবাদল, আর-ডব্লিউ-এ-সি, সরকারী জনস্বাস্থ্যবিভাগ ও পুলিশ বাহিনী মেলার কয়দিনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম করে থাকেন।

মেলা শেষ হয়। সরকারী কর্মচারীরা একদিন মেলা ভেঙ্গে দেবার কথা ঘোষণা করেন। তার আগেই অবশ্য যাত্রীরা চলে যান যে-যার ঘরে। ব্যবসায়ীরা লাভ-লোক-সানের হিসাব মিলিয়ে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠে বসেন মহাজনী নৌকায়। সরকারী কর্মচারী যাঁরা সবার শেষে সাগরদ্বীপ ত্যাগ করেন, তাঁদের কাছে শোনা যায় এই সময় নাকি অসংখ্য কুকুরের দল এসে হাজির হয় সাগরদ্বীপে মেলা প্রাঙ্গনে ছড়িয়ে থাকা উচ্ছিষ্টাংশ ভোজনের লোভে। তারপর একদিন তারাও ফিরে যায় যে-যার আস্তানায়। দূরে বহুদূরে দিগন্তে মিলিয়ে যায় সাগরদ্বীপ থেকে ছেড়ে যাওয়া শেষ মহাজনী নৌকাটি। জনকোলাহল থেমে যায়, নির্জনতা নেমে আসে সাগরদ্বীপে। কেবল ভাবলেশহীন বিস্ফারিত নেত্রে একদৃষ্টে চেয়ে বসে থাকেন মহামুনি কপিল; কিংবা হয়ত চক্ষু বুজিয়ে সারা বৎসরের জন্য আবার গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যান। তাঁরই কল্যাণে যে মোহন্তের দল প্রায় লক্ষ টাকা ধনসম্পত্তি নিয়ে অযোধ্যার 'হনুমানগড়ি মঠে' গিয়ে উঠলেন তাঁদের মধ্যেও কেউ একজন রইলেন না নিয়মিতভাবে তাঁকে দু'টো ফুল-বেলপাতা ছুঁড়ে দিতে। সংসার নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত, মহাজ্ঞানী মহামুনির তাতে কিছু আসে যায় না। এই অবহেলা তাঁর সুগম্ভীর প্রশান্ত হৃদয়ে কোন রেখাপাত করে না। জীবনে হয়তো এই নির্জনতা, এই নিঃসঙ্গতাই চেয়ে ছিলেন তিনি; তাই সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন কোন্ সেই সুদূর অতীতকালে সুবিশাল ভারতবর্ষের শেষপ্রান্তবর্তী বঙ্গোপসাগরের কূলে নির্জন সাগরদ্বীপকে। শান্ত, মহাশান্ত পরিব্যাপ্ত; শান্তি, মহাশান্তি বিরাজিত। শুধু শোনা যায় নির্জন সাগর সৈকতে আছড়ে পড়া বিরামবিহীন জলোচ্ছ্বাসের একটানা গর্জন। বর্ষচক্র ঘুরে চলে।



কৃষ্ণরায়ইজীউর মন্দির
- কাঁচরাপাড়া



পানিহাটির মন্দির



অন্নপূর্ণার মন্দির—টিটাগড



অন্নপূর্ণা মন্দিরের উপরিভাগ



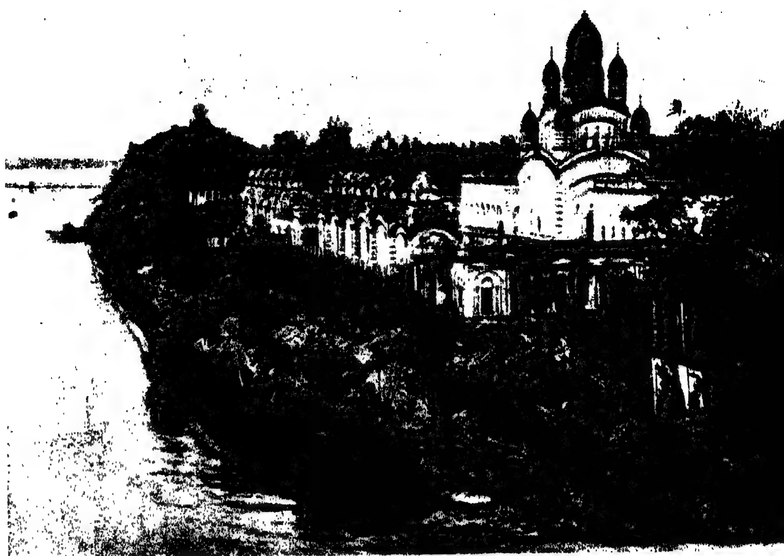
পঙ্কের কাজে অলংকৃত
অন্নপূর্ণা মন্দিরের একাংশ



আগরপাড়ার একটি শিবমন্দিরে
সুন্দর পঙ্কের কাজ



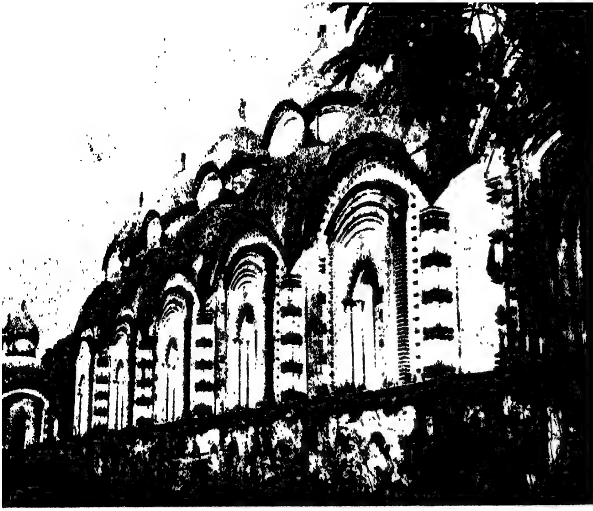
আগড়পাড়ার শিবমন্দিরে
পঙ্কের কাজের আর
একটি নমুনা



গঙ্গাতীরে দ্বাদশ
শিবমন্দিরসহ ভবতারিণীর
নবরত্ন মন্দির
—দক্ষিণেশ্বর



ভবতারিণী মন্দিরে নববর্ষ
উপলক্ষে দর্শনার্থীর ভীড়

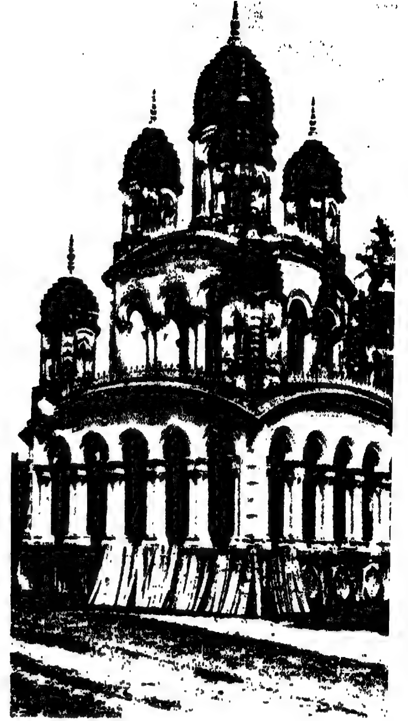


দ্বাদশ শিবমন্দির—দক্ষিণেশ্বর



বনগ্রাম ছয়ঘরিয়া
শিবমন্দির পঙ্কের কাজ

রাসমঞ্চ--দাঁতাকুড়িয়া

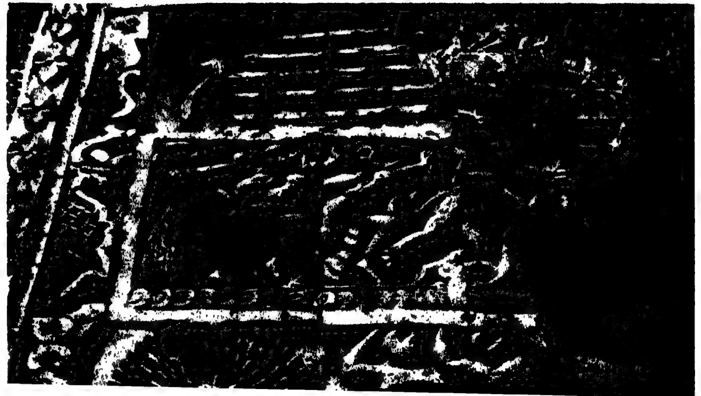




বাওয়ালীর মণ্ডলদিগের স্থাপিত
রাধাবল্লভ মন্দির—বাখরাহাট

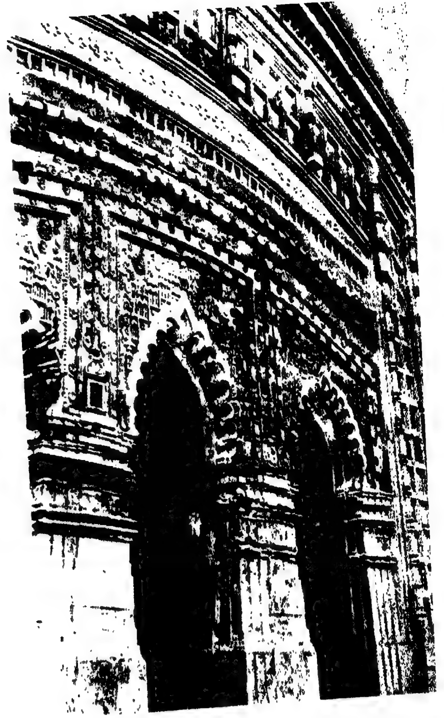


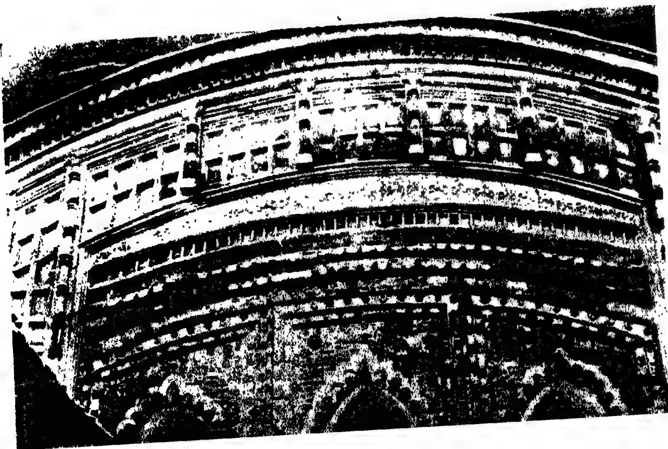
খড়্গেশ্বর শিবমন্দিরের
ছত্রাকৃতি চূড়া—জয়রামপুর



বজবজের নিকট
রাজারামপুরের শিবমন্দিরে
পোড়ামাটির কাজ

কেশবেশ্বর শিবমন্দিরের একাংশ
— মন্দিরবাজার





পোড়ামাটির কাজে অলংকৃত
কেশবেশ্বর শিবমন্দিরের
আর একটি দৃশ্য



প্রসিদ্ধ জটার দেউল



টালিগঞ্জ আদিগঙ্গার তীরে
বাওয়ালীর মণ্ডলদিগের নির্মিত
নবরত্ন মন্দির

নবনির্মিত কপিলমন্দির
—গঙ্গাসাগর





কপিলমন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ ইচ্ছুক
অপেক্ষারত দর্শকের একাংশ

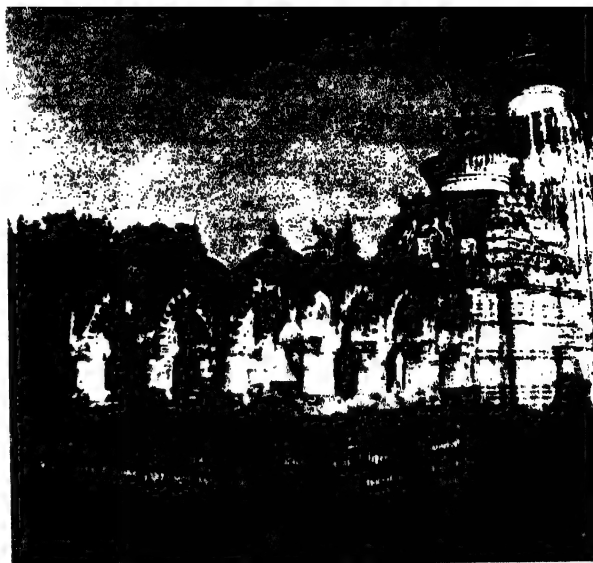


পৌষসংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে
সাগরসঙ্গমে স্নানার্থীর ভিড়



গঙ্গাসাগরের পুণ্যস্নানের

নাটমন্দির ও জগমোহনসহ
কটেশ্বর শিবমন্দির—এগরা





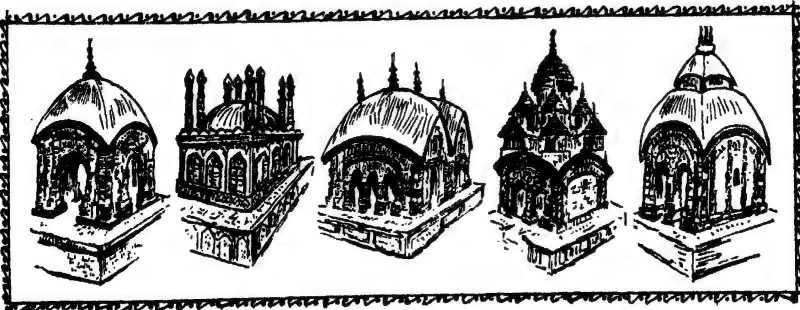
জিষ্ণুহরি মন্দির—মেদিনীপুর



বর্গভীমার মন্দির—মেদিনীপুর



মেদিনীপুর



মানচিত্রে
মেদিনীপুর জিলার
পূজা-পার্বণ ও মেলা

পূজা পার্বণ ও অন্যান্য উৎসবের প্রতীক নির্দেশক

শৈব দেবতা	[শিবপূজা, শিবরাত্রি, চড়ক, গাজন, নীলপূজা প্রভৃতি।]
বিষ্ণু আদি দেবতা	[রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, অক্ষয়তৃতীয়া, অনন্তচতুর্দশী, রাস, দোল, ঝুলন, রথ, স্নান, গোষ্ঠ প্রভৃতি দ্বাদশ যাত্রা এবং বৈষ্ণবীয় মহোৎসব।]
শক্তি	[কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, গন্ধেশ্বরী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি]
ধর্মরাজ	[ধর্মরাজপূজা, ধর্মরাজের গাজন প্রভৃতি]
লৌকিক ও গ্রাম্য দেবদেবী	[ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, চণ্ডী, ওলাবিবি, পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ, দক্ষিণরায় প্রভৃতি]
পুণ্যস্নানাদি পর্ব	[বারুণী, পৌষসংক্রান্তি, মাঘীপূর্ণিমা, অষ্টমীস্নান প্রভৃতি]
তিথিঘটিত পর্ব	[বাংলা নববর্ষ, পৌষপার্বণ, অম্বুবাচী, জামাইষষ্ঠী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি]
অন্যান্য দেবতা	[কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা, শনি, ব্রহ্মা, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি]
আবির্ভাব-তিরোভাব উৎসব	[হিন্দু সাধুসন্তদিগের]
পীরের উরস	[মুসলমান পীর, ফকির, দরবেশ প্রভৃতি]
আদিবাসী উৎসব	[করমপূজা, বাঁধনা পর্ব প্রভৃতি]
মুসলমানদিগের উৎসব	[মহরম, ঈদ, সবেবরাত প্রভৃতি]
জৈন উৎসব	[জৈন সম্প্রদায়ের যাবতীয় উৎসব]
বৌদ্ধ উৎসব	[বুদ্ধজয়ন্তী প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের যাবতীয় উৎসব]
খৃষ্টানদিগের উৎসব	[ইংরাজী নববর্ষ, বড়দিন, প্রভৃতি খৃষ্টানদিগের যাবতীয় উৎসব]
বিবিধ উৎসব	[ভারতের স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, প্রখ্যাত দেশনেতার জন্মোৎসব]

পূজা পার্বণ ও অন্যান্য উৎসব

জিলা মেদিনীপুর



জিলা বাঁকুড়া

জিলা পুরুলিয়া

জিলা হুগলী

জিলা ২৪-পরগণা

বিহার

উড়িষ্যা

বঙ্গোপসাগর

সাংকেতিক

রাজ্যের সীমানা ...	—·—·—·—
জিলার ,,	—·—·—·—
মহকুমার ,,	— — — —
থানার ,,	— - — - —
মৌজার অবস্থিতি...	▫

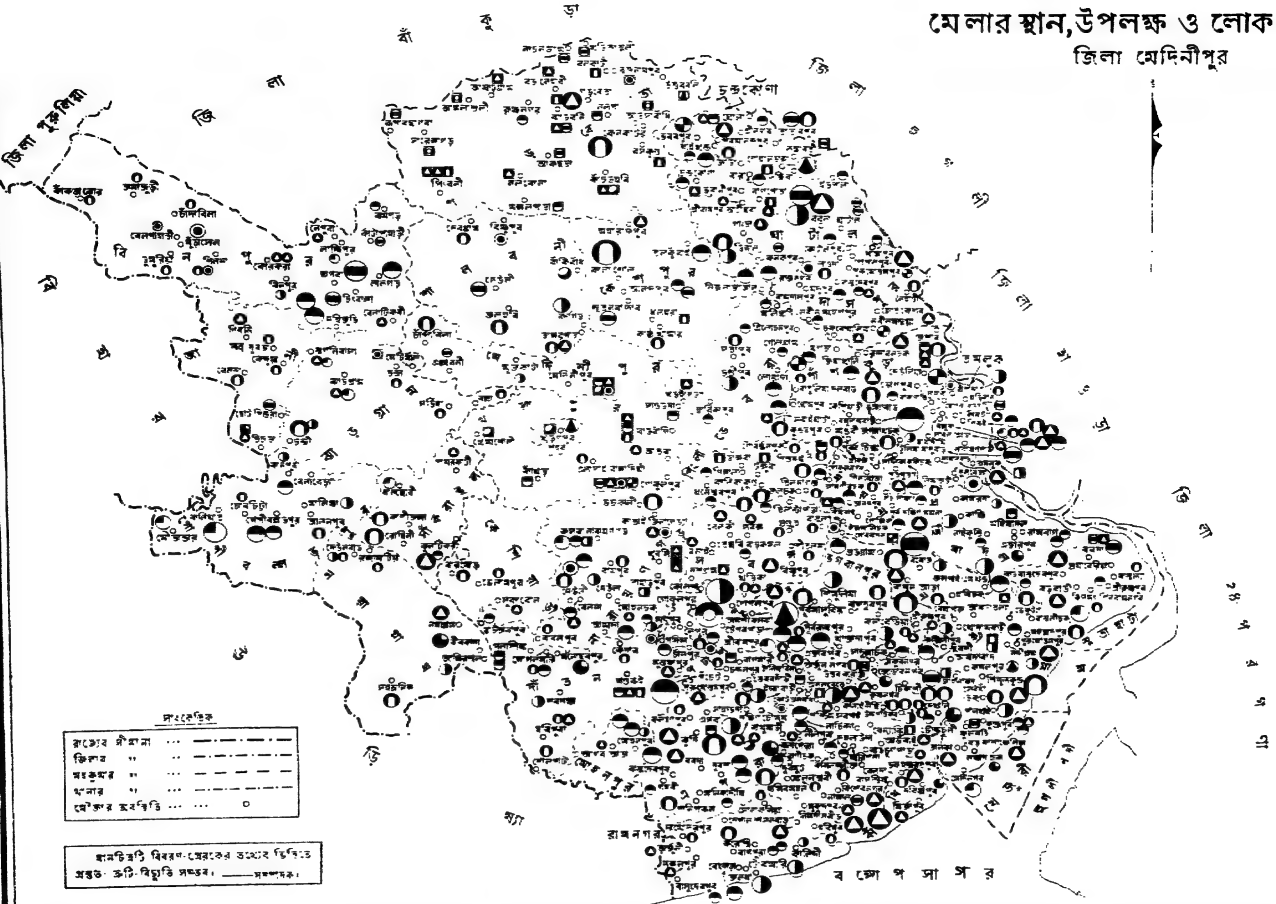
মানচিত্রটি বিবরণ-প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত. ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব। —— সম্পাদক

চট্টোপাধ্যায়।

মেলার উপলক্ষ ও লোকসমাগমের প্রতীক নির্দেশক

শৈব দেবতা	[শিবপূজা, শিবরাত্রি, চড়ক, গাজন, নীলপূজা প্রভৃতি]
বিষ্ণু আদি দেবতা	[রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, অক্ষয়তৃতীয়া, অনন্তচতুর্দশী, রাস, ঝুলন, গোষ্ঠ, দোল রথ, স্নান প্রভৃতি দ্বাদশযাত্রা এবং বৈষ্ণবীয় মহোৎসব।]
শক্তি	[কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, গন্ধেশ্বরী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি]
ধর্মরাজ	[ধর্মরাজপূজা, ধর্মরাজের গাজন প্রভৃতি]
লৌকিক ও গ্রাম্য দেবদেবী	[ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, চণ্ডী, ওলাবিবি, পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ, দক্ষিণরায় প্রভৃতি]
পুণ্যস্নানাদি পর্ব	[বারুণী, পৌষসংক্রান্তি, মাঘীপূর্ণিমা, অষ্টমীস্নান প্রভৃতি]
তিথিঘটিত পর্ব	[বাংলা নববর্ষ, পৌষপার্বণ, অম্বুবাচী, জামাইষষ্ঠী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি]
অন্যান্য দেবতা	[কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা, শনি, ব্রহ্মা, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি]
আবির্ভাব-তিরোভাব উৎসব	[হিন্দু সাধুসন্তদিগের]
পীরের উরস্	[মুসলমান পীর, ফকির, দরবেশ প্রভৃতি]
আদিবাসী উৎসব	[করমপূজা, বাঁধনা পর্ব প্রভৃতি]
মুসলমানদিগের উৎসব	[মহরম, ইদ, সবেবরাত প্রভৃতি]
জৈন উৎসব	[জৈন সম্প্রদায়ের যাবতীয় উৎসব]
বৌদ্ধ উৎসব	[বুদ্ধজয়ন্তী প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের যাবতীয় উৎসব]
খৃষ্টানদিগের উৎসব	[ইংরাজী নববর্ষ, বড়দিন প্রভৃতি খৃষ্টানদিগের যাবতীয় উৎসব]
বিবিধ উৎসব	[ভারতের স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, প্রখ্যাত দেশনেতার জন্মোৎসব]

লোকসমাগম অনির্দিষ্ট
১,০০০ পর্যন্ত
১,০০১ — ২,৫০০
২,৫০১ — ৫,০০০
৫,০০১ — ১৫,০০০
১৫,০০১ — ২৫০০০
২৫,০০১ এবং তদূর্ধ্ব


মেলার স্থান, উপলক্ষ ও লোকসমাগম
জিলা মেদিনীপুর
জিলা পুরুলিয়া
জিলা বাঁকুড়া
জিলা হুগলী
জিলা হাওড়া
জিলা ২৪ পরগণা
বঙ্গোপসাগর
উড়িষ্যা
বিহার
সাংকেতিক
রাজ্যের সীমানা
জিলার ,,
মহকুমার ,,
থানার ,,
মৌজার অবস্থিতি
মানচিত্রটি বিবরণ-প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব। ——সম্পাদক।

মাসপঞ্জীর প্রতীক নির্দেশক

বৈশাখ ... ...

জ্যৈষ্ঠ ... ...

আষাঢ় ... ...

শ্রাবণ ... ...

ভাদ্র ... ...

আশ্বিন ... ...

কার্তিক ... ...

অগ্রহায়ণ ... ...

পৌষ ... ...

মাঘ ... ...

ফাল্গুণ ... ...

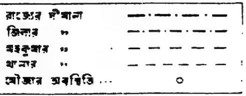
চৈত্র ... ...

চান্দ্রমাস ... ...

মাস অনির্দিষ্ট ... ...

মেলার মানচিত্র

জিলা মেদিনীপুর



স্থানভিত্তিক বিবরণ-প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব। —প্রকাশক.

উপাসনাস্থলাদির প্রতীক নির্দেশক

কালী, দুর্গা, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, মহামায়া প্রভৃতি ... ...

শিব, ধর্মরাজ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি ... ...

চণ্ডী, শীতলা, মনসা, বিশালাক্ষী, ষষ্ঠী, পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর প্রভৃতি গ্রাম্য দেবদেবী ... ...

বিষ্ণু আদি যাবতীয় দেবতা ... ...

হিন্দু সাধুসন্তদের সমাধিমন্দির ... ...

পীর-ফকির প্রভৃতির সমাধিস্থল ... ...

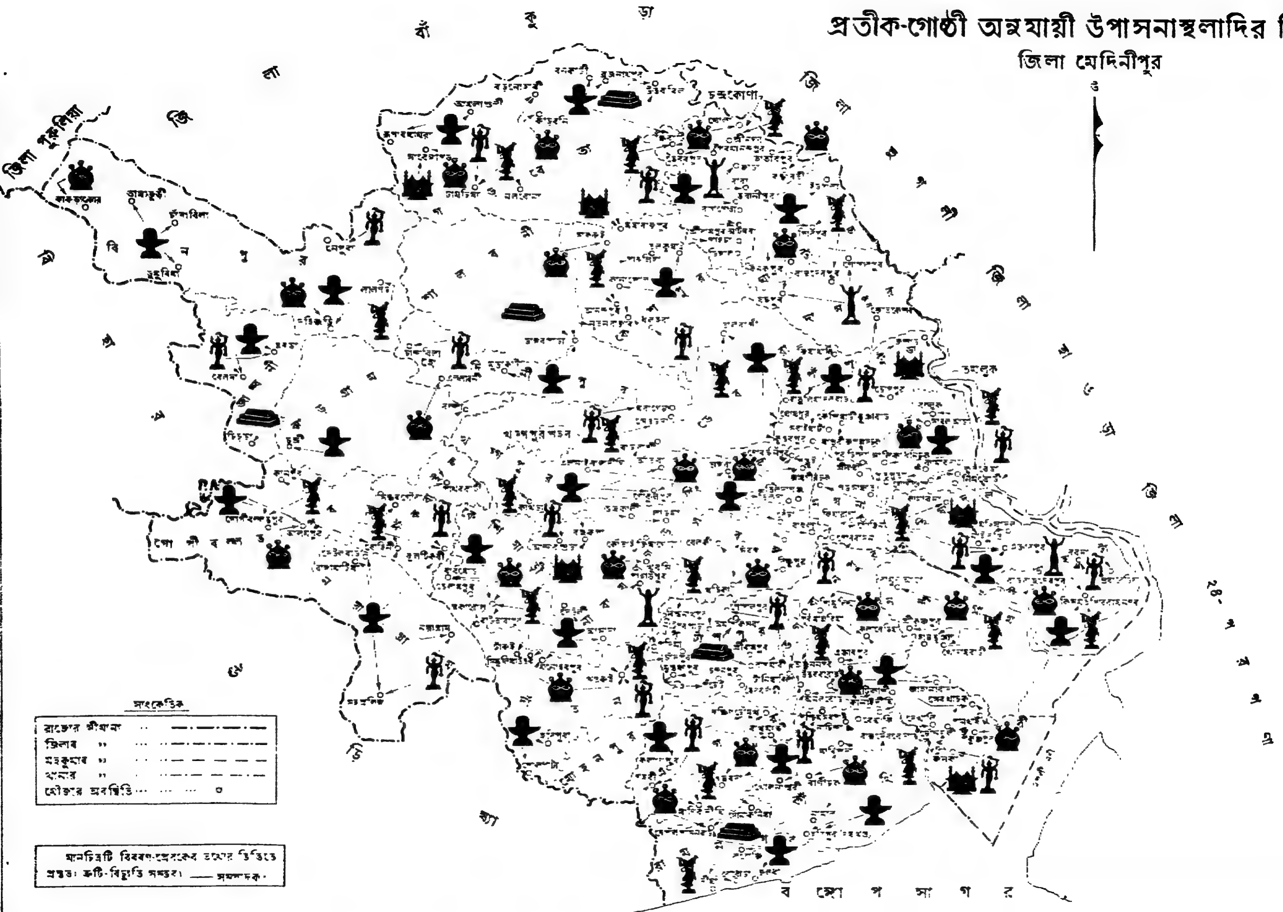
মুসলমান সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

জৈন সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

আদিবাসীদের উপাসনাস্থল .. ..


প্রতীক-গোষ্ঠী অনুযায়ী উপাসনাস্থলাদির বিন্যাস
জিলা মেদিনীপুর
উ
জিলা পুরুলিয়া
বাঁকুড়া জিলা
হুগলী জিলা
হাওড়া জিলা
২৪-পরগণা
বঙ্গোপসাগর
তমলুক
খড়্গপুর শহর
চন্দ্রকোণা
সাংকেতিক
রাজ্যের সীমানা
জিলার ,,
মহকুমার ,,
থানার ,,
মৌজার অবস্থিতি
মানচিত্রটি বিবরণ-প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত; ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব। —— সম্পাদক।

গ্রাম বিবরণী

মেদিনীপুর—খড়গপুর জংশন হইতে ৮ মাইল দূর। ইহা কংসাবতী বা কাঁসাই নদীর তীরে অবস্থিত। মেদিনীপুর শহরটি খুব প্রাচীন। রাজা প্রাণকরের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মেদিনীকোষ অভিধান প্রণেতা মেদিনীকর কর্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে, এবং সেইজন্যই ইহার নাম মেদিনীপুর। আইন-ই-আকবরীতে একটি সুবৃহৎ নগর বলিয়া মেদিনীপুরের উল্লেখ আছে।

মেদিনীপুরের প্রান্তবাহিনী কাঁসাই নদীর উপর প্রায় অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ একটি সেতু আছে। এই সেতুর নিকট হজরত পীর লোহানির সমাধি অবস্থিত। পীর সাহেবের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ইনি শ্রদ্ধার পাত্র। সমাধির নিকটেই একটি পরিত্যক্ত প্রাচীন মন্দির আছে। কথিত আছে, ইহা রঙ্কিনী দেবীর মন্দির এবং পূর্ব্বে নাকি পালা করিয়া গ্রামবাসিগণকে এই দেবীর নিকট প্রত্যহ একটি নরবলি দিতে হইত। একদিন একটি অসহায়া বিধবার একমাত্র পুত্রের পালা উপস্থিত হওয়ায় বিধবার করুণ ক্রন্দনে দয়ার্দ্র হইয়া পীরসাহেব বিধবা পুত্রের পরিবর্ত্তে স্বয়ং দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবীর সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে দেবী পরাজিত হইয়া মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া দিয়া পশ্চিমদিকে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করেন এবং এক রজকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উত্তরকালে এই রজক নাকি দেবীর অনুগ্রহে ধলভূমের রাজা হইয়াছিলেন।

মেদিনীপুর শহরে মুসলমানগণের আরও একটি পবিত্র স্থান আছে। উহা সুবিখ্যাত পীর হজরত মুরসেদ আলি শাহসাহেবের দরগাহ্ এবং খানকা শরীফ নামে পরিচিত। এখানে প্রতি বৎসর শাহসাহেবের উরস্ বা মৃত্যুতিথি উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু মুসলমান যাত্রীর সমাগম হয়।

হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে ওড়িয়া রাজাদের প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ মন্দির, বর্গীদের সময়ের শীতলা মন্দির, হনুমানজীর মন্দির, বিবিগঞ্জের দুর্গা মন্দির, কর্নেলগোলার রাম মন্দির, শিববাজারের দ্বাদশ শিবালয় ও রাসমঞ্চ এবং হবিবপুর ও নূতন বাজারের কালী মন্দির সমধিক প্রসিদ্ধ।

মেদিনীপুর শহরের অন্তর্গত নরমপুরে একটি অসমাপ্ত-মস্‌জিদ্ আছে। কথিত আছে শাহজাদা খুরম (সম্রাট শাহজাহান) দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিবার পথে যে দিন মেদিনীপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন সে দিন ঈদ্ পর্ব্ব থাকায় তাঁহার নমাজের জন্য একদিনেই এই মসজিদ্‌টি নির্ম্মিত হয়। সময়ের অল্পতার জন্য ইহার নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। খুরম ইহাতেই নমাজ পড়িয়াছিলেন। এই ঘটনার স্মারকরূপে মসজিদ্‌টিকে অসমাপ্ত অবস্থায়ই রাখা হইয়াছে।

জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে বর্ণিত আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব ওড়িষ্যা যাইবার সময় মেদিনীপুর পথে গমন করিয়াছিলেন।

[পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক ১৯৪০ সালে প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ', ২য় খণ্ড হইতে গৃহীত।]

ইহা ভিন্ন, শ্রীযোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"সদর মহাকুমার মধ্যে মেদিনীপুর শহরে একটি প্রাচীন প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ আছে। কতদিন হইল কাহার দ্বারা যে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। আমাদের অনুমান, রাজা মেদিনীকর কর্তৃক মেদিনীপুর নগর প্রতিষ্ঠিত হইবার সময়ে এই দুর্গটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎপরে এদেশে মুসলমানদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে দুর্গটিও মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। সেই সময়ে উহার অভ্যন্তরস্থ মস্‌জিদটি নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। আইন-ই-আকবরীতে মেদিনীপুর পরগণার মধ্যে দুইটি দুর্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর অনুমান করেন, এই দুর্গটি তন্মধ্যে একটি। (I. A. S. B., Vol. XII, 1916. No. 1, p. 46-56).

মেদিনীপুর শহরের মধ্যে জগন্নাথ, শীতলা ও হনুমানজীউর মন্দির তিনটি সমধিক প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি, মেদিনীপুর যে সময় উৎকলের রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল, সেই সময় এই স্থানে উৎকলাধিপতি গঙ্গবংশীয় কোন রাজা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কংসাবতী নদীর জল প্রবাহে প্রাচীন মন্দিরটি ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় কিঞ্চিদধিক শত বৎসর হইল বড় বাজারের মহাজনগণ বর্তমান মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই মন্দিরটি সহরের দক্ষিণ প্রান্তে যে স্থানে রাণীগঞ্জ রোড, উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা প্রভিন্সিয়াল রোড (উলুবেড়িয়া রাস্তা) ও পুরাতন বম্বে রোড নামে চারিটি প্রসিদ্ধ রাজপথ মিলিত হইয়াছে সেইস্থানে অবস্থিত।

শীতলা দেবীর মন্দিরটি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ মন্দিরটি বড় বাজারে কেন্দ্রস্থলে এবং হনুমানজীউর মন্দিরটি মীর বাজার নামক পল্লীতে অবস্থিত। আনুমানিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে জনৈক রামোপাসক সন্ন্যাসী এই শহরে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণের নিকট হইতে অর্থভিক্ষা করিয়া হনুমানজীউর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া যান।

মেদিনীপুর শহরের উত্তর প্রান্তে হবিবপুর পল্লীতে এবং শহরের দক্ষিণ প্রান্তে কংসাবতী নদীর তীরে নূতন বাজার নামক পল্লীতে প্রাচীন পঞ্চমুণ্ডি আসনের উপর প্রতিষ্ঠিত দুইটি কালীমূর্ত্তি আছেন। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল মেদিনীপুরের সুসন্তান, মধ্যপ্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত রেভিনিউ বোর্ডের সভ্য শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ দে, সি-আই-ই; আই-সি-এস, মহোদয় নিজ ব্যয়ে হবিবপুরের প্রাচীন কালীমন্দিরটির সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। শহরের মধ্যস্থিত বিবিগঞ্জ নামক পল্লীতে দশভুজা দুর্গাদেবীর ও কর্ণেলগোলা নামক স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের সুউচ্চ মন্দির দুইটিও উল্লেখযোগ্য। শিববাজার পল্লীতে মেদিনীপুরের অন্যতম জমিদার স্বর্গীয় চৌধুরী জনমেজয় মল্লিকের প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশটি শিবালয় ও কারুকার্য্য বিশিষ্ট একটি রাসমঞ্চ আছে।

মেদিনীপুর শহরের মধ্যস্থিত মসজিদ ও পীরস্থানগুলির মধ্যে সিপাহী বাজারের সাধল, নরমপুরের ইদগা, মিঞা বাজারের দেওয়ান সৈয়দ রাজ্জি বা চন্দন সাহিদের মসজিদ ও মহাতাপপুরের ইয়াদগার সাহেবের মসজিদ প্রসিদ্ধ। সিপাহী বাজারের সাধলে পারস্য ভাষায় লিখিত যে লিপিটি আছে, উহা হইতে জানা যায় যে, সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। নরমপুরের ইদগার সহিতও সাজাহানের নাম সংযুক্ত আছে, ………। চন্দন সাহিদের মসজিদে হস্ত লিখিত একখানি পুরাতন কোরাণ আছে। জনশ্রুতি, বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সময়ে এই মসজিদটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইয়াদগার সাহও চন্দন সাহিদের সমসাময়িক ব্যক্তি। বর্ত্তমান কালেক্টরী কাছারীর পূর্ব প্রান্তে পীর পলওয়ান নামে একজন মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। চন্দন সহিদ, ইয়াদগার সাহ ও পীর পলওয়ান হিন্দু, মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট হইতে সমভাবে শ্রদ্ধা ও পূজা পাইয়া থাকেন। কর্ণেলগোলা পল্লীর দেওয়ান খানার মসজিদটির কারুকার্যও উল্লেখযোগ্য। শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে বর্ত্তমান বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের স্টেশনের অনতিদূরে এক ফকিরের সমাধি স্থানে 'ফকিরের কূয়া' নামে পরিচিত যে কূপটি আছে, উহার জল অতি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্য পরিবর্দ্ধক। এই জন্য প্রতিদিন বহু সংখ্যক লোক সমাধি রক্ষকের নিকট হইতে মূল্য দিয়া জল লইয়া যায়। কূপটির সহিত একটির ঝরণার যোগ থাকায় উহার জল কখনও কম হয় নাই। বাহিরের আবর্জ্জনাদি যাহাতে কূপের ভিতরে পড়িতে না পারে সেইজন্য কূপটির উপরে ছাদ দেওয়া আছে।

মেদিনীপুর শহরের কেরানীটোলা পল্লীতে রোমান ক্যাথলিকদিগের ও চার্চ্চ অব ইংলণ্ড মিশন সম্প্রদায়ের খৃষ্টানদিগের একটি গীর্জ্জা আছে। এতদব্যতীত শহরের উত্তরাংশে 'আবাস গড়ের' সন্নিকটে আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট মিশন সম্প্রদায়েরও একটি গীর্জ্জা আছে। রোমান ক্যাথলিকদিগের গীর্জ্জাটি এদেশে ইংরাজাধিকার আরম্ভ হইবার কিছুকাল পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চার্চ্চ অব ইংলণ্ডের 'সেণ্ট জন্স চার্চ্চ' নামক সুউচ্চ গীর্জ্জাটি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মেদিনীপুর শহরের অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে রাণীগঞ্জ রাস্তার পূর্ব্বদিকে আবাস গড়টি অবস্থিত। এক্ষণে উহাকে একটি ভগ্নপ্রায় উদ্যান বাটিকার ন্যায় দেখায়। কর্ণগড়ের পঞ্চম

রাজা রামসিংহ কর্তৃক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই গড়টি নির্মিত হইয়াছিল।····· এই স্থানে (আবাস গড়ের মধ্যে) অন্যূন শতবিঘা আয়তন বিশিষ্ট একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে এবং উহার তীরে নয়টি চূড়া বিশিষ্ট একটি জীর্ণ মন্দির আছে। মন্দিরটির পার্শ্বে দুইটি পৃথক পৃথক ইষ্টক নির্মিত বাটী বিদ্যমান। একটির মধ্যে দশভুজা, জয়দুর্গা ও গৌরী নামে তিনটি ধাতুময়ী ভগবতী মূর্ত্তি এবং অন্যটিতে প্রস্তরময় রাধাশ্যাম, শ্যামসুন্দর ও মদনমোহন এবং ধাতুময়ী রাধিকা ও রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি আছেন। এই গড়টি এক্ষণে নাড়াজোলাধিপতির সম্পত্তি। তাঁহারই ব্যয়ে দেবদেবী-গুলির অন্নভোজ দেওয়া হয় এবং অতিথি ও অভ্যাগতগণ প্রত্যহ সেই প্রসাদী অন্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

(পৃঃ ৩৩৯—৪০)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় সম্প্রতি (১৩৭৭ বঙ্গাব্দে) অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়াছেন যে, উল্লিখিত জয়দুর্গা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদি ১৩৬১ সনে অপহৃত হওয়ায় উক্ত মন্দিরে পূজাদি বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং বর্তমানে সমতল ছাদ বিশিষ্ট দুর্গামণ্ডপের ন্যায় ঐ মন্দিরে লোকজন বসবাস করিতেছেন। শ্যামসুন্দরমন্দিরটি সমতল ছাদ বিশিষ্ট এবং অদ্যাপি এই মন্দিরে নিত্য পূজাদি হইতেছে বটে তবে উৎসবাদি হয় না। ইহা ভিন্ন, প্রতি বৎসর শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে নাড়াজোলের রাজ-পরিবারের অর্থানুকূল্যে মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া দুর্গোৎসব পালন করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আবাসগড়ে প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসের ইন্দ্রদ্বাদশী তিথিতে সাড়ম্বরে ইন্দ পরব পালন করা হয়। বর্তমানে উৎসবটি সর্বজনীন। তবে আদিতে এই উৎসব নাড়াজোলের রাজ-পরিবার কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইত। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মাঠে একটি লম্বা শালগাছ প্রোথিত করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা যথারীতি পূজা করা হয় এবং তদুপলক্ষে উৎসব প্রাঙ্গণে খাবার, মনিহারী প্রভৃতি জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকানপাট বসে।

মেদিনীপুর শহরে সুজাগঞ্জ মহল্লার তেমাথার মোড়ে অবস্থিত জগন্নাথদেবের মন্দিরটি উড়িষ্যা স্থাপত্যরীতিতে গঠিত। এই সুউচ্চ মন্দিরটি ইষ্টক নির্মিত এবং ইহার সম্মুখভাগে জগমোহন সংযোজিত। মন্দির শীর্ষে দুইটি বৃহৎ পিতলের কলস ও তাহার উপর বিষ্ণুচক্র ও পতাকাদণ্ড স্থাপিত। মন্দিরের পূর্বদিকের দেওয়াল গাত্রে দুইটি মৈথুনধর্মী ও দুইটি সাহেবদের তামুক সেবনের দৃশ্য সম্বলিত পোড়ামাটির শিল্পকর্ম ব্যতীত পশ্চিমদিকের দেওয়াল গাত্রে কয়েকটি পোড়ামাটির কাজ আছে। ইহা ভিন্ন জগমোহনের দেওয়াল গাত্রে অলঙ্কৃত পোড়ামাটির শিল্পকর্মগুলির উপর সংস্কারকালে চুন-বালির প্রলেপ পড়ায় উহার শিল্প-সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মন্দির প্রবেশের কাঠের দরজার গায়ে খোদিত দশাবতারসহ অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্তিগুলি দর্শনীয় শিল্পকর্ম। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরের অভ্যন্তরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে রথে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি স্থাপন করিয়া রথ টানা হয় এবং মন্দির প্রাঙ্গণে রাস্তার ধারে মেলা বসে।

মেদিনীপুর শহরের মধ্যে অবস্থিত রেখ দেউল আকৃতির সুবৃহৎ ইষ্টক নির্মিত দুর্গামন্দিরের অভ্যন্তরে প্রায় ৫ ফুট উচ্চ অষ্টধাতু নির্মিত সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী দুর্গা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সঙ্গে কার্তিক-গণেশাদি দেবতা নাই। মন্দিরটির চারিদিকে বারান্দাযুক্ত এবং শীর্ষে পর পর তিনটি কলস স্থাপিত। মন্দির অভ্যন্তরে মেঝের উপর একটি গোলাকার গর্তের মধ্যে শিবলিঙ্গ আছে। মন্দিরটি দেখিতে প্রাচীন বলিয়া মনে হইলেও মন্দির গাত্রে গ্রথিত ফলক হইতে জানা যায়, ইহা ১৩৪২ বঙ্গাব্দে সংস্কৃত হইয়াছে। ইহার পশ্চিম পাশে একটি প্রশস্ত পাকা নাটমন্দির আছে। নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর এই মন্দিরে আশ্বিন মাসে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা হয়। দুর্গামন্দিরের নিকটে একটি ঘরে শীতলা ও অপর একটি ঘরে কালীর মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

মেদিনীপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে বটতলায় সমতল ছাদ বিশিষ্ট একটি ঘরে শীতলা ও মনসার প্রতীক স্বরূপ পিতল নির্মিত দুইটি মুখমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত আছে। শীতলা মূর্তিটি প্রাচীন এবং প্রতিদিন একযোগে শীতলা ও মনসার পূজা হয়। এই শীতলামন্দিরের নিকট অপর একটি ঘরে এক প্রাচীন কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। নিত্য পূজা হয় এবং

প্রায় প্রতিদিনই ভক্তরা দেবীর নিকট দুই-একটি মানসিকের পাঠাবলি দিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন, কংসাবতী নদীর তীরে একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আর একটি প্রাচীন কালীমূর্তির নিত্য পূজাদি হইয়া থাকে। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় সাড়ম্বরে পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তির তিথিতে বহু নরনারী কংসাবতী নদীতে পুণ্যস্নান করিয়া কালীমন্দিরে পূজাদি দিয়া থাকেন। এই সময় কালীমন্দির প্রাঙ্গণে নদীর তীরে একটি মেলা বসে। প্রতি বৎসর ভীম একাদশী তিথিতে এই শহরে ভীমতলা চকে ভীমের বিশাল মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া সমারোহের সহিত সর্বজনীন উৎসব পালন করা হয় এবং মহরম উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

মেদিনীপুর শহরে অবস্থিত কয়েকটি পীরের আস্তানার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, জর্জ কোর্টের গেটের দক্ষিণ দিকে চামরু সাহেব পীরের একটি প্রাচীন আস্তানা এবং জর্জ কোর্টের দক্ষিণদিকে কালগাং গ্রামে কাঁসাই নদীর নির্জন তীরে আঁকড় শা বাবা নামে জনৈক পীরের আর একটি আস্তানা আছে।

মেদিনীপুর শহর সংলগ্ন হবিবপুর গ্রামে উল্লিখিত সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরটি চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত একটি প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরটি ইষ্টক নির্মিত ও সমতল ছাদ বিশিষ্ট। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরের অভ্যন্তরে শবরূপী শিবের উপর দণ্ডায়মানা কালীর বৃহৎ মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। সিদ্ধেশ্বরীমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে একটি ছোট মন্দিরে দেবীর ভৈরবরূপে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। শোনা যায়, প্রায় ছয়-সাত বৎসর পূর্বে কালিকানন্দ স্বামী নামে জনৈক তান্ত্রিক সাধক এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন। কালীমন্দিরের অভ্যন্তরে উক্ত সাধকের পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে আই, সি, এস, মহাশয় বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়া দেন। প্রতিদিন মৎস সহ ও অন্নভোগ দ্বারা দেবীর নিত্য পূজা হইয়া থাকে এবং মানসিক পূজা দিতে বহু লোকজন আসেন। দেবীর নিত্য পূজাদির জন্য বর্ধমানের মহারানী প্রায় দেড়শত বিঘা ভূসম্পত্তি দান করেন। বলা হয় তাম্রপাত্রে খোদিত এই দানপত্রটি মেদিনীপুর কালেক্টরী অফিসে রক্ষিত আছে। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে সাড়ম্বরে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৩২৫ বঙ্গাব্দ হইতে অদ্যাপি শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেবীর নিত্য পূজাদি করিতেছেন। বর্তমানে একটি ট্রাষ্টী কর্তৃক দেবীর পূজাদি পরিচালিত হইতেছে। এই মন্দিরের গাত্রে কয়েকটি পোড়ামাটির শিল্পকার্য আছে।

হবিবপুর একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামে বিভিন্ন জাতির বসবাস আছে। সিদ্ধেশ্বরীমন্দিরের সম্মুখেই অগ্নিযুগের শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর বাস্তুভিটার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন, গ্রামে ইষ্টক নির্মিত একটি প্রাচীন ভগ্ন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

১। গ্রাম : চাঁন্দাবিলা। ২৫।১৫৫'৬৫।৫১।৩৬১

(ক) মাহাতো, ক্ষত্রিয়, ভূমিজ, কামার, নাপিত ও হাড়ী। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন সরডিহা হইতে জেলা বোর্ডের একটি পাকা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে অষ্টমপ্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, ১লা বৈশাখ হইতে নয়দিন-ব্যাপী শিবের গাজন উৎসব, কার্তিক মাসে গোষ্টাষ্টমী এবং কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ও বাসুলীপূজা এবং চৈত্র মাসে চড়ক ও শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ভিন্ন, জ্যৈষ্ঠ মাসে, আষাঢ় মাসের দশহরা তিথিতে, শ্রাবণ মাসে ও আশ্বিন মাসে মনসাপূজা, টুসু ও ভাদু উৎসব এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের করমপূজা হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি সর্বজনীন, শীতলাপূজাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। পয়লা বৈশাখ একদিন। মেলাটি ষাট বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি শিবদুর্গা এবং শিবলিঙ্গসহ একটি পাকা শিবমন্দির ব্যতীত একটি শীতলা, একটি মনসা, এবং 'বাখুৎ' নামে পরিচিত একটি গ্রাম্য দেবতা প্রভৃতি দেবদেবী আছে এবং একটি বৃক্ষতলে জনৈক সন্ন্যাসী ঠাকুরের সমাধি মন্দির আছে।

শ্রীযোগধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক,
চাঁন্দাবিলা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ চাঁদড়া, মেদিনীপুর।

২। গ্রাম : এল্লাবনী। ৮৫।২৩০'২৭।৫৫।৩২৭

(ক) সদ্‌গোপ, মাঝি, বৈরাগী, ধোপা ও নাপিত। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে। যেমন—সদ্‌গোপপাড়া, মাঝিপাড়া ও বৈষ্ণবপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন সরডিহা হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। তাহা ছাড়া, মেদিনীপুর-ধেঁড়ুয়া বাসপথেও গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ৩রা মাঘ গ্রাম্য দেবী ফুলমণি দেবীর বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি বটবৃক্ষের নীচে ফুলমণি দেবীর শিলামূর্তি আছে। ইনি বনদেবীরূপে পূজিতা। শোনা যায়, শতাধিক বৎসর পূর্বে দীনবন্ধু পাল নামে জনৈক কাষ্ঠ ব্যবসায়ী বনে কাষ্ঠ আহরণ কালে উক্ত শিলামূর্তিটি পাইয়া গ্রামে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন এবং যথারীতি পূজার ব্যবস্থা করেন। ফুলমণি বিশেষ জাগ্রতা ঈশ্বরী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। উৎসবটি সর্বজনীন।

(ঙ) ফুলমণিপূজার মেলা। প্রতি বৎসর ৩রা মাঘ হইতে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা শিবমন্দির এবং একটি পাকা শীতলামন্দির আছে।

কংসাবতীর উত্তর তীরবর্তী এই স্থানটি পূর্বে জলাভূমি ছিল এবং স্থানীয় অঞ্চলে 'এলা' নামে পরিচিত একপ্রকার তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। এই কারণে পরবর্তীকালে জনবসতি গড়িয়া উঠিলে এলাবনী অপভ্রংশে এল্লাবনী নামে পরিচিত হয়।

শ্রীমদনমোহন আচার্য, শিক্ষক,
গ্রাম : এল্লাবনী, পো: চাঁদড়া,
মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম : মুড়াকাটা। ১২৭।৩৭৩'৮৮।৭৭।৩১০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, লোধা, মাঝি ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে। যেমন—দেপাড়া, বামুনপাড়া, মাঝিপাড়া ও মুসলমানপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন মেদিনীপুর হইতে ষ্টেট রিলিফের রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে পৌষসংক্রান্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। তাহা ছাড়া, শীতলাপূজা, মনসাপূজা, সরস্বতী-পূজা, গাজন উৎসব এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের টুসু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) পৌষসংক্রান্তির মেলা। পৌষ মাসে তিন-দিনব্যাপী। মেলাটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, শিক্ষক,
মুড়াকাটা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

চাঁন্দাবিলা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে স্থানীয় বুড়াশিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে সীমান্তবর্তী মালকুড়ি গ্রামে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিন হাজার নরনারী সাধারণতঃ গরুর গাড়ী ও মোটরবাসে করিয়া মেলায় আসেন।

চাঁদড়া, দেউল, ডাঙ্গা, বেড়ুয়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। মেলায় প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্নটি দোকানপাট বসে ও কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। খাবার, মনিহারী, ধামা-কুলা, তালপাতার পাখা, মাটির হাঁড়ি-খেলনা, শাঁখা, চুড়ি, পিতল-কাঁসার বাসনপত্র ইত্যাদি আমদানী হয়। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিকের দল আসে। ইহা ব্যতীত, নিকটবর্তী শিরিষ, মালজুড়ি, মালবাঁধ, শিয়াড়বনী, লালগড় প্রভৃতি গ্রাম হইতে আগত আদিবাসী সম্প্রদায় মেলায় ঝুমুরনাচ, কাচিনাচ ও মোহড়ানাচ দেখাইয়া থাকেন।

ফুলমণিপূজার মেলা

এল্লাবনী গ্রামে প্রতি বৎসর ৩রা মাঘ হইতে ফুলমণি দেবীর পূজা উপলক্ষে সাধারণের জমির উপর তিনদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। এই অঞ্চলে ইহা 'বনদেবীর মেলা' নামেও পরিচিত। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। আশপাশের কয়েকটি গ্রাম ও মেদিনীপুর শহর হইতে মোট প্রায় ছয়-সাতশত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় খাবার, মনিহারী, খেলনা-পুতুল এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের পনর-কুড়িটি দোকানপাট বসে ও কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন।

মেলায় ম্যাজিক ও কবিগানের দল আসে এবং জুয়া ও লটারী খেলা হয়।

পৌষসংক্রান্তির মেলা

মুড়াকাটা গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি উপলক্ষে স্থানীয় 'সনকাই' নামক এক পুষ্করিণীর পাড়ে প্রায় তিন-চারি বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং সাধারণতঃ বিকালের দিকেই লোকসমাগম হয়।

গুড়গুড়ি, তাঁতীবেড়িয়া প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় সাত-আটশত নরনারী মেলায় আসেন।

মেলায় মোট পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাটের মধ্যে খাবার ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই অধিক। ইহা ব্যতীত, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির কয়েকটি দোকান বসে। বিক্রেতারা শহর হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান আদায় করা হয় না। মেলায় কীর্তনগান ও তিনদিনব্যাপী যাত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।



থানা : শালবনী

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : দেবগ্রাম। ১৩৫।৬৪১'২০।১৬২।৭৯৩

(ক) বৈরাগী, সাহা, লায়েক, সদ্‌গোপ, মাহাতো, বেনে ও মুসলমান। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া জেলা বোর্ডের পাকা রাস্তায় গোয়ালতোড়-সারেঙ্গা রুটের মোটরবাস চলাচল করে। তাহা ছাড়া, চন্দ্রকোণা রেলস্টেশন হইতে গোয়ালতোড়গামী বাসেও গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির এবং ইহার সম্মুখভাগে একটি আটচালা গৃহ আছে। তাহা ছাড়া, গ্রামে দুইটি মনসা ও অন্যান্য দেবদেবীর স্থান আছে।

শ্রীরূপচাঁদ চক্রবর্তী, শিক্ষক,
দেবগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গোয়ালতোড়, মেদিনীপুর।

২। গ্রাম : জলহরি। ২৪৮।৩৬৮'৮৩।৭৪।৩৮১

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, কুর্মি, কামার, তাম্বুলী, শুঁড়ি ও মাহাতো। ব্রাহ্মণপাড়া, মাহাতোপাড়া, কামারপাড়া ও শুঁড়িপাড়া নামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কুটিরশিল্প।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন গোদাপিয়াশাল। গ্রামে মোটরবাসে যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে বুড়াশিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সাতদিনব্যাপী চলে এবং বহুদিনের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে ২রা জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত সাতদিনব্যাপী। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে বুড়াশিব নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। বলা হয় গ্রামে দুইটি বাঁধ সারা বৎসর জলে পরিপূর্ণ থাকিত। গ্রামবাসীগণ কখনই প্রয়োজনীয় জলের অভাব বোধ করিতেন না। এই কারণে নাকি গ্রামের নাম 'জলহরি' হইয়াছে।

শ্রীবনোয়ারীলাল রায়, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ মৌপাল,
মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম : দেউলী। ২৬৫।৩৮৫'৩০।৩০।১০৯

(ক) খয়রা, মাঝি ও ভূমিজ। গ্রামে খয়রাপাড়া ও মাঝিপাড়া নামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী মোটরবাস স্ট্যাণ্ড সাতপাটী। গ্রামের মধ্যে যাতায়াত করিবার জন্য কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে 'কালষণ্ডার পর্ব' অনুষ্ঠিত হয়। কিংবদন্তী আছে, বহুকাল পূর্বে কতিপয় রাখাল বালক খেলার ছলে একটি রাখাল বালককে দেবতার উদ্দেশে বলি দিবার জন্য পাতার খড়্গ দ্বারা স্কন্ধে আঘাত করে এবং ইহাতে নাকি বালকটি সত্য সত্যই দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। পরে কালষণ্ডা দেবতার অনুগ্রহে সে পুনর্জীবন লাভ করে। তদবধি এই গ্রামে কালষণ্ডার পূজা প্রচলিত হয়। কালষণ্ডার কোন মূর্তি নাই; নির্দিষ্ট স্থান আছে।

(ঙ) কালষণ্ডাপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের একটি বটবৃক্ষতলে কালষণ্ডা ঠাকুরের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীনির্মল কুমার বিশ্বাস, শিক্ষক,
ভুরখা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মৌপাল, মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম : বিষ্ণুপুর। ৩৫৭।৫১৭'৮২।১২৭।৬৭১

(ক) সদ্‌গোপ, কুমার, নাপিত, গোয়ালা, লায়েক, মাঝি ও সাঁওতাল। গ্রামে সামন্তপাড়া, ঘোষপাড়া,

কুমারপাড়া, লায়েকপাড়া ও সাঁওতালপাড়া নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও মৃৎশিল্প ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শালবনী।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ভীম একাদশী তিথিতে ভীমপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং মাত্র দশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ভীম একাদশীর মেলা। মাঘ মাসে সপ্তাহব্যাপী। মেলাটি দশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীরাধারমন রায়, শিক্ষক,
বিষ্ণুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ধাত্রা বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম : ডাঙ্গরপাড়া। ৫২৭।৫৫৯'৭৮।১২২।৫৪৭

(ক) বৈরাগী, ভূঁইঞা, মহাদণ্ড, সদ্গোপ, তিলি, ছুতার, লায়েক, স্বর্ণবণিক ও সাঁওতাল। গ্রামে মাইতি-পাড়া, শ্যামলপাড়া, দক্ষিণপাড়া, মহাদণ্ডপাড়া, ভূঁইঞাপাড়া ও সাঁওতালপাড়া নামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মেদিনীপুর। তাহা ছাড়া, গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে ষ্টেট রিলিফের কাঁচা রাস্তা দিয়া মোটরবাস যাতায়াত করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, গ্রামে বৎসরে দুইবার শীতলাপূজা এবং বৎসরের যে-কোন সময় চব্বিশপ্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। গাজন উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে সপ্তাহকালব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ত্রৈলক্যনাথ শিবের শীলা মূর্তিসহ একটি শিবমন্দির এবং একটি শীতলামন্দির আছে। তাহা ছাড়া, গ্রামে একটি গ্রাম্য দেবতার স্থান ও জনৈক পীরের আস্তানা আছে। পীরের আস্তানার নিকটে একটি ভগ্নপ্রায় প্রাচীন কূপ আছে।

গ্রামের প্রায় এক মাইল উত্তরে কর্ণগড় অবস্থিত। এই গ্রামের কয়েক স্থানে কারুকার্যখচিত অট্টালিকা এবং মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া মনে হয় অতীতে ইহা বেশ সমৃদ্ধশালী গ্রাম ছিল। বড়পাড়া অর্থাৎ ডাগরপাড়া হইতে বর্তমানে গ্রামের নাম ডাঙ্গরপাড়া হইয়াছে এইরূপ অনুমান করা হয়।

শ্রীশশাঙ্ক শেখর সিংহ,
গ্রাম : ডাঙ্গরপাড়া, মেদিনীপুর।

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক কর্ণগড়ের দণ্ডেশ্বের শিব ও মহামায়ার মন্দির সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

কর্ণগড়

মেদিনীপুর শহর হইতে ঘাটাল অথবা গড়বেতাগামী মোটরবাসে গরুর গ্রামে নামিয়া সেখান হইতে গভীর শাল-জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাথুরে পথে প্রায় দুই মাইল হাঁটিয়া কর্ণগড়ে (মৌজা ৫২৪) পৌছান যায়। কর্ণগড় যাতায়াতের ইহাই সহজতম পথ এবং এই পথে কোন প্রকার যানবাহন চলাচলের সুবিধা নাই। কর্ণগড় ও দণ্ডেশ্বর দুইটি পাশাপাশি মৌজা, তবে উভয় মিলিয়াই কর্ণগড় বলা যাইতে পারে। বর্তমানে কর্ণগড়ে প্রধানতঃ 'মাঝি' সম্প্রদায় বাস করিতেছেন। ইহা ভিন্ন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ, মাহিষ্য ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বসবাস আছে।

মেদিনীপুর হইতে ৬ মাইল উত্তরে শালবনী থানায় অবস্থিত কর্ণগড় একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে সিংহ উপাধিধারী এক রাজবংশের রাজধানী ছিল। এই বংশীয় রাজা মহাবীর সিংহের নির্মিত একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গের মধ্যে একটি সরোবর ও তন্মধ্যস্থ একটি প্রস্তর নির্মিত প্রাসাদ এখানকার দ্রষ্টব্য বস্তু। প্রবাদ,

কর্ণগড়ে দাতাকর্ণের বাটী ও ভোজরাজার রাজধানী ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, উৎকলাধিপতি কর্ণকেশরী এখানে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত "রাম চরিতম্" নামক সংস্কৃত কাব্যে কর্ণকেশরীর উল্লেখ আছে। বিখ্যাত "শিবায়ণ" প্রণেতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য বরদা ঘাটালের রাজা শোভাসিংহের অত্যাচারে স্বীয় জন্মভূমি যদুপুর গ্রাম ত্যাগ করিয়া কর্ণগড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গড়টি প্রায় দুই মাইলব্যাপী ছিল এবং সদর ও অন্দর দুই মহালে বিভক্ত ছিল। গড়ের তিনদিকে জঙ্গল এবং পূর্বদিকে কৃষিক্ষেত্র। জঙ্গল হইতে একটি নদী বাহির হইয়া গড়ের দুই দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া পুনরায় একত্রিত হইয়াছে।

গড়ের দক্ষিণ দিকে অনাদিলিঙ্গ দণ্ডেশ্বর শিব ও মহামায়ার মন্দির অবস্থিত। প্রস্তর নির্মিত এই মন্দির দুইটি অতি দৃঢ় ও নির্মাণকৌশল অতি সুন্দর। মহামায়ার মন্দিরে যে পঞ্চমুণ্ডী যোগাসন আছে, প্রবাদ যে, তথায় রামেশ্বর ভট্টাচার্য ও কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহ সিদ্ধ হইয়াছিলেন। উচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত প্রায় আট বিঘা পরিমাণ একটি প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে দীর্ঘ লম্বা প্রস্তর নির্মিত দুইটি পৃথক যন্ত্র বেদীর উপর পাশাপাশি দুইটি সুউচ্চ মন্দির প্রতিষ্ঠিত। উহার একটি দণ্ডেশ্বর শিবের মন্দির অপরটি মহামায়ার মন্দির। প্রস্তর নির্মিত এই মন্দির দুইটি সম্মুখে জগমোহনসহ উড়িষ্যার রেখ-দেউল স্থাপত্য রীতিতে গঠিত। মূল শিবমন্দিরের চূড়ায় বেঁকি, আমলক ও কলস স্থাপিত এবং মন্দিরের গণ্ডী অংশের উপরিভাগের বহির্দেওয়াল গাত্রে চারিদিকে চারিটি সিংহ ও পিছন দিকের দেওয়াল গাত্রে শিব-দুর্গা সহ অন্যান্য কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তি খোদিত আছে। শিবমন্দিরের সম্মুখস্থ জগমোহনের মধ্য স্থলে মূল চূড়া ব্যতীত উহার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে আরও তিনটি চূড়া আছে। দণ্ডেশ্বর শিবমন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মহামায়ার মন্দিরটি উল্লিখিত মন্দিরের অনুরূপ, তবে উচ্চতায় সামান্য ছোট। উভয় মন্দিরই পশ্চিমমুখী এবং মন্দির প্রাঙ্গণ ফুলগাছ দ্বারা শোভিত। কথিত আছে, কর্ণগড়ের রাজা কর্ণকেশরী সিং কর্তৃক এই মন্দিরদ্বয় স্থাপিত এবং তাঁহারই নামানুসারে এই স্থান কর্ণগড় নামে পরিচিত।

শিবমন্দিরের গর্ভগৃহের মেঝের উপর স্থাপিত উত্তর-দিকে প্রসারিত প্রস্তর নির্মিত একটি বৃহৎ গৌরী পট্টের মধ্যস্থলে প্রায় ১০" ইঞ্চি গোলাকার ব্যাসার্ধযুক্ত অন্ধকার গর্ভের মধ্যে দণ্ডেশ্বর নামে খ্যাত অনাদি লিঙ্গ নিহিত আছেন। শিবমন্দির সংলগ্ন জগমোহনের মধ্যে মূল মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটি প্রস্তর নির্মিত বেদী আছে। কথিত আছে দক্ষিণ পার্শ্বের বেদীর উপর বসিয়া কবি রামেশ্বর তাঁহার শিবায়ন কাব্য রচনা করেন এবং উত্তরদিকের বেদীর উপর খড়্গেশ্বর নামে খ্যাত প্রায় আড়াই ফুট উচ্চ গৌরীপট্ট সহ যে শিবলিঙ্গটি দেখিতে পাওয়া যায় উহা কবি রামেশ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

মহামায়ার মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে একটি দেবীর উপর প্রস্তরের খোদিত পাশাপাশি দুইটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। (মুখমণ্ডল বিশেষ এবং শাড়ী কাপড় দ্বারা সজ্জিত মূর্তি) মূর্তি দুইটি সম্পূর্ণ সিঁদুর রঞ্জিত এবং উহাদের শিল্পকর্ম সূক্ষ্ম নহে। মুখমণ্ডল দুইটির উপর রোপ্য ও স্বর্ণপাত দ্বারা ভ্রূ ও ত্রিনয়ন লাগান হইয়াছে। উহাদের মধ্যে উচ্চতায় কিঞ্চিৎ বৃহদাকারের মূর্তিটি মহামায়ারূপে এবং উহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অপর মূর্তিটি বিজয়া দেবীরূপে যথাক্রমে বগলা ও চণ্ডীর ধ্যানে নিত্য পূজা হয়। ইহা ভিন্ন, মন্দির অভ্যন্তরে একটি পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপিত আছে। মন্দিরে রক্ষিত দেবী যন্ত্রের উপর পুরোহিত নিত্য পূজাদি করেন। দেবী যন্ত্র সাধারণের দর্শনীয় নহে। মন্দিরের বাহিরের চত্বরের উপর প্রায় তিন ফুট উচ্চ একটি প্রস্তর স্তম্ভ আছে; স্তম্ভটিকে 'রুধির পাত্র' বলা হয় এবং উৎসব উপলক্ষে পশুবলি দিয়া উহার কর্তিত মুণ্ড উক্ত রুধির পাত্রের উপর স্থাপন করিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়।

মহামায়ার মন্দিরের ঠিক পশ্চাৎ ভাগে একটি পবিত্র কুণ্ড আছে। কয়েকটি সিঁড়ি বাহিয়া কুণ্ডে নামিতে পারা যায়। দণ্ডেশ্বর শিবমন্দিরের শিবের উদ্দেশ্যে ভক্তরা যে জল ও দুগ্ধ ঢালিয়া থাকেন উহা একটি সুড়ঙ্গ পথে এই কুণ্ডে আসিয়া সারা বৎসর সঞ্চিত হয় এবং ভক্তরা উহা চরণামৃতরূপে পান করিয়া থাকেন। বৎসরান্তে একবার কুণ্ডটিকে সংস্কার করা হয়।

শিবকুণ্ডের নিকট সমতল ছাদ বিশিষ্ট একটি ঘরে বেদীর উপর মহামায়া মূর্তির অনুরূপ, তবে উচ্চতায় কিঞ্চিৎ বৃহৎ

আর একটি দেবীর মুখমণ্ডল স্থাপিত আছে। ইনি যোগ-মায়া দেবী বলিয়া কথিত এবং ভগবতীর ধ্যানে নিত্য পূজা হইয়া থাকে। যোগমায়া মন্দিরের সম্মুখেও একটি রুধির পাত্র প্রতিষ্ঠিত আছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে দণ্ডেশ্বর শিবমন্দিরের চারিদিক সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্ঠিত। ইহার পশ্চিমদিকে শিব-মন্দিরের সমন্তরালে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের ত্রিতল বিশিষ্ট মূল তোরণ দ্বার আছে। তোরণ দ্বারটি প্রস্তর দ্বারা একটি সুন্দর মন্দিরাকারে নির্মিত। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ এই উভয় দিক দিয়া সংকীর্ণ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আরোহণ করা যায়। এই তোরণ দ্বারটিকে 'যোগী খোপা' বা যোগ মণ্ডপ বলা হয়। মহামায়ার মন্দিরে যে-সকল সাধকেরা শক্তি সাধনার জন্য আসেন তাঁহারা প্রথমে এই যোগ মণ্ডপের ত্রিতলে বসিয়া যজ্ঞ ও যোগসাধন করিয়া থাকেন।

পশ্চিমদিকের উল্লিখিত তোরণ দ্বার ব্যতীত পূর্ব দিকে অর্থাৎ ঠিক শিবমন্দিরের পশ্চাতে নহবৎখানা সহ আর একটি প্রবেশদ্বার আছে। বর্তমানে জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় এই প্রবেশদ্বারটি ব্যবহার করা হয় না। ইহা ভিন্ন, উত্তর-দিকে প্রাচীর ভেদ করিয়া পার্শ্ববর্তী একটি বৃহৎ পুষ্করিণীতে যাতায়াতের পথ আছে। পুষ্করিণীটি প্রাচীন এবং উহার চারিপাশের পাড় ভাঙ্গিয়া প্রায় সমতল হইয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে প্রায় চার-পাঁচ হাজার নরনারী এই পুষ্করিণীতে পুণ্যস্নান করিয়া থাকেন এবং তদুপলক্ষে পুষ্করিণীর পাড়ে দেবোত্তর জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলায় আগত ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে প্রতি বৎসর শতাধিক টাকার খাজনা আদায় হয় এবং ঐ অর্থ মহামায়ার সেবা-পূজার নিমিত্তে ব্যয় হইয়া থাকে।

মহামায়া দেবীর নিত্য অন্নভোগ দ্বারা পূজা ব্যতীত শারদীয়া সপ্তমী হইতে দশম তিথি পর্যন্ত চারদিনব্যাপী কুষ্মাণ্ড ও ছাগবলিসহ সাড়ম্বরে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া; প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শেষ শনিবার আশপাশের কয়েকটি গ্রামের লোকজনেরা সর্বজনীনভাবে অন্নভোগ দিয়া মহামায়ার পূজা দিয়া থাকেন; ইহাকে 'দেশ পূজা' বলা হয়। দণ্ডেশ্বর শিবের নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে সারারাত্রিব্যাপী হোম-পূজাদি হইয়া থাকে এবং বহু লোকজনের সমাগম হয়। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে নানাস্থান হইতে বহু সাধু-সন্ত দণ্ডেশ্বর শিব ও মহামায়ার মন্দির দর্শনে আসেন। বর্তমানে নাড়াজোলের রাজ পরিবার উল্লিখিত মন্দিরদ্বয়ের সেবায়েত। তাঁহারাই উল্লিখিত দেব-দেবীর নিত্য পূজা ও উৎসবাদির ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। বর্তমান পূজারী সাবর্ণ গোত্রীয় শ্রীবিজয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে পূজাদি করিতেছেন।

দণ্ডেশ্বর শিবমন্দিরের পিছন দিকে মাকড়া পাথর নির্মিত একটি প্রাচীন বেদীর উপর গত ২৯শে পৌষ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর শাখা কর্তৃক কবি রামেশ্বরের একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে।

ইহা ভিন্ন, এই গ্রামে একটি জগন্নাথদেবের মন্দির ও একটি শীতলামন্দির আছে। শীতলামন্দিরে শীতলা ও কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। নিত্য পূজা ব্যতীত বৈশাখ মাসে শীতলামন্দিরে বার্ষিক উৎসব হয়। জগন্নাথমন্দিরে জগন্নাথদেবের দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময় উৎসব ও রথটানা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কর্ণগড় গ্রামে প্রবেশ পথে গড়ের সন্নিকটে চারচালা গঠনের একটি প্রাচীন বৃহৎ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মূল মন্দির ও উহার উপস্থিত চূড়াটি অদ্যাপি অটুট আছে, তবে চারিদিকের চালাগুলি সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং চারিদিকে বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। মন্দিরটির চারিদিকের দেওয়াল গাত্র এক কালে অতি সুন্দর পোড়া মাটির শিল্পকর্ম দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল, এখনও দেওয়াল গাত্রের নানা স্থানে উহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরটি কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত হইয়াছিল আজ আর তাহা জানিবার উপায় নাই; তবে কর্ণগড়ের রাজ পরিবার ব্যতীত এই ব্যয়বাহুল্য মন্দির যে অন্য কেহ নির্মাণ করেন নাই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

মেলা বিবরণী

কালষণ্ডাপূজার মেলা

দেউলী গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে কালষণ্ডাঠাকুরের উৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় দশ বিঘা পতিত জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

জলহরি, মৌপাল, সাতপাটী, ভুরষা, গোদাপিয়াশাল, লালগড় প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে প্রায় তিন হাজার নরনারী প্রধানতঃ গরুর গাড়ী, সাইকেল ও মোটরবাসে করিয়া মেলায় আসেন।

শালবনী, লালগড়, মেদিনীপুর শহর, গোদাপিয়াশাল, চন্দ্রকোণা, পীরকাঁটা প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে বিক্রেতাগণ আসেন। শতাধিক দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী এবং পিতল-কাঁসার বাসনপত্রের দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া, ছাতনী, যশপুর, মেদিনীপুর শহর, চামিটাতলা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির পুতুল-খেলনা প্রভৃতির আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। মেলায় নাগরদোলা আসে।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

ডাঙ্গরপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় চার-পাঁচ বিঘা জমির উপর সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্রাধিক নরনারী মেলায় আসেন। যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান। যাত্রীরা সাধারণতঃ গরুর গাড়ীতে, সাইকেল রিক্সায় ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলার বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ মেদিনীপুর শহর, কোরাণীচট্টী, গোদাপিয়াশাল, ভাদুতলা, গোবরডাঙ্গা, আনন্দপুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে ও কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাঁচ ও এলুমিনিয়মের বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, সস্তার বই-ছবি, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও নানাপ্রকার শিল্পসামগ্রী প্রভৃতি আমদানী হয়। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য খেলাধূলা, নাগরদোলা ও লটারী খেলার দল আসে এবং কবিগান, কীর্তনগান, সাঁওতালীনাচ ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় দুই সহস্রাধিক নরনারীর সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ডাঙ্গরপাড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত সরস্বতীপূজার মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

জলহরি গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে বুড়াশিবের গাজন উপলক্ষে সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। ইহা সাধারণতঃ বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে আরম্ভ করিয়া ২রা জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত প্রত্যহ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে। মেলাটি মন্দির সংলগ্ন প্রায় কুড়ি বিঘা জমির উপর বসে। ইহা বহুদিনের প্রাচীন।

প্রধানতঃ কালীজোরা, ডমডিহা, লালগড়, ধানমারী, পীরাকাটা, সাতপাটী, ঘাটাল, গড়বেতা, বেতুয়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয়। তাঁহাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী।

মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে মিষ্টান্ন ও শিল্পজাত দ্রব্য সম্ভার লইয়া মেলায় আসেন। মেলায় দুই শতাধিক দোকান বসে। তন্মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, পিতল-কাঁসা ও কাঁচের বাসনপত্র, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দোকানের সংখ্যা বেশী। তাহা ছাড়া, স্থানীয় গ্রামবাসীদের তৈয়ারী বাঁশ ও বেতের জিনিসপত্র, কাঠের পুতুল, মাটির খেলনা ইত্যাদি আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য দুইদিন যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামেই যাত্রার দল আছে। এই অনুষ্ঠানে প্রায় সাত-আট-শত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

ভীম একাদশীর মেলা

বিষ্ণুপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ভীম একাদশী উপলক্ষে গ্রামের উপকণ্ঠে জনৈক গ্রামবাসীর আমবাগানে সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র দশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় দুই হাজার নরনারী গরুর গাড়ীতে, সাইকেলে ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

শালবনী, চন্দ্রকোণা, নয়াবসত, গড়বেতা, মেদিনীপুর, গোয়ালতোড়, আনন্দপুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকান বসে ও কতিপয় ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী ও কাপড়চোপড়ের দোকান ব্যতীত সস্তার বই-ছবি, মাটির পুতুল-হাঁড়িকুড়ি, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র ও পিতল-কাঁসার বাসনপত্র ইত্যাদি আমদানী হয়। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে এবং জুয়া খেলা হয়।

শিবরাত্রির মেলা

দেবগ্রাম গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা জমির উপর সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল ব্যতীত শালবনী থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ প্রধানতঃ গরুর গাড়ীতে ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

গোয়ালতোড়, হীরাশোল, নাগদানা, শালবনী, বাবুইবাসা প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে প্রায় প্রতি বৎসর বিক্রেতাগণ আসেন। মেলায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনিহারী দোকান ব্যতীত অন্যান্য জিনিস-পত্রের কয়েকটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য প্রধানতঃ কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে সহস্রাধিক দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।



গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : সাঁকরুই। ১৬।৭৭৩'২০।৬৭।৩৬৪

(ক) সদ্গোপ, কামার, বাগ্দী, লায়েক, মাঝি ও আদিবাসী। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে। যেমন—সদ্গোপ-পাড়া, কামারপাড়া, বাগ্দীপাড়া, লায়েকপাড়া, মাঝিপাড়া ও আদিবাসীপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও দিনমজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শালবনী হইতে মোটর-যোগে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব এবং ভাদ্র মাসে মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সবগুলি উৎসবই প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি শীতলামন্দির আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক, শিক্ষক,
গ্রাম : সালিদিহা, পোঃ-সাহাসপুর,
মেদিনীপুর।

২। গ্রাম : বেল্যা মহারাজপুর (মৌজা : মহারাজপুর)। ১৯।১,০৯১'৫৪।৬৭।৩৬০

(ক) সদ্গোপ, কামার, তাঁতী, লায়েক, সাঁওতাল ও মুসলমান। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে। যেমন—ঘোষপাড়া, মিদ্দেপাড়া, কামারপাড়া, তাঁতীপাড়া, লায়েক-পাড়া, সাঁওতালপাড়া ও মুসলমানপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শালবনী। চন্দ্রকোণা রোড হইতে একটি কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। চন্দ্রকোণা রোড দিয়া মোটরবাস ও সাইকেল রিক্সা যাতায়াত করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সরস্বতীপূজাটি প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি স্থানীয় অঞ্চলে 'ষষ্ঠীর মেলা' নামে পরিচিত এবং প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন একটি হরি-মন্দির আছে এবং মাত্র দশ বৎসর হইল একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছে।

শ্রীমহম্মদ দাউদ আলি খাঁন, শিক্ষক,
বেল্যা মহারাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম : কানা শোল। ৮১।৫৭০'২৫।১৪৭।৭০৮

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, নাপিত, কামার ও মাঝি।

(খ) কৃষিকার্য ও দিনমজুরী।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন গোদাপিয়াশাল। গ্রামের নিকট দিয়া মেদিনীপুর শহর হইতে পুরী-রাণীগঞ্জ রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে। ষ্টেট্ রিলিফের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে ঝাড়েশ্বর শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহব্যাপী। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ইষ্টক নির্মিত সুউচ্চ একটি পঞ্চরত্ন মন্দিরে ঝাড়েশ্বর নামে খ্যাত প্রাচীন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটির ক্ষেত্রফল ত্রিশ বর্গফুট এবং উচ্চতায় সাড়ে সাতষট্টি ফুট। শিবমন্দিরের উত্তরে অষ্টস্তম্ভ বিশিষ্ট 'লেত নালা' এবং মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে 'ভোগশালা' আছে। শিবমন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে টিনের ছাউনীযুক্ত নাটমন্দিরের দেওয়াল গাত্রে অষ্টাদশভুজা দুর্গা দেবীর প্রতিমূর্তি অঙ্কিত আছে। নাটমন্দিরের সন্নিকটে পশ্চিম-দিকে মহাকাল ভৈরব এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পঞ্চানন্দের নির্দিষ্ট স্থান আছে। ইহা ছাড়া, গ্রামে একটি শীতলা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীদুর্গাপদ বক্সী, শিক্ষক,
কানা শোল প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম : পারুলিয়া। ১০১।২২১'৮২।৭২।৩৩৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, সদ্‌গোপ, মাঝি, বাগ্‌দী, লায়েক ও সাঁওতাল। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে। যেমন—বাগ্‌দী-পাড়া, মাঝিপাড়া, সাঁওতালপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মেদিনীপুর। ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা ধরিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে রাসযাত্রা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ও চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, ঝুলনযাত্রা উৎসব এবং প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর চব্বিশ-প্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব এবং বৎসরের যে-কোন সময় গ্রাম-বাসীর সুবিধা অনুযায়ী শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি দামোদরজীউর মন্দির আছে। তাহা ছাড়া, টীনের ছাউনীযুক্ত একটি ঘরে একত্রে শীতলা এবং মহাপ্রভুর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ, একটি মনসা, একটি শীতলা এবং চারটি বাবাঠাকুর আছে।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ ঘোষ, শিক্ষক,
পারুলিয়া উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যাপীঠ,
পোঃ পড়গুড়া, মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম : নেড়া দেউল (মৌজা : তলকুঁয়াই)। ২০০।২৫৬'২৬।১২৮।৬৬৮

(ক) বর্ণ হিন্দু ও তপশীলভুক্ত হিন্দু।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শালবনী। গ্রামের মধ্য দিয়া বর্ধমান রোড যাওয়ার মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করিবার সুবিধা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে লক্ষ্মীজনাদন-জীউর রাসযাত্রা উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে কামেশ্বরনাথজীউর গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাসযাত্রা উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তি হইতে আটদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে কামেশ্বরনাথজীউ নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ ব্যতীত তিনটি শীতলার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শোনা যায়, সুদূর অতীতকালে মেদিনীপুর জেলার কেশপুর ও শালবনী থানার অন্তর্গত অঞ্চল গভীর বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোকজন এই স্থানের বন-জঙ্গল কাটিয়া কিছু পরিমাণ জমি চাষোপযোগী করিয়া বসবাস সুরু করেন। পরে বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন আসিয়া তাঁহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং ক্রমে এই স্থানের ভূস্বামী হইয়া বসেন। অতীতে এই অঞ্চল 'রাঢ় দেশ' নামে অভিহিত হইত। রাজা উমাপতি দেবভট্ট নামে জনৈক ভূস্বামী কামেশ্বরনাথজীউর মন্দির নির্মাণ করিতে সুরু করেন কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে মন্দিরের চূড়াটি অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। অনেকের ধারণা সেই কারণে গ্রামের নাম 'নেড়া দেউল' হইয়াছে।

শ্রীরামধেনু রায়, শিক্ষক,
গ্রাম : তলকুঁয়াই, মেদিনীপুর।

নেড়া দেউল মন্দির সম্পর্কে শ্রীযোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার "মেদিনীপুরের ইতিহাস" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণভূম পরগণার উত্তর সীমায় 'নেড়া দেউল' নামে একটি প্রাচীন মন্দির আছে। ঐতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের অনুমান 'নেড়া' শব্দ 'রাঢ়া' শব্দের অপভ্রংশ (গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৬৩)। আমরাও তাই মনে করি। নেড়া দেউল চন্দ্রকোণা পরগণার দক্ষিণ সীমায় কোডাই নদীর পরপারে অবস্থিত। কোডাই নদীর দক্ষিণ হইতেই ব্রাহ্মণভূম পরগণা আরম্ভ। ......এক সময় মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত চন্দ্রকোণা প্রভৃতি পরগণা রাঢ় দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং উহার দক্ষিণ হইতে উড়িষ্যার সীমা আরম্ভ হইয়াছিল। আইন-ই-আকবরীতেও দেখা যায়, সে সময় চন্দ্রকোণা বাঙ্গালার সরকার মান্দারণের এবং ব্রাহ্মণভূম সরকার জলেশ্বরের অন্তর্ভূত ছিল। ঐ মন্দিরটি রাঢ় দেশেরই শেষ সীমায় নির্মিত হওয়ায়, উড়িষ্যা হইতে পৃথক করিবার জন্য উহাকে 'রাঢ় দেউল' নামে পরিচিত করা হইয়া থাকিবে। আর সেই কারণেই, রাঢ় হইতে পৃথক বলিয়া ব্রাহ্মণভূমের ও 'আরাঢ়া ব্রাহ্মণভূম' (রাঢ় নয়) নামাকরণ হইয়াছিল বলিয়া

আমাদের বিশ্বাস। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত ভ্যানডেন ব্রুকের মানচিত্রে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সীমান্তে চিতুয়া বরদার পশ্চিমে মন্দিরাকৃতি একটি চিত্র অঙ্কিত আছে দৃষ্ট হয়। ('West of Barada a monument is drawn to make the frontier between West Bengal and Orissa'—Professor Blockman's Notes in Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. I, p. 376.) আমাদের অনুমান, উহা ঐ নেড়া দেউল বা রাঢ়া দেউলের চিত্র"।

৬। গ্রাম ঃ আনন্দপুর। ৩৭৮।৬২৪'৮৬।৮৪৮।৫,০৬২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, জেলে, নাপিত, স্বর্ণকার, গোয়ালা, তামলী, গন্ধবেনে, মুচি, মেথর, কলু, কামার, কুমার, হাড়ী, বাউরী, ময়রা, ধোপা, ডোম ও তাঁতী। গ্রামটি তাঁতী প্রধান বলিয়া জানা যায়। গ্রামে উনিশটি পাড়া আছে। যেমন—বৈরাগীপাড়া, স্যাকরাপাড়া, কায়স্থ-পাড়া, জেলেপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, বাউরীপাড়া, তেলীপাড়া, হাড়ীপাড়া ও ডোমপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য, তাঁতশিল্প ও কুটিরশিল্প।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন গোদাপিয়াশাল। গ্রামের পশ্চিমদিকে রেলস্টেশনে যাতায়াতের একটি পাকা রাস্তা আছে। এই রাস্তা দিয়া প্রতিদিন দুইখানি মোটরবাস গোদাপিয়াশাল হইয়া মেদিনীপুর পর্যন্ত যাতায়াত করে। ইহা ভিন্ন, গ্রামের পূর্বদিক হইতে গোদাপিয়াশাল রেল-স্টেশন হইয়া কেশপুর যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে চব্বিশপ্রহর-ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা, পৌষ মাসে পৌষপার্বণ, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, হাউড়ি মায়ের পূজা, বীর ঝাপট উৎসব এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলির মধ্যে দুর্গাপূজা এবং সরস্বতীপূজা প্রায় একশত বৎসরের, লক্ষ্মীপূজা, মহোৎসব, পৌষপার্বণ ও রথযাত্রা প্রায় দেড় হইতে দুইশত বৎসরের এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

বীর ঝাপটের মেলা। পৌষসংক্রান্তিতে একদিন। এই মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি শীতলামন্দির, একটি গ্রাম্য দেবী হাউড়ি মায়ের মন্দির, একটি মনসার মন্দির এবং একটি গোপালজীউর মন্দির আছে। তাহা ছাড়া, আটচালাযুক্ত হরিসভা ঘর এবং শীতলার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীনিতাই চরণ লেকড়ী, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ আনন্দপুর,
মেদিনীপুর।

৭। গ্রাম ঃ নূতনবাজার। ৪০০।২২১'৫০।৯৮।৫১৭

(ক) ব্রাহ্মণ, তিলি, বারুজীবী, কামার, সদ্গোপ, মাহিষ্য ও মাঝি। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে। যেমন—বারুজীবীপাড়া, কামারপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন গোদাপিয়াশাল হইতে মোটরযোগে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব, আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী উৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ও হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব এবং চৈত্র মাসে শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, মাঘ মাসে 'বড়ামপূজা' এবং 'ভাঙসিং-পূজা' অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের এই উৎসবগুলি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ভাঙসিংয়ের মেলা। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে হরিমন্দির, শীতলামন্দির, মনসামন্দির, বিষ্ণুমন্দির, সরস্বতীমন্দির ব্যতীত বড়ামঠাকুর, ভাঙসিং-ঠাকুর, পাঁচটি বাবাঠাকুর, একটি শীতলা, চারটি মনসা এবং একটি সর্বমঙ্গলাদেবীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

গ্রামটির পূর্ব নাম ছিল নয়াগ্রাম। পরবর্তীকালে এই স্থানে দৈনিক বাজার প্রবর্তন হইবার পর ইহার নামটি নূতনবাজার হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস মণ্ডল, চাকুরী,
নূতনবাজার, মেদিনীপুর।

৮। গ্রাম ঃ ধলহরা। ৪৪৭।৪২৩'৪৬।৭০।৩০১

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, বাগ্দী, ডোম, লায়েক, তামলী, দলুই, হাড়ী, মুচি ও সাঁওতাল। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে। যেমন—হাড়ীপাড়া, মুচিপাড়া, সাঁওতালপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে মেদিনীপুর রেলস্টেশন অবস্থিত। রেলস্টেশন হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখসংক্রান্তিতে গাজন উৎসব এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে বটেশ্বর শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৩৩০ বঙ্গাব্দ হইতে বটেশ্বর শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া জানা যায়। তাহা ছাড়া, বৎসরে দুইবার শীতলাপূজা হয়।

(ঙ) বটেশ্বর শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা। চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহব্যাপী। মেলাটি ১৩৩০ বঙ্গাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, প্রতি বৎসর বৈশাখ-সংক্রান্তিতে গাজন উৎসব উপলক্ষেও এই গ্রামে একটি মেলা বসে।

(চ) গ্রামে বটেশ্বর শিবমন্দির ছাড়া আর একটি প্রাচীন শিবমন্দির ও একটি গৌরীমন্দির আছে।

গ্রামে প্রস্তর নির্মিত একটি সুবিশাল মন্দিরে বটেশ্বর শিব নামে খ্যাত প্রায় ৩ হাত উচ্চ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবলিঙ্গের সহিত বেষ্টিত গৌরীপট্টটি প্রায় সাত হাত দীর্ঘ। মন্দিরের দেওয়াল গাত্র নানারূপ শিল্পকর্ম দ্বারা অলঙ্কৃত। শিবমন্দিরটি অতি প্রাচীন। শিবের নিত্য সেবা-পূজার জন্য কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিং প্রায় ১০৮ বিঘা জমি দেবোত্তর স্বরূপ দান করেন।

গ্রামের গৌরীমন্দিরটি পাগলীমাতা নামে খ্যাত একজন সিদ্ধ পুরুষ তাঁহার শিষ্যগণের নিকট হইতে আদায়কৃত অর্থের দ্বারা নির্মাণ করান। মন্দিরটি প্রায় সত্তর-আশি হাত উচ্চ। কালীপূজার সময় দেবীর বিশেষ পূজা ও বলি হয়।

শ্রীবিজয় কুমার চক্রবর্তী, শিক্ষক,
ধলহরা পাগলীমাতা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ পড়ওড়া, মেদিনীপুর।

উৎসব বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

কানা শোল গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে ধূমধামের সহিত ঝাড়েশ্বর শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইষ্টক নির্মিত সুউচ্চ একটি পঞ্চরত্ন মন্দিরে ঝাড়েশ্বর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটির ক্ষেত্রফল ত্রিশ বর্গফুট এবং উচ্চতা সাড়ে সাতষট্টি ফুট। ইহার উত্তরে অষ্টস্তম্ভ বিশিষ্ট 'লেত নালা', পশ্চিমে 'ভোগশালা' এবং দক্ষিণে টিনের ছাউনীযুক্ত একটি নাটমন্দির আছে। নাটমন্দিরের দেওয়াল গাত্রে অষ্টাদশভুজা একটি দুর্গামূর্তি খোদিত আছে।

ঝাড়েশ্বর শিব বিশেষ জাগ্রত দেবতা বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। শোনা যায়, ১০৩৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে কলিকাতা নিবাসী শীতলানন্দ মিত্র নামে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই গ্রামে একটি বটগাছের নীচে মাটি খনন করিয়া উক্ত শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হন এবং তদবধি শিবের নিত্য পূজাদি হইতেছে। এইক্ষেত্রেও গাভী কর্তৃক শিবলিঙ্গের মস্তকে দুগ্ধদানের বহুল প্রচলিত কিংবদন্তীটি শুনিতে পাওয়া যায়। আর শোনা যায় যে, মেদিনীপুর জেলার গড় আড়রার রাজা আলাল নাথ দেব স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শিবের নিত্য পূজার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া দেন। আলাল নাথ দেব রাজা বাঁকুড়া দেবের বংশধর। কথিত আছে, বাঁকুড়া দেবের আশ্রয়ে থাকিয়া কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ঝাড়েশ্বর শিব বিশেষ জাগ্রত দেবতা। এই কারণে মেদিনীপুর জেলার নানা স্থান হইতে বহুলোক রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের জন্য মন্দিরে নানারূপ মানসিক করিয়া থাকেন। ভাঙ্গাবাধ নিবাসী রামনারায়ণ জানা মহাশয় ঝাড়েশ্বরের নিকট মানসিক করিয়া শূলরোগ

হইতে আরোগ্যলাভ করেন এবং তদনুসারে ১২৪১ বঙ্গাব্দের ৯ই জ্যৈষ্ঠ বর্তমান পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়া দেন। তৎপূর্বে একটি চালাঘরে উক্ত শিবঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কেশপুর থানার অন্তর্গত বেঁতলা গ্রামের জমিদার স্বর্ণময় সনাতন চৌধুরী মহাশয়ের মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়ায় ১২১৮ বঙ্গাব্দে শিবের 'ভোগঘর' এবং অষ্টস্তম্ভ বিশিষ্ট 'লেত নালা' নির্মাণ করেন। শিবের নিকট মানত জানাইয়া শ্রীমতী গৌরী দেবী শিবলিঙ্গের সহিত বেষ্টিত গৌরীপট্টটি রৌপ্যপাত দ্বারা মণ্ডিত করাইয়া দেন।

প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের ১৫ই তারিখের পর প্রথম শনি বা মঙ্গলবার ঘট স্থাপন করিয়া উৎসবের সূচনা হয়। এইদিন একটি সর্বজনীন ভোজের আয়োজন করা হয়। ঘট স্থাপনের পর হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রত্যহ যথারীতি পূজা এবং 'হিন্দোল সেবা' ও 'দন্ত চালান' নামে পর্ব পালন করা হয়। ইহা ভিন্ন, সংক্রান্তির পাঁচদিন পূর্ব হইতে প্রত্যহ 'কালিকা তোলা', 'মাথা চালা', 'মানিক বেড়', 'দন্ত ডাক', 'বেতভাঙ্গা', 'কাঁটাভাঙ্গা', 'কলাকাটা', আগুন ঝাঁপ' প্রভৃতি বিবিধ পর্ব সন্ন্যাস ব্রতীরা পালন করিয়া থাকেন। গাজন উৎসব উপলক্ষে বহু ভক্ত সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বীর ঝাপট পূজা

(গ্রাম্য দেবী)

আনন্দপুর গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে স্থানীয় হাড়ী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ 'বীর ঝাপট' নামে এক গ্রাম্য দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। গ্রামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে দেবীর শীলা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বিশ্বাস, এই দেবীর পূজা করিলে কোনরূপ রোগ-ব্যাধির আক্রমণ ও দৈব দুর্ঘটনা হয় না। এই পূজার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, পূজারম্ভের পূর্বে দেবীর মস্তকোপরে পর পর তিনবার 'ফুল চাপান' হয়। ফুল-বেলপাতাগুলি দেবীর মস্তক হইতে আপনা আপনি খসিয়া পড়িলে পূজার অনুমতি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফুল-বেলপাতাগুলি খসিয়া পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত অনবরত দেবীর মুখে বোতল বোতল মদ ঢালা হয়। এই মদ গড়াইয়া মূর্তির নিকট একটি গহ্বরে জমা হয় এবং একটি নালা দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে। সেখান হইতে পাত্রে ধরিয়া ঐ মদ দেবীর প্রসাদরূপে ভক্তরা পান করিয়া থাকেন। 'ফুল চাপান' পর্বের পর যথারীতি পূজা আরম্ভ হয়। দেবীর নিকট বরাহ, ছাগ, মোরগ ইত্যাদি মানত স্বরূপ বলি দেওয়া হয় এবং উহা ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। উৎসবটি প্রাচীন।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

কানা শোল গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহব্যাপী ঝাড়েশ্বর শিবের গাজন উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে দেবোত্তর জমির উপর একটি বৃহৎ মেলা বসে। মেলাটি তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মেদিনীপুর জেলার কেশপুর, দাঁতন, ঘাটাল, মেদিনীপুর, সবঙ্গ, শালবনী, কেশিয়াড়ী প্রভৃতি থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় ত্রিশ হাজার নরনারী প্রধানতঃ ট্রেন, মোটরবাস ও গরুর গাড়ী করিয়া মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ এবং নারীর সংখ্যা প্রায় সমান।

মেলায় প্রায় তিনশত দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। প্রধানতঃ ময়রা, মনিহারী, কাঁসার বাসনপত্র, পাথরের থালা-বাটি, শীল-নোড়া, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, মাদুর, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল প্রভৃতি নানাবিধ জিনিসপত্রের দোকান বসে। উহাদের মধ্যে মাদুর ও পাথরের জিনিসপত্র বেশী আমদানী হয়। বিক্রেতারা মেদিনীপুর শহর, সবঙ্গ, ঘাটাল, শালবনী, আনন্দপুর, নাড়াজোল, ঝলেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক ও লটারী খেলার দল আসে এবং কবিগান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়। তাহা ছাড়া, কেশপুর থানার আমগেড়্যা নামক গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসর শিবায়ণ

গানের দল আসে। এই সকল অনুষ্ঠানে অগণিত নরনারীর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।

কানা শোল গ্রামে ঝাড়েশ্বর শিবের গাজন সম্পর্কে ও'ম্যালি কৃত 'Midnapur District Gazetteer' গ্রন্থে লেখা হইয়াছে—

"At Kanasol, there is a temple of Jhareswar (Siva), which is visited by a large number of people during the Charak Puja at the end of Chaitra".

ধলহারা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির শেষ সপ্তাহব্যাপী বটেশ্বর শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন প্রায় চার-পাঁচ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি ১৩৩০ বঙ্গাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

আশপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে মেলার যাত্রীরা আসেন এবং ময়রা, মনিহারী, কাপড়চোপড়, বাসনপত্র, খেলনা-পুতুল ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে। ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় প্রায় প্রতি বৎসর যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং অনেকে জুয়া খেলেন। প্রায় তিন-চার হাজার দর্শক যাত্রাভিনয় দেখিতে আসেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ধলহারা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ-সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত গাজনের মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

রথযাত্রার মেলা

আনন্দপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে গোপাল-জীউর রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে চকবাজারের রাস্তার দুই ধারে প্রায় দুই বিঘা সরকারী জমির উপর রথযাত্রা এবং উল্টো রথযাত্রার দিন একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

কানা শোল, শৌলা, কদমপাট, পাচরা, লাউড়া, কেশপুর, নূতনবাজার, রেণুয়াচ, নাগদা, তেঘরী, মেজুয়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারী মেলায় আসেন।

মেলায় খাবার, মনিহারী, কাপড়চোপড়, খেলনা-পুতুল এবং আম, আনারস, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলাদির মোট ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে। অধিকাংশ বিক্রেতাই আশপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য— আনন্দপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত বীর ঝাপটের মেলাটি উল্লিখিত রথযাত্রার মেলার অনুরূপ। তবে মেলায় উল্লিখিত ফলাদির দোকানপাটগুলি বসে না।

রাসযাত্রার মেলা

নেড়া দেউল গ্রামে প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া আটদিনব্যাপী কামেশ্বরনাথজীউর রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে সরকারী এবং উপাস্য দেবতার প্রায় পঁচিশ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

কেশপুর, শালবনী, চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, গড়বেতা, মেদিনীপুর প্রভৃতি থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রতিদিন গড়ে প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। প্রধানতঃ মোটরবাস, গরুর গাড়ী করিয়া ও হাঁটিয়া যাত্রীরা মেলায় আসেন।

ঘাটাল, খড়ার, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, আনন্দপুর, গড়বেতা, শালবনী, কেশপুর, মেদিনীপুর, নাড়াজোল, খড়্গপুর এমন কি কলিকাতা হইতেও মেলায় ব্যবসায়ীরা আসিয়া থাকেন। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ, কাঁসা-পিতলের বাসনপত্র, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের প্রায় দুইশত দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য প্রায় প্রতি বৎসর নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে এবং কোন কোন বৎসর সার্কাস ও সিনেমা দেখানর ব্যবস্থা করা হয়।

ভাওসিংয়ের মেলা
(গ্রাম্য ঠাকুর)

নূতনবাজার গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে গ্রাম্য দেবতা 'ভাওসিং'-এর পূজা উপলক্ষে গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে এক

শালবনের মধ্যে জনৈক গ্রামবাসীর প্রায় এক বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য মেলাটি বসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

কাঁচগেড়্যা, রেণুয়াড়, পাচরা, লেপস্তা, আনন্দপুর, বীরসিংহপুর, জাওড়া, শুকনাডিহা, পিড়ড়দা, আটঘরা, সোনাডিহা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রধানতঃ মাঝি, বারুজীবী, তিলি, কামার, মুচি, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত নরনারী মেলায় আসেন।

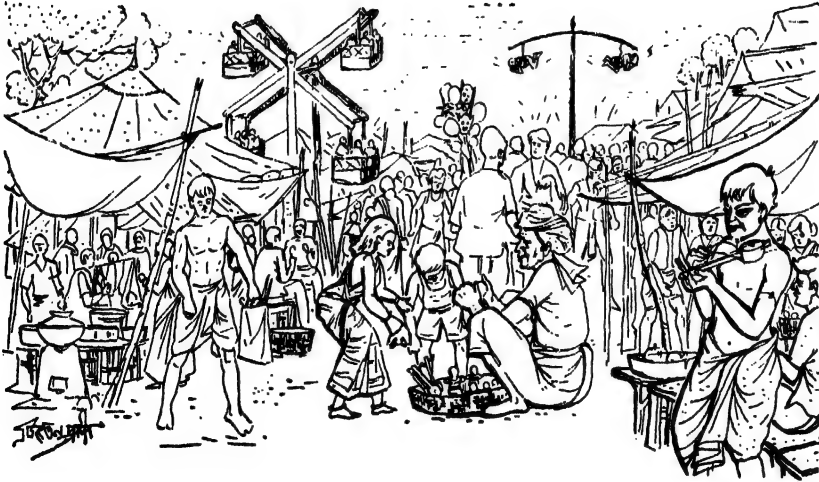
মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ আনন্দপুর, পিপুড়দা, নূতনবাজার প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসী। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, চা-পান-বিড়ি, বাদাম, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির প্রায় ত্রিশটি দোকান বসে। ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কোনপ্রকার দান বা তোলায় আদায় করা হয় না। মেলায় প্রায় প্রতি বৎসর ম্যাজিকের দল আসে এবং কোন কোন বৎসর কবিগান ও জলসার আয়োজন করা হয়।

সরস্বতীপূজার মেলা

বেল্যা মহারাজপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একদিনের জন্য মেলা বসে। মেলাটি স্থানীয় অঞ্চলে 'ষষ্ঠীর মেলা' নামে পরিচিত এবং ইহা প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

কেশপুর এবং গড়বেতা থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় আড়াই হাজার নরনারী মেলায় আসেন।

অকুলধণ্ডা, শীর্ষা, সাতশোল, শালবনী, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতাগণ প্রায় প্রতি বৎসর মেলায় আসেন। মেলায় নানাবিধ জিনিসপত্রের পঁয়ত্রিশটি দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী এবং বাসনকোসনের দোকান উল্লেখযোগ্য। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।



থানা ঃ গড়বেতা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ রূপারঘাগরা। ১৩।৬২৩'৯৩।৫৭।২৩৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বাগ্দী, কুর্মি, কলু, মাল ও সাঁওতাল। গ্রামে মোট ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও মৎসশিকার।

(গ) রেলস্টেশন গড়বেতা হইতে ষ্টেট রিলিফের কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়। বর্ষাকালে গ্রামে যাতায়াত করিতে গেলে নৌকাযোগে কাঁশাই ও শিলাইনদী পারাপার হইতে হয়। গড়বেতা রেলস্টেশন হইতে প্রায় আঠার মাইল দূর দিয়া চন্দ্রকোণা রোড চলিয়া গিয়াছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা এবং মাঘ মাসের ৪ঠা তারিখে গ্রাম্য দেবী রূপাসিনীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। রূপাসিনী দেবীর পূজাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন। দেবীর কোন মূর্তি নাই। নির্দিষ্ট স্থানে একটি প্রাচীন বৃক্ষের নীচে রক্ষিত কয়েকটি মাটির হাতী-ঘোড়াকে দেবীর প্রতীকরূপে পূজা করা হয়। উৎসবের দিন পুরোহিত উক্ত মাটির হাতী-ঘোড়াগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া সিন্দুর লেপন করেন এবং পাঠাবলি সহ নানা প্রকার নৈবেদ্য দিয়া পূজা করেন। প্রধানতঃ নিম্ন শ্রেণীর লোকজনেরাই দেবীর নিকট পূজাদি দিয়া থাকেন। বিশ্বাস রূপাসিনী দেবীর পূজা দিলে রোগ ও অপদেবতার আক্রমণের ভয় থাকে না।

(ঙ) রূপাসিনীপূজার মেলা। প্রতি বৎসর ৪ঠা মাঘ একদিন। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মনসা ও লক্ষ্মীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, একটি শিবমন্দির এবং শীতলাপূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে। উক্ত শিবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি 'ভুবনেশ্বর শিব' নামে খ্যাত। মন্দিরটি স্থানীয় মুখোপাধ্যায় পরিবার কর্তৃক স্থাপিত।

শ্রীগোবিন্দ সিংহ মহাপাত্র, শিক্ষক,
বিশারবাঁধ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ পাথরপাড়া, মেদিনীপুর।

২। গ্রাম ঃ সারেঙ্গাগড়। ৪৪।১০৭'২৯।১৭।৪৯

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, গোয়ালা, তাম্বুলী, মুচি ও সাঁওতাল। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে রানীগঞ্জ রোড দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে রাধাগোবিন্দ-জীউকে কেন্দ্র করিয়া মহোৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা এবং 'সারগার জাত' বা বংগাঠাকুরের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত উৎসবটি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের। সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারীরা প্রতি বৎসর ৩রা মাঘ হইতে সপ্তাহব্যাপী নৃত্য-গীতের মাধ্যমে এই উৎসব পালন করিয়া থাকেন। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) বংগাঠাকুরের মেলা। প্রতি বৎসর ৩রা মাঘ হইতে সপ্তাহব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শীতলামন্দির এবং একটি মনসা-মন্দির আছে।

শ্রীসন্তোষ কুমার দেব, চাকুরী,
গ্রাম ঃ কিয়াবনী, পোঃ গড়বেতা,
মেদিনীপুর
ও
শ্রীচন্দ্র মোহন দে, শিক্ষক,
লক্ষ্মণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম ঃ বেন্তকরিয়া। ৯৩।৪১৬'২১।৫৯।৩৬০

(ক) গ্রামটি আদিবাসী সাঁওতাল জাতি অধ্যুষিত বলিয়া জানা যায়। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে গড়বেতা রেলস্টেশন অবস্থিত। স্টেশন হইতে একটি পাকা রাস্তা

দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়। ইহা ভিন্ন, গ্রামের উত্তরদিক দিয়া ষ্টেট রিলিফের রাস্তা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যার পরের দিন আদিবাসী সম্প্রদায়ের সহরায়পূজা অর্থাৎ গৃহপূজা, পৌষসংক্রান্তিতে সাফরাৎ উৎসব এবং ফাল্গুন মাসে শালুইপূজা অনুষ্ঠিত হয়। যে মহান ঈশ্বর সৃষ্টি রক্ষার জন্য নিজ দেহ হইতে নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশ্যে শালুইপূজার দিন একটি শালবৃক্ষকে পূজা করা হয়।

সহরায়পূজা উপলক্ষে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রায় প্রতিটি গৃহে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে ছাগ বলি দেওয়া হয় এবং উক্ত বলির মাংস রান্না করিয়া নিমন্ত্রিত আত্মীয়স্বজনের সহিত বসিয়া একসাথে খাওয়া-দাওয়া করেন।

প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তিতে সাঁওতাল সম্প্রদায় সাফরাৎ উৎসব পালন করেন। এই দিনটিতে তাঁহারা সবাই একত্রিত হইয়া ধর্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং কোন ব্যক্তি কোনপ্রকার সমাজ বিরোধী কর্ম করিলে তাহার বিচার-নিষ্পত্তি করিয়া পরে সবাই মিলিয়া পানাহার করেন। উৎসবটি দুইদিন স্থায়ী হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রাম সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, বহু পূর্বে স্থানটি ঘন বেত বনে পরিপূর্ণ ছিল। এই বেত বন পরিষ্কার করিয়া আদিবাসী সম্প্রদায় এই স্থান বসবাসের উপযোগী করেন। বোধ হয় এই জন্যই গ্রামের নাম 'বেতঝরিয়া' হইয়াছে।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ সরেন, চাকুরী,
গ্রাম : বেতঝরিয়া, মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম : পিংবনী। ১১৮।৯২৯'৭৩।২২৫।১,১৫১

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, গন্ধবণিক, মাল, মাহিলী, বৈরাগী, কলু, ধোপা, স্বর্ণবণিক, মাহাতো, কামার, মাঝি ও সাঁওতাল। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে। যেমন—মালপাড়া, মাহিলীপাড়া, সাঁওতালপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে একটি পাকা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। তাহা ছাড়া, রামগড়-চন্দ্রকোণা রোড, সারেঙ্গা-মেদিনীপুর, সারেঙ্গা-গড়বেতা রেলস্টেশন এবং সারেঙ্গা-চন্দ্রকোণা রোড স্টেশন প্রভৃতি রুটের বাসগুলি এই গ্রামের উপর দিয়া যাতায়াত করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে জলেশ্বর শিবের-গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির তিনদিন পূর্ব হইতে জলেশ্বর শিবের গাজন উৎসব শুরু হয়। ভক্তরা সারাদিন উপবাস থাকিয়া যথারীতি শিব-পূজার পর 'হিন্দোল' পর্ব পালন করেন এবং রাত্রিকালে শিবের নিকট নিবেদিত 'মন্ডুই' ভোগ নামে একটি বিশেষ ভোগ প্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়া উপবাস ভঙ্গ করেন।

দুর্গাপূজাটি ব্যক্তিবিশেষের এবং বৈষ্ণব মতে প্রায় ষাট-সত্তর বৎসর যাবৎ অনুষ্ঠিত হইতেছে। সরস্বতীপূজাটি মাত্র আট-দশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। শিবপূজাটি বহুকালের প্রাচীন এবং ইহা ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা পরিচালিত হইলেও স্থানীয় জনসাধারণ ইহাতে যোগদান করেন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

সরস্বতীপূজার মেলা। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

জলেশ্বর শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা। চৈত্র-সংক্রান্তি হইতে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শীতলা, একটি মনসা এবং একটি পঞ্চানন্দ আছে।

শ্রীশশধর মল্লিক, শিক্ষক,
গ্রাম : পিংবনী, পোঃ গোহালতোড়,
মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম : চামচিয়া। ১৪১।৪১৪'৮৩।৯৬।৫৭১

(ক) তিলি, সদ্‌গোপ, তাম্বুলী, মাল, মুচি, বাগাল ও সাঁওতাল। তিলিপাড়া, মালপাড়া, বাগালপাড়া ও সাঁওতালপাড়া নামে গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড। গ্রামের পশ্চিমদিকে প্রায় দেড় মাইল দূর দিয়া নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে ধূমধামের সহিত কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

শোনা যায়, স্থানীয় গোবিন্দ ঘোষ নামে জনৈক ব্যক্তি একদা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া নিকটবর্তী শিলাবতী নদী হইতে একটি ঘট, খড়্গ ও যূপকাষ্ঠ পাইয়া এই স্থানে একটি চালা ঘরে প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি উক্ত ঘটে নিয়মিত কালীপূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে কার্তিকপূজা উপলক্ষে দেবীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করা হয় এবং তিনদিনব্যাপী পূজান্তে উক্ত প্রতিমা ধূমধামের সহিত শোভাযাত্রা করিয়া নিকটবর্তী জিরাপাড়া গ্রামে একটি পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং আশ-পাশের বিভিন্ন গ্রামের লোকজন ইহাতে যোগদান করেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালাযুক্ত একটি কালীমন্দির এবং দুইটি হরিমন্দির আছে। তাহা ছাড়া, গ্রামে দুইটি মনসা আছে।

শ্রীচারু চন্দ্র ঘোষ, কৃষিজীবী,
গ্রাম: চামচিয়া, পোঃ গোয়ালতোড়,
মেদিনীপুর।

৬। গ্রাম: আমলাশুলী। ১৭১।৬৬৪'৪৬।১৫০।৮১২

(ক) সাঁওতাল, শুঁড়ি, কুম্ভকার, তাম্বুলী, গোয়ালা, সুবর্ণবণিক, কলু ও মাল। গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন গড়বেতা হইতে জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিকসংক্রান্তিতে কার্তিক-পূজা ও মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ভিন্ন, শ্রীপঞ্চমী তিথিতে স্থানীয় সাঁওতাল সম্প্রদায় 'বোঙ্গাপূজা' করিয়া থাকেন।

(ঙ) বোঙ্গাপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি ছোট আকারের শিবমন্দিরে রামেশ্বর শিব নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহা ছাড়া, বুড়া কুদরা (গ্রাম্য দেবতা), চণ্ডী এবং মনসার নির্দিষ্ট স্থান আছে। মনসা দেবীর কোন মূর্তি নাই। কয়েকটি মাটির হাতী-ঘোড়াই মনসার প্রতীক।

কিংবদন্তী আছে স্থানীয় অঞ্চলের ভূস্বামীরূপে পরিচিত লায়েকরা একদা তাঁহাদের আমলা অর্থাৎ রাজ-কর্মচারীগণ বিদ্রোহ করায় তাঁহাদিগকে এই স্থানে শূলে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করেন। এই কারণে নাকি গ্রামের নাম আমলাশুলী হইয়াছে।

শ্রীভৈরব চন্দ্র বারিক, শিক্ষক,
আমলাশুলী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ পুঁইছড়া, মেদিনীপুর।

৭। গ্রাম: আষাড়গ্রাম। ২০৮।৩৮৪'৮৪ ৯৫।৩৯২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, কুমার, পোদ্দার, ছুতার, কলু, শুঁড়ি, বৈরাগী, গোয়ালা, লায়েক, বাগ্দী, মাঝি প্রভৃতি। গ্রামে মাঝিপাড়া, শুঁড়িপাড়া, পোদ্দারপাড়া, কায়স্থপাড়া, কুমারপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, বাগ্দীপাড়া, তিলি-পাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন গড়বেতা হইতে কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়। তাহা ছাড়া, নদীপথেও গ্রামে যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা নবমীতে জগদ্ধাত্রীপূজা এবং মাঘ মাসের ১লা বনদেবীরূপে হলা-সিনীর পূজা হইয়া থাকে। জগদ্ধাত্রীপূজাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া গ্রামবাসীগণ দাবী করেন।

(ঙ) জগদ্ধাত্রীপূজার মেলা। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিব, একটি শীতলা এবং চারটি মনসা আছে।

শোনা যায়, পূর্বে এই স্থানে হিন্দু রাজাদের একটি গড় বা দুর্গ ছিল এবং ইহা 'আষাড়গড়' নামে পরিচিত ছিল।

শ্রীভবতোষ ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
আষাড়গ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জগারডাঙ্গা, মেদিনীপুর।

৮। গ্রাম : নলবোনা।৩১৫।১,২৫০'০৫।১২৫।৭১৭

(ক) তাম্বুলী, তেলি, গন্ধবণিক, মাঝি, বাগাল, কামার, তাঁতী ও সাঁওতাল। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে। যেমন—তাম্বুলীপাড়া, বাগালপাড়া, তাঁতীপাড়া, পাত্রপাড়া ও সাঁওতালপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও তাঁতশিল্প ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ মাসে একযোগে সরস্বতী ও লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি স্থানীয় জমিদার কর্তৃক প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল।

(ঙ) সরস্বতীপূজার মেলা। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি সুগঠিত পাকা মন্দিরের অভ্যন্তরে কারুকার্য খচিত মঞ্চের মধ্যে শ্রীধর বিগ্রহ স্থাপিত আছে। ইহা ভিন্ন, গ্রামে শীতলা ও মনসা আছে।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, ছাত্র,
গ্রাম : নলবোনা, পোঃ সাতবাকরা,
মেদিনীপুর।

৯। গ্রাম : মঙ্গলপাড়া। ৩২৩।৫১৬'৭৫।১০৩।৪৯৯

(ক) হিন্দু। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড। গ্রামের নিকটবর্তী একটি পাকা রাস্তা দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের রামনবমী তিথিতে রঘুনাথজীউ ও শঙ্কর্ষণজীউর বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি ব্যক্তিবিশেষের এবং মাত্র পনর-ষোল বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে উক্ত বিগ্রহদ্বয়কে রথে স্থাপন করিয়া রথ টানা হয়।

(ঙ) রামনবমীর মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি মাত্র পনর-ষোল বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি শিব, একটি শীতলা ও একটি মনসা আছে।

শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী, শিক্ষক,
মঙ্গলপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ নয়াবসত, মেদিনীপুর।

১০। গ্রাম : আকছড়া। ৪৩২।৩১৬'০৩।৭৪।৪৭৩

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, তিলি, তাম্বুলী, নাপিত, জেলে, ছুতার ও মুসলমান। গ্রামে আটটি পাড়া আছে। যেমন—তিলিপাড়া, তাম্বুলীপাড়া, মুসলমানপাড়া, জেলেপাড়া, নাপিতপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, ছুতারপাড়া ও ক্ষত্রিয়পাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও কুটীরশিল্প।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড। স্টেশন হইতে অহল্যাবাঈ রোডে কুসুমডিহা আসিয়া সেখান হইতে জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ২রা মাঘ হইতে ৪ঠা মাঘ পর্যন্ত বনদেবী শিকড়াসিনীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শিকড়াসিনীপূজাটি প্রাচীন তবে গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ মাঘ মাসে দেবীর বার্ষিক পূজাটি ধূমধামের সহিত পালন করা হইতেছে। দেবী সাধারণের এবং পূজায় পশু বলি দেওয়া হয় এবং প্রসাদ বিতরণ ও দরিদ্র নারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়।

(ঙ) শিকড়াসিনীপূজার মেলা। মাঘ মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি মাত্র কুড়ি বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিকড়াসিনীর নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত একটি শীতলা ও তিনটি মনসা আছে।

শ্রীবিজয় কুমার তেওয়ারী, চাকুরী,
গ্রাম ও পোঃ আকছড়া, মেদিনীপুর।

১১। গ্রাম : ঝাড়বনি। ৪৮৯।২২৪'০৭
(শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)

(ক) খয়রা, তিলি, তাম্বুলী, ব্রাহ্মণ ও বাউরী। গ্রামে পাচটি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, তিলিপাড়া, খয়রাপাড়া, বাউরীপাড়া ও তাম্বুলীপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন গড়বেতা হইতে মোটর-বাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং গ্রাম্য দেবী ঝাড়বনীসিনীর পূজা হয়। উৎসব দুইটি প্রাচীন এবং সর্বজনীন। ঝাড়বনীসিনীর পূজার নির্দিষ্ট কোন সময় নাই, গ্রামবাসীর সুবিধামত বৎসরের যে-কোন সময় উৎসবের আয়োজন করা হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

ঝাড়বনীসিনীপূজার মেলা। বৎসরের যে-কোন সময় একদিনের জন্য মেলা বসে। এই মেলাটিও প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল ও টীনের ছাউনীযুক্ত একটি দুর্গামণ্ডপ এবং স্থানীয় গ্রাম্য দেবী ঝাড়বনীসিনীর একটি আটচালাযুক্ত মন্দির আছে।

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চৌধুরী, শিক্ষক,
ঝাড়বনি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ আমলাগুড়া, মেদিনীপুর।

১২। গ্রাম ঃ নোহারী (মৌজা ঃ বড় নোহারী)। ৫০৪।২৮৩'৯১।১৪৯।৬১৮

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাল, জেলে, কুমার, কামার, ডোম। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে। যেমন—বোসপাড়া, সেনপাড়া, রায়পাড়া, মেটেপাড়া, মালপাড়া ও ব্রাহ্মণপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বগড়ী রোড হইতে প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে গ্রামটি অবস্থিত।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী-পূজা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি, দোল ও পঞ্চম দোল এবং চৈত্র মাসে রামনবমী ও চব্বিশপ্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, গ্রামের মধ্যে চণ্ডী, শীতলা, ভৈরব প্রভৃতি দেবদেবীর নিত্য পূজা এবং বাৎসরিক উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলির মধ্যে দুর্গা এবং কালী পূজা শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের মধ্যে দুইটি দুর্গামণ্ডপ, একটি মনসামন্দির এবং শীতলার স্থান আছে।

শোনা যায়, পূর্বে এই স্থানে বগড়ীর স্বাধীন রাজাদের অস্ত্র প্রস্তুতের কারখানা ছিল। লৌহজাত অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী হইত বলিয়া এই স্থান লোহারী অপভ্রংশে নোহারী হইয়াছে।

শ্রীপ্রমথ নাথ চৌপাঠী, শিক্ষক,
নোহারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

১৩। গ্রাম ঃ নাচনজাম। ৫৩১।৯০৩'৬৩।১২৭।৬৪৪

(ক) সদ্গোপ, তিলি, মাঝি, লায়েক, কামার, কৈবর্ত, কুমার ও সাঁওতাল। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে। যেমন—লায়েকপাড়া, মাঝিপাড়া, তিলিপাড়া, জানাপাড়া ও সাঁওতাল পাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন পিয়ারডোবা হইতে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণদিকে গ্রামটি অবস্থিত। স্টেশন হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে মকর সংক্রান্তি তিথি হইতে দুইদিনব্যাপী বনদেবী নাচনজামসিনীর বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। নাচনজামসিনীর কোন মূর্তি নাই; নির্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত কয়েকটি মাটির হাতী-ঘোড়াকে দেবীর প্রতীকস্বরূপ পূজা করা হয়। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) নাচনজামসিনীপূজার মেলা। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে মকর সংক্রান্তি হইতে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মহাপ্রভু, দুইটি শীতলা, একটি চণ্ডী এবং দুইটি মনসা আছে। নাচনজামসিনী দেবীর স্থানটি গ্রামের একটি শালবৃক্ষের নীচে অবস্থিত।

পূর্বে গ্রামটি জামনগর নামে পরিচিত ছিল। পার্শ্ববর্তী একচক্রনগর গ্রামে পঞ্চ পাণ্ডবগণ কিছুকাল অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে।

শ্রীমদন মোহন সিংহ মহাপাত্র, শিক্ষক,
নাচনজাম প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ পিয়ারডোবা, মেদিনীপুর।

১৪। গ্রাম ঃ খড়িকাসুলী। ৫৫২।১,৯০২'৬৬।১২০।৬১৭

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, সদ্গোপ, তিলি, লায়েক, বাউরী, মুচি, কামার, মাঝি ও সাঁওতাল। গ্রামে চৌদ্দটি পাড়া আছে। যেমন—কামারপাড়া, মাঝিপাড়া, সাঁওতালপাড়া, মুচিপাড়া, তিলিপাড়া, সিংহপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, বাউরীপাড়া, সদ্গোপপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন পিয়ারডোবা।

এই গ্রামের মধ্য দিয়া রানীগঞ্জ-মেদিনীপুর রোডে নিয়মিত মোটরবাস যাতায়াত করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে তিনদিনব্যাপী চব্বিশপ্রহর সংকীর্তন মহোৎসব, আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজা, ১লা মাঘ গ্রাম্য দেবী মাচাইসিনী এবং মকর সংক্রান্তিতে বালিবিলাসিনী দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মাচাইসিনী দেবীর পূজাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন। মাচাইসিনী ও বালিবিলাসিনী দেবীর পাষাণময় মূর্তি আছে। পূজায় ছাগ বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) মাচাইসিনীপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে শিবঠাকুর, মনসা, শীতলা, চণ্ডী, মাচাইসিনী, বালিবিলাসিনী প্রভৃতি দেবদেবীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীগোলকবিহারী চরণ, শিক্ষক,
গ্রাম: খড়িকাশুলী, পো: বাঁকাদহ,
মেদিনীপুর।

১৫। গ্রাম: বনকাটী। ৬০৯।৪২৪'১২।৯৯।৫৫৪

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, তাম্বুলী, বাগ্দী, বৈরাগী, কলু, জেলে, মুচি ও সাঁওতাল। গ্রামে পনরটি পাড়া আছে। যেমন—বাগ্দীপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, তাম্বুলীপাড়া, মুচিপাড়া, জেলেপাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, কলুপাড়া ও সাঁওতালপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য, কুটিরশিল্প ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামটি রেলস্টেশন গড়বেতা হইতে প্রায় ষোল মাইল দূরে অবস্থিত। তবে গ্রামের প্রায় দুই মাইল দূরে রামডিহা হইতে যাতায়াতের জন্য মোটরবাস পাওয়া যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে কাশীনাথ শিবের গাজন উৎসব এবং শীতলাপূজা হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি শিব, দুইটি মনসা, একটি শীতলা ছাড়া একটি দুর্গা মূর্তি, দুইটি ধর্ম মূর্তি, একটি কালী মূর্তি এবং তিন-চারটি শালগ্রাম শিলা আছে।

গ্রামে কাশীনাথ শিবের পাকা মন্দির ও সম্মুখভাগে একটি আটচালাবিশিষ্ট নাটমন্দির আছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ মিত্র,
গ্রাম: মাজুরিয়া, পো: ধাড়া,
হুগলী।

১৬। গ্রাম: ব্রজনাথপুর বা শিওড়বনি। ৬১০।১৬৪'৮'১।২৪।১৪৮

(ক) ব্রাহ্মণ ও সদ্‌গোপ।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে রেলস্টেশন এবং প্রায় দুই মাইল দূর দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে পৌষপার্বণ উপলক্ষে ভৈরবসিনী নামে খ্যাত শিবের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) পৌষপার্বণের মেলা। পৌষ মাসে একদিনের জন্য মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাঁচশত নরনারী মেলায় আসেন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দিরে ভৈরবসিনী নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ আছে। তাহা ছাড়া, গ্রামে শীতলা এবং মনসা ঠাকুর আছে।

শ্রীমহম্মদ ইজ্জত আলি, শিক্ষক,
ব্রজনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পো: গড়বেতা, মেদিনীপুর।

১৭। গ্রাম: নলপা। ৬৫০।২৫৯.১২।৫১।২১৬

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ, শুঁড়ি, লায়েক ও সাঁওতাল। গ্রামে চারটি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, ক্ষত্রিয়পাড়া, শুঁড়িপাড়া ও সাঁওতালপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের প্রায় পাঁচ মাইল দূরে গড়বেতা রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে কিংবা গরুর গাড়ী করিয়া যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে রাধাগোবিন্দজীউর পূজা ও চব্বিশপ্রহর নামসংকীর্তন, জ্যৈষ্ঠ মাসে

শীতলাপূজা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, পৌষসংক্রান্তিতে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জাহীর বুড়ি দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। রাধাগোবিন্দজীউর চব্বিশপ্রহরব্যাপী নাম সংকীর্তন উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শীতলা, একটি মনসা এবং সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একটি জাহীর বুড়ি দেবীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মোহান্ত, শিক্ষক,
নলপা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

১৮। গ্রাম : কাঁচড়হরি। ৭১২।৬৪০·০৯।১৪২।৬৭৪

(ক) মুসলমান, সাঁওতাল, মুচি, তাঁতী, ময়রা ও মাঝি। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন গড়বেতা।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহরম উৎসবটি বহুদিনের প্রাচীন।

(ঙ) সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে এক সপ্তাহ-ব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতিকালের।

মহরমের মেলা। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীসেখ সাজ্জাৎ আলি, শিক্ষক,
কাঁচড়হরি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৯। গ্রাম : আউসাবাঁধি। ৭৬৫।৫৪·০৩।২৫।৬১

(ক) কায়স্থ, মুসলমান ও সাঁওতাল। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে। যেমন—কায়স্থপাড়া, মুসলমানপাড়া ও সাঁওতালপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে বগড়ী রোড রেলস্টেশন অবস্থিত।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র পূর্ণিমায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শালুইপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি তিনদিন-ব্যাপী চলে এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) শালুইপূজার মেলা। চৈত্র পূর্ণিমা হইতে তিন-দিনব্যাপী। মেলাটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীগিয়াসুদ্দিন আহমেদ, শিক্ষক,
আউসাবাঁধি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

২০। গ্রাম : উত্তরবিল। ৮৪০।১৫১·৮৭।৯৭।৬১৪

(ক) গোয়ালা, কুমার ও মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন গড়বেতা। ভেদুয়া হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে চব্বিশপ্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব এবং ফাল্গুন মাসে জনৈক পীরের উরস্ অনুষ্ঠিত হয়। পীরের জীবনী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে শোনা যায়, তিনি চট্টগ্রাম হইতে এই স্থানে আসিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাঁহাকে বিশেষ মান্য করেন। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) পীরের উরস্ উপলক্ষে মেলা। ফাল্গুন মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে টিনের আটচালাযুক্ত একটি দেবালয়ে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহা ছাড়া, একটি পীরের আস্তানা আছে।

শ্রীআবদুল হালিম, শিক্ষক,
গ্রাম : উত্তরবিল, পোঃ সন্ধিপুর,
মেদিনীপুর।

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক গড়বেতায় অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণাদি সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি নিয়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

গড়বেতা

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গড়বেতা একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে এইস্থানেই একটি রেলস্টেশন আছে। মেদিনীপুর শহর হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৬০ মাইল। সদর শহর হইতে গড়বেতা পর্যন্ত নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে। বর্তমানে এইস্থানে থানা, ডাকঘর ও উচ্চ বিদ্যালয় আছে এবং প্রতিদিন বাজার বসে।

গড়বেতার অতীত ইতিহাসালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"বগড়ীর রাজাদের রাজধানী প্রথমে গড়বেতা গ্রামে ছিল, পরে তাহারা গোয়ালতোড় গ্রামে উহা স্থানান্তরিত করেন; এক্ষণে তাঁহাদের অধস্তন পুরুষগণ মঙ্গলাপোতা গ্রামে বাস করিতেছেন। বর্তমান সময়ে গড়বেতার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির বিশেষ কোন চিহ্ন নাই। বগড়ীর অন্যতম নরপতি রাজা তেজচন্দ্র নির্মিত প্রসিদ্ধ রায়কোটা দুর্গটি কালে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া বন গুল্ম লতা সমাদৃত প্রস্তররূপে পরিণত হইয়াছে; আর যে সকল বজ্রনিনাদ কামান দুর্গ প্রাকারোপরি সজ্জিত হইয়া শত্রু হৃদয়ে ভীতি নিক্ষেপ করিত তাহা ইংরাজ-রাজ ঐ স্থান হইতে অপসারিত করিয়াছেন। শিলাবতী নদীর পূর্বপার্শ্বে গড়বেতার সেই পরিখা-বেষ্টিত দুর্গ প্রকারের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। দুর্গের চারিদিকে উত্তরে লাল দরজা, পূর্বে রাউতা দরজা, দক্ষিণে পেশা দরজা ও পশ্চিমে হনুমান দরজা নামে যে চারিটি সুবৃহৎ সিংহদ্বার শোভা পাইত অদ্যাপি দু'এক স্থানে সেগুলির ভগ্নাবশেষ আছে।

...রায়কোটা দুর্গের উত্তর দ্বারের সম্মুখে জলটুঙ্গী, ইন্দ্র পুষ্করিণী, পাথুরিয়া, হাড়ুয়া, মঙ্গলা, কবেশ দীঘি ও আম্র পুষ্করিণী নামে সাতটি পুরাতন পুষ্করিণী আছে। প্রত্যেক পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে এক একটি প্রস্তর নির্মিত জীর্ণ মন্দির আছে। দুর্গের সান্নিধ্য হেতু অনেকে এই পুষ্করিণী ও মন্দিরগুলিকে চৌহান বংশীয় রাজাদিগের কীর্তি বলিয়া মনে করেন।

পূর্বোক্ত রায়কোটা দুর্গের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত মহাশক্তি সর্বমঙ্গলা দেবীর নির্মিত মন্দিরটি গড়বেতার অন্যতম প্রাচীন কীর্তি। কিন্তু কতদিন হইল এবং কাহার দ্বারা যে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, বগড়ীর প্রথম রাজা গজপতি সিংহ উহার প্রতিষ্ঠাতা; আবার কেহ কেহ বলেন উজ্জয়িনীপতি রাজা বিক্রমাদিত্য যখন মধ্যভারতের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন সেই সময় জনৈক সিদ্ধ-পুরুষ বগড়ীর বনপ্রদেশে এই দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য দেবীর অলৌকিক শক্তির বিষয় লোক-মুখে অবগত হইয়া গড়বেতায় সমবেত হন এবং দেবীর মন্দির মধ্যে শব-সাধনে নিরত হ'ন। দেবী তাঁহার সাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাল-বেতাল নামে অলৌকিক তেজ সম্পন্ন দুই অনুচরের উপর আধিপত্য-লাভের অধিকার প্রদান করেন। রাজা আপন সফলতা প্রত্যক্ষীভূত করিবার মানসে দেবীর অনুমতিক্রমে তাল-বেতালকে মন্দির-দ্বার পূর্বদিক হইতে উত্তরদিকে পরিবর্তিত করিবার আদেশ করিবামাত্র উহা পরিবর্তিত হইয়া যায়। জনশ্রুতি, সেই কারণে সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরের দ্বার উত্তরদিকে অবস্থিত; সচারাচর কোন হিন্দু মন্দিরে এরূপ দেখা যায় না।

উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য এ প্রদেশে আসিয়া শব-সাধনা করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। দাঁতনের পূর্বোক্ত রাজা বিক্রমকেশরী বা এ প্রদেশে বিক্রমাদিত্য নামে অন্য কোন রাজার সহিত এ কিম্বদন্তীর কোন সম্বন্ধ আছে কিনা বলা যায় না। উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের নাম ভারত-বিখ্যাত এবং তাঁহার শব-সাধনা ও তাল-বেতালের কাহিনী তাঁহার নামের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় উত্তরকালে

এই মন্দিরের উত্তরমুখী দ্বারের কারণটাও তাঁহার তাল-বেতালের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়।

সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরের গঠন প্রণালী দেখিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। দ্বারযোগে মন্দিরের মধ্যে ত্রিশ হস্ত পরিমিত স্থান সুবিস্তীর্ণ সুড়ঙ্গ পথের ন্যায় আলোক বিরহিত পথে অতিক্রম করিয়া গেলে মন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বে দেবীর পাষাণমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সে স্থলে দিবা দ্বিপ্রহরের সময়েও অন্ধকার। আলোকের সাহায্য ব্যতীত কিছুই দেখা যায় না। তথায় দিবা রজনী একটি প্রদীপ জ্বালিত হইয়া থাকে। দেবীর বামপার্শ্বে একটি সুরচিত পঞ্চমুণ্ডি প্রস্তর আসন আছে। কিম্বদন্তী, ঐ আসনে উপবেশন করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য ও বগড়ীর রাজা গজপতি সিদ্ধ হইয়াছিলেন।" (পৃঃ ৩৫১—৩৫৪)

সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরটি উড়িষ্যার রেখ-দেউল স্থাপত্য রীতিতে গঠিত। মন্দিরটি সুউচ্চ এবং উত্তরমুখী। ইহার সম্মুখভাগে মূল মন্দিরের সহিত জগমোহন সংযোজিত এবং জগমোহন সংলগ্ন ইষ্টক নির্মিত একটি প্রশস্ত নাটমন্দির আছে। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় মনে করেন সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উড়িষ্যার রাজাদের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। মূল মন্দিরের ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভগৃহে প্রায় ৫ ফুট উচ্চ কৃষ্ণ প্রস্তরে খোদিত দশভুজা সিংহবাহিনী দুর্গা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইনিই সর্বমঙ্গলা দেবী নামে খ্যাত। সর্বমঙ্গলার শিলা মূর্তিটি মন্দিরের পিছন দিকের দেওয়াল গাত্রে ঠেস্ দিয়া দাঁড় করান অবস্থায় আছে, দেখিলে মনে হয় কোন সময় মূর্তিটিকে অন্য কোন স্থান হইতে তুলিয়া আনিয়া মন্দিরে রাখা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন মন্দিরাভ্যন্তরে পশ্চিমদিকে একটি পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। জগমোহনের মধ্যে মূল মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটি প্রস্তর মূর্তি আছে। উহার দক্ষিণপার্শ্বের দেবী মূর্তিটি চতুর্ভুজা এবং বাম পা মুড়িয়া ও ডান পা ঝুলাইয়া উপবিষ্টা। ইঁহার নীচের দুইটি হাত হাঁটুর উপর রক্ষিত এবং উপরের দুই হাতে কোন আয়ুধ ছিল যাহা বর্তমানে ভগ্ন। পদতলে একটি সিংহ আছে। মূর্তিটি ভগ্ন হইলেও দেখিতে অতি সুন্দর। মূল মন্দির বাম পার্শ্বে দুই হাত উর্দ্ধে উঠান অবস্থায় দণ্ডায়মান প্রস্তরে খোদিত একটি পুরুষ মূর্তি আছে। তবে উহার উপর রংয়ের প্রলেপ দেওয়ায় এবং মোম দ্বারা কৃত্রিম চক্ষু-কর্ণ উৎকীর্ণ করায় আদিতে ইহা কিরূপ ছিল তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সাধারণে বলেন ইঁহারা মন্দিরের রক্ষী ভৈরব ও ভৈরবী। মন্দিরের চারি-পাশ মাকড়া পাথর দ্বারা নির্মিত অনুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত। প্রাচীরটি ভুবনেশ্বরী ধন্তের নক্সা ভিত্তিতে গঠিত।

দুর্গার ধ্যানে সর্বমঙ্গলা দেবীর নিত্য অন্নভোগ দ্বারা পূজা এবং আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী সাড়ম্বরে শারদীয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নবমী তিথিতে অদ্যাপি একটি মহিষ বলিসহ অনেকগুলি পাঁঠা বলি হইয়া থাকে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মহিষ বলির হাড়িকাঠ মন্দির প্রাঙ্গণের বাহিরে এবং ছাগ বলির হাড়িকাঠ মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রোথিত আছে। শোনা যায়, পূর্বে সর্বমঙ্গলা দেবীর নিকট নরবলিও হইত। মন্দির প্রাঙ্গণের বাহিরে উত্তরদিকে 'পাঠগেড়িয়া' নামে একটি পুষ্করিণী আছে। পুকুরের মধ্যস্থলে একটি কূঁয়া ও পাথর নির্মিত একটি যূপকাষ্ঠ প্রোথিত আছে বলিয়া শোনা যায়। এমন কি গ্রামবাসী অনেকে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। বর্তমানে দেবীর পূজা-পার্বণাদি একটি ট্রাষ্টী কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, সিদ্ধান্ত ও চট্টোপাধ্যায় পদবীধারী ব্রাহ্মণগণ শরিকভাগে বংশপরম্পরায় দেবীর নিত্য পূজাদি করিতেছেন। শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে মন্দিরের আশেপাশে রাস্তার ধারে একটি মেলা বসে। মেলায় প্রায় দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং নানাবিধ জিনিসপত্রের পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে।

সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির হইতে পশ্চিমদিকে কিছু দূরে দেবীর ভৈরব কামেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী ও মাঝারি গঠনের। মাকড়া প্রস্তর নির্মিত সমতল ছাদ বিশিষ্ট একটি ঘরের উপর চতুষ্কোণ তিনটি স্তূপ পিরামিডের আকারে উপরের দিকে উঠিয়া চূড়ার সৃষ্টি করিয়াছে। চূড়ার শীর্ষে ঘটসহ পদ্ম স্থাপিত। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের দুই পার্শ্বে দেওয়াল গাত্রের সহিত সংযুক্ত হস্তীমুখযুক্ত দুইটি স্তম্ভের উপর তোরণ নির্মাণ করা হইয়াছে। ঘটের দুই পার্শ্বে দুইটি উপবিষ্ট সিংহ মূর্তি এবং

প্রবেশদ্বারের ঠিক উপরেই একটি গণেশ মূর্তি খোদিত আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে মেঝে ভেদ করিয়া প্রায় বার ইঞ্চি ব্যাসার্ধযুক্ত এবং চার ফুট উচ্চ একটি প্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গ উঠিয়াছে। শিবলিঙ্গটিকে বেষ্টন করিয়া মেঝের উপর গৌরীপট্ট স্থাপিত আছে। ইনিই কামেশ্বর শিবলিঙ্গ নামে খ্যাত। মন্দিরের বাহিরে দেওয়াল গাত্রে হেলান দিয়া প্রায় তিন ফুট উচ্চ শিলায় খোদিত দণ্ডায়মান একটি পুরুষমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কটিদেশ হইতে সম্মুখভাগে প্রলম্বিত বস্ত্রের ন্যায় আচ্ছাদন দেওয়া হইয়াছে। মূর্তিটি কালের প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত এবং সম্ভবতঃ অন্য কোন স্থান হইতে তুলিয়া আনিয়া এইস্থানে রাখা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন মন্দির প্রাঙ্গণের চারিপার্শ্বে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি মাকড়া পাথর পড়িয়া আছে। কামেশ্বর শিবের নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ তিন-দিনব্যাপী গাজন উৎসব এবং ১লা বৈশাখ মন্দির প্রাঙ্গণে চড়কপূজা হইয়া থাকে। উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর প্রায় ৭০-৮০ জন ভক্ত সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন এবং অগ্নিতে ঝম্প প্রদান ও চড়কগাছে পাক খাইয়া থাকেন। গাজন উৎসবের সময় শিবমন্দির প্রাঙ্গণে নানাবিধ জিনিসপত্রের প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে।

সর্বমঙ্গলা মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্বদিকে একটি আটচালা গঠনের মন্দিরে অষ্টধাতু নির্মিত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা রাধাবল্লভজীউর মন্দির নামে পরিচিত। নিত্য অন্নভোগ দ্বারা পূজা ব্যতীত রাধাবল্লভ-জীউকে কেন্দ্র করিয়া ফাল্গুন মাসে পঞ্চমদোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং তদুপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা হয়। মেলায় বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রায় ত্রিশটি দোকান বসে। সর্বমঙ্গলামন্দির, কামেশ্বর শিবমন্দির ও রাধাবল্লভজীউর মন্দিরের নিত্যসেবা-পূজা একই ট্রাষ্টী কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হয়।

ইহা ভিন্ন, গড়বেতা বাজারের নিকট চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণে লক্ষ্মীজনাদনজীউর মন্দিরসহ দ্বাদশটি শিবমন্দির আছে। শিবমন্দিরগুলি দেউলাকৃতি এবং মাঝারি গঠনের। কেবলমাত্র মন্দির প্রাঙ্গণে নহবৎখানাসহ প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে অবস্থিত লক্ষ্মীজনাদনমন্দিরটি চারচালা রীতিতে গঠিত এবং ইহার সম্মুখভাগের দেওয়ালগাত্র অতি সুন্দর পোড়া-মাটির শিল্পকর্ম দ্বারা অলঙ্কৃত। দ্বাদশ শিবমন্দির প্রাঙ্গণের সংলগ্ন প্রশস্ত ঘাটসহ একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে।

বগড়ী-কৃষ্ণনগর

খড়্গপুর হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত বগড়ী-কৃষ্ণনগর একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। দক্ষিণ-পূব রেলপথে এইস্থানে 'বগড়া রোড' নামে একটি রেলস্টেশন আছে। স্টেশন হইতে বগড়ী-কৃষ্ণনগর গ্রাম আড়াই মাইল। গড়বেতা হইয়া মোটরবাসেও এই স্থানে যাতায়াত করিতে পারা যায়। অনেকের মতে বগডিহি বা বক রাক্ষসের বাসস্থান হইতে "বগড়ী" শব্দের উৎপত্তি। প্রবাদ, পুরাকালে এইস্থানে নাকি মহাভারতোক্ত বকরাক্ষসের রাজ্য ছিল। জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবেরা বিদুরের পরামর্শ মত নৌকায় গঙ্গাপার হইয়া দক্ষিণদিকে অরণ্য সমাবৃত এইস্থানে উপনীত হন। বক রাক্ষস প্রত্যহ একটি করিয়া মানুষ ভক্ষণ করিত। ভীমের হস্তে বক রাক্ষসের নিধন ঘটে।

বগড়ীর নিকটে ভিকনগর ও গণগণির মাঠ নামক দুইটি স্থান আছে। প্রবাদ, পাণ্ডবেরা ভিকনগর হইতে ভিক্ষা করিয়া দৈনিক আহার্য্য সংগ্রহ করিতেন। শিলাবতী নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত গণগণির মাঠে ভীম কর্তৃক বক রাক্ষস নিহত হইয়াছিল বলিয়া স্থানীয় লোকের বিশ্বাস। এই মাঠের উপর কতকগুলি প্রস্তরীভূত বৃক্ষকাণ্ডকে লোকে বক রাক্ষসের অস্থি বলিয়া দেখাইয়া থাকে। বগড়ী-কৃষ্ণনগরের নিকবর্তী মহাভারতোক্ত একচক্রপুর বা একারিয়া গ্রামে সপুত্র কুন্তীদেবী যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন লোকে আজিও তাহা নির্দেশ করিয়া থাকে।

গড়বেতার ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে বগড়ীর সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণরায় জীউ আছেন। জনশ্রুতি, বগড়ীর প্রথম রাজা গজপতি সিংহের মন্ত্রী রাজাধর রায় ইঁহার প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তীকালে বগড়ীর অন্যতম রাজা রঘুনাথ সিংহ কৃষ্ণরায়-জীউর পার্শ্বে রাধিকা-মূর্তি স্থাপন করিয়া মন্দিরটি নির্মাণ

করিয়া গিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোলযাত্রার সময় এইস্থানে কয়েকদিনব্যাপী একটি সুবৃহৎ মেলা হয়। সেই সময় বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক বৈষ্ণব ও অন্যান্য বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে।

বগড়ীর ঐতিহ্যপূর্ণ দোল মেলা সম্পর্কে ৭ই চৈত্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' নিম্নলিখিত সংবাদ পরিবেশিত হয়।

"মেদিনীপুর, ১৯শে মার্চ—গত ২৮শে ফাল্গুন, চাঁচর-এর দিন হইতে ১লা চৈত্র মঙ্গলবার পর্যন্ত, মেদিনীপুরের অন্তর্গত গড়বেতার সন্নিকটে বগড়ীর দোল বাগানে, শীলাবতী নদীর তীরে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায়জীউ-এর চাঁচর, দোলযাত্রা ও এই উপলক্ষে বিরাট মেলা ও হাজার হাজার যাত্রীর সমাবেশ হয়। কয়েক শত বৎসর পূর্বে দেওয়ান রাজ্যধর রায় এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া শোনা যায়। দোলবাগানে আম্রকুঞ্জের মাঝে সেই ঐতিহ্যপূর্ণ, কারুকার্যখচিত বিরাট প্রস্তরের মন্দির এখন ধ্বংসের মুখে।

অধুনা শকাব্দ ১৭৭৭ ও বাংলা সন ১২৬২ সালে নির্মিত শীলাবতী নদীর ওপারে নূতন মন্দিরে দেবতার ভোগ, আরাধনা হইয়া থাকে। নূতন মন্দিরটিও শীলাবতী নদী গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ইতিমধ্যে মন্দির সন্নিকটস্থ ভোগ রান্নার পাকা গৃহটি ধ্বংস করিয়াছে।

মন্দিরের দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে দেবতার সেবাইত রায় পরিবারেরও দৈন্যতা দেখা দিয়াছে। তথাপি তাঁহারা পূর্বপুরুষ নির্দিষ্ট আচার-আড়ম্বরগুলি সযত্নে পালন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। আজিও ঐ বাড়ীর মেয়েরা নীলাম্বরী শাড়ী পরিধান করেন না। পূর্ব প্রথামত আজিও মন্দিরে প্রত্যূষে, দ্বিপ্রহরে ও সায়াহ্নে সানাই, কাঁসর-ঘণ্টা, দামামা ও খোল-করতাল দ্বারা দেবতার ভোগ আরতি নিবেদন করেন। অন্নভোগ নিবেদনান্তে, দামামার শব্দে অভুক্তজনে আহ্বান জানানো হয় ও সবাগ্রে তাঁদেরই প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দেবতার ভূসম্পত্তি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন ও পরিবর্তে যে যৎসামান্য বরাদ্দ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তাহাতে দেবতার অন্নভোগ ও উৎসবাদির খরচ সঙ্কুলান সম্ভব নয় বলিয়া সর্ব বিষয়েই ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইয়াছে। তথাপি পূর্ব ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য এ-বৎসরও শীলাবতী নদীর তীরে চাঁচরের দিন রাত্রে কিছু বাজী পোড়ান হয় ও চাঁচর উৎসব হয়। এতদুপলক্ষে দেশ-বিদেশ হইতে শত শত যাত্রী গভীর রাত্রে, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শীলাবতী নদীর বালুচরে সমবেত হইয়াছিল।

নূতন মন্দির হইতে নদী পার করিয়া রাধাকৃষ্ণের সুসজ্জিত অপূর্ব যুগল-মূর্তি পাল্কীতে করিয়া এপারের পুরানো মন্দিরে তিন দিনের জন্য আনা হয়।

পরদিন প্রত্যুষ হইতে প্রত্যহ গভীর রাত্রি অবধি দোকানের পসরায় আর যাত্রীর ভীড়ে মেলা ক্রমশঃ জমিয়া উঠে।

মেলায় সার্কাস, ম্যাজিক, চোখের ধাঁধা, কাপড়ের দোকান, কাঁসা-পিতলের দোকান, পাথরের বাসন, শাঁখার দোকান, চুড়ির দোকান, প্লাষ্টিকের খেলনা, মনোহরী দোকান, লোহালক্কড়, ফটোর স্টুডিও, জুতার দোকান, মাদুর, চন্দন কাঠ, নানা রকম তরিতরকারী—মাছ, হোটেল ইত্যাদি দোকান বসিয়াছে। তা ছাড়া খাবার, চা, পান-বিড়ির দোকান-ত আছেই।

যার সামান্য পুঁজি, সেও খালি হাতে ফেরে নাই। দুইটি তালপাতার পাখা কিংবা ছেলেদের জন্য একটা ঢোলক ও কাঠের পুতুল, আর চার আনার "কদমা" কিংবা "নিঝুম মিঠাই" বাড়ীতে কিনিয়া নিয়াছে। দেশ-বিদেশের যাত্রী মোটর, সাইকেলে, গরুর গাড়ীতে অথবা পায়ে হাঁটিয়া এখানে আসিয়াছে এবং এই কয়েক দিন দোলবাগানের আম্রকুঞ্জকে গুঞ্জরিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রেমের ঠাকুরের দেউলে দয়িতের মিলন ও মঙ্গল কামনায় প্রণতি জানাইয়া 'কৃষ্ণরায় জীউ কি জয়!' ধ্বনি দিয়া এ-বৎসরের মত হোলি উৎসব সাঙ্গ করিয়া যাত্রী দল আবার নিজ নিজ বাড়ী ফিরিয়া যায়।"

বগড়ী পরগণার মধ্যে আরও কয়েকটি মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি আছে। তন্মধ্যে পূর্বোক্ত রাজ্যধর রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গোয়ালতোড়ের সনৎকুমারী, বাগবীজ গোস্বামী নামক জনৈক সাধু পুরুষ কর্তৃক প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত পাথরবেড়া গ্রামের রঘুনাথজীউ, কাদড়ার চমৎকারিণী দেবী ও মেড়রা শিরোমণিপুরের

বৃক্ষস্থলের ভৈরবীমূর্তি প্রসিদ্ধ। চমৎকারিণী দেবীর প্রতিষ্ঠাতার নাম জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন, শিরোমণিপুরের ভৈরবীমূর্তিটিকে উপেন্দ্র ভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণ প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে অন্য স্থান হইতে লইয়া আসিয়া উক্তস্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও ঐ স্থানে বাস করিতেছেন। রত্নাবলী ব্যাকরণ, রাস কৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা এবং পদাঙ্কদূত, ষটপদী প্রভৃতি গ্রন্থের টীকাদার স্বর্গীয় পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, গোয়ালতোড়ে কারুকার্যখচিত একটি অতি সুন্দর মন্দির আছে। রাজা যাদব চরণ সিংহ কর্তৃক বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে এই মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল। রাজা এই মন্দিরে বালচন্দ্র নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবার মানসে ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে তথায় একটি গোবৎস মৃত হওয়ায় উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত গোয়ালতোড়ের সনৎকুমারীমন্দিরে নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর শারদীয়া অষ্টমী তিথিতে সাড়ম্বরে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দেবীর মন্দিরটি পূর্বমুখী এবং মন্দিরাভ্যন্তরে গড়বেতার সর্বমঙ্গলাদেবীর অনুরূপ একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইনিই সনৎকুমারী। মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির, পাশে একটি পুষ্করিণী এবং একটি গাছতলায় দেবীর ভৈরবের নির্দিষ্ট স্থান আছে। নাটমন্দিরের পূর্বদিকে একটি বাঁধান স্থানে একটি শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড প্রোথিত আছে। শোনা যায়, প্রতি বৎসর শারদীয়া দুর্গাপূজার পূর্বে ঐ শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ডে পত্র-পল্লবের সঞ্চার হয় এবং এইস্থানে 'বিল্ববরণ' পর্ব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সনৎকুমারীর পূজারী মাঝি সম্প্রদায়।

গড়বেতা হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে রসকুণ্ড গ্রামে একটি শিবমন্দিরে বসন্তরায় নামে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি সোমবার এই শিবমন্দিরে পূজা দিতে বহু লোকজন আসেন। মন্দির হইতে বাত-বেদনা নিরাময়ের জন্য দৈব ঔষধ দেওয়া হয়। চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও তদুপলক্ষে একটি মেলা বসে।

(শ্রীযোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' অবলম্বনে শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক রচিত)

মেলা বিবরণী

আদিবাসী উৎসবের মেলা
(বংগাঠাকুর)

সারেঙ্গাগড় গ্রামে সাঁওতালী সম্প্রদায়ের বংগাঠাকুরের পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর ৩রা মাঘ হইতে সপ্তাহব্যাপী ব্যক্তিবিশেষের প্রায় পঁচিশ বিঘা জমির উপর একটি বড় মেলা বসে। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা 'সারগার জাত' মেলা নামে পরিচিত এবং ইহা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন মেলা বলিয়া দাবী করা হয়।

কদমডিহা, কিয়াবনী, ভাবচা, নবকলা, চন্দ্রকোণা, ওড়গন্ডা, আরবেড়া, লক্ষ্মণপুর, বিলা, খড়গপুর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে প্রায় দশ-বার হাজার নরনারী মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নরনারীর সংখ্যাই বেশী।

প্রধানতঃ গড়বেতা, আমলাগুলী, খড়ার, খড়্গপুর, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর মেলায় প্রায় দুইশত বিক্রেতা ও কিছু ফেরিওয়ালা আসেন। ইহাতে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের বেশী আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের মধ্যে নাগরদোলা, ম্যাজিক, ও সার্কাসের দল আসে এবং লটারী ও জুয়া খেলা হয়। তাহা ছাড়া, মেলায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নাচ-গান বিশেষ আকর্ষণীয়। জানা যায় যে, এই মেলা উপলক্ষে অস্থায়ী 'হেঁড়ে মদের' দোকানগুলিতে প্রায় এক হাজার হাঁড়ি মদ বিক্রয়ার্থে মজুদ থাকে এবং বহু নরনারী ঐ সকল দোকান হইতে 'হেঁড়ে মদ' পান করিয়া নাচ-গানে যোগদান করেন। অধিক রাত্রি পর্যন্ত এইরূপ নাচ-গান চলিয়া থাকে। এই অনুষ্ঠানে প্রায় এক হাজার দর্শক উপস্থিত থাকেন।

(শালুইপূজা)

আউসাবাঁধি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র পূর্ণিমা হইতে তিনদিনব্যাপী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শালুইপূজা উপলক্ষে দেবোত্তর এবং সাধারণের প্রায় দশ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম ব্যতীত সীমান্তবর্তী বাঁকুড়া জেলা হইতেও মেলায় বহু লোকজন আসিয়া থাকেন। বিভিন্ন জিনিসপত্রের মধ্যে মেলায় খাবার, মনিহারী ও বাঁশের তৈয়ারী দ্রব্যসামগ্রী বেশী আমদানী হয়। বিক্রেতাগণ নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট খাজনা বাবদ আদায়কৃত অর্থের দ্বারা মেলায় আমোদপ্রমোদের আয়োজন করা হয়। ইহার মধ্যে সাঁওতালী নরনারীর নাচ উল্লেখযোগ্য। এই অনুষ্ঠানে প্রায় আটশত দর্শকের সমাগম হয়।

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা (নাসির খাঁ পীর)

উত্তরবিল গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে নাসির খাঁ নামে জনৈক পীরের উরস্ উপলক্ষে পীরের সমাধি সংলগ্ন প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে।

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে মেলায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং রামজীবনপুর, কয়াপাট, গড়বেতা, খড়কুশমা, ঘাটাল, বিষ্ণুপুর, ফুলবেড়ে প্রভৃতি স্থানগুলি হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, বাসনকোসন, মনিহারী, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদির শতাধিক দোকান বসে। তাহা ছাড়া, শালমুড়া, কয়াপাট, হেতেশোল, ফুলমণি প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে প্রতি বৎসর বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র আমদানী হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে এবং কবিগান ও যাত্রাভিনয় হয়। অনেকে জুয়া ও লটারী খেলিয়া থাকেন।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

বনকাটী গ্রামে কাশীনাথ শিবের গাজন উপলক্ষে শিবমন্দির প্রাঙ্গণে দেবোত্তর প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। সাধারণতঃ বিকালের দিকেই মেলায় লোক সমাগম বেশী হয় এবং ইহা শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

হুগলী জেলার বদনগঞ্জ ইউনিয়নের অন্তর্গত বেতরা, তিড়াল, মাজুরিয়া, কোকন্দ, বলিয়ারপুর, রণডাঙ্গা, কয়াপাট; বাঁকুড়া জেলার ধাড়া, বৈতল, শীলাকোণ এবং মেদিনীপুর জেলার কাদরা ইউনিয়নের কাঁটাগড়, কামারবাজ, পাটপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে মেলায় লোকজনের সমাগম হইয়া থাকে এবং ভেদুয়া, বাঁশদহ, মোহনপুর ও আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে ব্যবসায়ীরা আসিয়া থাকেন। পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, তামা-পিতলের বাসনকোসন, বই-ছবি, জামা-কাপড় প্রভৃতি জিনিসপত্রের দোকানই উল্লেখযোগ্য। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য মেলায় যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

পিংবনী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে জলেশ্বর শিবের গাজন উপলক্ষে ২০শে চৈত্র হইতে ১লা বৈশাখ পর্যন্ত শিব-মন্দির সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় দশ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

কেশিয়া, কদমবন্দী, গঙ্গারামপুর, রূপারঘাগরা, বড়বাড়ী, বনকাটি, বড় খাজরা, ছোট খাজরা, শশাবেড়িয়া প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহ হইতে এবং বিনপুর থানার রামগড়, শালবনী থানার উত্তরাঞ্চল এবং বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সারেঙ্গা ও রাইপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাঁচ হাজার নরনারী মেলায় আসেন।

মেলায় শতাধিক দোকানপাট বসে এবং কুড়ি-পঁচিশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপত্রের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতিই উল্লেখ-যোগ্য। তাহা ছাড়া, অন্যান্য জিনিসপত্রের দোকান-

পাটও বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিকের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়। তাহা ছাড়া, অনেকে জুয়া ও লটারী খেলিয়া থাকেন।

জগদ্ধাত্রীপূজার মেলা

আষাড়গ্রামে জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে স্থানীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন এবং সাধারণতঃ ইহাতে বিকালের দিকে লোকসমাগম হয়।

পাটতেঁতুল, কাণ্ডোড়, লখেবাদ, বোলকান্দী, দেরেপুর, তালবান্দী, জসারডাঙ্গা, ভাটমৌদি, মালিবনী প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় সাত-আটশত নরনারী মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা প্রায় সমান।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী প্রভৃতি জিনিস-পত্রের মাত্র পনর-কুড়িটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। আমোদপ্রমোদের জন্য প্রতি বৎসর যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

ছোট নোহারী গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে স্থানীয় শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বসুদিগের দুর্গা-দালানের সম্মুখস্থ প্রায় সাড়ে তিন বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় একশত পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন। আশপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় সাত-আটশত নরনারী মেলায় আসেন। প্রধানতঃ মিষ্টান্ন, মনিহারী, সস্তার বই-ছবি, কৃষি যন্ত্রপাতি, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি ইত্যাদি আমদানী হয়। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না। আমোদপ্রমোদের জন্য প্রতি বৎসর কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রাদল আসে।

ঝাড়বনি গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে সাধারণের জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন। আশপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারী মেলায় আসেন এবং ফতেসিংপুর, ঝাড়বনী এবং রাউলিয়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে বিক্রেতারা আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী প্রভৃতি বিবিধ জিনিসপত্রের দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য জলসা বা যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় সাত-আটশত নরনারীর সমাবেশ হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই গ্রামে অনুষ্ঠিত ঝাড়বনীসিনীপূজার মেলাটি উল্লিখিত দুর্গাপূজার মেলার অনুরূপ।

নাচনজামসিনীপূজার মেলা

নাচনজাম গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে মকরসংক্রান্তি তিথিতে গ্রাম্য দেবী নাচনজামসিনীর পূজা উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে প্রায় এক একর জমিতে দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া গ্রামবাসীরা দাবী করেন।

কাওরাপোল, আমলাশুলী, কুইলীবাদ, বুড়ামড়া, শালদহ, শিলাবনী প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় আট-নয়শত নরনারী মেলায় আসেন।

পিয়ারডোবা, বাঁকাদহ, মামড়া প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই বিক্রেতারা আসেন। মেলায় প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে ও আট-দশজন ফেরিওয়ালা আসেন। উক্ত দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, মাটির হাঁড়িকুড়ি, পুতুল, বই-ছবি, কোদাল, কাস্তে, বটি এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র ইত্যাদির দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কীর্তনগানের ব্যবস্থা করা হয় এবং সাঁওতালী নাচ-গানের আসর বসে।

মাচাইসিনীপূজার মেলা

খড়িকাস্থলী গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ মাত্র একদিনের জন্য স্থানীয় গ্রাম্য দেবী মাচাইসিনীর পূজা উপলক্ষে বন-জঙ্গলে ঘেরা একটি নির্দিষ্ট স্থান সংলগ্ন প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

ফুলবেড়িয়া, শ্যামনগর, বাঁকাদহ এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

পিয়ারডোবা, গড়বেতা, বাঁকাদহ, নাচনজাম, ফুলবেড়িয়া প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে প্রায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। মেলায় প্রায় চল্লিশটি দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, বাসনকোসন, মনিহারী, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও ধামা-কুলা প্রভৃতির দোকানপাট উল্লেখযোগ্য।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য রামায়ণগান ও হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করা হয় এবং এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় এক হাজার শ্রোতার সমাগম হয়। অনেকে জুয়া ও লটারী খেলেন।

মহোৎসবের মেলা

নলপা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে রাধাগোবিন্দ-জীউকে কেন্দ্র করিয়া চব্বিশপ্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব উপলক্ষে স্থানীয় জনৈক গ্রামবাসীর প্রায় এক বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

কাষ্ঠগুড়া, ধবনী, বীরক্ষা প্রভৃতি আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাঁচশত নরনারী মেলায় আসেন এবং গড়বেতা, কড়সা প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির মাত্র কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কোন কোন বৎসর স্থানীয় যুবসম্প্রদায় কর্তৃক যাত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

রামনবমীর মেলা

মঙ্গলপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রামনবমী তিথিতে রঘুনাথজীউ ও শঙ্করর্ষণজীউ ঠাকুরের উৎসব উপলক্ষে প্রায় তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত কুড়ি বৎসর হইল শুরু হইয়াছে।

গঙ্গারামপুর, রূপারঘাগরা, ছোট খাজরা, শশাবেড়িয়া, কুনরপুর, হাতীমশান, আমডিহা, কদমা প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিন হাজার নরনারী মেলায় আসেন। মেলা প্রাঙ্গণে কয়েকটি বৃহৎ প্রাচীন গাছের নীচে অনেক যাত্রী রাত্রি যাপন করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া, পানীয় জলের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। মেলা স্থান হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড। সেখান হইতে মোটরবাসে নিকটবর্তী খাজরা গ্রামে নামিয়া যাত্রীরা মেলায় আসিয়া পৌছান। তাহা ছাড়া, অনেকে গরুর গাড়ী, লরী প্রভৃতি যানবাহনেও যাতায়াত করেন।

চন্দ্রকোণা, গোয়ালতোড়, গড়বেতা, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসর বিক্রেতাগণ মনিহারী ও মিষ্টান্নজাত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া মেলায় আসেন। মোট দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় আশি-নব্বইটি। তাহার মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনিহারী দোকানের সংখ্যা সর্বাধিক বলিয়া জানা যায়। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, জুয়া, লটারী, যাত্রা-ভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেলায় আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় প্রতি বৎসর কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রাদল আসে। যাত্রাভিনয়ের অনুষ্ঠানে প্রায় দুই-তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

রূপাসিনীপূজার মেলা

রূপারঘাগরা গ্রামে প্রতি বৎসর ৪ঠা মাঘ রূপাসিনী দেবীর পূজা উপলক্ষে দেবীর নির্দিষ্ট স্থান সংলগ্ন সাধারণের জমিতে মাত্র একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন এবং ইহাতে ১১নং পাথরপাড়া ইউনিয়নের অধীন বিশারবাঁধ, বারোবাড়ী, পড়াশ্যা, রূপারঘাগরা, বনকাটা গ্রাম, ১০ নং শশাবেদ্যা ইউনিয়নের অধীন শশাবেদ্যা, কদমবাঁধি, কেন্দ্যাগ্রাম প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে হিন্দু-মুসলমান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারী আসেন।

মেলায় খাবার, মনিহারী, তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ, খেলনা-পুতুল ও কারিগরী যন্ত্রপাতি ইত্যাদির কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে এবং আট-দশজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয়, তাহাদের নিকট কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য লাঠিখেলা, ভেড়ার লড়াই, মোরগের লড়াই, নাচনীনাচ, তাজ নিশান খেলা

এবং কাঁটার খেলা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। নাচনীনাচ বিশেষ আকর্ষণীয়।

শিকড়াসিনীপুজার মেলা

আকছড় গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে শিকড়াসিনা নামে পরিচিতা গ্রাম্য দেবীর পূজা উপলক্ষে গ্রামের পূর্ব-দিকে একটি আমবাগানের নীচে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত পনর-কুড়ি বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে।

মেলায় মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, সারেঙ্গাগড় প্রভৃতি স্থান ও আশপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দুই-আড়াই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। সাধারণতঃ গরুর গাড়ী, সাইকেল ও রিক্সা করিয়া মেলায় লোকজন আসেন।

গড়বেতা থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম ও চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর, হুমগড়, আমলাগোড়া প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতাগণ আসেন। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে খাবার ও মনিহারী জিনিসপত্র ভিন্ন বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কাঠের ও মাটির পুতুল, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতির দোকানপাট বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, নাগরদোলা, ম্যাজিকের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়। ইহা ভিন্ন, কবিগান, সাঁওতালী নাচ, জুয়াখেলা, লটারী খেলা ও নানা প্রকার প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা হয়।

সরস্বতীপূজার মেলা

নলবোনা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় চার-পাঁচ বিঘা জমিতে একদিনের জন্য মেলা বসে। সাধারণত বিকালের দিকে মেলায় লোকসমাগম হয়। ইহা প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিন-চার হাজার নরনারী মেলায় আসেন। তাঁহাদের মধ্যে বহু সাঁওতাল নরনারীও থাকেন।

চন্দ্রকোণা,ডুমুরগেড়্যা, শালবনী, গড়বেতা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসর বিক্রেতাগণ মনিহারী ও মিষ্টান্ন-জাত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া মেলায় আসেন। মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য পেশাদারী দল কর্তৃক যাত্রাভিনয় হয়।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : তালবান্দী। ২২।৫৪২'৫৭।৭২।৩৫৩

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কামার, মাঝি ও সাঁওতাল। গ্রামে উত্তরপাড়া, বামনপাড়া ও সাঁওতালপাড়া নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কংসাবতী নদীতে নৌকা করিয়া যাইবার পর কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর রাস পূর্ণিমার পরে কৃষ্ণপক্ষের একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী—এই তিনদিনব্যাপী কিশোরী-বল্লভ চক্রবর্তী নামে জনৈক বৈষ্ণব গোস্বামীর তিরোধান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবটি স্থানীয় মোহান্ত গোস্বামীগণের নিজস্ব উৎসব এবং প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি একচূড়া বিশিষ্ট সুউচ্চ শিবমন্দির এবং পঞ্চরত্ন বিশিষ্ট একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের অভ্যন্তরে কালো পাথর নির্মিত কৃষ্ণ মূর্তি এবং পিতলের রাধিকা মূর্তি আছে। তাহা ছাড়া, একটি শীতলা, একটি ধর্মঠাকুর ও একটি হরিঠাকুরের স্থান আছে।

শ্রীকেনারাম ভূঁইয়া, শিক্ষক,
গ্রাম : মির্জাপুর, পোঃ তালবান্দী,
মেদিনীপুর।

২। গ্রাম : লোয়াদা। ১৩৮।২৩০'৫১।৯২।৪৪৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, মাহিষ্য, মোদক, তাম্বুলী, কামার, শৌণ্ডিক, লোহারী, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, নাপিত, নমঃশূদ্র, ধোপা, ভূমিজ, গোয়ালা, মাহালী, মাঝি ও মুসলমান। গ্রামে পাচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বালিচক হইতে মোটর-বাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ব্রহ্মাপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিনী কালীপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে রাধাবল্লভজীউর রথযাত্রা উৎসব ও ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কালীপূজাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের এবং অন্যান্য উৎসবগুলি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। মাঘ মাসে দুইদিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি মন্দির আছে। মন্দিরগুলির শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, উক্ত মন্দিরগুলি ১১০০ শতাব্দী হইতে ১৩০০ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় সৃষ্টিধর চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক নির্মিত প্রায় তিনশত ফুট উচ্চ মন্দিরটি স্থাপত্য ও কারুকার্য গুণসহ অম্লানভাবে বিরাজমান। এই মন্দিরে অবশ্য কোন দেবদেবীর বিগ্রহাদি নাই। তাহা ছাড়া, শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ও শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দারুময় মূর্তিসহ গ্রামে একটি পাকা মন্দির আছে।

শ্রীহেমন্তকুমার গুপ্ত, প্রধান শিক্ষক,
লোয়াদা উচ্চ বিদ্যালয়,
পোঃ লোয়াদা, মেদিনীপুর।

[ডেবরা থানার অন্তর্গত কেদারকুণ্ড গ্রামে চপলেশ্বর নামে খ্যাত শিবের পূজাদি সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য নিয়ে লিপিবদ্ধ রা হইল।]

কেদারকুণ্ড

ডেবরা থানার অন্তর্গত কেদারকুণ্ড বর্তমানে একটি সাধারণ গ্রাম। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে বালিচক স্টেশন হইতে প্রায় তিন-চার মাইল দূরে এই স্থানটি অবস্থিত। মেদিনীপুর শহর অথবা বালিচক হইতে মোটরবাসে কেদারকুণ্ড গ্রামে

যাতায়াত করিতে পারা যায়। এই গ্রামে একটি সুউচ্চ মন্দিরে চপলেশ্বর নামে খ্যাত এক স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গ আছে। উড়িষ্যা রেখ দেউল স্থাপত্য রীতিতে গঠিত পশ্চিমমুখী এই প্রাচীন মন্দিরটি সম্পূর্ণ মাকড়া পাথর দ্বারা নির্মিত। পাথরের গায়ে চূন-বালির পলেস্তরা দেওয়া। মন্দির প্রাঙ্গণের চারিদিকে একদা উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। বর্তমানে উহা স্থানে স্থানে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। মন্দির প্রাঙ্গণের প্রবেশ দ্বারের উপরের নহবৎখানাটি সম্পূর্ণই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মূল মন্দিরের অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভগৃহে স্থাপিত বৃহৎ গৌরীপট্টের মধ্যস্থলে গর্তের মধ্যে অনাদি লিঙ্গ শিব অবস্থান করিতেছে। মন্দিরের পশ্চাৎভাগে লতাগুল্মে পরিপূর্ণ একটি মজা দহের নিকট পাথর দ্বারা বাঁধান একটি চতুষ্কোণ চৌবাচ্চা আছে। চৌবাচ্চার উপর একচূড়া বিশিষ্ট প্রস্তর মণ্ডপ দ্বারা আচ্ছাদিত। চৌবাচ্চাটি সারা বৎসর পরিষ্কৃত জলে পরিপূর্ণ থাকে। ইহা কেদার-কুণ্ডরূপে খ্যাত এবং কেদারকুণ্ডের জল পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী এই পবিত্র কুণ্ডে নামিয়া পুণ্যস্নান করেন এবং তদুপলক্ষে প্রায় একমাসব্যাপী শিবমন্দির প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসে। মেলায় মেদিনীপুর জেলার ডেবরা, পিংলা, দাসপুর, মেদিনীপুর, খড়্গপুর, ময়না প্রভৃতি থানা হইতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় দেড় হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং বিবিধ জিনিসপত্রের দেড় শতাধিক দোকানপাট বসে। মেলাটি প্রাচীন।

চপলেশ্বর শিব সম্পর্কে শ্রীযোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার মেদিনীপুর গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"ডেবরা থানার অন্তর্গত কেদারকুণ্ড পরগণায় 'ভুড়ভুড়ি কেদার' বা চপলেশ্বর নামে এক অনাদিলিঙ্গ মহাদেব আছেন। তাহারই নামে ঐ পরগণার নাম কেদার বা কেদারকুণ্ড হইয়াছে। রাজা তোডরমল্লের রাজস্ববিভাগে কেদারকুণ্ড পরগণার নাম দৃষ্ট হয়। সুতরাং তাহারও পূর্ব্ব হইতেই যে ঐ মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা বলা যাইতে পারে। জনশ্রুতি, রাজা যুগল কিশোর রায় নামক এই স্থানের জনৈক প্রাচীন জমিদার উহার প্রতিষ্ঠাতা। মহাদেবের মন্দিরের পার্শ্বে একটি কুণ্ড বা জলাশয় আছে; নিরন্তর উহার মধ্য হইতে 'ভুড় ভুড়' শব্দে জল-বুদ্‌বুদ উত্থিত হইতেছে। উহার অনতিদূরে যে ক্ষুদ্র জলস্রোতটি আছে উহা ক্ষীরাই নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ উহার সহিত এই কুণ্ডটির কোন প্রকার যোগ থাকায় ঐরূপ জল-বুদ্‌বুদ উত্থিত হইয়া থাকে এবং উহার জলও কখন শুষ্ক হয় না। সাধারণের বিশ্বাস, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিবসে এই কুণ্ডে স্নান করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হন। এই কারণে উক্ত দিবস শত শত বন্ধ্যানারী প্রত্যূষে এই স্থানে স্নান করিয়া চপলেশ্বরের পূজা দিয়া থাকেন।"

চপলেশ্বর শিবের নিত্য যথারীতি পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী উৎসব এবং চৈত্র মাসের শেষ ১১ দিনব্যাপী গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উৎসবে প্রতি বৎসর প্রায় ২০।২৫ জন ভক্ত সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। বর্তমান পাটভক্ত শ্রীগুণধর কর, ইঁহারা বংশপরম্পরায় পাটভক্তের দায়িত্ব পালন করিতেছেন। সন্ন্যাসব্রতীরা উৎসবের কয়দিন সংযম পালন করিয়া প্রতিদিন শিববন্দনা পাঠ ও সন্ধ্যায় সূর্যার্ঘ প্রদান করেন এবং বেতচলা, মাথাচালা, আগুন দোলন প্রভৃতি কৃচ্ছ্র-সাধনের মাধ্যমে বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকেন। আচার্য পদবীধারী ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসব্রতীদের সূর্যার্ঘ প্রদান ও শিববন্দনা পাঠ করাইয়া থাকেন। সংক্রান্তির পূর্বদিন 'মেলঘরপূজা' নামে একটি বিশিষ্ট আচার পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে আচার্য ব্রাহ্মণ মন্দিরাভ্যন্তরে গৌরীপট্টের নিকট পঞ্চগুড়ি দ্বারা নবগ্রহের ঘর নির্মাণ করিয়া নবগ্রহ পূজা করেন। পূজার পর একটি জীবন্ত মাগুর মাছকে নবগ্রহের আসনের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং ঐ মাছটি নবগ্রহের আসন হইতে গৌরীপট্ট বাহিয়া মন্দিরের দেওয়াল গাত্রের ফাঁক দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলে পাটভক্ত উহা ধরিয়া লন। পূর্বে চড়কগাছ পূজা হইত; বর্তমানে উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চক্রবর্তী, মহাপাত্র ও পাণ্ডা পদবীধারী ব্রাহ্মণগণ বংশপরম্পরায় পালাক্রমে চপলেশ্বর শিবের পূজাদি করিতেছেন।

ইহা ভিন্ন ডেবরা থানার অন্তর্গত অন্যান্য গ্রামে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি দেবদেবী সম্পর্কে শ্রীযোগেশ চন্দ্র বসু তাঁহার 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে—

"ডেবরা থানার দ্বারপাড়া গ্রামে বাশুলী দেবী, কুমরপুর

গ্রামে হাতেশ্বর জীউ ও পুশং গ্রামে খগেশ্বর জীউ নামে তিনটি দেবতা আছেন। জনশ্রুতি, পূর্বোক্ত রাজা যুগল কিশোর বংশের শেষ রাজা মুকুটনারায়ণ রায় বাশুলী দেবীর প্রতিষ্ঠাতা। ঐ স্থানের সুরাদীঘি নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণীটিও তাঁহার সময়ে খোদিত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হাতেশ্বর জীউ ও খগেশ্বর জীউর মন্দির প্রাঙ্গণে এক একটি মেলা বসিয়া থাকে।

ডেবরা থানার অন্তর্গত সাহাপুর পরগণার মাড়তলা গ্রামে সাহাজীউ নামক এক মুসলমান সাধুর আস্তানা আছে। জনশ্রুতি, সাহাজীউ আলিসাহর গুরু ছিলেন এবং তাঁহারই নামানুসারে সাহাপুর পরগণার নামাকরণ হইয়াছিল। তোডরমল্লের রাজস্ব-বিভাগে সাহাপুর মহাল সরকার মান্দারণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহা হইলে অনুমান করা যাইতে পারে, সাহাজীউ ও আলিসাহ চারিশত বৎসরের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। সাহজীউর অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে নানাপ্রকার কাহিনী প্রচলিত।"

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব
(কিশোরীবল্লভ গোস্বামী)

তালবান্দী গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কৃষ্ণা একাদশী হইতে ত্রয়োদশী পর্যন্ত কিশোরীবল্লভ গোস্বামীর তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

উৎসবের প্রথম দিনে গ্রামের একটি প্রাচীন অশ্বত্থ-গাছের নীচে হরিনাম সংকীর্তন হয় এবং ইহার পর উপস্থিত সকলের মধ্যে চিড়াভোগ বিতরণ করা হয়। দ্বিতীয় দিন, দ্বিপ্রহরে ও রাত্রে রাধাকৃষ্ণের যথারীতি পূজা এবং পূজান্তে পুনরায় হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন হরিনাম সংকীর্তনের পর প্রায় পাঁচ-ছয়শত নরনারীকে অন্নভোগ ও চিড়াভোগ দেওয়া হয়, তৃতীয় দিনেও অনুরূপ পূজাদি হইয়া থাকে।

প্রচলিত নিয়ম অনুসারে প্রতি বৎসর চিড়াভোগের সঙ্গে কাঁঠাল নিবেদন করিতে হয়। এই অসময়ে কাঁঠাল পাওয়া অসম্ভব হইলেও শোনা যায়, উৎসবের আগে মোহন্তগণ স্বপ্নাদেশে কাঁঠালের সন্ধান পাইয়া থাকেন। ইহাতে গ্রামের সর্বসাধারণ যোগদান করিয়া থাকেন।

মেলা বিবরণী

রথযাত্রার মেলা

লোয়াদা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে রাধাবল্লভ-জীউর রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন গ্রামে রাস্তার দুইধারে মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এবং আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী আসেন।

মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, খেলনা-পুতুল, শিল্পসামগ্রী ও কারুশিল্পজাত দ্রব্যাদির শতাধিক দোকান-পাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচ, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং খেলাধূলা, কীর্তনগান, কবিগান ও যাত্রা-ভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। অনেকে লটারী খেলেন। গ্রামেই পুতুলনাচের দল আছে।

থানা ঃ সবঙ্গ

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ বাসুল্যা। ২৬৪।৪৫৪'৮৯।২৪৩।১,৫১৯

(ক) মাহিষ্য, তেলী, কুমার, তাঁতী, স্বর্ণকার, ডোম ও হাড়ী। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন হাউর হইতে সবঙ্গগামী মোটরবাসে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শম্ভুনাথ শিবের গাজন উৎসব এবং বৈশাখ মাসের যে-কোন শনি-মঙ্গলবার শীতলা-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটিই প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে দুই-তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় ষাট বৎরের প্রাচীন।

মেলায় চার-পাঁচশত নরনারী আসেন এবং মিষ্টান্ন, মনিহারী প্রভৃতির কয়েকটি দোকান বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য কবিগান ও যাত্রাভিনয় হয়।

(চ) গ্রামে একত্র তিনটি শিবমন্দির এবং একটি শীতলামন্দির ছাড়া বাবাঠাকুর ও শীতলার স্থান আছে।

শ্রীচিন্তামণি মাইতি, শিক্ষক,
গ্রাম : বালুশিয়া, মেদিনীপুর।

২। গ্রাম ঃ বৈঁচা। ২৭৫।১৮০'৬৩।৭১।৩৪০

(ক) মাহিষ্য, হাড়ী, ধোপা, চামার ও নাপিত।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বালিচক হইতে পিঙ্গলাগামী মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে বটেশ্বর শিবের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং গত ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ হইতে শুরু হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয় এবং পূজা প্রাঙ্গণে, ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী প্রভৃতি জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকান বসে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি শীতলামন্দির এবং একটি ঘরে বটেশ্বর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীগোবর্দ্ধন মাইতি, প্রধান শিক্ষক,
হারজান প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ঋড়ুগুন্ত, মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম ঃ গুণ্ডুত। ২৮২।৮৮৬'৬৮।১৫৫।৭৮৫

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, ধোপা ও শবর। গ্রামে চৌদ্দটি পাড়া আছে। যেমন—মহাপাত্রপাড়া, মূলাপাড়া, বামুনপাড়া, বেরাপাড়া, মণ্ডলপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বালিচক হইতে মেঠো পথ ধরিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ ১১ দিন ধরিয়া রুদ্রেশ্বর শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে ছয়-সাতদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রুদ্রেশ্বর শিবের একটি মন্দির ও তিনটি শীতলা আছে।

শ্রীঅনিল কুমার চক্রবর্তী, শিক্ষক,
বিথৰ্না উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ খাগড়াগেড়্যা, মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম ঃ সবঙ্গ। ২৯৩।২,৭৪৬'৭৮।৮০৬।৪,৩২৯

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, সদ্গোপ, তেলী, হাড়ী ও মুসলমান। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, তাঁতীপাড়া, মাহিষ্যপাড়া, ভাটপাড়া, গুড়িয়াপাড়া, সদ্গোপপাড়া, হাড়ীপাড়া, তেলী-পাড়া, ধোপাপাড়া ও মুসলমানপাড়া নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মাদুরবয়ন শিল্প।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বালিচক হইতে মোটর-বাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সম্প্রতিকালের।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে সাতদিন-ব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতিকালের।

(চ) গ্রামে রাধামাধবজীউর একটি মন্দির, একটি রঘুনাথজীউর মন্দির এবং একটি জগন্নাথদেবের মন্দির ছাড়া একটি শিবঠাকুর ও দুইটি শীতলা আছেন।

শ্রীবিজয় কুমার রাউল, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ সবঙ্গ, মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম ঃ বেলকী। ৩০৫।২১৭'৯৪।৯১।৪২৩

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, মাহিষ্য, তিলি, ধোপা, নাপিত ও ভূমিজ। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বালিচক হইতে সবঙ্গ রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা দুইটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে মেলায় সর্বসম্প্রদায়ের দুই সহস্রাধিক নরনারীর সমাগম হয় এবং ষাট-সত্তরটি দোকানপাট বসে।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে, বাসুলীদেবীর প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, একটি শীতলামন্দির, বিনন্দ-জীউ ও লক্ষ্মীজনাদনজীউর শিলামূর্তি আছে।

শ্রীভুবন চন্দ্র মাইতি, প্রধান শিক্ষক,
বেলকী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৬। গ্রাম ঃ তেঘরি বাড়কমল।
৩০৮।১৭১'০৩।৪২।১৮৭

(ক) কায়স্থ, মাহিষ্য, ছুতার ও সাঁওতাল। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বালিচক হইতে সবঙ্গ-গামী মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। কিছুকাল পূর্বেও জগন্নাথদেবের বিগ্রহসহ রথ বাহির হইত; কিন্তু রথটি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় বর্তমানে রথ টানা হয় না।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীগঙ্গাপদ মাজি, শিক্ষক,
চাঁদকুড়ি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৭। গ্রাম ঃ দশগ্রাম। ৩১৮।১,২২৯ ৫৬।২৮০।১,৫৩৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, হাড়ী, ডোম, ঘড়িয়াল, ছুতার, ধোপা, সাঁওতাল ও মুসলমান। গ্রামে ঘড়িয়ালপাড়া, নমঃশূদ্রপাড়া, মাঝেরপাড়া, তিলিপাড়া, মুসলমানপাড়া, হাড়ীপাড়া ও হাটপাড়া নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, মাদুরশিল্প ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন নারায়ণগড় হইতে ডেমোথানি রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মুসলমান ফকিরের আস্তানা আছে।

শ্রীকৃত্তিবাস ভক্ত, কৃষিজীবী,
গ্রাম ঃ রামচক, পোঃ দশগ্রাম,
মেদিনীপুর।

৮। গ্রাম ঃ বনাই। ৩৩৬।৮৩০'৭৮।২০৭।৭৬৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, ধোপা, হাড়ী, নাপিত, স্বর্ণকার, ডোম ও সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বালিচক হইতে জেলা বোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি মাত্র দশ-বার বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) বাসন্তীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতিকালের।

(চ) গ্রামে একটি শীতলা ও একটি শিবঠাকুর আছে।

শ্রীনিরাপদ পট্টনায়ক, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ বনাই, মেদিনীপুর।

৯। গ্রাম : খড়িকা। ৩৫১।৬৯৫।০৮।১৬৫৮০৮

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, নাপিত, ঘোড়াই, জেলে ও মুসলমান। গ্রামে পূর্বপাড়া, পশ্চিমপাড়া, উত্তরপাড়া ও মুসলমানপাড়া নামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বালিচক হইতে সবঙ্গ-গামী মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। তাহা ছাড়া, বর্ষাকালে নৌকা করিয়া গ্রামে যাতায়াত করিতে পারা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে খড়্গেশ্বর শিবের গাজন উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে রাসযাত্রা উৎসব এবং চান্দ্রমাসানুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজাটি সম্প্রতিকালের এবং অন্যান্য পূজাগুলি প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি আশি-নব্বই বৎসরের প্রাচীন।

দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতিকালের।

(চ) গ্রামের দাস পরিবারের গৃহদেবতা রঘুনাথজীউর মন্দির ও রাসমঞ্চ এবং খড়্গেশ্বর শিবের মন্দির আছে। তাহা ছাড়া, গ্রামে দুইটি শীতলামন্দির আছে।

শ্রীভুবন মোহন হাজরা, শিক্ষক,
গ্রাম : ছিনা, পোঃ খড়িকা,
মেদিনীপুর।

১০। গ্রাম : বিষ্ণুপুর। ৪০৭।২,৩৬৫৩৭।৬২০।৩,৭২৩

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজবংশী, মাহিষ্য, কামার, কুমার, ছুতার, মুচি, হাড়ী, তাঁতী নাপিত ও ধোপা। গ্রামে বর্মনপাড়া, মণ্ডলপাড়া, ভূঁইয়াপাড়া, ল্যায়াপাড়া, শীটপাড়া, মাইতি-পাড়া, শাসমলপাড়া, সামন্তপাড়া, জানাপাড়া, গুছাইৎপাড়া, দাসপাড়া, ঘোড়াইপাড়া ও বেরাপাড়া নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামটি কেলেঘাই নদীর তীরবর্তী বলিয়া নৌকাতে গ্রামে যাতায়াত করিবার সুবিধা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং বৈশাখ ও চৈত্র মাসে শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাগুলি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে ছয়দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শীতলামন্দির আছে। শোনা যায়, প্রায় একশত বৎসর পূর্বে গ্রামের জনৈক জেলের মাছ ধরা জালে আবদ্ধ হইয়া নদী হইতে একটি পাথর উঠে; কিন্তু সামান্য পাথর জ্ঞানে জেলে উহাকে পুনরায় নদীতে ফেলিয়া দেন। ঐ দিনই রাত্রিকালে নারায়ণ চন্দ্র পাণ্ডা নামে জনৈক ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া উক্ত পাথর খণ্ড জল হইতে উদ্ধার করেন এবং একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া পাথর খণ্ডটিকে শীতলা জ্ঞানে পূজা আরম্ভ করেন।

শ্রীহরিপদ গাতাইৎ, শিক্ষক,
বিষ্ণুপুর পূর্ববঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সবঙ্গ থানার অন্তর্গত কোলঙ্গা গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে কেলেঘাই নদীতে পুণ্যস্নান উপলক্ষে একটি মেলা বসে। মেলায় প্রায় চল্লিশ হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং ইহা সবঙ্গ থানার মধ্যে বৃহৎ মেলা বলিয়া দাবী করা হয়। গ্রামে একটি মন্দিরে শ্যামসুন্দরজীউ নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। স্থানীয় ভূঁইয়ারা ইহার সেবায়েত। পৌষসংক্রান্তির দিন ভক্তরা কেলেঘাই নদীতে পুণ্যস্নান করিয়া এই মন্দিরে পূজাদি দিয়া থাকেন। মেদিনীপুর হইতে দেহাটাগামী মোটরবাসে দশগ্রাম আসিয়া মেটে রাস্তায় প্রায় চার মাইল হাঁটিয়া এই গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

ইহা ভিন্ন, প্রতি বৎসর সবঙ্গ থানার কেলেঘাই নদীর তীরে 'তুলসীচারার মেলা' নামে একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন এবং ইহা স্থানীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় পরিচালনা করিয়া থাকেন। উৎসব প্রাঙ্গণে একটি উচ্চ খাড়াই মাটির স্তূপের উপর একটি তুলসীগাছের চারা রোপণ করা আছে। প্রতি বৎসর উৎসবকালে প্রতিটি ভক্ত হাতে এক ঢেলা মাটি ও নদীর জল লইয়া ঐ স্তূপের উপর আরোহণ করেন এবং তুলসী-গাছে জল ঢালিয়া দেন। বলা হয় আবহমানকাল ধরিয়া ভক্তদের দেওয়া মাটির দ্বারাই স্তূপটি সৃষ্টি হইয়াছে। তুলসীগাছে ভক্তদের জল ঢালিবার ফলে স্তূপটি পিচ্ছল হইয়া যায় এবং ঐরূপ পিচ্ছল ও কর্দমাক্ত স্তূপের গা বাহিয়া দলে দলে ভক্তরা উপরে উঠিতে চেষ্টা করেন। যাঁহারা সফলকাম হন তাঁহারা অবশ্যই নিজেকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করেন। উৎসবের সময় উক্ত স্তূপটিকে বেষ্টন করিয়া অনেকগুলি হরিনাম সংকীর্তনের দল চক্রাকারে সর্বক্ষণ হরিনাম সংকীর্তন করিতে থাকেন। উৎসবে প্রায় চার-পাঁচ হাজার নরনারী যোগদান করেন এবং নদীর তীরে একদিনের জন্য একটি মেলায় নানাপ্রকার জিনিসপত্র আমদানি হইয়া থাকে। (শ্রীঅরুণ কুমার রায়)

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

খড়িকা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে খড়েশ্বর শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি আশি-নব্বই বৎসরের প্রাচীন।

নিকটবর্তী পরেশপুর, নেবুয়া, ধামসাই, আশাপুরা, তালাডিহা, বালিসীতা, ছনা, লাড়ো প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারী মেলায় আসেন।

মেলার বিক্রেতাগণ স্থানীয় গ্রামবাসী এবং মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়চোপড় প্রভৃতি জিনিসপত্রের কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সাধারণতঃ কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—দুর্গাপূজা উপলক্ষে এই গ্রামের সতীরহাট নামক স্থানে চারদিনব্যাপী যে মেলা বসে তাহা উল্লিখিত মেলার অনুরূপ।

গুণ্ডত গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রুদ্রেশ্বর শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা জমির উপর ছয়-সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

আশপাশের হারনান, রাইনান, পেরুয়া, কুল্যা, বাঘমারী, বহুবলপুর, বুড়াল, বেরুড় প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে প্রায় পাঁচশত নরনারী মেলায় আসেন।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী প্রভৃতি দ্রব্যের কয়েকটি দোকানপাট বসে এবং সঙনাচ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্রেতারা স্থানীয়।

দুর্গাপূজার মেলা

বিষ্ণুপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পি, ডব্লিউ, ডি-র বাঁধের উপর ছয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় আশপাশের প্রায় সত্তর-পঁচাত্তরটি গ্রাম হইতে প্রত্যহ গড়ে তিন-চারি সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। গ্রামের সীমান্ত দিয়া প্রবাহিত নদী পথে নৌকায় বহু যাত্রী আসেন।

শিবচক, মুরারীচক, বালিচক, বাঁকিভেড়ী, মোহাড়, সিউলিপুর, রামভদ্রপুর, বালিসীতা, দাসপুর, মাধবচক প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ কাপড়চোপড়, মনিহারী ও অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিসপত্র লইয়া মেলায় আসেন। মেলায় শতাধিক দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী ও কাপড়চোপড় প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সৌখীন জিনিসপত্রের দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য প্রায় প্রতি বৎসর চণ্ডীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, মনসামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল প্রভৃতি গানের আসর বসে।

সবঙ্গ গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামের একটি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

সবঙ্গ থানার অধিকাংশ গ্রামগুলি হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রত্যহ গড়ে ছয়-সাতশত নরনারী মোটরবাস, গরুর গাড়ী ও নৌকা করিয়া মেলায় আসেন।

মেলার বিক্রেতাগণ সবঙ্গ থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা ও অন্যান্য নানা প্রকার জিনিসপত্রের শতাধিক দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য গ্রামের যুবকদল থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় করেন। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় সাত-আটশত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

বাসন্তীপূজার মেলা

বনাই গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর চারদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি-কালের।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত নরনারী এবং বিক্রেতারা প্রতি বৎসর মেলায় আসেন। মেলায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকান বসে ও কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, তেলেভাজা, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের আমদানী হয়। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিকের দল আসে এবং থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়।

রথযাত্রার মেলা

তেঘরি বাড়কমল গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে গ্রামের রথতলায় রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারী মেলায় আসেন এবং মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বাঁশ ও মাটির তৈয়ারী জিনিসপত্র ইত্যাদি আমদানী হয়। বিক্রেতারা নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কোন কোন বৎসর কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

থানা ঃ পিঙ্গল।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ ডাঙ্গরা। ৪৮।৪৫৫'২৮।৮৪।৩৬৩

(ক) হিন্দু। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বালিচক হইতে কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব। উৎসবটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। ইহা প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন। মেলায় তিন-চারশত যাত্রী আসেন এবং কয়েকটি ময়রা ও মনিহারীর দোকানপাট বসে।

(চ) গ্রামে পাঁচটি শিবমন্দির, দুইটি শীতলামন্দির ও দুইটি পঞ্চানন্দমন্দির আছে। শিবমন্দিরগুলির মধ্যে একটি মন্দিরে রুদ্রেশ্বর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীকামাখ্যা রঞ্জন চক্রবর্তী, গ্রামসেবক,
গ্রাম ঃ পিঙ্গলা, মেদিনীপুর।

২। গ্রাম ঃ টুঙ্গুরা। ৭৬।১,১৯৮'৪৩।২০১।৯৯৭

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বালিচক হইতে পাকা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব। ইহা গত প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। ইহা প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন। মেলায় প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয় এবং ময়রা, মনিহারী, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান বসে।

(চ) গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ ও একটি শীতলা আছে।

শ্রীকামাখ্যা রঞ্জন চক্রবর্তী, গ্রামসেবক,
গ্রাম ঃ পিঙ্গলা, মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম ঃ গোবর্দ্ধনপুর।
২০৪।১,১০৪'৮০।২৬৩।১,৪১৪

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন সবঙ্গ হইতে কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে রত্নেশ্বর শিবের গাজন উৎসব। উৎসবটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে দুইদিনব্যাপী। ইহা প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি শিবমন্দির এবং একটি শীতলামন্দির আছে। শিবমন্দির দুইটির মধ্যে একটি রত্নেশ্বর শিবমন্দির নামে পরিচিত।

শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, গ্রামসেবক,
গ্রাম ঃ মুণ্ডমারী, মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম ঃ পিণ্ডরুই। ২০৯।৯৯৭'০০।৩৮৭।১,৯০০

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, কলু, কুমার, তাঁতী, ধোপা, হাড়ী, ডোম ও মুচি। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন হাউর হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়। তাহা ছাড়া, বর্ষাকালে রেলস্টেশন হইতে নৌকায় যাতায়াত করিবার সুবিধা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। বৈশাখ মাসে দুইদিন। গত ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে এক সপ্তাহব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন। মেলায় প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয় এবং মাত্র দশ-পনরটি দোকানপাট বসে। আমোদ- প্রমোদের জন্য যাত্রা ও কবিগান অনুষ্ঠিত হয়।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির এবং দুইটি শীতলামন্দির আছে।

শ্রীগুণধর হাজরা, শিক্ষক,
পিণ্ডরুই উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম ঃ কেলেয়াড়া। ২২৯।৩৫৫৪৭।১৩৪।৭২৫

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে ভূঁইয়াপাড়া, সামন্ত-পাড়া, গুছাইতপাড়া, পাত্রপাড়া, মণ্ডলপাড়া, প্রামাণিক-পাড়া, সাউপাড়া, মাঝিপাড়া, নমঃশূদ্রপাড়া, বেহারাপাড়া, মিস্ত্রীপাড়া ও মুসলমানপাড়া নামে বারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন হাউর হইতে বালিচক-জলচক রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় শ্যামসুন্দরজীউর রাসযাত্রা এবং ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি প্রায় আশি বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে শ্যামসুন্দরজীউর প্রস্তর মূর্তি এবং শ্রীরাধিকার পিতল মূর্তি আছে।

শ্রীপঞ্চানন ভৌমিক, প্রধান শিক্ষক,
কেলেয়াড়া উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ লক্ষ্মীবাড়ী, মেদিনীপুর।

৬। গ্রাম ঃ তিলদাগঞ্জ। ২৩৫।১১৭১৭।৯৯।৫১৫

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন হাউর হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে তিলেশ্বর শিবের গাজন উৎসব। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিনব্যাপী। ইহা প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে চারটি শিবমন্দির ও তিনটি শীতলামন্দির ব্যতীত সাধারণের একটি দেবালয় আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, গ্রামসেবক,
গ্রাম : মুণ্ডামারী, মেদিনীপুর।

৭। গ্রাম ঃ জলচক। ২৩৬।৪৮৮৩৩।৪৫৯।২,৪৪৮

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে পনরটি পাড়া আছে। যেমন—ধোপাপাড়া, মাইতিপাড়া, কুমারপাড়া, হাড়ীপাড়া, মুচিপাড়া, মুসলমানপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বালিচক হইতে মোটর-বাসে গ্রামে যাতাযাত করা যায়। তাহা ছাড়া, হাউর রেলস্টেশন হইতে বর্ষাকালে নৌকাযোগে গ্রামে যাতায়াত করিবারও সুবিধা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ও দুইটি শীতলামন্দির আছে।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস, শিক্ষক,
গ্রাম : তিলদা, পোঃ জলচক, মেদিনীপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য— পিঙ্গলা থানার কাঁটাপুকুর গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরে জগন্নাথদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে মহাসমারোহে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রথযাত্রা উপলক্ষে এই স্থানে একটি মেলা বসে। পক্ষকাল-ব্যাপী এই মেলায় প্রায় বিশ হাজার নরনারীর সমাগম এবং নানা প্রকার জিনিসপত্রের আমদানী হয়।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

গোবর্দ্ধনপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গাজন উৎসব উপলক্ষে রত্নেশ্বর শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন এবং সাধারণতঃ বিকালের দিকেই লোক সমাগম হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত নরনারী গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলার বিক্রেতাগণ স্থানীয়। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, কাপড়চোপড়, ঔষধপত্র, বই-ছবি, লাঙ্গল-কাস্তে,

ঝুড়ি-চুপড়ী, কাঁচের গ্লাস, মাটির খেলনা-পুতুল প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য গ্রামের যুবকবৃন্দ থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় করিয়া থাকেন।

তিলদাগঞ্জ গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে তিলেশ্বর শিবের গাজন উপলক্ষে উপাস্য দেবতার প্রায় দুই বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রাম হইতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় পাঁচশত নরনারী মেলায় আসেন।

মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, কোদাল-কাস্তে, ধামা-কুলা, মাটির হাঁড়ি ও পুতুল প্রভৃতি নানাপ্রকার জিনিসপত্রের প্রায় চল্লিশটি দোকানপাট বসে। কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে।

জলচক গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর প্রায় সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

পিঙ্গলা থানার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিন-চারি সহস্র নরনারী মেলায় আসেন।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির খেলনা-পুতুল, হাঁড়ি-কলসী প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য মেলায় আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। বিক্রেতারা আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতেই প্রতি বৎসর আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক ও সঙনাচের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে বহু দর্শকের সমাগম হয়।

থানা ঃ খড়্গপুর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ খেমাশোলী। ৪৪।৩১৮'৩২।৮৯।৪৮৭

(ক) বৈরাগী, কুর্মি, তাঁতী, ডোম, মুচি, কামার, মাহিষ্য ও সাঁওতাল। গ্রামে উত্তরপাড়া ও দক্ষিণপাড়া নামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কলাইকুণ্ডা হইতে মোটর-বাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে ইন্দ্রপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) ইন্দ্রপূজার মেলা। ভাদ্র মাসে একদিন। মেলাটি গত নয়-দশ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে মনসা, শীতলা, গরাম, কালমুছি প্রভৃতি দেবদেবী আছে।

শ্রীহরিচরণ মান্না, প্রধান শিক্ষক,
খেমাশোলী সতীশ চন্দ্র উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

২। গ্রাম ঃ হরিয়াতাড়া। ৬৯১,৫৯৭'৯২।১৫০।৭১৮

(ক) ভূমিজ, তাঁতী, নাপিত, ধোপা, কোড়া, সাঁওতাল ও মুসলমান। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কলাইকুণ্ডা হইতে কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ়, চৈত্র ও পৌষ মাসে ধূমধামের সহিত হরিয়াবুড়ী নামে গ্রাম্য দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, সম্প্রতি গ্রামে একটি সরস্বতী পূজা হইতেছে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে শীতলা, মনসা ও হরিয়াবুড়ী দেবীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

গ্রাম দেবী হরিয়াবুড়ীর নাম অনুসারে গ্রামের নাম হরিয়াতাড়া হইয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দাস, শিক্ষক,
হরিয়াতাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ রাখাজঙ্গল, মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম ঃ কাঁথড়া। ১৭৮।২৬৯'৬৪।৩৪।১৫১

(ক) কায়স্থ, কৈবর্ত, সদ্গোপ, রজক, বৈরাগী, নাপিত ও সাঁওতাল। গ্রামে হিন্দুপাড়া ও সাঁওতালপাড়া নামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কলাইকুণ্ডা রেলস্টেশন হইতে পাকা রাস্তায় মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রাধাগোবিন্দ-জীউর রথযাত্রা উৎসব, ভাদ্র মাসে ঝুলনযাত্রা ও জন্মাষ্টমী, অগ্রহায়ণ মাসে রাসযাত্রা এবং মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, প্রতি বৎসর কালীপূজার পর গ্রামে গৃহপালিত গরু-মহিষগুলিকে গায়ে রং দ্বারা চিত্রিত করিয়া একটি মাঠের মধ্যে খোঁটায় বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার পর ঢাক-ঢোল, কাঁসির শব্দে উহাদের খ্যাপাইয়া দিয়া আনন্দ উৎসব করা হয়। এই সময় বহু দর্শকের সমাগম হয়।

শেষোক্ত উৎসবটি ভিন্ন অন্যান্য সবগুলি উৎসবই প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে সপ্তাহকালব্যাপী। ইহা প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রাধাগোবিন্দজীউর মন্দির ও সেবাশ্রম ছাড়া শীতলা ও মনসা আছে।

শ্রীভূপতি নাথ রায়, চাকুরী,
গ্রাম ঃ পাড়াপাড়া, পোঃ শলুয়া,
মেদিনীপুর।

**৪। গ্রাম ঃ এলাসাই রাঙ্গাদিঘী।
৩০১।২৯৮'৪৯।৬২।৩৫১**

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ভূমিজ, বাগ্দী ও সাঁওতাল। গ্রামে কায়স্থপাড়া, ভূমিজপাড়া, বাগ্দীপাড়া ও সাঁওতাল-পাড়া নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেনাপুর হইতে সাঁকোয়া লোকাল বোর্ডের রাস্তায় এবং উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড দিয়া বাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে একদিনের জন্য। ইহা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রঙ্কাবতীর মন্দিরে শীতলা, মনসা প্রতিষ্ঠিত আছে।

বলা হয় যে, গ্রামের একটি দীঘিতে রাঙ্গা পদ্ম, রাঙ্গা মাছ এমন কি দীঘির মাটিও রাঙ্গা ছিল বলিয়া গ্রামবাসীগণ ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন "রাঙ্গাদিঘী"।

শ্রীশ্রীপতিচরণ গিরি, প্রধান শিক্ষক,
বেনাপুর বিদ্যাভবন,
পোঃ বেনাপুর, মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম : ঘড়ুইগেড়্যা। ৫৩৪।৭৫·৯৭।১০।৫১

(ক) গ্রামের দুইটি পৃথক পাড়ায় পৃথকভাবে মাত্র বাগদী ও শবর জাতি বসবাস করেন।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন জকপুর হইতে মেদিনীপুর-কোলাঘাট রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রক্ষাকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি রক্ষাকালীমন্দির, একটি শীতলা-মন্দির এবং একটি হরিঠাকুরের মঞ্চ আছে।

শ্রীশিবানন্দ সিংহ, প্রধান শিক্ষক,
রূপনারায়ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জকপুর, মেদিনীপুর।

৬। গ্রাম : সাওড়দা। ৫৫৯।৬১·২১।৩৫।১৮৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তেলী, ধোপা ও গোয়ালা। গ্রামে উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, তেলীপাড়া ও বাগালপাড়া নামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন জকপুর হইতে মেদিনীপুর-কোলাঘাট রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে গোপীনাথজীউর রথযাত্রা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, শ্রাবণ মাসে ঝুলন, অগ্রহায়ণ মাসে রাসযাত্রা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে চার-পাঁচদিন-ব্যাপী। মেলাটি মাত্র গত বার বৎসর হইল শুরু হইয়াছে।

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনীযুক্ত একটি দেবালয়ে গোপীনাথজীউ নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণের প্রস্তর নির্মিত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দেবালয়ের সম্মুখে একটি রাসমঞ্চ আছে। তাহা ছাড়া, গ্রামে একটি শীতলা ও একটি বাসুলী দেবী আছে।

শ্রীবিজয় কৃষ্ণ দে, চাকুরী,
গ্রাম : শ্রীরামপুর, পোঃ শ্যামচক,
মেদিনীপুর।

৭। গ্রাম : বাড়বাঁসি। ৫৭৫।৬০৪·৪৫।১৫০।৮২৯

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, ভূমিজ, বেনে, নাপিত, কুমার, কামার, ময়রা, তেলী, হাড়ী, মুচি, ডোম, সাঁওতাল, ও মুসলমান। গ্রামে পনরটি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, বৈরাগীপাড়া, মাহিষ্যপাড়া, ভূমিজপাড়া, বেনে-পাড়া, নাপিতপাড়া, কুমারপাড়া, কামারপাড়া, ময়রাপাড়া, তেলীপাড়া, হাড়ীপাড়া, মুচিপাড়া, ডোমপাড়া, সাঁওতাল-পাড়া ও মুসলমানপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মাদপুর হইতে রেল-লাইনের পাশ দিয়া হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী উৎসব, কার্তিক মাসে কালীপূজা, ফাল্গুন মাসে সয়লা ও দোলযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে বাণেশ্বর শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন এবং কালীপূজাটি ১৩১২ বঙ্গাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে দুইদিন। ইহা প্রায় যাট বৎসরের প্রাচীন।

দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে সপ্তাহকালব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালীমন্দির, একটি মনসামন্দির, দুইটি শীতলামন্দির এবং বাণেশ্বর শিবের মন্দির আছে। শিবমন্দিরটি কাল পাথরের দ্বারা নির্মিত এবং বহু প্রাচীন। আদিতে মন্দিরটির সুউচ্চ চূড়ায় স্বর্ণ কলস ও ধ্বজা বিশিষ্ট ছিল। জনশ্রুতি আছে, কালাপাহাড় মন্দিরের চূড়াটি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পর চূড়ার উপর সিমেণ্ট করিয়া কেবল মাত্র ধ্বজাটি স্থাপন করা হইয়াছে। অদ্যাবধি মন্দিরের ভগ্ন চূড়াটি মন্দির প্রাঙ্গণে সযত্নে রক্ষিত আছে। তাহা ছাড়া, গ্রামে রঘুনাথজীউর বিগ্রহ এবং পাঁচলেশ্বর, রুদ্রেশ্বর ও বটেশ্বর নামে তিনটি শিবলিঙ্গ একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামে একটি মসজিদ আছে।

কিংবদন্তী আছে যে, এই গ্রামের পূর্বনাম ছিল লোহাগ্রাম এবং বাঁশী পাল ও বুধি পাল নামে দুই ভাইয়ের বাস ছিল। এই গ্রামটি তাঁহাদের তালুকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে এই গ্রামের তালুক দুই ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হইয়া যায় এবং বড় ভাইয়ের অংশ 'কড়বাঁসি' ও ছোট ভাইয়ের অংশ 'কড়বুধি' নামে পরিচিত হয়।

শ্রীতারাপদ আচার্য, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ বাড়বাঁসি,
মেদিনীপুর।

৮। গ্রাম ঃ আতরা। ৬০৯।৪৪১'৪০।১১৩।৫৭৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, রাজপুত, তাঁতী, বাগ্দী, কাওরা, ভূমিজ ও সাঁওতাল। গ্রামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মাদপুর হইতে ক্যানেলের পাড় দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রক্ষাকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি গত পঁচিশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে সাতদিনব্যাপী। ইহা গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ বসিতেছে। মেলায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় পাঁচশত নরনারী আসেন।

(চ) গ্রামের মধ্যস্থলে একটি শিবমন্দির এবং একটি শীতলামন্দির আছে।

শ্রীনিতাই চাঁদ, প্রধান শিক্ষক,
আতরা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৯। গ্রাম ঃ গোকুলপুর। ৬২৪।৪৪৫'৫১।৯১।৪৭৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শোলাঙ্কি, বৈরাগী, ধোপা, নাপিত, হাড়ী, মুচি, মাঝি ও সাঁওতাল। গ্রামে কায়স্থপাড়া, জরডিহাপাড়া, পূর্বপাড়া, বামনপাড়া, মুচিপাড়া, মাঝিপাড়া, হাটপাড়া, হাড়ীপাড়া, শূরপাড়া ও সাঁওতালপাড়া নামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেনাপুর এবং মাদপুর। উভয় রেলস্টেশন হইতে ক্যানেল বিভাগের বাঁধের উপর দিয়া হাটা পথে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ধর্মরাজপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীপূজা, ভাদ্র মাসে ভীম একাদশীতে ভীমপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে গোষ্ঠ উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবচতুর্দশী উৎসব, কালীপূজা ও শীতলাপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

ভীমএকাদশীর মেলা। ভাদ্র মাসে একদিন। ১৩৬০ বঙ্গাব্দ হইতে মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

কালীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

শীতলাপূজার মেলা। চৈত্র মাসে তিন-চারদিনব্যাপী।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির, একটি কালীমন্দির এবং একটি ধর্মরাজমন্দির আছে। শিবমন্দিরে গোকুলেশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহা ছাড়া, একটি মনসা, একটি পঞ্চানন্দ ও একটি শীতলা আছে।

বহুকাল পূর্বে চন্দ্রশেখর ঘোষ নামে জনৈক ব্যক্তি গ্রামে একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে কপালেশ্বরী নদী উক্ত মন্দিরটিকে গ্রাস করে। পরে নদীর চড়া পড়িলে পর ঐ স্থানে পুনরায় একটি কালীমন্দির নির্মাণ করিয়া যথারীতি পূজার ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীসীতারাম ভট্টাচার্য, শিক্ষক,
গোকুলপুর বাণীভবন,
পোঃ বাড় গোকুলপুর,
মেদিনীপুর।

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক খড়্গপুর শহরে অনুষ্ঠিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উৎসব-পার্বণাদি সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

খড়্গপুর শহর

কলিকাতা হইতে প্রায় ৭২ মাইল দূরে মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর শহরটি অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে এইস্থানে একটি জংশন স্টেশন আছে এবং এই স্টেশনকে কেন্দ্র করিয়াই ধীরে ধীরে এই বৃহৎ শহরটি গড়িয়া উঠিয়াছে। তৎপূর্বে সমতল ভূমি হইতে প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ এই ভূখণ্ডটি তরুলতাহীন বিস্তীর্ণ মরুভূমির মত দেখাইত। লোকে ইহাকে "খড়্গপুরের দমদমা" বলিত।

স্টেশনের নিকটে ইন্দ্রাপল্লীতে খড়্গেশ্বর নামে খ্যাত শিবের একটি প্রাচীন মন্দির আছে। কাহার মতে ইহা খড়্গপুর থানার কলাইকুণ্ডা গ্রামের ধারেন্দার রাজা খড়্গসিংহের দ্বারা নির্মিত; আবার কাহার মতে ইহা বিষ্ণুপুর রাজা খড়্গমল্ল দ্বারা নির্মিত। চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত একটি প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে বাঁধান উচ্চ চত্বরের উপর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি মাঝারি গঠনের এবং উড়িষ্যার রেখদেউল স্থাপত্য রীতিতে গঠিত। ইহার সম্মুখভাগে জগমোহন সংযোজিত। মূল মন্দিরের অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভগৃহের মেঝের উপর সিমেন্ট দ্বারা নির্মিত গৌরীপট্ট ভেদ করিয়া প্রস্তররূপী শিবলিঙ্গ উঠিয়াছে। ইনিই খড়্গেশ্বর শিব এবং ইঁহারই নামানুসারে এই স্থান খড়্গপুর নাম ধারণ করিয়াছে। মানসিক পূজাদি দিতে প্রতিদিনই মন্দিরের যাত্রীর সমাগম হয়। ফাল্গুন মাসে শিব চতুর্দশী তিথিতে এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে ধূমধামের সহিত খড়্গেশ্বর শিবের পূজা হইয়া থাকে।

খড়্গেশ্বর মন্দির হইতে সামান্য দূরে একটি মন্দিরে হিড়িম্বেশ্বরী নামে এক দেবী মূর্তির পূজা হয়। কথিত আছে ইনি মহাভারতোক্ত হিড়িম্বা রাক্ষসীর আরাধ্য দেবী ছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে বলা হয়, বনবাসকালে পঞ্চপাণ্ডব এই স্থানে আগমন করিলে হিড়িম্ব রাক্ষসের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ হয় এবং ভীমের হস্তে হিড়িম্বের নিধন ঘটে। হিড়িম্বের ভগিনী হিড়িম্বা ভীমের রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করে। হিড়িম্বার নাম হইতেই এইস্থান 'হিড়িম্বাডাঙ্গা নামে পরিচিত।

বর্তমানে সমতল ছাদ বিশিষ্ট একটি ঘরের অভ্যন্তরে সিমেন্টের বেদীর উপর অষ্টধাতু নির্মিত চতুর্ভুজা হিড়িম্বেশ্বরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। হিড়িম্বেশ্বরীর শিরে জটার ন্যায় একটি স্তূপ আছে; উহা সিন্দুর রঞ্জিত। মূর্তিটির আকৃতি সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। ইহা ভিন্ন, এই ঘরে সম্পূর্ণ সিন্দুর লিপ্ত বিকট দর্শন একটি মুখমণ্ডল আছে—শীতলাজ্ঞানে ইঁহাকে পূজা করা হয়। বাৎস্য গোত্রীয় মিশ্র পদবীধারী ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা কালিকার ধ্যানে হিড়িম্বেশ্বরীর নিত্য পূজা করিয়া থাকেন। প্রতিদিন মন্দিরে মানসিক পূজা দিতে আশপাশের অঞ্চল হইতে লোকজন আসেন। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে ধূমধামের সহিত হিড়িম্বেশ্বরীর পূজা হইয়া থাকে। এই সময় দেবীর উদ্দেশ্যে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। বর্তমান মন্দির ঘরটি সাধারণের অর্থানুকূল্যে ৫ই ভাদ্র, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে নির্মিত হইয়াছে। কথিত আছে হিড়িম্বেশ্বরীর প্রস্তর নির্মিত আদি মন্দিরটি কালাপাহাড় কর্তৃক বিনষ্ট হইলে দেবী ইন্দ্রাপল্লীস্থ ওন্দাপুকুরের বায়ু কোনে আত্মগোপন করেন। বর্তমান পূজারী মিশ্রগণের ঊর্ধতন চতুর্থ পুরুষ সুন্দরনারায়ণ মিশ্র স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া উক্ত মূর্তি উদ্ধার করেন এবং নিজগৃহে আনিয়া যথারীতি পূজার ব্যবস্থা করেন। উল্লিখিত মন্দির ঘর নির্মাণের পর মিশ্রদিগের গৃহ হইতে হিড়িম্বেশ্বরী মূর্তি আনিয়া এইস্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমান মন্দির প্রাঙ্গণে একটি কূপের নিকট প্রস্তর নির্মিত মন্দিরের চূড়ার বেঁকি অংশ পড়িয়া আছে, বলা হয় ইহা হিড়িম্বেশ্বরীর আদি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ।

খড়্গপুর শহরের মধ্যে পীর লোহানী সাহেব নামে জনৈক মুসলমান পীরের সমাধি আছে। পীরের পূর্ণ নাম সৈয়দ শা মীরুখান লোহানী মতান্তরে আমীর খাঁ। সম্ভবতঃ তিনি লোহানীবংশীয় ছিলেন বলিয়া পীর লোহানী নামে পরিচিত হন। শোনা যায় তাঁহার পূর্ব নিবাস উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছিল এবং প্রায় সাড়ে চারশত

বৎসর পূর্বে তিনি এই অঞ্চলে ভ্রমণে আসিয়া এক স্থানে আস্তানা নির্মাণ করেন। জনহিতকর কার্যে জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট তিনি সবিশেষ শ্রদ্ধালাভ করেন। তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। পীর লোহানী সাহেবের আস্তানার নিকট একটি প্রাচীন ভগ্ন মন্দির আছে; লোকে বলে রঙ্কনী দেবীর মন্দির। বর্তমানে মন্দিরে কোন মূর্তি নাই। কিংবদন্তী আছে, পীর লোহানী সাহেবের সহিত এক সংঘর্ষে রঙ্কিনী দেবী মন্দির ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কিংবদন্তীটি ইতিপূর্বে মেদিনীপুর শহর সম্পর্কিত বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

লোহানী পীরের আস্তানার চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত একটি প্রশস্ত উচ্চ চত্বরের উপর পাশাপাশি এক গম্বুজ বিশিষ্ট দুইটি ঘর আছে। ঘর দুইটির মেঝে শ্বেত প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত। ইহার পশ্চিমদিকের ঘরে লাল শালু কাপড়ে আচ্ছাদিত লোহানী পীরের সমাধি আছে। সমাধির চারিপাশ লোহার রেলিং দিয়া ঘেরা এবং উপরে সামিয়ানা টাঙ্গান পাশের ঘরটিতে তাঁহার সহোদরা (মতান্তরে মাতা) ফতে-খাতুনের এবং লাল খাঁ ও তার খাঁ নামক ভাগিনয়দ্বয়ের সমাধি আছে। ইহা ভিন্ন, আস্তানায় আশ পাশে উন্মুক্ত-প্রাঙ্গণে তাঁহার কয়েকজন ভক্ত-শিষ্যের সমাধি দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেকগুলি প্রাচীন বৃক্ষ উক্ত প্রাঙ্গণটিকে ছায়া সুশীতল করিয়া রাখিয়াছে। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রতিদিন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকজন পীরের উদ্দেশে সিন্নি দিয়া হাজত পূজা দেন। ১১ শরীফের চাঁদে ২০শে তারিখে পীরের উরস্ পালন করা হয়। এইদিন নানাস্থান হইতে প্রায় তিন হাজার লোকজন আসেন এবং উৎসব প্রাঙ্গণে নানাবিধ জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে এবং কাওয়ালী গান ও সর্বজনীন ভোজ হয়। উরস্ ব্যতীত প্রতি বৎসর ইদ ও মহরমের সময় প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার মুসলমান এই স্থানে জমায়েত হইয়া ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। মহরম উপলক্ষে এই স্থানে একটি মেলা বসে। পীরের উৎসবাদি পরিচালনার জন্য নবাবী আমল হইতে বহু নিষ্কর ভূসম্পত্তি আছে। খড়্গপুর পাঁচবেড়িয়া নিবাসী শ্রীনাসির আলী খান বর্তমানে পীরের খাদেম এবং পূজারী শ্রীগোলাপনবী চৌধুরী।

ইহা ভিন্ন, খড়্গপুর শহরে প্রতি বৎসর শারদীয়া বিজয়া দশমী তিথি দশরা নামে একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রধানতঃ স্থানীয় প্রবাসী দক্ষিণ ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত হইলেও শহরবাসী সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। বিজয়া দশমীর দিন কাগজের মণ্ড দ্বারা দশানন রাবণের একটি বিরাট মূর্তি নির্মাণ করিয়া খড়্গপুর রেলওয়ে কারখানার নিকট একটি উন্মুক্ত মাঠে স্থাপন করা হয়। রাবণের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভ্যন্তরে স্থানে স্থানে বারুদ ভর্তি থাকে। সন্ধ্যাকালে রামবেশী জনৈক ব্যক্তি তীরের মাথায় অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাবণের এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিক্ষেপ করেন এবং বারুদের সহিত অগ্নির স্পর্শ ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গে এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সশব্দে বিস্ফোরিত হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে রাবণের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ ভস্মে পরিণত হইলে পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। সন্ধ্যা হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত এই উৎসব চলে এবং ইহা প্রত্যক্ষ করিতে মেদিনীপুরের নানা স্থান হইতে অগণিত লোকজন আসেন। উৎসবের দিন সন্ধ্যার পূর্বে উদ্যোক্তরা অনেকে নানারূপ দেবদেবীর মূর্তিতে সজ্জিত হইয়া লরিতে করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে শহরের নানা রাজপথ ঘুরিয়া উৎসব প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হন। খড়্গপুরের দশরা উৎসব বর্তমানে একটি জনপ্রিয় লোকোৎসবে পরিণত হইয়াছে।

খড়্গপুর শহরের নিকটবর্তী অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থান ও তথাকার দেবদেবীর মন্দির সম্পর্কে শ্রীযোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃতি দেওয়া হইল—

"খড়্গপুর রেলওয়ে স্টেশনের পূর্ব্বদিকে প্রায় চার পাঁচ মাইল অন্তরে চাঙ্গুয়াল নামে একখানি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে এবং তৎসন্নিহিত দেউলী প্রভৃতি স্থানে ঘোলা দীঘি, ক্ষীরসরোবর, বীরসরোবর, নজর প্রভৃতি নামে কয়েকটি দীর্ঘ জলাশয় ও প্রস্তর-নির্মিত কতকগুলি মন্দির ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই সকল রাজা বীরসিংহ ও তদীয় বংশধরগণের কীর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। চাঙ্গুয়ালের বর্তমানে জমিদারগণ উক্ত গ্রামের নানাস্থানে পতিত প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ

হইতে কয়েক লক্ষ ইষ্টক ও প্রস্তরাদি গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও ভূগর্ভে ও ভূপৃষ্ঠে যথেষ্ট ইষ্টক ও প্রস্তর রহিয়াছে। এই গ্রামের মধ্যে "ধনপোতা" নামে একটি স্থান আছে। প্রবাদ, পূর্ব্বকালে ঐ স্থানে প্রাচীন রাজবংশের ধনাগার ছিল, সময় সময় উক্ত স্থানের মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে কেহ কেহ নাকি অর্থও প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বীরসিংহের ভগ্ন প্রাসাদের পার্শ্বে কালনাগিনী নাম্নী এক প্রাচীন দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। লোকে বলে এ প্রদেশে বীরসিংহের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই এই দেবী এখানে সংস্থাপিতা আছেন। কালনাগিনী দেবীর মন্দিরের কিছু পশ্চিমে ক্ষীর সরোবরের তীরে একটি প্রাচীন শিবালয়ও আছে। জনশ্রুতি, ইহা বীরসিংহের বংশের কীর্ত্তি।

চাঙ্গুয়াল গ্রামের প্রায় অর্দ্ধ মাইল অন্তরে শিরমী ও চকদেউল গ্রামের সীমায় যোলাদীঘি নামে একটি সুবৃহৎ দীঘি আছে। উহার পরিমাণ ফল প্রায় একশত বিঘা। যোলাদীঘি যোল খণ্ডে বিভক্ত। যোলটি পুষ্করিণী একত্র সংযোগ করিলে যেরূপ ভাব পরিলক্ষিত হয়, এখানেও প্রায় তদ্রূপভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। জনশ্রুতি, যোলজন সর্দ্দারের অধীনে পৃথক পৃথক ভাবে প্রথমে যোলটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া পরে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দীঘির উভয় পার্শ্বে বাঁধা ঘাটের পশ্চিম দিকে পূর্ব্বাভিমুখে একটি হোমকুণ্ড ছিল এবং ঘাটের উপরিভাগের কতক অংশ স্তম্ভযুক্ত ছাদ বা চাঁদনী দ্বারা আবৃত ছিল। চাঁদনীর প্রস্তর গাঁথনীর চিহ্ন অদ্যাপি স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে; স্থানটি এক্ষণে চাঁদনীচক নামে পরিচিত।

দীঘির উত্তর ও পশ্চিম পার্শ্বের পাড়ের উপরিভাগে চারিটি দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ পার্শ্বেও তিনটি শ্রেণীবদ্ধ প্রস্তর নির্মিত দেউল ছিল। এই তিনটি দেউলের ভগ্নাবশেষ তিনটি কঙ্করস্তর মণ্ডিত বৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। দৈব-প্রভাব ভীতি লোকের মনে অত্যন্ত প্রবল থাকায় বহুকাল কোন ব্যক্তি ঐ স্থানের একখানি প্রস্তর গ্রহণ বা স্থানচ্যুত করিতে সাহস না করায় ঐ স্তূপীকৃত মৃত্তিকার অভ্যন্তরে মন্দিরের অবশিষ্টাংশ যে কিরূপ ছিল তাহা জানিবার কোন উপায় ছিল না। ৪০।৫০ বৎসর হইল নিকটবর্ত্তী ধীতপুকুর গ্রামের জমিদার মহাশয়েরা একটি নূতন বাটী প্রস্তুত করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত তিনটি স্তূপের মধ্যে সর্ব্বোত্তরাংশের স্তূপটি খনন করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় দেখা গিয়াছিল যে, একটি সুগভীর সমচতুষ্কোণ বৃহদায়তন প্রস্তর স্তম্ভের উপর উক্ত মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ স্তম্ভ বা মঞ্চের কোণচতুষ্টয় লৌহপাত দ্বারা সংযোজিত ছিল এবং প্রস্তরগুলি অতি সুন্দরভাবে বিণ্যস্ত হইয়াছিল। ঐ সকল প্রস্তর মধ্যে একটি পাষাণময়ী দীর্ঘকায়া ভগ্ন হস্তপদ দশভুজা মূর্ত্তি ও একখণ্ড শিলালিপি পাওয়া গিয়াছিল। বহুকালের লিখিত প্রস্তর ফলকটির অক্ষরগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাওয়ায় এক্ষণে উহার পাঠোদ্ধার করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। জমিদার মহাশয়েরা ধীতপুর ভবনস্থ কুলদেবতা রঘুনাথজীউর মন্দিরের ভিত্তির উপরিভাগে উক্ত প্রস্তর ফলকখানি সংস্থাপিত করিয়াছেন। প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিটিও উক্ত মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। লোকে বলে যোলাদীঘির মধ্যস্থলে একটি মন্দির আছে এবং সেই মন্দিরে এক দেবতা আছেন। ঐ মন্দির ও দেবতা সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। যোলাদীঘির বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়; আবর্জ্জনা ও পঙ্কে পরিপূর্ণ। খড়্গপুর পরগণার মধ্যে বারবাটিয়া ও কৌশল্যা নামে ও দুইটি সুবৃহৎ ও সুরম্য সরোবর আছে।

খড়্গপুর থানার মধ্যে বলরামপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত 'আড়াসিনীগড়' ও 'অযোধ্যাগড়' বিশেষ প্রসিদ্ধ। কাল-বিবর্ত্তনে রাজবংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল গড়ের পূর্ব্বশ্রী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অযোধ্যাগড়ের মধ্যে 'জোড় বাঙ্গালা' ও 'পঞ্চরত্ন' নামে প্রস্তর-নির্মিত দুইটি মন্দির আছে। রাজা বীরসিংহের বংশধর রাজা সুরথ সিংহের কুলদেবতা সিংহবাহিনী জোড় বাঙ্গালায় অধিষ্ঠিতা ছিলেন এবং পঞ্চরত্ন মন্দিরটি শ্যামসুন্দরজীউ বিগ্রহের জন্য নির্মিত হইয়াছিল। রাজা সুরথ সিংহের মৃত্যুর পর দুইটি মন্দিরই বলরামপুর রাজবংশে অধিকারভুক্ত হইয়াছিল এবং এই বংশের রাজা শত্রুঘ্ন মহাপাত্র দেবতা দুইটি সেবা পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে এখনও অতিথি, অভ্যাগত এইস্থানে প্রসাদান্ন পাইয়া থাকেন। ইহা বলরামপুরের ঠাকুরবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ।

খড়্গাপুর থানার অন্তর্গত কলাইকুণ্ডা গ্রামে ধারেন্দার প্রাচীন রাজবংশের গড় ছিল। বাঘাসিনী দেবী এই রাজবংশের কুলদেবতা। একটি হস্তির উপর সিংহ এবং তদুপরি প্রস্তরময়ী চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি। মহেশপুর নামক গ্রামের 'যমুনাদীঘি' নামক পুষ্করিণীটি এই বংশের তৃতীয় রাজা খড়্গা সিং পালের সময়ে খোদিত হইয়াছিল। উত্তর-কালে এই বংশের অন্যতম রাজা প্রতাপনারায়ণ পাল তাঁহার সহোদরার বিবাহের যৌতুক স্বরূপে উক্ত পুষ্করিণী মেদিনীপুরের স্বনামধন্য পুরুষ দেওয়ান চন্দ্রশেখর ঘোষের পিতামহ নন্দকিশোর ঘোষকে প্রদান করেন। চন্দ্রকিশোর ঘোষের দানশীলতাই মেদিনীপুর জেলায় "দানে চন্দ্র" প্রবাদ বাক্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

খড়্গাপুর থানার অন্তর্গত জকপুর গ্রামে "সদরকাননগো" পদে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত 'মহাশয়' বংশের বাস ছিল। তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরবের পরিচয় দিতে এক্ষনে কয়েকটি পঙ্ক-পরিপূর্ণ সুদীর্ঘ পুষ্করিণী, কয়েকটি ভগ্ন দেবমন্দির ও কারুকার্য্য খচিত কয়েকটি প্রকাণ্ড জীর্ণ অট্টালিকা পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীগণের মধ্যে যক্ষেশ্বর ও গণেশের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই দুইটি দেবমূর্তি ও দুইটি মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছিল। যক্ষেশরের নামেই স্থানটির নাম যক্ষপুর বা জকপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামখানি চকগণেশ নামকরণ হইয়াছিল। বর্গীর হাঙ্গামার সময় দুর্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ মন্দির লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত ধনরত্ন ও মূর্তি দুইটি অপহরণ করিয়া লইয়া যায়।

জকপুরের নিকটবর্তী মালঞ্চ গ্রামেও মহাশয় বংশের এক শাখা এক্ষণে বাস করিতেছেন। ঐ স্থানের কালী-মন্দিরটি ঐ বংশের সন্তান গোবিন্দরাম রায় কর্তৃক ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (পৃঃ ৩৪৩-৩৪৭)

মেলা বিবরণী

ইন্দ্রপূজার মেলা

খেমাশোলী গ্রামে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে ইন্দ্রপূজা উপলক্ষে ৩নং ন্যাশনাল হাইওয়ের পার্শ্বস্থিত প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। ইহা গত নয়-দশ বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে।

খড়্গাপুর, ঝাড়গ্রাম, শাকরাইল প্রভৃতি স্থান হইতে প্রধানতঃ কুর্মি সম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাঁচশত নরনারী মেলায় আসেন। দূরবর্তী স্থানের যাত্রীগণ প্রধানতঃ মোটরবাস, সাইকেল রিক্সা ও গরুর গাড়ী করিয়া আসেন।

সরডিহা, মাণিকপাড়া, খড়্গাপুর, কলাইকুণ্ডা প্রভৃতি স্থানগুলি হইতে প্রায় প্রতি বৎসর বিক্রেতাগণ আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, মাটির হাঁড়ি-পুতুল, বেতের ধামা-কুলা প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, লটারী দল আসে।

কালীপূজার মেলা

ঘড়ইগেড়্যা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রক্ষাকালী-পূজা উপলক্ষে কালীমন্দির সংলগ্ন প্রায় চৌদ্দ-পনর বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

খড়্গাপুর, মেদিনীপুর এবং তৎসংলগ্ন স্থানগুলি হইতে প্রায় তিন-চার হাজার নরনারী মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ খড়্গাপুর ও মেদিনীপুর শহর হইতে প্রায় প্রতি বৎসর মেলায় আসেন। মেলায় প্রায় একশত দোকান বসে এবং পনর-কুড়িজন ফেরিওয়ালাও আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়চোপড়, বাসনকোসন, বই-ছবি, ঝুড়ি-চুপড়ী, কাস্তে-কোদাল প্রভৃতি জিনিসপত্রের দোকানপাট ছাড়া চানাচুর, আইসক্রীম চা-পান-বিড়ির দোকানপাটও বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক ও লটারীর দল আসে। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গ্রামের যুবক সম্প্রদায় বিশেষ সহযোগিতা করেন। তাহা ছাড়া, খড়্গাপুর লোকাল থানা হইতেও পুলিশ আসে।

গোকুলপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে কালীপূজা উপলক্ষে দেবীর মন্দির সংলগ্ন জমিতে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন থানা হইতে প্রায় পাঁচ-সাত সহস্র নরনারী মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী।

মেলার বিক্রেতাগণ বালিচক, মাদপুর, বেনাপুর, সবঙ্গ, সেঁকুরা, পিঙ্গলা, খড়্গপুর টাউন প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। শতাধিক দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্নের দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া, বাসনকোসন কাপড়চোপড়, বই-ছবি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, খেলনা-পুতুল, হাঁড়ি-কলসী ইত্যাদি আমদানী হয়। ইহা ছাড়া, বহু ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক, লটারী, নানাপ্রকার ক্রীড়ানুষ্ঠান এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন বৎসর কলিকাতা হইতে যাত্রাদল আসে। তাহা ছাড়া, মেলায় আতসবাজি পোড়ান হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় তিন-চারি সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গোকুলপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত ধর্মপূজার মেলা, ভীম একাদশীর মেলা ও শীতলাপূজার মেলা উল্লিখিত কালীপূজার মেলার অনুরূপ।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

এলাসাই রাঙ্গাদীঘি গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে গ্রামের রাঙ্গাদীঘির পাড়ে প্রায় চার-পাচ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। সাধারণতঃ বিকালেরদিকেই লোক সমাগম ও বেচাকেনা হয়।

হরিপুর, চাঙ্গুয়াল, নয়াপাষনা, জিতপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিন-চার হাজার নরনারী গরুর গাড়ী, সাইকেল রিক্সা করিয়া ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলার বিক্রেতাগণ খড়্গপুর, চাঙ্গুয়াল, হরিপুর, শ্যামলপুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। প্রায় আশি-নব্বুইটি দোকানপাট বসে এবং আট-দশজন ফেরিওয়ালা আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র এবং মাটির খেলনা ও হাঁড়ির দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক, সার্কাস ও লটারীর দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়। যাত্রাভিনয় দেখিতে প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

বাড়বাঁসি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। সকাল হইতে অধিক রাত্রি পর্যন্ত মেলায় লোকসমাগম হয়। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল ছাড়া খড়্গপুর, ডেবরা, পিঙ্গলা, সবঙ্গ, পাঁশকুড়া, নারায়ণগড় থানার কয়েকটি গ্রাম হইতে প্রায় দুই সহস্র নরনারী মেলায় আসেন।

মেদিনীপুর শহর, তমলুক এমন কি কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতা ও ফেরিওয়ালারা আসেন। দোকান-পাটের মধ্যে ময়রা দোকানের সংখ্যা সর্বাধিক। তাহা ছাড়া মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, তাঁত ও মিলের কাপড়চোপড়, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধামা-কুলা-চুপড়ী এবং অন্যান্য নানা প্রকার জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। প্রধানতঃ পাঁশকুড়া ও ভোগপুর হইতে তাঁতের কাপড়; ডেবরা, শাঁকমণ্ডল এবং সবঙ্গ হইতে বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র এবং চকসুজান, জালিবান্ধা, ভাণ্ডারিয়া প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা প্রভৃতি প্রায় প্রতি বৎসরই আমদানী হয়। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক, লটারী ও জুয়াখেলার দল আসে এবং ক্রীড়ানুষ্ঠান, চণ্ডীমঙ্গল ও শিবায়ন গান এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কলিকাতা হইতে প্রায় প্রতি বৎসর পেশাদারী যাত্রাদল আসে। এই সকল অনুষ্ঠানে বহু সংখ্যক দর্শক ও শ্রোতার সমাবেশ ঘটে।

রথযাত্রার মেলা

কাঁথড়া গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রাধাগোবিন্দ-জীউর রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে সরকারী প্রায় এক বিঘা

জমির উপর সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন এবং সাধারণতঃ বিকালের দিকেই লোক সমাগম বেশী হয়। স্থানীয় গ্রামবাসী ছাড়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে প্রায় সাত-আটশত নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়াই মেলায় আসেন।

ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, মাটির হাঁড়ি-কলসী, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয়, তাঁহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না। উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন হরিনাম সংকীতন ব্যতীত কোন কোন বৎসর যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

সাওড়দা গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে গোপীনাথ-জীউর রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন স্থানে একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র বার বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

আশপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় সাত-আটশত নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। বিক্রেতারা শ্যামচক, বুড়ামূলা, অর্জুণী প্রভৃতি গ্রাম হইতে আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিকের দল আসে এবং যাত্রা ও কবিগানের ব্যবস্থা করা হয়।



থানা ঃ নারায়ণগড়

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ আন্দার শুড়া। ২২২।৯০৪৩।১৩।৫৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধোপা, তাঁতী, লোধা, মালাকার, কামার ও স্বর্ণকার। গ্রামে পাচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন নারায়ণগড় হইতে কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়। বর্ষাকালে কেলেঘাই নদী নৌকায় পার হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিতে হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা। উৎসবটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে বাসন্তী দেবীর পিতল নির্মিত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহা ছাড়া, গ্রামে শীতলা এবং চণ্ডীর প্রস্তর মূর্তি আছে।

শ্রীসন্তোষ কুমার পড়া, প্রধান শিক্ষক,
যমুনা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ডিবরপণ্ড, মেদিনীপুর।

২। গ্রাম ঃ কসবা নারায়ণগড় (মৌজা ঃ বহুরূপা)
২৬৮।১,৭৭৫৬৭।৪৫৮।২,০১২

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, ধোপা, মাহিষ্য, লোধা, ডোম, নমঃশূদ্র ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। নিকটবর্তী অহল্যাবাঈ রোড দিয়া মোটরবাস যাতায়াত করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও ব্রহ্মাণী দেবীর বার্ষিক উৎসব, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে রাসযাত্রা উৎসব, মাঘী পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা উৎসব, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উপরোক্ত উৎসবগুলি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

ব্রহ্মাণীপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় চারশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাউনীযুক্ত একটি ঘরে ব্রহ্মাণী দেবীর প্রস্তর মূর্তি এবং ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে রুদ্রাণীর ও বাম পার্শ্বে ইন্দ্রাণীর প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। নারায়ণগড়ের রাজা গন্ধর্ব ব্রহ্মাণী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া শোনা যায়। কিংবদন্তী আছে, রাজা গন্ধর্ব ভদ্রকালী গ্রামের নিকটবর্তী অরণ্যময় স্থান হইতে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তিনখানি প্রস্তর লইয়া আসেন; উহার একখানি দ্বারা ব্রহ্মাণীর এবং অপর দুইখানি দ্বারা রুদ্রাণী ও ইন্দ্রাণী দেবীর মূর্তি নির্মাণ করিয়া নারায়ণগড়ে প্রতিষ্ঠা করেন। অপর আর একখানি প্রস্তর খণ্ড দ্বারা ভদ্রাণী বা ভদ্রকালী দেবীর মূর্তি নির্মাণ করাইয়া উক্ত বনমধ্যে একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মাণী মন্দির পার্শ্বে রানী সরোবর নামে একটি সরোবর আছে।

গ্রাম সম্পর্কে ইতিহাসে আছে যে, ৬৭১ বঙ্গাব্দে নারায়ণগড়ের রাজবংশের আদি রাজা গন্ধর্ব পাল উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের অধীনে এই প্রদেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত গড় অমরাবতীর নিকটবর্তী দিকনগর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ইঁহারা জাতিতে সদ্গোপ ছিলেন। একদা তিনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথদেব দর্শনার্থে গমন করেন। যাত্রাপথে তিনি একটি যাত্রীনিবাসে রাত্রি যাপনকালে স্বপ্নযোগে ব্রহ্মাণী দেবীর দর্শন পান। গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব তৎকালে মেদিনীপুর ও তমলুক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেবী ব্রহ্মাণীর আদেশানুক্রমে রাজা গন্ধর্ব যে সময় পুরী গমন করেন সে সময় গঙ্গাবংশীয় রাজ মহিষী গর্ভবতী ছিলেন এবং তিনি প্রসব বেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। রাজা গন্ধর্ব পুরীধামে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মাণী প্রদত্ত স্বপ্নাদ্য ঔষধি দ্বারা সুষ্ঠুভাবে রাজমহিষীর প্রসব কার্যে সহায়তা করেন। গঙ্গাবংশীয় রাজা ইহাতে পরম খুশী হইয়া তাঁহাকে এই প্রদেশের রাজ্যভার প্রদান করেন। জগন্নাথদেবের নাভিকুণ্ডস্থিত চন্দন এবং রাজছত্র উপবীত খুরদার রাজা কর্তৃক রাজ্যাভিষেক সময়ে প্রদত্ত হইয়াছিল; এই জন্য এই রাজবংশীয়গণ "শ্রীচন্দন পাল" উপাধিতে আখ্যায়িত হইয়াছিলেন।

রাজা গন্ধর্ব যে সময়ে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া এই প্রদেশে গমন করেন, সেই সময়ে নারায়ণগড়, কেশিয়াড়ী, রাজভূম, কিসমত নারায়ণগড় প্রভৃতি আটটি পরগণা এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্বকালে এই সমস্ত ক্রমশঃই হস্তান্তরিত হইয়া যায় এবং পরিশেষে নারায়ণগড় এক পরগণায় পরিণত হয়। এই পরগণার বাৎসরিক আয় ছিল প্রায় যাট হাজার টাকা। রাজা গন্ধর্বের আমলে এই স্থানটির নাম নারায়ণগড় ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজা নারায়ণ বল্লভ ৭০৩ বঙ্গাব্দে রাজপদে অধিষ্ঠিত হন এবং নিজের নাম অনুসারে এই স্থানটি নারায়ণগড় নামে অভিহিত করেন।

শ্রীরামেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক,
নারায়ণগড় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগ,
পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর।

নারায়ণগড়—খড়্গপুর হইতে নারায়ণগড় ১৪ মাইল দূর। হান্দোলগড় নামে এখানে একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ নারায়ণগড়ের প্রাচীন রাজবংশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই দুর্গের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া কটক যাইবার রাস্তা গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব এই পথ দিয়া পুরী গিয়াছিলেন। এখানে ধলেশ্বর নামক এক শিবের মন্দির আছে। কথিত আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেব এই মন্দিরের প্রাঙ্গনে হরিনাম কীর্তন করিয়াছিলেন। তৎকালে এখানে কেশব সামন্ত নামে একজন ধনী ভূস্বামী বাস করিতেন। চৈতন্যদেবের মহিমা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কেশব তাঁহার ভক্ত হন।

পূর্বকালে নারায়ণগড়ের চারিদিকে চারিটি দরজা ছিল। ইহার মধ্যে প্রধান দরজাটি পশ্চিম দিকে অবস্থিত পুরী যাইবার রাস্তার উপর অবস্থিত ছিল এবং উহার নাম ছিল "যম দুয়ার"। এই রাস্তার উভয় পার্শ্বে হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ গভীর অরণ্য ছিল। এই দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলে ওড়িস্যা যাইবার পথ বন্ধ থাকিত। কথিত আছে, উড়িষ্যা যাইতে হইলে এই দরজার নিকট নারায়ণগড়ের রাজার "ছাড় পত্র" লইয়া তবে যাইতে পারা যাইত। দ্বিতীয় দরজার নাম "সিদ্ধেশ্বর দরজা"। উহার নিকটে সিদ্ধেশ্বর নামে এক শিব ছিলেন। তৃতীয়টির নাম মৃন্ময় দরজা বা "মেটে দুয়ার"। উহার প্রাচীর এত বিস্তৃর্ণ ছিল যে তাহার উপর দিয়া তিনজন অশ্বারোহী পাশাপাশি যাইতে পারিত। চতুর্থ দরজাটির কোন চিহ্ন নাই। প্রবাদ উহা কেলেঘাই নদীর মধ্যে কোথাও অবস্থিত ছিল এবং এমন সুকৌশলে নির্মিত হইয়াছিল যে প্রয়োজন হইলে উহা বন্ধ করিয়া নারায়ণগড়ের সমস্ত পথ জলপ্লাবিত করিয়া শত্রুর গতি প্রতিরোধ করা যাইত।

নারায়ণগড়ের প্রতিষ্ঠাতা গন্ধর্ব পাল বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি ব্রহ্মাণী নামক এক দেবী মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। পুরীর যাত্রী মাত্রকেই প্রণামী দিয়া "ব্রহ্মাণী দেবীর ছাপ" নামক এক প্রকার মুদ্রা লইয়া পুরী প্রবেশ করিতে হইত। প্রবাদ ব্রহ্মাণী দেবীর প্রতিষ্ঠার দিন যে ঘৃত প্রদীপ জ্বালা হইয়াছিল, তাহা একাদিক্রমে ছয় শত বৎসর পর্যন্ত সমভাবে প্রজ্বলিত ছিল। ১২৯০ খৃষ্টাব্দে এই রাজবংশের শেষ রাজা পৃথ্বীবল্লভের মৃত্যুর সাথে সাথে উহা হঠাৎ নিবিয়া যায়। এখনও এই স্থানে মাঘী পূর্ণিমার দিন একটি মেলা বসিয়া থাকে। নিকটেই রানীসাগর নামে প্রায় দুই শত বিঘাব্যাপী একটি জলাশয় আছে। প্রবাদ, রাজা গন্ধর্ব পালের মহিষী রানী মধুমঞ্জরী রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখেন যে কুলদেবতা ব্রহ্মাণী দেবী যেন তৃষ্ণার্ত হইয়া তাঁহার নিকট জল চাহিতেছেন। এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত কুলগুরুর নিকট ব্যক্ত করিলে তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী রানী মধুমঞ্জরী এই বৃহৎ জলাশয় খনন করান।

সাহজাদা খুরম উত্তরকালের সম্রাট শাহজাহান, পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া যখন সম্রাট সৈন্যের দ্বারা পরাজিত হইয়া মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন, তখন নারায়ণগড়ের রাজা শ্যামবল্লভ এক রাত্রির মধ্যেই তাঁহার গমনের জন্য রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন। এই উপকারের কথা স্মরণ করিয়া পরবর্তীকালে সম্রাট শাহ্‌জাহান তাঁহাকে "মাড়ি সুলতান" বা "পথের রাজা" উপাধি প্রদান করেন। যে ফার্মানের দ্বারা এই উপাধি প্রদান করা হয় তাহার উপর রক্তচন্দনে সম্রাট শাহ্‌জাহানের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ ছিল।

নারায়ণগড়ের নিকটবর্তী কসবা গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। এই মসজিদের একটি শিলালেখন হইতে জানা যায় যে, ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহ্‌জাহানের দ্বিতীয় পুত্র বাংলার তৎকালীন শাসনকর্তা শাহসুজা কর্তৃক উহা

নির্মিত হয়। এই মসজিদের উপর তিনটি গম্বুজ আছে। উহার মধ্যে একটির এখন ভগ্নদশা।

[পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত 'বাংলায় ভ্রমণ' গ্রন্থ অবলম্বনে]

৩। গ্রাম : দেউলী। ৩১২।১,০১০'৩৮।৫৫৬।৩,১১০

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজপুত, তিলি, তেলী, তাঁতী, কদমা, মাহালী, ভূমিজ, কোড়া ও সাঁওতাল। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, তিলিপাড়া, তাঁতীপাড়া, কদমাপাড়া ও ভূমিজপাড়া নামে পাচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কাঁথি রোড হইতে মোটর-বাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিকী পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উৎসব, পৌষসংক্রান্তিতে পৌষপার্বণ উৎসব এবং চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন।
পৌষপার্বণের মেলা। মাঘ মাসে একদিন।
চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে পনরদিন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে চম্পকেশ্বর নামে প্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গ ব্যতীত পিতল নির্মিত চণ্ডী ও শীতলার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহা ছাড়া, গ্রামে দুইটি পঞ্চানন্দ, অগণিত বাবাঠাকুর, একটি শীতলা এবং প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে মনসা দেবীর স্থান আছে।

জনশ্রুতি আছে যে, কোন এক সময়ে জনৈক সিদ্ধ যোগীপুরুষ এই স্থানে একটি দেউলী নির্মাণ করেন বলিয়া গ্রামের নাম প্রথমে 'যোগী দেউলী' ছিল। আবার কাহার কাহার অনুমান মারাঠাগণ কর্তৃক এই স্থানে একটি দেউলী নির্মাণের পর গ্রামের নাম দেউলী হইয়াছিল। ইহার সত্যতা সম্পর্কে তেমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

শ্রীভাস্কর চন্দ্র পাহাড়ী, প্রধান শিক্ষক,
দেউলী বিদ্যালয়,
পোঃ বেলদা, মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম : ভদ্রকালী। ৪৮০।২১৪'৬২।৪৬।১৭৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, সদ্‌গোপ, মাহিষ্য, স্বর্ণ-বণিক, তেলী, ময়রা, রজক, নাপিত, ধোপা, মালী, ভূমিজ, কোড়া, সাঁওতাল ও মুসলমান। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, কায়স্থ-পাড়া, সদ্‌গোপপাড়া, নাপিতপাড়া, ধোপাপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন নারায়ণগড় এবং বেনাপুর হইতে ১২নং ক্যানেল রোড দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়। তাহা ছাড়া, খড়্গপুর স্টেশন হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করিতে পারা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে ভদ্রেশ্বর শিব-ঠাকুরের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তি হইতে আটদিন-ব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে ভদ্রেশ্বর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ এবং অপর একটি মন্দিরে ভদ্রানী বা ভদ্রকালীর শিলায় খোদিত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। নারায়ণগড়ের রাজা গন্ধর্ব পাল উক্ত মন্দিরদ্বয় প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া জানা যায় (নারায়ণগড় দ্রষ্টব্য)। ইহা ভিন্ন, গ্রামে ধর্মরাজ ও শীতলার নির্দিষ্ট স্থান এবং একটি পীরের আস্তানা আছে।

এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত ভদ্রকালীর নামানুসারেই এই গ্রামের নাম ভদ্রকালী হইয়াছে।

শ্রীপুলিন বিহারী অধিকারী, প্রধান শিক্ষক,
ভদ্রকালী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ভদ্রকালী, মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম : লাড়ুমা। ৪৭৮।৩০৬'৪৩।১২৮।৬৪৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, কায়স্থ, মাহিষ্য, মাঝি, ভূমিজ, বাগাল, নাপিত, কামার, কুমার ও সাঁওতাল। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, বৈরাগীপাড়া, কায়স্থপাড়া, মাহিষ্যপাড়া, নাপিতপাড়া, কুমারপাড়া, মাঝিপাড়া, ভূমিজপাড়া, কামার-পাড়া ও সাঁওতালপাড়া নামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বালিচক হইতে জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে ঝুলন, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী ও জীমূতবাহনপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও রাসযাত্রা উৎসব,

মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব, শীতলাপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, গ্রামে সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর নামে জনৈক বৈষ্ণব সাধকের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসব-পার্বণগুলি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির এবং গোপাল-জীউমন্দির, একটি রাসমণ্ডপ, একটি কালীমণ্ডপ ব্যতীত 'শ্রীমন্দির' নামে একটি মন্দিরে মনসা ও শীতলা প্রতিষ্ঠিত আছে।

লাড়মা একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই স্থানে পুষ্করিণী প্রভৃতি খননকালে মৃত্তিকা গর্ভ হইতে প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ও নল-কূপাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রামে 'বেরা' ও 'মদনা' নামে মজিয়া যাওয়া দুইটি প্রাচীন দীঘি আছে। পূর্বে এই গ্রামে শতাধিক রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বসবাস ছিল।

লাড়মা গ্রামের জমিদারেরা প্রজাবৎসল এবং অতি প্রাচীন বংশ। ইঁহারা গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ বালী-কোতরং গ্রামের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ৺নীলাম্বর গুহের বংশধর বলিয়া জানা যায়। একদা নীলাম্বর পঞ্চপুত্র ও ভার্যাসহ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে জগন্নাথ বিগ্রহ দর্শন করিতে গমন করেন এবং শ্রীক্ষেত্র হইতে ফিরিবার পথে নারায়ণগড়ের রাজা শ্যামপালকে পরাজিত করিয়া জমিদারী অধিকার করেন। কিয়ৎকাল পরে শ্যামপাল লোকবল সংগ্রহ করিয়া নীলাম্বরকে পরাজিত ও নিহত করিয়া জমিদারী পুনরুদ্ধার করেন। পিতৃবিয়োগে পঞ্চ-পুত্র শোকাভিভূত হইয়া দিল্লীর দরবারে গমন করেন এবং তথায় কিছুকাল অতিবাহিত করার পর দিল্লীশ্বরের অনুকম্পায় সন ১০৫২ সালে খানদার পরগণার জমিদারী প্রাপ্তিসূচক পাঞ্জা পান এবং "রায় চৌধুরী" উপাধি লাভ করিয়া সেঁকোয়া গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন। নীলাম্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বংশীধর সেঁকোয়াতে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া দেবসেবা, অতিথিসেবা প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। বংশীধরের পুত্র জয়কৃষ্ণের পৌত্র গোপীনাথ অন্যান্য ভ্রাতাদের সহিত লাড়মাতে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন। অপর পুত্র দামোদরের উত্তরাধিকারীগণ অদ্যাপি সেঁকোয়া গ্রামে বসবাস করিতেছেন। এই বংশের রামভদ্র রায় মেদিনীপুর জেলার তদানীন্তন কালেক্টর হ্যারিসন সাহেবের 'দেওয়ান' পদ প্রাপ্ত হন এবং 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। ইঁহাদের বংশীয় রমাকান্ত ও রাধাকান্ত রায় পরম বৈষ্ণব ছিলেন। রমাকান্তের পুত্র মধুসূদন এই গ্রামে গোপালজীউমন্দির এবং রাসমঞ্চ নির্মাণ করেন। ইঁহার সহোদর ভ্রাতা দীনবন্ধু ও খুল্লতাত ভ্রাতা কৃপালসিন্ধু উভয়েই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। মধুসূদনের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র বৈকুণ্ঠনাথ রায় বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। মধুসূদন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র দ্বারিকানাথ রায় ১৩৩১ বঙ্গাব্দে মেদিনীপুর হিন্দু ধর্মাবলম্বী লাড়মা শাখা সংস্কৃত পরিষদ গড়িয়া তুলিয়া বিরাট ধর্ম-সভার আয়োজন করেন। উক্ত ধর্মসভায় বহু পণ্ডিত ব্যক্তিগণের সমাবেশ হইয়াছিল। এমন কি সুদূর কাশী হইতেও পণ্ডিতেরা আসিয়াছিলেন।

অন্যূন পাচশত বৎসর পূর্বে কেঠো হরিদাস নামক জনৈক পরিব্রাজকাচার্য মাধব গৌড়ীয় বৈষ্ণব এই গ্রামের মধ্যভাগে সুন্দর বনানী বেষ্টিত মনোরম নির্জন স্থানে তাঁহার একমাত্র আরাধ্য হরিজীউ বিগ্রহ স্থাপন পূর্বক কুটীর নির্মাণ করিয়া সাধন-ভজনে মনোনিবেশ করেন। কথিত আছে, নিকটবর্তী বনমধ্যে পরিত্যক্তা এক সর্ব-সুলক্ষণা অলৌকিক রূপ লাবণ্যবতী মৃত বালিকাদেহে জীবনসঞ্চার করিয়া হরিসেবার সঙ্গিনী করিয়া লন। ইঁহার বংশীয় ধ্যানমঙ্গল মহান্ত ভক্তি মার্গের উচ্চাবস্থা লাভ করিয়া হরিনাম প্রচারের মুখে সমগ্র মেদিনীপুর জেলার মধ্যে বহু সংখ্যক শিষ্য ও প্রশিষ্য রাখিয়া যান। ইঁহার এক শিষ্য গোকুলানন্দ কোন কারণে গুরুর নিকট অপরাধী হওয়ায় গুরুদেব তাঁহার মুখ দর্শন করিবেন না বলিলে গোকুলানন্দ তাঁহার আশ্রম সমীপবর্তী কেলেঘাই নদীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজেকে লুকাইয়া রাখেন। কিছুদিন পরে তাহার দেহ জলের উপর ভাসিতে থাকে এবং গ্রামবাসীগণ তাঁহার দেহান্তর হইয়াছে মনে করিয়া শবদেহ সৎকারের আয়োজন করিলে তাঁহার দেহ পুনরায় হঠাৎ জলের মধ্যে তলাইয়া যায়। এইরূপ ছয় মাস

অতিবাহিত হওয়ার পর ধ্যানমঙ্গল গোস্বামীর দেহত্যাগ হইলে তাঁহার শিষ্য গোকুলানন্দ নদীগর্ভ হইতে উঠিয়া নিজ আসনে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে তিনিও দেহরক্ষা করেন।

প্রবাদ আছে, এক সময় নারায়ণগড়ের রাজা তাঁহার রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ধ্যানমঙ্গল গোস্বামীকে প্রতিকারের জন্য আহ্বান করেন। গোকুলানন্দ নারায়ণগড়ে আসিয়া উচ্চ স্বরে হরিনাম সংকীর্তন করিতে থাকিলে অনতিকালের মধ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ইহাতে রাজা আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহার রাজ্যের একাংশ হরিসেবার নিমিত্তে গকুলানন্দকে দান করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু বিষয় সম্পত্তির সংস্পর্শে বৈষ্ণব কুল লোভে বশীভূত হইয়া হরিসেবার ত্রুটি করিতে পারেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। জনশ্রুতি আছে, ধ্যানমঙ্গল গোস্বামী অলৌকিক ক্ষমতায় ঘোড়া বাঁধিবার খুঁটি কেলি কদম্ববৃক্ষে এবং একটি দাঁতনকাঠিকে বকুলবৃক্ষে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বকুলগাছটি ১২৭২ সালের ঝড়ে পড়িয়া যায়।

শ্রীকানাইলাল অধিকারী, শিক্ষক,
গ্রাম : লাড়মা, পোঃ মদনমোহন চক,
মেদিনীপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—লাড়মা গ্রামের নিকটবর্তী মদনমোহন চক গ্রামে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার মেলা সম্পর্কে শ্রীঅধিকারী মহাশয় একটি বিস্তারিত বিবরণী প্রেরণ করিয়াছেন। উহা মেলা বিবরণী অধ্যায় লিপিবদ্ধ করা হইল।

৬। গ্রাম : কোতাইগড় (মৌজা : কোঁতাই জিঁয়া গেড়্যা)। ৫০৮।৫৫২'৪১।১৪০।৬৩১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, মাহিষ্য, কামার, কুমার, নাপিত, ধোপা, ভূমিজ ও মাহালী। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বালিচক হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব এবং আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমোক্ত উৎসবটি প্রাচীন।

(ঙ) অক্ষয় তৃতীয়ার মেলা। বৈশাখ মাসে নয়দিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে তিনটি পাকা শিবমন্দির, একটি শ্যামসুন্দরজীউমন্দির ও একটি শীতলামন্দির ছাড়া সাধারণের একটি দেবদেবীর মন্দির আছে।

শ্রীকমলাকান্ত রায়, প্রধান শিক্ষক,
কোতাইগড় প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কোতাইগড়, মেদিনীপুর।

৭। গ্রাম : খুরসি। ৫৮৮।৫৮৩'১৬।২১২।৯১৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, বৈরাগী, স্বর্ণকার, কুমার, তাঁতী, গোয়ালা, ধোপা, হাড়ী, মুচি ও সাঁওতাল। গ্রামে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন নারায়ণগড় হইতে মেঠো পথ ধরিয়া গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, চৈত্র মাসে ভীম একাদশী, বাসন্তীপূজা ও হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে দুইদিনব্যাপী।

ভীম একাদশীর মেলা। চৈত্র মাসে দুইদিনব্যাপী।

বাসন্তীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে চারদিনব্যাপী। উল্লিখিত মেলাগুলি সম্প্রতিকালের।

(চ) গ্রামে একটি শীতলামন্দির আছে। তাহা ছাড়া, শিব ও মনসা আছে।

শ্রীজীবন কৃষ্ণ দুয়ারী, প্রধান শিক্ষক,
খুরসি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৮। গ্রাম : পাহাড়পুর। ৬০৮।২২২'৪৫।৫২।৩০৯

(ক) মাহিষ্য, জেলে, খড়িয়াল, ডোম, তাঁতী, ছুতার ও মেথর। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মৎস্য ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী বেলদা রেলস্টেশন হইতে গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে কেলেঘাই নদীর বাঁধের উপর দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়। নৌকাপথে গ্রামে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে কেলেঘাই নদীতে পুণ্যস্নান এবং চৈত্র মাসে শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) পৌষসংক্রান্তির স্নান উপলক্ষে মেলা। পৌষ মাসে একদিন। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শীতলামন্দির এবং শ্যামানন্দ গোস্বামী নামে জনৈক বৈষ্ণবের সমাধি মন্দির আছে।

গ্রামটি কেলেঘাই নদীর তীরে অবস্থিত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল বলিয়া পরিচিত।

শ্রীগুণধর ঘোড়াই, প্রধান শিক্ষক,
পাচাড়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ খুরসি, মেদিনীপুর।

৯। গ্রাম ঃ আসাদা। ৭০৪।২৫৫˙০৩৬১।০৫১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য ও শোলাঙ্কী। গ্রামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলদা হইতে কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মঠাকুরের পূজা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, ভাদ্র মাসে বিশ্বকর্মাপূজা, জন্মাষ্টমী উৎসব ও ইন্দ্রপূজা, আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজা এবং কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মদনমোহনঠাকুরের রাসযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে পাঁচ-ছয়দিন-ব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে অনেকগুলি মন্দির ও দেবদেবীর স্থান আছে। তাহার মধ্যে স্থানীয় জমিদারদিগের প্রতিষ্ঠিত মদনমোহনজীউর মন্দির ও রাসমঞ্চ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দিরাভ্যন্তরে মদনমোহন (শ্রীকৃষ্ণ) ছাড়া রাধারাণী, গৌরাঙ্গ, গোপালজীউ, গিরিধারী, রঘুনাথ প্রভৃতি দেবদেবীর অনেকগুলি ক্ষুদ্র-বৃহৎ মূর্তি আছে; তন্মধ্যে জয়পুরের কালো ফটিক প্রস্তর নির্মিত ত্রিভঙ্গ মুরলীধারী মদনমোহনের মূর্তিখানি অতি মনোরম ও দর্শনীয়। বৃন্দাবন হইতে আনীত রাধারানীর পিতল মূর্তি এবং নদীয়া হইতে আনীত নিমকাষ্ঠ নির্মিত মহাপ্রভুর মূর্তি ছাড়া মন্দিরের অন্যান্য সকল মূর্তিগুলি প্রস্তর নির্মিত। হৃদয়নাথ অধিকারী নামক জনৈক গ্রামবাসীর একটি প্রাচীন মন্দিরে নিত্যানন্দ ও চৈতন্য মহাপ্রভুর বৃহদাকার অতি সুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং বলা হয় বিগ্রহ দুইটি বহুকালের প্রাচীন। এই গ্রামের পূর্বাংশে শোলাঙ্কী পরিবারের জনৈক বিধবা মহিলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তিনটি শীতলা মূর্তিসহ একটি মন্দির আছে এবং মূর্তিগুলি স্থানীয় পুষ্করিণী হইতে প্রাপ্ত বলিয়া শোনা যায়। এই গ্রামে বটব্যাল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত বিশালাক্ষী কালীমাতার মন্দিরটিও প্রাচীন। বৃটিশ শাসনের আমলে কোম্পানীর সনন্দ হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে মন্দির ও বিগ্রহ বহুকালের প্রাচীন। দেবীর বিগ্রহটি কালো প্রস্তর দ্বারা নির্মিত এবং বটব্যাল মহাশয়দিগের জনৈক পূর্বপুরুষ পুষ্করিণী সংস্কারকালে উহা পাইয়াছিলেন। এই মন্দিরের সম্মুখভাগে দুই পার্শ্বে দুইটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

গ্রামের পশ্চিম পার্শ্বে প্রাচীন একটি তেঁতুলগাছের নীচে একটি কালো প্রস্তর নির্মিত মস্তক বিহীন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। অনেকের অনুমান, কালাপাহাড় কর্তৃক মূর্তিটির এইরূপ ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল। মূর্তিটিকে স্থানীয় গ্রামবাসীগণ চণ্ডী মূর্তি জ্ঞানে পূজা করিলেও মূর্তিটি প্রকৃত নরসিংহদেবের মূর্তি বলিয়া মনে হয়। মূর্তিটির পুরুষোচিত আকৃতি, কটিদেশে এক বিরাট পুরুষ শায়িত; এক হস্তে উক্ত পুরুষটাকে চাপিয়া ধরিয়া আছেন, অন্য হস্তে তাহার নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়িয়া বাহির করিতেছেন। মূর্তিটিকে যে ধ্যানে পূজা করা হয় বস্তুতঃ সেই ধ্যানের সহিত ইহার কোন সামঞ্জস্য নাই।

গ্রামের পূর্বাংশে বৈষ্ণব সাধকগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অতি প্রাচীন একটি মঠ আছে। এই মঠটি নিত্যানন্দ বাবাজী নামক জনৈক বৈষ্ণব ভক্ত প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া শোনা যায়। মঠের অভ্যন্তরে নিতাই, চৈতন্য, গিরিধারীলাল ও গোপালজীউর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বৎসরে প্রায় তিন-চারি বার এই মঠে বৈষ্ণব উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রামে ঝাড়েশ্বর শিবের একটি অতি প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরটিতে পূর্বে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হইত; কিন্তু প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বৎসর হইল উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত মন্দির ও বিগ্রহাদি ছাড়া গ্রামে সর্বসাধারণের চারটি শীতলামন্দির আছে। এই সকল শীতলা মন্দিরে বৎসরে একবার করিয়া মহাধুমধামে পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীবিমলাশঙ্কর পাল, শিক্ষক,
আমড়িহা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

খুরসি গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল ছাড়া সবঙ্গ ও পটাশপুর থানার কয়েকটি গ্রামাঞ্চল হইতে বহুসংখ্যক নরনারী ট্রেন, মোটর গাড়ী ও গরুর গাড়ী করিয়া মেলায় আসেন।

মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ মঙ্গলা, মাড়ো ছাড়া সবঙ্গ থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম হইতে আসেন। মেলায় প্রায় সত্তরটি দোকানপাট বসে এবং দশ-বারজন ফেরিওয়ালা আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ, কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং ধামা-কুলা, হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি জিনিসপত্রের আমদানী হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক প্রদর্শনী ও যাত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় তিন সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—খুরসি গ্রামে ভীম একাদশী ও বাসন্তী-পূজার মেলা এই গ্রামে অনুষ্ঠিত উল্লিখিত কালীপূজার মেলার অনুরূপ।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

ভদ্রকালী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে ভদ্রেশ্বর শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণের নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ স্থানে প্রায় দশদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা অনুমোদিত এবং বহুকালের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়।

মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ থানাগুলি হইতে হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রত্যহ গড়ে প্রায় ছয় সহস্র নরনারী ট্রেন, মোটর গাড়ী, গরুর গাড়ী করিয়া ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ খড়্গপুর, বেলদা, নারায়ণগড় প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন। মেলায় তিনশতাধিক দোকানপাট বসে এবং মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়চোপড়, তেলেভাজা, বই-ছবি, ধামা-কুলা, দা-কাস্তে প্রভৃতি নানা-প্রকার জিনিসপত্রের আমদানী হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাচ-গান, সার্কাস, ম্যাজিক, কবিগান, জলসা ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং জুয়া ও লটারী খেলার দল আসে। যাত্রাভিনয় করিতে প্রতি বৎসর পেশাদারী যাত্রাদল আসে। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

মদনমোহন চক গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে উৎসব প্রাঙ্গণ সংলগ্ন প্রায় বার বিঘা জমির উপর ছয়-সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতিকালের।

লাড়মা, নারমাবাটিটাকী, মালিগেড়্যা, বাবামতি, বিশ্রীপাট, আম্বি, সরগেড্যা, কানাইসাগর, মাগুরা, গামা, মঙ্গলপুর, চাকই, চকশৌলা, খেলনা, দেভোগ, তুতরাঙ্গা, বেলডিহা, নয়াগ্রাম, মণিনাথপুর, সাগুনা, কয়তা, কালীপাটনা, কুলডিহা, পাঁচপাড়া, বড়কলঙ্কাই, ধনেশ্বরপুর, বসন্তপুর, সিমলা, উচিৎপুর প্রভৃতি গ্রাম ভিন্ন নারায়ণগড়, সবঙ্গ, খড়্গপুর ও পিঙ্গলা থানার অন্তর্গত গ্রাম হইতে প্রত্যহ

গড়ে প্রায় সহস্রাধিক নরনারী ট্রেন, মোটর গাড়ী করিয়া ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে। মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়চোপড়, বাসনকোসন, টোটকা ঔষধপত্র, সস্তার বই-ছবি, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, মাটির হাঁড়িকুড়ি, তালপাতার পাখা, মাদুর, পান-বিড়ি, সরবৎ, শাঁখা, শাকসব্জী প্রভৃতি জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক ও লটারী খেলার দল আসে এবং কবিগান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় আটশত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

কোতাইগড় গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

নারায়ণগড় ও খড়্গপুর থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম হইতে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র যাত্রী সাইকেল, গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ খড়্গপুর শহর হইতে বিশেষতঃ মিষ্টান্ন ও মনিহারী জিনিসপত্র লইয়া মেলায় আসেন। ময়রা, তেলেভাজা এবং লোহা, কাঁচ ও মাটির বাসনপত্র, বই-ছবি, তৈয়ারী কাপড়-জামা, কাস্তে-কোদাল, লাঙ্গল, ধামা-কুলা-চুপড়ী প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় একশত দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক, কবিগান, চণ্ডীমঙ্গলগান এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় তিন সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কোতাইগড় গ্রামে অনুষ্ঠিত গাজনের মেলাটি এই গ্রামে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার মেলার অনুরূপ।

পৌষপার্বণের মেলা

দেউলী গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে পৌষপার্বণ উৎসব উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রায় পাচ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

নারায়ণগড় থানার কয়েকটি গ্রাম ছাড়া কেশিয়াড়ী, দাঁতন, সবঙ্গ, খড়্গপুর প্রভৃতি থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে প্রায় তিন সহস্র নরনারী মোটরবাস, রিক্সা, ট্রেন, গরুর গাড়ী ও সাইকেল করিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, টোটকা ঔষধ, বই-ছবি, কাপড়-জামা, দা-কোদাল, ধামা-কুলা প্রভৃতি নানাবিধ জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক ও নাগরদোলার দল আসে। যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান ও সাঁওতালী নৃত্যের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় তিন হাজার দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—দেউলী গ্রামে অনুষ্ঠিত রাসযাত্রার মেলা ও চড়কের মেলা উল্লিখিত পৌষপার্বণ মেলার অনুরূপ।

ব্রহ্মাণীপূজার মেলা

কসবা নারায়ণগড় গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে ব্রহ্মাণী দেবীর পূজা উপলক্ষে দেবীর মন্দির সংলগ্ন প্রায় দশ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি চারশতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

নারায়ণগড় থানার কয়েকটি ইউনিয়ন ছাড়া সবঙ্গ, কেশিয়াড়ী, দাঁতন, খড়্গপুর প্রভৃতি থানাগুলি হইতে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় তিন সহস্র নরনারী ট্রেন, মোটরবাস ও গরুর গাড়ী করিয়া মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ নারায়ণগড়, দাঁতন ও খড়্গপুর হইতে প্রায় প্রতি বৎসর মেলায় আসেন। মেলার শতাধিক দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কুড়ুল-কাস্তে, কারুশিল্পজাত জিনিসপত্র, মাদুর প্রভৃতির দোকান বসে। কারুশিল্পজাত জিনিস ও মাদুর প্রধানতঃ নারায়ণগড় ও সবঙ্গ থানার কয়েকটি গ্রাম হইতে আসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক ও সার্কাসের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় ছয়শত দর্শকের সমাগম হয়।

রথযাত্রার মেলা

কসবা নারায়ণগড় গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে প্রায় ত্রিশ বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

হান্দলা, কসবা, কুচলি, বেনাডিহা, চাতরিভাড়া, পুরাতনভাড়া, বহুরূপা, বেলটি, ফুলগেড়্যা, ম্যাটেল, যমুনা প্রভৃতি গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি-দিন প্রায় দুই সহস্র নরনারী গরুর গাড়ী করিয়া ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন। যাত্রীগণের মধ্যে নারীর সংখ্যা বেশী।

খড়্গপুর, বেলদা, চাতরিভাড়া এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বিক্রেতাগণ আসেন। মেলায় শতাধিক দোকানপাট বসে। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, সস্তার বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, মাদুর, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনা ছাড়া অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিসপত্রের দোকান-পাট বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক ও সাঁওতালী নাচ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সাঁওতালী নাচের আসরে সর্বাধিক দর্শকের সমাগম হয়।

রাসযাত্রার মেলা

আসদা গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে মদন-মোহন ঠাকুরের রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে রাসমঞ্চ সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা জমির উপর পাঁচ-ছয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। ইহা শতাধিক বৎসরের প্রাচীন মেলা।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি থানার অন্তর্গত গ্রামাঞ্চল হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় তিন সহস্র নরনারী গরুর গাড়ী করিয়া ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে নারীর সংখ্যা বেশী।

মেলায় মোট দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় একশত। তাহা ছাড়া, কুড়ি-পঁচিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, ঔষধপত্র, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা, মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা-পুতুল, জুতা প্রভৃতি নানাপ্রকার জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতেই আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিকের দল আসে এবং কবিগান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, স্থানীয় জমিদারগণের দ্বারা নির্মিত এই গ্রামে একটি স্থায়ী থিয়েটার মঞ্চ ছিল, বর্তমানে উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। থিয়েটার বা যাত্রাভিনয় দেখিতে প্রতি বৎসর প্রায় তিন সহস্র দর্শকের সমাগম হয়। ইহা ভিন্ন, কেহ কেহ মেলায় জুয়া খেলিয়া থাকেন।

গ্রাম বিবরণী

দাঁতন—খড়্গপুর জংশন হইতে দাঁতন ৩২ মাইল দূর। দাঁতনে একটি মুনসেফী আদালত আছে। প্রবাদ, ওড়িষ্যা যাইবার পথে শ্রীচৈতন্যদেব এখানে দাঁতন বা দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়াই স্থানের নাম দাঁতন হইয়াছে। এই আখ্যাটির প্রমাণ-স্বরূপ স্থানীয় একটি মন্দিরে প্রস্তরীভূত দন্তকাষ্ঠ রক্ষিত আছে। দাঁতনে জগন্নাথ-দেবের ও শ্যামলেশ্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দির আছে।

কেহ কেহ বলেন যে দাঁতনের প্রাচীন নাম দন্তপুর। "দাঠাবংশ" নামক বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ক্ষেম নামে বুদ্ধদেবের এক শিষ্য বুদ্ধের চিতা হইতে একটি দন্ত সংগ্রহ করিয়া উহা কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্ত একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দন্তটিকে তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং স্থানটির নাম দেন দন্তপুর। ব্রহ্মদত্ত বংশের শিবগুহ নামক জনৈক নৃপতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, বৌদ্ধধর্মের উপর তাঁহার অনুরাগ ছিল না। কিন্তু একবার দন্তপুরের দন্তোৎসব দেখিয়া তিনি বিশেষ মুগ্ধ হন ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। রাজ্যবাসী ব্রাহ্মণগণ এই জন্য তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া তাঁহার শাস্তি-বিধানের জন্য পাটলিপুত্রের হিন্দু নরপতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। পাটলিপুত্ররাজের সৈন্য শিব গুহকে বন্দী করিয়া তৎসহ বুদ্ধদন্তটিকেও পাটলিপুত্রে আনয়ন করে। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই পাটলিপুত্রে বহু আশ্চর্য ঘটনা ঘটায় পাটলিপুত্ররাজ ভীত হইয়া বুদ্ধদন্তসহ শিব গুহকে পুনরায় দন্তপুরে প্রেরণ করেন। পাটলিপুত্র-রাজের মৃত্যুর পর পার্শ্ববর্তী অপর এক রাজা দন্তপুর আক্রমণ করিয়া শিব গুহকে নিহত করেন। রাজকুমারী হেমমালা এবং রাজমাতা উজ্জয়িনীরাজকুমার ছদ্মবেশে বুদ্ধদন্তটি লইয়া তাম্রলিপ্তের পথে সিংহলে গমন করেন। সিংহলরাজ মেঘবাহন পরম ভক্তি সহকারে ধর্মমন্দিরে দন্তটির প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও সিংহলে এই বুদ্ধদন্ত নিত্য পূজিত হইতেছে। দেবপ্রিয় তিষ্যের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন সিংহলে মহাসমারোহে বুদ্ধদন্ত প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব দর্শন করিয়াছিলেন।

দন্তপুর নগরের অবস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বর্তমান রাজমহেন্দ্রীকে প্রাচীন দন্তপুর বলিয়া নির্দেশ করেন, কাহারও মতে পুরী বা জগন্নাথধামেই দন্তপুর এবং জগন্নাথের মন্দিরই প্রাচীন দন্তমন্দির। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ মনীষীর মতে বর্তমান দাঁতনই প্রাচীন দন্তপুর। দাঠাবংশের স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে তাম্রলিপ্ত হইতেই বুদ্ধদন্ত সিংহলে প্রেরিত হয়। পুরীও তৎকালে একটি প্রধান বন্দর ছিল। সুতরাং পুরী বা রাজমহেন্দ্রী হইতে দন্তটি পুরী বন্দর দিয়াই প্রেরিত হইবার কথা। তাম্রলিপ্ত হইতে উহা প্রেরিত হওয়ায় অনেকে মনে করেন যে নিকটস্থ দাঁতনই প্রাচীন দন্তপুর। দাঁতন যে একটি বহু পুরাতন স্থান তাহা এখনও দেখিলে বুঝিতে পারা যায়।

দাঁতনের অনতিদূরে শরশঙ্ক নামে একটি সুবৃহৎ জলাশয় আছে। উহার দৈর্ঘ্য ৫,০০০ ফুট ও প্রস্থ ২,৫০০ ফুট। বাংলাদেশে এরূপ দীঘি অতি অল্পই আছে। জনশ্রুতি যে, শশাঙ্কদেব নামক জনৈক নৃপতি পুরী গমন কালে বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্তে এই দীঘি প্রতিষ্ঠা করেন। দাঁতনে 'বিদ্যাধর' নামে পরিচিত ১,৬০০ ফুট দীর্ঘ অপর একটি দীঘি আছে। বিদ্যাধর নামক জনৈক রাজমন্ত্রীর দ্বারা ইহা খনিত হইয়াছিল বলিয়া খ্যাত। প্রবাদ মাটির নীচে দিয়া শরশঙ্ক ও বিদ্যাধর দীঘিকে সংযুক্ত করিয়া ৪ হাত উচ্চ ও ৩ হাত প্রশস্ত একটি প্রস্তর নির্মিত সুড়ঙ্গ আছে।

শরশঙ্ক সম্বন্ধে আরও একটি কিম্বদন্তী আছে। উহা এইরূপ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব যখন মহাপ্রস্থানের পথে গমন করিয়াছেন ও গৃহযুদ্ধে যাদবকুল ধ্বংস হইয়াছে, সেই সময় একদিন ক্লান্ত, বিষণ্ণ শ্রীকৃষ্ণ ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অভয়শঙ্খ পাঞ্চজন্য হাতে লইয়া শরশঙ্ক দীঘির পাড়ে আসিয়া হাজির হন। তারপর মনের খেয়ালে ঐ সরোবরের তীরে একটি অর্জুন বৃক্ষে উঠিয়া বসেন। এই অঞ্চলে তখন জরা শবরের আধিপত্য। দিনান্তে শিকার করিয়া ফিরিবার পথে দূর হইতে জরা

শিকার ভ্রমে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষ হইতে মাটিতে লুটাইয়া পড়েন এবং মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়া শেষবারের মত তাঁহার পাঞ্চজন্য তুলিয়া ঐ সরোবরে নিক্ষেপ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহ-ত্যাগ করেন। সেই দিন ছিল পৌষসংক্রান্তি তিথি। তাই প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে বহু লোক পুণ্য-স্নানের জন্য শরশঙ্ক দীঘিতে হাজির হন। দীঘির পাড়ে একটি মেলাও বসে।

(পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলায় ভ্রমণ" গ্রন্থের ২য় খণ্ড অবলম্বনে)

দাঁতন সম্পর্কে শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার "মেদিনীপুরের ইতিহাসে" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"দাঁতনের জগন্নাথের মন্দিরের পাণ্ডারা বলেন যে, চৈতন্যদেব যখন নীলাচলে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি এইখানে দন্তধাবণ করিয়া দন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া যাওয়ায় এই স্থানের নাম দাঁতন হইয়াছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই যে এই স্থান দাঁতন নামে পরিচিত ছিল এবং বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল তাহা চৈতন্যদেবের জীবনকালেই রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থাদি হইতে জানা যায়, এই কারণে চৈতন্যদেবের দন্ত ধাবণ বা দন্ত কাষ্ঠের সহিত যে এই স্থানের কোন সম্বন্ধ নাই তাহা নিঃসন্দেহ। বুদ্ধ দন্তের সহিতই এই দাঁতন নামের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর।

দাঁতনে শ্যামলেশ্বর মহাদেবের মন্দির এই স্থানের অন্যতম প্রাচীন কীর্তি। মন্দিরটির প্রবেশদ্বারের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড সুগঠিত প্রস্তরময় স্তম্ভ আছে। উহার সম্মুখের দুইটি পদ ভগ্ন এবং সেইজন্য এখানেও কালা পাহাড়কেই দোষী করা হইয়া থাকে। কতদিন পূর্বে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। জনশ্রুতি ভোজ নামক কোন রাজা এক সময়ে এই স্থানে রাজত্ব করিতেন, তিনিই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। এ প্রদেশের আরো কয়েকটি কীর্তি ও কিম্বদন্তীর সহিত ভোজ রাজার নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন, এই ভোজ রাজাই উজ্জয়িনীপতি খ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের শ্বশুর ছিলেন। কিন্তু ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। তবে তিনি পূর্বোক্ত রাজা বিক্রমকেশরীর শ্বশুর হইলেও হইতে পারেন।" (পৃঃ ৩৭৪—৩৭৫)

১। গ্রাম : রাউতারাপুর। ৩।২৭২।১৬।৭৫।৩১১

(ক) ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, তেলী, ধোপা ও মাঝি। গ্রামে তেলীপাড়া, মাঝিপাড়া, বামনপাড়া, গোয়ালাপাড়া, জানাপাড়া ও ধোপাপাড়া নামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলদা হইতে সুবর্ণরেখা নদীতে নৌকাযোগে গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব ও বাশুলী দেবীর পূজা, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব। উৎসবগুলি বহু প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে প্রায় তিনশত নরনারীর সমাগম হয়।

(চ) গ্রামে ইষ্টক নির্মিত একটি পাকা মন্দিরে শীতলা মূর্তি এবং চাঁদনী বিশিষ্ট অপর একটি মন্দিরে শালগ্রাম শিলাসহ ঈশ্বরজীউর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামে অনেকগুলি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে।

শ্রীনীলকণ্ঠ প্রসাদ নন্দ, শিক্ষক,
গ্রাম : রাউতারাপুর, পোঃ সুকাবোল,
মেদিনীপুর।

২। গ্রাম : পলাশিয়া। ৩৮।২৩২।২২।৯৪।৪৯৯

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, বৈরাগী, রজক, কুমার, তাঁতী, শোলাঙ্কী, মাদাল, দুলে, হাড়ী, নাপিত, বারুই ও মুসলমান। গ্রামে উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, পূর্বপাড়া ও পশ্চিমপাড়া নামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী কাঁথি রোড রেলস্টেশন হইতে কাঁথি রোডে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে ঝুলনযাত্রা, ভাদ্র মাসে চৈতন্য মহাপ্রভুর রাসযাত্রা ও কার্তিক মাসে চৈতন্য মহাপ্রভুর গিরিযাত্রা উৎসব, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং

চৈত্র মাসে মুক্তেশ্বর শিবঠাকুরের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। ভাদ্র মাসে একদিন।

দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে সপ্তাহকাল-ব্যাপী। মেলাটি গত পাঁচ বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি রাসমঞ্চ আছে।

শ্রীগুণধর পাণ্ডা, প্রধান শিক্ষক,
পলাশিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম : মোগলমারি (মৌজা : সিমুলিয়া উত্তর)। ৭৩।১৬৯'৭৩।৯০।৩৮৩

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বৈরাগী, মাঝি, ধোপা, কামার ও সাঁওতাল। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন নেকুড়সেনী হইতে মেদিনীপুর-দাঁতন রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব এবং মাঘ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। ইহা প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

মহোৎসবের মেলা। মাঘ মাসে তিনদিনব্যাপী।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ছাড়া একটি শীতলা, একটি শিব ও দুইটি শালগ্রাম শিলা আছে। শিবমন্দিরটি মুসলমান সম্প্রদায়ের মসজিদ আকারে নির্মিত; মন্দিরের মধ্যস্থলে একটি বিরাট গম্বুজ এবং চতুষ্কোণে চারটি ছোট চূড়া এবং মধ্যস্থলে গম্বুজের উপর একটি চূড়া ও ত্রিশূল আছে। মন্দিরটি প্রায় আশি বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করা হয়।

শ্রীশীতলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক,
মনোহরপুর শ্যামচরণ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নেকুড়সেনী, মেদিনীপুর।

মোগলমারি—দাঁতন হইতে দুই মাইল উত্তরে মোগলমারি গ্রাম অবস্থিত। এখানে 'শশিসেনার পাঠশালা' নামে পরিচিত একটি প্রাচীন ইষ্টক স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, এই পাঠশালায় অমরাবতীর রাজা বিক্রম কেশরীর কন্যা শশিসেনা বা সখীসেনা এবং কৃষক পুত্র অহিমাণিক বাল্যকালে একসাথে পাঠাভ্যাস করিতেন। পরে পরিণত বয়সে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পিতামাতার অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া গোপনে দেশত্যাগ করেন। শশিসেনা ও অহিমাণিকের প্রণয়-কথা কবি ফকিররামের "সখিসেনা" কাব্যে বিবৃত হইয়াছে।

মোগলমারি গ্রামে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে তোডরমল পরিচালিত মুঘল বাহিনীর সহিত ভীষণ যুদ্ধে সোলেমান কররানীর পুত্র দাউদ শাহ পরাজিত হন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও মুঘল পক্ষে বহু সেনা নিহত হয়। সেইজন্য এই গ্রামের নাম হয় মোগলমারি।

৪। গ্রাম : মনোহরপুর। ৭৪।৭৮১'১০।২৬৩।১'২২৬

(ক) গ্রামটি হিন্দু প্রধান। গ্রামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন নেকুড়সেনী হইতে মেদিনীপুর-দাঁতন রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী ও পূর্ণিমা তিথি হইতে স্থানীয় "মাতৃ সেবক সংঘের" বার্ষিক উৎসব এবং চৈত্র মাসে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মাতৃ সেবক সংঘের বার্ষিক উৎসবটি গত প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মাতৃ মেলা। ফাল্গুন মাসে পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শীতলামন্দির ও একটি শিবমন্দির আছে। শীতলামন্দিরটি পূর্বমুখী এবং মন্দিরাভ্যন্তরে শীতলা, ষষ্ঠী, মনসা, ঘণ্টাকর্ণ, পঞ্চানন, জরাপাত্র ও রক্তাবতীর মৃন্ময় মূর্তি ও তৎসম্মুখে তিনটি তাম্র নির্মিত ঘট স্থাপিত আছে। এই মন্দিরে একটি জৈন মূর্তি বহুকালব্যাপী প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীজগদীশ চন্দ্র রায় বীরবর,
গ্রাম : কোটবাজার,
মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম : শোলপাটা। ১৮৫।৪০১'২৮।৮২।৫২৯

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজু, কামার ও গিরি। গ্রামে বারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন জলেশ্বর হইতে মোটর-বাসে যাইয়া সামান্য কিছু পথ বাঁধের উপর দিয়া হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে তিলেশ্বর শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি গত প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি তিলেশ্বর শিবমন্দির এবং একটি উচ্চ ঢিপির উপর চণ্ডীদেবীর শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহা ছাড়া পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেবদেবী আছে।

তিলেশ্বর শিবের আবির্ভাব সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে, পাণ্ডাবংশীয় জনৈক ব্রাহ্মণ গ্রামবাসী একদা জমি কর্ষণকালে তাঁহার কোদালের আঘাতে একটি শিলাখণ্ড হইতে রক্ত নিঃসরণ হইতে থাকে। রাত্রিকালে তিনি স্বপ্নাদেশে জানিতে পারেন যে উহা সাধারণ শীলা নহে, উহা শিবের প্রতীক স্বরূপ। তদবধি ব্রাহ্মণ উক্ত শিলা-খণ্ডকে শিবজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতে থাকেন। ক্রমে শিবের মাহাত্ম্য সর্বত্র প্রচার লাভ করে এবং নানা স্থান হইতে বহু সাধু-সন্ন্যাসীগণ শিব দর্শন করিবার মানসে এই স্থানে উপস্থিত হইতে থাকেন। পরে সর্বসাধারণের অর্থে গ্রামের মধ্যস্থলে একটি পাকা শিবমন্দির নির্মিত হয় এবং উহা তিলেশ্বর শিবমন্দির নামে খ্যাত হয়। তিলেশ্বর মন্দিরে মানসিক করিয়া বহুলোক বহু দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে নিরাময় লাভ করিয়াছেন এবং অদ্যাপি মন্দিরে পূজাদি দিতে প্রত্যহ লোকজন আসেন।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র বেরা, প্রধান শিক্ষক,
শোলপাটা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মাটীবীরুয়া, মেদিনীপুর।

৬। গ্রাম : হরিপুরা। ২১৬।৪১২'৬৪।৮৫।৩৭৩

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, করণ, মাহিষ্য, রাজু, ধোপা, নাপিত ও সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন লক্ষ্মণনাথ হইতে জগন্নাথ রোড ধরিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উৎসবটি গত কুড়ি বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। ইহা প্রায় কুড়ি বৎসরের প্রাচীন।

সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি পাকা শিবমন্দির আছে।

শ্রীসুধীর কৃষ্ণ বসু, প্রধান শিক্ষক,
হরিপুরা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সোনাকানিয়া, মেদিনীপুর।

৭। গ্রাম : খণ্ডরুই। ২৪৫।১,০৭২'১১।৩৫৭।১,৭৫৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, কায়স্থ, করণ, ডোম, হাড়ী, মেথর, ধোপা, নাপিত, ভূমিজ, কোল, ছুতার, গুড়্যা, রাজু, তাঁতী, কাদমা, তেলী, কামার, সাঁওতাল ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কাঁথি রোড হইতে খাকুড়দাগামী পাকা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও রাসযাত্রা উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলির মধ্যে দুর্গাপূজাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয় এবং অন্যান্য উৎসবগুলি মাত্র পঞ্চাশ হইতে ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে সাতদিন-ব্যাপী। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে সপ্তাহব্যাপী। মেলাটি গত দুই বৎসর হইল বসিতেছে।

চড়কের মেলা। চৈত্র-বৈশাখে পক্ষকালব্যাপী। ইহা প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ইষ্টক নির্মিত গম্বুজাকৃতি দুইটি প্রাচীন মন্দিরে যথাক্রমে ভাগ্যেশ্বরী দেবী ও কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কথিত আছে, অতীতে এই স্থানে তেলঙ্গী দেশীয়

ব্রাহ্মণের রাজ্য ছিল এবং তাঁহাদের নিজ দেশের অনুকরণে মন্দির দুইটি নির্মিত বলিয়া ঐ মন্দির দুইটির সহিত এ দেশীয় মন্দিরের গঠন-ভঙ্গিমার কোন সাদৃশ্য নাই। তাহা ছাড়া, গ্রামে রাধাবল্লভজীউমন্দির, গোবিন্দজীউমন্দির, বৃন্দাবনচন্দ্রজীউমন্দির এবং শ্যামলেশ্বর শিবমন্দিরগুলি উক্ত রাজপরিবার নির্মাণ করান।

একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে বাসুলী দেবীর নির্দিষ্ট স্থান এবং রাজবাটীর মধ্যে একটি মন্দিরে শীতলা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

খণ্ডরুই গ্রামটি মেদিনীপুর জেলার তথা পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এবং উড়িষ্যা প্রদেশের সন্নিকটে অবস্থিত। নবাবী আমলের পর তুরকা পরগণাটি জনৈক উড়িষ্যার সামন্ত রাজার অধীনে চলিয়া যায়। তেলেঙ্গী জাতীয় জনৈক ব্রাহ্মণ সামন্ত রাজের অধীনে চাকুরী করিতেন। সামন্ত রাজরা তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তুরকা পরগণাটি জায়গীর স্বরূপ দেন। উক্ত তেলঙ্গী ব্রাহ্মণ প্রথমদিকে সামন্ত রাজদিগকে যথারীতি কর দিতেন। পরে নিজ রাজ্যের মধ্যে গড়, রাজবাটী, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া সৈন্য-সামন্ত বৃদ্ধি করেন এবং সামন্ত রাজদিগকে কর দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া নিজেকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ব্রাহ্মণ কর্তৃক নির্মিত গড়টির একটি মাত্র প্রবেশ পথ ছিল; অদ্যবধি উক্ত দ্বারটি গড়ের স্মৃতিচিহ্ন বহন করিয়া আসিতেছে। সামন্ত রাজা উক্ত ব্রাহ্মণকে কিছুতেই স্ববশে আনিতে না পারিয়া তাঁহার মস্তকের পরিবর্তে তুরকা পরগণার চিরস্থায়ী অধিকারী সত্ত্বের কথা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পর উড়িষ্যা হইতে রাজপুত বংশীয় দুই ভ্রাতা তুরকায় আসেন এবং উক্ত ব্রাহ্মণ রাজকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া এই রাজ্য লাভ করেন। বর্তমানে এই স্থানের রাজপরিবার এই রাজপুত বংশধর বলিয়া জানা যায়। তেলঙ্গী ব্রাহ্মণ রাজাকে 'নাগবিন্দা' নামক পুষ্করিণীর পাড়ে দাহ করা হয় এবং তাঁহার রানী সহমরণ বরণ করেন। খণ্ডরুইগড়ের সুবৃহৎ পুষ্করিণীটি বর্তমান রাজবংশের অন্যতম রাজা গঙ্গা-নারায়ণের সময় খোদিত এবং উক্ত পুষ্করিণীর পাড়ে অদ্যাপি "সতীকুণ্ড" নামে খ্যাত একটি স্থান আছে। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে উহাতে পূজা দেওয়া হয়।

শ্রীক্ষুদিরাম জানা, প্রধান শিক্ষক,
খণ্ডরুই নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
পোঃ তুরকাগড়, মেদিনীপুর।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

শোলপাটা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে তিলেশ্বর শিবের গাজন উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন এবং প্রতিদিন বিকালের দিকে মেলায় লোক সমাগম হয়।

দাঁতন থানার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতিদিন সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় দেড় সহস্র নরনারী প্রধানতঃ মোটরবাস ও সাইকেল করিয়া মেলায় আসেন। পুরুষ অপেক্ষা নারী যাত্রীর সংখ্যা অধিক।

স্থানীয় অঞ্চল ছাড়া উড়িষ্যা হইতে বিক্রেতাগণ বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী কারুশিল্পজাত জিনিসপত্র লইয়া প্রায় প্রতি বৎসরই মেলায় আসেন। মেলায় প্রায় সত্তর-আশিটি দোকানপাট বসে। তন্মধ্যে মনিহারী দোকানের সংখ্যা সর্বাধিক। তাহা ছাড়া মিষ্টান্ন, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাস্তে-কোদাল, ধামা-কুলা এবং অন্যান্য রকমারী জিনিসের দোকানপাট বসে। মেলায় বিক্রেতা-গণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য খেলাধুলা, নাগরদোলা, ম্যাজিক প্রভৃতি আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় এবং যাত্রাভিনয় হয়। যাত্রাভিনয় দেখিতে সহস্রাধিক লোকজনের সমাগম হয়।

হরিপুরা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দিরে সংলগ্ন প্রায় চার বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি গত কুড়ি বৎসর যাবৎ বসিতেছে।

পাশপলাশিয়া, বেলী, পাথুরিয়া, পাটনা, ধলবাড়,

সাঁইকোলা, কুশমী, চকপরগণা প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে প্রায় পাঁচশত নরনারী গরুর গাড়ী করিয়া ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, ঔষধপত্র, কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও খেলনা-পুতুলের অনেকগুলি দোকানপাট বসে। ব্যবসায়ীরা স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান, জলসা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে সহস্রাধিক দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—হরিপুরা গ্রামে অনুষ্ঠিত সরস্বতীপূজার মেলাটি উল্লিখিত গাজন মেলার অনুরূপ। তবে এই মেলায় প্রায় দেড় সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

দোলযাত্রার মেলা

পলাশীয়া গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে গ্রামের 'হেমসাগর' নামক পুষ্করিণীর পাড়ে এবং রাসমঞ্চের নিকটবর্তী প্রায় আট-দশ বিঘা জমির উপর সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র গত পাঁচ বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে।

আমড়দা, পুরুন্দা, চড়াইগ্রাম, পাণিয়াড়া, বাঁশীচক, বামনাসাই, জাহালদা প্রভৃতি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের অগণিত নরনারী গরুর গাড়ী করিয়া ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলার যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা বেশী।

মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ দাঁতন ও এগরা থানার অন্তর্গত গ্রাম সমূহ হইতে আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী রকমারী জিনিসপত্র, খেলনা-পুতুল, হাঁড়ি-কলসী ইত্যাদির পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য খেলাধূলা, ম্যাজিক ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

মাতৃ মেলা

মনোহরপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে "মাতৃ সেবক সঙ্ঘের" বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গ্রামের হাটে পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। স্থানীয় অঞ্চলে এই মেলাটি 'মাতৃ মেলা' নামে পরিচিত। ইহার প্রবর্তন সম্বন্ধে জানা যায়, গত ১৩১৫ বঙ্গাব্দে দোলপূর্ণিমার পূর্বদিবস অর্থাৎ একাদশী তিথিতে রাজা রামচন্দ্র রায় বীরবর নামক জনৈক জমিদারের স্ত্রী জানকীসুন্দরী দেবীর মৃত্যু হয়। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে গ্রামবাসীগণ 'রানী মেলা' নামে একটি মেলার প্রবর্তন করেন। তদবধি এই মেলাটি নিয়মিত প্রতি বৎসর বসিতেছিল। তারপর কয়েক বৎসর মেলাটি বন্ধ হইয়া যায়। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে গ্রামবাসীগণের দ্বারা গঠিত "মাতৃ সেবক সঙ্ঘের" সভ্যগণ মেলার পুনঃ প্রচলন করেন এবং 'রানী মেলা' নাম পরিবর্তন করিয়া 'মাতৃ মেলা' নামে নূতন নামকরণ করেন। বর্তমানে মেলাটি "মাতৃমেলা সেবক সংঘ"-এর সভ্যগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে।

আশপাশের শিরণী, কেশরগ্যা, কাজীপাড়া, বেহালা, গোপীনাথপুর, পাঁচরোল, বেনাডুবী, কাকরাজীউ, পাটনা, দক্ষিণ পাটনা, বৈঁচা, বৈঁচা পাটনা, মালিয়াড়া, সুন্দরপুর, বেজদা, গানপাদা, দোয়াস্তি, ধলহরা, পাণিচক, মোগলমারি, বারি, পুঞ্জা, জয়রামপুর, নেকুড়সেনী, শাঁখারী বাজার, রানীসরাই, লালমুরি, চক জয়রামপুর, দাঁতন, উত্তর রায়গড়, কৃষ্ণপুর, বাবুলপুর, জ্যোতি, বামদা, মুণ্ডাকাটা প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে প্রত্যহ গড়ে প্রায় তিন সহস্র নরনারী ট্রেন, গরুর গাড়ী এবং সাইকেল করিয়া মেলায় আসেন। পুরুষ অপেক্ষা নারী যাত্রীর সংখ্যা অধিক।

মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ দাঁতন, বেলদা, সাবড়া, মুরাদপুর, কাঁথি, খড়্গপুর, মেদিনীপুর শহর প্রভৃতি স্থানগুলি এবং তৎপার্শ্বস্থিত গ্রাম হইতে আসেন। মেলায় প্রায় দেড়শত দোকানপাট ছাড়া কুড়ি-পঁচিশজন ফেরি-ওয়ালা আসেন। দোকানপাটের মধ্যে মনিহারী জিনিসের দোকানই সর্বাপেক্ষা অধিক। তাহা ছাড়া মিষ্টান্ন, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড় এবং অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। মেলার বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না; অবশ্য গ্রামবাসীগণ মেলাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আর্থিক সাহায্য দান করেন।

মেলার কয়েকদিনব্যাপী স্থানীয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণের দ্বারা প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ানুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া শিবায়ণগান, ভারতগান, কীর্তনগান, জলসা, সার্কাস, ম্যাজিক, যাত্রা ও থিয়েটার প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাগানের দল আসে। যাত্রা দেখিতে প্রায় তিন সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

মহোৎসবের মেলা

উত্তর সিমুলিয়া মৌজার অন্তর্গত মোগলমারি গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে মহোৎসব উপলক্ষে গ্রামের একটি উঁচু ঢিবি সংলগ্ন প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি স্থানীয় অঞ্চলে 'শশীসেনার মেলা' নামে পরিচিত।

নেকুড়সেনী, রানীসরাই, তররই, দাঁতন প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দেড় সহস্র নরনারী গরুর গাড়ী করিয়া ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

দাঁতন, বেলদা ও তৎপার্শ্বস্থিত গ্রামসমূহ হইতে বিক্রেতাগণ প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে ও দশ-বারজন ফেরিওয়ালা আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, ঔষধপত্র, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যাদির দোকানপাটও বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য স্থানীয় যুবসঙ্ঘ কর্তৃক থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। যাত্রাভিনয়ের অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ-ছয়শত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়। **বিশেষ দ্রষ্টব্য**—মোগলমারি গ্রামে অনুষ্ঠিত গাজনের মেলাটি এই গ্রামে অনুষ্ঠিত উল্লিখিত মহোৎসবের মেলার অনুরূপ। গাজনের মেলায় ছয়-সাতশত যাত্রী আসেন।



থানা ঃ কেশিয়াড়ী

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ বারমোড়। ৯৫।১৮১`১৪।৪১।১৯৮

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, রাজপুত, ভূমিজ, বাগাল, সদ্‌গোপ, তাম্বুলী, নাপিত, ধোপা, তাঁতী ও সাঁওতাল। গ্রামে জানাপাড়া, আইচপাড়া, দেপাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, ভূমিজপাড়া, বাগালপাড়া, তাঁতীপাড়া ও সাঁওতালপাড়া নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও দিনমজুরী।

(গ) খড়্গপুর হইতে খাজরাগামী মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দিরটিকে ফুল-লতা-পাতা দিয়া সুসজ্জিত করিয়া বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহব্যাপী প্রত্যহ ঢাক-ঢোল-সানাই বাজাইয়া যথারীতি শিবের পূজা করা হয়। গাজন উপলক্ষে অনেকে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় সংনাচ হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে শেষ সপ্তাহব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শীতলামন্দির এবং একটি মাটির ঘরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবমন্দিরের নিকট একটি পাথরের গাথনীযুক্ত কূপ আছে।

শ্রীসতীশ চন্দ্র গিরি, শিক্ষক,
বারমোড় প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

২। গ্রাম ঃ ভেলামপুর। ১২০।১৩৭`৩০।১৮।৯৭

(ক) মাহিষ্য, রাজপুত, কোদমা ও সাঁওতাল। গ্রামে মাহিষ্যপাড়া, রাজপুতপাড়া ও সাঁওতালপাড়া নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) খড়্গপুর রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে অষ্টমপ্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন উৎসব ও শীতলাপূজা এবং আষাঢ় মাসে চণ্ডীপূজা এবং মাঘ মাসে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সম্প্রতিকালের।

(ঙ) শিবপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির, একটি শীতলামন্দির, একটি হরিমন্দির ও একটি গোপালজীউমন্দির ছাড়া চণ্ডীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীঅনন্ত কুমার শীট, প্রধান শিক্ষক,
ভেলামপুর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম ঃ সুকারোল। ১৪৫।৩০৩`০৪।৪৩।২৪৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, তাঁতী, রজক, কালন্দী, রাজপুত, মাহিষ্য ও সাঁওতাল। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন নয়াগ্রাম হইতে জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির, একটি শীতলামন্দির এবং একটি চণ্ডীমন্দির আছে। উল্লিখিত মন্দিরগুলিতে যথাক্রমে শীতলার দারুমূর্তি এবং শিব ও চণ্ডীর প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রবাদ আছে যে, গ্রামের 'গোপাল সাগর' নামক পুষ্করিণী হইতে শীতলার মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়। শীতলা-মন্দিরের সম্মুখে প্রায় পনর ফুট দৈর্ঘ্য ও নয় ফুট প্রস্থ এবং প্রায় সতর ফুট উচ্চ করগেটের ছাউনীযুক্ত একটি নাটমন্দির আছে। তাহা ছাড়া, গ্রামের মধ্যস্থলে জনৈক অজ্ঞাতনামা সাধুর সমাধি মন্দির আছে।

শ্রীগঙ্গাধর বারিক, প্রধান শিক্ষক,
সুকারোল শীতলাদেবী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক কেশিয়াড়ী গ্রামে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণাদি সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি নিয়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

কেশিয়াড়ী

খড়্গপুর হইতে প্রায় ১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কেশিয়াড়ী একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। খড়্গপুর অথবা মেদিনীপুর শহর হইতে মোটরবাসে সরাসরি কেশিয়াড়ীতে যাতায়াত করা চলে। কেশিয়াড়ীর প্রাচীন ও প্রখ্যাত সর্বমঙ্গলামন্দির নিকটবর্তী ভবানীপুর মৌজার মণ্ডলমোড়া পল্লীতে অবস্থিত। মাকড়া পাথর দ্বারা নির্মিত দক্ষিণমুখী এই বিশাল মন্দিরটি উড়িষ্যার রেখ-দেউল স্থাপত্য রীতিতে গঠিত। মন্দিরের সম্মুখভাগে জগমোহন ও তৎসংলগ্ন চারিদিকে খোলা বারটি স্তম্ভবিশিষ্ট 'বারদুয়ারী' নামে একটি নাটমন্দির আছে। নাটমন্দিরে উঠিবার সিঁড়ির উভয় পার্শ্বে পিছনের দুইটি পা মুড়িয়া এবং সামনের পায়ের উপর ভর দিয়া উপবিষ্ট প্রস্তর নির্মিত দুইটি বৃহৎ সিংহ মূর্তি স্থাপিত। মূল মন্দিরের দেওয়াল গাত্রে দুইটি মৈথুনধর্মী শিল্প এবং মনুষ্য ও সিংহমুখাকৃতি খোদিত আছে। জগমোহনের বাহিরের দেওয়াল গাত্রে খোদিত ওড়িয়া ভাষায় লিখিত একটি লিপি হইতে জানা যায় যে, এই অঞ্চলে রঘুনাথ শর্মা নামে ভূঞা উপাধিধারী জনৈক ভূস্বামীর পুত্র চক্রধর ভূঞা ১৫২৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ মানসিংহের তিন অঙ্কে সোমবার এই দেবী মন্দির ও জগমোহন প্রতিষ্ঠা করেন। হরিদাস নামক তাঁহার জনৈক কর্মচারীর অধীনে রঘুনাথ কামিলা ও বাসুরাম কারিকর অর্থাৎ রাজমিস্ত্রি এই মন্দির নির্মাণ কার্যে যুক্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

মূল মন্দিরের অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভগৃহে একটি বেদীর উপর অভয়বরদায়িনী দ্বিভুজা, বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা দেবী সর্বমঙ্গলা বাম পা মুড়িয়া এবং ডান পা ঝুলাইয়া উপবিষ্টা। পদতলে বেদীর নিম্নদেশে সম্পূর্ণ সিন্দুর লিপ্ত একটি সিংহ মূর্তি আছে। দেবীর বর্ণ মেটে সিঁদুরের ন্যায় এবং উপরের দুইটি দন্ত দিয়া নীচের অধরওষ্ঠ চাপিয়া আছেন। এই একই বেদীর উপর অন্যান্য আরও কয়েকটি মূর্তি আছে। যেমন, অষ্টধাতু নির্মিত প্রায় এক হাত পরিমিত উচ্চ সর্বমঙ্গলার অনুরূপ একটি দেবী মূর্তি (ইহা সর্বমঙ্গলার ভোগমূর্তি বলা হয়), পিতল নির্মিত প্রায় বারইঞ্চি উচ্চ চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী মূর্তি (সঙ্গে কার্তিক-গণেশাদি দেবতা নাই), প্রায় এক হাত উচ্চ কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত অতি সুন্দর আর একটি চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী মূর্তি এবং প্রায় ছয় ইঞ্চি উচ্চ একটি গণেশ মূর্তি আছে। ইহা ব্যতীত, সর্বমঙ্গলা দেবীর উভয় পার্শ্বে জয়া ও বিজয়া মূর্তি আছে।

জগমোহনের অভ্যন্তরে দেওয়াল গাত্রে হেলান দিয়া লাল পাথরে খোদিত প্রায় দুই হাত উচ্চ দ্বিভুজ দণ্ডায়মান একটি পুরুষ মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্তিটির উভয় হস্তে যথাক্রমে খড়্গ ও মুদগরের ন্যায় অস্ত্র এবং গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও বক্ষস্থলের উপর দিয়া আড়াআড়িভাবে যজ্ঞোপবীত আছে। দক্ষিণ হস্তের নীচের দিকে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি পুরুষ মূর্তি খোদিত। এই মূর্তিটিকে দেবীর ভৈরবরূপে পূজা করা হয়।

সর্বমঙ্গলা দেবীর প্রত্যহ দিবাভাগে অন্ন ও মৎস্য দ্বারা ভোগ এবং প্রাচীন রীতি অনুসারে রাত্রিকালে পান্তাভাত দ্বারা ভোগ পূজা হইয়া থাকে। সর্বমঙ্গলামন্দিরে বৎসরের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন উৎসবাদি পালন করা হয়; তবে উহাদের মধ্যে আশ্বিন মাসে শারদীয়া উৎসবেই বিশেষ ধূমধাম হইয়া থাকে। উৎসবকালে জয়-বিজয়াসহ দেবীর ভোগমূর্তিকে জগমোহনে একটি নির্দিষ্ট বেদীর উপর স্থাপন করিয়া যথারীতি পূজা-অর্চনা ও হোম-যজ্ঞাদি হইয়া থাকে। শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে সর্বমঙ্গলা দেবীর উদ্দেশ্যে অনেক-গুলি পাঠাবলি হয়। পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পূর্বে এই স্থানে মহিষ বলিও হইত। সর্বমঙ্গলামন্দিরের পশুবলির একটু বিশেষত্ব আছে। মানতের পাঠাগুলিকে মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রোথিত একটি যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া শিরচ্ছেদ করা হয় এবং মন্দিরের বাহিরে একটি রুধির পাত্রে রক্ত ও বলির ছাগ মুণ্ড রাখিয়া সেখান হইতে দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। কিন্তু মহিষ বলি হইত দেবীর মন্দিরের সম্মুখভাগেই। মন্দিরের পূজারীদের নিকট একটি বৃহৎ খড়্গ আছে। উক্ত খড়্গের উপর ওড়িয়া ভাষায় লিখিত লিপি খোদিত আছে। বিজয়া দশমী

তিথিতে সন্ধ্যা বেলায় স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখে জগন্নাথমন্দিরের নিকট রাবণের একটি মূর্তি নির্মাণ করিয়া দাহ করা হয় এবং এই সময় বহু টাকার আতশ-বাজি পোড়ান হয়। 'রাবণ দাহ' উৎসবটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে উৎসব প্রাঙ্গণে নানাবিধ জিনিসপত্রের ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং তিন-চার হাজার নরনারীর সমাগম হয়। শারদীয়া উৎসব ও চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজার দিন অদ্যাপি সিংহভূমের রাজ-পরিবার হইতে নৈবেদ্য আসিয়া থাকে।

ইহা ভিন্ন, ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমা তিথিতে সর্বমঙ্গলা দেবীর ভোগমূর্তি মন্দির হইতে বাহিরে আনিয়া নাটমন্দিরের সম্মুখস্থ বাঁধান দোলমঞ্চে স্থাপন করিয়া যথারীতি দোল পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে দোল উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসিত; বর্তমানে উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

পূর্বে নারায়ণগড় থানার খেলাড়ের সৎপথীগণ দেবী সেবায়েত ছিলেন। বর্তমানে বেলদার নিকটবর্তী গড়কেষ্ট-পুরের রাজপুত ক্ষত্রিয় শ্রীহরিশচন্দ্র দেব ও বেলেবেড়ার প্রহরাজগণ দেবীর সেবায়েতের কার্য এবং মহাপাত্র, মিশ্র ও পাণ্ডা পদবীধারী উৎকলবাসী ব্রাহ্মণগণ বংশ-পরম্পরায় দেবীর নিত্য পূজাদি করিতেছেন। তবে বিশেষ পূজাদি করেন শ্রীসূর্যকান্ত পরিছা, ইনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। একটি ট্রাষ্টী কমিটি কর্তৃক সর্বমঙ্গলামন্দিরের পূজা-পার্বণাদি পরিচালিত হইতেছে।

সর্বমঙ্গলামন্দিরের সরাসরি পূর্বদিকে কিঞ্চিৎ দূরে সম্মুখে জগমোহনসহ মাঝারি গঠনের একটি রেখ-দেউলাকৃতি মন্দিরে কাশীশ্বর নামে খ্যাত স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ আছে। মন্দিরে নিত্য পূজা ব্যতীত শিবরাত্রির সময় বহু লোকের সমাগম হয়, শিবমন্দিরের দেওয়ালগাত্রে শিব-দুর্গা ব্যতীত একটি মৈথুনধর্মী শিল্পকর্ম খোদিত আছে।

সর্বমঙ্গলামন্দিরের দক্ষিণদিকে সিকি মাইল দূরে তলকেশরী পল্লীতে রেখ-দেউল রীতিতে গঠিত প্রস্তর নির্মিত অপর একটি মন্দিরে কপিলেশ্বর নামে খ্যাত একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। কপিলেশ্বরের মন্দিরটি উল্লিখিত কাশীশ্বর শিবমন্দিরের তুলনায় উচ্চতায় কিঞ্চিৎ ছোট।

ইহা ভিন্ন, তলকেশরী পল্লীতে সম্মুখে সমতল ছাদ বিশিষ্ট নাটমন্দিরসহ জগন্নাথদেবের একটি সুবৃহৎ প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দারু নির্মিত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। শোনা যায়, প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে স্থানীয় ঘোষ বংশের জনৈক ব্যক্তি এই মন্দির নির্মাণ করেন। জগন্নাথদেবের নিত্য অন্নভোগ দ্বারা পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে ধূমধামের সহিত রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়। রথযাত্রার দিন অপরাহ্ণে সুসজ্জিত রথে উক্ত বিগ্রহাদি স্থাপন করিয়া জগন্নাথদেবের মন্দির হইতে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে স্থানীয় বি. ডি. ও অফিসের নিকট গুণ্ডিচা বাড়ী নামে খ্যাত একটি ঘরে আনিয়া রাখা হয়। গুণ্ডিচা বাড়ীর নিকটস্থ বিমলেশ্বর শিবমন্দির প্রাঙ্গণে রথযাত্রা উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী একটি বৃহৎ মেলা বসে। মেলায় প্রায় শতাধিক দোকানপাটে বিভিন্ন জিনিসপত্রের আমদানী হয় ও বহু লোকজন আসেন। উল্লিখিত বিমলেশ্বর শিবমন্দিরটি মির্জাপুর মৌজার অন্তর্গত এবং প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে মাত্র দুই-তিন বৎসর হইল বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছে। মির্জাপুর মৌজায় মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি মসজিদ আছে।

ইহা ভিন্ন, তলকেশরী পল্লীতে 'শুদ্ধভক্তি নিকেতন' নামে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি মঠ আছে। মঠটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এবং এই মঠের অন্তর্গত একটি সুন্দর মন্দিরে গৌরাঙ্গদেবের মূর্তি ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত বিগ্রহাদির নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে ঝুলন উৎসব এবং চৈত্র পূর্ণিমায় রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ণিমা তিথিতে রথটানা হয় এবং তদুপলক্ষে আশ্রম প্রাঙ্গণে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলায় প্রায় একশত দোকানপাটে বিবিধ জিনিসপত্রের আমদামী হয়।

তলকেশরী পল্লী হইতে প্রায় অর্ধ মাইলের মধ্যে গোপালপুর মৌজায় অবস্থিত 'গৌরাঙ্গ মঠে' পাশাপাশি দুইটি অতি সুন্দর মন্দিরে যথাক্রমে দারুময় গৌরাঙ্গ বিগ্রহ এবং গোপীনাথজীউ নামে খ্যাত কষ্টি পাথর নির্মিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্বেত পাথর নির্মিত শ্রীরাধার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। গোপীনাথজীউর মন্দির হইতে গৌরাঙ্গ মন্দিরটি উচ্চতায় বৃহৎ। প্রায় বিশ বৎসর হইল উক্ত মন্দিরদ্বয় নির্মিত হইয়াছে। উল্লিখিত বিগ্রহাদির নিত্য পূজা ও বৎসরের বিভিন্ন বিষ্ণুপর্বে উৎসবাদি অনুষ্ঠিত

হয়। শ্রাবণ মাসে ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে বহু লোকজনের সমাগম হয়।

কেশিয়াড়ী থানার অন্তর্গত অন্যান্য কয়েকটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে শ্রীযোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত দেওয়া হইল—

"কেশিয়াড়ীর প্রায় তিন মাইল অন্তরে কুরুমবেড়া দুর্গ নামে প্রস্তর নির্মিত একটি জীর্ণ দুর্গ আছে। দুর্গটির বহিঃ পার্শ্বের প্রাচীর এক্ষণে অনেকখানি মাটার মধ্যে বসিয়া গিয়াছে, যেটুকু বাহিরে আছে তাহার উচ্চতা প্রায় দশ ফিট এবং প্রস্থ তিন ফিট। এই প্রাচীর গাত্রে দুর্গের অভ্যন্তরে আট ফিট প্রশস্ত খিলানযুক্ত প্রকোষ্ঠ সমূহ চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে। মধ্যস্থলে প্রশস্ত সমতল চত্বরভূমি। এই প্রাঙ্গণের পূর্ব্বাংশে একটি দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং পশ্চিমদিকে তিনটি প্রশস্ত বৃত্তাকার গম্বুজ ও চারিদিকে খিলানযুক্ত দ্বারসহ একটি পুরাতন মসজিদ আছে। মন্দির গাত্রে উড়িয়া ভাষায় লিখিত যে প্রস্তর ফলকখানি আছে, তাহার প্রায় সকল অক্ষরই ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, কেবল যে দু'-একটি স্থান অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট আছে, উহাতে "বুধবার" ও "মহাদেবস্থ মন্দির" এই দুইটি কথামাত্র পাওয়া যায়। জনশ্রুতি, উড়িষ্যাধিপতি রাজা কপিলেশ্বর দেব কর্তৃক এই মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল এবং সেই কথাই উক্ত প্রস্তর ফলকটিতে খোদিত ছিল। কপিলেশ্বর বা কপিলেন্দ্রদেব খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উড়িষ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

কুরুমবেড়া দুর্গমধ্যস্থ মসজিদটির গাত্রেও একটি শিলা-লিপি আছে। উহা হইতে জানা যায় যে, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মহম্মদ তাদির কর্তৃক ১১০২ হিজিরীতে (১৬৯১ খৃষ্টাব্দে) ঐ মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল। মসজিদটির প্রস্তরগুলি দেখিলে মনে হয় যে, কোন হিন্দু মন্দিরের উপকরণ লইয়াই উহা নির্মিত হইয়াছিল। একই প্রাঙ্গণে একই প্রাচীরের মধ্যে হিন্দু মন্দির ও মুসলমান মসজিদের প্রতিষ্ঠা এক নূতন দৃশ্য।

মোগল রাজত্বের সময় কেশিয়াড়ীতে একটি প্রধান তহশীল কাছারী ছিল। সেই কারণে বহুসংখ্যক মোগলের এ প্রদেশে আমদানী হওয়ায় যে স্থানে তাঁহারা বাস করিতেন উহা মোগলপাড়া নামে অভিহিত হয় এবং অদ্যাবধি ঐ স্থান সেই নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহাদের নির্মিত মসজিদ ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একটি জীর্ণ মসজিদে আরবী ভাষায় লিখিত যে প্রস্তর ফলকখানি আছে উহা হইতে জানা যায় যে, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময়ে ঐ মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল। ঐ সকল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি প্রস্তর মূর্তি পড়িয়া আছে; উহা কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের প্রতি-মূর্তি বলিয়া মনে হয়। তলকেশিয়াড়ী গ্রামেও একটি মসজিদ আছে; উহা বাদশাহ সাহ আলমের সময়ে নির্মিত। স্থানীয় মুসলমানগণ সেই স্থানেই উপসনাদি করিয়া থাকেন।

কেশিয়াড়ীর কয়েকটি প্রাচীন পুষ্করিণী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেশিয়াড়ী, কাঞ্চনপুর, গগনেশ্বর প্রভৃতি স্থানের মধ্যে 'মুকুন্দদেব', 'বিদ্যাধর', 'পাত্রমা', 'দাঁড় পাত্রমা', 'নায়ক' প্রভৃতি নামে কয়েকটি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। মুকুন্দদেব পুষ্করিণীর তটভূমি অতি উচ্চ এবং সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। উহার চারিধার উত্তমরূপে গাঁথিয়া প্রাচীরাদির দ্বারা সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। কর্তিত প্রস্তরের আগাগোড়া গাঁথনীর ও সুগঠিত সোপানবলীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। জলাশয়ের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র ভগ্ন মন্দির কালের কঠোর নির্যাতন সহ্য করিয়া এখনও দণ্ডায়মান আছে।

কেশিয়াড়ীর পূর্ব্বদিকে ও গগনেশ্বরের উত্তরে বিদ্যাধর নামে যে পুষ্করিণী আছে উহা অতীব পূণ্যতোয়া বলিয়া এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন এখানে মেলা বসে। সে সময়ে অনেকে এই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে পিণ্ড ও জল তর্পণ প্রদান করেন। জন প্রবাদ, উৎকলাধিপতি মুকুন্দদেব ও তদীয় মন্ত্রী বিদ্যাধরের নামানুসারে পুষ্করিণী দুইটির নামকরণ হইয়াছিল।"

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

বারমোড় গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা পরিমাণ জমির উপর সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন এবং শেষের তিনদিন অধিক লোক সমাগম হয়।

কেশিয়াড়ী থানার ১নং ও ২নং মৌজা এবং সাঁকলোবনী, ছেবদা, সেবাঁধ, গাইঘাটা, ছোড়দা, ঘৃতগ্রাম, মালবাঁধ, গোয়ালডাঙ্গা, ভালুকখুল্যা, মাহিষামুণ্ডা, দেপালা, বড়চেট্যা, গিলাগেড়্যা, কাপাশগেড়্যা, ভুরকুণ্ডি, খাজরা, নেঙ্গামারা, কুশগেড়্যা প্রভৃতি স্থানগুলি হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী গরুর গাড়ী ও সাইকেল করিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ ছোড়দা, সিঙ্গাই, হাতিগেড়্যা, গিলাগেড়্যা, ছেবদা, বারিদা প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে ও দশ-বারজন ফেরিওয়ালা আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়-চোপড়, দা-কাস্তে, ধামা-কুলা এবং আম-কাঁঠাল, নারিকেল, খরমুজ প্রভৃতি ফলমূলাদির দোকানপাট বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিকের দল আসে। কবিগান, জলসা, বাঈজী নাচ এবং থিয়েটার বা যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ-ছয়শত দর্শকের সমাগম হয়। অনেকে জুয়া বা লটারী খেলিয়া থাকেন।

দুর্গাপূজার মেলা

সুকারোল গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে জনৈক অজ্ঞাতনামা সাধুর সমাধি মন্দির সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

কেশিয়াড়ী থানার ৬নং, ৭নং ও ৯নং ইউনিয়ন এবং দাঁতন থানার অন্তর্গত ১নং ইউনিয়ন হইতে প্রায় পাঁচশত নরনারী গরুর গাড়ী ও সাইকেল করিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ কেশিয়াড়ী, বেলদা, অন্ত্রী, তালবাঁধ, আমদা, কাঁড়ারোল ও সিঞ্চাফুল হইতে আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাঁচের বাসন-পেয়ালা, বই-ছবি, তৈয়ারী জামা-কাপড় প্রভৃতি নানা রকম জিনিসের ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয় ও কীর্তন-গানের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই কীর্তনগানের দল আছে তবে কোন কোন বৎসর সিঞ্চাফুল গ্রাম হইতে কীর্তন-গানের দল আসে।

শিবপূজার মেলা

ভেলামপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। গ্রামবাসীদের আনন্দবর্ধনের জন্যই বহুকাল আগে মেলাটি প্রবর্তিত হয় বলিয়া জানা যায়।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী হরিপুরা, করঞ্জীমুড়া, লালপুর, সিঙ্গুর, প্রতাপপুর, বাবুইগেড়্যা, পলাশিয়া, হাড়োপুর, রসিকপুর, দাড়রা, জ্যোতিকৃষ্ণপুর, ভসরা, নছিপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে প্রায় ছয়-সাতশত নরনারী গরুর গাড়ী করিয়া ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলার বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রাম হইতে আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, মাটির খেলনা ও বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও কবি-গানের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় ছয়-সাতশত দর্শকের সমাগম হয়। মেলায় অনেকে জুয়া খেলিয়া থাকেন।

থানা : কাঁথি

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : পশ্চিম সরপাই। ৪৬।২৩৩'৪২।৯৭।৪০৮

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য ও নমঃশূদ্র। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড এবং মোটরষ্ট্যাণ্ড কালিনগর।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষ মাসে গঙ্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী উৎসব এবং চৈত্র মাসে শীতলাপূজা ছাড়া প্রায় প্রতি ঘরে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় অর্ধ শতাব্দীকালের প্রাচীন।

(ঙ) গঙ্গাপূজার মেলা। পৌষ মাসে একদিন। মেলাটি গত বিশ বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ও একটি কালীমন্দির আছে। তাহা ছাড়া পঞ্চানন্দ ও মনসা আছে।

শ্রীখগেন্দ্র নাথ ঘোড়ুই, শিক্ষক,
গ্রাম: পশ্চিম সরপাই, মেদিনীপুর।

২। গ্রাম : বলাগেড়্যা। ৭৭।৯৬'০৫।২৭।১২৪

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, কোদমা, করণ, রাজু, তাঁতী, স্বর্ণকার, মাহিষ্য ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কাঁথি রোড হইতে কাঁথি-বেলদা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়। তাহা ছাড়া, উড়িষ্যা কোস্ট ক্যানেল দিয়া নৌকাযোগে গ্রামে যাওয়া যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি মাত্র চার বৎসর হয় আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে কাঁচা গাঁথুনীযুক্ত ইটের দেওয়াল ও খড়ের ছাউনী দেওয়া একটি দুর্গামণ্ডপ ছাড়া একটি শীতলা এবং একটি মঙ্গলচণ্ডী আছে।

শ্রীবেণীমাধব আদক, প্রধান শিক্ষক,
বলাগেড়্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বলাগেড়িয়া, মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম : খোলনাশ্বরী। ১০৩।১৬০'৬৫।৮৮।৫৯৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, করণ ও ধোপা। গ্রামে জানাপাড়া, নায়েকপাড়া, মাইতিপাড়া ও দাসপাড়া নামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড হইতে একটি কাচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের ২৫শে হইতে বৈশাখ মাসের ১০ই তারিখ পর্যন্ত শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা খোলনাশ্বরী, উগ্রসেনগড়, বড়মুশাপুর, জগন্নাথ-পুর ও ব্রজমালপুর গ্রামের অধিবাসীদের দ্বারা পরিচালিত সর্বজনীন উৎসব। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে পনরদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা শিবমন্দির আছে। শিব-মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি প্রাচীন বৃহৎ পুষ্করিণী আছে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাস, প্রধান শিক্ষক,
খোলনাশ্বরী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ধানগা, মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম : রানী চক। ১৮১।৬৫'৯৬।৩৮।১১৪

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, ধোপা, নাপিত ও বেহারা। গ্রামে পূর্বপাড়া, পশ্চিমপাড়া ও দক্ষিণপাড়া নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে নন্দীগ্রামগামী মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ললিতকুমারীর মেলা। প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তিতে একদিন এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে একদিন মেলা বসে। ১২৭২ বঙ্গাব্দে এই অঞ্চলে ভীষণ বন্যা হয় এবং বন্যার জল সরিয়া গেলে একটি দেবীমূর্তি পাওয়া যায়। উহা ললিতকুমারী দেবী নামে খ্যাত হন। ললিতকুমারী

মেলা উপলক্ষে রানী চক, টাকাপুরা, সাতদিয়াড়া, কাননগোচক, সিমূলকুন্ড, বৃন্দাবনচক, আমদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় আড়াই-তিন সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী ও অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিসপত্রের শতাধিক দোকানপাট বসে।

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল ও টালীর ছাউনীযুক্ত এবং দেবীর প্রতিমূর্তিসহ একটি শীতলামন্দির আছে। জনশ্রুতি আছে, মহিষাদলের রানীমাতা জানকীদেবীর নামানুসারে গ্রামের নাম রানী চক হইয়াছে।

শ্রীসৃষ্টিধর জানা, কৃষিজীবী,
গ্রাম: রানী চক, মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম : নামালডিহা (মৌজা : নামাল)।
২৭৮।৩৬৬০।২১।১৮৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, করণ, মাহিষ্য, তাঁতী, কামার, ধোপা, হাড়ী ও কাগমারা। গ্রামে উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, পূর্বপাড়া ও পশ্চিমপাড়া নামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড হইতে পাকা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে শীতলা, চণ্ডী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, জরাপাত্র, রক্তাবতী প্রভৃতি দেবদেবীর একযোগে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার প্রস্তুতি প্রায় মাসাধিককাল পূর্ব হইতে আরম্ভ হয় এবং চৌদ্দদিনব্যাপী যথারীতি পূজার পর প্রতিমাগুলি বিসর্জন দেওয়া হয়। প্রতিমা দর্শনের জন্য অগণিত নরনারী প্রত্যহ উৎসব প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হন।

(ঙ) গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে মেলা। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা 'নামালডিহার বাজার মেলা' নামে খ্যাত। ফাল্গুন মাসে পনরদিনব্যাপী। মেলাটি গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ বসিতেছে।

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি দেবালয় ছাড়া শীতলা ও রাইঠাকুরানী আছে।

শ্রীঅমূল্য কুমার শীট, প্রধান শিক্ষক,
কলাগাছিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নামালডিহা, মেদিনীপুর।
ও
শ্রীগয়াপ্রসাদ জানা, কৃষিজীবী,
নামালডিহা (রায় বাড়ী),
পোঃ নামালডিহা, মেদিনীপুর।

৬। গ্রাম : হরিপুর (দ্বিতীয় খণ্ড)।
২৯০।২৬৪৪৮।৪৯।৩০৪

(ক) মাহিষ্য, রাজু ও তাঁতী। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কাঁথি রোড রেলস্টেশনে নামিয়া কাঁচা রাস্তায় দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ মাসে বাসুলী দেবীর পূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন এবং সর্বজনীন।

(ঙ) চড়কপূজার মেলা। চৈত্র মাসে দশদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা শিবমন্দির এবং একটি বাসুলী-মন্দির আছে।

শ্রীগঙ্গানারায়ণ করণ, শিক্ষক,
হরিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৭। গ্রাম : মারিশদা।
৩৯৩।১,২৬৮৫১।৫০৮।২,৫৬৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, দলুই, হাড়ী, করণ, ধোপা, নাপিত, স্বর্ণকার ও মুসলমান। গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কাঁথি রোড রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, কার্তিক মাসের অমাবস্যায় কালীপূজা ও পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উৎসব, মাঘ মাসে গোষ্ঠপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয়-শত নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির মাত্র পনর-কুড়িটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রা ও থিয়েটার অনুষ্ঠানের

ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে সহস্রাধিক দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

(চ) গ্রামে একটি রাধাকৃষ্ণমন্দির, একটি দোলমঞ্চ এবং একটি শীতলামন্দির আছে।

শ্রীসুন্দরনারায়ণ পাত্র, প্রধান শিক্ষক,
মারিশদা সেন্ট্রাল প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৮। গ্রাম : নাচিন্দা। ৪১১।৪৯৯'৩২।২৫৮।১,৪০৩

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, হাড়ী, ধোপা, নাপিত, কদমা, তিলি, তাঁতী ও মুসলমান। গ্রামে মাইতিপাড়া, উত্তরপাড়া, পুর্বপাড়া, খানসামাচকপাড়া, জানাপাড়া, বেরাপাড়া, হাড়ীপাড়া ও মধ্যপাড়া নামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড। কাঁথি-তমলুক পাকা-রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে রাধাকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় তিন সপ্তাহব্যাপী চলে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে চন্দনলিপ্ত করিয়া স্থানীয় একটি পুষ্করিণীতে সারাদিন নৌকাবিহার এবং সন্ধ্যাকালে রাধাকৃষ্ণমন্দির সংলগ্ন শীতলামন্দির প্রাঙ্গণে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের প্রাচীন। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের বারোয়ারীতলায় নানারূপ মাটির পুতুল সাজাইয়া প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

(ঙ) চন্দনযাত্রার মেলা। বৈশাখ মাসে তিন সপ্তাহ-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি রাধাকৃষ্ণমন্দিরে পিতল নির্মিত প্রায় দশ ইঞ্চি উচ্চ রাধিকা মূর্তি এবং প্রায় পনর ইঞ্চি উচ্চ কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি পার্শ্ববর্তী ব্রাহ্মণচক গ্রামের অপুত্রক মুচিরাম মান্না মহাশয়ের গৃহে পূজা হইত। তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত যুগল বিগ্রহ এই গ্রামে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া যথারীতি পূজার ব্যবস্থা করা হয়। নিত্য সেবা-পূজার জন্য দেবোত্তর প্রায় দশ কাঠা জমি আছে।

রাধাকৃষ্ণমন্দিরের নিকট একটি শীতলামন্দিরে শীতলা, চণ্ডী, কালী ও রক্তাবতী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শতাধিক বৎসর পূর্বে নাচিন্দা নিবাসী বাপু সিং নামে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া স্থানীয় একটি পুষ্করিণী হইতে শীতলা মূর্তি প্রাপ্ত হন এবং দেবীর নিত্য পূজাদির ব্যবস্থা করেন। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে স্থানীয় জমিদার শ্রীদুর্গাপদ বেরা মহাশয় বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়া দেন। দেবীর নিত্য সেবা-পূজার জন্য নিকটবর্তী মুগবেড়্যা গ্রামের শ্রীমতি কামিনীকুমারী নন্দী চার বিঘা জমি দান করেন। ইহা ভিন্ন, আশপাশের গ্রামের অধিবাসীরা শীতলাপূজার জন্য নিয়মিত চাল-ডাল ইত্যাদি দান করিয়া থাকেন। বৈশাখ মাসে রাধাকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা উৎসবকালে শীতলা-মন্দিরেও ধুমধামের সহিত পূজা হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ পড়্যা, শিক্ষক,
নাচিন্দা জীবনকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয়,
পোঃ নাচিন্দা বাজার, মেদিনীপুর।

৯। গ্রাম : বেন্যাঝি। ৪১৩।৫২৯'৩১।১৫৯।৮৮২

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, রাজু, রজক, বাগ্দী, নাপিত ও চামার। গ্রামে উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া ও মাঝেরপাড়া নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড হইতে কাঁথি-কালিনগর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির, একটি শীতলামন্দির এবং রাইঠাকুরানীর মূর্তিসহ একটি মন্দির আছে।

শ্রীঅমূল্য কুমার শাউ, প্রধান শিক্ষক,
কলাগাছিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : বাসুদেববেড়্যা, পোঃ নামালডিহা,
মেদিনীপুর।

১০। গ্রাম : কানাইদিঘি।
৪১৬।২,১০৯'৯৭।৬৪৫।৩,৩৯৯

(ক) মাহিষ্য, তাঁতী, কলু, জেলে ও বাগ্দী। গ্রামে

পশ্চিমপাড়া, মাঝেরপাড়া, উত্তরপাড়া ও দক্ষিণপাড়া নামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কাঁথি রোড রেলস্টেশন হইতে কাঁথি-কালিনগর রুটের মোটরবাসযোগে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। গ্রামটি রসুলপুর নদীর তীরবর্তী বলিয়া নৌকাযোগেও গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষ মাসে গঙ্গা দেবী ও চণ্ডী দেবীর একযোগে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) গঙ্গাপূজার মেলা। পৌষ মাসে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে এবং স্থানীয় অঞ্চলে ইহা 'মধু মেলা' নামে খ্যাত।

(চ) গ্রামে একটি শীতলামন্দির আছে।

শ্রীঅমূল্য কুমার শীট, প্রধান শিক্ষক,
কলাগাছিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : বাসুদেববেড়্যা, পোঃ নামালডিহা,
মেদিনীপুর।

১১। গ্রাম : বাসুদেববেড়্যা।

৪২৮।১,২০৫·৬০।৩৩৮।১,৪৭২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, করণ, মাহিষ্য, কোদমা, ধোপা, কামার, তাঁতী, রাজু, ছুতার ও কাগমারা।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কাঁথি রোড রেলস্টেশন হইতে কাঁথি-কালিনগর অথবা নাচিন্দা-কালিনগর রুটের মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ব্যতীত শীতলা, কালী, রাইঠাকুরানী এবং রঘুনাথজীউ আছে।

শ্রীঅমূল্য কুমার শীট, প্রধান শিক্ষক,
কলাগাছিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : বাসুদেববেড়্যা, পোঃ নামালডিহা,
মেদিনীপুর।

১২। গ্রাম : বাড়চুণপাড়া।

৪৩৩।২৯৩·২৬।১০০।৬৩৪

(ক) কায়স্থ, মাহিষ্য, তাঁতী ও করণ। গ্রামে উত্তরপাড়া, পশ্চিমপাড়া ও দক্ষিণপাড়া নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কাঁথি রোড রেলস্টেশন হইতে কাঁথি-কালিনগর রুটের মোটরবাসে গ্রামের যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং তৎসহ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্মৃতি স্মরণ উৎসব পালিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং মাত্র পাঁচ বৎসর যাবৎ অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(ঙ) সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে সপ্তাহকাল-ব্যাপী। মেলাটি গত পাঁচ বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) পূজা-পার্বণের জন্য গ্রামে সাধারণের একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীঅমূল্য কুমার শীট, প্রধান শিক্ষক,
কলাগাছিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : বাসুদেববেড়্যা, পোঃ নামালডিহা,
মেদিনীপুর।

১৩। গ্রাম : বাহিরী।

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, করণ, মাহিষ্য, তাঁতী, তেলী, কামিলা, মালাকার, ধোপা, নাপিত, হাড়ী, কোড়া ও মুসলমান। গ্রামে মুসলমানপাড়া, দাসপাড়া, ভুঁইয়া-পাড়া, জানাপাড়া, তাঁতীপাড়া, তেলীপাড়া, কামিলাপাড়া, মাইতিপাড়া, ওঝাপাড়া, কয়ালপাড়া, করণপাড়া, বৈষ্ণব-পাড়া, মান্নাপাড়া, বারিকপাড়া, মালাকারপাড়া প্রভৃতি নামে প্রায় একুশ-বাইশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) কাঁথি রোড রেলস্টেশন হইতে কাঁথি-কালিনগর রুটের মোটরবাসে মারিশদা নামিয়া সেখান হইতে কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে চন্দনযাত্রা উৎসব, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব, শ্রাবণ মাসে ঝুলনযাত্রা উৎসব, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব, পৌষসংক্রান্তিতে পুণ্যস্নান, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব

এবং চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলির মধ্যে বাসন্তীপূজা ছাড়া অন্যান্য সবগুলি উৎসবই আনুমানিক ১৫০৬ শকাব্দ হইতে চলিয়া আসিতেছে।

(ঙ) চন্দনযাত্রার মেলা। বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে একদিন।

রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে নয়দিনব্যাপী।

ঝুলনযাত্রার মেলা। শ্রাবণ মাসে পাঁচদিনব্যাপী।

রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে বারদিনব্যাপী।

মকরস্নানের মেলা। পৌষ মাসে একদিন।

কৃষিপ্রদর্শনী মেলা। মাঘ মাসে বারদিনব্যাপী।

দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে বারদিনব্যাপী।

বাসন্তীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে পাঁচদিনব্যাপী।

বাসন্তীপূজার মেলাটি ভিন্ন অন্যান্য মেলাগুলি আনুমানিক ১৫০৬ শকাব্দ হইতে চলিয়া আসিতেছে।

(চ) কাঁথি শহর হইতে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরদিকে ৬নং ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বাহিরী গ্রাম। পাইকবাড়, দেউলবাড় ও ডিহি বাহিরী এই তিনখানি গ্রাম লইয়া বাহিরী গ্রাম। বাহিরী গ্রামের নানাস্থানে নানা প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন ছড়াইয়া আছে এবং গ্রামটিকে ঘিরিয়া নানা জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এই গ্রামের চারিপার্শ্বে 'গড়ক্ষ' নামে পরিচিত প্রায় চার মাইল দীর্ঘ ও একশত গজ প্রস্থ বিশিষ্ট স্থান সুউচ্চ প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত। ইহার চারিকোণে সাপটিকরা, ধনটিকরী, পালটিকরী ও গোধনটিকরী নামে চারটি পর্বত প্রমাণ মৃত্তিকাস্তূপ আছে। এই স্থানে মহাভারতোক্ত মৎস্যদেশাধিপতি বিরাট রাজার গোগৃহ ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। অনেকের ধারণা অতীতকালে এই স্থানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং সেই কারণেই বৌদ্ধ বিহার হইতে স্থানটির নাম 'বাহিরী' হইয়াছে! এই গ্রামে এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে পুষ্করিণী খননকালে অনেকগুলি বৌদ্ধযুগের প্রস্তর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি প্রাচীন জীর্ণ মন্দিরে নিম্নলিখিত তিনখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে—

(১) "কালীদাস কুলে বিভীষণ ইতি শ্রীপদ্মনাভাত্মজ।
শ্রীমানা বিরভিদ চিকর দশৌ প্রাসাদ মুচ্চৈরিয়ম্॥
গোপাল প্রতিমাংচ সন্তি প্রতিষ্ঠাং দ্বিজৌ।
রামংচেহ সুভদ্রয়াং সহ জগন্নাথ স্ত্যধাসিদপি॥

(২) পৌত্র শ্রীধরণীধর স্বতো ভগবতঃ সুস্থদ্বিজন্মগ্রনী।
শ্রীমাঞ্জন মিশ্র ইত্যাভিহিতস্যাচার্য্য চূড়ামণে॥
পুত্রশ্চক্রধর কবীন্দ্র ইতি যস্যাসীৎ প্রতিষ্ঠা বিধিম্।
প্রাসাদস্য বিভীষণস্য বিধিনাকৃত্বা বিরামংগতঃ॥

(৩) শকাব্দে রস শূণ্যবাণ ধরণী মানে তৃতীয়া তিথৌ।
বৈশাখে বুধ বাসরে মুনিমিতে পক্ষে যুগাদৌসিতে॥
শ্রীযুক্তায় গদাধরায় গুরবে তদ্দেবতাংনাংমুদে।
দত্তং গ্রাম বরোচিতং প্রতিদিনং তদ্দেউল
বাড়াখ্যাকম্॥

উক্ত শিলালিপিগুলি হইতে জানা যায় যে, বিভীষণ মহাপাত্র নামে এক ব্যক্তি উক্ত মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে তিন ফুট উচ্চ দারুময় জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন মূর্তি ও প্রস্তর নির্মিত বাসুদেব মূর্তি এবং দেড় ফুট উচ্চ গোপাল, শ্যামচাঁদ, গোকুলচাঁদের প্রস্তর মূর্তি এবং মহালক্ষ্মীর দেড় ফুট উচ্চ পিতল মূর্তি প্রভৃতি দেবদেবীর বিগ্রহ ছাড়া দ্বাদশটি শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৫০৬ শকাব্দে ৭ই বৈশাখ, বুধবার গদাধর নন্দ নামক এক গুরুর হস্তে উক্ত মন্দিরের ভার অর্পণ করিয়া দেবদেবীর সেবা-পূজা নির্বাহের জন্য দেউলবাড় গ্রামখানি দান করেন। কালক্রমে মন্দিরটি জীর্ণ হইয়া পড়ায় তাঁহার বংশধরগণ সংস্কার কার্যে অসমর্থ হইয়া অদূরে একটি ক্ষুদ্রাকারের মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে উক্ত দেবদেবীর বিগ্রহগুলি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া যথাবিধি পূজা-অর্চনাদি করিয়া আসিতেছেন।

ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন কালে উক্ত মন্দিরের নিকটবর্তী বন-জঙ্গল হইতে প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ একটি প্রস্তর মূর্তি ও দুইটি কামান আবিষ্কৃত হয় এবং উহা কিছুকাল কাঁথি ফৌজদারী আদালতের সম্মুখে রক্ষিত ছিল। বর্তমানে উক্ত মূর্তিটি "কলিকাতা আশুতোষ মিউজিয়ামে" সংরক্ষিত হইয়াছে। উল্লিখিত মূর্তিটি পালযুগের ভাস্কর্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলিয়া অনুমান করা হয়।

বাহিরী গ্রামে পূর্বে পাঁচ-ছয়টি মঠ ছিল; বর্তমানে 'বড়মঠ' ও 'ছোটমঠ' নামে দুইটি মঠ ছাড়া সবগুলিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে গিয়াছে। বড় মঠে আড়াই ফুট হইতে দেড় ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এবং সীতাদেবীর শ্বেত প্রস্তরের মূর্তি, অষ্টধাতু

নির্মিত সওয়া ফুট উচ্চ রাধা মূর্তি, পাথর নির্মিত দেড় ফুট উচ্চ গোবিন্দ মূর্তি, অষ্টধাতু নির্মিত দেড় ফুট উচ্চ লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্তি, তামার নির্মিত প্রায় এক ফুট উচ্চ চৌদ্দটি বালাজী মূর্তি স্থাপিত আছে। তাহা ছাড়া, রাধা-গোবিন্দজীউ চারটি, রামলীলাজীউ দুইটি, গোপালজীউ দুইটি, লক্ষ্মীনারায়ণ দুইটি, দধিবামন দুইটি, রঘুনাথ দুইটি ও বামন.নৃসিংহ, রাজরাজেশ্বর, বরাহ, দামোদর, লক্ষ্মী-জনার্দ্দন, বানেশ্বর প্রভৃতি দেবদেবীর একটি করিয়া মূর্তি, হনুমান-জীউয়ের দশটি মূর্তি, গরুড়ের তিনটি পিতল মূর্তি এবং শ্বেত প্রস্তর নির্মিত তিন ফুট উচ্চ একটি হনুমানজীউ মূর্তি আছে। উল্লিখিত দেবদেবীর মূর্তিগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যা-লঙ্কার দ্বারা সজ্জিত। ইহা ছাড়া, উক্ত মঠে অজ্ঞাতনামা বহু শিলাময় মূর্তি স্থাপিত আছে।

ছোট মঠে অষ্টধাতু নির্মিত প্রায় ১৯ ইঞ্চি উচ্চ রাধাগোবিন্দজীউ, ১৫ ইঞ্চি উচ্চ গোপালজীউ, ৭।৮ ইঞ্চি উচ্চ শ্রীরঙ্গজীউ, চতুর্ভুজাজীউ, অনন্তজীউ মূর্তি এবং ৫।৬ ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট নানা দেবদেবীর প্রায় শতাধিক মূর্তি ব্যতীত ৩৫টি শালগ্রাম শিলা আছে।

শীতলাদেবীর মন্দিরে তিন ফুট উচ্চ শীতলা, চণ্ডী ও কালীর ধাতুময়ী মূর্তি ও তামার ঘট প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহা ছাড়া, দাসপাড়ায় লক্ষ্মীনারায়ণ ও কালুরায়মন্দির, ভুঁইয়াপাড়ায় কালীমন্দির, গিরিপাড়ায় চণ্ডীমন্দির, প্রধান-পাড়ায় কালুরায়, জানাপাড়ায় বাসুলী ও মঙ্গলা দেবীর মন্দির আছে। গ্রামের মধ্যপাড়ায় শঙ্করনাথের আস্তানা আছে। জগন্নাথমন্দির, শীতলামন্দির, শিবমন্দির ও রাসমঞ্চটি ইষ্টক নির্মিত।

গ্রামের উত্তর সীমায় একটি বৃহৎকায় প্রাচীন তেঁতুলবৃক্ষ আছে। উহা 'জাহাজ বাঁধা তেঁতুলগাছ' নামে পরিচিত। বৃক্ষটির বেড় প্রায় পনর হাত এবং উহার গায়ে শিকল বাঁধার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, অতীতে এক সময় এই স্থানে একটি নদী প্রবাহিত ছিল এবং নদীতে যাতায়াতকারী নৌকা ও জাহাজগুলি সম্ভবতঃ এই স্থানে নোঙর করিয়া উক্ত বৃক্ষটির সহিত বাঁধিয়া রাখা হইত। বর্তমানে নদীটি মজিয়া উর্বর জমিতে পরিণত হইয়া 'রসনালা' নামে পরিচিত হইয়াছে।

গ্রামে 'ভীমসাগর', 'হেমসাগর', 'চাঁদকোণা' ও 'কালীদহ' নামে চারটি বৃহৎ পুষ্করিণীর মধ্যে 'কালীদহ' বর্তমানে ভরাট হইয়া গিয়াছে। হিজলীর মসনদ্-ই-আলা বংশীয়গণের মন্ত্রী ভীমসেন মহাপাত্র বিভীষণ মহাপাত্র বংশীয় ছিলেন। উল্লিখিত ভীমসাগর পুষ্করিণীটি ভীমসেন খনন করাইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, গ্রামের মধ্যে পুষ্করিণী খননকালে মৃত্তিকাগর্ভ হইতে প্রাচীন কারুশিল্পের নানা-প্রকার জিনিসপত্র পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে, বাহিরী গ্রামটি বহুকালের প্রাচীন এবং বিশেষ সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ পট্টনায়ক, প্রধান শিক্ষক,
দেউলবাড় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : পাইকবাড়, পোঃ দেউলবাড়,
মেদিনীপুর।

[কাঁথি শহর ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য কয়েকটি গ্রামে পূজা-পার্বণ সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

মেদিনীপুর জেলার অন্যতম মহকুমা শহর কাঁথিতে কলেজ, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, একটি সার্ভে স্কুল, একটি গুরু ট্রেনিং স্কুল, ব্রাহ্মসমাজ, হরিসভা ও রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম আছে। কাঁথি একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখান হইতে সমুদ্র মাত্র ৫ মাইল দূর। সমুদ্রতীরে দীঘা ও জনপুটে অনেকে সমুদ্র দর্শন ও হাওয়া পরিবর্তনের জন্য আসিয়া থাকেন। পৌষসংক্রান্তিতে সমুদ্রস্নানের জন্য জনপুটে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হয়।

সমুদ্রতীরবর্তী বীরকূল ও চাঁদপুর গ্রামও বেশ স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর। ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে দার্জিলিং, সিমলা, প্রভৃতি পার্বত্য নিবাস যখন অজ্ঞাত ছিল, তখন অনেক বিশিষ্ট রাজপুরুষ এই সকল স্থানে আসিয়া বিশ্রাম উপভোগ করিতেন বলিয়া জানা যায়। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের গ্রীষ্মাবাস ছিল বীরকূল। তথনকার সরকারী কাগজপত্রে বীরকূলের বহু উল্লেখ আছে।

কাঁথি শহর একটি বালিয়াড়ী বা উচ্চ বালুকা স্তূপের

উপর অবস্থিত। এই বালিয়াড়ীটি পূর্বে রসুলপুরে নদীর মোহনা হইতে পশ্চিমে সুবর্ণরেখার মুখ পর্যন্ত প্রায় ২৬ মাইল দীর্ঘ। ইহার বিস্তৃতি স্থানভেদে এক মাইল হইতে আধ মাইলের মধ্যে। কাহারও কাহারও মতে বালিয়াড়া বা বালির কাঁথ হইতে এই স্থানের নাম কাঁথি হইয়াছে। কাঁথি শহর হইতে ৯ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ফুলবাড়ী গ্রাম পরলোকগত জননায়ক দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয়ের জন্মস্থান।

কাঁথি শহরের নিকটবর্তী অন্যান্য কয়েকটি গ্রামে নিম্নলিখিত উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়।

শহরের অন্তর্বর্তী গড়াকিশোর নগরে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে কিশোরনগর রাজবাড়ীর দুর্গাপূজা উপলক্ষে চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলায় প্রায় চার-পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

কাঁথি শহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে দুরমুট গ্রামে একটি ছোট মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে চন্দনযাত্রা উপলক্ষে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহদ্বয় নৌকায় স্থাপন করিয়া নিকটবর্তী একটি পুষ্করিণীতে নৌকাবিহার উৎসব পালন করা হয় এবং পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতিকালের এবং ইহাতে প্রায় দেড় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় নাগরদোলা ও পুতুলনাচের দল আসে এবং আতশবাজি পোড়ান হয়।

দারুয়া গ্রামে প্রতি বৎসর মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উপলক্ষে একটি বৃহৎ মেলা বসে। মেলাটি মাত্র একদিন স্থায়ী হইলেও প্রায় দশ হইতে পনর হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং বিবিধ জিনিসপত্রের প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে। কাঁথি থানার বিভিন্ন স্থান হইতে শোভাযাত্রাসহকারে মহরমের তাজিয়া আসিয়া এই স্থানে উপস্থিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন। ইহা ভিন্ন, প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষেও এই স্থানে একটি মেলা বসে।

বাসন্তীয়া গ্রামে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা উপলক্ষে চারদিনব্যাপী একটি বৃহৎ মেলা বসে। স্থানীয় রানীপুকুর নামে একটি পুষ্করিণীতে বিজয়াদশমীর দিন আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দুর্গাপ্রতিমা আনিয়া বিসর্জন দেওয়া হয় এবং প্রতিমা বিসর্জন প্রত্যক্ষ করিতে মেলায় প্রায় বিশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় ম্যাজিক ও নাগরদোলার দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয় ও আতশ-বাজি পোড়ান হয়। মেলাটি প্রাচীন।

দরিয়াপুর গ্রামে সমুদ্রের তীরে একটি প্রাচীন শিব-মন্দিরে চৈত্র মাসে গাজন উৎসব এবং বারদিনব্যাপী সাহিত্য-বাসর ও একটি মেলা বসে। ইহা 'ঋষি বঙ্কিম মেলা' নামে পরিচিত। কথিত আছে, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কপাল কুণ্ডলা উপন্যাসের পরিকল্পনা ক্ষেত্র হিসাবে এই দরিয়াপুর গ্রামটি নির্দিষ্ট করেন। মেলাটি প্রাচীন এবং প্রতিদিন প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। বর্তমানে উৎসবটি আড়ম্বরহীন হইয়া পড়িয়াছে।

কাঁথি হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে জনপুটে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাজার নরনারী সমুদ্রে পুণ্যস্নান করিয়া থাকেন এবং তদুপলক্ষে এই স্থানে একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং মেলায় প্রায় চারশত দোকানপাট বসে। পূর্বে এই মেলায় আরও অনেক বেশী লোক সমাগম হইত। সম্প্রতি দশ-বার বৎসর হইল দীঘায় পৌষসংক্রান্তির স্নান পর্ব শুরু হওয়ায় জনপুটে লোক সমাগম কম হইতেছে। ইহা ভিন্ন, মাঘী পূর্ণিমা তিথিতেও জনপুট সমুদ্রে বহু নরনারী পুণ্যস্নান করিয়া থাকেন এবং একটি মেলা বসে।

বাহিরীর নিকটবর্তী আউরাই গ্রামে একটি বিখ্যাত প্রাচীন কালীমন্দির আছে। প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে ধূমধামের সহিত কালীপূজা হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে বারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলায় প্রায় দেড় হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

কাঁথি হইতে মোটরবাসে প্রায় ৫ মাইল দূরে রাউতারা নামিয়া সেখান হইতে এক মাইল হাঁটিয়া কাণ্টাই গ্রামে পৌছান যায়। কাণ্টাই গ্রামে প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসরের প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের দুইটি মঠ আছে। উহার একটি 'বড় মঠ' এবং অপরটি 'ছোট মঠ' নামে পরিচিত। এই উভয় মঠে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং মঠের গ্রন্থাগারে বহু দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব গ্রন্থাদি রক্ষিত আছে। উক্ত বিগ্রহাদির নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর রাস-

পূর্ণিমার উৎসব উপলক্ষে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ মঠ হইতে বাহিরে আনিয়া রাসমঞ্চে স্থাপন করিয়া চারদিনব্যাপী ধুমধামের সহিত রাস উৎসব পালন করা হয়। উৎসবে সহস্রাধিক নরনারীর সমাগম হয়।

মেলা বিবরণী

গঙ্গাপূজার মেলা

পশ্চিম সরপাই গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে গঙ্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বাগদা নদীর তট-ভূমিতে প্রায় দশ বিঘা পরিমাণ জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ বসিতেছে।

ভগবানপুর ও কাঁথি থানার কয়েকটি গ্রাম হইতে প্রায় সাত-আটশত নরনারী নৌকায়, ঘোড়ায় এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

প্রধানতঃ দামুয়া, পাউশী, বিজনগর, পশ্চিম সরপাই, চিমলর্যা প্রভৃতি গ্রাম হইতে মেলায় বিক্রেতারা আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, কাপড়চোপড়, দা-বঁটি, ধামাকুলা প্রভৃতি বিবিধ জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রধানতঃ অনলবেড়িয়া ও ঠাকুরনগর গ্রাম হইতে আমদানী হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিকের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয় ও হা-ডু-ডু খেলার প্রতিযোগিতা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় ছয়-সাতশত দর্শক ও শ্রোতার সমাবেশ ঘটে।

দুর্গাপূজার মেলা

বলাগেড়্যা গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপের নিকটবর্তী স্থানে ও গ্রামের স্কুল প্রাঙ্গণে চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র চার বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

স্থানীয় গ্রামাঞ্চল ছাড়া পার্শ্ববর্তী বড় রসুলপুর, ওলুয়া, পঁচিশ বেটিয়া, ছোট রসুলপুর, ভবানীচক, খলসীবেড়িয়া, বামুনিয়া, বামুয়াড়ি, হাতীয়াড়ি, মুড়িসাই প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক নরনারী মেলায় আসেন। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, কাঁচের পেয়ালা-বাসন, লোহার হাতা-বেড়ী, কবিরাজী ঔষধপত্র, বই-ছবি, তাঁতের কাপড় ও পোষাক-পরিচ্ছদ, মাটির হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় যুবকেরা অভিনয় করিয়া থাকেন।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

খোলনেশ্বরা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে প্রায় দুই বিঘা দেবোত্তর জমির উপর পনরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

পার্শ্ববর্তী বাদলপুর, সাতমাইল, ধানঘরা প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রত্যহ প্রায় পাঁচশত নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং শতাধিক দোকানপাট বসে। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র ছাড়া অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিসের আমদানী হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং কোন কোন বৎসর গ্রামের যুবক সম্প্রদায় কর্তৃক যাত্রাভিনয় করা হয়।

হরিপুর (২য় খণ্ড) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়কপূজা উপলক্ষে শিবমন্দির ও বাসুলীমন্দিরের মধ্যস্থলে প্রায় এক বিঘা জমিতে দশদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। সাধারণতঃ বিকালের দিকেই মেলায় লোকসমাগম হয়। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী পোতাপুখুরিয়া ও মুণ্ডবলিয়া গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয়

এবং মিষ্টান্ন ও মনিহারী, খেলনা-পুতুল প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কীর্তনগানের আসর বসে এবং যাত্রাভিনয় হয়।

চন্দনযাত্রার মেলা

নাচিন্দা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে চন্দনযাত্রা উৎসব উপলক্ষে রাধাকৃষ্ণমন্দির ও শীতলামন্দির সংলগ্ন জমিতে এবং জেলা বোর্ডের রাস্তার উভয় পার্শ্বে প্রায় তিন সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারী মোটর গাড়ী, সাইকেল, গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলার বিক্রেতাগণ আশপাশের বিভিন্ন স্থান হইতে আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, জামা-কাপড়, বই-ছবি ঔষধপত্র, লাঙ্গল-ফাল, ধামাকুলা, মাটির পুতুল, হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি নানাপ্রকার জিনিসপত্রের শতাধিক দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং লটারী খেলা, হা-ডু-ডু খেলা এবং যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে। তাহা ছাড়া, পেশাদারী যাত্রাদলও আসে। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় তিন সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

পৌষসংক্রান্তির মেলা

কানাইদিঘি গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে পুণ্যস্নান উপলক্ষে রসুলপুর নদীর তীরবর্তী প্রায় চার বিঘা জমির উপর সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহা 'মধু মেলা' নামেই পরিচিত।

রসুলপুরের নিকটবর্তী নদীতে প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তি তিথিতে বহু লোকজন পুণ্যস্নান করিতে আসিতেন। নিকটবর্তী উমাপতিবাড় গ্রামের শ্রীগুণধর মাইতি মহাশয় তদুপলক্ষে এই স্থানে একটি গঙ্গাপূজার প্রচলন করেন এবং ক্রমেই এই উৎসবটিকে কেন্দ্র করিয়া দোকানপাট বসিতে থাকে পরে স্থানীয় কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তি জেলা বোর্ডের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া নিয়মিত একটি মেলার প্রবর্তন করেন। কিন্তু ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে শ্রীমাইতি মহাশয় এই মেলাটিকে নিজের নামানুসারে 'গুণধর মেলা' নামে উল্লেখ করিয়া প্রচার পত্র বিলি করেন। ইহাতে স্থানীয় গ্রামবাসী ক্ষুব্ধ হইয়া উক্ত মেলা প্রাঙ্গণ হইতে কিছু দূরে নদীর তীরে পৌষসংক্রান্তি স্নান উপলক্ষে আর একটি নূতন মেলার প্রচলন করেন। ফলে পূর্বোক্ত 'গুণধর মেলা' বন্ধ হইয়া যায় এবং নূতন মেলাটি ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। এই নূতন মেলা প্রবর্তনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্থানীয় শ্রীমধুসূদন সাউ নামে জনৈক ব্যক্তি। এই কারণে নূতন মেলাটি 'মধু মেলা' নামে খ্যাত হয়।

স্থানীয় গ্রাম ছাড়া পার্শ্ববর্তী কাঁথি থানার অন্তর্গত আমতলিয়া, সুবর্ণনগর, আমরাই, বাহিরী, নামালডিহা, দুপুরা, ঝাউবনী, বাসুদেববেড়া, কলাগাছিয়া, উমাপতিবাড়, চনবেড়া প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় দেড় সহস্রাধিক নরনারী প্রতিদিন মোটর, গরুর গাড়ী করিয়া ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন। বলা বাহুল্য পৌষ-সংক্রান্তির দিন সর্বাপেক্ষা অধিক লোক সমাগম হয়।

মেলার বিক্রেতাগণ মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আসেন। মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, কাঁসা-লোহার থালা-বাটি, মনিহারী, টোটকা ঔষধপত্র, বই-ছবি, তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ, ধুতি-শাড়ী, দা-কোদাল, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি নানাবিধ জিনিসপত্রের শতাধিক দোকানপাট বসে। বাঁশের তৈয়ারী জিনিস ও মাটির হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি দ্রব্য টিকাশী, ইড়িঞ্চী প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আমদানী হয়। মেলার বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও লটারীর দল আসে এবং কীর্তনগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কীর্তনগানের দল প্রধানতঃ নামালডিহা এবং চিনাদাঁড়ী গ্রাম হইতে আসে। এই সকল অনুষ্ঠানে সহস্রাধিক দর্শক ও শ্রোতার সমাবেশ হয়।

রথযাত্রার মেলা

বাহিরী গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে জগন্নাথমন্দির হইতে গুণ্ডিচাবাড়ী পর্যন্ত

সুবিস্তৃত 'রথদাড়' নামে পরিচিত প্রাঙ্গণে নয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাঁচ সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। তাঁহারা মোটর গাড়ী, রিক্সা, সাইকেল, গরুর গাড়ী, পাল্কী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, চিড়েভাজা, তেলে-ভাজা, তামা-পিতলের থালা-বাসন, মনিহারী জিনিসপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, লাঙ্গল-জোয়াল, দা-কুরুল, হাঁড়ি-কুড়ি, খেলনা প্রভৃতি রকমারী জিনিসের প্রায় একশত দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রত্যহ প্রায় এক সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বাহিরী গ্রামে বৈশাখ মাসে চন্দনযাত্রার মেলা, শ্রাবণ মাসে ঝুলনযাত্রার মেলা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রার মেলা, পৌষ মাসে মকর স্নানযাত্রার মেলা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রার মেলা এবং চৈত্র মাসে বাসন্তী-পূজার মেলা এই গ্রামে অনুষ্ঠিত রথযাত্রার মেলার অনুরূপ।

শিবরাত্রির মেলা

বেন্যাঝি গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় এক বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

নিকটবর্তী বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের অগণিত নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয়। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, নানাপ্রকার জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য স্থানীয় যুবকদল যাত্রা-ভিনয় করেন।

বাসুদেববেড়্যা গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

কাঁথি থানার ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামগুলি হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের চারি সহস্রাধিক নরনারী মোটর গাড়ী করিয়া ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং প্রায় আশি-নব্বুইটি দোকানপাট বসে। মিষ্টান্ন, মনিহারী, তেলেভাজা, পিতলের বাসনকোসন, কবিরাজী ঔষধপত্র, কাপড়-জামা প্রভৃতি বিবিধ জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। মেলার বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাগানের ব্যবস্থা করা হয়। যাত্রানুষ্ঠানে প্রায় চারি সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাবেশ হয়।

সরস্বতীপূজার মেলা

বাড়চূণপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে স্থানীয় একটি পুষ্করিণীর পড়ে প্রায় দুই বিঘা জমির উপর সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। এই মেলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। মেলাটি মাত্র পাঁচ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

আশপাশের বাহিরী, আবাসগেড়্যা, মারিশদা, হাড়ি-গেছিয়া, যজ্ঞদাসবাড়, কর্পূরা, আমরাই, জামুয়াশংকরপুর, মৌজদারচক, মুণ্ডপাড়া, মোকামপাড়া, চণ্ডীভেটী, চাট্টাভেড়ী, হিঞ্চি, কাজলা, পারুলিয়া, পাঁচড়িয়া, বেলদা, সরদা, সেরপুর, কাঁথি, মনোহরচক, কামারদা, বাসুদেববেড়্যা ঝাউবনী, কুলঞ্চুরা, উমাপতিবাড়, কানাইদীঘি, জলপাই-কানাইদীঘি, শুনিয়া, কলাগাছিয়া, দনবেড়িয়া, নামালডিহা, নাচিন্দা, দেওয়ানচক, বেন্যাঝি, জনপুট, বিশ্বনাথপুট, রসুলপুর, দারিয়াপুর, হলুদবাড়ী প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রত্যহ সহস্রাধিক নরনারী প্রধানতঃ মোটর গাড়ী ও গরুর গাড়ী করিয়া মেলায় আসেন।

মেলার বিক্রেতাগণও প্রধানতঃ উপরোক্ত স্থানগুলি হইতেই আসেন। মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, কাঁচের তৈয়ারী

জিনিসপত্র, কবিরাজী ঔষধপত্র, বই-ছবি, তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ, ধামা-কুলা, মাটির হাঁড়িকুড়ি-ঢাকনা-মালসা প্রভৃতি জিনিসপত্রের পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, যাত্রাগান এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। তাহা ছাড়া, মেলা স্থানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবন আলেখ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

গ্রাম্য দেবদেবীপূজার মেলা

নামাল মৌজার অন্তর্গত নামালডিহা গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে এক যোগে কয়েকটি গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে গ্রামের বাজারে প্রায় দুই বিঘা জমির উপর পনরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ বসিয়া আসিতেছে।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামাঞ্চল হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রতিদিন গড়ে প্রায় দুই সহস্র নরনারী মোটর গাড়ী করিয়া ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ এই থানার অন্তর্গত গ্রামগুলি হইতে আসেন এবং ময়রা, তেলেভাজা, কাঁচের ও লোহার বাসনপত্র, টোটকা ঔষধপত্র, সস্তার বই-ছবি, ধুতি-শাড়ী, গামছা-লুঙ্গি, দা-কোদাল, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, রবারের জুতা, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও পুতুল ইত্যাদির মোট প্রায় একশত দোকান বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।



থানা ঃ খেজুরী

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ জাহানাবাদ।

১৪।১,৩৪৬·১১।৬০৩।৩,৭০২

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, তাঁতী ও করণ।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গ্রামের পাঁচটি স্থানে শীতলাপূজা এবং পৌষসংক্রান্তি তিথিতে পুণ্যস্নান অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) শীতলাপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন।

পৌষসংক্রান্তির মেলা। পৌষ মাসে একদিন। মেলা দুইটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বুড়ী বাসুলী দেবীর একটি প্রাচীন মন্দির ছাড়া পাঁচটি শীতলামন্দির আছে।

শ্রীঈশ্বর চন্দ্র মণ্ডল, চাকুরী,
গ্রাম ও পোঃ জাহানাবাদ, মেদিনীপুর।

২। গ্রাম ঃ দেখালি। ২০।২,৫৩৪·০০।৬৫৬।৩,২২৩

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ধীবর, কদমা, বাগ্দী, তাঁতী, কলু, ধোপা, ছুতার ও মুসলমান। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, জানাপাড়া, সামন্তপাড়া, গিরিপাড়া, ভূঁইয়াপাড়া, সাউপাড়া, দাসপাড়া, মণ্ডলপাড়া প্রভৃতি নামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে পি, ডব্লিউ, ডি, বাঁধের উপর দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। তাহা ছাড়া, রসুলপুর নদী পথে নৌকাযোগেও যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব, চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা এবং চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন। ইহা সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। ইহা প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। ইহাও প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ইষ্টক নির্মিত একটি বিষ্ণুমন্দির এবং একটি শিবমন্দির ছাড়া তিনটি পঞ্চানন্দ আছে।

শ্রীঅমূল্য রতন মিশ্র, প্রধান শিক্ষক,
দেখালি দেশবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ দেখালি, মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম ঃ সেরখাঁ চক। ২৭।১,৬৫৯·৭৮।৫৪৯।২,৭৭৬

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, তিলি, তাঁতী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বাগ্দী, কুমার, জেলে, নাপিত, ধোপা, কদমা, গোয়ালা ও মুসলমান। গ্রামে উত্তরপাড়া, মাইতিপাড়া, পূর্বপাড়া, করণপাড়া, মুসলমানপাড়া, দক্ষিণপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, পুতিয়াপাড়া প্রভৃতি নামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে মোটরবাস চলাচল করে। বর্ষাকালে নৌকাযোগে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি দেড়শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি দেড়শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে প্রতাপেশ্বর শিবের একটি মন্দির, শীতলামন্দির তিনটি, দুইটি জয়চণ্ডীদেবীর মন্দির, দুইটি রাধাগোবিন্দজীউমন্দির ব্যতীত ওলাবিবিসহ বিভিন্ন গ্রাম্য দেবদেবীর কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। উল্লিখিত প্রতাপেশ্বর শিবমন্দিরটি স্থানীয় অখিল চন্দ্র দাস নামে জনৈক ব্যক্তি নির্মাণ করান।

শোনা যায়, এই স্থানে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সেরখাঁ নামে জনৈক মুসলমান গ্রামটির পত্তন করেন এবং তাঁহারই নামানুসারে গ্রামের নাম হয় সেরখাঁ চক।

শ্রীজগদীশ চন্দ্র পাঁজা, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ সেরখাঁ চক, মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম ঃ পানখাই। ২৮।১,০১৪·৭৮।৩৪৬।২,১১৭

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বাগ্দী, করণ, নাপিত, ছুতার, তিলি ও মুসলমান। গ্রামে উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, পূর্বপাড়া, পশ্চিমপাড়া, মধ্যপাড়া ও মুসলমান-পাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) পাঁশকুড়া রেলস্টেশন হইতে রসুলপুর অথবা নন্দীগ্রাম রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, পৌষ-সংক্রান্তির স্নান, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) পৌষসংক্রান্তির মেলা। পৌষ মাসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে একটি শীতলামন্দির ছাড়া দুইটি মনসা আছে।

বর্তমানে যে স্থানে গ্রামখানি গড়িয়া উঠিয়াছে পূর্বে তাহা হুগলী নদীর গর্ভে বিলীন ছিল। কালক্রমে পলি পড়িয়া চরার উৎপত্তি হয়। স্থানীয় জমিদার তাঁহার কন্যাকে পান খাইবার জন্য স্থানটি বিবাহের যৌতুক স্বরূপ দান করেন বলিয়া গ্রামের নামটি পানখাই হইয়াছে এইরূপ জনশ্রুতি আছে।

শ্রীঈশান চন্দ্র মাইতি, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ পানখাই,
মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম ঃ চৌদ্দচুলী। ৩৩।৯১৯·০৬।২৭২।১,৮৪৭

(ক) মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ধোপা, নাপিত, কুমার, জেলে, তেলী, তাঁতী ও করণ। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কাঁথি রোড রেলস্টেশন হইতে রসুলপুর নদীর ঘাট পর্যন্ত মোটরবাসে আসিয়া লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ডের রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, পৌষ মাসে গোষ্ঠপূজা ও মাঘ মাসে রটন্তী কালীপূজা, রাধাগোবিন্দজীউর পূজা এবং কালুরায়পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, প্রতি বৎসর মাঘ মাসে স্থানীয় বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি নামে জনৈক ধর্মপ্রাণ ও দানশীল ব্যক্তির স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত উৎসবটি ১৩৪২ বঙ্গাব্দ হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে।

(ঙ) বঙ্কিম স্মৃতি মেলা। মাঘ মাসে সপ্তাহকালব্যাপী। ১৩৪২ বঙ্গাব্দ হইতে মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি বৃহৎ পাকা মন্দিরে লক্ষ্মীজনার্দ্দনজীউ, অপর একটি মন্দিরে রাধাগোবিন্দজীউর বিগ্রহ এবং একটি দুর্গামন্দির আছে। মন্দিরগুলি স্থানীয় মাইতি পরিবার কর্তৃক নির্মিত।

প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে এই গ্রামটি গভীর বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। স্থানীয় 'মাইতি' ও 'কর' বংশের কতিপয় পূর্বপুরুষ বাসুদেবপুরের রাজার নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়া বন-জঙ্গল কাটিয়া এই স্থানে প্রথম বসবাস স্থাপন করেন। কালক্রমে দূর-দূরান্তর হইতে বহু লোকজন বিশেষ করিয়া লবণ ব্যবসায়ীগণ লবণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে এই স্থানে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। এই গ্রামে লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য চৌদ্দটি চুলী ছিল বলিয়া গ্রামের নাম চৌদ্দচুলী হইয়াছে। অনেকের নিকট গ্রামটি সাঁওতানচক নামেও পরিচিত।

শ্রীতরেন্দ্র নাথ ভুঞ্যা, প্রধান শিক্ষক,
চৌদ্দচুলী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কাতিকখালী, মেদিনীপুর।

৬। গ্রাম ঃ কুঞ্জপুর। ৩৯।৩৭৪·০৩।১১০।৫৯৩

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, করণ ও ছুতার। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কাঁথি রোড হইতে রসুলপুর নদীর ঘাট পর্যন্ত মোটরবাসে আসিয়া জনকা-ললাট রোড দিয়া হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী।

রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে পাঁচদিনব্যাপী।

দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন।

উল্লিখিত মেলাগুলিতে চার-পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয় এবং মাত্র পনর-কুড়িটি করিয়া দোকানপাট বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

(চ) গ্রামে একটি শীতলামন্দির এবং একটি রাসমঞ্চ আছে।

শ্রীনিমাই চরণ মান্না, শিক্ষক,
গ্রাম : কল্পপুর, পোঃ রামচক,
মেদিনীপুর।

৭। গ্রাম : ফুলবাড়ি। ৬৫।৭৩'২৯।৬৪।৩৪৮

(ক) তিলি ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড হইতে রসুলপুর নদীর ঘাট পর্যন্ত মোটরবাসে আসিয়া হাঁটাপথে গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা, ফাল্গুন মাসে শীতলাপূজা ও দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শীতলাপূজাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) শীতলাপূজার মেলা। ফাল্গুন মাসে পাঁচদিন-ব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। মেলায় আশপাশের গ্রামসমূহ হইতে বহু লোকজন আসেন এবং নানাবিধ জিনিসপত্রের প্রায় একশত দোকানপাট বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য নানারকম প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার আয়োজন করা হয়।

(চ) গ্রামের একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে শীতলাদেবীর প্রতীকস্বরূপ তিনটি প্রস্তর আছে।

শ্রীঅতুল কৃষ্ণ দাস, চাকুরী,
গ্রাম : ফুলবাড়ী, পোঃ জনকা,
মেদিনীপুর।

৮। গ্রাম : জনকা। ৮৫।৪৫৩'৬৮।২৩৫।১,০৭৪

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, বৈরাগী, কামিলা ও মুসলমান। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী কাঁথি রোড রেলস্টেশন হইতে রসুলপুর নদী পর্যন্ত মোটরবাসে আসিয়া জনকা-ললাট রোড দিয়া হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে বাশুলীপূজা, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতী-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলির মধ্যে একমাত্র দুর্গাপূজাটি সর্বজনীন ; অন্যান্য পূজা-পার্বণগুলি ব্যক্তিবিশেষের।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি কালীমন্দির এবং একটি দুর্গামণ্ডপ ছাড়া একটি বাসুলী, একটি মনসা ও একটি জগন্নাথ এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি মসজিদ আছে।

শ্রীপঞ্চানন বারিক, শিক্ষক,
জেলা বোর্ড বিদ্যালয়,
গ্রাম : জনকা, মেদিনীপুর।

৯। গ্রাম : টিকাশী। ১৩৮।২,৩৬৪'৪৮।৮৫০।৪,৯৫৬

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে হেঁড়্যা-এড়াঞ্চ রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়। তাহা ছাড়া, হিজলী টাইটেল ক্যানেলে নৌকাযোগে গ্রামে যাতায়াত করিবার সুবিধা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে বাসুলীপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং শিবরাত্রি উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন।

চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলা দুইটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বিশালাক্ষীমন্দির, শীতলামন্দির এবং একটি শিবমন্দির ছাড়া চারটি পঞ্চানন্দ আছে।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সেন, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ টিকাশী,
মেদিনীপুর।

মেলা বিবরণী

দুর্গাপূজার মেলা

জনকা গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে দুর্গামণ্ডপ সংলগ্ন এবং জনকা-ললাট রোডের উভয় পাশে খোলা জায়গায় চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

আশপাশের গ্রামগুলি হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রত্যহ প্রায় চার সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি নানাবিধ জিনিসপত্রের প্রায় একশত দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা আশপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক ও সার্কাসের দল আসে এবং প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা, জলসা, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

পৌষসংক্রান্তির মেলা

পানখাই গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তির পুণ্যস্নান উপলক্ষে গ্রামের সীমান্তবর্তী হুগলী নদীর তীরে একটি মেলা বসে। মেলাটির সূচনা সম্পর্কে জানা যায় যে, পূর্বে বহু তীর্থযাত্রী এই স্থানে হুগলী নদীর ফেরিঘাট পার হইয়া গঙ্গাসাগরে মকর স্নানে যাইতেন। তদুপলক্ষে বহু লোক-সমাগম হইত ও একটি মেলা বসিত। বর্তমানে হুগলী নদী গতি পরিবর্তন করায় এবং অপরাপর যানবাহনের সুবিধা হওয়ায় গঙ্গাসাগর যাত্রীদের ভীড় কম হইলেও অদ্যাপি মেলাটি বসিতেছে। ইহা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন মেলা।

খেজুরী থানার ৫নং, ৬নং, ৮নং ও ৯নং ইউনিয়ন এবং নন্দীগ্রাম থানার ১৫নং ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহ হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনপত্র, ঔষধপত্র, সস্তার বই-ছবি, কাপড়চোপড়, দা-কুড়ুল-কোদাল, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলা-চ্যাঙ্গারী, হাঁড়ি-কলসী প্রভৃতি জিনিসপত্র মেলায় আমদানী হইয়া থাকে। খেজুরী থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র মেলায় অধিক আমদানী ও কেনা-বেচা হয়। আমোদ-প্রমোদের জন্য চারণগান ও কথকতার ব্যবস্থা করা হয়।

বঙ্কিম-স্মৃতি মেলা

কাঁথি মহকুমার খেজুরী থানার অন্তর্গত চৌদ্দচূলী গ্রামে ১২৯৮ বঙ্গাব্দে ২২শে মাঘ রবিবার বঙ্কিম বিহারী মাইতি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় আনন্দলাল মাইতি এবং মাতার নাম ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী। ইঁহাদের পূর্বপুরুষগণ মেদিনীপুরের সন্নিকটে কোন একটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁহাদের অনেকে নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। ৺বঙ্কিম বিহারী মাইতি মহাশয়ের পিতা এই গ্রামে আসিয়া বসতবাটী নির্মাণ করতঃ বসবাস করিতে থাকেন। বঙ্কিমবাবু পরহিতব্রতী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে পাথরপ্রতিমা লাটে শিবরাত্রি উপলক্ষে অদ্যাপি একটি মেলা বসিতেছে। ঐ মেলায় তিন-চারদিনব্যাপী বহু লোক-সমাগম হয়। হেঁড়িয়ার শীতলামন্দিরে বাৎসরিক পূজার ব্যয়ভার তিনিই বহন করিতেন। বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী স্বামীর স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে চৌদ্দচূলী গ্রামে ১৩৪১ বঙ্গাব্দ হইতে এই মেলার প্রবর্তন করেন। বর্তমানে মাইতি পরিবারের জমির উপর সপ্তাহকালব্যাপী এই মেলা বসিতেছে।

এই মেলায় খেজুরী, কাঁথি, নন্দীগ্রাম প্রভৃতি থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় তিন সহস্র নরনারী গরুর গাড়ী, নৌকা ও রিক্সা করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ আশপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে আসেন। মেলায় প্রায় একশত দোকানপাট বসে। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, কাঁচের প্লেট-গ্লাস, বই-ছবি, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, মাদুর, ধামা-কুলা, ঝুড়ি-চুপড়ি, তালপাতার পাখা-আসন প্রভৃতি জিনিসপত্রের দোকানপাট ছাড়া সোডা, লেমনেড, সরবৎ, পান-বিড়ি প্রভৃতির দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক ও সার্কাসের দল আসে এবং হা-ডু-ডু খেলা, যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা প্রদর্শনী ও রামায় গানের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় আড়াই সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

রথযাত্রার মেলা

দেখালি গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে গ্রামের সর্বসাধারণের প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী কেশবচক, নায়েবচক, হলুদবাড়ী, বিরবন্দর, শাকুড়িয়া, কষ্টাবাড়ী প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে প্রায় পাঁচশত নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন এবং মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মনিহারী, পোষাক-পরিচ্ছদ, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক ও সার্কাসের দল আসে এবং থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়। যাত্রা বা থিয়েটার দেখিতে শত শত লোকের সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—দেখালি গ্রামে অনুষ্ঠিত শিবরাত্রির মেলা ও চড়কের মেলা উল্লিখিত রথযাত্রার মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

শিবরাত্রির মেলা

টিকাশী গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রির উৎসব উপলক্ষে চপলেশ্বর শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় সাত-আট বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় তিন সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপচোপড়, বাসনকোসন, বই-ছবি, মাটির খেলনা, দা-কুরুল, হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি জিনিসপত্রের শতাধিক দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা নিকটবর্তী গ্রাম ও শহর হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং লটারীখেলা, কবিগান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—টিকাশী গ্রামে চৈত্রসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত চড়কের মেলাটি উল্লিখিত শিবরাত্রির মেলার অনুরূপ।

সেরখাঁ চক গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রির উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় চার বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি দেড়শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিন সহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলার বিক্রেতাগণ স্থানীয় এবং শতাধিক দোকানপাট বসে। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, দা-কুরুল, ধামা-কুলা, খেলনা-পুতুল প্রভৃতি জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়। ইহাতে প্রায় দুই সহস্র দর্শকের সমাগম হয়।

শীতলাপূজার মেলা

জাহানাবাদ গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলা-পূজা উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে বাসুলীমন্দির সংলগ্ন প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী প্রায় ২০।২৫ খানি গ্রাম হইতে প্রায় আট-নয় সহস্র নরনারী মেলায় আসেন। ওখালি, তেরপেখিয়া, মাগুড়িয়া প্রভৃতি স্থানগুলি হইতে প্রধানতঃ বিক্রেতাগণ আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা, পান-বিড়ি, জুতা, ঘুড়ি, মাটির খেলনা-পুতুল, হাঁড়ি-কলসী, কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে। মেলায় বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক ও সার্কাসের দল আসে এবং ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা ও যাত্রাভিনয় হয়। এইদিন অনেকে ঘুড়ি উড়াইয়া আমোদপ্রমোদ করেন।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ বুড়াবুড়ি কালুপুর (মৌজা ঃ কালুপুর)। ২৫।১৪৯৭৭।৩।৯

(ক) মাহিষ্য ও রাজবংশী। গ্রামে বর্মনপাড়া ও মণ্ডলপাড়া নামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কাঁথি রোড। হলদী নদীতে নৌকাযোগে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব ও মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে সর্বসাধারণের একটি মন্দিরে হরিঠাকুর, শীতলা দেবী এবং সরস্বতী দেবীর মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

জনশ্রুতি আছে, প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে বুড়াবুড়ি কালুপুর গ্রামের পূর্বাংশটি গভীর বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এবং এই বনমধ্যে অধুনা কালীতলা নামে পরিচিত স্থানে একটি বৃক্ষের পাদমূলে লোকচক্ষুর অন্তরালে বুড়াবুড়ি নামক দুইটি পাষাণ মূর্তি স্থাপিত ছিল এবং গ্রামটি পূর্বে গোকুলী গ্রামের সামন্তদের অধীন ছিল। এক সময় শ্রীসনাতন সামন্ত নামে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া উক্ত বুড়াবুড়ির অবস্থানের কথা জানিতে পারেন। বুড়াবুড়ির কথা জানাজানি হইবার পর কতিপয় রাখাল বালক দুষ্টামী করিয়া উক্ত মূর্তি দুইটি হলদী নদীর জলে ফেলিয়া দেয়; কিন্তু পরদিন ঠিক নির্দিষ্ট স্থানেই মূর্তি দুইটিকে পুনরায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সংবাদ প্রচারিত হইলে পর গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে লোকজন বুড়াবুড়ির পূজা দিতে এই স্থানে আসিতে থাকেন। বুড়াবুড়ির থানের নিকট দিয়া হলদী নদীতে যাতায়াতকারী প্রতিটি মাঝি-মাল্লা বুড়াবুড়ির উদ্দেশ্যে সিন্নী দিয়া জয়ধ্বনি করিয়া যাইতেন। গ্রামের সীমান্তবর্তী হলদী নদীতে একটি দহ আছে; উহা বুড়াবুড়ির দহ নামে খ্যাত। প্রবাদ আছে, নৌকায় গুড় থাকিলে আরোহীগণ দহের কাছাকাছি আসিয়া বুড়াবুড়ির উদ্দেশ্যে গুড় ফেলিয়া দিলে গড়স্থিত একটি কুমীর ভাসিয়া উঠিত এবং আরোহীগণ বুড়াবুড়ির জয়ধ্বনি করিলে কুমীরটি কাহারও কোন প্রকার ক্ষতি সাধন না করিয়া জলের মধ্যে আত্মগোপন করিত। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি বুড়াবুড়ির পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। খুব সম্ভব বুড়াবুড়িকে কেন্দ্র করিয়াই গ্রামের নাম বুড়াবুড়ি কালুপুর হইয়াছে।

শ্রীধরণীধর জানা, প্রধান শিক্ষক,
কালুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গোপীনাথপুর, মেদিনীপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বুড়াবুড়ি কালুপুর গ্রামের পার্শ্বস্থিত গুড়গ্রামে (মৌজা নং ২৮) অনুষ্ঠিত রাসযাত্রা মেলার বিবরণ 'মেলা বিবরণী' অধ্যায়ে দেওয়া হইল।

২। গ্রাম ঃ মাসুড়িয়া (মৌজা ঃ পূর্ব্ব মাসুড়িয়া)। ১১২।৩৭১৩।১৮৭।৯১৬

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, করণ, শবর, তাঁতী, জেলে ও ও রজক। গ্রামে পূর্বপাড়া, পশ্চিমপাড়া ও দক্ষিণপাড়া নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) কাঁথি রোড রেলস্টেশন হইতে অথবা এগরা হইতে রাজকুল রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামের উত্তর প্রান্তে পৌছাইয়া হাটিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। তাহা ছাড়া, কাশীনগর হইতে খাল দিয়া নৌকায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও চড়ক অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র-বৈশাখ মাসে আটদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে চারিদিকে মাটির দেওয়াল ও উপরে

খড়ের চালাযুক্ত একটি ঘরের অভ্যন্তরে কুণ্ডের মধ্যে স্বপ্নেশ্বর মহারুদ্রজীউ নামে খ্যাত একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী এবং প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে স্থানীয় কালুরাম চৌধুরী নামক জনৈক ভূস্বামী শিবলিঙ্গটিকে প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া জানা যায়।

শ্রীনিবাস চন্দ্র সাও, শিক্ষক,
গ্রাম : দ্বারিকাপুর,
পোঃ ভোটানাশা, মেদিনীপুর।
ও
শ্রীশশিভূষণ খাটুয়া, গ্রামসেবক,
বিভীষণপুর, মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম : ভীমেশ্বরী (মৌজা : শিমুলিয়া)।
১২৫।৬২৮'১৫।৪৬৭।২,২৩৩

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কায়স্থ, জেলে, ধোপা, হাড়ী, কামার, বারুজীবী, তিলি, ডোম ও মুসলমান। গ্রামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) কাঁথি রোড রেলস্টেশন হইতে রাজকুল রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে পুণ্যস্নান অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) পৌষসংক্রান্তির মেলা। দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন এবং ইহাতে প্রায় ছয় সহস্র নরনারীর সমাগম হয় এবং বিভিন্ন জিনিসপত্রের শতাধিক দোকানপাট বসে।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরে ভীমা দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ভীমা দেবীর মূর্তি দুর্গা মূর্তির ন্যায়। উক্ত দেবীর নামানুসারে গ্রামের নাম ভীমেশ্বরী হইয়াছে।

শ্রীপ্রিয় নাথ গড়ৎ, চাকুরী,
গ্রাম : শিমুলিয়া, পোঃ ভীমেশ্বরী বাজার,
মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম : বাহাদুরপুর।
১৩।১,০৯৬'২৭।৪৬৬।২,২২০

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, গোয়ালা, নাপিত, করণ, রজক, কাহার, মাহিষ্য, তাঁতী ও স্বর্ণকার। গ্রামে জানাপাড়া, মণ্ডলপাড়া, শাসমলপাড়া, দাসপাড়া, গিরিপাড়া, প্রধান-পাড়া, মান্নাপাড়া, রক্ষিতপাড়া, পট্টনায়কপাড়া, করণপাড়া, বাগপাড়া, মাইতিপাড়া, রায়পাড়া, পাত্রপাড়া, কৈবর্তপাড়া, বেহারাপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, চাউলিয়াপাড়া, নাপিতপাড়া ও রজকপাড়া নামে কুড়িটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) পাঁশকুড়া রেলস্টেশন হইতে রাজকুল রুটের মোটরবাসে করিয়া আসিয়া গ্রামের পার্শ্ববর্তী বাঁধের উপর দিয়া অথবা বাহাদুরপুর ঘাট পর্যন্ত নৌকায় আসিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং বহু প্রাচীন।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি দেবালয় আছে। তাহা ছাড়া একটি পঞ্চানন্দ, একটি শীতলা, দুইটি কালী, তিনটি চণ্ডী এবং একটি মনসা আছে।

শ্রীবামাচরণ মাইতি, প্রধান শিক্ষক,
বাহাদুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম : কলাবেড়িয়া। ১৪৬।৫২২'৬৭।২৩৮।১,৩৭১

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য ও শূদ্র। গ্রামে দক্ষিণপাড়া, মধ্যপাড়া ও পূর্বপাড়া নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) পাঁশকুড়া রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে করিয়া অথবা কলাবেড়িয়া খালে নৌকা করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজাটি মাত্র ছয় বৎসরের, চড়ক উৎসবটি প্রায় বাইশ বৎসরের এবং শিবরাত্রি উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতিকালের।

শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ও একটি শীতলামন্দির ভিন্ন সাধারণের একটি দেবালয় আছে। শীতলামন্দির হইতে বিগ্রহকে লইয়া গিয়া বৎসরের বিভিন্ন সময়ে গ্রামবাসীগণ নিজ নিজ গৃহে পূজা দিয়া থাকেন।

শ্রীসুনীল কুমার দাস, প্রধান শিক্ষক,
কলাবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কাকলগড়,
মেদিনীপুর।

৬। গ্রাম ঃ পূর্ব্ব রাধাপুর। ২১৭।৭৮৬·৬৯।১৮৪।১,১১৩

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) পাশকুড়া রেলস্টেশন হইতে কলাবেড়িয়া গ্রাম হইয়া কলাবেড়িয়া খালে নৌকা করিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রাচীন।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন। মেলাটিতে প্রায় পাচ-ছয়শত নরনারী আসেন এবং নানারকম জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাসের দল আসে এবং খেলাধূলা ও যাত্রাভিনয় হয়।

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি দেবালয় এবং দুইটি পঞ্চানন্দ ও দুইটি শীতলা আছে।

শ্রীগিরিশ চন্দ্র মেইকাপ, প্রধান শিক্ষক
পূর্ব্ব রাধাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বায়েন্দা,
মেদিনীপুর।

৭। গ্রাম ঃ সাতুল্যা চক। ২২৯।২৪৩·৫৪।৮৪।৪১৭

(ক) মাহিষ্য ও তাঁতী। গ্রামে জানাপাড়া, দাসপাড়া ও পাইকারপাড়া নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) পাশকুড়া রেলস্টেশন হইতে কালীনগর-নরঘাট অথবা মলাট-জনকা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়। তাহা ছাড়া, হেঁড়িয়া মোটরবাস স্ট্যাণ্ড হইতে নৌকাযোগে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ মাসে রটন্তী চতুর্দশী তিথিতে, পৌষ ও চৈত্র সংক্রান্তি তিথিতে মহাকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মহাকালীপূজাটি সবর্জনীন এবং প্রাচীন।

(ঙ) মহাকলীপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন। ইহা ভিন্ন, পৌষ মাস ও চৈত্র সংক্রান্তি তিথিতে পূজা উপলক্ষেও উৎসব প্রাঙ্গণে দোকানপাট বসে।

(চ) গ্রামে একটি মাটির ঘরে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রস্তর খণ্ডকে মহাকালীর প্রতীকরূপে পূজা করা হয়।

শ্রীবিপিন বিহারী দাস, শিক্ষক,
সাতুল্যা চক মহাকালী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জুলিয়া বাজার,
মেদিনীপুর।

৮। গ্রাম ঃ এক্তারপুর। ২৪৫।৫৩২·৬৪।২৪৭।১,৫০৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, ছুতার, হাড়ী, বৈরাগী, তাঁতী, দলুই ও মাহিষ্য। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, কায়স্থপাড়া, ছুতারপাড়া, হাড়ীপাড়া, তাঁতীপাড়া, দর্জিপাড়া ও মাহিষ্য-পাড়া নামে সাতটি পাড়া আছে। গ্রামটি মাহিষ্য প্রধান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন পাশকুড়া হইতে কালীনগর হইয়া রসুলপুর নদী সংলগ্ন এক্তারপুর পরোজ খাল দিয়া গ্রামে পৌছান যায়। এক্তারপুর ঘাট হইতে নিয়মিত মোটর-যোগে পশ্চিমদিকে ইটাবেড়িয়া হইয়া উত্তরে ভগবানপুর যাওয়ার পথেও গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দোলযাত্রা উৎসবটি প্রায় আশি বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে সপ্তাহকাল-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় আশি বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শীতলা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দির আছে। প্রায় ১২০ বৎসর পূর্বে এই গ্রামের জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া নিকটবর্তী গোপালক মৌজায় একটি হোগ্‌লা বন হইতে মূর্তিটি আবিষ্কার করেন। ইহা ছাড়া, গ্রামে ক্ষীরেশ্বর শিবলিঙ্গ, গোপালজীউ বিগ্রহ ও জনৈক মুসলমান ফকিরের 'থান' আছে। ক্ষীরেশ্বর শিবলিঙ্গটি এই গ্রামের

মুগুপাড়া নামে খ্যাত জঙ্গলাবৃত স্থান হইতে জনৈক সাধু উদ্ধার করেন।

শ্রীপুলিন বিহারী শী, শিক্ষক,
গ্রাম : এক্তারপুর, পোঃ ভূপতিনগর,
মেদিনীপুর।

৯। **গ্রাম : অর্জ্জুননগর। ২৯৯।৮০৪·৩৫।২৭৬।১,৩৬৯**

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, করণ, মাহিষ্য, নাপিত, মালাকার, ধীবর ও কোদমা। গ্রামে ধীবরপাড়া, কায়স্থপাড়া, মাহিষ্যপাড়া, নাপিতপাড়া ও কোদমাপাড়া নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, লবণ তৈয়ারী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলদা হইতে কালীনগর পর্যন্ত মোটরবাসে আসিয়া রসুলপুর নদীতে নৌকাযোগে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) বাসন্তীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে চারদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির এবং মদনগোপালজীউর ইষ্টক নির্মিত সুউচ্চ একটি প্রাচীন মন্দির আছে। বহুদূর হইতে মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিগোচর হয়। অর্জ্জুননগরের মদনগোপালজীউর মন্দির মাজনামুঠা রাজবংশের কীর্তি। বিগ্রহটি রাজা যাদবরামের প্রতিষ্ঠিত এবং উহার মন্দিরটি তাঁহার পুত্রবধূ রানী সুগন্ধ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ভগবানপুর থানার অন্তর্গত জুখিয়া গ্রামে নবরত্ন ও সরোবরাদি এবং খেজুরী থানার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর গ্রামের মন্দির ও ইড়িঞ্চি গ্রামের দীঘিকাটা জলামুঠা রাজবংশের কীর্তি। জলামুঠা জমিদারীর অন্তর্গত অধিকাংশ দেবালয় ও দীঘিকা এই বংশের খ্যাতনামা রানী কৃষ্ণপ্রিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও খোদিত হইয়াছিল। জনশ্রুতি, জলামুঠা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণপণ্ডা স্বীয় নামে কৃষ্ণনগর গ্রামটি স্থাপন করিয়া প্রথমে এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। পরে এগরা থানার অন্তর্গত বাসুদেবপুর গ্রামে তাঁহারা রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

শ্রীরামেশ্বর গিরি, প্রধান শিক্ষক,
অর্জ্জুননগর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

১০। **গ্রাম : অনলবেড়ে। ৩১৯।১২৬·৯৮।৭১।৪১২**

(ক) মাহিষ্য, করণ, নাপিত, কুমার, জেলে ও বাগ্দী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলদা হইতে কালীনগর পর্যন্ত মোটরবাসে আসিয়া হাঁটিয়া অথবা নৌকাযোগে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গোষ্ঠপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে মকরপূজা, ফাল্গুন মাসের দোলপূর্ণিমায় অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন মহোৎসব এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী।
মকরপূজার মেলা। মাঘ মাসে চারদিনব্যাপী।
দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে চারদিনব্যাপী।
শিবপূজার মেলা। চৈত্র মাসে পাঁচদিনব্যাপী।
উল্লিখিত মেলাগুলি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালীমন্দির, একটি শীতলামন্দির এবং ব্যক্তিবিশেষের একটি শিবমন্দির আছে।

শ্রীগুণধর মান্না, প্রধান শিক্ষক,
অনলবেড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ অনলবেড়ে, মেদিনীপুর।

১১। **গ্রাম : উত্তর বরোজ।**
৩৪১।২৩৭·৬৮।১১৪।৫৭৮

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, জেলে, বাগ্দী ও নাপিত। গ্রামে মাহিষ্যপাড়া ও বাগ্দীপাড়া নামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে মোটরবাসে কৃষ্ণনগর হইয়া যাতায়াত করা হয়। গ্রামের সীমান্ত দিয়া প্রবাহিত বরোজ নদী পথে নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে শারদীয়া দুর্গাপূজা ও গ্রাম্য দেবী বরোজচণ্ডীর পূজা এবং ফাল্গুন মাসে মহারুদ্র নামে খ্যাত শিবের মন্দিরে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ভিন্ন, প্রতি বৎসর পৌষ মাসে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বিজয়-চণ্ডীর পূজা হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

বিজয়চণ্ডীপূজার মেলা। পৌষ মাসে একদিন। ইহা প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরে মহারুদ্র নামে খ্যাত হর-পার্বতীর শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে এই গ্রামের নিকটবর্তী পুলবন্দীর রাস্তা মেরামত কালে মৃত্তিকা খনন করিয়া উক্ত প্রস্তর পাওয়া যায়। মহারুদ্র বিশেষ জাগ্রত দেবতা বলিয়া বিশ্বাস। ইঁহার সম্পর্কে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

খড়ের চালাযুক্ত একটি মাটির ঘরে বরোজচণ্ডী নামে খ্যাত সিংহবাহিনী অষ্টভুজা মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বরোজচণ্ডীও বিশেষ জাগ্রতা ঈশ্বরী বলিয়া বিশ্বাস। ইঁহার মাহাত্ম্য সম্পর্কে গ্রামে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। বরোজ নদীর গর্ভে 'চণ্ডীদহ' নামে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। নদী পথে এই স্থান দিয়া যাতায়াত-কালে নৌকার মাঝিরা চণ্ডীদহের উদ্দেশ্যে অদ্যাবধি যুক্তকরে প্রণাম জানান। গ্রামে অপর একটি মন্দিরে যুক্তকর ও ধ্যানমগ্ন একটি বৌদ্ধ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা বিজয়চণ্ডী নামে খ্যাত এবং চণ্ডীর ধ্যানে পূজিত হয়। গ্রামের দক্ষিণাংশে বর্তমানে 'চণ্ডী পুষ্করিণী' নামে খ্যাত একটি পুষ্করিণী খননকালে উক্ত মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। ইহা ভিন্ন, পুষ্করিণীর মধ্যে একটি সুগভীর কূপ ও তন্মধ্যে একটি অতিকায় জীবের অস্থি পাওয়া যায়। বিজয়চণ্ডীমন্দিরের নিকটে পাশাপাশি দুইটি বাঁধান সমাধি আছে। সাধারণের বিশ্বাস ইহা কোন অজ্ঞাতনামা পীরের আস্তানা। এই স্থানে প্রথম বসতি স্থাপনকালে গভীর বন-জঙ্গলের মধ্যে জীর্ণাবস্থায় ঐ সমাধি দুইটি দৃষ্ট হয়। পরে ১৩২২ খৃষ্টাব্দে জনৈক মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি সমাধি দুইটিকে সংস্কার করিয়া দেন।

বরোজ একটি বৃহৎ ও প্রাচীন গ্রাম। বর্তমানে ইহা উত্তর বরোজ, দক্ষিণ বরোজ ১ম খণ্ড ও দক্ষিণ বরোজ ২য় খণ্ড—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। এই অঞ্চলে স্বনামধন্য ভূস্বামী রাজা যাত্রারাম রায় ১৭৭৪ সালে উৎকল ভাষায় তালপত্রে লিখিত পাট্টা দ্বারা কিনু বাগ, হরেকৃষ্ণ মাইতি ও গোবর্ধন ভূঁইয়া নামে তিন ব্যক্তিকে স্বল্প সেলামীতে বন্দোবস্ত দ্বারা সম্মানীয় প্রজা স্বীকার করিয়া এই স্থানে বসবাস স্থাপনের অধিকার প্রদান করেন এবং উল্লিখিত তিনজন ব্যক্তি নানা স্থান হইতে লোকজন আনাইয়া এই স্থানে বসতি স্থাপন করেন বলিয়া জানা যায়। গ্রামটি বরোজ নদীর তীরে অবস্থিত এবং আশপাশের গ্রাম হইতে প্রায় সাত-আট ফুট উচ্চ ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত। গ্রামে পুষ্করিণী ও মৃত্তিকাদি খননকালে প্রাচীন ইষ্টক ও মৃৎ-পাত্রাদি এবং ভূগর্ভে প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন অতীতকালে এই স্থানে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল।

শ্রীসত্যেশ্বর মিশ্র, প্রধান শিক্ষক,
কায়েমগেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

মাস্থুড়িয়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

নিকটবর্তী কয়েকটি থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় বার-তের সহস্র নরনারী ট্রেন, মোটর গাড়ী গরুর গাড়ী করিয়া মেলায় আসেন।

মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ কাঁথি এবং পটাশপুর থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহ হইতে আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাঁচের বাসন-পেয়ালা-চুড়ি, বই-ছবি, ঔষধপত্র, কাপড়চোপড়, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের

তৈয়ারী জিনিসপত্র, পান-বিড়ি, সরবৎ, ডাব, ফলমূল প্রভৃতি দ্রব্যাদির চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সংনাচ, যাত্রাভিনয় ও বাজি পোড়ান হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় তিন সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

অনলবেড়ে গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় সাত সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় শতাধিক দোকানপাট বসে। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা, হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি জিনিসপত্র আমদানী হয়। বিক্রেতারা অধিকাংশ স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ক্রীড়ানুষ্ঠান, জলসা, যাত্রা, থিয়েটার ও কবিগানের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় দুই সহস্র দর্শকের সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—অনলবেড়ে গ্রামে অনুষ্ঠিত মকরপূজার মেলা এই গ্রামে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার মেলার অনুরূপ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অনলবেড়ে গ্রামের দক্ষিণে বাগদা নদীর উপকূলে কোটদলবাড় এবং হাটুরিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর ভীম একাদশীতে একটি মেলা বসে। পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং থিয়েটার বা যাত্রাভিনয় হয়।

দোলযাত্রার মেলা

এক্তারপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় তিন বিঘা জমির উপর এক সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আশি বৎসরের প্রাচীন।

ভগবানপুর থানার ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ নং ইউনিয়নগুলির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্থান হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দশ-বার সহস্র নরনারী রিক্সা ও গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয়। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, ঔষধপত্র, কাপড়চোপড় প্রভৃতি বিবিধ জিনিস-পত্রের ষাট-সত্তরটি দোকানপাট বসে। ইহা ভিন্ন, প্রায় প্রতি বৎসর বাঘাদাঁড়ী, মধুখালী, কাঁটাপুকুরিয়া, রামচল, নেলুয়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র আমদানী হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং কবিগান, থিয়েটার বা যাত্রাভিনয় হয়। অভিনয় দেখিতে প্রায় তিন সহস্র দর্শকের সমাগম হয়।

বাসন্তীপূজার মেলা

অর্জুননগর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

ভগবানপুর থানার ১৩ ও ১৪নং ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম এবং পটাশপুর থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম হইতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় দেড় সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড় প্রভৃতি অন্যান্য রকমারী জিনিস-পত্রের প্রায় একশত দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা অধিকাংশই স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং খেলাধুলা হয়।

রাসযাত্রার মেলা

গুড়গ্রাম (মৌজা নং ২৮) গ্রামে কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর যাবৎ বসিতেছে। এই গ্রামের দীনবন্ধু সাহু নামে জনৈক ব্যক্তি অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে ক্রমেই ধনবান হইয়া উঠেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি গৃহদেবতা রাধাকৃষ্ণের সেবা-পূজার নিমিত্তে দেবোত্তর করিয়া দেন। তদবধি এই

গ্রামে মহাধুমধামের সহিত রাসযাত্রা উৎসব ও তদুপলক্ষে একটি মেলা বসিতেছে।

আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রত্যহ গড়ে প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ কুলাপাড়া, দলগড়, পূর্ব ভগবানপুর, মহম্মদপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, মাটির খেলনা-পুতুল প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় একশত দোকানপাট বসে। ভগবানপুর ও নন্দীগ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় মাটির পুতুল-খেলনা আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কয়েকদিন নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে দর্শক ও শ্রোতার অন্যান সংখ্যা প্রায় পাঁচ সহস্র।

শিবরাত্রির মেলা

বাহাদুরপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে গ্রামের পূর্ব প্রান্তে প্রায় চার বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশপাশের ঈশ্বরপুর, মাধবপুর, মনোহরপুর, শ্রীকান্ত-পুর, চিনাদাঁড়ী, শ্যামচক প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রায় চার সহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয়। মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, কাঁসা-পিতলের বাসনকোসন, লণ্ঠন, আয়না, চিরুণী, টর্চলাইট, ঔষধপত্র, বই-ছবি, মিল ও তাঁতের কাপড়চোপড়, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধামা-কুলা, মাটির পুতুল, কাঠের খেলনা, হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি রকমারী জিনিসপত্রের শতাধিক দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক ও লটারী খেলার দল আসে এবং যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান, বিচিত্রানুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা হইয়া থাকে। এই সকল অনুষ্ঠানে সহস্রাধিক দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

কলাবেড়িয়া গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দিরের নিকটবর্তী রাস্তার উভয় পার্শ্বে প্রায় এক বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

পার্শ্ববর্তী কোটবাড়, আগুড়িয়া, চড়াবাড়, শ্যামচক, বলরামচক প্রভৃতি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় সহস্রাধিক নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, দা-বঁটি প্রভৃতি জিনিসপত্রের মাত্র পঁচিশটি দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিকের দল আসে এবং জলসা ও যাত্রাভিনয় হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কলাবেড়িয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

উত্তর বরোজ গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির এবং বরোজচণ্ডীর মন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

ভগবানপুর, কাঁথি ও খেজুরী থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী নৌকা করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, ঔষধপত্র, বই-ছবি, দা-কুড়ুল, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র মেলায় আমদানী হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিকের দল আসে এবং কবিগান, তরজাগান, কীর্তনগান ও যাত্রাভিনয় হয়।

থানা ঃ পটাশপুর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ বিশ্বনাথপুর। ৮।৩৮৬৮৩।৬৭।৩৯৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, উগ্রক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ, মাহিষ্য, করণ ও ধোপা। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড হইতে খাড়ুরদা রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে চন্দনযাত্রা উৎসব, শ্রাবণ মাসে ঝুলনযাত্রা উৎসব, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমী, কার্তিক মাসে গোবর্ধনযাত্রা উপলক্ষে অন্নকূট উৎসব ও রাধাগোপালজীউর রাসযাত্রা উৎসব এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব ও শিবচতুর্দশী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি রাধাগোপালজীউর মন্দির, একটি শিবমন্দির এবং কৃষ্ণবলরামজীউর মন্দির আছে। গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বনাথ শিবের নামানুসারেই গ্রামের নাম বিশ্বনাথপুর হইয়াছে।

শ্রীশ্রীকান্ত কুমার ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
বিশ্বনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নৈপুর,
মেদিনীপুর।

২। গ্রাম ঃ মধুপুর। ৯।৪৮৯৫৩।৫৫।২৮৪

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, তাঁতী, শোলাঙ্কী, কুমার, গোয়ালা ও সাঁওতাল। গ্রামে উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া ও পূর্বপাড়া নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড হইতে খাড়ুরদা রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব এবং মাঘ মাসে মাঘীপূর্ণিমা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি সর্বজনীন এবং শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন।

মাঘীপূর্ণিমার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলা দুইটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি শীতলার স্থান আছে।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিশাই, কৃষিজীবী,
গ্রাম ঃ মধুপুর, পোঃ নৈপুর,
মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম ঃ নৈপুর। ১১।৯৬৫৩৩।২৪৫।১,২৮৮

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, তিলি, রাজপুত, শোলাঙ্কী, কায়স্থ, স্বর্ণবণিক, মুচি, মেথর ও জেলে। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড হইতে পটাশপুর-নৈপুর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়। তাহা ছাড়া, খড়্গপুর হইতে বাখরাবাদ পর্যন্ত আসিয়া কেলেঘাই নদীতে নৌকায় গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব, আষাঢ় ও মাঘ মাসে মদনমোহনজীউর রথযাত্রা উৎসব, শ্রাবণ মাসে ঝুলনযাত্রা উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে ভীম একাদশী উৎসব এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গাজন ও দুর্গাপূজা ব্যতীত অন্যান্য উৎসবগুলি গ্রামের 'কানুনগো' বংশীয় জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসব্যাপী।

রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একসপ্তাহ-ব্যাপী।

ভীম একাদশীর মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলা দুইটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিব, শীতলা এবং কৃষ্ণ প্রস্তরের মদনমোহন-জীউ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শীতলাদেবীর মূর্তিটি বিকট দর্শন রাক্ষসী মূর্তির ন্যায়।

গ্রাম সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, নৈপুরের জমিদার

কানুনগো বংশের জ্ঞানদানন্দ দেব ১৬০২ খৃষ্টাব্দে সুদূর রাজপুতনা হইতে উড়িষ্যা হইয়া এদেশে আসেন এবং এই স্থানে জনবসতি গড়িয়া তোলেন। তৎকালে এই গ্রামের নামকরণ হয় নয়াপুর। নয়াপুর পরবর্তীকালে নৈপুরে পরিবর্তিত হইয়াছে।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ দাস কানুনগো, প্রধান শিক্ষক,
নৈপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম : গোকুলপুর। ২৬|১,৯৯৭·৪৫|৪০৪|২,২৫২

(ক) ব্রাহ্মণ, জেলে, যুগী, খড়িয়া ও হাড়ী। গ্রামে পূর্ব সাই, পশ্চিম সাই, হাসিরপুর, খড়িয়াপাড়া, যুগীপাড়া, পূর্ব জেলেপাড়া, কাজিপাটনা, দাঁড়িপাটনা প্রভৃতি নামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মাদুর বয়ন শিল্প।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাগরাবাদ হইতে কেলেঘাই নদীতে নৌকাযোগে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষ মাসের শেষ দুইদিন হইতে মাঘ মাসের তিনদিনব্যাপী জনৈক বৈষ্ণব সাধক গোকুলানন্দ গোস্বামীর তিরোধান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোকুলানন্দ দেহত্যাগ করিলে পর তাঁহার পরিবার-পরিজন এই গ্রামেই তাঁহার মরদেহ সমাধিস্থ করেন। ঐ সমাধির উপর প্রতি বৎসর উৎসবকালে প্রতিটি ভক্ত এক মুষ্টি করিয়া মাটি দিয়া যথারীতি পূজা দিয়া যান। ফলে বর্তমানে উহা একটি বৃহৎ মৃত্তিকা স্তূপে পরিণত হইয়াছে। ঐ মৃত্তিকা স্তূপের উপর তুলসীগাছ প্রোথিত আছে। উৎসবটি প্রায় চারশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গোকুলানন্দের তিরোধান উৎসব উপলক্ষে মেলা। পৌষ-মাঘ মাসে পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় চারশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গোকুলানন্দ গোস্বামীর নামানুসারেই গ্রামের নাম গোকুলপুর হইয়াছে।

শ্রীজগন্নাথ পাত্র, কৃষিজীবী,
গ্রাম ও পোঃ গোকুলপুর,
মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম : টেপরপাড়া। ৩১|৬৩৩·৩৬|২৪৭|১,১৯৮

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, কামার, রজক, দলুই, কোদমা ও তিলি। গ্রামে মাহিষ্যপাড়া, দলুইপাড়া ও ব্রাহ্মণপাড়া নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কাঁথি রোড হইতে এগরা-টেপরপাড়া রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়। তাহা ছাড়া, সবঙ্গ মোটরবাস ষ্ট্যাণ্ড হইতে বকুলতলা পর্যন্ত নৌকাযোগে আসিয়া কাঁচা রাস্তায় গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা এবং কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

রাসযাত্রা উৎসবটি পচেটগড়ের রাজাদের দ্বারা প্রবর্তিত এবং এই উৎসবের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য তাঁহাদের প্রদত্ত কিছু ভূসম্পত্তি আছে। ইহা গ্রামের সর্বজনীন উৎসব। শোনা যায়, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল গমনকালে এই গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে আটদিনব্যাপী।

রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে ছয়দিনব্যাপী। মেলা দুইটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট একটি ইষ্টক নির্মিত প্রাচীন লক্ষ্মীজনার্দনমন্দির ব্যতীত একটি শিব ও একটি শীতলার প্রস্তরময়ী মূর্তি আছে।

শ্রীঅনন্ত কুমার সামন্ত, প্রধান শিক্ষক,
টেপরপাড়া সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র,
পোঃ পটাশপুর, মেদিনীপুর।

৬। গ্রাম : গোপালপুর। ৩৬|১,৪৬৪·১৬|৩২৪|১,৭৫১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, রাজবংশী, নাপিত, গোয়ালা, তাঁতী, রজক, নমঃশূদ্র, কুমার, মুচি, মেথর, ডোম, তিলি ও মুসলমান। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী বাখরাবাদ রেলস্টেশন হইতে অমর্ষি রুটের মোটরবাসে করিয়া অথবা গ্রামের নিকটবর্তী কেলেঘাই নদীতে নৌকায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি গ্রামের চৌধুরী পরিবারের পারিবারিক উৎসব এবং প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ইষ্টক নির্মিত একটি চণ্ডীমণ্ডপ ব্যতীত একটি রাধামাধবজীউ, একটি গোবিন্দজীউ, একটি সীতানন্দ-জীউ, দুইটি শীতলা, একটি গ্রাম্য দেবতা এবং প্রায় প্রতি গৃহে মনসা আছে।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ চৌধুরী, কৃষিজীবী.
গ্রাম : গোপালপুর, পোঃ হাট গোপালপুর,
মেদিনীপুর।

৭। গ্রাম : চাঁদপুর। ৫৮।৮১৫'১২।১৩০।৬৭২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, মাহিষ্য, কোদমা, শোলাঙ্কী ও দলুই। গ্রামে দলুইপাড়া, রায়পাড়া, পাল-পাড়া, জানাপাড়া, মহাপাত্রপাড়া, সেনপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড হইতে পাহাড়ীচক পর্যন্ত মোটরবাসে আসিয়া সেখান হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা এবং ফাল্গুন মাসে শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। রথযাত্রা, রাসযাত্রা ও শীতলাপূজাটি বহুকালের প্রাচীন। দুর্গাপূজাটি ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রাসযাত্রা উৎসবটি স্থানীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত হয়। জনশ্রুতি আছে, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্র গমনকালে চাঁদপুর গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন বৈষ্ণব মঠ আছে।

গ্রামের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে দুইটি বৃহৎ প্রাচীন পুষ্করিণী ও গ্রামের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীন রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ আছে। জনশ্রুতি, বহুকাল পূর্বে এই স্থানে চাঁদরাজা নামে জনৈক ভূস্বামী বাস করিতেন। উল্লিখিত রাজবাটীতে তিনি বসবাস করিতেন এবং উক্ত পুষ্করিণীদ্বয় তিনিই খনন করান। চাঁদরাজার নামানুসারেই গ্রামের নাম চাঁদপুর হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস।

শ্রীঅতুল চন্দ্র দে, শিক্ষক,
চাঁদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ চাঁদপুর, মেদিনীপুর।

৮। গ্রাম : পদিমা। ৬৩।৪০৪'৫৭।১২০।৬৫২

(ক) মাহিষ্য, করণ, তেলী, তাঁতী, বৈরাগী ও সাঁওতাল। গ্রামে দেউলীপাড়া, পদিমাপাড়া, পাটনাপাড়া, বাবুপাড়া ও তেলীপাড়া নামে পাচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড হইতে মোটরবাসে পাহাড়ীচক আসিয়া সেখান হইতে একটি কাঁচা রাস্তা ধরিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ নববর্ষ উৎসব এবং কার্তিক পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেবের পূজা ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) নববর্ষের মেলা। বৈশাখ মাসে পনরদিনব্যাপী। মেলাটি গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর যাবৎ বসিতেছে।

(চ) গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের একটি মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-দেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, গ্রামে একটি শীতলা ও একটি মনসা আছে।

শ্রীকেদার নাথ দাস পট্টনায়ক, হেড পণ্ডিত,
পদিমা বীনাপাণি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সাউরি, মেদিনীপুর।

৯। গ্রাম : মুস্তফাপুর। ৭১।১,২০১'৪২।২৪৯।১,২৩৩

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, হাড়ী, কোদমা, ধোপা ও মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড এবং মোটর স্ট্যাণ্ড পাহাড়ীচক।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) বাসন্তীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে আটদিন-ব্যাপী। মেলাটি মাত্র গত পাঁচ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি দুর্গামণ্ডপ এবং মুস্তফা খাঁ নামে জনৈক পীরের একটি কবর স্থান আছে। পীরের জীবনী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁহারই নাম অনুসারে এই গ্রামের নাম মুস্তফাপুর হইয়াছে।

শ্রীপরমেশ্বর সাহু, শিক্ষক,
মুস্তফাপুর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

১০। গ্রাম : চন্দনপুর। ১০৩।৭১৫'৪৭।১৫৪।৫৫৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, করণ, মাহিষ্য, তাঁতী, কোদমা, নাপিত, ব্রহ্মভট্ট ও সাঁওতাল। গ্রামটি তিনটি পাড়ায় বিভক্ত।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড হইতে এগরা-রাজকুল রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় কুড়ি বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি মাত্র কুড়ি বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দিরে চন্দনেশ্বর শিব, শীতলা, বৃন্দাবনজীউ, রঘুনাথজীউ এবং একটি গ্রাম্য দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার গঠনভঙ্গী অতি সুন্দর।

জনশ্রুতি, চন্দনেশ্বর শিবের নামানুসারেই গ্রামের নাম চন্দনপুর হইয়াছে।

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ্র মাইতি, চাকুরী,
গ্রাম : কাশিমপুর, পোঃ পতাশদীঘি,
মেদিনীপুর।

১১। গ্রাম : পঁচেট। ১০৪।১,১৬৭'০৪।৩৩৩।১,৬৫৮

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, গোয়ালা, ময়রা, ছুতার, কোদমা, তাঁতী, ধোপা, নাপিত, বেনে, নমঃশূদ্র, করণ, কামার, কুমার, ডোম, হাড়ী, মুচি, মেথর ও তিলি। গ্রামে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এই চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড। এগরা-পটাশপুর রুটে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি পঁচেটগড়ের রাজপরিবার কর্তৃক প্রচলিত এবং প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে বারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় পাচশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে পচেটগড়ের রাজা চৌধুরী বংশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দেবালয়, দীঘি, গড়খাই, রাসমঞ্চ প্রভৃতি বিদ্যমান।

শ্রীঅনন্ত কুমার ভুঁইয়া, কৃষিজীবি,
গ্রাম ও পোঃ পঁচেট,
মেদিনীপুর।

১২। গ্রাম : পুরুষোত্তমপুর।
১০৭।৭৯১'৫৮।১৭২।৮৭০

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, করণ, ছুতার ও নাপিত। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড। এগরাগামী মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) বাসন্তীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি দেবালয় ভিন্ন দুইটি শীতলা আছে।

শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ কর, শিক্ষক,
গ্রাম : পুরুষোত্তমপুর, পোঃ পঁচেট,
মেদিনীপুর।

১৩। গ্রাম : বাগমারী। ১১৬।৮২৪'৮৯।২৫১।১,১৭০

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, শঙ্খবণিক, স্বর্ণকার, ধীবর, তেলী, তাঁতী, ধোপা ও মুসলমান। গ্রামে জেলেপাড়া, তাঁতীপাড়া, জানাপাড়া, উত্তরপাড়া, তেলীপাড়া, শাঁখারীপাড়া, কামিলাপাড়া, ভাটপাড়া, চণ্ডালপাড়া, পূর্বপাড়া ও মুসলমানপাড়া নামে এগারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড অথবা বেলদা হইতে

খড়ুই-এগরা রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব, চৈত্র মাসে শিবের গাজন এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে আটদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরে প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির, একটি হরিমন্দির ও একটি দুর্গামণ্ডপ ব্যতীত দুইটি শীতলা আছে। শিব-মন্দির ও হরিমন্দিরটি স্থানীয় রায় বংশীয় জমিদারগণের দ্বারা নির্মিত। গ্রামে একটি পীরের স্থান আছে।

শ্রীসত্যরঞ্জন রায়, কৃষিজীবি,
সম্পাদক, বাগমারী শ্রীকল্যাণ সংঘ,
গ্রাম : বাগমারী, পোঃ প্রতাপদীঘি,
মেদিনীপুর।

১৪। গ্রাম : শ্রীরামপুর। ১১৮।৮৭৫'২৩।২১৬।১,০৫৯

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, তাঁতী, তেলী, সদ্গোপ, ময়রা, কামার, নাপিত, ধোপা ও হাড়ী। গ্রামে প্রধানপাড়া, জানাপাড়া, মাইতিপাড়া, ভট্টপাড়া, দাসপাড়া, তেলীপাড়া, ময়রাপাড়া, তাঁতীপাড়া, সাউপাড়া প্রভৃতি নামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড অথবা বেলদা হইতে খড়ুই-এগরা রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়। তাহা ছাড়া, নৌকা করিয়াও গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় ও মাঘ মাসে শীতলাপূজা, পৌষ মাসের সংক্রান্তি তিথিতে বাসুলীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রাচীন।

(ঙ) বাসুলীপূজার মেলা। পৌষসংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বাসুলী ও শীতলা মন্দির এবং একটি শিব-লিঙ্গ আছে। বাসুলীমন্দিরে বাসুলী দেবীর মূর্তি (মুখ-মণ্ডল) এবং শীতলামন্দিরে শীতলার প্রতীক স্বরূপ একটি পিতলের ঘটের উপর পিতল নির্মিত মুখমণ্ডল স্থাপিত আছে।

শ্রীরমানাথ প্রধান, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ শ্রীরামপুর,
মেদিনীপুর।

১৫। গ্রাম : অমর্ষি কসবা।

১৩৪।২০৩'৯৪।৪২২।২,১১৬

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতী, শাঁখারী, স্বর্ণকার, তিলি ও মুসলমান। গ্রামে পনরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও তাঁতশিল্প।

(গ) রেলস্টেশন এগরা হইতে এগরা-রাজকুল রুটের মোটরবাসে কয়িয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের ১লা হইতে ৪ঠা পর্যন্ত পীর মখদুম সাহেবের তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকজন পীরের আস্তানায় ফুল, সিন্নি নিবেদন করিয়া প্রদীপ দিয়া যান। মানত স্বরূপ কেহ কেহ নূতন কাপড় দেন। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মখদুম পীর এই অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয় এবং হিন্দু-মুসলমান উভয়েই তাঁহাকে বিশেষ মান্য করেন। এই অঞ্চলের নানা স্থানে 'মখদুমচক' নামে পীরের নির্দিষ্ট স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তরা ঐ সকল স্থানে পূজাদি দিয়া মখদুম পীরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকেন।

(ঙ) পীর মখদুমের তিরোভাবের মেলা। বৈশাখ মাসে চারদিনব্যাপী।

(চ) গ্রামে পীর মখদুম সাহেবের সমাধি মন্দির আছে।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মাইতি, গ্রামসেবক,
গ্রাম ও পোঃ অমর্ষি কসবা, মেদিনীপুর।

অমর্ষি কসবা গ্রামের মখদুম পীর সম্বন্ধে শ্রীযোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয় 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"পটাশপুর থানার অন্তর্গত অমর্শী গ্রামে পীর মখদুম শিহাবুদ্দিন চিস্তির আস্তানা আছে। তিনি একজন

সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; তাঁহার অলৌকিক জীবনের অনেক কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। আস্তানার সেবকগণ বলেন, তৎকালে এ প্রদেশে অমর সিংহ নামক যে রাজা রাজত্ব করিতেন, তিনি তাঁহার রাজ্যে মুসলমানের বাস সহ্য করিতে পারিতেন না এবং প্রাতঃকালে কোন মুসলমানের মুখ দর্শন করিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহার সিংহদ্বারে একটি পাদুকা ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থীগণকে প্রথমে ঐ পাদুকাকে প্রণাম করিয়া তবে রাজদর্শনে যাইতে হইত। মখদুম সাহ একদিন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে রাজকর্মচারীগণ তাঁহাকে ঐ কথা জানাইলে তিনি অস্বীকৃত হওয়ায় রাজা তাঁহার শিরচ্ছেদ করিতে আদেশ দেন। ইহাতে মখদুম সাহ ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ হস্তস্থিত অসির দ্বারা রাজাকে নিহত করিলে রাজার লোকজন ভীত হইয়া পলায়ন করেন।

স্থানীয় অধিবাসীরা বলেন, রাজা অমর সিংহ কোন মুসলমান সাধুর অবমাননা করিলে নবাবী সৈন্য আসিয়া অমর্শী আক্রমণ করে। রাজা ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় একটি সুগভীর কূপে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ বিসর্জন করেন।......

মখদুম সাহের মসজিদে যে শিলালিপিটি আছে, মৌলভী আবদুল্ ওয়ালী খাঁ সাহেব তাহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। নিম্নে উহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল :—

পৃথিবীর এই মসজিদে নিঃসন্দেহরূপে বিশ্বাসী আত্মার (Angel Gabriel) অবতরণস্থান। এই স্থানে নিষ্ঠার সহিত প্রার্থনা সম্পন্ন কর,—কারণ এইটিই তোমার মুক্তির পথ। মখদুম শিহাবুদ্দিন আউলিয়া দৃঢ় ধর্ম্মমতের (ইস্‌লাম) অবলম্বী বলিয়া তাঁহার জন্য (ইহা নিৰ্ম্মিত হইল)। আমি অদৃশ্য দূতকে ইহা নির্ম্মাণের তারিখ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আনন্দের সহিত উত্তর করিলেন—ইহার তারিখ এই জগদীশ্বর তাহার সমর্থক—"১০৭২ হিজরী"— (১৬০০ খৃষ্টাব্দ)

স্থানীয় লোকেরা বলিয়া থাকেন মখদুম সাহ হিজলীর তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলীর গুরু ছিলেন। তিনিই এই মসজিদটি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন; হিজলীর মসজিদে রক্ষিত ফার্সী পুস্তকখানিতেও আছে যে, মখদুম তাজ খাঁর গুরু ছিলেন। তাজ খাঁ ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। মৌলভী ওয়ালী খাঁ সাহেব ও জনশ্রুতির উপর সন্দিহান হইয়া লিখিয়াছেন—The Musnud-i-Ali who was contemporary of the Mukhdum Sahib, must therefore be one of Taj Khan's successors having the same title. আমাদের মতে দ্বিতীয় বাহাদুর খাঁ যিনিও তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলী নাম ও উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই মখদুম সাহের গুরু ছিলেন এবং তাঁহারই প্রদত্ত অর্থে মসজিদটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাহাদুর খাঁর প্রেরিত সৈন্যদলই অমর সিংহের রাজ্য দখল করিয়াছিল।" (পৃঃ ৩৮১-৩৮২)

পরন্তু শ্রীবসু মহাশয় গোনাড়া গ্রামের মঙ্গলাঠাকুরাণী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে :—

"অমর্শী পরগণার অন্তর্গত গোনাড়া গ্রামের মঙ্গলা ঠাকুরাণী প্রাচীন দেবীমূর্তি। তাঁহারই নামানুসারে স্থানটি "মঙ্গলা মাড়ো" নামেই সুপরিচিত। এই গ্রামের "কালী পুষ্করিণী" নামে পরিচিত সরোবরটি কাঁথি মহকুমার মধ্যে অন্যতম সুবৃহৎ পুষ্করিণী। উহা গ্রামের প্রাচীন জমিদার বসু চৌধুরী বংশের কীর্তি। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের সমাজপতি, সম্রাট হুসেন শাহের মন্ত্রী গোপীনাথ বসুর (পুরন্দর খাঁন) অধস্তন পঞ্চম পুরুষ মহেশ চন্দ্র চৌধুরী জকপুরের "মহাশয় বংশের" দৌহিত্রসূত্রে জমিদারীর অংশ প্রাপ্ত হইয়া সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হুগলী জেলার অন্তর্গত বন্দীপুর গ্রাম হইতে আসিয়া এতদ্দেশে বাস করেন। তিনিই ঐ সুবৃহৎ পুষ্করিণীটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই বংশীয় হৃদয়রাম বসু কর্ণগড়ের মহামায়ার সাধক ছিলেন। কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের প্রসিদ্ধ 'শিবায়ণ' গ্রন্থে ইহার নামোল্লেখ আছে। হৃদয়রাম ঐ পুষ্করিণীটির পার্শ্বে স্থাপিত কালীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এক সময়ে বিজয়া দশমীর দিন এই গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের অনেকগুলি প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য এই স্থানে আনা হইত। সে সময় রিণীর পাড়ে একটি বড় মেলাও বসিত। লোকের অবস্থানৈগুণ্যে প্রতিমার সংখ্যা এখন হ্রাস হইয়া গিয়াছে ষ্ট্রেচী সাহেবের পূর্ব্বোদ্ধৃত বিবরণে মেদিনীপুর জেলার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদের তালিকায় এই বংশের রঘুনাথ চৌধুরীর নাম আছে।" (পৃঃ ৬৮৩)

১৬। গ্রাম : টানিয়াবিলা। ২২৩।২৬১'০০।৭২।৪৮২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, মাহিষ্য, তাঁতী, উগ্রক্ষত্রিয়, রাজবংশী, ধোপা, হাড়ী, গোয়ালা প্রভৃতি। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, দুগ্ধ ও মৎস্য ব্যবসায়।

(গ) ×

(ঘ) আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘী পূর্ণিমায় শীতলাপূজা ও নামকীর্তন মহোৎসব, শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোলযাত্রা এবং শিবচতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবাদির মধ্যে কেবলমাত্র রথযাত্রা ও শিবরাত্রি উৎসব ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা পরিচালিত হয়। অন্যান্য উৎসবগুলি সর্বজনীন। রথযাত্রা, শিবরাত্রি এবং শীতলাপূজা শতাধিক বৎসরের প্রাচীন উৎসব। শীতলাপূজা উপলক্ষে আতশবাজি পোড়ান এবং যাত্রাভিনয় হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে সপ্তাহব্যাপী। শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে দুইদিন। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শীতলা, শিব ও জগন্নাথদেবের মন্দির আছে। শিবমন্দিরে গঙ্গাধর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত অধিকারী, শিক্ষক,
গ্রাম : টানিয়াবিলা, পোঃ বামনবাড়,
মেদিনীপুর।

১৭। গ্রাম : ভৈরবদাঁড়ী। ২৫২।৩৭২'৪৮।১৫৬।৭৫৬

(ক) গ্রামটি মাহিষ্য প্রধান। ইহা ভিন্ন, গ্রামে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ, তাঁতী ও নাপিত আছেন। গ্রামে পাচটি পাড়া আছে। যেমন—মাইতিপাড়া, জানাপাড়া, সাউপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড হইতে মোটরবাসে এগরা হইয়া খড়ুই পৌছাইয়া সেখান হইতে কাঁচা রাস্তায় প্রায় চার মাইল হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। গ্রামের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি ক্যানেল দিয়া নৌকায় যাতায়াত করিতে পারা যায়।

(ঘ) গ্রামে বৈশাখ মাসে হরিনাম কীর্তন মহোৎসব, কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা, মাঘ অথবা ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় গ্রামে প্রতিষ্ঠিত সত্যনারায়ণ শিলাকে কেন্দ্র করিয়া সত্যনারায়ণপূজা এবং মাঘ ও আষাঢ় মাসে শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি খুব প্রাচীন নহে। রাসযাত্রা উৎসবটি স্থানীয় জমিদার মাইতি পরিবার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং বর্তমানে ইহা আড়ম্বরহীন হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য পূজা-পার্বণগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) সত্যনারায়ণপূজার মেলা। মাঘ অথবা ফাল্গুন পূর্ণিমায় একদিন।

(চ) গ্রামে পাঁচটি প্রাচীন জীর্ণ মন্দির আছে। উক্ত মন্দিরগুলির মধ্যে একটিতে নারায়ণ শিলা ও রাধাকৃষ্ণের মূর্তি আছে। অপর মন্দিরগুলি যথাক্রমে শিবমন্দির, দুর্গামন্দির ও দুইটি শীতলামন্দির। শীতলামন্দির দুইটি সাধারণের এবং অপর তিনটি মন্দির স্থানীয় মাইতি পরিবার দ্বারা নির্মিত।

ইহা ভিন্ন, গ্রামের উত্তর সীমান্তে প্রায় ¼ একর ভূমিব্যাপীয়া প্রায় ২০ ফুট উচ্চ একটি মাটির স্তূপ আছে। অনেকে বলেন পূর্বে ঐ স্থানে ভৈরবনাথের মন্দির ছিল। এখনও গ্রামে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে উক্ত ভৈরবতলায় হোমযজ্ঞ সহকারে যাতালপূজা দেওয়া হয় এবং ইহাতে সুফল পাওয়া যায় বলিয়া বিশ্বাস।

অতীতে গ্রামে ভৈরবনাথের অবস্থানহেতু গ্রামের নাম 'ভৈরবদাঁড়ী' হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ জানা, চাকুরী,
গ্রাম : ভৈরবদাঁড়ী, পোঃ চকভবানী,
মেদিনীপুর।

১৮। গ্রাম : ইচ্ছাবাড়ী। ২৮৩।১৬৫'৮০।১৫৮।৬৯৯

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, বৈরাগী, কলু, ধোপা, কোদমা প্রভৃতি। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, মাহিষ্যপাড়া, তেলিপাড়া, কোদমাপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) বেলদা অথবা কাঁথি রোড রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে কালিনগরে আসিয়া সেখান হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে মহারুদ্র নামে খ্যাত শিবকে কেন্দ্র করিয়া

প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি ব্যক্তিবিশেষের এবং বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) পৌষসংক্রান্তির মেলা। পৌষ মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মাটির ঘরে মহারুদ্র শিব প্রতিষ্ঠিত আছে

শ্রীসুধীর চন্দ্র মাইতি, প্রধান শিক্ষক,
ইচ্ছাবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ অনলবেড়িয়া, মেদিনীপুর।

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা
(গোকুলানন্দ গোস্বামী)

গোকুলপুর গ্রামে বৈষ্ণব সাধক গোকুলানন্দ গোস্বামীর তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে পচেটগড় রাজাদের প্রায় দেড়-শত বিঘা জমির উপর পৌষ মাসের দুইদিন ও মাঘ মাসের তিনদিন মোট পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চারশত বৎসরের প্রাচীন।

মেদিনীপুর জেলার সমগ্র কাঁথি মহকুমা, তমলুক মহকুমা এবং নন্দীগ্রাম, ময়না, দাঁতন, মোহনপুর, খেজুরী, কেশিয়াড়ী প্রভৃতি থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় লক্ষাধিক নরনারী গরুর গাড়ী ও নৌকা করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ মঙ্গলমাড়ো, ভগবানপুর, ময়না, নারায়ণগড়, কোলাঘাট, খড়্গপুর, কেশিয়াড়ী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় প্রায় পাঁচশত দোকানপাট বসে। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কাঠের আসবাবপত্র, ধামা-কুলা, হাঁড়িকুড়ি, খেলনা-পুতুল প্রভৃতি নানা প্রকার জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক ও সিনেমা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ সহস্র লোকের সমাগম হয়।

(মখদুম পীর)

অমর্ষি কসবা গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ পীর মখদুম সাহেবের তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে পীরের সমাধি মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় পটাশপুর, সবঙ্গ এবং ভগবানপুর প্রভৃতি থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় নানাপ্রকার জিনিসপত্রের প্রায় তিনশত দোকানপাট বসে। উহাদের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়-চোপড়, ধর্মীয় পুস্তকাদি, ধামা-কুলা প্রভৃতির আমদানী বেশী হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে। ইহা ভিন্ন, কবিগান, কাওয়ালীগান ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় দশ সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপুজার মেলা

নৈপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে নৈপুর ও মধুপুর গ্রামের সীমান্তে প্রায় দশ বিঘা জমির উপর প্রায় একমাসব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

নারায়ণগড় এবং পটাশপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের গড়ে প্রত্যহ প্রায় দুই সহস্র নরনারী গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ পটাশপুর, চাঁদপুর, বেলদা, বিশ্বনাথ-পুর, রঘুনাথপুর, মহম্মদপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী বাসন-কোসন, কাপড়চোপড়, ঔষধপত্র, বই-ছবি, বাঁশের ও

বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, জুতা, গিল্টি করা অলঙ্কার, চা-পান বিড়ি ইত্যাদির প্রায় একশত দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক, সার্কাস ও লটারী খেলার দল আসে এবং কবিগান হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নৈপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত রথযাত্রার মেলা এবং ভীম একাদশীর মেলা উল্লিখিত গাজনের মেলার অনুরূপ।

দুর্গাপূজার মেলা

গোপালপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

বড়হাট, এক্তারপুর, তোটানালা, মঙ্গলমাড়ো, পাচুড়্যা, শোলাভেড়ী, তালাডিহা, ধামসাই, বীরকটা, বাকুচা, দোবাঁদি, কলমাঘাট, মকরামপুর, টেপরপাড়া, পশ্চিমজালি, গোয়ালদা, সাতবাহিনী, খাড়ান, সেলমাবাদ, বুলাকীপুর, খিদিরপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাচ সহস্র নরনারী হাঁটিয়া ও নৌকা করিয়া মেলায় আসেন। মেলায় উল্লিখিত গ্রামগুলি হইতেই সাধারণতঃ প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন এবং প্রায় একশত দোকানপাট বসে। মিষ্টান্ন, মনিহারী, ঔষধপত্র, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধামা-কুলা, মাটির পুতুল, হাঁড়ি-কলসী প্রভৃতি নানাপ্রকার জিনিসপত্র মেলায় আমদানী হয়। বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিকের দল আসে এবং কোন কোন বৎসর যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

দোলযাত্রার মেলা

বাগমারী গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে বাগমারী হাটতলায় প্রায় আড়াই বিঘা জমির উপর সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

এই জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং সীমান্তবর্তী বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কয়েকটি থানার অন্তর্ভুক্ত গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাচ সহস্র নরনারী মেলায় আসেন। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন কোসন, কাপড়চোপড়, ধামাকুলা, হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি জিনিসপত্রের ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস ও লটারী খেলার দল আসে এবং কীর্তনগান, থিয়েটার অথবা যাত্রাভিনয় হয়।

নববর্ষের মেলা

পদিমা গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় হাটের ব্যবসায়ীগণের উদ্যোগে প্রায় দুই বিঘা জমির উপর পনরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত কুড়ি-পঁচিশ বৎসর যাবৎ বসিতেছে।

পদিমা, বেলদা, পটাশপুর, সাউরি প্রভৃতি স্থান হইতে প্রধানতঃ হিন্দু ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী নৌকা করিয়া ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, পান-বিড়ি, সরবৎ, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির মাত্র কুড়ি-পচিশটি দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিকের দল আসে এবং থিয়েটার, যাত্রা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়।

পৌষসংক্রান্তির মেলা

ইচ্ছাবাড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথি হইতে তিনদিনব্যাপী গ্রামের মধ্যস্থলে দেবোত্তর প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় আশপাশের প্রায় দশ-বারটি গ্রাম হইতে প্রায় তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয়। ময়রা, তেলে-ভাজা, মনিহারী, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, খেলনা-পুতুল প্রভৃতির প্রায় চল্লিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা আশ-পাশের গ্রাম হইতেই প্রধানতঃ প্রতি বৎসর আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা ও যাত্রাভিনয় হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ইচ্ছাবাড়ী গ্রামে অনুষ্ঠিত শিবরাত্রির মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

বাসুলীপূজার মেলা

শ্রীরামপুর গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তিতে বাসুলী দেবীর পূজা উপলক্ষে দেবীর মন্দির সংলগ্ন প্রায়

দেড় বিঘা জমির উপর মাত্র একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে ব্যবসায়ীরা এবং প্রায় তিন-চার সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, বাসনকোসন, মনিহারী, বই-ছবি, কাপড়-চোপড়, কৃষি যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির দোকানপাট বসে এবং উৎসব প্রাঙ্গণে হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়।

বাসন্তীপূজার মেলা

মুস্তফাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা উপলক্ষে গ্রামের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

পটাশপুর থানার ২নং, ৩নং ও ৪নং ইউনিয়ন, দাতন থানার ৯নং, ১০নং ও ১২নং ইউনিয়ন এবং খড়ুইগ্রাম, কৌড়দা, খাড়দা, পঁচেট, জালদা, টিটিয়া, পলাশা, ললাট, কাশমূলী, গঙ্গাসাগর, গিরিশা, বেলদা, সাঁখা, চাঁদপুর, মণিনাথপুর, দীঘা, কাটনা, মানপুর, ঝামবাড় প্রভৃতি স্থানগুলি হইতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় দুই সহস্র নরনারী মোটরবাস, গরুর গাড়ী ও নৌকা করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। বিক্রেতারা মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া থাকেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়-চোপড়, খেলনা-পুতুল, পান-বিড়ি, ফলমূল ইত্যাদি জিনিস-পত্রের শতাধিক দোকানপাট বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক ও পুতুলনাচের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়। ইহা ভিন্ন, হাডু-ডু খেলা ও বাঁশের বাঁশী বাজানো প্রতিযোগিতা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রত্যহ প্রায় আড়াই সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

পুরুষোত্তমপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বাসন্তী-পূজা উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দেড় সহস্র নরনারী প্রতিদিন প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকান বসে এবং দশ-পনরজন ফেরিওয়ালা আসেন। মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মাটির পুতুল, মনিহারী, বই, দেবদেবীর ছবি, তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ, ধামা কুলা, হাঁড়িকুড়ি, খেলনা প্রভৃতি জিনিসপত্র আমদানী হয়। বিক্রেতারা প্রধানতঃ নিকটবর্তী গ্রাম ও শহরাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর মেলায় আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কবিগান, থিয়েটার বা যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় এক সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

রথযাত্রার মেলা

মধুপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় সাত-আটশত নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। বিক্রেতাগণ স্থানীয় এবং মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, ঔষধপত্র, হাড়িকুড়ি, ধামা-কুলা প্রভৃতি রকমারী জিনিস-পত্রের ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য স্থানীয় যুবক সম্প্রদায় যাত্রাভিনয় করিয়া থাকেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—মধুপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত মাঘী পূর্ণিমার মেলাটি উল্লিখিত রথযাত্রার মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

টেপরপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে রথডাঙ্গা নামে পরিচিত প্রায় চার বিঘা জমির উপর আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় বহুকালের প্রাচীন।

পটাশপুর থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রত্যহ গড়ে প্রায় আট সহস্র নরনারী নৌকা করিয়া ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকান বসে। মিষ্টান্ন, মনিহারী, ঔষধপত্র, ধর্মীয় পুস্তকাবলী,

কাপড়চোপড়, দা-কাস্তে, ঝুড়ি-চুপড়ী, গাছের চারা, জুতা, মাদুর, শাঁখা এবং পাখী প্রভৃতি মেলায় আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন প্রকার খাজনা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় আট সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—টেপরপাড়া গ্রামে কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত রাসযাত্রার মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

চাঁদপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে গ্রামের 'কচুয়া' নামে একটি পুষ্করিণীর পাড়ে প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সবসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া ও নৌকা করিয়া মেলায় আসেন। সাধারণতঃ রথযাত্রার দিন অপেক্ষা পুনর্যাত্রার দিনই মেলায় লোকজনের ভীড় বেশী হয়। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, বাদাম, চানাচুর, লজেন্স, বেলুন, মালা, ঘুনসী, কাগজের রকমারী ফুল, পান-বিড়ি, আম-কাঁঠাল এবং চন্দনপুর, কাটনাদীঘি ও অমর্ষি কসবা গ্রাম হইতে তাঁতের কাপড়, মধুপুর ও কোঁড়দার গ্রাম হইতে মাটির খেলনা-পুতুল ও হাঁড়ি-কলসী মেলায় আমদানী হয়। মোট প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কীর্তনগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় ছয়শত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

রাসযাত্রার মেলা

পচেট গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে রাসমঞ্চ সংলগ্ন প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমির উপর বারদিনব্যাপী একটি বৃহৎ মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয় এবং ইহাকে পটাশপুর তথা মেদিনীপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ মেলা বলা যাইতে পারে।

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে ট্রেন, মোটর-বাস ও নৌকা করিয়া প্রায় এক লক্ষ নরনারী মেলায় আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ কলিকাতা, মেদিনীপুর শহর, খড়্গপুর, কাঁথি, অমর্ষি কসবা, ভগবানপুর, বেলদা, এগরা প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন। মেলায় প্রায় তিনশত দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, বাসনকোসন, কাঁচের গ্লাস-পেয়ালা-চুড়ি, ঔষধপত্র, ধর্মীয় পুস্তকাবলী, তাঁত ও মিলের কাপড়-চোপড়, কৃষি যন্ত্রপাতি, মাদুর, ধামা-কুলা, মাটির হাঁড়িকলসী ও খেলনা-পুতুল, জুতা, কাঠের আসবাবপত্র ইত্যাদি রকমারি জিনিসপত্র আমদানী হয়। বিক্রেতা-দের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং কীর্তনগান, যাত্রা, থিয়েটার এবং বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় দশ সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

শিবরাত্রির মেলা

চন্দনপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত কুড়ি বৎসর যাবৎ বসিতেছে।

পটাশপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় ছয়-সাতশত নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, তাঁতের কাপড়চোপড়, মাটির হাঁড়ি-কলসী প্রভৃতি জিনিসপত্রের কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কীর্তনগান ও যাত্রাভিনয় হয়।

টানিয়াবিলা গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে সাধারণের প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের চার-পাচ মাইলের মধ্যবর্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় এক হাজার নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয় অঞ্চলের লোকজন। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ ও তাঁতের শাড়ী, বই-ছবি, বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির খেলনা-পুতুল প্রভৃতি মেলায় আমদানী হয়। ইহা ভিন্ন, শাকসব্জী, ফলমূল, চা-পান-বিড়ি, সরবৎ ইত্যাদির দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য খেলাধূলা ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—টানিয়াবিলা গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

সত্যনারায়ণপূজার মেলা

ভৈরবদাঁড়ী গ্রামের উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত ক্যানেলের পার্শ্ববর্তী সরকারী পতিত জমির উপর প্রতি বৎসর মাঘ অথবা ফাল্গুন পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণপূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে। মেলাটি অপ্রাচীন।

আশপাশের পাঁচ-ছয়টি গ্রাম হইতে প্রায় এক হাজার নরনারী মেলায় আসেন এবং খাবার, মনিহারী, তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ, কুমারদের তৈয়ারী মাটির জিনিসপত্র এবং ডোমেদের তৈয়ারী বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিস-পত্রের মোট প্রায় চল্লিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচ ব্যতীত কোন কোন বৎসর সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্যোগে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী বা যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।



গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ দেপাল শাসনবাড়।
১২৮।১৭২·৭৭।১৩০।৬৪৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, বৈরাগী, গোয়ালা, রাজু, একাদশ তিলি, তাঁতী, করণ, ধোপা, জেলে, গন্ধবণিক ও মুসলমান। গ্রামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, তাঁত বয়ন, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে কাঁথি রোড রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে সাত মাইল নামক স্থানে নামিয়া সেখান হইতে উড়িষ্যা কোষ্ট ক্যানেলের পাড় দিয়া প্রায় নয় মাইল হাটিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে শারদীয়া দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সর্বমঙ্গলাপূজা, বাসন্তীপূজা, শীতলাপূজা, চড়ক এবং মহাবিষ্ণু মাঘোৎসব ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহাবিষ্ণু মাঘোৎসব ব্যতীত অন্যান্য উৎসবগুলি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। সর্বমঙ্গলা দেবী বিশেষ জাগ্রতা ঈশ্বরী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। শতাধিক বৎসর পূর্বে দেপাল শাসনবাড়ের প্রখ্যাত রায় পরিবারের কুঞ্জ বল্লভ রায় নামে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া একটি গাছের নীচে সাতটি পাথরের নুড়ি পান এবং সর্বমঙ্গলা দেবীর প্রতীকস্বরূপে উহাদের নিত্য পূজার ব্যবস্থা করেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে সাধারণের সাহায্যে সর্বমঙ্গলা দেবীর একটি ইষ্টক মন্দির নির্মিত হইয়াছে। দেবীর নিত্য পূজা হয়।

মহাবিষ্ণু মাঘোৎসবটি অপ্রাচীন এবং এই উৎসব উপলক্ষে বহু শিব মূর্তি নির্মাণ করিয়া বৈদিক মতে যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই যজ্ঞে প্রায় এক মণ ঘৃত আহুতি দেওয়া হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

ইহা ভিন্ন, এই গ্রামে কালীপূজা, চড়ক ও মহরম উপলক্ষে উৎসব প্রাঙ্গণে কয়েকটি দোকানপাট বসে।

(চ) গ্রামে সর্বমঙ্গলা ও শীতলার পাকা মন্দির, বকুল-তলায় গ্রাম্য দেবীর মাটির ঘর এবং একটি জীর্ণ প্রাচীন মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত, গ্রামে পঞ্চানন্দ ও একটি পীরের আস্তানা আছে।

দেপাল শাসনবাড় একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। মুসলমান রাজত্বকালের প্রথমদিকে এই গ্রামের পত্তন হয় বলিয়া জানা যায়। ১৯১০ সালের সেটেলমেণ্টে দেপাল শাসনবাড় নামের উল্লেখ আছে। কাঁথির অন্তর্গত বাসুদেবপুর রাজবংশের রানী হরিপ্রিয়া দেবীর অধিকার-ভুক্ত থাকায় এই গ্রামের অংশ বিশেষ রানীচক নামে অভিহিত হইত। ইহার আর এক অংশ লালবাগ নামে খ্যাত। সম্ভবতঃ মুসলমান রাজত্বকালে রাজস্ব আদায়ের জন্য ঐ অংশে সরকারী পাইক-বরকন্দাজেরা বসবাস করিতেন।

শ্রীঅনন্ত কুমার সাউ,
সভাপতি, সর্বমঙ্গলা পল্লী উন্নয়ন সঙ্ঘ,
৩০, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলিকাতা-৯।
ও
শ্রীপ্রসন্ন কুমার জানা, প্রধান শিক্ষক,
দেপাল প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

২। গ্রাম ঃ সোনাকনিয়া। ১৪০।৮০·১২।৮৬।২০৫

(ক) রাজবংশী, তাঁতী, সদ্‌গোপ, গোয়ালা ও একাদশ তিলি।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও মৎস্য ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কাঁথি রোড।

(ঘ) গ্রামে চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা ও বৎসরের যে-কোন সময় শীতলাপূজা হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অতীত কালে এই গ্রামে একটি শিবমন্দির ছিল এবং ঐ শিবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। শোনা যায়, কোন এক সময় একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটায় উক্ত

মন্দির হইতে শিব মূর্তি স্থানান্তরিত করিয়া পার্শ্ববর্তী ডেমুরিয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই গ্রামের পরিত্যক্ত মন্দিরটি ক্রমেই জীর্ণ হইয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে পাশাপাশি নয়টি মৌজার লোকজন মিলিতভাবে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে ডেমুরিয়া গ্রামে শিবপূজা ও চড়ক উৎসব পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু চড়কের মেলাটি অদ্যাপি সোনাকনিয়া গ্রামেই বসিতেছে।

(চ) গ্রামে একটি হ্রদের তীরে একটি সুন্দর ইষ্টক নির্মিত শীতলামন্দির আছে।

অনন্তি কুমার বাগ, শিক্ষক,
গ্রাম: সোনাকোনিয়া, পো: বেলদা,
মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম: করোঞ্জি। ১৯৭।১,০৬৫'৬১।৩৭৫।২,৮০৩

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, করণ, রাজু, তাঁতী, গোপা, নাপিত, কোদমা, বৈরাগী ইত্যাদি। গ্রামটি চারটি পাড়ায় বিভক্ত।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) খড়্গপুর-বালিসাই মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। নিকটবর্তী বাঁকশাল ঘাট হইতে নৌকায় কলিকাতা যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) চৈত্রসংক্রান্তির তিনদিন পূর্ব হইতে বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহব্যাপী ধুমধামের সহিত রুদ্রেশ্বর শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ভিন্ন, প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোল উৎসব পালন করা হয়। উৎসব দুইটি সর্বজনীন। গাজন উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের এবং দোল উৎসবটি প্রায় আশী বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে। গাজন উৎসবের শেষ দিন বিকালে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি ইষ্টক নির্মিত পাকা মন্দিরে রুদ্রেশ্বর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, গ্রামে একটি শীতলা ও দুইটি গ্রামবুড়ীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীবৈদ্যভূষণ মাইতি, শিক্ষক,
গ্রাম: করোঞ্জি, পো: বালিসাই,
মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম: বাগপুরা। ২০২।৩২৫'২৭।২১৩।১,৪০৩

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, বৈরাগী, তাঁতী, করণ, স্বর্ণকার ও মুসলমান। গ্রামে বারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) কাঁথি রোড রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ ও শীতলার একযোগে পূজা এবং আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ভিন্ন, গোষ্ঠপূজা ও মনসাপূজা হয়। পূর্বে গ্রামে চড়কপূজা হইত, এখন উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন শীতলাপূজা উপলক্ষে দেবীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করা হয়, তাহার সহিত তিন মাথা, তিন হস্ত ও ছয়টি পা বিশিষ্ট জ্বরাসুর ও দ্বিভুজা রক্তাবতী মূর্তিও স্থাপন করা হয়। রথযাত্রার দিন গ্রামে রথটানা হয় না; কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট মঞ্চের উপর জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি স্থাপন করিয়া যথারীতি উৎসব পালন করা হয়। রথযাত্রা উৎসবটি ব্যক্তিবিশেষের এবং প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন। অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) অক্ষয় তৃতীয়ার মেলা। বৈশাখ মাসে পাঁচদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন। প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে খড়ের ছাউনীযুক্ত একটি মাটির ঘরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্যামানন্দ কুমার সাহু, প্রধান শিক্ষক,
বাগপুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পো: বালিসাই, মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম: বোধোড়া। ২৫৪।৩০৬'৫৯।১৬৫।৯১৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, তাঁতী, রাজু, করণ ও গোপা। গ্রামে বারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও তাঁত শিল্প ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় ৪৮ মাইল দূরে কাঁথি রোড রেলস্টেশন। কাঁথি-দীঘাগামী মোটরবাসে আসিয়া প্রায় দুই মাইল পথ হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালী-পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি হইতে পাঁচদিন-ব্যাপী কৃষ্ণকৈবল্যদায়িনী সভার বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্মে প্রণোদিত হইয়া ১৩০১ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণকৈবল্যদায়িনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতি বৎসর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে একযোগে রাধাকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শীতলা ও পঞ্চেশ্বরী দেবীর পূজা ও নামকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিন উল্লিখিত দেবদেবীর মূর্তি পঞ্চেশ্বরীর মন্দিরে আনিয়া যথারীতি, পূজাদি করা হয়। দ্বিতীয় দিনে শীতলা মূর্তিটিকে স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপন করিয়া এবং রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তি একটি নির্দিষ্ট মন্দিরে স্থাপন করিয়া উৎসব পালন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে প্রথম দিন একশত ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় দিন পঞ্চাশজন বৈষ্ণব এবং বাকি তিনদিনব্যাপী দরিদ্র ভোজন করান হয়। উৎসবের পাঁচ-দিনব্যাপী অখণ্ড নামকীর্তন চলিতে থাকে।

ইহা ভিন্ন, গ্রামে রাখালদাস বাবাজী নামে জনৈক বৈষ্ণব সাধকের একটি সমাধি স্থান আছে। প্রতি বৎসর মাঘ মাসের দ্বাদশী তিথিতে তাঁহার তিরোভাব উৎসব পালন করা হয়।

(ঙ) কৃষ্ণকৈবল্যদায়িনী সভার উদ্যোগে মহোৎসবের মেলা। প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি হইতে পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি ১৩০১ বঙ্গাব্দ হইতে শুরু হইয়াছে।

(চ) গ্রামে কৃষ্ণকৈবল্যদায়িনী সভার মন্দির ব্যতীত একটি পুষ্করিণীর পাড়ে পঞ্চেশ্বরী দেবীর একটি ছোট মন্দির আছে। ঐ মন্দিরাভ্যন্তরে পঞ্চেশ্বরী দেবীর প্রতীকস্বরূপ এক খণ্ড চতুষ্কোণ পাথরের উপর একটি নারী মূর্তি খোদিত আছে। পঞ্চেশ্বরী দেবীর পূজাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। তবে বর্তমান মন্দিরটি মাত্র বিশ বৎসর হইল নির্মিত হইয়াছে।

শ্রীমানস কুমার পাণ্ডা, শিক্ষক,
বাগপুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বালিসাই, মেদিনীপুর।

৬। গ্রাম : জলধা। ২৪২।৬৩০·২৯।১৫০।৭১৮

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, কৈবর্ত, নাপিত, করণ, রাজু, কোদমা ও নমঃশূদ্র। গ্রামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মৎস্য ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় ৫১ মাইল দূরে কাঁথি রোড রেলস্টেশন এবং গ্রামের তিন মাইল দূর দিয়া মোটরবাস চলাচল করে। ইহা ভিন্ন, গ্রামে নৌকায় যাতায়াতেরও সুবিধা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে সমুদ্রে পুণ্য স্নান উৎসব উপলক্ষে একটি অস্থায়ী চালা ঘরে মকরবাহিনী গঙ্গা দেবীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া পুণ্যস্নানার্থীরা যথারীতি পূজাদি করিয়া থাকেন। ইহা শতাধিক বৎসরের প্রাচীন উৎসব। তবে আদিতে পার্শ্ববর্তী চাঁদপুর গ্রামে উৎসবটি অনুষ্ঠিত হইত ; কিন্তু সমুদ্র ক্রমশঃ পূর্বদিকে সরিয়া আসিতে থাকায় চাঁদপুর গ্রামের পরিবর্তে বর্তমানে জলধা গ্রামেই এই উৎসব পালন করা হইতেছে। উৎসবটি সর্বজনীন।

(ঙ) পৌষসংক্রান্তির মেলা। পৌষ মাসে একদিন। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ব্যতীত পঞ্চানন্দ, শীতলা ও মনসা আছে।

শ্রীমানস কুমার পাণ্ডা, শিক্ষক,
বাগপুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বালিসাই, মেদিনীপুর।

৭। গ্রাম : বালিসাই।

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, করণ, রাজু, নাপিত, ধোপা, হাড়ী, ডোম, স্বর্ণবণিক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী, ছুতার প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় ৩৬ মাইল দূরে কাঁথি রোড রেলস্টেশন। কাঁথি শহর হইতে দীঘাগামী মোটরবাস এই গ্রামের মধ্য দিয়া যাতায়াত করে। গ্রামটি বঙ্গোপ-সাগরের কূল হইতে তিন মাইলের মধ্যে অবস্থিত।

(ঘ) আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা ও কালীপূজা, পৌষসংক্রান্তি তিথিতে হরিসভার মহোৎসব, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ও শিবচতুর্দশী উৎসব এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কালীপূজা ও চড়ক উৎসবটি সর্বজনীন এবং অন্যান্য উৎসব-গুলি ব্যক্তিবিশেষের।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন।
দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিন।
মহোৎসবের মেলা। পৌষসংক্রান্তিতে একদিন।
মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে জগন্নাথদেবের মন্দির, শিবমন্দির, শীতলা-মন্দির ও একটি হরিসভা আছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পার্শ্ববর্তী তলকাটালিয়া গ্রামে বিশালাক্ষী দেবীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। বিশালাক্ষী দেবী বিশেষ জাগ্রতা ঈশ্বরী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। কথিত আছে, প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্বে স্থানীয় জমিদার স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া আসামের কামাখ্যা হইতে দেবীর শিলামূর্তি আনিয়া এই গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীমানস কুমার পাণ্ডা, শিক্ষক,
বাগপুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বালিসাই, মেদিনীপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : রামনগর থানার অন্তর্গত সমুদ্রতীরবর্তী দীঘা বর্তমানে ভ্রমণবিলাসীদের নিকট একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। খড়্গপুর রেলষ্টেশন হইতে কাঁথি হইয়া মোটরবাসে দীঘায় যাতায়াত করা যায়। প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে প্রায় সত্তর-আশী হাজার নরনারী দীঘার সমুদ্রে পুণ্যস্নান করিয়া থাকেন। মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং সীমান্তবর্তী উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে পুণ্যস্নানার্থীরা আসিয়া থাকেন। মাত্র দশ বার বৎসর হইল এই স্থানে উৎসবটি শুরু হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দীঘায় সমুদ্র-তীরবর্তী নাড়াজোল রাজবাড়ীর পিছন দিকে ইষ্টক নির্মিত একটি সাধারণ মন্দিরে ঝাড়েশ্বর নামে খ্যাত এক শিব আছেন। শোনা যায়, প্রায় একশত বৎসর পূর্বে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া স্থানীয় জনৈক ব্যক্তি গভীর বন-জঙ্গলের মধ্যে শিবমূর্তি উদ্ধার করেন এবং শিবমন্দির নির্মাণ করিয়া ইহার নিত্য পূজার প্রচলন করেন। সবার অলক্ষ্যে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া গাভী কর্তৃক শিবলিঙ্গের উপর দুগ্ধ দান ইত্যাদি বহু প্রচলিত কিংবদন্তীটি এখানেও শুনিতে পাওয়া যায়। ঝাড়েশ্বর শিবের মূর্তিটিকে ঠিক লিঙ্গমূর্তি বলা যায় না; মূলতঃ ইহা একটি রথের চক্র বলিয়া অনুমিত হয়। মন্দিরাভ্যন্তরের মেঝের উপর কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত গোলাকার এই চক্রটি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার উত্তর দিকে প্রসারিত গৌরী অগ্রভাগ সম্ভবতঃ মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে সংযোজিত হইয়াছে। বর্তমানে মন্দিরের সম্মুখে একটি প্রাচীন পুষ্করিণী এবং কয়েকটি প্রাচীন বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে ধুমধামের সহিত ঝাড়েশ্বর শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গাজনে প্রতি বৎসর প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন ভক্ত সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া নানারূপ আচার অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকেন এবং এই সময় মন্দির প্রাঙ্গণে নানাবিধ পণ্য-সামগ্রীর চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে ও চার-পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

(শ্রীঅরুণ কুমার রায়)

মেলা বিবরণী

অক্ষয় তৃতীয়ার মেলা

বাগপুরা গ্রামে স্থানীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের মাঠে প্রায় দুই একর জমির উপর পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। রামনগর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রধানতঃ হাঁটিয়া প্রায় এক হাজার নরনারী প্রতি বৎসর মেলায় আসেন।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, তৈয়ারী পোষাক, খেলনা-পুতুল, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, নানা রকম ফলমূল বিশেষ করিয়া স্থানীয় অঞ্চলে উৎপন্ন কাজু বাদামের আমদানী হয়। মোট প্রায় সত্তর-আশীটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য হা-ডু-ডু খেলা ও স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা 'ব্রতচারী' অনুষ্ঠান ব্যতীত কবিগান, কীর্তনগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রার দল আছে; কোন কোন বৎসর ভিন্ন গ্রাম হইতেও যাত্রাদল আনা হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

সোনাকনিয়া গ্রামের মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড পুরাতন বটগাছের নীচে সাধারণের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর

প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির দিন বিকালে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

আশপাশের ডেমুরিয়া, পাইকবাড়, বালিপুকুরিয়া, মৈদনা, কালীপুজা, কাঠমুণ্ডি, বেলমনী, খোজাবাড়, মহম্মদপুর, পদ্মপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচশত লোকজন এবং ব্যবসায়ী মেলায় আসিয়া থাকেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, ফলমূল, মাছ, বই-ছবি, তাঁতের কাপড়, হাঁড়ি-কলসী এবং মৈতনা ও বালিপুকুর হইতে বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র আমদানী হয়। মোট প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে ও কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। আমোদপ্রমোদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার আয়োজন করা হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

দেপাল শাসনবাড় গ্রামে প্রতি বৎসর শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে সাধারণের প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এবং ইহাতে রামনগর থানার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে দুই-তিন হাজার নরনারী আসিয়া থাকেন।

মেলায় খাবার, মনিহারী, কাঁসা-পিতলের বাসন-পত্র, তাঁতের শাড়ী ও কাটা-কাপড়, তালপাতার পাখা, ধামা-কুলা, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদির পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে। ইহা ভিন্ন, চন্দনপুর হইতে বাসন এবং দেপাল শাসনবাড় গ্রামের কুমারদের তৈয়ারী বিখ্যাত মাটির হাঁড়ি-কলসী বিশেষ করিয়া 'তেলানী' নামে এক প্রকার পাত্র অধিক আমদানী ও বেচাকেনা হয়। বিক্রেতারা রামনগর থানার বিভিন্ন অঞ্চল ও কাঁথি শহর হইতে প্রতি বৎসর আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক ও সার্কাসের দল আসে এবং চণ্ডীমঙ্গল গান, থিয়েটার বা যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

করোঞ্জি গ্রামে গাজন উৎসব উপলক্ষে বৈশাখ মাসে স্থানীয় একটি পুকুর পাড়ে সরকারী প্রায় চার বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। রামনগর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় তিন-চার হাজার নরনারী এবং ব্যবসায়ীরা আসিয়া থাকেন।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, চা-পান-বিড়ি প্রভৃতি বিভিন্ন খাবার; তামা, পিতল, লোহা ও কাঁচের বাসনপত্র; মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা; মনিহারী দ্রব্য, কবিরাজী ঔষধ, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, দা, কাস্তে, কুঠার, কোদাল, ফাল প্রভৃতি; কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, স্থানীয় অঞ্চলের ডোমেদের তৈয়ারী বাঁশ ও বেতের জিনিসপত্র, শাকসব্জী এবং বালিসাই গ্রাম হইতে কাঠের তৈয়ারী পুতুল ও বাঁশের বাঁশি ইত্যাদি আমদানী হয়। মোট প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকান বসে এবং দশ-বার জন ফেরিওয়ালা আসেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য খেলাধূলা, কবিগান, কীর্তনগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে।

পৌষসংক্রান্তির মেলা

জলধা গ্রামের সীমান্তবর্তী সমুদ্রোপকূলে বিস্তীর্ণ বালুতটে প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে পুণ্যস্নান উপলক্ষে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। সমগ্র কাঁথি মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর মেলায় প্রায় চৌদ্দ-পনর হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

কাঁথি শহর এবং এই থানার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রধানতঃ প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ভিন্ন, কাপড়চোপড়, ডাব, খেজুর-রস, নানা প্রকার ফল, খেলনা পুতুল, চা-পান-বিড়ি ইত্যাদির দোকান বসে। মোট প্রায় দেড়শত দোকানপাট বসে এবং দশ-পনরজন ফেরিওয়ালা আসে।

মহোৎসবের মেলা

বোধোড়া গ্রামে কৃষ্ণকৈবল্যদায়িনী সভার উদ্যোগে মহোৎসব উপলক্ষে স্থানীয় জুনিয়র হাই স্কুল প্রাঙ্গণে ও

পদ্মেশ্বরী পুকুরের পাড়ে মোট প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা সরকারী জমিতে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথি হইতে পাঁচদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি ১৩০১ বঙ্গাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

মেলায় আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় চার হাজার নরনারী আসেন এবং খোলা জায়গায় শতাধিক দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ কাঁথি শহর হইতেই আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে মনিহারী দোকানের সংখ্যাই অধিক দেখা যায়। ইহা ভিন্ন, ময়রা, তেলেভাজা, চা-পান-বিড়ি, কাপড়চোপড়, কাঁসা-পিতলের বাসনপত্র, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল, বেত ও বাঁশের তৈয়ারী ধামা-কুলা, ছাতা, জুতা, মাছ, মাংস, ডিম, শাকসব্জী ইত্যাদি আমদানী হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য খেলাধূলা, কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

বালিসাই গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে স্থানীয় হরিসভামন্দির প্রাঙ্গণে সাধারণের প্রায় চার-পাঁচ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় কাঁথি, রামনগর এবং এগরা থানার অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহ হইতে প্রায় তিন-চার হাজার নরনারী ও বিক্রেতারা আসেন। মনিহারী, খাবার, তেলেভাজা, কাপড়-চোপড়, খেলনা-পুতুল, হাঁড়ি-কলসী, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, শাক-সব্জী ও ফলমূলাদি আমদানী হইয়া থাকে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিকের দল আসে এবং খেলাধূলা ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়।

রথযাত্রার মেলা

বাগপুরা গ্রামে কাঁথি-দাঁথা রাস্তার ধারে জগন্নাথদেবের সেবায়েতের ও সাধারণের প্রায় এক একর জমির উপর আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন বিকালে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন এবং আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচশত নরনারী মেলায় আসেন।

বিক্রেতারা স্থানীয় এবং ময়রা, মনিহারী, তৈয়ারী পোষাক, বই-ছবি, খেলনা-পুতুল, শিল্পসামগ্রী ও ফলমূলাদি প্রভৃতি জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে।



গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : কল্যাণপুর। ৫৪।৩৩১·৩২।৭৩।৩৬০

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, রাজু, ধোপা, নাপিত ও তাঁতী। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও মাদুর শিল্প।

(গ) বেলদা অথবা কাঁথি রোড রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। গ্রামের মধ্য দিয়া একটি খাল গিয়াছে, ঐ খাল দিয়া কেবল মাত্র বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে ঝগড়েশ্বর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহের প্রথম শনি অথবা মঙ্গলবার 'কামিনা ঘট' স্থাপন করিয়া উৎসবের সূচনা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন।

(ঙ) শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা। চৈত্রসংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ব্যতীত গোপালজীউ, দামোদরজীউ ও চণ্ডী আছে।

শ্রীগঙ্গানারায়ণ মাইতি, শিক্ষক,
গ্রাম : কল্যাণপুর, পোঃ পাঁচরোল,
মেদিনীপুর।

২। গ্রাম : গহবী। ৬৬।১৯৫·৫১।৮৯।৪১৩

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, ধোপা, নাপিত, কোদমা ও রাজু। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, ধোপাপাড়া, নাপিতপাড়া, রাজুপাড়া ও কোদমাপাড়া নামে মোট ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) বেলদা অথবা কাঁথি রোড রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে আটদিনব্যাপী। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি সুউচ্চ ইষ্টক নির্মিত মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাসহ রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত, দুইটি কালীমন্দির এবং একটি শীতলামন্দির আছে।

শ্রীকানাই চন্দ্র মাইতি, কৃষিজীবী,
গ্রাম : জগদীশপুর, পোঃ পাঁচরোল,
মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম : মানিকাদিঘী। ১০৭।১৮৩·৬৯।৪৬।২৬১

(ক) মাহিষ্য, বৈরাগী, তাঁতী এবং কোদমা। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, তাঁতশিল্প ও মাদুরশিল্প।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড হইতে এগরা-বঙ্কিম চন্দ্র রোডে মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়। তাহা ছাড়া, নৌকা করিয়া পানিপারুল নামক ঘাটে নামিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গোষ্ঠপূজা এবং আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) গোষ্ঠপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে নাটমন্দির সহ একটি সমতল ছাদ বিশিষ্ট ঘরে চণ্ডীঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, গ্রামের দক্ষিণ দিকে প্রায় পঁচিশ একর ভূমি ব্যাপিয়া "মানিকাদিঘী" নামে একটি প্রাচীন দিঘীর পাড়ে গোপেশ্বরের মন্দির আছে। প্রতি ঘরে ঘরে মনসাপূজা হয়।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার জানা, প্রধান শিক্ষক,
মানিকাদিঘী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ পানিপারুল,
মেদিনীপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সাহাড়দা (মৌজা নং ১৬৬) গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি উপলক্ষে চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। এই সম্পর্কে রুক্মিনীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মহাপাত্র মহাশয় কর্তৃক প্রেরিত বিবরণী 'মেলা বিবরণী' অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।

৪। গ্রাম : দুবদা। ১৯১।৪,৬২৬৮২।১,১৫৯।৫,২৫৭

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, তিলি, নমঃশূদ্র, খাড়িয়া, কোদমা, ধীবর, হাড়ী, কামার, কুমার, ধোপা ও তাঁতী। গ্রামে বারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড হইতে এগরা রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র পূর্ণিমা ও কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক পূর্ণিমা ও চৈত্র পূর্ণিমায় সপ্তাহকালব্যাপী। মেলা দুইটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রাধাগোবিন্দজীউমন্দির, শিবমন্দির, শীতলামন্দির ও চণ্ডীমন্দির ব্যতীত অন্যান্য গ্রাম্য দেবদেবীর স্থান আছে।

স্থানটি পূর্বে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং ঝোপ-জঙ্গলকে ওড়িয়া ভাষায় বুদা বলা হয়। সম্ভবতঃ বুদা অপভ্রংশে দুবদা হইয়াছে।

শ্রীমথুরা নাথ জানা, প্রধান শিক্ষক,
দুবদা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র নাথ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম : দক্ষিণ চৌমুখ। ২০৯।১২২৪।৮৬৪।৪২৯

(ক) ব্রাহ্মণ ও ধীবর।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড হইতে কাঁথি-বেলদা রাস্তায় হাঁটাপথে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তিতে মহাকালীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জনশ্রুতি আছে, মহাকালী দেবী বাগদা নদীতে ভাসিয়া আসেন এবং বাসুদেবপুরের রাজা আদিষ্ট হইয়া দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। মহাকালীপূজাটি দেড় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মহাকালীপূজার মেলা। পৌষসংক্রান্তি হইতে দশ-বারদিনব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে খড়ের চালাযুক্ত একটি মাটির ঘরে মহাকালী ও গঙ্গাদেবীর প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ছাড়া, একটি শীতলামন্দির আছে।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মণ্ডল, শিক্ষক,
অস্তিচক সুরেন্দ্র-যোগেন্দ্র বিদ্যাপীঠ,
পোঃ অস্তিচক, মেদিনীপুর।

৬। গ্রাম : বাথুয়াড়ী। ২৪৪।১,১০৭৬৮।২৮০।১,৬২৭

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, ধীবর, বাগদী, ধোপা, নাপিত, করণ ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন কাঁথি রোড হইতে মোটরবাসে তাজপুরে নামিয়া সেখান হইতে জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তা ধরিয়া গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়। তাহা ছাড়া, বর্ষা-কালে নৌকায় যাতায়াত করিতে পারা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে কালীপূজা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা ও শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলির মধ্যে কালীপূজা ও গাজন উৎসব দুইটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

মহরমের মেলা। চান্দ্রমাসানুযায়ী একদিন। মহরম উপলক্ষে মেলাটি গ্রামের হাটের উপর বসে এবং 'তাজিয়া' দর্শনার্থে প্রায় ছয়-সাতশত পুণ্যকামী মুসলমান নরনারী আসেন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ও একটি কালীমন্দির ব্যতীত প্রতি পাড়ায় শীতলামন্দির আছে। তাহা ছাড়া, জনৈক গ্রামবাসীর গৃহে পূজিত রাধাকৃষ্ণ মূর্তিকে রাস উৎসবের সময় শোভাযাত্রা করিয়া আনিয়া গ্রামের একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করিয়া যথারীতি উৎসব পালন করা হয়।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ সাউ, শিক্ষক,
বাথুয়াড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বাথুয়াড়ী, মেদিনীপুর

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক এগরা গ্রামের হটনগর মহাদেবের পূজাদি সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

এগরা

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত এগরা একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম এবং কাঁথি শহর হইতে ইহা প্রায় ১৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বর্তমানে এই স্থানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, একাদশ তিলি, যুগী, স্বর্ণকার, কাঁসারী, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বসবাস আছে এবং একটি থানা ও ডাকঘর আছে। মেদিনীপুর অথবা খড়্গপুর হইতে কাঁথিগামী মোটরবাসে এগরা বাজারে নামিয়া এই গ্রামে যাতায়াত করা হয়। বাজারের অতি সন্নিকটেই এগরা হটনগরে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে; ইহা হটনগর মহাদেবের মন্দির নামে পরিচিত। জনশ্রুতি আছে, উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা গজপতি মুকুন্দদেব এই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আবার কাহারও কাহারও মতে উৎকলবাসী মহাপাত্র পদবীধারী স্থানীয় কোন সামন্তরাজ উহা নির্মাণ করান।

চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণের মধ্যে শিবমন্দিরটি অবস্থিত। যদিও চারিদিকের প্রাচীর স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পশ্চিমদিকে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশদ্বারের উপর মন্দিরাকার সুন্দর নহবৎখানা আছে। পশ্চিমমুখী ইষ্টক নির্মিত সুবিশাল শিবমন্দিরটি উড়িষ্যার রেখদেউল স্থাপত্য রীতিতে গঠিত এবং একটি উচ্চ চত্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত। মূল মন্দিরের সহিত সংযুক্ত জগমোহন ও তৎসংলগ্ন ছাদহীন প্রশস্ত একটি নাটমন্দির আছে। নাটমন্দিরের চারিদিক বারটি স্তম্ভের দ্বারা সুসজ্জিত। জগমোহনের প্রবেশদ্বারে দেওয়ালগাত্রের সহিত সংযুক্ত উচ্চ ও সুন্দর একটি তোরণের উপরিভাগে দুই পার্শ্বে দুইটি দণ্ডায়মান সিংহ মূর্তি আছে। মূল মন্দিরের চূড়ায় বেঁকি, আমলক, পরপর তিনটি কলস ও তদুপরি পতাকাদণ্ড শোভা পাইতেছে।

মূল মন্দিরের মধ্যে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভগৃহের উত্তর দিকে প্রসারিত প্রস্তর নির্মিত বৃহৎ গৌরীপট্টের মধ্যস্থলে প্রায় ১২ ইঞ্চি ব্যাসার্ধযুক্ত গোলাকার এবং প্রায় ১৪ হাত পরিমাণ গভীর গহ্বরের মধ্যে হটনগর শিবলিঙ্গ অবস্থান করিতেছে বলিয়া শোনা যায়। গহ্বরটি সারা বৎসর পঞ্চামৃত ও ফুল বেলপাতায় পরিপূর্ণ থাকে। কেবলমাত্র শিবচতুর্দশী উৎসবের সময় সাধারণে শিবলিঙ্গের দর্শন পাইয়া থাকেন। শোনা যায়, অতীতে এই স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে গভীর বেতবনের মধ্যে এই অনাদি লিঙ্গ অবস্থান করিত। পরে জনসমাজে ইহার পূজা প্রচলন সম্পর্কে রাখালের গাভী কর্তৃক গভীর বনে প্রবেশ করিয়া অন্যের অলক্ষ্যে শিবলিঙ্গের মস্তকোপরি দুগ্ধদান ইত্যাদি বাংলা দেশে বহুল প্রচলিত কিংবদন্তীটি এই স্থানেও শুনিতে পাওয়া যায়। মন্দিরাভ্যন্তরের দেওয়ালগাত্রে একটি কুলঙ্গির মধ্যে পিতল নির্মিত শিবের দণ্ডায়মান রুদ্রমূর্তি, পিতলের চতুর্ভুজা জয়দুর্গা মূর্তি, গৌরীপট্টসহ দুইটি শিবলিঙ্গ এবং প্রায় ১৮ ইঞ্চি ব্যাসার্ধযুক্ত একটি গোলাকার শিলায় খোদিত অষ্টদল পদ্ম আছে। অষ্টদল পদ্মটিকে সূর্যের ধ্যানে নিত্য পূজা করা হয়। ইহা ভিন্ন, চারিদিকে রূপানাদি অস্ত্রসস্ত্র খোদিত একটি শিলামূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইহা কোন বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি হইবে।

জগমোহনের অভ্যন্তরে এবং মূল মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বাম পার্শ্বে উচ্চতায় প্রায় ৪½ ফুট ও দৈর্ঘে-প্রস্থে দেড় ফুট চতুষ্কোণ একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের উপর খোদিত বিষ্ণু পাদপদ্ম আছে। ইহার সম্মুখভাগে প্রস্ফুটিত পদ্ম ও কূর্ম মূর্তি, বাম পার্শ্বে শঙ্খ ও গদা এবং দক্ষিণ পার্শ্বে চক্র খোদিত। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বাঁধান বেদীর উপর প্রায় ১০ ইঞ্চি উচ্চ ও ৭ ইঞ্চি প্রস্থ বিশিষ্ট প্রস্তর নির্মিত হস্তীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট দুই হস্তে অস্ত্রধৃত একটি পুরুষ মূর্তি আছে। ইনি মন্দিরের দ্বারপালরূপে পরিচিত।

ইহা ব্যতীত, জগমোহনের মধ্যে অন্যান্য আরোও কয়েকটি প্রস্তর মূর্তি রক্ষিত আছে। যেমন, দুই হাত উচ্চ ও এক হাত প্রস্থ বিশিষ্ট একটি কৃষ্ণ প্রস্তরে খোদিত নিম্নভাগে ময়ূরসহ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান পুরুষ মূর্তি (সম্ভবতঃ কার্তিক), অনুরূপ আকৃতির একটি শিলায় খোদিত নিম্নভাগে মূষিকসহ গণেশ মূর্তি, প্রস্তরে খোদিত (২½ × ১¼ হাত) প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান এবং নিম্নভাগে দুই পার্শ্বে

দুইটি নারীমূর্তিসহ একটি বিষ্ণুমূর্তি, পদ্মের উপর বংশীবাদনের (বাঁশী নাই) ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান কৃষ্ণ মূর্তি এবং একটি প্রস্তর নির্মিত গোলাকার গড়ুরাসনের উপর রঘুনাথ শিলাসহ দ্বাদশটি শিলা রক্ষিত আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উপরিউক্ত কার্তিক ও গণেশ মূর্তিদ্বয়ের হস্ত-পদ ভগ্ন।

নাটমন্দিরের দেওয়ালগাত্রের সহিত হেলান দিয়া একটি চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি রক্ষিত আছে। এই মূর্তিটিরও নীচের দুই হাত এবং হাঁটুর নীচের অংশ সম্পূর্ণ ভগ্ন।

হটনগর মহাদেব বিশেষ জাগ্রত ঈশ্বর বলিয়া সকলের বিশ্বাস। প্রায় প্রতিদিনই শিবলিঙ্গ দর্শন করিতে এবং পূজাদি দিতে মন্দিরে লোকসমাগম হয়। রোগব্যাধি নিরাময়ের জন্য অনেকে মন্দিরে 'হত্যা' দিয়া থাকেন এবং দৈব ঔষধ পাইয়া অনেকে নিরাময় লাভ করেন বলিয়াও শোনা যায়।

প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দশী তিথিতে মহা ধূমধামের সহিত হটনগর শিবকে কেন্দ্র করিয়া শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হয় মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথি হইতে। এইদিন হইতে মন্দির সংস্কার ও মন্দিরাভ্যন্তরে গৌরীপট্টের মধ্যস্থিত গহ্বরে সারা বৎসর যে ফুল-বেলপাতা ও পঞ্চামৃত জমা হইয়া থাকে তাহা প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া তুলিয়া ফেলা হয় এবং এইরূপে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের একাদশী তিথিতে সম্পূর্ণ পঞ্চামৃত তুলিয়া গহ্বরটি পরিচ্ছন্ন করা হয়। এইদিন সন্ধ্যায় অগণিত নরনারী শিবলিঙ্গ দর্শনের জন্য মন্দিরে আসিয়া সমবেত হন এবং সন্ধ্যারতির পর দলে দলে তাঁহারা শিবলিঙ্গ দর্শনের জন্য মন্দিরে প্রবেশ করেন। দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য উক্ত গহ্বরের মধ্যে দড়িতে বাঁধিয়া একটি ঘৃত প্রদীপ নামাইয়া দেওয়া হয়। ঐ স্বল্পালোকে যতদূর দেখা যায় তাহাতে দর্শকেরা বলেন শিবলিঙ্গের মস্তোকপরি একটি ধাতু নির্মিত সর্প বেষ্টিত আছে। এইরূপে পরপর তিনদিন ভক্তরা শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া থাকেন এবং বৎসরের মধ্যে কেবলমাত্র এই তিনদিন শিবলিঙ্গের উদ্দেশ্যে পঞ্চামৃত প্রদান করা হয় না। চতুর্দশীর দিন হইতে পুনরায় শিবলিঙ্গের উদ্দেশ্যে পঞ্চামৃত প্রদান করা হয়। এইদিন প্রত্যুষে মঙ্গলারতির পর সারাদিনব্যাপী যথারীতি অভিষেক ও পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রিকালে চার প্রহরে অন্নভোগ দিয়া চারবার আনুষ্ঠানিক পূজা হয়। উৎসবের দিন আশপাশের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বহু নরনারী মন্দির সংলগ্ন শিবকুণ্ড নামক পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া পূজাদি দিয়া থাকেন। পাহাড়ী পদবীধারী ব্রাহ্মণেরা বংশ পরম্পরায় শিবের নিত্য পূজাদি করিতেছেন। পূজাদির তত্ত্বাবধানের জন্য ভাণ্ডারী, ঘণ্টাবাদক 'ঘড়িয়া', ভোগরন্ধন কার্যে সাহায্যকারী 'টহলীয়া', ভোগরন্ধনকারী 'কুশিয়া' আছেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং পুরুষানুক্রমে মন্দিরে কাজ করিবার জন্য দেবোত্তর জমি ভোগ দখল করিতেছেন। তাহা ছাড়া, সানাই বাদক, ঢাকী ও কীর্তনীয়ার দল আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মন্দিরে কীর্তনগান হয়।

শিবচতুর্দশী তিথি হইতে আটদিনব্যাপী মন্দির প্রাঙ্গণ ও সম্মুখস্থ রাস্তার দুই পার্শ্বে একটি বৃহৎ মেলা বসে। নিকটবর্তী বিভিন্ন থানা হইতে মেলায় প্রায় বিশ সহস্র নরনারীর সমাগম হয় এবং প্রায় তিনশত দোকানপাট বসে। মেলায় বিভিন্ন প্রকার খাবার ও মনিহারী দোকান ব্যতীত কাপড়চোপড়, জুতা, বাসনপত্র, পাথরের পাত্র, কাঠের আসবাবপত্র, কৃষি ও কারিগরী যন্ত্রপাতি, মাটির হাঁড়ি-কলসী, মাদুর, তালপাতার পাখা, ফলমূল, শাকসব্জী ইত্যাদির দোকান বসে। তাহা ছাড়া, ব্রাহ্মণেরা ফুল নৈবেদ্য ও গোয়ালারা পঞ্চামৃতের অনেকগুলি দোকান দেন। নৈবেদ্য ও পঞ্চামৃতের দোকানের জন্য মন্দির প্রাঙ্গণে একটি এলাকা নির্দিষ্ট করা আছে। মাটির হাঁড়ি-কলসী, মাদুর ও ডাব মেলায় অধিক আমদানী হইয়া থাকে।

এগরার বামুনপাড়ায় একটি মাটির ঘরে জগন্নাথদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। নিত্য পূজা ব্যতীত, প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে সমারোহের সহিত রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং তদুপলক্ষে একটি মেলা বসে। এই মেলায় নানাবিধ জিনিসপত্রের শতাধিক দোকানপাট বসে। উৎসবটি প্রাচীন এবং স্থানীয় ব্রাহ্মণ পরিবার দ্বারা পরিচালিত হয়।

ইহা ভিন্ন, বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখে কৃষ্ণসাগর দীঘিতে একটি নৌকা ভাসাইয়া উহার মধ্যস্থলে পিতল নির্মিত শিবদুর্গা মূর্তি স্থাপন করিয়া একুশদিনব্যাপী প্রতিদিন অপরাহ্নে নৌকা বিহার উৎসব ও শিবদুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি মন্দিরে উক্ত শিবদুর্গা প্রতিষ্ঠিত আছে।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

দক্ষিণ চৌমুখ গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তিতে মহাকালীপূজা উপলক্ষে দেবীর মন্দিরের সম্মুখে প্রায় দুই বিঘা জমির উপর দশ-বারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় প্রত্যহ গড়ে দেড় সহস্র নরনারী মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, খেলনা, কৃষিজাত দ্রব্যাদি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতির প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়; তবে কাঁথি ও অমর্ষি হইতে তাঁতের কাপড়চোপড় মেলায় আমদানী হইয়া থাকে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাসের দল আসে এবং হাডু-ডু প্রতিযোগিতা ও যাত্রাভিনয় হয়। কেহ কেহ লটারী খেলিয়া থাকেন। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ-ছয়শত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

বাথুয়াড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে কালীপূজা উপলক্ষে কালীমন্দির প্রাঙ্গণে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এবং সাধারণতঃ বিকালের দিকেই মেলায় লোকসমাগম হয়।

এগরা থানার ৪নং, ৫নং ও ১৫নং এবং কাঁথি থানার ১নং ও ২নং ইউনিয়নগুলির অন্তর্গত গ্রামগুলি হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, ঔষধপত্র, মাটির খেলনা-পুতুল, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র ইত্যাদির কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয় হয়।

গোষ্ঠপূজার মেলা

মানিকাদিঘী গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গোষ্ঠ-পূজা উপলক্ষে গ্রামের 'মানিকাদীঘির' উত্তর-পূর্ব পাড়ে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটী সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

আশপাশের জাগুলিয়া, খুরুটিয়া, হাঁসাড়িয়া, বরসী, অর্জ্জুনী, মাহারাইপুর, জনকা প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের পাঁচশত নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী প্রভৃতি জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকানপাট বসে এবং আমোদপ্রমোদের জন্য ভাগবত পাঠ, কীর্তনগান এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

কাল্যাণপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন উপলক্ষে স্থানীয় একটি পুকুর পাড়ে প্রায় চার বিঘা পরিমাণ জমিতে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশপাশের গ্রামগুলি হইতে মেলায় প্রায় চারশত লোকজন আসেন এবং ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, জামা-কাপড়, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল ইত্যাদির প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। মেলায় যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

পৌষসংক্রান্তির মেলা

সাহাড়দা (মৌজা নং ১৬৬) গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি উপলক্ষে গ্রামের শীতলামন্দির সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ বসিতেছে।

এরেন্ধা, সুলতানপুর, কোটগেড়িয়া, হরিচক, খেজুরদা প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে মেলায় প্রায় সাত সহস্র নরনারীর সমাগম হয় এবং মনিহারী, তেলেভাজা, মিষ্টান্ন, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি রকমারী জিনিসপত্রের শতাধিক দোকান-পাট বসে।

রথযাত্রার মেলা

গহবী গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে রঘুনাথজীউর মন্দির সম্মুখস্থিত

প্রায় এক বিঘা জমির উপর আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। প্রধানতঃ বিকালের দিকেই মেলায় লোকসমাগম হয়।

আশপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতিদিন সবসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয়শত নরনারী প্রধানতঃ হাটিয়া মেলায় আসেন এবং মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, শিপুর গ্রাম হইতে মাটির পুতুল ও হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি নানাবিধ জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান-পাট বসে।

রাসযাত্রার মেলা

ডুবদা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাস ও কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে প্রায় সাত-আট বিঘা জমির উপর সপ্তাহকালব্যাপী মেলা বসে। মেলা দুইটিই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

এগরা, বালিঘাই, ছত্রি, বরদা, চোরপালিয়া প্রভৃতি আশপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারী হাটিয়া মেলায় আসেন। বিক্রেতাগণের অধিকাংশই স্থানীয় এবং মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় দেড়শত দোকানপাট বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ক্রীড়ানুষ্ঠান, ম্যাজিক প্রদর্শনী, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় তিন-চার সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।



থানা ঃ তমলুক

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ হোগলবেড়্যা। ১৪।৩৩০'২০।২১৫।১.০১২

(ক) হিন্দু। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন তমছায়া হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে শীতলাপূজা, পৌষ মাসে পৌষপার্বণ, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি ও হরিঠাকুরের চাঁচর উৎসব এবং চৈত্র মাসে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রাচীন।

(ঙ) শীতলাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে মেলায় লোকজন এবং বিক্রেতাগণ আসেন এবং প্রায় একশত দোকানপাট বসে। মেলায় সার্কাস, লটারীখেলা, ম্যাজিক, যাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

(চ) গ্রামে একটি সাধারণ মন্দিরে হরনাথ শিব, পঞ্চানন্দ, জরাসুর, মনসা, রক্তাবতী, শীতলা, ওলাবিবি, হরিঠাকুর প্রভৃতি দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী সামন্ত, শিক্ষক.
গ্রাম : পাওন্দা. পোঃ ঃ রামতারকহাট,
মেদিনীপুর।

২। গ্রাম ঃ বল্লুক। ১৬।২৫৪' ৩৭।৩১০।১,৮০৫

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, সুবর্ণবণিক ও তাঁতী। গ্রামটিতে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন মেচাদা হইতে বর্ষাকাল ব্যতীত বৎসরের অন্যান্য সময়ে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও রাসযাত্রা উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, চৈত্র মাসে চড়ক ও গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে এক সপ্তাহব্যাপী। দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী। কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। রাসের মেলা। কার্তিক মাসে চারদিনব্যাপী। চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। উল্লিখিত মেলাগুলি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির, একটি শীতলামন্দির, একটি মনসামন্দির এবং একটি চণ্ডীমন্দির আছে। শিব-মন্দিরে দেড় ফুট উচ্চ প্রস্তর নির্মিত মদনগোপালজীউ নামে খ্যাত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীসন্তোষ কুমার মান্না, শিক্ষক,
গ্রাম : বামনপাড়া. পোঃ ধলহরা.
মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম ঃ হুড়িনান। ৩৫।৩৮০'০১।৩০০।১,২৪৯

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য ও কামার।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কোলাঘাট হইতে পি, ডব্লিউ, ডি, বাঁধের উপর দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে হুড়েশ্বরীদেবীর পূজা এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন ও সর্বজনীন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন। মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত নরনারী আসেন। প্রধানতঃ মিষ্টান্ন, মনিহারী প্রভৃতির প্রায় কুড়িটি দোকান বসে।

(চ) গ্রামে একটি শীতলা, একটি মনসা, একটি শিব এবং হুড়েশ্বরী নামে এক গ্রাম্য দেবী আছে। হুড়েশ্বরীদেবীর নামানুসারেই গ্রামটির নাম হুড়িনান হইয়াছে।

শ্রীঋষিকেশ চক্রবর্তী, প্রধান পণ্ডিত,
হুড়িনান প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ খারুই, মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম কাঁকট্যা। ৪৩।২৩৫'৫৬।১৫০।৭৩৫

(ক) হিন্দু। গ্রামে বাজারপাড়া, কুমারপাড়া,

পাত্রপাড়া, জেলেপাড়া, পশ্চিমপাড়া প্রভৃতি নামে পাচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মেচেদা হইতে তমলুক-কাঁকটাা রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের সাত-আটশত নরনারী হাটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী ইত্যাদির প্রায় পচিশটি দোকান বসে এবং ম্যাজিকের দল আসে ও যাত্রাভিনয় হয়।

(চ) সাধারণের একটি মাটির ঘরে শীতলা, মনসা, শিব, ওলাবিবি প্রভৃতি দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীশশিভূষণ নায়ক, প্রধান পণ্ডিত,
কাকটাা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম : সাবল আড়া। ৪৫।৩৩২'৯৩।২৫৫।১,২৪৭

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, ডোম, তাঁতী, ধোপা, নাপিত ও মুসলমান। গ্রামটি তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মেচেদা হইতে তমলুক-মেচেদা রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে বিন্ধ্যবাসিনীপূজা এবং চৈত্র মাসে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন।
বিন্ধ্যবাসিনীপূজার মেলা। মাঘ মাসে তিনদিন-ব্যাপী।
গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাগুলি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালীমন্দির আছে। কালীমন্দির সংলগ্ন একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া ভক্তরা মানসিক করেন। কালীমন্দিরে অনেকে সন্তান কামনায় মানসিক করিয়া থাকেন।

শ্রীগুণধর মাইতি, শিক্ষক,
গ্রাম : বিদ্রোহীনগর, পোঃ ডিমারীহাট,
মেদিনীপুর।

৬। গ্রাম : টুলা (মৌজা : টুলিয়া যাদুবাড়)।
৫৬।২৮১'০২।১৮০।৮৪৭

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কামার, তাঁতী ও গোয়ালা। গ্রামটিতে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন পাশকুড়া হইতে তমলুক পাঁশকুড়া রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমা তিথিতে শীতলাপূজা এবং চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) শীতলাপূজার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি সাধারণের ইষ্টক নির্মিত মন্দিরে শিব, কালী, রাধাকৃষ্ণ, মনসা, শীতলা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামে একটি প্রাচীন বিরাট দীঘি আছে।

শ্রীপ্রমথ নাথ বেরা, শিক্ষক,
গ্রাম : টুলা, পোঃ চনশ্বরপুর,
মেদিনীপুর।

৭। গ্রাম : শিউরী (মৌজা : শিরুই)।
৭৪।৫৭১'৪৯।২৮৫।১,৪৪৮

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামটিতে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মেচেদা হইতে তমলুক-মেচাদা রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে রাধাকৃষ্ণের রথযাত্রা এবং দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি সর্বজনীন এবং গত প্রায় পয়ত্রিশ বৎসর যাবৎ অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে এক সপ্তাহব্যাপী। মেলাটি গত প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবৎ বসিতেছে।

(চ) গ্রামে রাধাকৃষ্ণ, একটি বাবাঠাকুর, একটি শীতলা এবং একটি মনসা আছে।

শ্রীঅমূল্য রতন জানা, প্রধান শিক্ষক,
শিউরী মাতঙ্গিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৮। গ্রাম ঃ সালিকা ধনি চক।

১২২।৩৩৮'০৪।১৩০।৬৮৭

(ক) হিন্দু। গ্রামটিতে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে হরিদাসপুরের পাকা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আশপাশের গ্রামগুলি হইতে বহু নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। উৎসবটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি ইষ্টক নির্মিত মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীসুধীর কুমার হালদার, গ্রামসেবক,
গ্রাম ও পোঃ চন্দ্রপুর,
মেদিনীপুর।

৯। গ্রাম ঃ কামারবাড়। ১৩২।২১৭'০০।১০৫।৫০৩

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে পনরটি পাড়া আছে।

(গ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে তমলুক-পাঁশকুড়া রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়। তাহা ছাড়া, রূপনারায়ণ নদীতে নৌকা করিয়া গ্রামে যাওয়া যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন ও মহাধুমধামের সহিত শীতলাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। মহরম উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি মাত্র ছয় বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে দুইটি শিবমন্দির এবং একটি শীতলামন্দির ছাড়া 'কামারগঞ্জ পুষ্করিণী' নামে একটি বিরাট দীঘি আছে। জনশ্রুতি আছে যে, গ্রামের জনৈক কামার পুষ্করিণীটি খনন করান।

শ্রীসন্তোষ কুমার মণ্ডল, শিক্ষক,
গ্রাম : কামবরবাড়, পোঃ কেলোমাল,
মেদিনীপুর।

১০। গ্রাম ঃ যোগীখোপ। ১৫২।২০৮'৩৪।১০০।৮৫৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য ও ডোম। গ্রামটি দুইটি পাড়ায় বিভক্ত।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে তমলুক রেলওয়ে বাস সার্ভিসের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। দুর্গাপূজা উপলক্ষে উৎসব প্রাঙ্গণে কয়েকটি দোকানপাট বসে।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে চারটি শিবমন্দির, একটি শীতলামন্দির, একটি রাসমঞ্চ ও একটি চণ্ডীমণ্ডপ ব্যতীত ষষ্ঠীতলা এবং একটি পীরের আস্তনা আছে।

শ্রীবিজয় কৃষ্ণ গাড়াইত, কৃষিজীবি,
গ্রাম : যোগীখোপ, পোঃ কাকগাছিয়া,
মেদিনীপুর।

১১। গ্রাম ঃ কিসমত পুতপুত্যা (মৌজা ঃ পুতপুত্যা)।

১৬৩।৯৯৩ ৩৫।৪২৫।২,২৪৫

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, জেলে, রজক ও তাঁতী। গ্রামটি দুইটি পাড়ায় বিভক্ত।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে তমলুক-পাঁশকুড়া রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ মাসে রক্ষাকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। মাঘ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি শিবমন্দির ও শীতলা আছে।

শ্রীহৃষিকেশ ভৌমিক, প্রধান শিক্ষক,
কিসমত পুরুষোত্তমপুর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

১২। গ্রাম ঃ নিমতোড়ী। ২৭০।২৮০'৩৬।২০৫।৮৭১

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, নাপিত, গোয়ালা, চামার ও তাঁতী। গ্রামটি তিনটি পাড়ায় বিভক্ত।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন নিমতোড়ী হইতে তমলুক-শ্রীরামপুর অথবা তমলুক-পুরুষাঘাট রোড রুটের মোটর-বাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে নয়দিনব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির এবং একটি কালীমন্দির ব্যতীত দক্ষিণা হরি, শীতলা, ওলাবিবি এবং রাধাবল্লভজীউ আছে।

জনশ্রুতি যে, পূর্বে গ্রামটির নাম নিমাইনগর ছিল; বর্তমানে নিমতোড়ী নামেই পরিচিত।

শ্রীবিপদ মাইতি, প্রধান শিক্ষক,
নিমতোড়ী বিদ্যালয়,
পো: উত্তর সাউতানচক, মেদিনীপুর।

১৩। গ্রাম ঃ কুলবেড়িয়া। ২৭৪।২৩৮'৭০।১৬৫।৪৯৮

(ক) মাহিষ্য, গোয়ালা, নাপিত ও তাঁতী।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে তমলুক-শ্রীরামপুর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ভীম একাদশী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রস্তুতি সাধারণতঃ কয়েকদিন পূর্ব হইতে আরম্ভ হয়। ভীমের দণ্ডায়মান মূর্তিটি প্রায় দশ ফুট উচ্চ। পদতলে শায়িত মৃত্যু ভয়ে ভীত জরাসন্ধের বাম উরুর উপর এক পা রাখিয়া তাহার দক্ষিণ পা খানি দুই হাতে আকর্ষণ করিয়া জরাসন্ধের শরীরকে দুইভাগে বিভক্ত করিবার ভঙ্গিতে ভীমের দণ্ডায়মান মূর্তি। পার্শ্বে দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে একটি বিল্বপত্র দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ইঙ্গিতে জরাসন্ধ নিধনে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। এই ভীম মূর্তির সহিত অন্যান্য নানা দেবদেবীর মূর্তিও থাকে। পূজাটি প্রায় সাতদিনব্যাপী চলে এবং প্রত্যহ পূজা শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ভীম একাদশীর মেলা। মাঘ মাসে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শীতলামন্দির এবং একটি ভীমমন্দির আছে।

শ্রীপ্রহ্লাদ চন্দ্র দাস, গ্রামসেবক,
তমলুক ১নং ইউনিয়ন ব্লক,
মেদিনীপুর।

তমলুক

পাঁশকোড়া হইতে মোটরযোগে মেদিনীপুর জেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থান তমলুকে যাইতে হয়। পাঁশকুড়া হইতে তমলুক ১৬ মাইল দূরে। ইহা রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তটে অবস্থিত।

প্রাচীনকালে তমলুক বহু নামে পরিচিত ছিল, যথা, তাম্রলিপ্তি, তাম্রলিপ্ত, তমোলিপ্তি, দামলিপ্তি, বিষ্ণুগৃহ, বেলাকূল ইত্যাদি। চৈনিক পর্যটকগণ ইহাকে তোমোলিতি ও "তমোলিত্তি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন পরকালে বাংলাদেশে দ্রাবিড় জাতির বিশেষ প্রাধান্য ছিল এবং তমলুক তাহাদেরই একটি প্রধান নগর ছিল। তামিল জাতি যে বাংলাদেশ হইতে দক্ষিণ-দেশে গিয়াছিলেন এবং তৎকালীন বাংলার রাজধানী তমোলিত্তি বা তাম্রলিপ্ত হইতে তামিল জাতির নামকরণ হইয়াছে, অনেকেই পণ্ডিত কনকসভাই পিলের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। দ্রাবিড়, দামল বা তামল তামিল জাতির আবাসস্থল তাম্রলিপ্তির আদি নাম সম্ভবতঃ

দামলিপ্ত ছিল। দ্রাবিড় সভ্যতার প্রাধান্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া আর্য্যগণ এই নগরের নাম "তমোলিপ্ত" বা অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত রাখেন বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করেন। পরে এই স্থানে আর্য্যসভ্যতার অভ্যুদয় হইলে তাঁহারা তমোলিপ্ত নামের ঘৃণাসূচক ব্যাখ্যারও পরিবর্ত্তন করেন। দ্রাবিড় বা দামল জাতিকে আর্য্যেরা ঘৃণাভরে অসুর বলিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের পরাজয়ের পর হইতেই তমোলিপ্ত "তাম্রলিপ্ত" বা "তাম্রলিপ্তি" নামে পরিচিত হয়। অসুরগণকে নিধনকালে কল্কিরূপধারী বিষ্ণুর দেহ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া এই স্থানে পতিত হওয়ায় ইহার পবিত্রতা সম্পাদিত হয়, এইরূপ একটি কাহিনীও আছে। এইজন্য আর্য্যগণ তমোলিপ্তের নাম দেন "বিষ্ণুগৃহ"।

মহাভারতে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যের উল্লেখ আছে। অনেকের মতে এখানে মহাভারতোক্ত তাম্রধ্বজ রাজার রাজধানী ছিল। তাম্রধ্বজ পাণ্ডবগণের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব ধারণ করেন ও মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাঁহার বীরত্বে প্রীত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন তাহার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। রাজা তাম্রধ্বজের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত কৃষ্ণার্জ্জুনের মূর্ত্তি এখনও তমলুকের রাজবাড়ীতে বিষ্ণুহরি নামে পূজিত হইতেছে। প্রায় ত্রিশ একর জমির উপর প্রাচীন রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। কথিত আছে, রাজা তাম্রধ্বজ ও তাঁহার রাণী এক প্রকাণ্ড দীঘি খনন করাইয়া তাহার মধ্যে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার সময় উভয়ে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ঐ দীঘিটি বর্ত্তমানে "খাটপুকুর" নামে পরিচিত।

জৈন কল্পসূত্র গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্তে চাতুর্যাম ধর্ম্ম প্রচার করেন।

বৌদ্ধগ্রন্থের নানাস্থানেও তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায়। তৎকালে ইহা সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল এবং তজ্জন্য ইহার অপর নাম ছিল বেলাকূল। তাম্রলিপ্ত বন্দরের খ্যাতি তখন সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সে সময়ে এখানে জাহাজ নির্ম্মিত হইত। কথিত আছে, যে বৎসর বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন সেই বৎসর বাংলার রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ তাম্রলিপ্তে নির্ম্মিত জাহাজ লইয়া সিংহলদ্বীপ জয় করেন। বিজয়-সিংহের নাম হইতেই সিংহল নামের উৎপত্তি হয়।

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশে উল্লিখিত আছে যে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০৭ অব্দে তাম্রলিপ্ত একটি প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর ছিল এবং ঐ স্থান হইতেই পবিত্র বোধিদ্রুম সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ভারতের প্রধান সঙ্ঘারাম তৎকালে তাম্রলিপ্তে অবস্থিত ছিল।

সম্রাট অশোক সাম্রাজ্যের নানাস্থানে ধর্ম্মানুশাসন ও ও ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করেন। অনুশাসনগুলি প্রস্তরস্তম্ভে খোদিত হইত। তাম্রলিপ্ত নগরেও একটি অশোকস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে চৈনিক পর্য্যটক য়ুয়ান্ চোয়াঙ উহা দেখিয়াছিলেন।

প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে যখন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ পৃথিবীর দিকে দিকে বুদ্ধদেবের বাণী বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে মহারাজ অশোকের পুত্র মহেন্দ্র সিংহলরাজ তিষ্যের আমন্ত্রণে খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪৩ অব্দে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসহ তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে সিংহলে যাত্রা করেন। তৎকালে ভারতবর্ষ হইতে সিংহল, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশে যাইবার জন্য তাম্রলিপ্ত প্রধান বন্দর ছিল। পরবর্ত্তীকালে গুপ্তরাজগণ, বঙ্গরাজ শশাঙ্ক ও সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন তাম্রলিপ্ত জয় করেন।

চৈনিক পর্য্যটকগণের লিখিত বিবরণ হইতে তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ইতিহাস বিশ্রুত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারত ভ্রমণে আগমন করেন এবং তাঁহার ভ্রমণকালের শেষ দুই বৎসর ৪১১-৪১২ খৃষ্টাব্দ তাম্রলিপ্ত নগরে অবস্থান করিয়া বহু বৌদ্ধগ্রন্থের প্রতিলিপি ও দেবমূর্ত্তির চিত্র গ্রহণ করেন। তিনি তাম্রলিপ্তে ২৪টি সঙ্ঘারাম ও বহু বৌদ্ধশ্রমণ দেখিয়াছিলেন।

য়ুয়ান্ চোয়াঙের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনিও তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যসম্পদ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত আছে যে তিনি সমতট অর্থাৎ বর্ত্তমান ঢাকা হইতে পশ্চিমদিকে নয় শত "লি" আক্রমণ করিয়া তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হন। তখন তাম্রলিপ্ত বঙ্গোপসাগরের উপকূলস্থ নিম্নভূমিতে

অবস্থিত ছিল। রাজ্যের পরিধি ছিল ১৪০০ "লি" এবং রাজধানীর বিস্তার ১০ লি'র অধিক ছিল। তাম্রলিপ্তে তখন ১০টি বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং এক হাজারের উপর বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। নগরের এক প্রান্তে প্রায় একশত ফুট উচ্চ একটি অশোকস্তম্ভ ছিল। ইহা ছাড়া যুয়ান্ চোয়াঙ তাম্রলিপ্তে ৫০টি হিন্দু মন্দির দেখিয়াছিলেন। অধিবাসীরা পরিশ্রমী, উদ্যোগী, সাহসী ও সমৃদ্ধ ছিলেন। যুয়ান্ চোয়াঙ আরও লিখিয়াছেন যে ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত সমুদ্রসলিলের দ্বারা প্লাবিত হইয়াছিল।

ইহার পর ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ই-চিং নামক আর একজন বৌদ্ধ পর্য্যটক সেঙ্ চউ নগর হইতে সমুদ্রপথে ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে তাম্রলিপ্ত নগরে আগমন করেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কয়েক বৎসর নালন্দার মহাবিহারে অবস্থান করিয়া পুনরায় তাম্রলিপ্ত হইতে জাহাজযোগে দক্ষিণদিকে গমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে তৎকালে তাম্রলিপ্ত রাজ্য উত্তর-দক্ষিণে চারিশত যোজন ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে তিনশত যোজনের অধিক ছিল। শ্রীনালন্দা ও "মহাবোধি" হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৬০ যোজন। ই-চিং তাম্রলিপ্তে পাঁচ-ছয়টি ধর্ম্মমন্দির দেখিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানের অধিবাসিগণকে ধনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ই-চিংয়ের পর আরও কয়েকজন বৌদ্ধ চৈনিক পর্য্যটক তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়া ভারতে আগমন করিয়াছিলেন এবং তাহারাও তাম্রলিপ্তের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন।

চীন সম্রাটের আক্রমণে আচার্য্য বোধিধর্ম্ম ৫২৬ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত হইয়া সমুদ্রপথে ক্যাণ্টন যাত্রা করেন। তাহার কাষায় বস্ত্র ও ভিক্ষা-ভাণ্ড জাপানের ইকরুগ মঠে বহুকাল সসম্মানে রক্ষিত ছিল। তিনি "প্রজ্ঞাপারমিতহৃদয়সূত্র" এবং "উষ্ণীষবিজয়ধারিণী" নামক বঙ্গাক্ষরে লিখিত দুইখানি গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। জাপানের প্রসিদ্ধ হোরিউজি মঠ হইতে ঐ গ্রন্থ দুইখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

একাদশ শতাব্দীতে ওড়িষ্যারাজ চোলগঙ্গাদেব মেদিনীপুর জয় করেন। সেই সময় হইতেই তাম্রলিপ্ত বন্দরের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। সমুদ্র ক্রমে ক্রমে এই স্থান হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়া এই প্রসিদ্ধ বন্দরকে বর্ত্তমানে একটি নগণ্য উপনগরে পরিণত করিয়াছে। বর্ম্মার পেগু জেলার কল্যাণী গ্রামে যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ পেগুতে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

তমলুকের বর্গভীমাদেবীর মন্দির একটি প্রাচীন কীর্ত্তি। ইহার শিল্পনৈপুণ্য অতি অপূর্ব্ব। সেই জন্য সাধারণ লোকের ধারণা যে ইহা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত। কবে এবং কাহার দ্বারা যে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। রূপনারায়ণ নদের তটে একটি উচ্চ ভূখণ্ডে উন্নত পাদ-পীঠের উপর এই মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরের উন্নত চূড়া বহুদূর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেকে অনুমান করেন। সম্রাট অশোক তাম্রলিপ্তে যে স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন উত্তর কালে তাহার উপরেই এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটির বহির্ভাগের গঠনপ্রণালী বাংলার স্থাপত্যরীতি হইতে পৃথক। ভিতরের গঠনপ্রণালী বৌদ্ধ বিহারের সদৃশ ও বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অনুরূপ। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব লুপ্ত হইলে কোন পরিত্যক্ত বৌদ্ধ বিহারই হিন্দুমন্দিরে পরিণত হয়। ৩০ ফুট উচ্চ বুনিয়াদের উপর মূল মন্দিরটি প্রায় ৬০ ফুট উচ্চ। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে মনে হয় যে ছাদটি যেন একখণ্ড অতি বৃহৎ প্রস্তরের চাপ হইতে কুঁদিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে। খাজ কাটিয়া প্রস্তর খোদাই করা হইয়াছে বলিয়াই ইহার শোভা হইয়াছে অতি অনুপম এবং কোথাও জোড় আছে বলিয়া ধরা যায় না। মূল মন্দিরটির সম্মুখে "যজ্ঞমন্দির" নামে আর একটি মন্দির আছে। এই দুইটি মন্দির "জগমোহন" নামে একটি খিলানের দ্বারা সংযুক্ত। যজ্ঞ-মন্দিরের সম্মুখে বলিদান ও গীতবাদ্যাদির জন্য "নাটমন্দির" আছে। উহার সম্মুখে তোরণ ও নহবৎখানা।

একখণ্ড প্রস্তরের সম্মুখ ভাগ কুঁদিয়া বর্গভীমা দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ধরণের নির্ম্মাণপ্রণালী বড় একটা দেখা যায় না। মূর্ত্তিটি উগ্রতারা মূর্ত্তির অনুরূপ। দেবীমূর্ত্তির বেদীর নিম্নে সোপানশ্রেণীর মধ্যে "ভূতিনাথ" ভৈরব অবস্থিত। বর্গভীমা দেবী বিশেষ জাগ্রত দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে বহুদেবমূর্ত্তি-ভগ্নকারী কালাপাহাড় উড়িষ্যা বিজয় অভিযানের পথে এই দেবীকে দর্শন করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হন এবং ফারসীতে একখানি দলিল লিখিয়া

দিয়া যান। "বাদশাহী পাঞ্জা" নামে অভিহিত দলিলখানি আজিও বর্গভীমার পূজকগণের নিকট আছে। দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয় বর্গীগণ নিম্নবঙ্গের সর্ব্বত্র নিদারুণ অত্যাচার করিলেও এই দেবীর ভয়ে তমলুকে কোন প্রকার অত্যাচার করিতে সাহস করিত না। বরং এই দেবীকে তাহারা বহু অলঙ্কারে সাজাইয়া ষোড়শোপচারে পূজা দিত।

বর্গভীমাদেবী একান্নপীঠের অন্তর্গত না হইলেও অনেকে ইহাকে উপপীঠ মনে করেন এবং সেই জন্য এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ একটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে তাঁহারা অপর কোন দেবী প্রতিমা গঠন করিয়া পূজা করেন না।

বর্গভীমা দেবীর প্রকাশ সম্বন্ধে তিনটি কিংবদন্তী আছে। প্রথম কিংবদন্তীর মতে সুপ্রসিদ্ধ ধনপতি সদাগর যখন সিংহলে বাণিজ্য-যাত্রা করেন তখন তাম্রলিপ্তে তিনি এক ব্যক্তির হস্তে একটি স্বর্ণ ভৃঙ্গার দেখিয়া সে উহা কোথায় পাইল তাহা জিজ্ঞাসা করেন। সে উত্তর দেয় যে নগরের প্রান্তবর্ত্তী অরণ্যে এক অদ্ভূত কুণ্ড আছে। উহার জলে পিতলের জিনিস ডুবাইলে তাহা সোনার হইয়া যায়। এই কথা শুনিয়া ধনপতি তাম্রলিপ্তের বাজারের সমস্ত পিতলের জিনিস কিনিয়া সেই কুণ্ডে ডুবাইয়া সমুদয় পিতলকে স্বর্ণ পরিণত করেন। সিংহল পত্তনে সেই সোনা বিক্রয় করিয়া তিনি বহু অর্থ লাভ করেন। গৃহে ফিরিবার সময় ধনপতি সেই কুণ্ডে আসিয়া বর্গভীমাদেবীর প্রতিষ্ঠা ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

দ্বিতীয় প্রবাদ অনুসারে একজন ধীবর রমনী তাম্রলিপ্ত-রাজ তাম্রধ্বজের রাজ সংসারে প্রত্যহ মাছের যোগান দিত। একদিন পূর্ব্বোক্ত অরণ্য পথে আসিবার সময় ধীবর রমণী উক্ত কুণ্ড হইতে কিছু জল লইয়া মৃত মৎস্যের উপর ছিটাইয়া দেয়। দেখিতে দেখিতে মৎস্যগুলি পুনর্জ্জীবন লাভ করে। এই সংবাদ তাম্রধ্বজের কর্ণগোচর হইলে তিনি ধীবর রমণীকে সঙ্গে লইয়া কুণ্ডটি দেখিতে যান। কিন্তু কুণ্ডের পরিবর্ত্তে সেখানে একটি বেদী ও তদুপরি এক প্রস্তরময়ী দেবী মূর্ত্তি দেখিতে পান। তাম্রধ্বজ তথায় একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেবীর যথাবিহিত পূজার ব্যবস্থা করেন।

তৃতীয় প্রবাদ অনুসারে কৈবর্ত্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কালু ভুঁইয়া বর্গভীমাদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাচীন কাল হইতেই তাম্রলিপ্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েরই নিকট প্রসিদ্ধ স্থান। পুরাকালে ইহা হিন্দুগণের একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র ছিল। ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে দক্ষযজ্ঞে শিব দক্ষকে নিহত করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে দক্ষের ছিন্ন মস্তক তাঁহার হস্তে আবদ্ধ হইয়া যায়। পাপ-মোচনের জন্য শিব বহু তীর্থে ভ্রমণ করেন, কিন্তু হস্ত হইতে কপাল বা মস্তক কিছুতেই মুক্ত হয় না। অতঃপর বিষ্ণুর নির্দ্দেশক্রমে তিনি তমলুকের একটি অজ্ঞাত তীর্থে আসিয়া স্নান করায় দক্ষ-শির তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হয়। এই জন্য এই তীর্থটির নাম হয় "কপাল-মোচন"। কপাল-মোচন সরোবরের নাম ও মাহাত্ম্য বহু গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। কালক্রমে এই সরোবরটি রূপনারায়ণ নদের কুক্ষিগত হইয়াছে। কিন্তু আজও প্রতি বৎসর বারুণী উপলক্ষে বহু নরনারী বর্গভীমাদেবীর মন্দিরের প্রান্তবাহী রূপনারয়ণে স্নান করিয়া কপাল-মোচন তীর্থ স্নানের পুণ্যকার্য্য সমাধা করেন।

তমলুকের খাট পুকুরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত একখানি পাথরকে লোকে "নেতা ধোপানীর পাঠ" নামে অভিহিত করে। মনসার ভাসান গানে উল্লিখিত আছে যে নেতা ধোপানীর সহায়তায় বেহুলা মৃত পতি লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। পৌষ সংক্রান্তির সময়ে এখানে একটি বৃহৎ মেলা হয়।

তমলুকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর একটি মন্দির আছে। কথিত আছে যে গৌরাঙ্গ দেবের অন্যতম পার্ষদ বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

(পূর্ব্ববঙ্গের রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত "বাংলায় ভ্রমণ" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।)

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

সাবল আড়া গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালী-পূজা উপলক্ষে দেবীর মন্দির সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী মোটর গাড়ী এবং রিক্সা করিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়-জামা, ঔষধপত্র, বই-ছবি, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় কুড়ি পঁচিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কীর্তনগান এবং যাত্রাভিনয় হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য সাবল আড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত বিন্ধ্যবাসিনী-পূজার মেলা এবং গাজনের মেলা উল্লিখিত কালীপূজার মেলার অনুরূপ।

কিসমত পুতপুত্যা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে রক্ষা-কালীপূজা উপলক্ষে একটি খোলা মাঠে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম এবং গোপীনাথপুর, কুরপাই, কালিকাপুর, পূর্বমুখী, পুতপুত্যা, শ্রীরামপুর, রাজনগর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় দুই সহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড় এবং অন্যান্য রকমারি জিনিসপত্রের প্রায় পঁয়ত্রিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য খেলাধূলা, নাচগান, চণ্ডীগান, কবিগান, যাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচশত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

নিমতোড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন স্থানে নয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম ছাড়া মহিষাদল থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী প্রধানতঃ মোটর গাড়ী এবং সাইকেলে করিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বই ছবি, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় পনর-কুড়িটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, নামকীর্তন ও যাত্রা ভিনয়ের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

ভীম একাদশীর মেলা

কুলবেড়্যা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ভীম একাদশী পূজা উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন প্রায় পনর বিঘা জমির উপর সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম এবং তমলুক থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় আট-দশ সহস্র নরনারী প্রধানতঃ মোটরবাস এবং গরুর গাড়ী করিয়া মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, ঔষধপত্র, হাঁড়িকুড়ি, খেলনা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক ও পুতুলনাচের দল আসে এবং কবিগান খিয়েটার, ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। অনেকে জুয়া বা লটারী খেলিয়া থাকেন।

দুর্গাপূজার মেলা

কামারবাড় গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

আশপাশের সমস্ত ইউনিয়ন এবং তমলুক হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারী মোটর গাড়ী করিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, তামা-পিতলের থালা-বাসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, দা-কাস্তে, ধামা-কুলা,

বিস্কুট-লজেন্স ইত্যাদি রকমারি পণ্যের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে। প্রধানতঃ তমলুক হইতেই প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক ও নাগরদোলার দল আসে এবং কবিগান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়। কোন কোন বৎসর কলিকাতা হইতে বিখ্যাত পেশাদারী যাত্রাদল আসে।

দোলযাত্রার মেলা

সালিকা ধনি চক গ্রামে প্রতি বৎসর রাধাকৃষ্ণের দোল-যাত্রা উৎসব উপলক্ষে প্রায় পাঁচ বিঘা দেবোত্তর জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিন সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা বেশী। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশের ঝুড়ি-চুপড়ী-মোড়া প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় সত্তরটি দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণ স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয় না।

রথযাত্রার মেলা

বল্লুক গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে গ্রামের হাটখোলায় প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশপাশের গ্রামগুলি হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিন সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, ঔষধপত্র, লাঙল-কোদাল ইত্যাদির প্রায় একশত দোকান বসে। মেলার বিক্রেতারা-স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক ও পুতুলনাচের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় দুই-তিন সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বল্লুক গ্রামে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার মেলা, কালীপূজার মেলা, রাসযাত্রার মেলা ও চড়কের মেলা উল্লিখিত মেলা বিবরণের অনুরূপ।

শিউরী গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে রাধাকৃষ্ণের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে একটি মাঠে সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবৎ শুরু হইয়াছে।

আশপাশের গ্রাম হইতে প্রতি দিন সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী নৌকা ও মোটর গাড়ী করিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, জামাকাপড়, বই-ছবি, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় শতাধিক দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণ স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, সার্কাস ও লটারী খেলার দল আসে এবং জলসা, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

শীতলাপূজার মেলা

টুল্যা গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের দোলপূর্ণিমায় শীতলাপূজা উপলক্ষে শীতলামন্দির সংলগ্ন প্রায় চার বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় আট-দশ সহস্র নরনারী মোটর গাড়ী, রিক্সা করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, জামা-কাপড় প্রভৃতি জিনিসপত্রের দোকান বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য মেলায় কোন কোন বৎসর যাত্রাগানের ব্যবস্থা করা হয়।

থানা ঃ পাঁশকুড়া

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ জিয়াখালি। ৪০।৯২০'১৩।৫৩৪।২'৬৮৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, কামার, কুমার, মালাকার, বাগ্দী, দুলে, হাড়ী, ডোম, ঘোড়ই ও তিলি। গ্রামটি পাঁচটি পাড়ায় বিভক্ত।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে ঘাটাল-পাশকুড়া পাকা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়। তাহা ছাড়া, রেলস্টেশন হইতে রূপনারায়ণ নদীতে নৌকা করিয়া গ্রামে যাওয়া যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে রঘুনাথজীউর রথযাত্রা উৎসব ও দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি ব্যক্তি-বিশেষের এবং প্রায় গত পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবৎ অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে আটদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের একটি মন্দিরে রঘুনাথজীউর শিলামূর্তি এবং কয়েকটি হরিমন্দির ব্যতীত, শীতলা, পঞ্চানন্দ, রাবাঠাকুর, মনসা, গঙ্গা, কালী প্রভৃতি দেবদেবী আছে।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ সাহু, গ্রামসেবক,
পোঃ কেশপাট, মেদিনীপুর।

২। গ্রাম ঃ রাতুলিয়া দলবাড়।
১২২।৩২৫'১৩।৬১।৩০৯

(ক) মাহিষ্য, মুচি, সাঁওতাল ও মুসলমান। গ্রামে মুসলমানপাড়া, মুচিপাড়া ও সাঁওতালপাড়া নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন হাউর হইতে মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় নব্বই বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় নব্বই বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির আছে।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র মেটা্যা, শিক্ষক,
গ্রাম : রাতুলিয়া দলবাড়, পোঃ রাতুলিয়া,
মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম ঃ ঘোষপুর। ১৩৯।১১৪'৩৫।৬৭।৩৭১

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, তিলি ও নাপিত। গ্রামে সামন্তপাড়া, নন্দীপাড়া, দেপাড়া, পশ্চিমপাড়া নামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন হাউর হইতে রাতুল্যা-বাজার-বোম্বাই রোডে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, ভাদ্র মাসে ঝুলনযাত্রা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে নাটমন্দিরসহ সুউচ্চ ইষ্টক নির্মিত দ্বিতল মন্দিরে লক্ষ্মীবরাহজীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, একটি শীতলামন্দির আছে।

শ্রীচিত্তরঞ্জন নন্দী, গ্রামসেবক,
ঘোষপুর ১১নং ব্লক,
মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম ঃ কুণ্ডরপুর। ১৬৮।৭২'২৮.২১।১১৫

(ক) মাহিষ্য প্রধান গ্রাম।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন হাউর।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে নৌকেশ্বর শিবের রথযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে হটেশ্বর শিবমন্দিরে চড়ক-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) চড়কপূজার মেলা। চৈত্র মাসে আটদিনব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে হটেশ্বর শিবের একটি মন্দির আছে।

শ্রীপান্নালাল সিংহ, শিক্ষক,
কুত্তরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ আমদান, মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম : বেগুনবাড়ী (মৌজা : সরাইঘাটা)। ১৮১।২২৩'৯৫।১০৪।৪৬৯

(ক) ব্রাহ্মণ, বর্গক্ষত্রিয় ও মাহিষ্য। গ্রামটিতে উত্তরপাড়া ও দক্ষিণপাড়া নামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন খেরাই হইতে কাঁসাই নদীর বাঁধের উপর দিয়া রিক্সায় করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) স্থানীয় বর্গক্ষত্রিয় সম্প্রদায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি কালীমন্দির। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিণী কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে উৎসবের দিন শতাধিক পাঁঠা বলি হয়।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে দশদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালীমন্দির আছে।

শ্রীতারা মাঁতরা, সমাজসেবক,
গাম : নবাসন, পোঃ বাগনান,
হাওড়া।

৬। গ্রাম : মাগুরী জগন্নাথচক। ১৯৬।৫৭৫'২১।১৮৫।১,০৫৬

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, ধোপা ও কুমার। গ্রামে মাহিষ্যপাড়া ও কুমারপাড়া নামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে পাঁশকুড়া-প্রতাপপুর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) চড়কপূজার মেলা। চৈত্র মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন ভগ্নপ্রায় শিবমন্দির ব্যতীত শীতলাঠাকুর আছে।

শ্রীহরিপদ মাইতি, গ্রামসেবক,
পাঁশকুড়া ১নং ব্লক, হরিনারায়ণচক,
মেদিনীপুর।

৭। গ্রাম : কেশিয়াড়ী ভুঞ্যাবাড়। ২০৩।২৪৭'৮৫।১৫৫।৮০২

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, গোয়ালা, জেলে, ধোপা, নাপিত, কামার, স্বর্ণকার, দুলে ও মুসলমান। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, গোয়ালাপাড়া, জেলেপাড়া, ধোপাপাড়া, নাপিতপাড়া, কামারপাড়া, স্যাক্‌রাপাড়া, মাহিষ্যপাড়া, দুলেপাড়া, সুবর্ণবণিকপাড়া ও মুসলমানপাড়া নামে এগারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে তমলুক-পাঁশকুড়া রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন, জ্যৈষ্ঠ মাসে গঙ্গাপূজা এবং কার্তিক মাসে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উৎসবটি প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে সপ্তাহকালব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) ১২৪৮ বঙ্গাব্দে জনৈক ব্রাহ্মণ এই গ্রামে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে প্রায় দুই ফুট উচ্চ কাশীশ্বর নামে খ্যাত একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মন্দিরটি জীর্ণ হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে একটি নূতন মন্দির নির্মাণ করিয়া উক্ত শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। গ্রামে একটি শীতলামন্দির আছে।

শ্রীঅনিল বরণ মণ্ডল, গ্রামসেবক,
পাঁশকুড়া ১নং ব্লক,
মেদিনীপুর।

৮। গ্রাম : জশাড়। ২৭০।১১৬'৯৭।১৪৩।৯০৮

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, তাঁতী, জেলে ও মুসলমান। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কোলাঘাট হইতে জশাড়-কোলাঘাট রোড দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা, পৌষ মাসে শীতলাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন।
দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী।
রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে চারদিনব্যাপী।
সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে চারদিনব্যাপী।
মেলাগুলি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ব্যতীত একটি পঞ্চানন্দ, একটি শীতলা, একটি মনসা, একটি দক্ষিণরায় ঠাকুর আছে। তাহা ছাড়া, মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি মস্‌জিদ আছে।

শ্রীনলিনী কান্ত মাইতি, শিক্ষক,
গ্রাম : জশাড়, পোঃ মোহনপুর,
মেদিনীপুর।

৯। গ্রাম ঃ দেউলিয়া (মৌজা ঃ মিহিটিকরী)।
৩০০।৫৩১`৬০।৩৮৫।২,২৩৯

(ক) ব্রাহ্মণ, মালাকর, তাঁতী, কুমার, কামার, চামার, মাহিষ্য ও মুসলমান। গ্রামে তেরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কোলাঘাট হইতে দেউলিয়া-কোলাঘাট মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব, ভাদ্র মাসে ধর্মরাজপূজা এবং পৌষ মাসে শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। ভাদ্র মাসে সপ্তাহকাল-ব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শীতলা, মনসা, পঞ্চানন্দ এবং শিব আছে।

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী, শিক্ষক,
দেউলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

১০। গ্রাম ঃ ভোগপুর। ৩০৯।৪৭৮`৭৫।৪৫৫।২,৬৭৬

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, নাপিত, হাড়ী, তেলী ও মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে এই গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে চন্দ্রেশ্বর শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটিই সর্বজনীন। গাজন উৎসবটি প্রাচীন তবে দুর্গাপূজাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে দুইদিন। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি দুর্গামণ্ডপ ও চন্দ্রেশ্বর শিব ব্যতীত শীতলা, মনসা, গঙ্গা ও কালুরায় ঠাকুর আছে।

শ্রীরামগোপাল ঘড়া, শিক্ষক,
ভোগপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

১১। গ্রাম ঃ রঘুনাথবাড়ী। ৩৩৩।১১৮`২৭।২১১।২৮৩

(ক) হিন্দু। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পাচ মাইল দূরে পাশকুড়া রেলস্টেশন। পাশকুড়া হইতে তমলুকগামী মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর শারদীয়া বিজয়াদশমী তিথিতে রঘুনাথজীউর রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রঘুনাথজীউর রথযাত্রা উপলক্ষে মেলা। আশ্বিন মাসে সপ্তাহব্যাপী। মেলাটি প্রায় আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মঠে লক্ষ্মণ ও সীতাসহ রঘুনাথজীউর-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, শিব, শীতলা ও কালী আছে।

শ্রীপঁচাপদ চক্রবর্তী, চাকুরী,
গ্রাম ও পোঃ রঘুনাথবাড়ী,
মেদিনীপুর।

১২। গ্রাম ঃ পূর্ব্ব চিল্কা। ৩৬০।৩৫১`০৬।২২৫।১,০২৩

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মৎস্য ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাশকুড়া এবং মোটরবাসে পুরুষোত্তমপুর আসিয়া সেখান হইতে হাটা পথে গ্রামে

যাতায়াত করা হয়। হরিদাসপুর অথবা রানীহাটী হইতে নৌকায়ও যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব, মাঘ মাসে রঘুনাথজীউর রাসযাত্রা উৎসব, ফাল্গুন মাসে শীতলাপূজা এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত পূজা ও উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে সপ্তাহকালব্যাপী মেলাটি প্রায় নব্বই বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কাশীশ্বর শিবমন্দির এবং রঘুনাথজীউর মন্দির আছে।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাস, সহকারী প্রধান শিক্ষক,
পূর্ব চিৎকা লালচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়,
পোঃ মহাড়োল, মেদিনীপুর।

উৎসব বিবরণী

রথযাত্রা

রঘুনাথবাড়ী গ্রামে একটি মঠের অন্তর্গত মন্দিরে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণসহ ভরত, শত্রুঘ্ন, বিভীষণ, মহাবীর ও জাম্বুবানের ধাতু নির্মিত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, মঠে মোহান্তদিগের বাসঘর, বহিরাগতদের বাসস্থান, ভাণ্ডার ও ভোগরন্ধন এবং গোয়াল ঘর আছে।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে হরিদাস নাগা নামে জনৈক পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ উল্লিখিত বিগ্রহাদিসহ এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তৎকালীন স্থানীয় ভূস্বামী রাজা রাজনারায়ণ রঘুনাথবাড়ী গ্রামের প্রত্তন করিয়া রঘুনাথজীউর মঠ স্থাপন করেন। অধিকন্তু নিত্য দেবসেবার নিমিত্তে তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত কাশীজোড় ও সাহপুর পরগণায় প্রায় ১,৮০০ বিঘা ভূসম্পত্তি দেবোত্তর স্বরূপ দান করেন। তদবধি এই মঠে নিয়মিত রঘুনাথজীউর পূজা ও উৎসব চলিতেছে। বর্তমানে শ্রীঅচ্যুতানুজ দাস মহারাজ (হরিদাস মহান্ত মহারাজ হইতে সপ্তম) মহান্তরূপে দেবসেবা করিতেছেন।

প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে বিজয়াদশমী তিথিতে রঘুনাথজীউর রথযাত্রা উৎসব মহাধূমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে মহানবমী তিথিতে রাত্রিকালে রামচন্দ্র ও মহামায়ার পূজার পর রামচন্দ্র বিগ্রহকে যোদ্ধার বেশে সজ্জিত করিয়া একটি সুবৃহৎ রথে স্থাপন করা হয় এবং মঠ হইতে রথ টানিয়া গ্রামের শেষ প্রান্তে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে আনিয়া উপস্থিত করা হয়। এই স্থানে রাবণবধ ও সীতার অগ্নিপরীক্ষা এই দুইটি অনুষ্ঠান পালনের পর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের মূর্তি স্থাপন করিয়া পুনরায় রথটিকে মঠে ফিরাইয়া আনা হয়। মঠে প্রত্যাবর্তনের পথে 'ভরত মিলন' নামে অনুষ্ঠান পালিত হয়। ইহার পর উক্ত বিগ্রহাদি মঠে আসিয়া পৌছাইলে তথায় অযোধ্যার রাজসভার পরিবেশে সজ্জিত মণ্ডপে বিগ্রহগুলিকে সিংহাসনের উপর সাজাইয়া রাখা হয়। উৎসব উপলক্ষে যথারীতি পূজা এবং নবমী ও দশমী তিথিতে সর্বজনীন ভোজ ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় পঁচিশ হাজার যাত্রী আসেন। উৎসবটি সর্বজনীন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই গ্রামে রঘুনাথজীউর অবস্থান হেতু গ্রামের সীমার মধ্যে কোনরূপ পশুবলি দেওয়া নিষিদ্ধ।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

বেগুনবাড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে কালীপূজা উপলক্ষে দেবীর মন্দির সংলগ্ন প্রায় পঁচিশ বিঘা জমির উপর দশদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত অধিকাংশ গ্রাম এবং হাওড়া জেলার বাগনান থানার অন্তর্গত অনেক গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দশ সহস্র নরনারী ট্রেন ও মোটর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং নানাবিধ জিনিসপত্রের প্রায় দেড়শত দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ কলিকাতা, বাগনান, মেদিনীপুর শহর, বালিচক, সবঙ্গ, ঘাটাল, কোলাঘাট, বল্লুক প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন।

বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক, নাগরদোলার দল আসে এবং তরজাগান ও যাত্রাভিনয় হয়। তাহা ছাড়া, অনেকে লটারী খেলিয়া থাকেন। পেশাদারী যাত্রাদল সাধারণতঃ নরঘাট, মেদিনীপুর এবং কলিকাতা হইতে আসে। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় সাত-আট সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

রাতুলিয়া দলবাড় গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় নব্বই বৎসরের প্রাচীন।

গগণপুর, তিলাগড়, পলতাবেড়্যা, পশ্চিম অর্জুনদা, কামালপুর, রিজাহারপুর, চিয়াজ, রাজনগর করাটি, বাকলশ, শ্রীরামপুর, শীতলানন্দপুর, কয়া, মঙ্গলদ্বারী ইত্যাদি গ্রামগুলি হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নারনারী মোটর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বই-ছবি, ধামা-কুলা, হাঁড়িকুড়ি ইত্যাদি জিনিসপত্রের মাত্র পনর-কুড়িটি দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কবিগান এবং যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় সাত-আট শত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

কুণ্ডরপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়কপূজা উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় চার বিঘা জমির উপর আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়চোপড়, মাটির খেলনা, হাঁড়িকুড়ি ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রা, থিয়েটার, কীর্তনগান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। তাহা ছাড়া, কোন কোন বৎসর সার্কাসের দল আসে।

মাগুরী জগন্নাথচক গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়কপূজা উপলক্ষে কংসাবতী নদীর দক্ষিণ তীরে প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিন-চার সহস্র নরনারী রিক্সা করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বই-ছবি, ঔষধপত্র, কাপড়-চোপড়, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র এবং অন্যান্য রকমারি জিনিসপত্রের মোট প্রায় দেড়শত দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচের দল আসে এবং থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়।

কেশিয়াড়ী ভূঞাবাড় গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে গ্রামের 'নারায়ণদীঘি' নামে দীঘির পাড়ে প্রায় চার-পাঁচ বিঘা জমির উপর সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি খুব সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দশ সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ তমলুক, রঘুনাথবাড়ী, পাঁশকুড়া প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক ও সার্কাসের দল আসে এবং কবিগান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

জশাড় গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে শিবমন্দির প্রাঙ্গণে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন,

মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, দাঁ-কোদাল, ধামা-কুলা-চুপড়ী ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য খেলাধূলা, ম্যাজিক, যাত্রা, কবিগান ও থিয়েটার প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

পূর্ব্ব চিল্কা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় নব্বই বৎসরের প্রাচীন।

তমলুক, ময়না ও পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন সহস্র নরনারী রিক্সা ও নৌকা করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, লাঙ্গল-কোদাল, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের শতাধিক দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ তমলুক ও ময়না হইতে আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রা, কবিগান, পুতুল-নাচ, কীর্তনগান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

ভোগপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে রেলস্টেশনের নিকটবর্তী বাজারে প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি খুব সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

মেলায় আশপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে প্রায় তিন হাজার নরনারী এবং বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, লোহার বাসনপত্র, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা, তৈয়ারী জামা-কাপড় এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলো, চ্যাঙ্গারী ইত্যাদি আমদানী হয়। উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় যুবকেরা থিয়েটার করিয়া থাকেন।

দোলযাত্রার মেলা

জিয়াখালি গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে রঘুনাথ-জীউর দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে জনৈক গ্রামবাসীর প্রায় তিন বিঘা জমির উপর আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম ব্যতীত কোলাঘাট, ভোরদা প্রভৃতি স্থান হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারী রিক্সা ও গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ, পিতল-লোহা-মাটির বাসনপত্র, বই-ছবি, ধামা-কুলা, মোড়া, মাটির খেলনা-পুতুল, জুতা, হ্যারিকেন ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় দেড়-শত দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় ; তবে কোলাঘাট হইতেও কতিপয় বিক্রেতা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচ, যাত্রাগান, পালাগান প্রভৃতির দল আসে। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় তিন-চার সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

ধর্মরাজপূজার মেলা

দেউলিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে ধর্মরাজপূজা উপলক্ষে ও, টি, রোডের দুই পার্শ্বে সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম ব্যতীত পার্শ্ববর্তী কয়েকটি থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দশ-বার সহস্র নরনারী ট্রেন, মোটর গাড়ী, নৌকা প্রভৃতি করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ কলিকাতা ও মেদিনীপুর শহর হইতে আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, দা-কোদাল, ঝুড়ি-চুপড়ী-মোড়া ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশটি দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, লটারী খেলা, কবিগান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

রথযাত্রার মেলা

রঘুনাথবাড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের বিজয়া-দশমী তিথিতে রঘুনাথজীউর রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে প্রায় অর্ধ মাইলব্যাপী রথযাত্রার রাস্তার উভয় পার্শ্বে একটি বড় মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে পঁচিশ-ত্রিশ

হাজার নরনারী এবং বিক্রেতার প্রতি বৎসর মেলায় আসিয়া থাকেন। মেলায় তিনশতাধিক দোকানপাট বসে এবং কুড়ি-পঁচিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি নানাপ্রকার খাবারের দোকানের সংখ্যাই অধিক। তাহা ছাড়া, কাঁসা, পিতল, লোহা ও কাঁচের বাসনপত্র, মনিহারী দ্রব্য, কাপড়-চোপড়, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, চারা গাছ, মাদুর প্রভৃতি রকমারি জিনিস-পত্র আমদানী হইয়া থাকে।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং সিনেমা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। স্থানীয় যুবকেরা থিয়েটার করিয়া থাকেন।

মেলাটি জেলা বোর্ডের লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং ইহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় যুবকগণ, পুলিশ ও স্বাস্থ্যবিভাগের লোকজন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন। স্থানীয় ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিস হইতে যাত্রীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়।

রাসযাত্রার মেলা

ঘোষপুর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উপলক্ষে রাসমঞ্চ সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা জমির উপর চারদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম ছাড়া ছয়রাশিয়া, হাউর, আথদান, কেন্দুয়াড়া, রাতুল্যা প্রভৃতি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারী ট্রেনে এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ হাউর, এরাশ্বর, হিজলদা, রাধামোহনপুর এবং তৎপার্শ্বস্থিত কয়েকটি গ্রাম হইতে আসেন। মিষ্টান্ন এবং মনিহারীর প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকান বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রা ও থিয়েটারের ব্যবস্থা করা হয়। তাহা ছাড়া, ম্যাজিকের দল আসে। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়



গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ শ্রীকণ্ঠা। ১৬৯।৬৯২'১০।৫১০।৩,০২৫

(ক) ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, কুমার, ধোপা, নাপিত, জেলে, মুচি, তাঁতী ও মুসলমান। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে পুরুষোত্তম-পুরগামী মোটরবাসে করিয়া অথবা পাঁশকুড়া হইতে কাঁসাই নদীতে নৌকা করিয়া গ্রামে যাওয়া যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী ও ঝুলনযাত্রা উৎসব, পৌষ মাসে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক, মাঘ মাসে রাধাকৃষ্ণের রাসযাত্রা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা, শিবরাত্রি উৎসব ও রক্ষাকালীপূজা এবং চৈত্র মাসে শীতলাপূজা, বাসন্তী-পূজা, চড়ক ও গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, মুসলমান সম্প্রদায়ের ফতেহা-দোয়াজ-দহম্, ফতেহা-ইয়াজ-দহম্, ঈদল্‌ফেতর এবং ঈদুজ্জোহা প্রভৃতি উৎসব চান্দ্রমাসানুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবগুলি ছাড়া প্রত্যেক বৎসর ভারতের স্বাধীনতা উৎসব ও প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে আটদিনব্যাপী। মেলাটি গত প্রায় ষাট বৎসর যাবৎ বসিতেছে।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ও একটি বাসন্তীদেবীর মন্দির ব্যতীত রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি এবং তিনটি শীতলা আছে।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ সামন্ত, প্রধান শিক্ষক,
শ্রীকণ্ঠা বাসন্তী অবৈতনিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

২। গ্রাম ঃ তিলখোজা। ১৮৫।৪৭৮'১৮।৪৩৫।২,৪৭৩

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, কুমার, স্বর্ণকার, ধোপা, রজক, রাজবংশী, তাঁতী ও মুসলমান। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে তমলুক-পাঁশকুড়া রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। তাহা ছাড়া, শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী খাল দিয়া নৌকায় করিয়া যাওয়া যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গাজন উৎসব এবং ফাল্গুন মাসে রক্ষাকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে সপ্তাহকালব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মাটির ঘরে শিব এবং একটি শীতলা আছে।

শ্রীপ্রভঞ্জন দাশ, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ তিলখোজা,
মেদিনীপুর।
ও
শ্রীবিষ্ণুপদ গাতাইত, শিক্ষক,
তিলখোজা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম ঃ জায়গীর চক। ১৯৬।১৬৬'০৪।৯৩।৪৩৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, তাঁতী ও ধোপা। গ্রামে মাইতিপাড়া, জানাপাড়া, মণ্ডলপাড়া, আদকপাড়া, বেরাপাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, পড়্যাপাড়া, সাঁতরাপাড়া, সামন্ত-পাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, তাঁতীপাড়া, ধোপাপাড়া প্রভৃতি নামে বারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন হাউর ও পাঁশকুড়া। শ্রীরামপুর-পাঁশকুড়া রুটের মোটরবাসে করিয়া হাউর অথবা পাঁশকুড়া হইতে নৌকাযোগে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ মাসে রসিকরায় নামে খ্যাত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের রথযাত্রা উৎসব ও একটি শীতলাপূজা, ফাল্গুন মাসে রসিকরায়ের রাসযাত্রা উৎসব এবং এই মাসেই জনৈক বৈষ্ণব মহান্তের সমাধি মন্দিরে তাঁহার তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং বহু প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। মাঘ মাসে দুইদিন। মেলাটি প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি ছোট আকারের মন্দিরে প্রস্তর নির্মিত শ্রীকৃষ্ণ ও ধাতুময়ী শ্রীরাধিকার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ছাড়া, গ্রামে একটি শীতলা আছে।

শ্রীজগন্নাথ বাগ, শিক্ষক,
জায়গীর চক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জায়গীর চক, মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম : গড় সাক্কাৎ। ২০৮।২৭৭·৯০।৪০১।২,০৪৭

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে বাজারপাড়া, মল্লিক-পাড়া, উত্তরপাড়া, পাঠানপাড়া, পশ্চিমপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটিপাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে শ্রীরামপুর-গামী মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। তাহা ছাড়া, কংসাবতী নদীতে নৌকা করিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শ্যামসুন্দরমন্দির ছাড়া শিব, রঘুনাথজীউ, কানাই ও বলাই প্রভৃতি বিগ্রহের নিত্য পূজা হয়।

শ্রীঅনিল চন্দ্র মাইতি, শিক্ষক,
গড় সাক্কাৎ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম : কিয়ারাণা। ২২৪।৭৯৫·৪৭।৪৩৫।২,৪৫৬

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, নাপিত, কুমার, গোয়ালা, কামার, ছুতার, রাজবংশী, ধোপা, তাঁতী, হাড়ী, চামার ও নমঃশূদ্র। গ্রামে উত্তরপাড়া, কুমারপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, আচার্যপাড়া, মাঝেরপাড়া, নাপিতপাড়া, দক্ষিণপাড়া, হাড়ী-পাড়া, কামারপাড়া, রাজবংশীপাড়া প্রভৃতি নামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে শ্রীরামপুর-গামী মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে মনসাপূজা ও ধর্মরাজ-পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে শ্যামাপূজা ও রাসযাত্রা উৎসব, অগ্রহায়ণ মাসে লক্ষ্মীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং বহু প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী। রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে পনরদিনব্যাপী। মেলা দুইটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, রাধাকান্তমন্দির, শ্যামামন্দির এবং চণ্ডীমণ্ডপ ছাড়া একটি কালী ও তিনটি শীতলা আছে।

শ্রীচূড়ামণি বেরা, প্রধান শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ কিয়ারাণা,
মেদিনীপুর।

৬। গ্রাম : গোজিনা। ২২৫।৬৩৪·১০।৩৩২।১,৮৪৬

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কুমার, তাঁতী, ছুতার, নমঃশূদ্র, স্বর্ণকার, বেদে, মুচি ও মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে শ্রীরামপুর-পুরুষোত্তমপুর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ মাসে দামোদরজীউর রাসযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। মাঘ মাসে সপ্তাহকালব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি এক চূড়া বিশিষ্ট ইষ্টক নির্মিত দামোদরজীউমন্দির ব্যতীত শিবমন্দির, কালীমন্দির এবং শীতলামন্দির আছে।

শ্রীবিভূতি ভূষণ মাইতি, প্রধান শিক্ষক,
গোজিনা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ আড়ং কিয়ারাণা, মেদিনীপুর।

৭। গ্রাম : হামিরুদ্দিনচক (মৌজা : গোবরাদন)। ২৩৬।৪৩৪·৭৪।২৬৩।১,৩৮০

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কুমার, ধোপা, নাপিত, তিলি, ময়রা, নমঃশূদ্র ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া। শ্রীরামপুর বা পুরুষাঘাট রুটের মোটরবাসে আসিয়া প্রায় ছয় মাইল

হাঁটাপথে অথবা নরঘাট বোট সার্ভিসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে ধর্মরাজপূজা ও বিশ্বকর্মা-পূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে ভীম একাদশী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রায় আশি বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা ভাদ্র মাসে একদিন মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কালীমন্দির ও শীতলামন্দির ব্যতীত ওলাবিবির স্থান আছে।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস, প্রধান শিক্ষক,
হামিরুদ্দিনচক অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বাকচা, মেদিনীপুর।

ময়না

তমলুক হইতে ময়না বা প্রাচীন ময়নাগড় প্রায় নয় মাইল দূরে অবস্থিত। বর্তমানে এই স্থানে থানা ও ডাকঘর আছে। বৌদ্ধযুগে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুক ব্যতীত দাঁতন, বাহিরী ও ময়নাতে এক একটি সঙ্ঘারাম ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। ময়নাগড়ে বৌদ্ধ নরপতি লাউসেনের রাজধানী ছিল।

নবম শতাব্দীতে ধর্মপাল যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে ময়নাগড়ে কর্ণসেন নামে এক রাজা ছিলেন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয়গড়ের সামন্ত গোপ-রাজ সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইয়া কর্ণসেনকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করেন। যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হয় এবং সেই শোকে কর্ণসেনের পত্নী প্রাণত্যাগ করেন। ইছাই ঘোষ মহাশক্তিশালী ও ভবাণী দেবীর বরপুত্র বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহাকে ধ্বংস করিবার জন্য রাজা কর্ণসেন গৌড়েশ্বর ধর্মপালের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহার শ্যালিকা ধর্মউপাসিকা রঞ্জাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। ধর্মপালের মহিষী স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া কর্ণসেনের সহিত রঞ্জাবতীর বিবাহ দেন। ধর্মঠাকুরের বরে রঞ্জাবতীর গর্ভে লাউসেন নামে কর্ণসেনের এক পুত্র হয়। ধর্মের বরপুত্র মহাবীর লাউসেন ভবানীর বরপুত্র ইছাই ঘোষকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পিতার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। লাউসেন কামরূপকামাখ্যা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মাণিক গাঙ্গুলীর ও ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্ম মঙ্গল' কাব্যে লাউসেনের বীরত্বের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ময়নাগড়ের রঙ্কিণী নাম্নী কালী ও লোকেশ্বর শিব এবং ময়নার সন্নিকটবর্তী বৃন্দাবন চকের ধর্মঠাকুর লাউসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লোকের বিশ্বাস এবং ময়নাগড় ধর্মরাজ-পূজার প্রধান পীঠস্থান বলিয়া পরিচিত।

ময়নাগড়ের প্রাচীন কীর্তি আজও কিছু কিছু বর্তমান আছে। ভিতরগড়ের ক্ষেত্রফল ৬২,৫০০ বর্গফুট, উহার চতুর্দিকে পরিখার প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য ৭০০ ফুটেরও অধিক। বাহিরগড় বা দ্বিতীয় পরিখার প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১,৮০০ ফুট। ভিতর ও বাহির উভয় গড়ের পরিখার বিস্তৃতি প্রায় ১৫০ ফুট। বর্গীদের উপদ্রবের সময় অনেকে নিরাপত্তার জন্য এই গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। উভয় পরিখার মধ্যবর্তী স্থান গভীর জঙ্গলে আবৃত। জঙ্গলের মধ্যে কামান বসাইবার উঁচু ঢিপি এখনও বর্তমান আছে।

(পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ' গ্রন্থ অবলম্বনে।)

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

শ্রীকণ্ঠা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন।

তমলুক থানার ১১নং, পাঁশকুড়া থানার ১৭নং, এবং ময়না থানার ১নং, ২নং ও ৩নং ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলি হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন সহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়-চোপড়, ধামা-কুলা-চুপড়ী, মাটির হাঁড়িকুড়ি-খেলনা এবং

অন্যান্য রকমারী জিনিসপত্রের প্রায় একশত দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ ময়না এবং তমলুক থানার অন্তর্গত গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রা এবং কবিগানের দল আসে। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় দেড় সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

তিলখোজা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে গ্রামের কালীমন্দির সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা জমির উপর সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং খেলাধুলা, জলসা, থিয়েটার বা যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় দুই সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

ধর্মরাজপুজার মেলা

হামিরুদ্দিনচক্‌ গ্রামে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে ধর্মরাজ-পূজা উপলক্ষে গ্রামের মাঠে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের নরনারী মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, পুতুল, হাঁড়িকুড়ি, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় ত্রিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য স্থানীয় যুবকগণ যাত্রাভিনয় করিয়া থাকেন। যাত্রানুষ্ঠানে প্রায় তিন সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

রাসযাত্রার মেলা

গড়সাফাৎ গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে শ্যামসুন্দর-জীউর রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন জমিতে চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

তমলুক, পাঁশকুড়া, পিঙ্গলা, সবঙ্গ, ভগবানপুর, নন্দীগ্রাম প্রভৃতি থানার অন্তর্গত গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রতিদিন গড়ে প্রায় এক সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া ও নৌকা করিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, কাপড়চোপড়, মাটির হাঁড়ি-কুড়ি-খেলনা, জুতা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় একশত দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ ময়না থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য পাঁচালীগান, যাত্রাগান এবং থিয়েটার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

কিয়ারাণা গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে রাধাকান্তমন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই-তিন বিঘা জমির উপর পনরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী প্রধানতঃ নৌকা করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা ব্যতীত অন্যান্য রকমারী জিনিসপত্রের প্রায় আশিটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য থিয়েটার বা যাত্রাভিনয় হয়। অভিনয় দেখিতে প্রায় পাঁচ সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

গোজিনা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে দামোদরজীউর রাসযাত্রা উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন জমির উপর সপ্তাহকাল-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রতিদিন গড়ে প্রায় দুই সহস্র নরনারী মোটরবাস ও নৌকা করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-

কোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের শতাধিক দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানগুলিতে প্রায় পাঁচ সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

রথযাত্রার মেলা

জায়গীরচক গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে রসিকরায়জীউর রথযাত্রা উপলক্ষে সাধারণের প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর দুইদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের প্রাচীন।

কাঁচিচক, মুদিবাড়, গোকুলনগর, রঘুনাথচক, বিষ্ণুমিশ্রচক, কালই, খাদাবন, রাধাবন, ব্রজবল্লভপুর, কুমরচক, চংরাচক, রসিকপুর, হাড়দুয়াচক, গড়ময়না, শ্রীরামপুর, হরিদাসপুর, পরমানন্দপুর, সুদামপুর, দোনাচক, রায়চক, গাংড়া, বেলুড়িয়া, জলচক, নারাঙ্গদীঘি, বড়িষা, হান্দোল প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী প্রধানতঃ নৌকা ও গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, কাপড়চোপড়, লাঙ্গল-জোয়াল, কোদাল, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য খেলাধূলা, সার্কাস, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে গড়ে প্রায় সাত-আটশত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।



থানা ঃ মহিষাদল

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ কামারদা। ৩৮।১৬৫.০০।১০৭.৪৮২

(ক) মাহিষ্য, কর্মকার ও বৈরাগী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূর দিয়া নিয়মিত মোটরবাস যাতায়াত করে।

(ঘ) গ্রামে একটি মঠের অন্তর্গত অত্যুচ্চ কারুকার্য বিশিষ্ট ইষ্টক নির্মিত একটি সুন্দর পঞ্চরত্ন মন্দিরে গৌর, গোবিন্দ ও গোপালজীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং মন্দির সংলগ্ন একটি নাটমন্দিরে লক্ষ্মী, নারায়ণ, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবী আছে। উল্লিখিত দেবদেবীর নিত্য পূজাদি এবং মাঘ মাসে মাকর সপ্তমী তিথিতে মঠে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় আটাশ বৎসরের প্রাচীন। মঠটি রঘুনাথজীউর মঠ নামে খ্যাত।

(ঙ) মাকরী সপ্তমীর মেলা। মাঘ মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি মাত্র বার বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে রঘুনাথজীউর মঠ ব্যতীত একটি শীতলা আছে।

শ্রীপুলিন বিহারী ভৌমিক, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ পুরুষোত্তমপুর, পোঃ নাৎভারহাট,
মেদিনীপুর।

২। গ্রাম ঃ নাইকুণ্ডি। ১১৭।২৩৮.৯০।১৭৪।৯৭৮

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামটি মুসলমান প্রধান।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাশকুড়া হইতে মোটরবাসে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক ও চৈত্র মাসের অমাবস্যায় মৃন্ময় কালী মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা ও উৎসব পালন করা হয়। ইহা ব্যতীত, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ও ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায় প্রতি বৎসর চান্দ্রমাসের ৬ই তারিখে (চৈত্র মাস) খাজা মহিদুদ্দিন চিস্‌তি বা বড় পীর সাহেবের উরস্‌ ও তদুপলক্ষে এক মহাফিলের আয়োজন করিয়া থাকেন। এই উৎসবে আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ সহস্র মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজনের সমাগম হয় এবং সর্বজনীন ভোজ ও ধর্মালোচনা হইয়া থাকে।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে দুইদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শীতলা, ওলাবিবি ও মুসলমান সম্প্রদায়ের দুইটি মসজিদ আছে। ওলাবিবির সেবায়েত মুসলমান। ওলাবিবির নিকট হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই শিন্নি দিয়া পূজা দিয়া থাকেন।

শ্রীএশহাক আলী, মৌলবী,
নাইকুণ্ডি প্রাথমিক মক্তব,
পোঃ গোপালপুর, মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম ঃ একারপুর। ১৪২।২৩৭.৭৭।১৭২।১,৩০০

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, কামার, কুমার ও তিলি। গ্রামের মধ্য দিয়া বরাবর একটি ক্যানেল চলিয়া যাওয়ায় গ্রামটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ক্যানেলের পূর্বদিকে দুইটি পাড়া এবং পশ্চিমদিকে দুইটি পাড়া—মোট এই চারটি পাড়া লইয়া সম্পূর্ণ গ্রামটি গঠিত।

(খ) কৃষিকার্য ও কুটীর শিল্প।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে পাশকুড়া রেলস্টেশন। গ্রামের সীমান্ত হইতে এক মাইল দূর দিয়া পাশকুড়া হইতে তমলুক পর্যন্ত মোটরবাস চলাচল করে। ক্যানেল পাড়ের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয় এবং ক্যানেল দিয়া নৌকায়ও যাতায়াত করিতে পারা যায়।

(ঘ) গ্রামের একমাত্র উল্লেখযোগ্য উৎসব 'গান্ধী মেলা'। প্রতি বৎসর ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে পাঁচদিনব্যাপী এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বদেশীযুগে মহাত্মা গান্ধীজী একদা এই গ্রামে পদার্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতি রক্ষার জন্য স্থানীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এবং আশপাশের চার-পাঁচটি গ্রামের লোকজনের সহযোগিতায় প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল এই উৎসবটি আরম্ভ হইয়াছে এবং এই স্থানে একটি মহাত্মা স্মৃতি মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে প্রথমদিন সুতা কাটা প্রতিযোগিতা, দ্বিতীয় দিন স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, তৃতীয় দিন কৃষি

প্রদর্শনী, চতুর্থ দিন ছায়া চিত্র প্রদর্শনী এবং পঞ্চম দিনে মহাত্মা গান্ধীজীর জীবনী ও আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনান্তে উৎসবের সমাপ্তি হয়।

(ঙ) গান্ধী মেলা। প্রতি বৎসর ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের বিষ্ণুমন্দির এবং সাধারণের কালীমন্দির, শিবমন্দির ও শীতলামন্দির ব্যতীত গাছতলায় ওলাবিবির নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস অধিকারী, চাকুরী,
গ্রাম ও পোঃ মধ্যহিংলা,
মেদিনীপুর।

মহিষাদল

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মহিষাদলে চারিদিকে পরিখা বেষ্টিত একটি অতি সুরম্য রাজপ্রাসাদ আছে। এই রাজপ্রাসাদে রাজা উপাধিধারী এক প্রাচীন জমিদার বংশ বসবাস করিতেছে। বর্তমান মহিষাদলের কৃষ্টি, শিক্ষা, ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই রাজপরিবারের দান অবিস্মরণীয়। মহিষাদল, গুমগড়, তমলুক প্রভৃতি পরগণা, মেদিনীপুর জেলার অন্যান্য স্থান, হাওড়া, চব্বিশপরগণা, কলিকাতা এবং উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের কতকগুলি সম্পত্তি ও জমি লইয়া মহিষাদল রাজ এষ্টেট গঠিত। এই সকল ভূসম্পত্তির মোট পরিমাণ ফল ছিল প্রায় ২ লক্ষ একর বা প্রায় তিনশত বর্গমাইল। এই সকল ভূসম্পত্তি হইতে মহিষাদল রাজ-এষ্টেটের তৎকালীন বার্ষিক আয় ছিল প্রায় ৭ লক্ষ টাকা। পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা বিলোপের পর এই সকল ভূসম্পত্তি বর্তমানে হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। এই বিশাল জমিদারী সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনার জন্য প্রায় আড়াইশত কর্মচারী জমিদারের অধীনে কার্য করিতেন। মেদিনীপুর তথা বঙ্গদেশের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে ও কার্যে মহিষাদলের রাজারা মুক্ত হস্তে দান করিয়া গিয়াছেন।

মহিষাদলের রাজবংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা উত্তর প্রদেশ নিবাসী সামবেদীর ব্রাহ্মণ জনার্দ্দন উপাধ্যায়। শোনা যায় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তর প্রদেশ হইতে ইনি ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যপদেশে মেদিনীপুর জেলার জীবনখালি বা গেঁওখালিতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং স্বীয় অধ্যাবসায় ও কর্মদক্ষতায় ব্যবসা-বাণিজ্যে উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিয়া প্রভূত অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করিতে সমর্থ হন। গেঁওখালির নিকটবর্তী বিস্তৃত জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগকে তিনি একটি মনুষ্য-বাসোপযোগী জনপদে রূপান্তরিত করেন। কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা অর্থোপার্জন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি বিস্তৃত ভূমিভাগকে কর্ষিত করাইয়া এই সকল স্থানে কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন।

অপর মতে জনার্দ্দন উপাধ্যায় গেঁওখালিতে পদার্পণ করিবার পূর্বে মোগল সম্রাট আকবরের অধীনে সৈন্য বিভাগের উচ্চ কর্মচারী ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। বৈরাম খাঁর নামাঙ্কিত একটি সুন্দর তরবারি তিনি মোগল সম্রাট কর্তৃক উপহার পাইয়াছিলেন। এই তরবারিখানি মহিষাদল রাজপরিবারের অস্ত্রাগারে আজিও সযত্নে রক্ষিত আছে। ইহা ব্যতীত, জনার্দ্দন উপাধ্যায় একটি সুবৃহৎ স্বর্ণমণ্ডিত বহু চিত্র-সম্বলিত ফার্দ্দৌসীর 'সাহনামা' মোগল সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিলেন। এই হস্তলিখিত অপূর্ব গ্রন্থটি কেবল যে রাজপরিবারের অমূল্য সম্পত্তি তাহা নহে, ইহা মোগল যুগের শিল্পকলার একটি অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই 'সাহনামা' গ্রন্থটি রাজপরিবারে রক্ষিত আছে।

জনার্দ্দন উপাধ্যায় কর্তৃক জমিদারী প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জানা যায় স্থানীয় তৎকালীন ভূস্বামী রাজা কল্যাণ রায় চৌধুরী একবার সরকারের নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া গেঁওখালির অধিবাসী ধনাঢ্য জনার্দ্দন উপাধ্যায়কে জামিন রাখিয়া অব্যাহতি পান এবং পরিশেষে তাঁহার নিকটেই জমিদারী সমর্পণ করিতে বাধ্য হন।

মহিষাদলের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন এই দ্বীপের আকার মহিষের আকারের ন্যায় ছিল বলিয়া ইহার নাম মহিষাদল হইয়াছে। কেহ বলেন অতীতে এই স্থানে বন্য মহিষাদি

পশুগণ সর্বাধিক পরিমাণে দেখা যাইত বলিয়া ইহার নাম মহিষাদল হইয়াছে। আবার কেহ বলেন যে, আদিতে এই স্থানে মাহিষ্য জাতির বসবাস ছিল বলিয়া এই স্থানের নাম মহিষাদল হইয়াছে।

প্রাচীনকালে মহিষ নামক এক জাতির অস্তিত্ব ছিল। সমুদ্রোপকূলে, প্রত্যন্ত দেশে তাহারা বাস করিত। তাহাদের পূর্বপুরুষ মহারাজ সগরের অভিশাপে ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার রাজ্য হইতে অপসারিত হইয়া বেদ ও ব্রাহ্মণের অদর্শনে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিশ্বকোষে মহিষ শব্দে দেখা যায়—শ্মশ্রুধারী ম্লেচ্ছ জাতিবিশেষ। হয়ত তাহাদের বংশধরগণ এদেশে প্রথম বাস করায়—মহিষদল বা মহিষাদল—এদেশের নামকরণ হইয়া থাকিবে।

প্রাচীন মানচিত্রে যেমন, ডি ব্যারো ও গাসটল্ডীর মানচিত্রে দেখা যায় যে, রূপনারায়ণ নদী দুইটি প্রশস্ত শাখায় বিভক্ত হইয়া ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছিল। ঐ দুইটি শাখার মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ড একটি দ্বীপের ন্যায় দেখা যাইত। পরবর্তীকালে অঙ্কিত ভ্যালেন্টাইন ও কাউরির মানচিত্রে পশ্চিম-দক্ষিণের শাখাটির অস্তিত্ব নাই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর রেনেলের মানচিত্রে তমলুক হইতে টেংরাখালি পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত দেখা যায়। বর্তমান হলদী নদী এই টেংরাখালি হইতে আরম্ভ হইয়া হুগলী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তৎকালে ইহার যে অংশটি তমলুকের নিকট হইতে টেংরাখালি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, পরবর্তীকালে তাহা বিলুপ্ত হওয়ায় পূর্বোক্ত দ্বীপটি ভূমিখণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ দ্বীপটি তখনকার সুতাহাটা ও মহিষাদল।

মহিষাদল রাজপরিবারের বিভিন্ন রাজা ও রানীদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরাদির মধ্যে রামজীউর মন্দির, গোপালজীউর মন্দির, দধিবামন মন্দির ও সিংহবাহিনীর মন্দির উল্লেখযোগ্য।

মহিষাদলের রামবাগ গ্রামে যে সুন্দর অত্যুচ্চ রামজীউর মন্দিরটি দীর্ঘদিন ধরিয়া দেশবাসীর ভক্তি ও বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া আসিতেছে তাহা রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায়ের সহধর্মিনী ধর্মপ্রাণা রানী জানকী দেবী ১৭১০ শকাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি উচ্চতায় কলিকাতার কালীঘাটের মন্দির অপেক্ষা কম নহে বলিয়াই মনে হয় এবং ইহার গঠন-প্রণালী বৈচিত্র্যও অতি প্রশংসনীয়। মন্দিরগাত্রে যে সকল চিত্র মন্দিরটির শোভাবর্দ্ধন করিত, তাহা সংস্কারের সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাধাকৃষ্ণ, হনুমানজীউ বিগ্রহ এবং কতকগুলি শালগ্রাম শিলা মন্দিরে বিরাজিত আছে। রানী জানকীর সময় এবং তাঁহার পরবর্তী কয়েকজন রাজার সময় দেবসেবার বিপুল আয়োজন ছিল। রামজীউর রথ এই অঞ্চলে বিখ্যাত। কথিত আছে, দেবসেবার কোনরূপ ত্রুটি হইলে তিনি স্বপ্নাদেশ পাইতেন। একদা হনুমানজীউ কোন এক পূজারী ব্রাহ্মণের দেবসেবার ত্রুটির জন্য রাত্রিকালে তাঁহাকে প্রহার করেন এবং সেই প্রহারের দাগ তাঁহার শরীরে অঙ্কিত হইয়া যায়। পরদিন উক্ত পূজারী উপযুক্ত ভোগ ও প্রার্থনার দ্বারা হনুমানজীউর সন্তুষ্টি বিধান করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। পূর্বে এই মন্দিরে দেবদেবীর সেবার জন্য প্রত্যহ দেড় মণ হইতে দুই মণ চাউলের ভোগ দেওয়ার বন্দোবস্ত ছিল এবং নানা উৎসব উপলক্ষে প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হইত। বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও গ্রামের দুঃস্থ জনসাধারণ এই মন্দিরের ভোগ হইতে প্রতিপালিত হইত। এখনও এই মন্দিরে নিত্য সেবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। রামজীউর মন্দির-প্রাঙ্গণের মধ্যে পঞ্চানন্দ ও শিবের দুইটি মন্দির বর্তমান আছে। রামজীউর মন্দিরের খোদিত লিপি এইরূপ—

শুভমস্তু সকাব্দা ১৭১০ সতরস দস
দিগৃষি চন্দ্রসখ্যেত্তু সাকেভূ সুতবাসরে
ইন্দ্বাংশে ঘটসামাক্ষ্যা বেদীস্তমাস্তেতিথৌ তথা
ভূমিপানন্দলালস্য পত্নী শ্রীজানকীমুদা
দদৌ শ্রীরামচন্দ্রায় মন্দিরঞ্চেদমুক্তমং।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সুদূর বৃন্দাবনে জানকীরমণের মন্দির প্রতিষ্ঠা রাণী জানকীর একটি বিশেষ স্মরণীয় কীর্তি। তিনি এই মন্দিরটি ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবসেবার জন্য ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন।

মহিষাদলে একটি সুসজ্জিত প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত গোপালজীউর সুউচ্চ নবরত্ন মন্দিরটিও রাণী জানকী দেবী

১৭০০ শকাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির গাত্রে নিম্নলিখিত প্রস্তরলিপি আছে—

শুভমস্তু ১৭০০ শকে শ্রীনৃপানন্দলালস্য পত্নী
শ্রীজানকীয়াদ্বন্দ্বত্রয়োবিংশসনেদশেষু
নবরত্ন দদে সপ্তদশশকে গোপাল রায়
তৎগঠিত শ্রীপাচুসেনা মিস্ত্রিরে।

গোপালজীউর মন্দির সম্বন্ধে একটি সুন্দর জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। ধর্মপ্রাণা রাণী জানকীর সময় একজন ধীবর মৎস্য ধরিবার জন্য মহিষাদলের নিকটবর্তী কোন নদীতে বা খালে গিয়াছিলেন। মাছ ধরিবার সময় তাহার জালে একটি কাষ্ঠখণ্ড আটকাইয়া যায়। ইহাকে নিজের কাজে লাগাইবার জন্য সেই ধীবর তাহার বাড়ীতে আনিয়া ঘরের এক কোণে দড়ি দিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলেন। সেইদিন রাত্রে রাণী জানকী স্বপ্নাদেশে জানিতে পারেন যে, যেন গোপালজীউ বলিতেছেন—"আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে, ধীবর আমাকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া শ্বাসরোধ করিতেছে। অবিলম্বে আমাকে লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠা কর।" রাণী জানকী অনুসন্ধান করিয়া ধীবরের গৃহ হইতে মহা ধূমধামের সহিত দারুমূর্তিটি আনাইয়া মন্দিরে স্থাপন করিয়া পূজার ব্যবস্থা করেন। কথিত আছে যে, এই দারুমূর্তিটি মেদিনীপুর জেলার গোপালনগর গ্রামের কোন জমিদারের মন্দির হইতে কোনরূপে নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছিল। সে যাহাই হোক এই গোপালজীউ প্রাসাদোপম মন্দিরে অবস্থান করিয়া অদ্যাবধি নিত্য পূজাদি পাইয়া আসিতেছেন। গোপালজীউ ধীবরের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া প্রতি শ্রীপঞ্চমীতে গোপালের পিতৃশ্রাদ্ধ (জেলে বাপের শ্রাদ্ধ) এই মন্দিরে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল। কিছুকাল হইল, এই অনুষ্ঠানটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই পরিবারের রাজা জগন্নাথ গর্গের সহধর্মিনী রাণী ইন্দ্রাণী দেবী ১৭৪৮ শকাব্দে একটি সুদৃশ্য রাসমণ্ডপ নির্মাণ করেন এবং রাজপ্রসাদে দধিবামনজীউ ও সিংহবাহিনী মূর্তি মহাসমারোহের সহিত স্থাপন করেন। সেই সময় হইতে আজিও দধিবামনজীউর নিয়মিত সেবাপূজা চলিয়া আসিতেছে। দধিবামনজীউর বর্তমান দরদালানসহ সমতল ছাদ বিশিষ্ট মন্দিরটি রাজা সতীপ্রসাদ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন। মহিষাদলের রাজা ভবানীপ্রসাদ গর্গ ভবানীদেবীর আরাধনা করিতেন এবং যে স্থানে তিনি এই দেবীর পূজা করিতেন সেই স্থান অদ্যাবধি 'ভবানীতলা' বলিয়া খ্যাত। কথিত আছে, ভবানী দেবীর উদ্দেশ্যে নরবলি দেওয়া হইত। রাজা লছমনপ্রসাদ কাহাকেও শাস্তি বিধান করিবার সময় বলিতেন, "ভবানীতলা মে লে যাও"।

মহিষাদল রাজবাড়ীর রথযাত্রা মেদিনীপুর জেলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উৎসব। মহা ধূমধামের সহিত এই উৎসব পালন করা হয় এবং তদুপলক্ষে বর্তমানে তের চূড়া বিশিষ্ট সুউচ্চ রথ টানা হয়। রাজ পরিবারের লোকজন সাধারণের সহিত নগ্নপদে রথের অনুগমন করিয়া থাকেন। যতদূর জানা যায় রানী জানকীদেবীর মৃত্যুর পর (১৮০৪ খৃঃ) স্বল্পকালের জন্য মতিলাল পাড়ে মহিষাদলের রাজত্ব পান। সেই সময় তিনি একটি সতের চূড়া বিশিষ্ট সুসজ্জিত রথ নির্মাণ করান। আমাদের জনৈক সংবাদদাতা মহিষাদলের নিকটবর্তী ঘাঘরা গ্রাম-নিবাসী শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র পট্টনায়ক মহাশয় জানান যে, ১৮৫২ খৃঃ লছমন প্রসাদ গর্গ বাহাদুর মতিহুমেরা নামক জনৈক মিস্ত্রীর সাহায্যে উক্ত রথটির সংস্কার করান। এই সময় তিনি কলিকাতা হইতে কয়েকজন সুদক্ষ চীনা কারিগর আনাইয়াছিলেন। তৎকালে প্রায় চার হাজার টাকা ব্যয়ে রথটির চারি পার্শ্বে চারিটি মূর্তি বসান হইয়াছিল। ১৯১২ সালে স্থানীয় মিস্ত্রী মাধব চন্দ্র দে রথের সম্মুখে সজ্জিত কাঠের ঘোড়া দুইটি নির্মাণ করান। রথযাত্রা উপলক্ষে মহিষাদলে পক্ষকালব্যাপী একটি বৃহৎ মেলা বসে এবং মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন থানা হইতে ও সীমান্তবর্তী ২৪-পরগণা, হাওড়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলা হইতে প্রায় এক লক্ষ নরনারীর সমাগম হয়। স্থানীয় রাজ পরিবারের জমিতে বিবিধ জিনিসপত্রের সাত শতাধিক দোকানপাট বসে। বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং বিহার ও উত্তর প্রদেশ হইতে ব্যবসায়ীরা আসিয়া থাকেন। সমগ্র দোকানপশারের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও হোটেল জাতীয় খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত মনিহারী, কাঁচ, তামা, পিতল ও লোহার বাসনপত্র, কাপড়চোপড়, তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ, লাঙ্গল-জোয়াল সহ কৃষি যন্ত্রপাতি,

বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল, বই-ছবি, ঔষধপত্র, আম-কাঁঠাল ইত্যাদি নানাপ্রকার জিনিসপত্র মেলায় আমদানী হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচ, সার্কাস, নাগরদোলা ইত্যাদির দল আসে এবং চলচ্চিত্র, মৃৎশিল্প প্রদর্শনী, পালা-গান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা থাকে। প্রায় প্রতি বৎসরই কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রার দল আসে।

মহিষাদলের রথযাত্রা উপলক্ষে ২৩শে আষাঢ়, ১৩৬৭ সনে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়—

"মহিষাদল, ৫ই জুলাই—নির্বিঘ্নে মহিষাদলে রথের পুনর্যাত্রা উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্বদিন হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্যাত্রা দিবস পর্যন্ত অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ হইতে থাকায় রথের মেলার আনন্দ যথেষ্ট ব্যাহত হয়। গুণ্ডিচাবাটী হইতে অর্ধ মাইল কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথের উপর দিয়া যাত্রিগণ রথরজ্জু ধরিয়া বিরাট তের চূড়া রথটিকে টানিয়া পূর্বস্থানে পৌছাইয়া দেয়। বৃদ্ধ-যুবক-শিশু-নির্বিশেষে সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর পবিত্র উল্লাসের তুলনা হয় না।

এই উপলক্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, গোপালপুর হাই স্কুল ও মহিষাদল রাজ হাই স্কুলের ছাত্র কর্মিগণ অতি প্রশংসনীয় সেবাকার্য করেন।"

(১৯৪০ খৃষ্টাব্দে "মেদিনীবাণী" মহিষাদল রাজসংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীরাসবিহারী রায় মহাশয়ের 'মহিষাদল রাজবংশ', শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায় মহাশয়ের 'মহিষাদল' নামক প্রবন্ধ ও শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থ অবলম্বনে এবং আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত।)

মেলা বিবরণী

মাকরী সপ্তমীর মেলা

কামারদা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে মাকরী সপ্তমী উৎসব উপলক্ষে রঘুনাথজীউর মঠ সংলগ্ন খালপাড়ে ব্যক্তি-বিশেষের জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র বার বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। আশ-পাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় পাঁচ-ছয়শত নরনারীর সমাগম হয় এবং প্রতিদিন বিকালের দিকেই মেলায় কেনাবেচা হয়।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, লোহার বাসন ও কাস্তে, কোদাল, তৈয়ারী জামা-কাপড়, বই-ছবি, নারিকেলদা গ্রাম হইতে বাঁশের তৈয়ারী জিনিস, ধলহারা গ্রাম হইতে মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল ইত্যাদি আমদানী হইয়া থাকে। মোট প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে। কোন কোন বৎসর শাকসব্জি ও মাছের আমদানী হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য কোন বৎসর ম্যাজিকের দল, কোন বৎসর সার্কাসের দল আবার কোন বৎসর হাওড়া জেলা হইতে পুতুলনাচের দল আসে।

দোলযাত্রার মেলা

নাইকুণ্ডি গ্রামে শ্মশানক্ষেত্রের নিকট প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল ও শীতলাপূজা উপলক্ষে প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় সাত-আটশত নরনারী আসেন। মেলায় ময়রা তেলেভাজা, চা-পান-বিড়ি, সরবৎ ইত্যাদি খাবারে দোকান ব্যতীত মনিহারী, তামা, পিতল ও কাঁসার বাসনপত্র, স্থানীয় তাঁতীদের তৈয়ারী গামছা, মশারী, জুতা, টোটকা ঔষধ, মাটির খেলনা-পুতুল, ধামা-কুলা প্রভৃতি বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র আমদানী হইয়া থাকে। মহিষাদল ও তমলুক হইতে প্রায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়। কেহ কেহ জুয়াও খেলিয়া থাকেন।

বিবিধ
(গান্ধী মেলা)

এক্তারপুর গ্রামের মধ্যবর্তী ক্যানেলের পশ্চিম পাড়ে শিশুসদন নামক একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রায় তিন বিঘা জমির উপর প্রতি বৎসর ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে পাঁচদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র পঁচিশ বৎসর হইল

মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে স্থানীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শুরু হইয়াছে।

নিকটবর্তী মধ্য হিংলা, চাঁপী, ঝাউপাথরা, রঙ্গীবসান প্রভৃতি গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় পনর-ষোলশত নরনারী প্রতি বৎসর মেলায় আসেন। মোট পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে ও কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবার, মনিহারী দ্রব্য, কাঁচ, তামা, পিতল ও লোহার বাসনপত্র, ছবি সংক্রান্ত জিনিসপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল, বই-ছবি, তাঁতের কাপড় ও হাতে কাটা সুতার কাপড় ইত্যাদি আমদানী হইয়া থাকে।

আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচের দল আসে এবং খেলাধূলা, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়। স্থানীয় যুবকেরা অভিনয় করিয়া থাকেন।

মেদিনীপুরের গ্রামে গান্ধী মেলা সম্পর্কে ১৯৬০ সনে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি সংবাদ—

"গোকুলনগর, ১৩ই ফেব্রুয়ারী—স্বদেশী যুগে লবণ আইন অমান্য করিবার উদ্দেশ্যে আগত প্রায় ২৫ হাজার সত্যাগ্রহীর উপর পুলিশ যে স্থানে লাঠি চার্জ করিয়াছিল সেই তলাপটি খালের তীরভূমিতে গান্ধীমেলা ও খাদি গ্রামোদ্যোগ প্রদর্শনী গত ৬ই ফেব্রয়ারী সর্বোদয় নেতা শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ বিপুল সংখ্যক জনতার উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীর উদ্বোধনের পর বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে শ্রীগুহ প্রদর্শনীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

এই প্রদর্শনীতে স্বদেশী যুগে গ্রামে গ্রামে কিভাবে লবণ প্রস্তুত করা হইত তাহা প্রদর্শিত হয়। কয়েক হাজার উৎসুক দর্শক শান্তভাবে লবণ প্রস্তুত প্রণালী দেখেন। গোকুলনগর গান্ধী আশ্রমের কর্মীদের প্রস্তুত বিভিন্ন হাতের কাজও প্রদর্শিত হয়। কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন বিভাগও উক্ত প্রদর্শনীতে স্থান লাভ করিয়াছে।

তাল ও খেজুর গুড় হইতে কিভাবে চিনি প্রস্তুত করা হয়, তাহাও দর্শকগণকে দেখান হয়।

প্রদর্শনী উদ্বোধনের পূর্বে সকালবেলায় গোকুলনগর গোবিন্দজীউ শিক্ষানিকেতনের প্রধান শিক্ষক শ্রীভূতনাথ দাসের নেতৃত্বে শ্রীরমেন দাস, শ্রীমুকুল গুহ, বিশ্ব ভ্রমণকারী শ্রীসুনীল নাগ প্রভৃতি তলাপটি খালের তীরে যাইয়া যে স্থানে ১৯৩২ সালে প্রায় ২৫ হাজার লবণ সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশ অত্যাচার করিয়াছিল সেই স্থানে সত্যাগ্রহীদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

অতঃপর ১৯৪৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী গান্ধীজীর চিতাভস্ম যেস্থান হইতে তলাপটির জলে বিসর্জন দেওয়া হয় সেই স্থানে যাইয়া নত মস্তকে জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। এই স্থানে একটি গান্ধীঘাট নির্মাণের পরিকল্পনা আছে বলিয়া স্থানীয় গান্ধী আশ্রমের জনৈক কর্মীর নিকট হইতে জানা গিয়াছে।

অতঃপর গান্ধী আশ্রমের একধারে গান্ধীস্তম্ভের নিকট উপস্থিত হইয়া সমাগত জনতা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

এই মেলা ও প্রদর্শনী উপলক্ষে শিশুদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। প্রবল বর্ষণ ও ঝড়ের জন্য শিশু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নাই।…"

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : বামুন আড়া। ৬১।৯৭৬'৬৭।২৮১।১,৪৬৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, মাহিষ্য, করণ, তাম্বুলী, করঙ্গা, কামার, নাপিত, ধোপা, তাঁতী ও মুসলমান। গ্রামে মাইতিপাড়া, ভট্টাচার্যপাড়া, পতিপাড়া, দাসপাড়া, জানাপাড়া, খাটুয়াপাড়া, মল্লিকপাড়া, ধোপাপাড়া, মুসলমান-পাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে কিছু পথ শ্রীরামপুর-পুরুষোত্তমপুর রুটের মোটরবাসে করিয়া তৎপর চণ্ডীপুরগামী মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি ১১৩৭ বঙ্গাব্দে প্রথম আরম্ভ হয়।

(ঙ) শীতলাপূজার মেলা। চৈত্র মাসে প্রায় এক পক্ষকালব্যাপী। মেলাটি ১১৩৭ বঙ্গাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শীতলার পাষাণ-মূর্তি ব্যতীত একটি পঞ্চানন্দ, রসিকরায় নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি এবং প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন কালুরায় নামে গ্রাম্য দেবতা আছে।

শ্রীবসন্ত কুমার দাস, প্রধান শিক্ষক,
কসবা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : বামুন আড়া, পোঃ আশুতিয়াবাড়,
মেদিনীপুর।

২। গ্রাম : শ্রীকৃষ্ণপুর। ৭৭।৫২৪'৫৮।২৮৬।১,৫০০

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, ধোপা, নাপিত ও স্বর্ণকার। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে তমলুক-দীঘা রাস্তায় মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে রক্ষাকালীপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসে শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে সর্বসাধারণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত টালীর ছাউনীযুক্ত একটি শীতলামন্দির আছে।

শ্রীদেব নারায়ণ সাহু, শিক্ষক,
শ্রীকৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ শ্রীকৃষ্ণপুর, মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম : আমড়াতলা। ১২৫।৮৭৮'০৪।৪৪৬।২,৭৬৭

(ক) ব্রাহ্মণ, আচার্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, তিলি, তাঁতী, ধোপা, নাপিত, শবর ও মুসলমান। গ্রামে চিঙ্গুড়-মারীপাড়া, মুসলমানপাড়া, দক্ষিণপাড়া, পশ্চিমপাড়া, ব্রাহ্মণ-পাড়া ও উত্তরপাড়া নামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে আনন্দ-তলাগামী মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়। তাহা ছাড়া, তেয়পাখিয়া হইতে একটি খাল দিয়া নৌকা-পথে গ্রামে যাওয়া যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে শীতলাপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন। মেলায় কয়েকটি মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মনিহারী প্রভৃতির দোকান বসে এবং চণ্ডী-মঙ্গলগান হয়।

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি মন্দিরে শীতলা, চণ্ডী, নারায়ণ প্রভৃতি দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীকুমুদবান্ধব মাইতি, প্রধান শিক্ষক,
আমড়াতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর

৪। গ্রাম : খোদামবাড়ী।

১৩১।১,৪৯৪'১২।৫৬৩।৩,৫৭৫

(ক) হিন্দু। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে উড়িষ্যা কোস্ট ক্যানেলের পাড় দিয়া হাঁটিয়া অথবা ক্যানেল দিয়া নৌকা করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে ঝুলনযাত্রা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমী উৎসব, অগ্রহায়ণ মাসে অন্নকূট মহোৎসব, পৌষ মাসে পুষ্যাভিষেক উৎসব, মাঘ মাসে বলরামদেবের রাসযাত্রা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রাচীন।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। মাঘ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। মেলাটি মাত্র দশ-বার বৎসর হইল শুরু হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি বাশুলীমন্দির এবং একটি শীতলা-মন্দির ব্যতীত 'আনন্দমঠ' নামে একটি মঠে গৌরাঙ্গ বিগ্রহ, রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ এবং নাড়ুগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা আছে।

শ্রীপ্রভাস চন্দ্র জানা, প্রধান শিক্ষক,
গোদামবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম : হান্দুভুঞ্যা।
১৩৩।১,৩৪৭'৪৬।৩৯২।২,৩৬৭

(ক) হিন্দু জাতির বাস। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া। বাস ষ্ট্যাণ্ড গড়গ্রাম হইতে হাঁটিয়া অথবা নৌকা করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, আষাঢ় মাসে শীতলা ও বাশুলীদেবীর একযোগে পূজা এবং গোষ্ঠ উৎসব, ভাদ্র মাসে ধর্মরাজপূজা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব ও কালীপূজা এবং মাঘ মাসে মাঘোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রাচীন।

(ঙ) শীতলাপূজার মেলা। আষাঢ় মাসে তিনদিন-ব্যাপী।

কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলা দুইটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি গোপালজীউমন্দির এবং অপর একটি মন্দিরে শীতলা ও বাশুলীদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শেষোক্ত মন্দিরটি মহিষাদলের রাজ পরিবার কর্তৃক নির্মিত।

শ্রীহারাধন বাড়া, চাকুরী,
গ্রাম ও পো: হান্দুভুঞ্যা,
মেদিনীপুর।

৬। গ্রাম : আমদাবাদ।
১৪০।২,১৮৪'৭২।৯৫৩।৫,৩৮৪

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, তাঁতী, ধোপা, নাপিত, কামার (কামিলা), তেলী, বৈরাগী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মুচি, হাড়ী ও মুসলমান। গ্রামে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে তমলুক-নরঘাট রুটের মোটরবাসে করিয়া রাজকুল হইয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, আশ্বিন মাসে চণ্ডী ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও গোষ্ঠ-পূজা, পৌষ মাসে মকরস্নান, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে সীতানবমী এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রাচীন।

(ঙ) পৌষসংক্রান্তির মেলা। পৌষ মাসে।

চৈত্রসংক্রান্তির মেলা। চৈত্র মাসে। মেলা দুইটি প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সাধারণের মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনীযুক্ত একটি দেবালয়ে মঙ্গেশ্বরী ও কানোরায়ের প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত গ্রামে ওলাবিবি এবং জনৈক অজ্ঞাতনামা পীরের স্থান আছে।

ডা: প্রবোধ কুমার ভৌমিক, অধ্যাপক,
৩৫, খেলাত বাবু লেন, কলিকাতা-২।
ও
শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ বেরা, শিক্ষক,
গ্রাম ও পো: আমদাবাদ, মেদিনীপুর।

৭। গ্রাম : কমলপুর। ২২০।১,৫৩৩'৮৬।৫৭২।৩,৩৭৬

(ক) ব্রাহ্মণ, করণ, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, রজক, কলু, ধীবর, বেহারা ও মুসলমান। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, করণ-পাড়া, মাহিষ্যপাড়া, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়পাড়া, রজকপাড়া, কলু-পাড়া, ধীবরপাড়া, বেহারাপাড়া ও মুসলমানপাড়া নামে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে কিছু পথ শ্রীরামপুর-পুরুষোত্তমপুর রুটের মোটরবাসে আসিয়া পরে কয়েক মাইল হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। ইহা ভিন্ন, নৌকায়ও যাতায়াত করিতে পারা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গোষ্ঠপূজা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, পৌষ মাসে শীতলা-পূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ব্যতীত জনৈক অজ্ঞাতনামা পীরের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) পীরের উৎসব উপলক্ষে চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন। মেলায় প্রায় দুই সহস্র নরনারী আসেন এবং বিবিধ জিনিসপত্রের অনেকগুলি দোকান বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য নানাপ্রকার ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল এবং টালীর ছাউনীযুক্ত সাধারণের একটি মন্দিরে তিনটি শীতলা, একটি মনসা এবং একটি গোবিন্দজীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্যামাপদ মাইতি, শিক্ষক,
গ্রাম : কমলপুর,
মেদিনীপুর।

মেলা বিবরণী

দুর্গাপূজার মেলা

শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামের বাজারে প্রায় দুই বিঘা জমিতে চারদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

আশপাশের গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা, মাটির পুতুল-খেলনা ইত্যাদি জিনিসপত্রের মাত্র কুড়ি-পচিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য হরিনাম সংকীর্তন এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

রাসযাত্রার মেলা

খোদামবাড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে বলরাম-দেবের রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে প্রায় চার-পাচ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী ইত্যাদি জিনিসপত্রের মাত্র পনর-কুড়িটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কৃষ্ণযাত্রাগান, ম্যাজিক এবং কীর্তনগান অনুষ্ঠিত হয়। কীর্তনগানের দল সাধারণত নবদ্বীপ হইতে আসে।

শীতলাপূজার মেলা

বামুন আড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শীতলাপূজা উপলক্ষে দেবীর মন্দির সংলগ্ন প্রায় ত্রিশ বিঘা জমির উপর প্রায় এক পক্ষকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি ১১৩৭ বঙ্গাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম ব্যতীত তমলুক, মহিষাদল, সবঙ্গ, এগরা প্রভৃতি থানার অন্তর্গত গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ সহস্র নরনারী মোটরবাস, সাইকেল ও রিক্সা করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, ঔষধপত্র, কৃষি সংক্রান্ত নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি, খেলনা-পুতুল ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় পাঁচশত দোকান বসে। তাহা ছাড়া, এই মেলায় হাঁস-মুরগী-পায়রা, নানা জাতীয় পাখী ক্রয়-বিক্রয় হয়। বিক্রেতারা প্রধানতঃ ডায়মণ্ডহারবার, কাঁথি, তমলুক, মহিষাদল, সবঙ্গ, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে আসেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক ও সার্কাসের দল আসে।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ বরদা। ৩৮।৮২০'০৫।৩৬৬।১,৯০৮

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কামার, হাড়ী, মুচি ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) চব্বিশ-পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার রেল-স্টেশনে নামিয়া হুগলী নদী পার হইয়া গ্রামে যাতায়াত করা সুবিধাজনক।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা এবং আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজা ব্যতীত অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) শীতলাপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে।
মনসাপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে।
লক্ষ্মীপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে। মেলাগুলির প্রত্যেকটি সপ্তাহকালব্যাপী চলে এবং বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পঞ্চানন্দমন্দির, একটি শীতলা-মন্দির, একটি মনসামন্দির এবং একটি লক্ষ্মীমন্দির আছে।

শ্রীশঙ্কর্ষণ বেরা, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ বরদা,
মেদিনীপুর।

২। গ্রাম। বাড় বাসুদেবপুর।
৬২।৯৬৪'০৭।৪৪০।২,৩১০

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, ধোপা, নাপিত, যোগী ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও তাঁতশিল্প।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে সুতাহাটা-চৈতন্যপুর রুটের মোটরবাসে করিয়া বালুহাটা হইয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে শীতলাপূজা ও দোলযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি শীতলামন্দির আছে।

শ্রীবিজয় কৃষ্ণ জানা, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ বাড় শুকলালচক, পোঃ কুমারপুর,
মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম ঃ গুয়াবেড়িয়া।
৭৭।৫১৩'১৭।২২৬।১,৩৬৮

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, করণ, ধোপা, হাড়ী, নাপিত, গোয়ালা ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে সুতাহাটা-চৈতন্যপুর রুটের মোটরবাসে করিয়া বালুহাটা হইয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষ মাসে অন্নপূর্ণাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) অন্নপূর্ণাপূজার মেলা। পৌষ মাসে পনরদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে টালীর ছাউনীযুক্ত অন্নপূর্ণামন্দির আছে।

শ্রীসত্য রঞ্জন মাইতি, চাকুরী,
গ্রাম ঃ গুয়াবেড়িয়া, পোঃ টাবাখালি
মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম ঃ কিসমত শিবরামনগর।
৯৪।৬১৪'৫৪।৩০১।১,৭২৪

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে সুতাহাটা-চৈতন্যপুর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা এবং ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর যাবৎ অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির, চারটি শীতলামন্দির, একটি ওলাবিবির মন্দির এবং একটি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির আছে।

শ্রীশ্যামাপদ পাত্র, প্রধান শিক্ষক,
কিসমত শিবরামনগর ২নং প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ শিবরামনগর, মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম : শ্রীকৃষ্ণপুর। ১০৩।৩৮৬৯৮।৭৬।৪১৪

(ক) মাহিষ্য, কামার ও করণ। গ্রামটিতে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) চব্বিশ-পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার রেল-স্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, মাঘ মাসে শীতলাপুজা এবং ফাল্গুন মাসে বলরামদেবের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে আটদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন। মেলায় প্রায় এক সহস্র নরনারী আসেন এবং বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রায় চল্লিশটি দোকান বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য পুতুলনাচ ও যাত্রানুষ্ঠান হয়।

(চ) গ্রামে একটি শীতলামন্দির এবং একটি হরিমন্দির আছে।

শ্রীবসন্ত কুমার বেরা, শিক্ষক,
গ্রাম : শ্রীকৃষ্ণপুর, পোঃ বরদা,
মেদিনীপুর।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"সুতাহাটা থানার দারো-পরগণায় মাধব, সাগর-মাধব ও নীলমাধব নামে তিনটি অতি প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি আছে। নীল প্রস্তরে নির্মিত সুবৃহৎ মূর্তিগুলির গঠন-প্রণালী দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কত যুগ হইল মূর্তিগুলি নির্মিত হইয়াছে, কালের কঠোর হস্ত উহাদের উপর কত অত্যাচার করিয়া গিয়াছে, তথাপি মূর্তিগুলি দেখিলে মনে হয়, যেন শিল্পী সন্তঃ সন্তঃ উহাদের নির্মাণকার্য শেষ করিয়া গিয়াছেন। উহাদের প্রকাশ সম্বন্ধেও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু ঐগুলি যে বৌদ্ধযুগের মূর্তি তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। দেবভোগের নবরত্ন ও দীর্ঘিকা মাজনামুঠার জমিদার প্রাতঃস্মরণীয় রাজা যাদবরাম রায়ের পুত্রবধূ, রাজা রাজকুমার নারায়ণের পত্নী রাণী সুগন্ধা কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।" (পৃঃ ৩২১)

"সুতাহাটা থানায় অনুষ্ঠিত 'মাধবের মেলা' সম্পর্কে ১৫ই বৈশাখ, ১৩৬১ সনে নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃক 'আনন্দ-বাজারপত্রিকা'য় নিম্নলিখিত সংবাদ পরিবেশিত হয়—

মেদিনীপুর জেলার দোর পরগণার বৎসর বেশী নয়। এখনও আবালবৃদ্ধবনিতা জানে, শ পাঁচেক বছর আগে এটি দরিয়া ছিল। তারপর ডাঙ্গা মাথা তুলল। গাংপাড় বাঁধা হল। মানুষের বসবাসের সঙ্গে এর নাম হল দোর।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সর্বপ্রথম মানুষ এখানে আস্তানা পাতে। প্রথম যারা বসবাস করেছিলেন তাঁরা ছিলেন সাধু-সন্ত, তীর্থযাত্রী।

সাগর সঙ্গমে স্নান উপলক্ষে প্রতি বৎসর বহু সাধু-সন্ত, ভক্ত আর পুণ্য লোভাতুর সাগর দ্বীপে কপিল মুনির আশ্রমে যেতেন। আজও তেমনিভাবে যাত্রী সমাগম হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সাগর প্রত্যাগত হয়ে এখানে বসবাস করে। দোরের সর্বপ্রাচীন ঐতিহ্য মাধবের মেলা তার প্রমাণ। কিংবদন্তী এই যে, সাগর মাধব দুই ভাই। এটি দোরের প্রথম প্রসিদ্ধ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই মেলা যে সাধু বাবাজীদের কীর্তি তারও প্রমাণ আছে। এতদঞ্চলে প্রথম নাগা সাধুগণ বাসস্থান স্থাপন করেন। নাগার মঠ গ্রামটি তার সাক্ষী। যারা অতি বার্ধক্যবশতঃ সাগর যেতে পারতেন না, তাঁদের জন্য সাধুরা একটি বিকল্প ব্যবস্থা করেন। তাঁরাই সাগরের ভাই মাধবকে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন এবং সাগর যাত্রার সমান ফল এখানেই সম্ভব বলে প্রচার করেন। এই মাধব ঠাকুরের মেলা আজও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে এই পরগণার অন্তর্গত বড়বাড়ী গ্রামে গঙ্গারাম নামক জনৈক তিলি একটি শিব

প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ এই যে, গঙ্গারাম বার্ধক্যবশতঃ সাগরে যেতে না পারায় সেই দেবতার প্রতিকৃতি এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবতার নাম হয় গঙ্গেশ্বর। লোকপরম্পরায় শোনা যায় যে, গঙ্গারাম স্বপ্নাদেশে এইরূপ মূর্তি লাভ করেন।

এই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিটি নিঃস্ব ও নিঃসন্তান ছিলেন। এই বংশ এক্ষণে নির্বংশ। বাৎসরিক উৎসবাদি অনুষ্ঠানের জন্য তিনি শিবনারায়ণ বেরা নামক জনৈক বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বে ভার দিয়ে যান। তদবধি এই বংশ পূজক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে বিগ্রহের নিত্য সেবা-পূজার সমূহ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এই বংশের শ্রীমধুসূদন মন্দিরটি পাকা করেন ও নাট মন্দির নির্মাণ করেন। কিন্তু সেবাইত বংশের দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের দুরবস্থা দেখা দেয়। শতবর্ষ পরে মন্দির চূড়া ধসে পড়ে। গাত্র প্রলেপ ঝরে ঝরে ইষ্টক ক্ষয়ে যায়। চামচিকা, গিরগিটি আর আরশুলা নিশ্চিন্ত আরামে সেখানে বসবাস করতে থাকে।

কিন্তু কাল-সচেতন একদল যুবক এই প্রাচীন কীর্তিকে রক্ষার জন্য বদান্য ব্যক্তিগণের দ্বারস্থ হন। তাঁরা চার হাজার টাকা সংগ্রহ করে ভগ্ন, জীর্ণ মন্দিরটির সংস্কার করেন।

প্রতি বৎসর বৈশাখে অক্ষয় তৃতীয়ার তিনদিনব্যাপী বিরাট উৎসব ও মেলা বসে। দূর দূরান্তর হতে হাজার হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

মেলার জের চলে সপ্তাহ ধরে। এ ক'দিন মেলাটি একটি জাতীয় প্রদর্শনীর রূপ ধারণ করে। কয়েক হাজার দোকান বসে। বহু শিল্পী, কারিগর ও যাদুবিদ আসে। আমদানী হয় হাজার হাজার বিভিন্ন জাতের কুটির শিল্প।

কুলবধূ আসে শাশুড়ী ননদের সঙ্গে। ঘোমটা চাপা মুখে মাঠের আলো আর বাতাস লাগে। তারা ক'দিন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পায়। গৃহস্থরা ঘর সংসারের জন্য সারা বৎসরের খুঁটিনাটি কেনে। মাদুর, পাখা, পাথরবাটি, বঁটি, খুনতি, খেলনা ও বাসনকোসন নিয়ে বাড়ী ফেরে।

ভূসম্পত্তিহীন মেঠো দেবতা। তবু তাঁর কত না আকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে কদিন সঙ্গীতে, নৃত্যে, বাজিতে আর বাদ্যে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে ওঠে।

গ্রাম থেকে দূরে নির্জন প্রান্তরে ইতিহাসের সাক্ষীরূপে মন্দিরটি মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একা। সঙ্গীস্বরূপ কয়েকটি বট, অশ্বত্থ, শিরিষ আর একটি স্বচ্ছতোয়া পুষ্করিণী বিদ্যমান।"

মেলা বিবরণী

অন্নপূর্ণাপূজার মেলা

গুয়াবেড়িয়া গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষমাসে অন্নপূর্ণাপূজা উপলক্ষে মাধববাবু নামে জনৈক গ্রামবাসীর প্রায় একশত বিঘা জমির উপর পনরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা 'মাধবের মেলা' নামে পরিচিত। মেলাটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দশ সহস্র নরনারী মোটরবাসে এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, ঔষধপত্র, লাঙ্গল-জোয়াল-দা-কুড়ুল প্রভৃতি কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধামা-কুলা, মাটির হাঁড়িকুড়ি-খেলনা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় তিন-চারিশত দোকান বসে। মেলার বিক্রেতারা প্রধানতঃ মহিষাদল ও তমলুক থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক ও সার্কাসের দল আসে এবং সিনেমা প্রদর্শনী ও যাত্রাভিনয় হয়। অনুষ্ঠানগুলিতে প্রায় আট-দশ সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

দোলযাত্রার মেলা

বাড় বাসুদেবপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল-যাত্রা উৎসব উপলক্ষে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর দুইদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

বড়বাড়ী, চকলালপুর, বাড় বাজিতপুর, ডালিকচক, ছাদিয়া, কুকুড়াহাটি, বালুহাটা, মহিষাদল ইত্যাদি গ্রামগুলি হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় সহস্রাধিক নরনারী মোটরবাস করিয়া ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, কারুশিল্পজাত জিনিসপত্র ইত্যাদির প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ সুতাহাটা, মহিষাদল, বালুহাটা, কুকুড়াহাটা প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন। তাহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিকের দল আসে এবং জলসা ও যাত্রাভিনয় হয়। ইহা ব্যতীত অনেকে লটারী খেলিয়া থাকেন।

শীতলাপূজার মেলা

বরদা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা উপলক্ষে স্থানীয় শীতলামন্দির সংলগ্ন জমিতে সপ্তাহকাল-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে বিক্রেতারা এবং সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, চা-পান ইত্যাদি জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকান বসে বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিকের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় ও প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা হয়।

শিবরাত্রির মেলা

কিসমত শিবরামনগর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে জনৈক গ্রামবাসীর প্রায় এক বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম ব্যতীত মনোহরপুর, গোবিন্দপুর, ডিহি শিবরামনগর প্রভৃতি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড় ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং অনেকে লটারী খেলিয়া থাকেন। গ্রামেই একটি যাত্রাদল আছে।



গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ ইড়পালা। ১৭।৭২৪'৭২।৪৩৬।২,৩৪১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, সদ্‌গোপ, মাহিষ্য, গোপ, কুমার, মাঝি, দুলে, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, হাড়ী ও ডোম।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে খড়ারগামী মোটরবাসে করিয়া ঘাটাল-বরদা হইয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। ইহা ব্যতীত, নৌকাযোগে গ্রামে যাতায়াত করিতে পারা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে লক্ষ্মীজনার্দনজীউর রথযাত্রা উৎসব, ফাল্গুন মাসে দামোদরজীউর রথযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন। মেলাটি গত প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ বসিতেছে। মেলায় আশপাশের গ্রাম হইতে প্রায় এক সহস্র নরনারী আসেন এবং খাবার, মনিহারী প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় পঁচিশটি দোকানপাট বসে।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির, একটি দামোদরজীউ-মন্দির একটি লক্ষ্মীজনার্দনজীউমন্দির ব্যতীত একটি পঞ্চানন্দ, আটটি শীতলা এবং নয়টি মনসা আছে।

শ্রীআশুতোষ সরকার, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ ইড়পালা, মেদিনীপুর।

২। গ্রাম ঃ বরদা (মৌজা ঃ শিবপুর)।
৬৯।১৭৯'১৪।১৭১।৮৫৬

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, রাজপুত, বাগ্দী, মাহিষ্য, তাঁতী, কামার, কুমার, তেলী, মালাকার, সদ্‌গোপ, গোপ ও নমঃশূদ্র।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কোলাঘাট হইতে স্টীমার অথবা নৌকাযোগে কিংবা ঘাটালগামী মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়। ইহা ছাড়া, চন্দ্রকোণা রোড স্টেশন হইতে মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং পৌষ-সংক্রান্তিতে মকরস্নান ও বিশালাক্ষীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং বিশালাক্ষীদেবীর পূজাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী। মকরস্নানের মেলা। পৌষসংক্রান্তিতে একদিন।

বিশালাক্ষীপূজার মেলা। পৌষ মাসে একদিনের জন্য বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে নাটমন্দির ও ভোগরন্ধন ঘরসহ ইষ্টক নির্মিত একটি বিশালাক্ষীমন্দির আছে। মন্দিরটি চেতুয়া পরগণার জমিদার রাজা শোভা সিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানা যায়। ইহা ভিন্ন, গ্রামে একটি প্রাচীন পরীখা দৃষ্ট হয় এবং রণসাগর, সিংসাগর, রাধাসাগর, চংদারদীঘি প্রভৃতি নামে কয়েকটি প্রাচীন দীঘি আছে।

শ্রীসুবল চন্দ্র সামন্ত, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ শিবপুর, পোঃ রথিপুর,
মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম ঃ কণকপুর। ১২৩।১৪০'২৬।৩৪।২১৩

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, নাপিত ও ধোপা। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কোলাঘাট হইতে স্টীমার বা নৌকা-যোগে অথবা ঘাটালগামী মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়। চন্দ্রকোণা রোড স্টেশন হইতে মোটরবাসে করিয়াও গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে শীতলাপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি বহুকালের প্রাচীন এবং সর্বজনীন।

(ঙ) শীতলাপূজার মেলা। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ও শীতলামন্দির ব্যতীত একটি মনসা, একটি বাবাঠাকুর এবং একটি শীতলা আছে।

শ্রীভোলা নাথ মান্না, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ কণকপুর, পোঃ মহারাজপুর,
মেদিনীপুর।

মেলা বিবরণী

বিশালাক্ষীপূজার মেলা

বরদা গ্রামে প্রতি বৎসর বিশালাক্ষীপূজা উপলক্ষে দেবীর মন্দির সংলগ্ন প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পনর-কুড়ি সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, ধামা-কুলা এবং অন্যান্য রকমারী জিনিসপত্রের প্রায় একশত দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বরদা গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং পৌষসংক্রান্তিতে মকরস্নান উপলক্ষে যে দুইটি মেলা বসে তাহা উল্লিখিত বিশালাক্ষীপূজার মেলার অনুরূপ।

শীতলাপূজার মেলা

কণকপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে শীতলাপূজা উপলক্ষে দেবীর মন্দির সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

টুবলী, বাড় গোবিন্দ, কালিচক্, পিরিচক্, ধর্মপুর, নারায়ণপুর, মান্দারপুর, এলাচক্, কুণ্ডপুর, সিংহচক্ প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী ও পান-বিড়ি ইত্যাদির কয়েকটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণ স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য কীর্তনগান এবং যাত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।



গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ যদুপুর। ২৭।২১৮'৮৮।৮২।৪৫৩

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, নাপিত, তাঁতী, জেলে ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়। গ্রামটিতে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন পাঁশকুড়া এবং বাসষ্ট্যাণ্ড নাড়াজোল। নৌকাযোগে সুরতপুর হইয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী ও কালীয়াদমন উৎসব এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব ব্যতীত জনৈক বৈষ্ণব সাধকের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রাচীন।

(ঙ) কালীয়াদমন উৎসবের মেলা। ভাদ্র মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি খুব সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি শীতলামন্দির, একটি বিষ্ণুমন্দির, একটি হরিমন্দির এবং জনৈক বৈষ্ণব সাধকের সমাধি মন্দির আছে।

শ্রীকানাই লাল খাটুয়া, শিক্ষক,
গ্রাম : যদুপুর, পোঃ চেতুয়া রাজনগর,
মেদিনীপুর।

২। গ্রাম ঃ বাসুদেবপুর। ৬৩।৫০৬'৪৪।২৫৭।১,২৯৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নরশাখ, মাহিষ্য, বাগ্দী, দুলে, হাড়ী, ডোম ও মাল। গ্রামে বিদ্যাবাগীশপাড়া, ন্যায়ভূষণপাড়া, বিদ্যালঙ্কারপাড়া, দক্ষিণপাড়া, উড়িয়াপাড়া, উত্তরপাড়া ও মালপাড়া নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে সাইকেল রিক্সা করিয়া অথবা হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে মহাপ্রভুর রথযাত্রা উৎসব ও অমাবস্যা তিথিতে শ্মশানকালীপূজা, আশ্বিন মাসে জয়চণ্ডীমন্দিরে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসে শীতলা তথা দেশপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্মশানকালীপূজাটি ১২৪১ বঙ্গাব্দে প্রবর্তিত হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। বৈশাখ মাসে দুইদিনব্যাপী। দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে বিজয়াদশমী তিথিতে একদিন। মেলা দুইটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি শীতলামন্দির আছে। উহার একটিতে শীতলাসহ পঞ্চানন্দ ও মনসার মূর্তি এবং অপরটিতে কেবলমাত্র একটি ঘট স্থাপিত আছে। ইহা ব্যতীত, জয়চণ্ডীর মন্দিরে দুর্গাপ্রতিমা এবং মহাপ্রভুমন্দিরে জগন্নাথদেবের দারুমূর্তি ও ধর্মরাজমন্দিরে ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছে।

গ্রামের অন্যতম প্রাচীন পরিবার ভট্টাচার্যদিগের গৃহে সেবিত বাসুদেব বিগ্রহের নামানুসারেই গ্রামের নাম বাসুদেবপুর হইয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম : বাসুদেবপুর, পোঃ শঙ্করপুর
মেদিনীপুর।
ও
শ্রীতুলসীচরণ সেন, প্রধান শিক্ষক,
বাসুদেবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ শঙ্করপুর, মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম ঃ ফতেপুর (মৌজা ঃ নবীন মহেশপুর)। ১৩৩।১২৫'৮১।৭১।৩৭০

(ক) মাহিষ্য ও নাপিত। গ্রামে পূর্বপাড়া ও পশ্চিমপাড়া নামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাঁশকুড়া।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে রাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রা ও রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি সর্বজনীন এবং সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে সপ্তাহকালব্যাপী। মেলাটি গত প্রায় দশ বৎসর যাবৎ বসিতেছে।

(চ) গ্রামে একটি শিব, একটি পঞ্চানন্দ এবং একটি শীতলা আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ মৎসগেড়িয়া, পোঃ চেতুয়া রাজনগর,
মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম : চক বোয়ালিয়া। ১৪৬।২২৪·৩০।১৫৪।৭৫৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, গোয়ালা, মাহিষ্য ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়। গ্রামটিতে দক্ষিণপাড়া, মধ্যপাড়া, পূর্বপাড়া ও পশ্চিমপাড়া নামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে ঘাটাল রোড দিয়া মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উৎসব এবং ফাল্গুন মাসে শ্মশানকালীপূজা ও দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। ফাল্গুন মাসে আটদিন-ব্যাপী। মেলাটি ১৩২৯ বঙ্গাব্দ হইতে শুরু হইয়াছে।

(চ) গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের গৃহে শীতলা ও দামোদর জীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীকুমুদপদ খাটা, শিক্ষক,
চক বোয়ালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম : জোত কেশব।
১৫৯।৩৬৫·৩২।২ ৮।১,২৭৩

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কামার, তাঁতী, রজক ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়। গ্রামটিতে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে জেলা বোর্ডের রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে এক সপ্তাহ-কালব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালীমন্দির আছে।

শ্রীগুনধর বেরা, শিক্ষক,
গ্রাম : জোত কেশব, পোঃ পলাসপাই,
মেদিনীপুর।

৬। গ্রাম : গোপালপুর। ১৯৯।৬৯৪·৫০।১৯৮।১,০০৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, রজক, কামার, হাড়ী, মাহিষ্য ও মুসলমান। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন পাঁশকুড়া হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। ইহা ব্যতীত, নৌকায় যাতায়াতেরও সুবিধা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে শীতলাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উৎসবটি দেড়শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে ছয়দিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে পঞ্চানন্দ, শিব, বাবাঠাকুর, মহাপ্রভু এবং শীতলা ব্যতীত জনৈক সাধকের সমাধি মন্দির আছে।

শ্রীকেনারাম দেশী, শিক্ষক,
গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ দাসপুর, মেদিনীপুর।

মেলা বিবরণী

কালীয়াদমন উৎসবের মেলা

যদুপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে কালীয়াদমন উৎসব উপলক্ষে কংসাবতী নদীর উভয় কূলে প্রায় দশ-বার বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

আশপাশের গ্রাম হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন সহস্র নরনারী মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বই-ছবি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলা ইত্যাদির প্রায় পনর-কুড়িটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

কালীয়াদমন উৎসব উপলক্ষে গ্রামের সীমান্তবর্তী

নদীতে নৌকায় বসিয়া কীর্তনীয়ার দল হরিনাম সংকীর্তন করেন এবং প্রায় পাঁচ-ছয়শত নরনারী নদীর উভয় কূল হইতে কীর্তনগান শ্রবণ করেন।

কালীপূজার মেলা

জোত কেশব গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে শ্যামা-পূজা উপলক্ষে দেবীর মন্দির সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা জমির উপর প্রায় এক সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, বাসনকোসন, জামা-কাপড়, বই-ছবি, দা-কোদাল, ধামা-কুলা, মাটির পুতুল, জুতা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে। বিক্রেতারা বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সন্তরণ প্রতিযোগিতা ও যাত্রাভিনয় হয় এবং ম্যাজিক, সার্কাস ও নাগর-দোলার দল আসে। কেহ কেহ লটারী খেলিয়া থাকেন।

দোলযাত্রার মেলা

ফতেপুর গ্রামে প্রতি বৎসর দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে জনৈক গ্রামবাসীর প্রায় চার-পাঁচ বিঘা জমির উপর সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র দশ বৎসর যাবৎ বসিতেছে।

দাসপুর থানার ৩নং ও ৪নং ইউনিয়ন এবং ডেবরা থানার ৭নং ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামগুলি হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের মোট প্রায় এক সহস্র নরনারী গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, বাসনকোসন, মনিহারী, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কাস্তে, কাটারী, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকান বসে। মেলার বিক্রেতারা প্রধানতঃ সামাটবেড়্যা, কলা-চন্দনপুর, সরবেড়িয়া, গোলগ্রাম, কৃষ্ণনগর, ভিতরবেড়িয়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক, পুতুলনাচ এবং যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানগুলিতে প্রায় ছয়-সাত-শত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

রথযাত্রার মেলা

বাসুদেবপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে মহাপ্রভুর রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে ধর্মঠাকুরের মন্দির সংলগ্ন প্রায় তিন-চার বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি তিন শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, বাসনকোসন, মনিহারী, ঔষধপত্র, কাপড়চোপড়, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র ইত্যাদির দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় সহস্রাধিক দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বাসুদেবপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত আশ্বিন মাসে বিজয়াদশমীর মেলাটি উল্লিখিত রথযাত্রার মেলার অনুরূপ।

সরস্বতীপূজার মেলা

গোপালপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর ছয়-দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দশ সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, বাসনকোসন, মনিহারী, বই-ছবি, জামা-কাপড়, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় দুইশত দোকান বসে। মেলার বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয় ও হরিনাম সংকীর্তন হয়। প্রায় পাঁচ-ছয়শত দর্শক ও শ্রোতা আসেন।

থানা ঃ চন্দ্রকোণা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : ঘোলা। ১৪।১৩৮·৭৮।৩৮।২০৩

(ক) সদ্‌গোপ ও বাগ্দী। গ্রামটিতে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন গড়বেতা হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, আষাঢ় মাসে রাধাগোবিন্দজীউকে কেন্দ্র করিয়া হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, পৌষ মাসে কুড়ুর্থা নামক ঠাকুরের শিরনী উৎসব এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা ও উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। আষাঢ় মাসে চারদিন-ব্যাপী।

কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কালীমন্দির ও শীতলামন্দির ব্যতীত দুইটি মনসা ও দুইটি শীতলা আছে।

শ্রীহরেকৃষ্ণ পাঞ্জা, কৃষিজীবী,
গ্রাম : ঘোলা, পোঃ জাড়া,
মেদিনীপুর।

২। গ্রাম : শ্রীনগর। ২৭।৯২৩·৯২।১৮৩।৮৯৬

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, দুলে, মাঝি, বাগ্দী, কামার, নমঃশূদ্র, মুচি ও সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন গড়বেতা হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ মাসে রাধাগোবিন্দজীউর রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি স্থানীয় চৌধুরী পরিবারের পারিবারিক উৎসব এবং প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। মাঘ মাসে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন একদিন। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রাধাগোবিন্দজীউর মন্দিরে গোবিন্দজীউর প্রস্তরমূর্তি ও রাধার অষ্টধাতু নির্মিত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত শিব, বিষ্ণু, শীতলা, মনসা, ধর্মরাজ, শ্যামসুন্দর এবং জগৎরায় প্রভৃতি দেবদেবী আছে।

অতীতে শ্রীনগর একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। ইহার নিদর্শনস্বরূপ এখনও গ্রামের মধ্যে নানাস্থানে ভগ্নপ্রায় মূর্তি ও প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরাখাল রাজ চট্টোপাধ্যায়, কৃষিজীবী,
গ্রাম ও পোঃ শ্রীনগর,
মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম : ক্ষিরাটি। ৫৪।২০৪·৮৭।১০৫।৫২৭

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, নাপিত, মাঝি, হাড়ী ও মুচি। গ্রামটিতে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন গড়বেতা হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি গ্রামের রায় পরিবারের দ্বারা পরিচালিত এবং প্রায় আশি বৎসরের প্রাচীন। দোলযাত্রা উপলক্ষে উৎসব প্রাঙ্গণে কয়েকটি দোকানপাট বসে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে দ্বাদশটি শিবমন্দির, একটি দুর্গামন্দির, একটি চণ্ডীমন্দির, একটি রাসমঞ্চ এবং নহবৎখানাসহ একটি বিষ্ণুমন্দির ব্যতীত দুইটি পঞ্চানন্দ, দুইটি শীতলা, দুইটি মনসা, একটি কালী, একটি মদনমোহন প্রভৃতি দেব-

দেবী আছে। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটি তেঁতুল গাছের নীচে ক্ষিরাইচণ্ডীর স্থান আছে। সম্ভবতঃ ক্ষিরাইচণ্ডীর নামানুসারেই গ্রামের নাম ক্ষিরাটি হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ কোলে, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ ভগবন্তপুর,
মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম : ভৈরবপুর। ৫৫।৫৬৩৮৯।১৯০।৯৪৩

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, মাঝি, কুমার, গোয়ালা ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে চন্দ্রকোণা শহরগামী মোটরবাসে করিয়া এবং শীলাবতী নদীতে নৌকা করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি সর্বজনীন এবং ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিন-ব্যাপী।

(চ) গ্রামে শিবমন্দির, ধর্মরাজমন্দির ও শীতলামন্দির এবং খেলারায় ও শীতলাঠাকুর আছে। ইহা ব্যতীত, গ্রামে বনদেবতা ভৈরব ঠাকুরের স্থান আছে। ভৈরব ঠাকুরের নামানুসারে সম্ভবতঃ গ্রামের নাম ভৈরবপুর হইয়াছে।

শ্রীপরেশ নাথ ব্যানার্জী, শিক্ষক,
ভৈরবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম : ধাইখণ্ড। ১৩২।২৯৩৬২।৫১।২৭৬

(ক) সদ্গোপ, মাঝি, মাহালী, মুচি ও মুসলমান। গ্রামটিতে মাঝিপাড়া, রায়পাড়া, মাহালীপাড়া, মুচিপাড়া ও মুসলমানপাড়া নামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে চন্দ্রকোণা শহরগামী মোটরবাসযোগে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে পঞ্চমরাত্রিব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি মাত্র গত ষোল বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) মহোৎসব উপলক্ষে মেলা। ফাল্গুন মাসে ছয়-দিনব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ, দুইটি বাবাঠাকুর, একটি শীতলা এবং দুইটি মনসা আছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
ধাইখণ্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ছত্রগঞ্জ, মেদিনীপুর।

৬। গ্রাম : পরমানন্দপুর। ১৩৭।১৫৮৭৪।৭০।৪৩৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বাগ্দী, সদ্গোপ, তাম্বুলী, স্বর্ণকার, একাদশ তিলি, ছুতার ও গন্ধবণিক। গ্রামটিতে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা হইতে চন্দ্রকোণা শহর-গামী মোটরবাসে করিয়া অথবা শীলাবতী নদীতে নৌকা-যোগে গ্রামে যাতায়াত করিতে পারা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে রাধাগোবিন্দজীউ বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া নামসংকীর্তন মহোৎসব ও বসুন্ধরা-পূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে রক্ষাকালীপূজা, শ্রাবন মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কার্তিক-পূজা, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব, পৌষ মাসে রঙ্কিনী-দেবীর অন্নভোগ উৎসব ও মকরস্নান, মাঘ মাসে সরস্বতী-পূজা, চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা ও গাজন উৎসব এবং প্রতি দশ বৎসর অন্তর সরলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) রঙ্কিনীপূজার মেলা। পৌষমাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি ভগ্নদশাপ্রাপ্ত আটচালা মন্দিরে রঙ্কিনীদেবীর শিলা মূর্তি এবং শিব প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত, গ্রামে একটি মনসা এবং একটি বাবাঠাকুর আছে।

শ্রীক্ষুদিরাম পাল, প্রধান শিক্ষক,
বামুনিয়া বান্ধব উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৭। গ্রাম : জাড়া। ১৫২।১,৬০৫২৯।৫১৭।৩,১৫৮

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, কামার, কুমার, বর্গক্ষত্রিয়, তেলী, তাম্বুলী, মাঝি, মেটে, ডোম, তাঁতী, জেলে, রজক,

নাপিত, গোয়ালা, মেথর, হাড়ী, মুচি ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে বারিকপাড়া, মাঝিপাড়া, মেটেপাড়া, বাবুপাড়া, চৌধুরীপাড়া, বাগ্দীপাড়া, পাঁজাপাড়া, জেলেপাড়া, ভট্টাচার্য-পাড়া, পালপাড়া, ভুইয়াপাড়া, মুচিপাড়া, বেনেপাড়া, দুলে-পাড়া, কুমারপাড়া, নায়েকপাড়া, সরকারপাড়া, চক্‌বাজার-পাড়া, চক্রবর্তীপাড়া, সাঁতরাপাড়া, গোয়ালাপাড়া, করবেড়ে ও সাঁওতালপাড়া নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা হইতে চন্দ্রকোণা শহরগামী মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে পঞ্চরাত্রিব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গা-পূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও রাসযাত্রা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা ও অন্নপূর্ণাপূজা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে চড়ক ও শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন। মেলাটি প্রায় ছত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা শিবমন্দির ব্যতীত একটি পঞ্চানন্দ, একটি ক্ষেত্রপাল, তিনটি মনসা, একটি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, একটি স্বরূপনারায়ণ, একটি জগৎরায় এবং বারটি শীতলা আছে।

শ্রীমৃগাঙ্ক নাথ রায়, কৃষিকাম,
গ্রাম ও পোঃ ঝাড়া,
মেদিনীপুর।

৮। গ্রাম : তাতারপুর। ১৬৫।৪২৪'৪৭।১২৭ ৬৪২

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, দুলে, বর্গক্ষত্রিয়, ডোম, মাঝি, হাড়ী, গোয়ালা ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে দুলেপাড়া, সদ্‌গোপপাড়া, মাঝিপাড়া, পালপাড়া, মণ্ডলপাড়া, রায়পাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড। ক্ষীরপাই-রামজীবনপুর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে বিশালাক্ষীপূজা ও দোলযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা ও শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন এবং সর্বজনীন।

(ঙ) বিশালাক্ষীপূজার মেলা। ফাল্গুন মাসে দুইদিন-ব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে বিশালাক্ষী দেবীর প্রস্তর ফলকে অঙ্কিত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত একটি পঞ্চানন্দ, একটি বাবাঠাকুর, একটি মনসা, একটি বুড়াশিব প্রভৃতি দেবদেবী আছে।

শ্রীসতীশ চন্দ্র পাল, কৃষিকাম,
গ্রাম ও পোঃ তাতারপুর,
মেদিনীপুর।

৯। গ্রাম : ক্ষিরা। ১৮৪।২১৮'৩৬।২৭।২০০

(ক) ব্রাহ্মণ ও সদ্‌গোপ। গ্রামটিতে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিব, একটি শীতলা এবং একটি সিংহবাহিনী দেবী আছে। গ্রামের মধ্যে অবস্থিত একটি উচ্চ ঢিপিকে স্থানীয় লোক পবিত্র স্থান বলিয়া মনে করেন এবং ঐ ঢিপির উপর শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীদিবাকর চক্রবর্তী, গ্রামসেবক,
চন্দ্রকোণা ৫ নং ইউনিয়ন,
মেদিনীপুর।

১০। গ্রাম : কঙ্কাবতী। ১৮'৯।৫০৮'০৪।১৫২।৭২৫

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, বর্গক্ষত্রিয়, কামার, দুলে, মুচি, হাড়ী ও মাঝি। গ্রামটিতে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি সর্বজনীন এবং শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) শীতলাপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে ছয়দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মাটির ঘরে শীতলার শীলা মূর্তি আছে। ইহা ব্যতীত একটি পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর এবং মনসা আছে।

শ্রীনন্দদুলাল পালধি,
গ্রাম : গাংচা, পোঃ ঝাকরা,
মেদিনীপুর।

১ । গ্রাম : বহুয়া (মৌজা : বারা)। ২০৮।৪৩৭৭৩।১১৬।৫৯৯

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, হাড়ী, দুলে, রজক, মাঝি ও কামার।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে চন্দ্রকোণা-ঘাটাল রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে চাঁচর ও দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কৃষ্ণরায়জীউমন্দির ব্যতীত একটি শীতলা ও একটি মনসা আছে।

শ্রীবীরেন্দ্র কান্ত চক্রবর্তী, গ্রামসেবক,
গ্রাম : কালিকাপুর, পোঃ বাঁকা,
মেদিনীপুর।

১২। গ্রাম : ভবানীপুর। ২১১।৬০৯৮৫।৪৩।৪০০

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, মাহিষ্য, মাঝি ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে তেরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে ঘাটালগামী মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে ভবানীদেবীর পূজা, আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভবানীদেবী স্থানীয় অঞ্চলের গ্রাম্যদেবী এবং দুর্গার ধ্যানে ইহার পূজা করা হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রাচীন।

(ঙ) ভবানীপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে।

(চ) গ্রামে একটি আটচালা শিবমন্দির এবং একটি শীতলামন্দির ব্যতীত মনসা, বাবাঠাকুর, পঞ্চানন্দ, মঙ্গলচণ্ডী এবং ভবানীদেবী ও বেনেবুড়ী নামে এক গ্রাম্যদেবীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীচরমোহন চক্রবর্তী, কৃষিজীবী,
গ্রাম : ভবানীপুর, পোঃ বাঁকা,
মেদিনীপুর।

১৩। গ্রাম : বাগপোতা। ২১২।৪৯৬২৪।১০০।৮১৬

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ, কামার, বর্গক্ষত্রিয় ও মাঝি।

(খ) কৃষিকার্য

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে ঘাটাল-চন্দ্রকোণা রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে রক্ষাকালীপূজা ও হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, মাঘ মাসে শীতলাপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রক্ষাকালীপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিন-ব্যাপী।

গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলা দুইটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালীমন্দির ব্যতীত তিনটি শীতলা ও দুইটি মনসা আছে।

শ্রীজলধর পাত্র, প্রধান শিক্ষক,
বাগপোতা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

১৪। গ্রাম : শ্রীরামপুর আটঘরা।
২৩২।২৯১'৭৬।১১৫।৬১৩

(ক) সদ্‌গোপ, মাহিষ্য, নাপিত, কামার, ধোপা, জেলে ও মুচি। গ্রামে চৌদ্দটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে বাঁকাঘাট রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে রক্ষাকালীপূজা, হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব এবং আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালীমন্দির এবং একটি শীতলামন্দির ব্যতীত একটি পঞ্চানন্দ, একটি মনসা, দুইটি শীতলা, একটি ধাবাঠাকুর এবং 'মেকীবুড়ি' নামে একটি বনদেবীর স্থান আছে।

শ্রীহরমোহন চক্রবর্তী, শিক্ষক,
শ্রীরামপুর বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

১৫। গ্রাম : গাংচা। ২৬৬।৩০০'৫৭।৩৬।২৫৮

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ ও ধোপা।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে ঘাটালের রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে রক্ষাকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে সপ্তাহকাল-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। মেলায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় দেড় সহস্র নরনারী আসেন এবং প্রায় একশত দোকানপাট বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় ও লটারী খেলা হয়।

(চ) গ্রামে একটি মাটির ঘরে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ছাড়া, গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ, একটি শীতলা এবং একটি মনসা আছে।

শ্রীনন্দদুলাল পালাধি, শিক্ষক,
গ্রাম : গাংচা, পোঃ ঝাকরা,
মেদিনীপুর।

১৬। গ্রাম : ডিঙ্গাল। ২৭৯।৫০৪'১৩।৯৮।৪৭৭

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, কামার, বর্গক্ষত্রিয়, জেলে, মাহিষ্য, কলু, হাড়ী, ডোম, গোয়ালা, মাঝি ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে বর্গক্ষত্রিয়পাড়া, জেলেপাড়া, সাঁওতালপাড়া, কলুপাড়া, হাড়ীপাড়া, মাঝিপাড়া, মাহিষ্যপাড়া, ডোমপাড়া, গোয়ালাপাড়া প্রভৃতি নামে এগারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে চন্দ্রকোণা-ঘাটাল রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে রক্ষাকালীপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব এবং চৈত্র মাসে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে আটদিনব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি বৃহৎ শিবমন্দির, একটি মাটির ঘরে শীতলা ও পঞ্চানন্দ এবং একটি ছোট পাকা মন্দিরে সত্যপীরের স্থান আছে। ইহা ব্যতীত, গ্রামে বাবাঠাকুর ও শীতলা আছে।

শ্রীবগলা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষিজীবী,
গ্রাম : ডিঙ্গাল, পোঃ মনোহরপুর,
মেদিনীপুর।

চন্দ্রকোণা

খড়্গপুর জংশন হইতে ৩০ মাইল দূরে চন্দ্রকোণা রোড। স্টেশন হইতে চন্দ্রকোণা শহর মোটরবাসযোগে ২১ মাইল। ইহা ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত। প্রবাদ আছে যে, বহুকাল পূর্বে এখানে চন্দ্রকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে চন্দ্রকোণা নাম হইয়াছে। রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ এখনও চন্দ্রকোণার প্রাচীনত্বের পরিচয় প্রদান করে।

কথিত আছে, এককালে চন্দ্রকোণা নগরে বাহান্নটি বাজার ছিল। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত ভ্যালেন্টাইনের মানচিত্রে চন্দ্রকোণাকে (Sjandercona) শিলাবতী নদীর তীরে একটি সমৃদ্ধ নগর বলিয়া দেখান হইয়াছে।

চন্দ্রকোণার দক্ষিণে প্রাচীন হিন্দুরাজগণের দ্বাদশদ্বারী বা "বারদুয়ারী" নামক গড়ের ভগ্নাবশেষের নিকটেই রাজ বংশের প্রতিষ্ঠিত মল্লেশ্বর ও উজ্জনাথ শিব আজিও বিদ্যমান। কথিত আছে, কালাপাহাড়ের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুজারীগণ মল্লেশ্বরকে প্রস্তর দিয়া মুড়িয়া ফেলেন ও উজ্জনাথকে লইয়া এক বটবৃক্ষ মূলে স্থাপন করেন। কালাপাহাড় শূন্য মন্দির ধ্বংস করিয়া চলিয়া যান। মল্লেশ্বরের বর্তমান সুন্দর মন্দিরটি বর্ধমানের মহা-রাজা কীর্তিচন্দ্রের দ্বারা নির্মিত। মল্লেশ্বর আজিও প্রস্তরাবৃত আছেন। ইঁহার মন্দিরের নিকটে উন্মুক্ত আকাশ তলে এক বটবৃক্ষের মূল আশ্রয় করিয়া উজ্জনাথ মহাদেব বিদ্যমান। যতবারই ইঁহার জন্য মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে ততবারই তাহা বজ্রপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈবদুর্ঘটনার দ্বারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

চন্দ্রকোণায় রাজমাতা লক্ষ্মণাবতীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "রাজার মার পুকুর" নামে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে। "রাজার মার কালীও" বিশেষ প্রসিদ্ধ। চন্দ্রকোণায় বড়, মধ্যম ও ছোট অস্থল নামে তিনটি মঠে রামচন্দ্রের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পশ্চিম ভারতীয় তিনজন বৈষ্ণব মোহান্ত এই আখড়া তিনটির পরিচালক। এখানে নানক পন্থীদেরও একটি মঠ আছে।

চৌহানবংশীয় রাজাদের আমলে চন্দ্রকোণার পশ্চিম প্রান্তে রামগড় ও লালগড় নামে দুইটি দুর্গ নির্মিত হইয়া-ছিল। তন্মধ্যে ১৫২২ খৃষ্টাব্দে রামগড় দুর্গে রঘুনাথজীউর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৫৭৭ শকাব্দায় (১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে) প্রাচীন দ্বাদশদ্বারী দুর্গ হইতে গিরিধারীজীউকে আনয়ন করিয়া লালগড় দুর্গে স্থাপিত করা হইয়াছিল। তথায় গিরিধারীজীউর জন্য একটি সুদৃশ্য নবরত্ন মন্দিরও নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অষ্টধাতুনির্মিত রঘুনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লালগড় দুর্গের অভ্যন্তরস্থ নবরত্ন মন্দিরটিও ধ্বংস হইলে গিরিধারীজীউকেও উত্তরকালে তথা হইতে আনয়ন করিয়া রঘুনাথজীউর মন্দিরের নিকটে একটি নূতন মন্দির নির্মাণ করিয়া স্থাপন করা হইয়াছিল। লালগড় হইতে আনীত হইবার পর হইতে গিরিধারীজীউ লালজীউ নামে অভিহিত হইতেছেন। গিরিধারীজীউর পুরাতন নবরত্ন মন্দিরে যে প্রস্তর ফলকখানি ছিল তাহা এক্ষণে লালজীউর মন্দিরের সম্মুখে রক্ষিত আছে। উহা হইতে জানা যায় যে, ১৫৭৭ শকে রাজা হরিনারায়ণের পত্নী রানী লক্ষ্মণাবতী কর্তৃক গিরিধারীজীউর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রস্তর ফলকটিতে বঙ্গাক্ষরে লিখিত আছে—

"শুভমস্তু শকাব্দা ১৫৭৭।
শাকে অশ্ব মুনিবানেন্দৌ বৈশাখে শুক্লপক্ষকে
তৃতীয়ায়াং ভৃগুদিনে শ্রীযুতস্য বভূবহ।
হরিনারায়ণ ভূপস্য পত্নী শ্রীলক্ষ্মণাবতী
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রীত্যৈ নবরত্ন মিদংদদৌ॥
রাধাকৃষ্ণ পদারবিন্দ রসিকা শ্রীবীরভার্ণে বৈধূঃ
খ্যাত শ্রীহরিভূপতেশ্চ বণিতা শ্রীহোলরাজাত্মজ।
মাতা শ্রীযুত মিত্রসেন নৃপতৌবিখ্যাত কান্তেমিতৌ
শ্রীনারায়ণ মল্লভূপ ভগিনী-রম্য দদৌ মন্দিরং॥
গিরিধারী পদাম্বোজে নবরত্ন মিদং শুভং
নির্মায় বহু যত্নেন সমর্পিতবতীমুখ॥"

লালজীউর মন্দিরটি বঙ্গীয় শিল্প পদ্ধতি অনুসারে নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু রঘুনাথজীউর মন্দিরটি উৎকল স্থাপত্যের নিদর্শন। লালজীউর মন্দিরের সম্মুখে একটি নাট্য মন্দির আছে এবং উহার অনতিদূরে কামেশ্বর মহাদেবের একটি পঞ্চরত্ন মন্দিরও আছে। উহারই দক্ষিণ-পশ্চিমে রাসমঞ্চ। খোদিত লিপি হইতে জানা যায়, কামেশ্বর মহাদেবও ১৫৭৭ শকাব্দায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত মন্দির সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। পূর্বদিকে সুবৃহৎ প্রবেশদ্বার। এই স্থানটি 'রঘুনাথগড় ঠাকুরবাড়ী' নামে পরিচিত এবং যে গ্রামে এই ঠাকুরবাড়ীটি অবস্থিত উহা 'অযোধ্যা' নামে অভিহিত হইতেছে। তদানীন্তন বর্ধমানাধিপতি মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর ১২৩৮ সালে (খৃঃ অঃ ১৮৩১) ঐ সকল পুরাতন মন্দিরগুলির সংস্কার ও আবশ্যকীয় নূতন মন্দির ও প্রাচীরাদি নির্মাণ করিয়া দিয়া প্রাচীন দেবতাগুলিকে সুশোভন করেন। তদবধি বর্তমানকাল পর্যন্ত বর্ধমান

রাজবংশের আনুকূল্যে প্রাচীন কীর্তিগুলি সজীবভাবে রক্ষিত হইতেছে।

রঘুনাথ ঠাকুরবাড়ীর সম্মুখে লালজীউ ও রঘুনাথজীউর কারুকার্যবিশিষ্ট দুইখানি রথ আছে। দশহরার দিবস রথযাত্রা ও রঘুনাথজীউর পূজা উৎসব উপলক্ষে চন্দ্রকোণায় দুইটি বৃহৎ মেলা বসে। সে সময় তথায় সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে এবং নানাপ্রকার দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী হয়। এই সকল উৎসবের খরচ, দেবতাদিগের নিত্য নৈমিত্তিক সেবা-পূজাদির ব্যয় এবং অতিথি-অভ্যাগত-দিগের সৎকারের জন্য বর্ধমানরাজ বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন।

(পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ' দ্বিতীয় খণ্ড এবং শ্রীযোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থ অবলম্বনে।)

চন্দ্রকোণার "সতীমন্দির" সম্পর্কে 'ভারত পুত্রম' ছদ্মনামে জনৈক ব্যক্তির লিখিত একটি কাহিনী ১৯৫৮ সনের ১২ই নভেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়। উহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

"মেদিনীপুরের এই চন্দ্রকোণায় মন্দির গড়লেন হরিভানু সিংহ। চন্দ্রকোণার রাজা হরিভানু সিংহ। মন্দির গড়লেন, সতীমন্দির। চন্দ্রকোণায় মন্দিরের অভাব নেই। লালজী, রঘুনাথজী, মল্লেশ্বর মহাদেব—আরও কতো মন্দির চন্দ্রকোণায়, ও তার আশেপাশে। কী সুন্দর তাদের কারুকার্য।

হরিভানু সিংহ সে পথে গেলেন না। জনারণ্য থেকে তিনি সরে এলেন দূরে। নির্জনে। নিভৃতে। সাগর-প্রিয়া শীলাবতী যেখানে মাটি ছুঁয়ে সাগর-সন্ধানে গেছে সেইখানে। নিজের নামে স্থাপন করলেন হরিসিংহপুর। ছোট্ট গ্রাম। ফুলে ফুলে ছাওয়া। কৃষ্ণচূড়া, বনকেতকী, রজনীগন্ধায় ভরা। স্থাপন করলেন মন্দির। সতীমন্দির। কিন্তু রাজার অহঙ্কার গাঁথলেন না তিনি মন্দিরের গায়। মন্দির হলো সাদা-মাঠা। একটি অনাহত স্বরের মতো একটি সাধারণ মন্দির। শুধু একটি মাধবীলতাকে উঠিয়ে দেয়া হলো। মাধবীলতা ঘুরে ফিরে মন্দিরের গা জড়িয়ে জড়িয়ে উপরে উঠে গেলো। হরিভানু সিংহ মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপন করলেন। লোক এলো দূরদূরান্ত থেকে। 'হ্যাঁ, এইতো কাজের মতো কাজ। রাজ্য বলো, ঐশ্বর্য বলো—সব মিছে। সবই ধূলোর স্তূপ। দু' দিনেই ভেঙে যায়। পথের ধূলা পথে উড়ে যায়। কিন্তু এই দেবতার পীঠ? এ হলো অক্ষয়। অব্যয়। কালের চাকার কালি এর গায় পড়বে না কোন দিন।' পথে আসতে আসতে অনেকেই অনেক কথা বললে। ধন্য ধন্য করলে হরিভানু সিংহকে।

সতীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হলো।

ভক্তকণ্ঠে উঠলো আকাশ ফাটা ধ্বনি, 'জয় মা, মাগো!'

বিগ্রহের সমুখ থেকে একখানি লাল পরদা সরে গেলো!

—জয় মা, মা—' আবার জয়ধ্বনি করতে গিয়েছিল ভক্তগণ। কিন্তু তাদের আটকে কথা গেলো। মন্দিরের মূর্তির দিকে তাকিয়েই যেন চমকে উঠলে সবাই। চোখে চোখে বিস্ময় উঠলো ঝিলমিলিয়ে।

—এ কোন্ দেবী গো?

—মুই তো চিনিতে নারিছু।

—মায়ের এ রূপ তো দেখিনি কোথাও।

—রাজা তবে কোন্ দেবীর প্রতিষ্ঠা করলেন মন্দিরে? প্রশ্ন। জিজ্ঞাসা। বিস্ময়। আলোড়ন। আন্দোলন।

শীলাবতীর কুলকুল ধ্বনি ছাপিয়ে ভক্তগণের কলগুঞ্জন উঠলো।

—এ কোন্ দেবী? এ কোন্ দেবী।

—এ তো দেবী নয়।' একজন লোক এতক্ষণ কৃষ্ণ-চূড়ার ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল। মাঝামাঝি বয়েস। কাঁচা-পাকায় মেলানো মাথার চুল। চন্দ্রকোণায়ই তার বাড়ী। রাজপরিবারের সঙ্গেও নাকি তার কোন্সূত্রে আত্মীয়তা আছে।

সে-ই এগিয়ে এসে বললে, 'এ তো দেবী নয়।'

দেবী নয়? তবে—

—মানবী।

—মানবী?'

—হ্যাঁ।

—দেবীর আসনে মানবী?

—হ্যাঁ, মানবী। রাজমহিষী লক্ষণাবতী।

রাজমহিষী লক্ষ্মণাবতী, হরিভানু সিংহের পত্নী লক্ষ্মণাবতী! লক্ষ্মণাবতী দেবীর আসনে? চারদিকে কোলাহল ক্রমেই যেন বেড়ে গেলো।

—এ কি অনাচার! এ কি অহঙ্কার! দেবীর আসনে মানবী? কোথায়—কোথায় মহারাজ!

—রাজা! মহারাজ!

হরিভানু সিংহ নীরব। তাঁর দু' চোখের কোল বেয়ে অঝোরে জল—গড়িয়ে পড়ছে।

—মহারাজ! একি অনাচার, দেবীর আসনে মানবী!

হরিভানু সিংহের চোখের জল আরও যেন বেড়ে গেলো। কাপড়ের আঁচলে তা মুছে নিলেন। চোখ মেলে চাইলেন।

—রাজা! মহারাজ--একজন যেন কি বলতে গিয়েছিল। কিন্তু তার আর বলা হলো না।

হরিভানু সিংহ বাধা হলেন। বললেন, দেবী নয়, দেবী নয়, আমার মন্দিরে মানবীর অধিষ্ঠান। আমার প্রিয়ার অধিষ্ঠান। এ মন্দির আমার একার। আমি একাই এ মন্দিরের পূজারী। তোমরা যাও। চলে যাও। আমায় ভাবতে দাও। তোমরা আমায় ভাবতে দাও। তোমাদের চীৎকারে আমার লক্ষণার স্বপ্ন মুছে দিও না। বলতে বলতে আবার জল গড়িয়ে এলো—হরিভানু সিংহের চোখে। চোখের জলে দুটি কপোল সিক্ত হয়ে গেলো। লোকজন সরে পড়লো।

আবার আঁচলে চোখ মুছলেন হরিভানু সিংহ। আবার চোখ মেলে চাইলেন। শীলাবতী দক্ষিণা বাতাসে খেলছে। রোদের মুক্তা তার বুকে ঝিলমিল করছে। দূরে—অনেক দূরে, ঐ দূর বনানীর সরু সবুজ রেখাটিও ছাড়িয়ে একখানা বাটির মতো উপুর করা নীলাকাশ যেখানে শীলাবতীর বুক ছুয়েছে, হরিভানু সিংহ একবার সেইদিকেই তাকালেন। হঠাৎ যেন একটা রুদ্ধ আবেগ ফেটে পড়লো। অনেক কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন হরিভানু সিংহ। বললেন, লক্ষণা, লক্ষণা আমার, আমি আমার কথা রেখেছি। বুকে তোমায় গেঁথে রেখেছি। তোমার নামে মন্দির করেছি। অনুক্ষণ তোমায় স্মরণ করবার জন্যে সে মন্দিরে তোমায় মূর্তি করে বসিয়েছি। পৃথিবীর কোন দিন কেউ যা করেনি, সে কাজ আমি করেছি। প্রিয়াকে আমার দেবীর আসনে বসিয়েছি। লক্ষণা, লক্ষণাবতী, তুমি সুখী হয়েছো? তুমি সুখী হয়েছো?'

রাজ্য ছোট হলেও প্রতাপ কম ছিল না হরিভানু সিংহের। আশেপাশের রাজারা তাঁকে সম্মান করতেন। প্রজারা শ্রদ্ধা করতো। এই প্রতাপের কথা শুনেই বিষ্ণুপুরের রাজা হোলমল্ল নিজ কন্যা লক্ষণাবতীকে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

লক্ষণাবতীকে পেয়ে খুশী হয়েছিলেন চন্দ্রভানু সিংহ। লক্ষণাবতী সাধারণ মেয়ে নন। শুধু রূপে নয়, গুণেও তিনি ছিলেন অনন্যা। রাজপুরীর ঐশ্বর্য তিনি দেখেছেন। তার ভেতরই তিনি মানুষ হয়েছেন। কিন্তু সে ঐশ্বর্য লক্ষণাবতীর মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। রাজরাণী হয়েও তিনি ছিলেন পূজারিণী।

হরিভানু বলেছিলেন, 'তোমাকেই আমি চেয়েছিলাম লক্ষণা।' সেদিন চাঁদ ছিল আকাশে। রূপালী জ্যোছ্নায় চন্দ্রকোণার মুখে হাসি ফুটেছিল। শরতের শীর্ণা শীলাবতীর বুকও যেন উছলে উঠেছিল। দু'জনে বসেছিলেন বারান্দায়। হরিভানু আর লক্ষণাবতী। পাশের যে চাঁপা গাছটি তার মনের খুশী চেপে রাখতে না পেরে ফুল করে তাকে ফুটিয়ে দিয়েছিল, সেই চাঁপা গাছেরই ছায়া পড়েছিল সেখানে। চাঁদের আলো রূপালী ঝালরের মতো ঝুলে পড়েছিল তারই ফাঁকে। লক্ষণাবতীর কোমল আঙুলে একটু চাপ দিয়ে সেদিনই বলেছিলেন রাজা হরিভানু, 'তোমাকেই আমি চেয়েছিলাম লক্ষণা!'

লক্ষণাবতীর দীঘল দু'টি কালো চোখে একটা লজ্জার ছায়া নেমেছিল। কপোল দু'টি আরও যেন রক্তিম হয়ে উঠেছিল। বুকটা বুঝি একটু কেঁপে উঠেছিল।

হরিভানু আবার ডেকেছিলেন 'লক্ষণা!'

—রাজা!

—তুমি তো কিছু বললে না!

—'আমি?' দীঘল দুটি চোখ তুলে হরিভানুর চোখের দিকে তাকিয়েছিলেন লক্ষণাবতী। বলেছিলেন, 'আমি—ধন্য—আমি ধন্য রাজা!'

—সত্যি!

হরিভানুর চোখের উপর আবার দু'টি প্রসন্ন দৃষ্টি তুলে ধরেছিলেন লক্ষণাবতী। মুখে কিছু বলেননি।

হরিভানু বলেছিলেন, 'তোমায় না পেলে আমার বুঝি কিছুই পাওয়া হতো না।'

—তাই নাকি?' এবারে যেন একটু হাল্কা হয়ে উঠেছিলেন লক্ষণাবতী। দু'টি ঠোঁটে তাঁর হাসি ছড়িয়ে গিয়েছিল। রক্তিম দুটি গালে তার আভা লেগেছিল।

হরিভানু বলেছিলেন, 'সত্যি তাই লক্ষণা।'

—আর যদি বলি না—

লক্ষণা! লক্ষণা! একটু যেন উচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন হরিভানু সিংহ। একটা আবেগে তাঁর কণ্ঠস্বরটা কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। তা দেখে খিলখিল করে হেসে উঠেছিলেন লক্ষণা। লক্ষণাবতী বলেছিলেন, 'না গো না, এমনই তোমায় বললাম আমি। এমনিই।'

হেসেছিলেন হরিভানুও। আবার বলেছিলেন, 'তোমায় পেয়ে সবই পেলাম লক্ষণা।'

—তা হলে বলো চিরদিন মনে রাখবে আমায়।

—চিরদিন! চিরকাল! একটা দীর্ঘশ্বাস উড়ে গিয়েছিল হরিভানু সিংহের বুক থেকে। তারপর দু'জনেই ঘুমোতে গিয়েছিলেন। শীলাবতীর শীর্ণ জলরেখায় রুপালী চাঁদ তখনও মুখ দেখ্‌ছে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভেঙে গেলো স্বপ্ন। থেমে গেলো সঙ্গীত। ছিঁড়ে গেলো মধু-বাসরের মালা।

লক্ষণাবতী চোখ বুজলেন। চিরদিনের মতো।

প্রথমটায় কাঁদেননি হরিভানু সিংহ। বজ্রাহতের মতো তিনি যেন নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। থির দুটি দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলেন লক্ষণাবতীর মৃত্যু-মলিন মুখমণ্ডলের দিকে। কিন্তু পুত্র মিত্রসেন কাছে আসতেই চোখের জল আর রুখে রাখতে পারেননি হরিভানু। সেদিন যেন তাঁর বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। অঝোরে চোখের জল গড়িয়ে পড়েছিল। সেদিন উন্মাদের মতো হঠাৎ চীৎকার করে উঠেছিলেন হরিভানু, 'লক্ষণা! লক্ষণা!'

সে ডাকের আর উত্তর আসেনি।

কিন্তু উত্তর না পেলেও সে ডাক আর বন্ধ হয়নি হরিভানু সিংহের। দিন গেছে, রাত এসেছে। রোদ মরেছে। অন্ধকার নেমেছে। পথে পথে ঘুরে ফিরছেন হরিভানু সিংহ। কখনও শীলাবতীর তীরে। কখনও যৌবন-রাঙা কৃষ্ণচূড়ার স্নিগ্ধ ছায়া-কুঞ্জে। ডেকেছেন। নাম ধরে ডেকেছেন লক্ষণাবতীকে। দু' চোখের জল যেন আর শুকাতে পারেনি তাঁর। সে জলে তার বুক ভেসেছে।

মাত্র কয়েকদিন—কয়েকদিনের জন্যে বুঝি সে জল শুকিয়েছিল হরিভানুর। সেই জল টল টল চোখ দু'টি হঠাৎ যেন জলে উঠেছিল। আবার বর্ম পরেছিলেন হরিভানু সিংহ। আবার তরোয়াল হাতে নিয়েছিলেন। আবার সৈন্যবাহিনী নিয়ে রণক্ষেত্রে ছুটেছিলেন।

মোগল বাহিনী চন্দ্রকোণা আক্রমণ করেছিল।

কিন্তু পারেননি। বিশাল মোগল বাহিনীর গতি রোধ করতে—পারেননি হরিভানু সিংহ। উদ্দাম মোগল আক্রমণের মুখে তাঁর সব প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছিল।

সেদিন বড়ো ব্যথা নিয়ে সরে এসেছিলেন হরিভানু সিংহ। মোগলের সঙ্গে আপোষ করেছিলেন। মোগল সরকারের পাঁচ হাজারী মসনবদার হয়েছিলেন। সে দিন আবার চোখের আগুন নিবেছিল হরিভানু সিংহের। চোখের জলে—চোখের আগুন নিবেছিল। সেই চোখের জল নিয়েই দূরে সরে এসেছিলেন তিনি। একটি নতুন গ্রাম পত্তন করেছিলেন। হরিসিংহপুর। নতুন মন্দির স্থাপন করেছিলেন। সতীমন্দির। প্রিয়াকে বসিয়েছিলেন দেবীর আসনে।

নানা কাজে দিন কাটতো হরিভানু সিংহের। দিনই কাটতো, কোন কাজে আর মন বসতো না। মন পড়ে থাকতো শীলাবতীর তীরে। সতীমন্দিরে। রক্তলাল কৃষ্ণচূড়া ফুলের রাজ্যে।"

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

ঘোলা গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষে দেবীর মন্দির সংলগ্ন জমিতে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম ব্যতীত জাড়া, বওড়া, কচুগেড়্যা, নারায়ণপুর, মুইদে, রোজনা, সনপুর, গোবিন্দপুর, শ্রীনগর, মদনচক্, শীতাশোল প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী সাধারণতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, জামাকাপড়, বই-ছবি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের কুড়ি-পচিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কবিগান এবং হরিনাম সংকীর্তনের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় দেড় সহস্র শ্রোতার সমাগম হয়।

বাগপোতা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে রক্ষাকালী-পূজা উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন এবং প্রধানতঃ মিষ্টান্ন ও মনিহারী প্রভৃতি জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকান-পাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয় হয়।

শ্রীরামপুর আটঘরা গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে রক্ষাকালীপূজা উপলক্ষে কালীমন্দির ও শীতলামন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর তিনদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি গত প্রায় ষাট বৎসর যাবৎ বসিতেছে।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা, মাটির খেলনা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় ত্রিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য শীতলামঙ্গলগান, কীর্তন-গান এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

ডিঙ্গাল গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় আট-দশ বিঘা জমির উপর আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন।

কেশপুর, দাসপুর, ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম হইতে এবং সীমান্তবর্তী হুগলী জেলা হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় ছয় সহস্র নরনারী গরুর গাড়ীতে করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, বাসনকোসন, মনিহারী, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, লাঙ্গল-কোদাল, ধামা-কুলা, জুতা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় দুইশত দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ ঘাটাল, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, খড়ার, দাসপুর, নাড়াজোল, রাজনগর, ক্ষীরপাই প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় দেড় সহস্র শ্রোতার সমাগম হয়।

দোলযাত্রার মেলা

বহরা গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উপলক্ষে কৃষ্ণরায়জীউর মন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম ব্যতীত জাড়া, বসনঘেরা, মাংরুল, ক্ষীরপাই প্রভৃতি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী প্রধানতঃ গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

ধর্মরাজপূজার মেলা

ভৈরবপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ধর্মরাজপূজা উপলক্ষে গ্রামের উত্তর প্রান্তে প্রবাহিত শীলাবতী নদীর উভয় তীরে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে।

চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত ১ নং হইতে ৮ নং ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাচ সহস্র নরনারী গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়-চোপড়, বই-ছবি, ঔষধপত্র, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার জিনিসপত্রের প্রায় একশত দোকান বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ ঘাটাল, গড়বেতা ও চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য হরিনাম সংকীর্তন, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং জুয়া খেলা হয়।

মহোৎসবের মেলা

ধাইগড় গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর ছয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

আশপাশের গ্রাম ব্যতীত কড়াসিয়া, বামুনিয়া, রঘুনাথপুর, সিমল্যা, বোলঘাটা, রাধানগর, রামপুর, পানিছোড়া, রাস্কা, বসনছোড়া, পাথরকুদা প্রভৃতি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় সহস্রাধিক নরনারী প্রধানতঃ হাটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, জামা-কাপড়, বই-ছবি, দা-কুড়ুল ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা, ছত্রগঞ্জ, পলাশবাড়ীঘাট, নাহিরগঞ্জ, ঘাটাল প্রভৃতি গ্রাম হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কবিগান ও যাত্রাভিনয় হয়। অনুষ্ঠানগুলিতে প্রায় সহস্রাধিক দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

রথযাত্রার মেলা

জাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে গ্রামের রথতলায় প্রায় চার বিঘা জমির উপর দুইদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি গত প্রায় ছত্রিশ বৎসর যাবৎ বসিতেছে।

আশপাশের গ্রাম ব্যতীত চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত ১ নং হইতে ৬ নং ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম এবং ক্ষীরপাই রামজীবনপুর, ঘাটাল, খড়ার প্রভৃতি স্থান হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় পাচ সহস্র নরনারী ট্রেন, মোটরবাস ও গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, ধামা-কুলা, জুতা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ ঘাটাল, রামজীবনপুর, খড়ার, মেদিনীপুর, চন্দ্রকোণা এবং পুরুলিয়া হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে কোনপ্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিকের দল আসে এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় দুই সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

শ্রীনগর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে রাধাকৃষ্ণের রথযাত্রা উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী সাধারণতঃ গরুর গাড়ী করিয়া ও হাটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারা, বাসনকোসন, বই-ছবি, ধামাকুলা, মাটির খেলনা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কীর্তন, কবিগান ও যাত্রাভিনয় হয়। প্রায় সহস্রাধিক শ্রোতা উল্লিখিত অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করেন।

রঙ্কিণীপূজার মেলা

পরমানন্দপুর গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে রঙ্কিণী-দেবীর পূজা ও অন্নভোগ উৎসব উপলক্ষে দেবীর মন্দির

সংলগ্ন প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম এবং বর্ধমান জেলা হইতে মোট প্রায় পাঁচ-ছয় সহস্র নরনারী ট্রেন, মোটরবাস ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, ঔষধপত্র, বই-ছবি, দা-কুড়ুল, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ হুগলী, মেদিনীপুর, শান্তিপুর, রামজীবনপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, খড়ার ইত্যাদি স্থান হইতে আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং কোন কোন বৎসর জলসা ও যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামেই যাত্রার দল আছে।

বিশালাক্ষীপূজার মেলা

তাতারপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে বিশালাক্ষীপূজা উপলক্ষে দেবীর মন্দির সংলগ্ন জমিতে এবং জেলা বোর্ডের ১০১ নং রাস্তার উভয় পার্শ্বে দুইদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত ১নং, ৪নং ও ৫নং ইউনিয়ন, রামজীবনপুর, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন সহস্র নরনারী ট্রেন, মোটরবাস ও গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ আরামবাগ, ঘাটাল, খড়ার, ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর, ইড়পালা, সুলতানপুর, হাজীপুর, কয়াপাট, বদনগঞ্জ, কামারপুকুর প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক লাঠিখেলা এবং কবিগান ও যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামেই যাত্রার দল আছে।



থানা : ঝাড়গ্রাম

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : শুগনীবাঁসা। ৩৪০।৫৩২'৪৪।৫৭।২৬৪

(ক) মাহাতো, মুচি ও শবর।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন খড়্গপুর হইতে বোম্বাই রোড দিয়া মোটরবাসে অথবা সর্ডিহা রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং দুর্গার ধ্যানে গুপ্তমণিদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি গ্রামের সর্বজনীন এবং দুইশতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শীলা খণ্ডে খোদিত গুপ্তমণিদেবীর মূর্তি ও শীতলা আছেন।

শ্রীশুকলাল সরেণ, গ্রামসেবক,
হরিয়াধরা ক্যাম্প, মেদিনীপুর।

২। গ্রাম : মেটিয়াল। ৪৯৫।৪৮'০০।২৭।১৩৬

(ক) মাঝি, গোয়ালা, তেলি ও ডোম।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন সর্ডিহা হইতে মোটরবাসযোগে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ)* প্রতি বৎসর পৌষ মাসে পৌষপার্বণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহুদিনের প্রাচীন।

(ঙ) পৌষপার্বণের মেলা। পৌষ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শীতলার একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীসুনীল কুমার বসু, শিক্ষক,
গ্রাম : জয়নগর, পোঃ বোধনা,
মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম : বল্লা। ৬২৫।১০৫'৪১।৩২।১৮৫

(ক) কায়স্থ, বৈরাগী, মাঝি, সদ্‌গোপ ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন সর্ডিহা হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জাতালপূজা এবং চৈত্র মাসে শীতলাপূজা ও চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি গত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ বসিতেছে।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির, একটি শীতলামন্দির (মন্দিরে ঘটে অঙ্কিত শীতলা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত) এবং জাতালপূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীহরিপ্রসাদ কর, শিক্ষক,
বল্লা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ থাম শিউলী, মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম : চন্দ্রি। ৮১১।২৭৪'৬৭।২৪৭।১,০৮৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, খণ্ডাইত, মাঝি, ভূমিজ, ক্ষত্রিয়, নাপিত, ধোপা ও বাগদী। গ্রামটিতে মাঝিপাড়া, ব্রাহ্মণ-পাড়া, ভূমিজপাড়া, গুজিপাড়া, বাবুপাড়া, খণ্ডাইতপাড়া, ধোপাপাড়া, নাপিতপাড়া প্রভৃতি নামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন খড়্গপুর হইতে বোম্বাই রোডে মোটর-বাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চন্দ্রশেখর শিবের চড়ক ও গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে সপ্তাহব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ঝাড়গ্রামের রাজা কর্তৃক নির্মিত চন্দ্রশেখর শিবমন্দিরটি ব্যতীত একটি শীতলা, একটি সাবিত্রী, একটি সাতভগিনী, একটি ডাকুইবুড়ী, একটি চড়ামবুড়ী, একটি কালী এবং একটি গ্রামদেবীর স্থান আছে। চন্দ্রশেখর শিবের নামানুসারেই গ্রামের নাম চন্দ্রী হইয়াছে।

শ্রীশচীন্দ্র নাথ দাস, চাকুরি,
গ্রাম ও পোঃ চন্দ্রি, মেদিনীপুর।
ও
শ্রীবাণী প্রসন্ন ত্রিপাঠী, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ চন্দ্রি, মেদিনীপুর।

চন্দ্রী গ্রামে চন্দ্রশেখর শিব সম্পর্কে শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার 'মেদিনীপুরের ইতিহাস'-এ লিখিয়াছেন—"ঝাড়গ্রাম গড় হইতে প্রায় তের মাইল দূরে চন্দ্রী গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরে চন্দ্রশেখর নামে এক অনাদিলিঙ্গ মহাদেব আছেন। এই মহাদেবের প্রকাশ সম্বন্ধেও নানাপ্রকার অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। চন্দ্রশেখর মহাদেবের নাম হইতে গ্রামের নাম চন্দ্রী হইয়াছে। ঝাড়গ্রামের রাজগণ দেবসেবার জন্য অনেক ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন এবং সমস্ত গ্রামখানি গ্রামবাসীদিগকে নিষ্কর ভোগ করিতে দিয়াছেন। প্রতি বৎসর এই স্থানে মহাসমারোহে চড়কপূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে।"

(পৃঃ—৩৫৮)

ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম খড়গপুর জংশন হইতে ১৪ মাইল দূর। ইহা মেদিনীপুর জেলার অন্যতম মহকুমা। রেল লাইন খুলিবার পূর্বে এই অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং এখানে পাইক ও চুয়াড় প্রভৃতি দস্যুবৃত্তিধারী জাতি বাস করিত।

রেলের কল্যাণে ঝাড়গ্রাম একটি সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হইয়াছে। এই স্থানে প্রাচীন মল্লভূম রাজ্যের বহু রাজবংশধরের বাস। ঝাড়গ্রামের গড়ের মধ্যে রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রী দেবীর মন্দির আছে। ইহা একটি প্রাচীন কীর্তি। এখানে কোন প্রতিমা নাই। সিন্দুর রঞ্জিত একখানি বৃহৎ খড়্গ ও একটি পেটিকার উপর নিত্য অর্চনা হয়। কথিত আছে, এই পেটিকার মধ্যে এক গুচ্ছ কেশ আছে, উহা মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রী দেবীর কেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সাবিত্রী দেবী নাকি ছিলেন মানবী। প্রবাদ, জনক-জননীর সহিত উড়িষ্যা গমন পথে ঝাড়গ্রামের নিকট তৎকালীন জনৈক দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়া বাল্যকাল হইতে ইনি দস্যু সর্দারের গৃহে লালিতপালিত হন। তিনি নিজেকে "সবিতার দাসী সাবিত্রী" নামে পরিচয় দিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া দস্যু সর্দারের পুত্র তাঁহাকে বলপূর্বক আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু দৈবপ্রেরিত খড়্গের সাহায্যে তিনি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। সরোবর মধ্যস্থ একটি মন্দিরে তাঁহার বাসস্থান ছিল। ঝাড়গ্রামের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দস্যুগণের হস্ত হইতে ঝাড়গ্রাম অধিকার করিয়া লন। এই নবীন রাজাও সাবিত্রীদেবীর সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হন। তাঁহার নির্বন্ধাতিশয়ে সাবিত্রী দেবী এই প্রস্তাবে সম্মত হন। কিন্তু বিবাহের দিন অপরাহ্নে তিনি সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া একাকিনী অদূরবর্তী শালবনের দিকে চলিলেন। রাজা এই সংবাদ পাইবামাত্র অতি ব্যস্ততার সহিত তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রাজানুসৃতা সাবিত্রী দেবী শালবন পার হইয়া এক বালুকা প্রান্তরে পৌছিলে রাজা শশব্যস্তে তাহার দীর্ঘ কেশ গুচ্ছ ধরিয়া ফেলিলেন। অকস্মাৎ চতুর্দিক হইতে বালুকারাশি আসিয়া সাবিত্রী দেবীকে ঢাকিয়া ফেলিল। রাজাও বালুকারাশির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছেন দেখিয়া অনুচরেরা বলপূর্বক তাঁহাকে সরাইয়া আনিল। সাবিত্রী দেবীর এক গুচ্ছ কেশ রাজার হস্তে রহিয়া গেল। অতঃপর স্বপ্নাদেশ পাইয়া রাজা সাবিত্রী দেবীর কেশ গুচ্ছ ও খড়্গ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিলেন। ঝাড়গ্রাম গড়ের দুই মাইল দূরে রাধানগর গ্রামে ঝাড়গ্রামের অন্যতম রাজা বিক্রমজিৎ মল্ল উগাল দেব বাহাদুরের নির্মিত মেল বাঁধ ও কেরেন্দার বাঁধ নামে দুইটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে।

ঝাড়গ্রাম থানার মধ্যে ঝাড়গ্রাম ও জামবনীর গড় দুইটিই প্রসিদ্ধ। পূর্বকালে ঝাড়গ্রাম গড়ের চতুর্দিকেও সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাকার ও পরিখা ছিল। জামবনী রাজবংশের গড়বাড়ী 'চিল্কী গড়' নামে সু-পরিচিত। এখানেও কয়েকটি পুষ্করিণী ও দেবালয় আছে।

(পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত 'বাংলায় ভ্রমণ' দ্বিতীয় খণ্ড এবং শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থ অবলম্বনে।)

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

বল্লা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়কপূজা উপলক্ষে শিবালয় সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

দামুরাশোল, শিরশী, ষোলশিউলী, ব্রাহ্মণদানা, ডুবকা, চিতলকানি, ডোমকলা প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে প্রধানতঃ মাঝি, বাগাল, তাঁতী, সাঁওতাল ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিদিন গড়ে সহস্রাধিক নরনারী গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, বই-ছবি, ঔষধপত্র, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিস-পত্রের প্রায় একশত দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক ও নাগরদোলার দল আসে। ইহা ব্যতীত, ক্রীড়ানুষ্ঠান এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানগুলিতে প্রায় পাঁচশত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

চন্দ্রি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা জমির উপর সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, জাম্বনী, শাঁকরাইল প্রভৃতি থানার অন্তর্গত গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় ছয় সহস্র নরনারী প্রধানতঃ মোটরবাস ও গরুর গাড়ী করিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, ঔষধপত্র, ধামা-কুলা, দা-কুড়ুল ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় দেড়শত দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ছৌনাচ এবং নাগর-দোলার ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই ছৌনাচের দল আছে। অনুষ্ঠানগুলিতে প্রায় চার-পাঁচ সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

গুগনীখাসা গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামের মধ্যে প্রায় এক বিঘা খোলা জায়গায় একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম ব্যতীত বলদমরা, কলসীভাঙ্গা, প্রতাপপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রধানতঃ মাহাতো সম্প্রদায়ের প্রায় দুইশত নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের মাত্র পনর-কুড়িটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কাঠিনাচের দল আসে। এই অনুষ্ঠানে প্রায় দুই-তিনশত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : দুবড়া। ১৮৯।৯২৭.১৩।২২১।৯৬৬

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, জেলে, তাঁতী, ডোম, নাপিত ও সাঁওতাল। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, সদ্‌গোপপাড়া, জেলে-পাড়া, তাঁতীপাড়া, ডোমপাড়া, নাপিতপাড়া ও সাঁওতাল-পাড়া নামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন গিধনি হইতে জেলা বোর্ডের পাকা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রাসযাত্রা উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে সপ্তাহকালব্যাপী। মেলাটি গত প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসর যাবৎ বসিতেছে।

(চ) গ্রামে একটি পাকা শিবমন্দির এবং একটি দুর্গামণ্ডপ ব্যতীত শীতলা ও মনসা আছে।

শ্রীফণী ভূষণ শতপথী, শিক্ষক,
গ্রাম : দুবড়া, পোঃ চিল্কীগড়,
মেদিনীপুর।

২। গ্রাম : বেলদা। ২১০।২০৩.২৬।১০৭।৫৩৯

(ক) স্বর্ণবণিক, মাহাতো, ভুঁইয়া, ভূমিজ, নাপিত, বাগাল, .বৈরাগী, হাড়ী ও সাঁওতাল। গ্রামে বেনেপাড়া, ভুঁইয়াপাড়া, ভূমিজপাড়া, সাঁওতালপাড়া, মাইতিপাড়া, হাড়ীপাড়া প্রভৃতি নামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন গিধনি হইতে পাকা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। মেলায় প্রায় আড়াই সহস্র নরনারী আসেন এবং মাত্র পনর-কুড়িটি দোকান বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য পাইকনাচ হয়।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ব্যতীত শীতলা ও মনসা আছে।

শ্রীকেদার নাথ মাহাতো, কৃষিজীবী,
গ্রাম : বেলদা, পোঃ চিল্কীগড়,
মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম : চিচ্‌ড়া। ২৬০।১৯৪.০৬।২৯৪।১,৬২৯

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, কামার, রজক, তিলি, সদ্‌গোপ, নাপিত, ময়রা, কাহার, ডোম, মাঝি, বাগাল ও মুসলমান। গ্রামটিতে বৈষ্ণবপাড়া, ধোপাপাড়া, খামারপাড়া, কারুয়া-পাড়া, বাগালপাড়া, করঙ্গাপাড়া, সাহাপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন ঝাড়গ্রাম হইতে ঝাড়গ্রাম-সড়িহা রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, ভাদ্র মাসে বিশ্বকর্মাপূজা ও করমপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, পৌষ মাসে টুসু উৎসব এবং মাঘ মাসে মকর পরব ও সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। টুসু উৎসব, করমপূজা এবং মকর পরব উৎসবগুলি প্রাচীন এবং এখানকার উল্লেখযোগ্য উৎসব।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

'উড়া'র মেলা। মেলাটি খুব সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে তিনটি বড়াম ঠাকুরের থান, একটি শীতলা, একটি মনসা এবং একটি অজ্ঞাতনামা পীরের দরগাহ্ আছে।

শ্রীমুরলি মোহন সাউ, প্রধান শিক্ষক,
চিচ্‌ড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম : ছোট পিণ্ডরা। ২৮৮।৮১.৬০।৩৭।১৫১

(ক) ব্রাহ্মণ, ভূমিজ, কোড়া, লোধা, মাহালী, ডোম, তাঁতী ও কামার। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) ঝাড়গ্রাম অথবা গিধনি রেলস্টেশন হইতে হাঁটা পথে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ মাসে স্বর্গ বাউড়ীর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বন্য জন্তুর আক্রমণের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য গ্রামবাসী এই উৎসবটি পালন করেন। ইহা প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) স্বর্গ বাউড়ীপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। মেলায় প্রায় দেড় সহস্র নরনারী আসেন এবং বিবিধ জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে।

(চ) গ্রামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্বর্গ বাউড়ীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ দাস, শিক্ষক,
গ্রাম : সাপধরা, পোঃ চন্দ্রি,
মেদিনীপুর।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

ডুবড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে প্রতিদিন গড়ে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাচশত নরনারী গরুর গাড়ীতে করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, দা-কুড়ুল, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় সত্তর-পঁচাত্তরটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য মুখে নানাপ্রকার মুখোস আঁটিয়া কবিগান ও কথকতা এবং থিয়েটার অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ আছে।

দুর্গাপূজার মেলা

চিচ্‌ড়া গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রায় দশ বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে প্রতিদিন সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় একশত দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য টুসুগান এবং যাত্রাভিনয় হয়।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ কাঁকড়াঝোর। ২৭।১,৯৪৪'২০।৭৪।৩৩৫

(ক) ভূমিজ, মুণ্ডা ও সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন গিধনি হইতে বেলপাহাড়ী রুটের মোটরবাসে করিয়া অথবা ঝাড়গ্রাম হইতে ফরেষ্ট রোডে মোটরযোগে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবপূজা ও তৎসহ ভক্তা পরব নামে একটি বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তা পরবটি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে আরম্ভ হয়। এই উৎসবে পুরুলিয়া, ধলভূম, সিংভূম ও মেদিনীপুরের অরণ্যময় অঞ্চলের অধিবাসীগণ যোগদান করেন।

(ঙ) শিবপূজা উপলক্ষে মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি গত প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবৎ বসিতেছে। মেলায় পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় সাত-আটশত নরনারী প্রধানতঃ গরুর গাড়ী করিয়া ও হাঁটিয়া আসেন এবং প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকান বসে। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ঝুমুরনাচ অনুষ্ঠিত হয়।

(চ) গ্রামে একটি নাগিনীকন্যার মন্দির এবং বৃক্ষতলে একটি বৃহদাকার শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীরাম নরেশ, প্রধান শিক্ষক,
বেলপাহাড়ী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

২। গ্রাম ঃ তামাজুরি। ৪৩।৩৩৭'৫১।৫৬।১৭১

(ক) ব্রাহ্মণ, ভূমিজ, সামন্ত, কুমার, তাঁতী ও সাঁওতাল। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন গিধনি হইতে মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন এবং মাত্র দশ-পনরটি দোকান বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য ছৌনাচ অনুষ্ঠিত হয়।

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল ও টালির ছাউনিযুক্ত একটি ঘরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীযাদব চন্দ্র মুর্মু, প্রধান শিক্ষক,
তামাজুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ভুলাভেদা, মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম ঃ চাঁদাবিলা। ১১০।৬৯৪'১৮।১০।৬১

(ক) মাহাতো ও সাঁওতাল। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন গিধনি হইতে মোটরবাসযোগে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন। মেলায় প্রধানতঃ মাহাতো ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রায় পাচশত নরনারী আসেন এবং নানাবিধ জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশটি দোকান বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা আসে এবং অনেকে জুয়া খেলিয়া থাকেন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির আছে।

শ্রীহীরেন্দ্র কুমার মিত্র, চাকুরী,
লালগড় বি. ডি. ও. অফিস,
মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম ঃ ডুমুরিয়া। ১৭৩।২২১'২৪।১১২।৫৪২

(ক) বেনে, তিলি, ভূঁইয়া, ধোপা ও কলু। গ্রামটিতে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন গিধনি হইতে বেলপাহাড়ী রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়কপূজা ও শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত দুইটি গরাম ঠাকুর এবং একটি ষষ্ঠীর স্থান আছে।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ রানা, প্রধান শিক্ষক,
ডুমুরিয়া উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বেলপাহাড়ী, মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম : শিলদা। ৩০৫।৩৪০'৪১।৫০৭।২,৬৭৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বেণে, কামার, তাম্বুলী, তেলি ও কলু। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন ঝাড়গ্রাম হইতে বেলপাহাড়ী রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গন্ধেশ্বরীপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে শিবের গাজন উৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, ভাদ্র মাসে বিশ্বকর্মাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, পৌষ মাসে টুসু উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রাচীন।

(ঙ) চড়কপূজার মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ মজুমদার, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ শিলদা,
মেদিনীপুর।

শিলদার ভৈরব ও রঙ্কিণীদেবী এবং আঞ্চলিক লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় তাহার 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। উহার অংশ-বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

"জঙ্গলমহলের বিখ্যাত চুয়াড় বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি ছিল শিলদা। পরগণা শিলদার পূর্বেকার নাম ছিল ঝাটিবনি। এ-অঞ্চল যে এক সময়ে স্থানীয় আদিবাসীদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে ছিল, আজও তা বোঝা যায়। ঝাড়গ্রাম থেকে বেরিয়ে সোজা উত্তরপশ্চিমে দহিজুড়ী আঙ্কারিয়া বিনপুরের ভিতর দিয়ে শিলদা যাবার পথ।...শিলদা ছাড়িয়ে আরও উত্তর-পশ্চিমে বেলপাহাড়ী ও তামাজুড়ী। তামাজুড়ীতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের তামার হাতিয়ার পাওয়া গেছে,...। পার্বত্য পরিপার্শ্বের মধ্যে তামাজুড়ী।...শিলদা রাজবংশের গড়বাড়ি ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে। অনেকটা এলাকা জুড়ে ঘেরা রাজবাড়ি। তার চৌহদ্দির মধ্যেই একাধিক দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। একটি দেবালয়ের গায়ে লিপি আছে—১৭৪২ শকাব্দ লেখা। অর্থাৎ ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। তখন রানী কিশোরমণির রাজত্বকাল (১৮২০-১৮৪৮ খৃঃ)। কিশোরমণিই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরই রাজত্বকালে আরও দেবালয় এবং 'শিলদার বাঁধ' নামে প্রসিদ্ধ জলাশয়টিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বোঝা যায়।

শিলদার রাজারা যে শৈব-শাক্তধর্মী ছিলেন তা এ অঞ্চলের ভৈরব প্রাধান্য দেখে অনুমান করা যায়। পাথরের বড় বড় যে-সব খণ্ডমূর্তি গ্রামের মধ্যে এখনও দেখা যায়, সেগুলি প্রতিষ্ঠিত শিবেরই অনুচর ছিল এক সময়। দেবালয়ের সামনে বিরাজ করত। এখন দেবালয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং খণ্ডও প্রভুহীন অনাথ অবস্থায় কালাতিপাত করছে।...শিলদার ভৈরব হলেন এ অঞ্চলের সবচেয়ে বিখ্যাত দেবতা।...ভৈরব যেখানে আছেন, সেখানে ভৈরবীও থাকবেন। শিলদার প্রতাপশালী ভৈরবের ভৈরবী কোথায়? শিলদায় নয়। ভৈরব থাকেন শিলদায়, আর ভৈরবী থাকেন ধলভূমগড়ে। ভৈরবীর নাম রঙ্কিণী।... রঙ্কিণী দেবীর বেদীতে যে বেঁধা পর্ব হয়, সেই পর্ব সাঙ্গ হয় ওড়গঙ্গা গ্রামে (শিলদায়) ভৈরবের সামনে 'পাতা বেঁধা' নামে। দুর্গাপূজার দশমীর দিনে এই উৎসব হয়। জিতাষ্টমী জাগরণের নবমী তিথিতে আকালে কল্পারম্ভ হয়। একপক্ষকাল ধরে দশভূজা দেবীর পূজা হয়ে বিজয়াদশমীর দিন শেষ হয় পূজা। ঐদিন নাকি ভৈরবী রঙ্কিণী দেবী তাঁর স্থান ধলভূমগড়-ঘাটশীলা থেকে

ভৈরবভূমি শিল্‌দায় গমন করেন এবং সেখানে ভৈরব-ভৈরবীর মিলন হয়।...,

আগে শিল্‌দা ধলভূমগড় ঘাটশীলা অঞ্চলে যে একই জাতির এবং তাদেরই জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিপত্তি ছিল, এখনও শিল্‌দার ভৈরব ও ধলভূমের রঙ্কিণীর যোগসূত্র থেকে তার পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়। সমস্ত ঐতিহাসিক প্রমাণের মধ্যে জনসংস্কৃতিগত প্রমাণই হল আঞ্চলিক অভিজ্ঞতার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ধলভূমগড় ও শিল্‌দা পরগণা যে একই সাঁতভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল, আজও ভৈরব ও রঙ্কিণী দেবী তার সাক্ষী রয়েছেন। এ-সাক্ষ্যের গুরুত্ব অনেক বেশী। দুই দেব-দেবীই আসলে জঙ্গল ও জঙ্গলবাসীদের দেবতা। তার পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে কেবল শিল্‌দায় নয়, সারা ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে। শিল্‌দার ভৈরব এখন ভগ্ন পাথরের মন্দিরের (মন্দিরটি পাথরের দেউল ছিল, পরিষ্কার বোঝা যায় ধ্বংসাবশেষ দেখে) উপর প্রতিষ্ঠিত। অজস্র পোড়ামাটির হাতিঘোড়া তার চারিদিকে ছড়ানো ও স্তূপীকৃত। ধর্মঠাকুরের কামিন্যা-মূর্তির মতন প্রেতিনীমূর্তিও (পোড়ামাটির) ভৈরবস্থানে বসানো আছে দেখা যায়। ঠিক এই একই রকমের ভৈরব, খেঁদারাণী, ভৈরবী ইত্যাদির পূজাস্থান শিল্‌দার পথে বহু সাঁওতাল ও লোধাপল্লীতে দেখা যায়। চিল্‌কিগড়ের রঙ্কিণী দেবীর স্থানেরও এই একই দৃশ্য। বেশ বোঝা যায়, এসব অরণ্যের ও অরণ্যবাসীদের পূজ্য দেবদেবী। ক্রমে স্থানীয় সামন্তরাজাদের পোষকতায় এক-একজন এক-একটি অঞ্চলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও দেবীরূপে গণ্য হয়েছেন এবং খ্যাতিও অর্জন করেছেন। কিন্তু সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের ইতিহাস একেবারে লুপ্ত হয়ে না গিয়ে কল্পনাস্ফীত কিংবদন্তীর মধ্যে কঙ্কালাকারে রয়েছে। ভৈরব-রঙ্কিণীর কাহিনী তারই নিদর্শন। দেবস্থানের পরিবেশ ও নানাবিধ উপকরণের মধ্যে এ অঞ্চলের জনসংস্কৃতির সঙ্গে তার যোগাযোগ কোথায়, তার প্রমাণও রয়েছে স্পষ্ট।"

(পৃঃ ৩৫৯—৩৬৩)

৬। গ্রাম: কোরকরা। ৩৬১।৪২১'৮৫।৭০।৪২৮

(ক) কায়স্থ, সদ্‌গোপ, কুমার, কামার, গোয়ালা ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে কায়স্থপাড়া, সদ্‌গোপপাড়া, কুমার-পাড়া, কামারপাড়া, গোয়ালাপাড়া, সাঁওতালপাড়া প্রভৃতি নামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন ঝাড়গ্রাম হইতে বেলপাহাড়ী রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসের মকর সংক্রান্তি তিথিতে গ্রাম্যদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাগুলি প্রাচীন।

(ঙ) লক্ষ্মীপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে তিনদিনব্যাপী। কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে চারদিনব্যাপী। শেষোক্ত মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে টিনের ছাউনীযুক্ত একটি চালাঘর আছে। এই স্থানে হরিনাম সংকীর্তন হয়।

শ্রীচণ্ডী চরণ মণ্ডল, চাকুরী,
গ্রাম: কুই, পোঃ বিনপুর,
মেদিনীপুর।

৭। গ্রাম: বিনপুর। ৪২৬।২৫০'৪৭।১৫৭।৭২৬

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন ঝাড়গ্রাম হইতে বেলপাহাড়ী রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষ মাসে পৌষপার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) পৌষপার্বণের মেলা। পৌষসংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া একমাসব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। মেলায় প্রত্যহ গড়ে প্রায় সাত-আটশত নরনারীর সমাগম হয় এবং নানাবিধ জিনিসপত্রের শতাধিক দোকান বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস দল আসে এবং অনেকে জুয়া ও লটারী খেলিয়া থাকেন

(চ) ×

শ্রীসন্তোষ কুমার দাস, গ্রামসেবক,
গ্রাম ও পোঃ বিনপুর,
মেদিনীপুর।

৮। গ্রাম: নেপুরা। ৪৭০।৪৪৫'৭২।১১৫।৫৩২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, নাপিত, কলু, তাঁতী, মাঝি ও বাউরী। গ্রামটিতে সদ্‌গোপপাড়া, মাঝিপাড়া,

বিশ্বাসপাড়া, গোঁসাইপাড়া, বাউরীপাড়া প্রভৃতি নামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন ঝাড়গ্রাম হইতে বেলপাহাড়ী রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত পূজা-পার্বণগুলি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। আশপাশের গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় পাঁচশত নরনারী আসেন এবং মাত্র পনর-কুড়িটি দোকানপাট বসে।

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি মনসার স্থান এবং ব্যক্তিবিশেষের একটি দুর্গামণ্ডপ আছে।

শ্রীকন্দর্প মোহন দত্ত, শিক্ষক,
গ্রাম: বলরামপুর, পোঃ নেপুরা,
মেদিনীপুর।

৯। গ্রাম: কাঁটাপাহাড়ি। ৬৯১।১৭৬২১।৫০।২০৯

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, তাম্বুলী, কুমার, নাপিত, মাঝি, বাগাল, রাজোয়ার, মাল ও কামার।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন মেদিনীপুর হইতে মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ও ভীমরাজসিনীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন এবং সর্বজনীন।

(ঙ) ভীমরাজসিনীপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন। আশপাশের গ্রাম হইতে প্রায় ছয়-সাত সহস্র নরনারী মেলায় আসেন এবং বিবিধ জিনিসপত্রের প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকান বসে।

(চ) গ্রামে ভীমরাজসিনীপূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীক্ষুদিরাম সরকার, প্রধান শিক্ষক,
কাঁটাপাহাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

১০। গ্রাম: ঘাগরা। ৭১৮।১৪৮৮৮।২৩।১০৮

(ক) ভূমিজ, দেশালী ও সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন গির্দান হইতে বেলপাহাড়ীগামী মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ঘাগরাসিনীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। 'ঘাগরাসিনী' বনদেবী এবং সাধারণের বিশ্বাস ইনি বন্য হিংস্র জীব-জন্তুর আক্রমণ হইতে গ্রামবাসীকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ইঁহার উদ্দেশ্যে ছাগ, মেষ, পায়রা, মোরগ প্রভৃতি পশু-পক্ষী বলি দেওয়া হয়। পূজাটি বহুকালের প্রাচীন এবং ইহাতে আশপাশের গ্রাম হইতে প্রায় পঁচিশ হাজার নরনারী যোগদান করেন।

(ঙ) ঘাগরাসিনীপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের মধ্যে জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে ঘাগরাসিনী দেবীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ মজুমদার, শিক্ষক,
শিলদা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

১১। গ্রাম: চিৎরাঙ্গা। ৭৫৩।১৬৮৭৪।১২১।৬৮২

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, সদ্গোপ, তিলি, শবর, মাল, মাঝি, দেশালী, ময়রা ও কামার। গ্রামটিতে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন ঝাড়গ্রাম হইতে দহিজুড়ি হইয়া ধরমপুর জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়। বর্ষাকালে খেয়া নৌকায় কংসাবতী নদী পার হইয়া গ্রামে যাইতে হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে মনসাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ব্যতীত দৈনিক শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাগুলি প্রায় দেড় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিব এবং মনসার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীমাণিক চন্দ্র দাস, শিক্ষক,
গ্রাম: চন্দ্রপুর, পোঃ বেলাটিকরি,
মেদিনীপুর।

১২। গ্রাম: লালগড়। ৭৯০।৩৯২৫৪।৪০৬।১,৮৮৭

(ক) ব্রাহ্মণ, ভূমিজ, বাউরী, বাগ্দী, মাঝি, ডোম,

হাড়ী, ময়রা, মুচি, মেথর, গোয়ালা, নাপিত, সাঁওতাল ও মুসলমান। গ্রামটিতে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন ঝাড়গ্রাম হইতে দক্ষিণজুড়ীগামী মোটরবাসযোগে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে আটদিনব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে জোড়বাংলা ধরণের বহির্ভাগ চতুষ্কোণ, অন্তর্দেশ গোলাকার এবং খিলানযুক্ত একটি পাকা মন্দিরে রাধামোহনজীউ নামে খ্যাত প্রস্তর নির্মিত রাধাকৃষ্ণের ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীমায় দণ্ডায়মান মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীঅনিল কুমার সিংহ, চাকুরী,
গ্রাম ও পোঃ লালগড়,
মেদিনীপুর।

১৩। গ্রাম ঃ বেলাটিকরি। ৮৯০।৬৩৬৪।৩১।১৭৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, গন্ধবণিক, মাঝি, নাপিত, কামার, রজক, হাড়ী, তাঁতী, সদ্‌গোপ, কলু, ভুঁইয়া ও সাঁওতাল। গ্রামে নাপিতপাড়া, বৈরাগীপাড়া, গন্ধবণিকপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, মাঝিপাড়া, সর্দারপাড়া, কায়স্থপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন ঝাড়গ্রাম হইতে বেলপাহাড়ী রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গন্ধেশ্বরীপূজা, পৌষ মাসে শীতলাপূজা, কালামদন, তেঁতুলাবুড়ী ও মনসাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রাচীন। গন্ধেশ্বরীপূজা উপলক্ষে উৎসব প্রাঙ্গণে কয়েকটি খাবারের দোকান বসে এবং কীর্তনগান ও যাত্রাভিনয় হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে শীতলা, কালামদন ও মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর স্থান আছে।

শ্রীমাণিক চন্দ্র দাস, শিক্ষক,
বেলাটিকরি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

১৪। গ্রাম ঃ দহিযুড়ি। ৯১০।৪৫৫৭১।২৮৭।১,৬২৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, কুমার, তিলি, বাউরী, নাপিত, ধোপা, ক্ষত্রিয়, বাগাল, সদ্‌গোপ, ডোম, মুচি, কোড়া, মাহালী, লোধা, মাহাতো, সাঁওতাল ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন ঝাড়গ্রাম হইতে ঝাড়গ্রাম-বেলপাহাড়ী রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, পৌষ মাসে বড়াম মা পূজা এবং ফাল্গুন মাসে মহোৎসব ও দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব ও পূজাগুলি প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন। মহোৎসবের মেলা। ফাল্গুন মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলা দুইটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে শিবমন্দির ও শীতলামন্দির ব্যতীত বড়াম মার স্থান আছে।

শ্রীকৃষ্ণপদ মুখার্জী, চাকুরী,
গ্রাম ঃ রঙবেড়া, পোঃ দহিযুড়ি,
মেদিনীপুর।

বিনপুর

মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম সীমান্তে বিনপুর থানায় কানাইসর নামে একটি পাহাড় আছে। এতদ্‌ অঞ্চলের কয়েকটির মধ্যে ইহাই সর্বোচ্চ। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে এই পাহাড়টির দুইবার পূজা হয়। তদুপলক্ষে বাঁকুড়া, মানভূম, সিংহভূম প্রভৃতি জেলা হইতে বহু লোক আসিয়া থাকে। গিরিশৃঙ্গের দৃশ্য অতি মনোরম। সেখানে নানা প্রকার অদ্ভুত ও বিচিত্র পুষ্পোদ্যান দৃষ্ট হয়। তথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষও আছে। শিখরদেশ বিস্তৃত; তন্মধ্যে মাত্র ছয় বিঘা ভূমি উদ্ভিদ্‌ বর্জিত সমতল ক্ষেত্র। অবশিষ্ট প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বিঘা ভূমি নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ।

উৎসব বিবরণী

রথযাত্রা উৎসব

লালগড় গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে স্থানীয় জমিদার পরিবারের কুলদেবতা রাধামোহনজীউর রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তি-বিশেষ দ্বারা পরিচালিত হইলেও সর্বসাধারনে ইহাতে যোগদান করেন। ইহা শতাধিক বৎসরের প্রাচীন উৎসব।

রথযাত্রার পূর্বদিন মন্দিরে নেত্রোৎসব নামে একটি অনুষ্ঠান হয় এবং এইদিন হইতে নয়দিনব্যাপী উৎসব চলে। নেত্রোৎসব উপলক্ষে রথযাত্রার পূর্বদিন রাধামোহন-জীউর মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া জনৈক উপবাসী ব্যক্তি প্রায় পঁচিশ গজ দীর্ঘ নূতন কাপড়ের থান নিক্ষেপ করেন। উহার এক প্রান্ত তাহার হাতে ধরা থাকে এবং অপর প্রান্ত আসিয়া কুলদেবতার সম্মুখে দণ্ডায়মান জমিদারের মস্তকে পতিত হয়। ইহার পরের দিন হইতে নয়দিনব্যাপী ধুমধামের সহিত যথারীতি রাধামোহনজীউর পূজা এবং প্রতিদিনের পূজায় মূর্তির কৃষ্ণকালী, কালীয়াদমন, সুভদ্রা হরণ, বস্ত্রহরণ, পার্থসারথি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বেশ পরিবর্তন করা হয়। উৎসবের কয়েকদিন সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। রথটানায় সর্ব-সম্প্রদায়ের লোকজন অংশ গ্রহণ করেন।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

কোরকরা গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন স্থানে চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয়-শত নরনারী মোটরবাস ও গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা, বই-ছবি, মাটির পুতুল-খেলনা প্রভৃতি জিনিসপত্রের মাত্র পনর-কুড়িটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা আসে এবং গান-বাজনা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও যাত্রাভিনয় হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য— কোরকরা গ্রামে লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে তিনদিনব্যাপী যে মেলা বসে তাহা উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

ঘাগরাসিনীপূজার মেলা

ঘাগরা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে বনদেবী ঘাগরাসিনীরপূজা উপলক্ষে নদীতীরবর্তী প্রায় একশত বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম ব্যতীত শিলদা, বেলপাহাড়ী, বামুনডিহা, ভুলাভেদা, বাঁশপাহাড়ী, শিমূলপাল প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ সহস্র নরনারী গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, ঔষধপত্র কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধামা-কুলা, মাটির পুতুল ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় চারিশত দোকান বসে। মেলার বিক্রেতারা প্রধানতঃ ভুলাভেদা, শিলদা, বেলপাহাড়ী, সিমলা, শুকজোড়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিক দল আসে। ইহা ব্যতীত লাঠিখেলা, মোরগ লড়াই প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হয়। ছৌনাচ, চাঁইনাচ এবং নাচনীনাচ দেখিতে বহুদর্শকের সমাগম হয়। অনেকে জুয়া ও লটারী খেলিয়া থাকেন।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

ডুমুরিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় শত নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়-

চোপড়, দা-কুড়ুল, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় কুড়িটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় অঞ্চলের লোকজন। তাঁহাদের নিকট হইতে সামান্য খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য গ্রামের একটি দল ছৌনচ করেন।

শিলদা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়কপূজা উপলক্ষে উৎসব প্রাঙ্গণ সংলগ্ন প্রায় পাচ-ছয় বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু-কালের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় সহস্র নরনারী গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, দা-লাঙ্গল-জোয়াল, ধামা-কুলা-চুপড়ী, পান-বিড়ি ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় একশত দোকান বসে। স্থানীয় এবং আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর ব্যবসায়ীরা আসেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য মেলায় লোকনৃত্যের আয়োজন করা হয়।

মনসাপূজার মেলা

চিৎরাঙ্গা গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে মনসাপূজা উপলক্ষে গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে খোলা মাঠের উপর প্রায় পনর বিঘা জমি জুড়িয়া একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি দেড় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

বিনপুর থানার অন্তর্গত ২নং হইতে ৮নং ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সকল গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিন সহস্র নরনারী গরুর গাড়ী, সাইকেল রিক্সা করিয়া এবং অনেকে হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন,মনিহারী, বই-ছবি ইত্যাদি বিবিধ জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে। বিক্রেতারাও প্রধানতঃ আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, কীর্তন গান, কাঠিনাচ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ব্যতীত অনেকে জুয়া ও লটারী খেলিয়া থাকেন।

মহোৎসবের মেলা

প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে স্থানীয় হরিবাসরে নাম সংকীর্তন উৎসব উপলক্ষে দহিজুড়ি চকে কয়েকটি রাস্তার সংযোগস্থলে প্রায় পনর-ষোল বিঘা জমির উপর তিন-দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। ইহা সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম এবং এই জেলার অন্যান্য থানা হইতে প্রায় চৌদ্দ-পনর সহস্র নরনারী মোটরবাস, গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, মাটির পুতুল, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে এবং অনেকে লটারী খেলিয়া থাকেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—দহিজুড়ি গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত রথযাত্রার মেলাটি উল্লিখিত মহোৎসব মেলার অনুরূপ।

রথযাত্রার মেলা

লালগড় গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রাধামোহন-জীউর রথযাত্রা উপলক্ষে "মাসির বাড়ী" বা "গুণ্ডিচা বাড়ী" সংলগ্ন প্রায় সাত-আট বিঘা জমির উপর আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত ধরমপুর, খেতাই, সিজুয়া, বেলাটিকারী, নেপুরা, ভীমপুর, কয়মা, ধানমরী প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রধানতঃ হিন্দু ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রায় দশ সহস্র নরনারী গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, বাসনকোসন, মনিহারী, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, লাঙ্গল-জোয়াল, ধামা-কুলা, শাঁখা-চুড়ি ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশটি দোকান বসে। মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয়। তাহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও সার্কাসের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়। অনেকে জুয়া ও লটারী খেলেন। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় তিন-চার সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

থানা ঃ গোপীবল্লভপুর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ মৌভাণ্ডার। ২৩।১০৩'৪৮।২৯।১৫৬

(ক) মুণ্ডা, মল্লক্ষত্রিয়, সাঁওতাল ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন ঝাড়গ্রাম হইতে ঝাড়গ্রাম-দারিশোল রুটের মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে স্থানীয় সাঁওতাল সম্প্রদায় কর্তৃক বাঁধনা পরব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে স্থানীয় মুণ্ডা সম্প্রদায়ের লোকজনও যোগদান করিয়া থাকেন। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) বাঁধনা পরব উপলক্ষে মেলা। কার্তিক মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মনসার স্থান আছে।

শ্রীনন্দলাল সিংহ, প্রধান শিক্ষক,
মৌভাণ্ডার উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ আটাঙ্গী, মেদিনীপুর।

২। গ্রাম ঃ বালিষাত (মৌজা ঃ কর্বানিয়া)।
১৮৪।৪৩৫'৫৮।৫১।২৩১

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, বাগাল, বাগ্দী, তিলি, ধোপা ও নাপিত।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন ঝাড়গ্রাম হইতে দারিশোল-ঝাড়গ্রাম রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে 'বালিষাত উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে সুবর্ণ নদীতে পুণ্যস্নান ও পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পনাদির জন্য মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং সীমান্তবর্তী বিহার ও উড়িষ্যা হইতে বহু নরনারী আসিয়া থাকেন। কিংবদন্তী আছে, পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসে থাকাকালীন এই স্থানে চৈত্র সংক্রান্তি তিথিতে উত্তরবাহিনী সুবর্ণরেখা নদীতে স্নানও পিতৃতর্পণাদি করিয়াছিলেন। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) বালিষাত উৎসবের মেলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

শ্রীবিভূতি ভূষণ দাস, শিক্ষক,
গোপীবল্লভপুর, মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম ঃ কানপুর। ৩৩৩।৪৬'৫৫।৬০।২৪৮

(ক) কায়স্থ, বৈরাগী, গোয়ালা, তাঁতী, নমঃশূদ্র ও বাগাল। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন ঝাড়গ্রাম হইতে গোপীবল্লভপুরগামী পাকা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষ মাসে মকর স্নান, মাঘ মাসে শীতলাপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি সর্বজনীন এবং বহু প্রাচীন।

(ঙ) মকরস্নান উপলক্ষে মেলা। পৌষ মাসে পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। আশপাশের গ্রাম হইতে প্রায় এক সহস্র নরনারী মেলায় আসেন এবং খাবার, মণিহারী জাতীয় জিনিসপত্রের মাত্র পনের-কুড়িটি দোকানপাট বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য মেলায় নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে শ্যামসুন্দরজীউ নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীকাশী নাথ দে, প্রধান শিক্ষক,
কানপুর-তালগ্রাম উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ তপশিয়া, মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম ঃ আলমপুর। ৩৬৭।৫৭১'৩৩।২৯২।১,০৫৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, গন্ধবণিক, সদ্গোপ, বারুই, ধোপা, কৈবর্ত, নাপিত, ডোম, ছত্রী, ভূমিজ, লোধা, তাঁতী ও কামার। গ্রামে বারুইপাড়া, জেলেপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, নাপিতপাড়া, ভূমিজপাড়া, ডোমপাড়া, মাঝিপাড়া, সদগোপপাড়া, হাটপাড়া, বৈতাপাড়া, মাটি-সাইপাড়া ও কামারপাড়া নামে মোট বারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন ঝাড়গ্রাম হইতে মহাপাট-কুঠীঘাট রুটের মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গন্ধেশ্বরীপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীপূজা, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা ও ঝুলন, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমী উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, জীতাষ্টমী ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা, পৌষ মাসে মকর স্নান ও পৌষপার্বণ, মাঘ মাসে ভীম একাদশী ও সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ও শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে শীতলাপূজা ও শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রাচীন।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির, একটি শীতলামন্দির ও মহাপ্রভুর মন্দির ব্যতীত একটি বাবাঠাকুর, একটি শীতলা, ছয়টি মনসা এবং সাতভোগীদেবী, কপিলাদেবী ও চৈতাদেবী নামে কয়েকটি গ্রাম্য দেবদেবী আছে।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ রথ, শিক্ষক,
গ্রাম: নিমডিহা, পোঃ চাকিনাশোল,
মেদিনীপুর।

৫। গ্রাম ঃ গোপীবল্লভপুর।

৩৯৪।৪৯'৮৬।২৯৬।১,৩৭২

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন ঝাড়গ্রাম হইতে কুঠীঘাটগামী মোটর-বাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দিরে স্থানীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্তৃক দণ্ড মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি তিন শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দণ্ড মহোৎসব উপলক্ষে মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে বারদিনব্যাপী। মেলাটি তিন শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রাধাগোবিন্দ মন্দির, জগন্নাথদেবের মন্দির, হনুমানজীউ মন্দির ব্যতীত সাতভোগী, তালবেতাল, ডুলিয়াবুড়ী, গুণগুণিয়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি গ্রাম্য দেবদেবী আছে।

শ্রীবিভূতি ভূষণ দাস, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ গোপীবল্লভপুর, মেদিনীপুর।

গোপীবল্লভপুরের গোবিন্দজীউর মন্দির সম্পর্কে শ্রীযোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয় 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"গোপীবল্লভপুরের গোবিন্দজীউর মন্দিরটি এ প্রদেশে সুপ্রসিদ্ধ। গোবিন্দজীউ বা গোপীবল্লভজীউর নামানুসারেই এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। গোপীবল্লভপুরের বিখ্যাত গোস্বামী বংশ এই মন্দির ও মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা। স্নান পূর্ণিমার সময় এই স্থানে একটি বৃহৎ মেলা হয় এবং সেই উপলক্ষে নানাস্থানের বহু সংখ্যক বৈষ্ণবের সমাবেশ হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের এবং উড়িষ্যার নানাস্থানেই গোপীবল্লভপুরের গোবিন্দজীউর সম্পত্তি আছে এবং গোস্বামী বংশের শিষ্য আছে।"

শ্রীবসু গোপীবল্লভপুর থানায় কয়েকটি প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে "এই থানার অন্তর্গত কুলটিকরী গ্রামের প্রায় এক মাইল পূর্ব্বদিকে কিয়ারচাঁদ প্রান্তরে প্রায় পাঁচ-ছয় শত প্রস্তর স্তম্ভ স্থানে স্থানে প্রোথিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে। সেগুলি উচ্চে আড়াই ফিট হইতে পাঁচ ফিটের বেশী নয়। উহাদের মস্তকভাগ গোলাকৃতি, অনেকটা মনুষ্যের মস্তক ও গ্রীবাদেশের অনুরূপ ও অধোভাগ সাধারণ স্তম্ভের ন্যায়। আসামের নাগা পর্বতে ও ছোটনাগপুরের স্থানে স্থানেও এইরূপ প্রস্তর স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন এগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম নিবাসীগণের কীর্তি। তাঁহারা তাহাদের আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুর পর এইরূপ সমাধি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া দিত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জহর সিংহ নামক এ প্রদেশের জনৈক রাজা বিভিন্ন স্থান হইতে এইরূপ প্রায় সহস্র স্তম্ভ সংগ্রহ করিয়া কিয়ারচাঁদ প্রান্তরে স্থাপিত করিয়াছিলেন। দূর হইতে দেখিলে ঐগুলিকে দণ্ডায়মান মনুষ্য বলিয়া ভ্রম হয়। এইরূপ কিংবদন্তী, শত্রুপক্ষের মনে তাঁহার জনবল সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে জহর সিংহ ঐগুলিকে উক্ত স্থানে প্রোথিত রাখিয়াছিলেন।"

(পৃঃ ৩৫৯-৩৬২)

অপর পক্ষে উল্লিখিত প্রাচীন প্রস্তর স্তম্ভগুলি সম্পর্কে ডাঃ প্রবোধ কুমার ভৌমিক মহাশয় 'আমাদের মেদিনীপুর' নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লিখিয়াছেন যে,—

"কেশিয়াড়ি থেকে কুলটিকরি যাবার পথে মন্দিরের অনুকরণে তৈরী পাথরের ফলকগুলোকে পোতা অবস্থায় দেখা যায় বিরাট এক খোলা জায়গায়। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, যেন হাজারে হাজারে সৈন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখনও ওই জায়গাটাকে লোকে 'দীপা কিয়ার চাঁদ' বলে। কিন্তু কেন একথা বলে?

দীপা কিয়ারচাঁদকে নিয়ে কিংবদন্তীর অভাব নাই। অনেকের ধারণা বর্গীরা যখন আমাদের দেশ আক্রমণ করেছিল তখন স্থানীয় রাজারা বর্গীদের ভয় দেখানোর জন্যে কিয়ারচাঁদের ওই ঢিবিটার উপর পাথরের ফলকগুলোকে পুঁতে তাতে মশাল জেলে দিত। রাত্রির অন্ধকারে ওইভাবে মশাল জ্বালা থাকলে বর্গীরা ভাবত অনেক লোক মোতায়েন হয়ে রয়েছে। তাই ভয় পেয়ে তারা পালিয়ে যেত। এখনও অনেকের কাছে একথা শোনা যায়।

আবার অনেকে অন্য কথা বলে থাকেন। তাঁদের ধারণা, এটা ছিল একটা সমাধিক্ষেত্র। এখনও আমাদের দেশে বহু জাতি উপজাতির মধ্যে মৃতের সমাধিক্ষেত্রে পাথরের ফলক পুঁতে দেওয়ার রীতি আছে। হয়ত এটা সেই বীরদের স্মৃতি মনে করে কেউ কেউ তাকে বীর স্তম্ভ বলে ব্যাখ্যা করেন।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়। এর চত্বরে বেশ ভালভাবে খুঁজলে দেখা যাবে এটা ছিল মস্তবড় এক মন্দির। মন্দিরের বিভিন্ন দেওয়াল গাত্র কোথায় ছিটকে পড়ে রয়েছে। মন্দিরের চূড়ায় যে আমলক বা কলস থাকে তাও কতকগুলো খাঁজকাটা পাথরের। তেমনি ফলক এখনও রয়েছে। অল্প কিছুদিন হল ওই ঢিবির তলা থেকে দুটি শিবলিঙ্গ পাওয়া গেছে। একটি এখন আছে কুলটিকরির জমিদারের বাড়ীতে আর অপর একটি আছে কুলটিকরি গ্রামের লোধা-শবরদের গ্রামে। এইসব দেখে এখন আমরা নিশ্চিন্তভাবে বলতে পারি, এখানে ছিল এক বিরাট শিবমন্দির। তবে শিবমন্দিরের পাশে এমনভাবে পাথরের ফলক পোঁতা কেন?

ওড়িশার এক রীতি রয়েছে যদি কোন মনস্কামনা পূর্ণ হয় তবে ঠাকুরের কাছে মন্দির তৈরী করে দিতে হবে। ওই মানত করার নাম হল 'দেবালয়' প্রথা। এমনিতে কিয়ারচাঁদের ওই মন্দিরে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তবৃন্দ আসত। আর তাদের মনের ইচ্ছা পূরণ হলে 'দেবালয়' তৈরী করে দিত। অর্থাৎ লম্বা পাথরকে খাঁজকেটে ঠিক মন্দিরের ঢঙ-এ সাজিয়ে দিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করত। দিনের পর দিন এমনি দেবালয়ে কিয়ারচাঁদের প্রান্তর ভরে গেছে। এটা যে একেবারে ওড়িয়া রীতিনীতির প্রভাব তা আর অস্বীকার করার কোন উপায় নাই।" (পৃঃ ২১-২২)

উৎসব বিবরণী

মহোৎসব

গোপীবল্লভপুর গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে রাধা-গোবিন্দজীউর মন্দিরে দণ্ড মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি তিনশতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলাবসানের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে, বিশেষতঃ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় যে তিনজন মহাপুরুষ রূপানুগশুদ্ধ ভক্তিধারা প্রবাহিত করেন তাঁহাদের মধ্যে শ্যামানন্দপ্রভু অন্যতম। শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীনরোত্তম-ঠাকুর ও শ্যামানন্দপ্রভু যথাক্রমে মধ্যবঙ্গে, উত্তরবঙ্গে এবং উড়িষ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গে ধর্মপ্রচারার্থ গমন করেন। গৌরাঙ্গ প্রভুর পরবর্তীকালে শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীনরোত্তমঠাকুর ও শ্যামানন্দপ্রভুকে যথাক্রমে গৌরাঙ্গপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের আবেশ অবতাররূপে গণ্য করা হয়।

শ্যামানন্দ প্রভুর বাল্য নাম "দুঃখী"। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান খড়্গপুর সহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে 'ধারেন্দা' নামক গ্রামে সদ্গোপ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতৃদেব শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল এবং মাতা দুরিকাদেবী উভয়েই সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ, অমায়িক, বিশুদ্ধ চিত্ত ও দয়াদাক্ষিণ্যের আদর্শ ছিলেন। দুঃখী যথাসময়ে কাব্য ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করেন। কিন্তু আরো অধিক বিদ্যা ও প্রকৃত জ্ঞানার্জন করিবার জন্য অমোঘ বাসনা তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলে। এই কারণে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া

বর্ধমান জেলায় শ্রীপাট অম্বিকায় উপস্থিত হন। শ্রীপাট অম্বিকা তৎকালে বৈষ্ণব সমাজের নিকট অতি আদরের কাম্যস্থান এবং বৈষ্ণব চর্চার কেন্দ্রস্থান ছিল। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে অপ্রকট হইয়াছেন। ফলে তাঁহার বিরহে কাতর ভক্তগণ শ্রীপাট অম্বিকায় প্রতিষ্ঠিত গৌর-নিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া সান্ত্বনালাভ করিতেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ লালীর একজন প্রধান সহচর ও পার্ষদ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের প্রকট কালে এই দুই বিগ্রহ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ স্বয়ং প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, উক্ত বিগ্রহে তাঁহারা উভয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া চিরকাল শ্রীগৌরদাস পণ্ডিতের সেবা গ্রহণ করিবেন। দুঃখী দাস যখন এই স্থানে পৌছান, তখন শ্রীগৌরদাস পণ্ডিতের প্রিয় শিষ্য শ্রীহৃদয়ানন্দপ্রভু শ্রীপাট অম্বিকায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া উক্ত বিগ্রহদ্বয়ের সেবাকার্য চালাইতে ছিলেন। শ্রীহৃদয়ানন্দঠাকুর দুঃখীকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা দেন এবং দীক্ষান্তরে তাঁহার নূতন নামকরণ করেন কৃষ্ণদাস। গুরুর আজ্ঞানুসারে শ্রীকৃষ্ণদাস বৈষ্ণব গ্রন্থে অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় শ্রীজীব-গোস্বামীর নিকট শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্রীনরোত্তমঠাকুর সহ বৈষ্ণব গ্রন্থ অধ্যয়ন ও আলোচনায় মননিবেশ করেন। "শ্যামানন্দ চরিত্র", "বিন্দু প্রকাশ" প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায় যে, এই সময়ে কৃষ্ণদাস রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলাস্থল শ্রীধামের কেলিকুঞ্জে পরিমার্জনা করিতে করিতে একদিন শ্রীরাধা-রানীর শ্রীচরণের নূপুর কুড়াইয়া পান। বৃদ্ধা ব্রাহ্মনীর বেশে শ্রীমতীর প্রিয় সখী শ্রীললিতা দেবী সেই নূপুর ফিরাইয়া লইতে আসেন। উক্ত নূপুর স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণদাসের চিত্তে এক অভূতপূর্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি সেই নূপুরের অধিকর্ত্রীকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং প্রার্থনা জানান। শ্রীললিতাদেবীর কৃপায় কৃষ্ণদাস দিব্যদেহে শ্রীরাধারানীর শ্রীচরণ দর্শন করিয়া তাঁহার দীর্ঘদিনের সাধনা সার্থক করেন। শ্রীরাধারানী উক্ত নূপুর কৃষ্ণদাসের মস্তকে স্পর্শ করাইতে আদেশ দেওয়ায় শ্রীললিতাদেবী কৃষ্ণদাসের ললাটে সেই নূপুর স্পর্শ করাইয়া দেন এবং স্বয়ং শ্রীরাধারানী উক্ত নূপুর চিহ্নের মধ্যস্থলে বিন্দু প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীরাধারানীর (শ্যামার) আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীরাধারানী তাঁহার নাম শ্যামানন্দ রাখেন।

"বৃন্দাবনে নব নিকুঞ্জে রাইর নূপুর পাইল যে।
শ্যামানন্দ নাম বিদিত তথায়, সুচরিত বুঝিবে কে ?"
—(শ্রীভক্তি রত্নাকর, ১৫।১০৬)

কৃষ্ণদাস শ্যামানন্দ হইলেন এবং শ্রীশ্যামানন্দের ললাটে সেই নূপুর চিহ্ন তিলক-আকারে শোভা পাইতে লাগিল। এই অলৌকিক ব্যাপারে বৈষ্ণব সমাজে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। শ্রীপাট অম্বিকায় শ্রীহৃদয়ানন্দঠাকুরও এই সংবাদ পান এবং তাঁহার শিষ্য তাঁহার প্রদত্ত 'কৃষ্ণদাস' নাম পরিত্যাগ করিয়া 'শ্যামানন্দ' নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রদত্ত তিলক পরিবর্তন করিয়াছেন; সর্বোপরি সখ্যভাবের সাধনমার্গ ত্যাগ করিয়া সখীভাবে সাধন-ভজন করিতেছেন জানিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পড়েন। তাঁহার বিশ্বাস জন্মে ইহা শ্রীজীব গোস্বামীর কারসাজি ও ভণ্ডামী মাত্র। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া শ্রীহৃদয়ানন্দঠাকুর সদলবলে শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া বিচার সভার আহ্বান করেন। এই অপূর্ব বিচার দেখিবার জন্য দ্বাদশ গোপাল, চৌষট্টি মোহান্ত, চারি সম্প্রদায়ের শত শত সাধু-সন্ত উপস্থিত হন। বিচারক মণ্ডলী শ্যামানন্দকে তাঁহার নাম, তিলক ও ভজনপ্রণালী পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরাধারানীর নিষেধ থাকার জন্য প্রকৃত ব্যাপার গোপন রাখিয়া সভামণ্ডলীর নিকট প্রকাশ করেন যে, "আমি স্বপ্নে গুরুর আদেশে নাম, তিলক ও ভজনপ্রণালী পরিবর্তন করিয়াছি।" কিন্তু বিচারকমণ্ডলী তাঁহার বক্তব্যে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং স্বয়ং হৃদয়ানন্দঠাকুর ও বিচারকমণ্ডলী তাঁহার শ্যামানন্দ নাম পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেন ও তিলক মুছিয়া দিবার প্রস্তাব করেন। এমন কি হৃদয়ানন্দঠাকুর স্বহস্তে শ্যামানন্দের তিলক নরুণ দ্বারা কাটিয়া তুলিয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হন কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও তিনি শ্যামানন্দের কপালের তিলক চিহ্ন মুছিয়া দিতে সক্ষম হন না। এই অলৌকিক ঘটনা দর্শনে উপস্থিত সকলে আশ্চর্যান্বিত হন এবং চতুর্দিক "হরি, হরি," ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। সেদিনের মত সভা স্থগিত রাখা হয়। রাত্রিকালে

শ্রীহৃদয়ানন্দঠাকুর স্বপ্নে দেখিতে পান, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রুধিরাক্ত কলেবরে তাঁহার শিয়রে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। শ্রীহৃদয়ানন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এইরূপ অবস্থার হেতু জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু হৃদয়ানন্দকেই উহার জন্য দায়ী করেন এবং বলেন তাঁহার প্রিয় ভক্ত শ্যামানন্দের শরীরে আঘাত করায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরীরেই এইরূপ ক্ষত চিহ্ন দেখা গিয়াছে। পরিশেষে হৃদয়ানন্দঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে তাঁহার দণ্ডস্বরূপ দ্বাদশ-দিনব্যাপী মহোৎসব পালন করিতে আদেশ করেন। তৎপর দিবস হৃদয়ানন্দ-ঠাকুর বিচার সভায় নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করেন এবং দ্বাদশদিনব্যাপী মহোৎসব পালন করিবার জন্য উপস্থিত সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানান। এইভাবে 'দণ্ড মহোৎসবের' উৎপত্তি হয়। পরে শ্যামানন্দপ্রভু গুরুর নিকট হইতে এই মহোৎসব প্রতি বৎসর পালন করিবার জন্য স্বচ্ছন্দে ভারবহন করিবার ভিক্ষা চাহিয়া লন। এই দণ্ড মহোৎসব প্রথম বর্ষে শ্রীধামবৃন্দাবনে দ্বিতীয় বর্ষে শ্রীপাটশ্যামসুন্দরপুরে (বিহার প্রদেশের কাকপাড়া স্টেশনের নিকট) এবং তৃতীয় বর্ষে কুশরদামঠে অনুষ্ঠিত হয়। তৎপর হইতে প্রায় তিন শতাধিক বৎসর ধরিয়া উক্ত মহোৎসব শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে পালিত হইয়া আসিতেছে।

এই ঘটনার পর শ্যামানন্দের নাম চতুর্দিকে প্রসারলাভ করে। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বহু ভক্ত নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইঁহার শিষ্যদের মধ্যে রসিকানন্দ ও মুরারীই প্রধান। ইঁহাদের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষ করিয়া উড়িষ্যায় অসংখ্য নরনারী বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশের নানাস্থানে, এমন কি সুদূর রাজপুতনার জয়পুরে, বোম্বাই প্রদেশের বাঘিয়াওয়াড়ে ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত মঠ ও মন্দিরে অদ্যাপি শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের স্মৃতি বহন করিতেছে। গুরু ও শিষ্য উভয়ে মিলিয়া বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মিলন স্থলের অতি সন্নিকটে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে এক রম্য স্থানে শ্রীগোপীবল্লভজীউর মন্দির নির্মাণ করাইয়া শ্রীরসিকানন্দে কুলদেবতা রাধাগোবিন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার পূজিত বিগ্রহের নামানুসারে, এই গ্রামের নামকরণ করেন "শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর"।

রাধাগোবিন্দজীউর মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শোনা যায় যে, শ্রীরসিকানন্দ প্রভু প্রতি বৎসর রথযাত্রা সময়ে পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনে যাইতেন। তাঁহার এইরূপ কষ্টকর পদযাত্রায় ব্যথিত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ করেন, "তুমি শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর গ্রামে শ্রীগোবিন্দজীউর প্রকাশ কর, তথায় আমি সর্বক্ষণ বিরাজ করিব।" তৎপর জনৈক ভাস্কর একদিন একখণ্ড শিলাসহ শ্রীরসিকানন্দ সমীপে উপস্থিত হন এবং রসিকানন্দের নির্দেশানুক্রমে ত্রিভঙ্গভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান গোবিন্দজীউর মূর্তি নির্মিত হয়। অদ্যাবধি গোপীবল্লভপুরে সেই শ্রীগোবিন্দজীউ বিরাজ করিতেছেন।

শোনা যায়, গোপীবল্লভজীউর মন্দিরে দণ্ড মহোৎসব উপলক্ষে দ্বাদশদিনব্যাপী অহোরাত্র ধরিয়া সুউচ্চ রবে হরিনাম সংকীর্তন হইবার জন্য এই স্থানে কোন কাক-পক্ষীর সমাগম দেখা যাইত না। দয়াল রসিকানন্দ সেই কারণে মহোৎসবের পরের দিন রাজ্যের যত কাক জড় করিয়া "কাক মহোৎসবের" প্রচলন করেন এবং তদবধি এই অনুষ্ঠানটি এইস্থানে পালন করা হইতেছে। নাম সংকীর্তন মহোৎসব উপলক্ষে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, সিংভূম প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন অংশ হইতে প্রায় দুইশত প্রখ্যাত কীর্তনীয়ার দল আসেন এবং সহস্র সহস্র পুণ্য লোভাতুরা নরনারী এই মহোৎসবে যোগদান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে মনোহরসাহী, গরানহাটী, রেণেটী ও মন্দারণী নামে যে চারিটি সংকীর্তনে 'ঠাট্' প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে শেষোক্ত দুইটি ঠাট্ শ্যামানন্দ প্রভুর এবং রসিকানন্দপ্রভুর দ্বারা প্রবর্তিত এবং অদ্যাপি এই স্থানে উপরোক্ত দুই "ঠাটে" কীর্তনগান গাওয়া হয়।

মেলা বিবরণী

আদিবাসী উৎসবের মেলা (বাঁধনা পরব)

মৌভাণ্ডার গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে বাঁধনা পরব উপলক্ষে গ্রামের রাইধনী নামক স্থানে প্রায় দশ-বার বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে প্রধানতঃ সাঁওতাল এবং মুণ্ডা সম্প্রদায়ের প্রায় তিন সহস্র নরনারী মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা, মাটির খেলনা-পুতুল, চুড়ি-আলতা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয়। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সাঁওতালী নৃত্য হয়।

বালিঘাত উৎসবের মেলা

বালিঘাত গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বালিঘাত উৎসব উপলক্ষে বাংলা ও বিহার রাজ্যের সংযোগস্থলে সুবর্ণরেখা নদীর উভয় তীরস্থ প্রায় এক মাইলব্যাপী স্থানে একদিনের জন্য মেলা বসে। মূলতঃ স্বর্গগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণাদি করিবার জন্য জনসমাবেশ হইয়া থাকে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রায় পনর-কুড়ি সহস্র নরনারী ট্রেন, মোটরবাস, গরুর-গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষি-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধামা-কুলা-ঝুড়ি, পাথরের থালা-বাটি ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় তিনশত দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বিহার এবং পশ্চিম বাংলার নানাস্থান হইতে আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের প্রধান আকর্ষণ সাঁওতালী নৃত্য। তাহা ছাড়া, নাগরদোলা ও সার্কাসের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়। অনেকে জুয়া ও লটারী খেলিয়া থাকেন।

মহোৎসবের মেলা

গোপীবল্লভপুর গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দণ্ড মহোৎসব উপলক্ষে রাধাগোবিন্দজীউ মন্দির সংলগ্ন প্রায় আঠার-কুড়ি বিঘা জমির উপর কয়েকদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিন শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হাওড়া ও হুগলী জেলা, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও বালেশ্বর জেলা এবং বিহারের সিংভূম ও মানভূম জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রধানতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রায় ছয়-সাত সহস্র নরনারী ট্রেন, মোটরবাস, গরুরগাড়ী করিয়া এবং অনেকে হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বইছবি, কাপড়চোপড়, কাস্তে-বটি-নিড়ানী, বাঁশ ও বেঁতের তৈয়ারী নানাপ্রকার জিনিসপত্র, পাথরের বাটি-গ্লাস-থালা, ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় তিনশতাধিক দোকান বসে। মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর, সাঁকরাইল, ঝাড়গ্রাম, খড়্গপুর, ময়ূরভঞ্জ, নীলগিরি, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক ও সার্কাসের দল আসে এবং কীর্তনগান, সিনেমা, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে ; কোন কোন বৎসর গ্রামান্তর হইতে পেশাদারী যাত্রাদলও আসে।

শিবরাত্রির মেলা

আলমপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে চৈতন্যচক, চাঁদনীচক, স্কুলচক এবং শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় চারি বিঘা জমি জুড়িয়া একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম ব্যতীত নয়াগ্রাম, সাঁকরাইল, ঝাড়গ্রাম, কেশিয়াড়ী, জাম্বনী, লালগড়, মেদিনীপুর প্রভৃতি থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী ট্রেন, মোটরবাস, গরুরগাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং কবিগান, জলসা ও প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা হয়।

থানা ঃ সাঁকরাইল

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ সিন্দুরগৌরা। ৬৭১।১৩৭'০৩।৩১।১৩৮

(ক) সদ্‌গোপ, কামার, বাগাল, ভূমিজ, তাঁতী, ধোপা ও মাহাতো।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন সর্ডিহা হইতে মোটরবাসে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা ও ঝুলনযাত্রা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী উৎসব, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে লক্ষ্মীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ও শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন ও প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দির ব্যতীত ভাগবতজীউ, শিব ও মনসা আছে।

গ্রামের একটি পুষ্করিণী খননকালে লাল প্রস্তরের একটি গৌরাঙ্গমূর্তি পাওয়া যায়। অনেকের অনুমান, এই সিন্দুর বর্ণের ন্যায় মূর্তিকে কেন্দ্র করিয়াই গ্রামের নাম "সিন্দুরগৌরা" হইয়াছে।

শ্রীপঞ্চানন পড়্যা, প্রধান শিক্ষক,
সিন্দুরগৌরা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কুকড়াখুপি, মেদিনীপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ সিন্দুরগৌরা গ্রামের পার্শ্ববর্তী ধানঘোরী (মৌজা নং ৬৬৬) গ্রামে পৌষ সংক্রান্তিতে ধনেশ্বরজীউ শিবের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে। উহার বিশদ বিবরণ "মেলা বিবরণী" অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।

২। গ্রাম ঃ পাথরকাটী। ৮০১।৩৯৪'৭৪।১০৭।৪৬৪

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, ধোপা, নাপিত, হাড়ী, ডোম, তিলি, কামার, মাহাতো, রাজোয়ার ও ভূমিজ। গ্রামে প্রত্যেক বর্ণের অধিবাসীগণের পৃথক পৃথক পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন সর্ডিহা হইতে সাঁকরাইল রুটের মোটরবাসে অথবা ঝাড়গ্রাম বা খড়্গপুর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি সর্বজনীন এবং প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি প্রস্তর নির্মিত একতলা ঘরে একটি জয়চণ্ডী মন্দির এবং একটি ভৈরবমন্দির ব্যতীত একটি শিব আছে।

শ্রীনন্দকিশোর দাস, প্রধান শিক্ষক,
বাদিনা আংশিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
পোঃ দুধকুণ্ড, মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম ঃ কুলটিকুরি। ৯০৫।৫২৭'৪৬।৯৮।৩৮৩

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, হাড়ী, কৈবর্ত, সুবর্ণবণিক, সদ্‌গোপ, করণ, একাদশ তিলি, করেঙ্গা, ভূমিজ, খাঁটরা, কামার, মাঝি, মাহিষ্য, নাপিত, ধোপা, লোধা, সাঁওতাল ও মুসলমান। গ্রামে লোধাপাড়া, মুসলমানপাড়া, কৈবর্ত-পাড়া, করেঙ্গাপাড়া, হাড়ীপাড়া, ভূমিজপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, সাঁওতালপাড়া ইত্যাদি নামে কুড়িটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন সর্ডিহা। মাণিকপাড়া হইতে মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব এবং আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি শীতলামন্দির, একটি কালীমন্দির, ছয়টি শিবমন্দির, একটি সিংহবাহিনীদেবীর মন্দির, একটি

রাধারানী মন্দির ব্যতীত কাদুয়াচণ্ডী, তেঁতুলাবুড়ী প্রভৃতি নামে গ্রাম্যদেবীর স্থান আছে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ বেরা, শিক্ষক,
কুলটিকরী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কুলটিকরী, মেদিনীপুর।

৪। গ্রাম: রোহিণি। ৯৩৩।১৭৫'৫৮।১৪৪।৯১৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈষ্ণব, রাজু, বেনে, গোয়ালা ও ভূঁইয়া। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, ভূঁইয়াপাড়া, রাজুপাড়া ইত্যাদি নামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন সর্ডিহা হইতে সাঁকরাইল রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা ও উৎসবগুলি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির, একটি শীতলামন্দির এবং একটি রাধাকান্তজীউ মন্দির আছে।

শ্রীনবীন চন্দ্র পানিয়া, প্রধান শিক্ষক,
রোহিণি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

রোহিণি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়কপূজা উপলক্ষে সাধারণের একটি মাঠে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দশ সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মণিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী নানাপ্রকার জিনিসপত্রের প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ ঝাড়গ্রাম, খড়্গপুর, গোপীবল্লভপুর, কেশিয়াড়ী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে এবং পালাগান, যাত্রাভিনয় ও তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা হয়। তাহা ছাড়া অনেকে জুয়া ও লটারী খেলিয়া থাকেন।

দুর্গাপূজার মেলা

পাথরকাটী গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে জয়চণ্ডী মন্দির সংলগ্ন প্রায় সাড়ে তিন বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম ব্যতীত সীমান্তবর্তী বীরভূম জেলার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের সহস্রাধিক নরনারী ট্রেন ও গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, দা-কুড়ুল ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয় হয়।

কুলটিকরী গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন স্থানে পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

লাউদহ, কালরুই, বাঁশগেড়্যা, রণরণিয়া, বেহারাসাহি, কেশিয়াড়ী, হাতিগেড়্যা, খাজরা, দীঘা, পচাখালি, আমড়াতলা, আহিরা, পায়রাচালি, গোপালপুর, জকুয়া, কাদগেড়্যা, মান্দার, ফুলবনি, ডাংরা ইত্যাদি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় বার সহস্র নরনারী মোটরবাস, গরুর গাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং অনেকে হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়-চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধামা-কুলা-চুপড়ী ইত্যাদি নানা-প্রকার জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ কেশিয়াড়ী, রোহিণি, মাণিকপাড়া, রাণা, রণবনিয়া, বালিগেড়্যা প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলার দল আসে এবং

যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে। যাত্রা দেখিতে প্রতি বৎসর প্রায় চারি সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

শিবপূজার মেলা

ধানঘোরী গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে ধনেশ্বরজীউ নামে খ্যাত শিবের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

মেলায় সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দেড় সহস্র নরনারী মোটর-বাস, গরুরগাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টিটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কবিগান, পালাগান এবং সাঁওতালী নৃত্য ও গীত অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন বৎসর থিয়েটার বা যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।



গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ দেউলবাড় ।৯৮৭।১,২৫৫.২৩।৮৬।৪৫২

(ক) ব্রাহ্মণ, খণ্ডাইত, বাগাল ও মাঝি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ঝাড়গ্রাম হইতে মহাপাল রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। তাহা ছাড়া রগড়া হইয়া সুবর্ণরেখা নদীতে নৌকাযোগে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে বারুণী স্নান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে দুইদিনব্যাপী।
বারুণী স্নানের মেলা। চৈত্র মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলা দুইটি প্রাচীন।

(চ) দেউলবাড় গ্রামটি সুবর্ণরেখার নদীর তীরে অবস্থিত। গ্রামের জনবসতি হইতে অনতিদূরে নির্জন জঙ্গলাকীর্ণ শিলাময় স্থানে প্রস্তর নির্মিত একটি বৃহৎ মন্দিরে রামেশ্বর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মুল মন্দিরের সহিত নাট্‌ মন্দির এবং নিকটেই 'কুণ্ড পুকুর' নামে একটি পুষ্করিণী আছে। রোহিণি গড়ের শ্রীলক্ষ্মীনারায়ন যড়ঙ্গী মহাশয় কিছুকাল পূর্বে মন্দিরটির সংস্কার করান এবং কুণ্ড পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া পাথর দ্বারা ঘাটের সিঁড়ি বাঁধাইয়া দেন। ইহা ব্যতীত মন্দিরে নিত্য-সেবাপূজার জন্য কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন।

শ্রীউমেশ চন্দ্র জানা, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ রাজপাহাড়ী, পোঃ পেটবিন্দি,
মেদিনীপুর।

দেউলবাড় গ্রামের রামেশ্বরনাথের মন্দির সম্বন্ধে শ্রীযোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয় তাঁর 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে,—

"খেলাড় নয়াগ্রাম পরগণায় সুবর্ণরেখা নদীর দক্ষিণ কুলে দেউলবাড় গ্রামে রামেশ্বরনাথের প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত মন্দিরটি একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর উৎকল দেশীয় শিল্প পদ্ধতি অনুসারে নির্মিত, উহার উচ্চতা প্রায় ৭৫ ফিট। ছাদে এবং দেওয়ালের চতুর্দিকে নানা প্রকার চিত্র ও কারুকার্য আছে। মন্দির মধ্যে সহস্রলিঙ্গ নামে এক মহাদেব আছেন। জনশ্রুতি, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নয়াগ্রামের অন্যতম রাজা চন্দ্রকেতু স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া ঐ মন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখনও নয়াগ্রামের বর্তমান রাজবংশের ব্যয়েই দেবসেবা নির্বাহ হইয়া থাকে। চৈত্র সংক্রান্তি ও গঙ্গা বারুণীর সময় ঐ স্থানে বৃহৎ মেলা হয়।

রামেশ্বর নাথের মন্দিরের প্রায় দুই মাইল অন্তরে নিবিড় অরণ্য মধ্যে তপোবন নামক একটি স্থান আছে। তথায় একটি জীর্ণ ক্ষুদ্র মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও দৃষ্ট হয়। উহার নিকট দিয়া 'সীতা' নামক একটি নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইতেছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস এই স্থানেই মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন ছিল; বলা বাহুল্য রামায়ণ বর্ণিত তপোবনের সহিত এই তপোবনের কোন সম্বন্ধ নাই।"
(পৃঃ ৩৫৯-৩৬০)

এই প্রসঙ্গে শিয়ালিয়া গ্রাম নিবাসী আমাদের জনৈক সংবাদদাতা শ্রী প্রেমচাঁদ মাহাত মহাশয় জানাইয়াছেন যে, উল্লিখিত নির্ঝরিণী হইতে সকল ঋতুতেই হলুদ বর্ণের জল প্রবাহিত হয়। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে অনেক ভক্ত নরনারী নির্ঝরিণী জলে স্নান করিয়া থাকেন এবং তদুপলক্ষে কয়েকটি দোকানপাট বসে।

শ্রীঅশোক মিত্র মহাশয় "District Handbook Midnapur, 1951 গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

At Deulbārh, about one mile east of Chandra Rekhā Garh, there is an old temple of Rameswarnāth (Siva), which stands on a high rugged rock. The temple, which is built of stone and has carvings on the roof and walls, consists of the usual Orissan tower having a pyramidal porch in front and a refactory hall. The presiding deity is a linga encircled with ten rows of marks, the strokes in which number one thousand. It is said that Rājā Chandra Ketu was visited

by Rāma in a dream and asked to build a temple of Siva with one thousand faces; and so he built this temple. A *mela* is held here during Gangā Bāruni festival in Chait Within one mile of this place is a jungle called Tapoban, which is visited by pilgrims. (p. cxvii)

রাজা চন্দ্রকেতু ও তাঁহার গড় সম্পর্কে শ্রীযোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

নয়াগ্রাম পরগণায় চন্দ্ররেখা গড় নামে আর একটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। মেদিনীপুর জেলার যতগুলি প্রাচীন গড়ের চিহ্ন আছে তন্মধ্যে এইটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুরক্ষিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। গড়টির দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থের ভূমি পরিমান ১০৫০×৭৮০ গজ।......

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নয়াগ্রামের রাজা চন্দ্রকেতু সিংহ (কেহ কেহ বলেন চন্দ্রশেখর সিংহ) কর্তৃক এই গড়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।" (পৃ: ৩৬১-৬২)

২। গ্রাম ঃ রাঙ্গামাটিয়া। ৯৮৮।১০৫.২৭।১৮।১১৮

(ক) ভূমিজ, তাঁতী, কামার, কুর্মি, ক্ষত্রিয় ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন ঝাড়গ্রাম হইতে মহাপাল রুটের মোটরবাসে করিয়া এবং রগড়া হইয়া সুবর্ণরেখা নদীতে নৌকাযোগে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা ও উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রাচীন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে। মেলাটি প্রায় চারি বিঘা জমির উপর বসে এবং প্রায় পাঁচশত নরনারী সমাগম হয়। প্রধানতঃ মিষ্টান্ন ও মনিহারী জিনিসপত্রের প্রায় পনর-কুড়িটি দোকান বসে এবং কীর্তনগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা থাকে।

(চ) গ্রামের একটি শিবমন্দিরে শিবমূর্তিসহ জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহা ছাড়া, গ্রামে পাঁচটি শীতলা আছে।

শ্রীভাগবত চন্দ্র মাইতি, শিক্ষক,
গ্রাম : রাঙ্গামাটিয়া, মেদিনীপুর।

৩। গ্রাম ঃ নয়াগ্রাম। ১২৬৪।৬০৯.২০।২৪৪।৬৭০

(ক) করণ, কুমার, মাঝি, লোধা, সদ্‌গোপ ও হাড়ী। গ্রামটিতে মাঝিপাড়া, কুমারপাড়া, করণপাড়া, সদ্‌গোপ-পাড়া, হাড়ীপাড়া, লোধাপাড়া প্রভৃতি নামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলদা। গোপীবল্লভপুর-নয়াগ্রাম রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং নয়াগ্রামের রাজবংশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরের কালীপূজা ব্যতীত ধুমধামের সহিত শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় শীতলা দেবী বিশেষ জাগ্রত ঈশ্বরী বলিয়া বিশ্বাস। দুর্গাপূজাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে, কালী ও শীতলাপূজা বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারিদিন-ব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে স্থানীয় রাজবংশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির ও একটি কালীমন্দির আছে। ইহা ব্যতীত গ্রামে একটি মঠ আছে।

নয়াগ্রাম পরগণাটি 'খেলাড় নয়াগ্রাম' পরগণা বলিয়া পরিচিত। গ্রামটি সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত। বহুপূর্বে এই পরগণাটিতে সতরটি গড়জাত জমিদারগণ প্রায় স্বাধীন রূপে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা সকলেই স্বাধীন ছিলেন।

শ্রীগোলক বিহারী রক্ষিত, প্রধান শিক্ষক,
নয়াগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মেদিনীপুর।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের "মেদিনীপুরের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন নয়াগ্রাম সম্পর্কে যে—

"নয়াগ্রামের খেলাড় গড়টি নয়াগাম রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ কর্তৃক অনুমান পঞ্চদশ শতাব্দীতে

নির্মিত হইয়াছিল। প্রস্তর নির্মিত সুবৃহৎ রাজবাটীকে কেন্দ্র করিয়া গড়টির চতুর্দ্দিকে সুউচ্চ প্রাচীর ও সুগভীর পরিখা ছিল। এক্ষণে সেই রাজবাটী প্রস্তর-স্তূপে পরিণত হইয়াছে। গড়খাই ভরিয়া গিয়াছে, কেবল প্রস্তর প্রাচীরের কিয়দংশ ও তোরণ দ্বারটী প্রাচীন কীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াইয়া আছে। এই গড়ের অভ্যন্তরে নীল প্রস্তরে নির্মিত একটি অশ্ব পৃষ্ঠে একত্রোপবিষ্ট স্ত্রী ও পুরুষ মূর্তি আছে। সচরাচর এরূপ অশ্বারূঢ় যুগলমূর্তি দেখা যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ উহাকে পারসীক বা শক্ প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন, ইহার গঠন প্রণালী অনেকাংশে আরবের প্রাচীন বিধ্বস্ত নিনিভ নগরীর স্তূপ-গর্ভে প্রাপ্তমূর্তির অনুরূপ। আমাদের অনুমান, উহা আমাদের এই ভারতবর্ষের দেবতা কামদেব ও রতিদেবীর মূর্তি। পুরুষ মূর্তিটির হস্তস্থিত তীর-ধনুক কামদেবের ফুলশরের কথাই স্মরণ করিয়া দেয়। মানভূম জেলার অনেক মন্দিরের সম্মুখেও এরূপ মূর্তি দেখা যায়।" (পৃঃ ৩৬০-৬১)

শ্রীঅশোক মিত্র মহাশয় ১৯৫১ সালের মেদিনীপুর District Handbook উল্লেখ করিয়াছেন যে—

"**Nayagram**—A village in the Midnapur subdivision, and headquarters of a police station, situated on the river Subarnarekhā, 10 mils north-west of Dāntan. It contains a police station and two forts called Khelār Garh is attributed to Balabhadra Singh, the third Rājā of Khelār, who completed the fortifications, of which his father Pratāp Chandra Singh had laid the foundations (1490 A. D.). The building is a fortress with towers and walls of laterite surrounded by a moat. The gate and postern are intact, and the walls are still standing. Inside, there is a good well of drinking water, but all the buildings are in ruins; here there used to be two curious figures in blue stone representing a man and his wife on horseback. Similar stone with rude carvings at horsemen and attendants are found before temples in Manbhūm district and are of no great age. The site is now overgrown with jungle. This fort belongs to the Nawāb Nazim of Murshidābād." (p. 129)

মেলা বিবরণী

দুর্গাপূজার মেলা

নয়াগ্রাম গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামের হাট সংলগ্ন এবং পূজামণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় আট-নয় বিঘা জমির উপর চারিদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম ব্যতীত দাঁতন ও কেশিয়াড়ী থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারী গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, কাপড়চোপড়, ধামাকুলা, খেলনা-পুতুল ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ নয়াগ্রাম, দাঁতন এবং কেশিয়াড়ী থানার অন্তর্গত গ্রাম হইতে আসেন। আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

শিবরাত্রির মেলা

দেউলগাড় গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় দশ-বার বিঘা দেবোত্তর জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

নয়াগ্রাম, সাঁকরাইল, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর প্রভৃতি থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম এমন কি কলিকাতা হইতে প্রতিদিন গড়ে সর্বসম্প্রদায়ের সহস্রাধিক নরনারী মোটরবাস ও গরুর গাড়ী করিয়া এবং অনেকে হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, ময়ূরভঞ্জ হইতে বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, বিশ্বনাথপুরের মাটির তৈয়ারী হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল, পাথরের থালা-বাটি, জুতা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি

দোকান বসে। নয়াগ্রাম, সাঁকরাইল, গোপীবল্লভপুর, কেশিয়াড়ী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রধানতঃ বিক্রেতারা আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, সার্কাস প্রভৃতির দল আসে এবং অনেকে জুয়া খেলা করিয়া থাকেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—দেউলবাড় গ্রামে অনুষ্ঠিত প্রাচীন বারুণীর মেলাটি উল্লিখিত শিবরাত্রি মেলার অনুরূপ।



পরিশিষ্ট ক

মেলা সারণি

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
✣ ১	২৪-পরগণা	বাগদহ	১	সিন্দ্রানী	চৈত্র	গাজন	...	১ দিন	...
✣ ২	”	”	৮৬	খোয়াড়া	”	”	১০০ বৎসর	১ দিন	...
✣ ৩	”	”	৮৮	দুর্গাপুর	”	চড়ক	বহু প্রাচীন	১ দিন	৩০০
✣ ৪	”	বনগাঁ	৩৩	কেউটিপাড়া	আষাঢ়	রথযাত্রা	৪ বৎসর	২ দিন	২০০
* ৫	”	”	৩৩	মড়িঘাটা [মৌজাঃ কেউটিপাড়া]	মাঘ	মাঘীপূর্ণিমা স্নান	৭০ বৎসর	৪ দিন	৮,০০০-৯,০০০
* ৬	”	”	৫১	গাঁড়াপোতা	চৈত্র	চড়ক	১৫০ বৎসর	৭ দিন	৩,০০০
* ৭	”	”	৫২	গোবরাপুর	বৈশাখ	মহিষমর্দ্দিনীপূজা	৩০০ বৎসর	১৫ দিন	২,০০০
✢ ৮	”	”	৫৪	বাজিতপুর	চৈত্র	শিবপূজা	...	৪ দিন	২০০
✣ ৯	”	”	৭৪	গোপালনগর	আষাঢ়	রথযাত্রা	২০০ বৎসর	২ দিন	১,০০০
✣১০	”	”	১০৮	হরিদাসপুর	কার্তিক	কালীপূজা	...	...	...
✣১১	”	”	১৪৩	ভাণ্ডারকোলা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৩০ বৎসর	২ দিন	৩০০-৪০০
✣১২	”	”	১৪৯	বল্লভপুর	শ্রাবণ	পঞ্চানন্দপূজা	১৫০ বৎসর	১ দিন	...
✣১৩	”	”	...	বনগ্রাম শহর	পৌষ	কালীপূজা	১০০ বৎসর	২ দিন	৪,০০০-৫,০০
✣১৪	”	”	...	বনগ্রাম শিমূলতলা	চৈত্র	চড়ক	...	২ দিন	৫,০০০-৬,০০০
✣১৫	”	”	...	বনগাঁ শহর (যশোহর রোডের ধারে)	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	৪,০০০-৫,০০০
✣১৬	”	”	...	বনগাঁ শহর (বাগদহ রোডের ধারে)	চান্দ্রমাস	ঈদ্ মেলা	...	১ দিন	...

❁১৭	২৪-পরগণা	বনগাঁ	...	বনগাঁ শহর (ছয়ঘরিয়া চন্দ্রকান্ত রোডের ধারে)	কার্তিক	কালীপূজা	...	...	...
❁১৮	"	"	...	বনগাঁ শহর (ব্যারাকপুর-শ্রীপল্লী)	কার্তিক	রাসযাত্রা	...	...	...
❁১৯	"	"	...	বনগাঁ শহর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	...	...
✦২০	"	"	...	গৌরপোটা	বৈশাখ	নববর্ষ	...	৩ দিন	৬০০
✦২১	"	"	...	বনগাঁ চড়কতলা	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	৫০০
*২২	"	গাইঘাটা	২২	জলেশ্বর	চৈত্র	গাজন	...	১ দিন	৮,০০০-১০,০০০
✦২৩	"	"	৩০	বাগনা	পৌষ	হাজত নেওয়াজ	...	৬ দিন	...
❁২৪	"	"	৩৬	ইছাপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	বহু প্রাচীন	৪ দিন	১০,০০০
✦২৫	"	"	৭৫	সারুইপুর	বৈশাখ	শিবের মেলা	...	৮ দিন	৩০০
*২৬	"	"	৯০	ঠাকুরনগর	ফাল্গুন	বারুণীস্নান	১০ বৎসর	৩ দিন	৩০,০০০
❁২৭	"	স্বরূপনগর	২৫	কপিলেশ্বরপুর	মাঘ	মাঘীপূর্ণিমা	বহু প্রাচীন	১৫ দিন	...
✦২৮	"	"	২৬	দিয়াড়া	পৌষ	...	...	৭ দিন	৪০০-৫০০
❁২৯	"	"	২৮	ঘোলা	মাঘ	মাঘীপূর্ণিমা	১০০ বৎসর	১ মাস	১৫,০০০-২০,০০০
❁৩০	"	"	৩৪	বারঘরিয়া	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	প্রাচীন	১ দিন	...
❁৩১	"	"	৪২	ছোট বাঁকড়া	চৈত্র	শিবের গাজন	১৫০ বৎসর	৩ দিন	২,০০০-৩,০০০
❁৩২	"	"	৬২	কৈজুড়ী	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	৫,০০০-৬,০০০
*৩৩	"	বাদুরিয়া	৩২	আটলিয়া	কার্তিক	বড়পীরের স্মরণোৎসব	৩০০ বৎসর	৮ দিন	৭,০০০-৮,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
✦ কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
❁ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
‡৩৪	২৪-পরগণা	বাদুরিয়া	৩৬	আটঘরা	চৈত্র	চড়ক	১০০ বৎসর	১ দিন	৩০০-৪০০
‡৩৫	„	„	৪৩	আন্ধারমাণিক	অগ্রহায়ণ	সাহাচাঁদ পীরের উরস্	৫০০ বৎসর	১৫ দিন	৫,০০০-৬,০০০
+৩৬	„	„	৪৫	রুদ্রপুর	মাঘ	কালীপূজা	...	৩ দিন	১,৩০০
*৩৭	„	„	৮৫	তারাগুনিয়া	চৈত্র	বারুনীস্নান	২০০ বৎসর	১০ দিন	৭,০০০
‡৩৮	„	„	১০১	আটুরিয়া	আষাঢ়	রথযাত্রা	৬০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
‡৩৯	„	বসিরহাট	৭	ধান্যকুড়িয়া	আষাঢ়	রথযাত্রা	প্রাচীন	২ দিন	৩,০০০-৪,০০০
‡৪০	„	„	৭	„	কার্তিক	রাসযাত্রা	প্রাচীন	৪ দিন	১০,০০০-১২,০০০
‡৪১	„	„	৭	„	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	৫০০-৬০০
‡৪২	„	„	৮	নেহালপুর	ফাল্গুন	পীর গোরাচাঁদের উরস্	সম্প্রতি	১ দিন	৫০০-৬০০
+৪৩	„	„	৯	বেগমপুর	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	সম্প্রতি	৭ দিন	৪০০
‡৪৪	„	„	১৮	কাঁকড়া	চৈত্র	চড়ক	৩০-৪০ বৎসর	১ দিন	৪০০-৫০০
‡৪৫	„	„	২৩	কৃপালপুর	চান্দ্রমাস	ঈদ	৫০-৬০ বৎসর	১৫ দিন	৪,০০০-৫,০০০
+৪৬	„	„	২৭	মেটিয়াবাজার	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	...	১ মাস	৫০০
‡৪৭	„	„	৩৮	গোবিন্দপুর ধোকড়া	আষাঢ়	রথযাত্রা	৫০ বৎসর	২ দিন	...
‡৪৮	„	„	৩৬	„	চৈত্র	বারুণীস্নান	৫০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
*৪৯	„	„	৪৩	বসিরহাট টাউনহল	চৈত্র	বারুণীস্নান	...	২ দিন	৭,০০০-৮,০০০
+৫০	„	„	৫৪	রাজাপুর	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	...	১৫ দিন	২৫০
+৫১	„	„	৫৫	চাঁপা পুকুরিয়া	বৈশাখ	হরিপূজা	...	১ দিন	৫০০
+৫২	„	„	৬৪	চৈতা	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	...	১ মাস	৩০০
‡৫৩	„	„	৭৩	পিফা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	১ দিন	৫,০০০
‡৫৪	„	„	৭৩	„	কার্তিক	কালীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	৫,০০০

‡৫৫	২৪-পরগণা	বসিরহাট	৭৩	পিফা	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	৫,০০০
‡৫৬	”	”	১১২	শিবহাটী	আষাঢ়	সিংহবাহিনীপূজা	২০০ বৎসর	১ দিন	২৫০-৩০০
‡৫৭	”	”	১১৭	গাছা	ফাল্গুন-চৈত্র	পাগলা পীরের মেলা	২০০ বৎসর	৮ দিন	৮,০০০-১০,০০০
‡৫৮	”	”	১২০	পানিতর	কার্তিক	শিবপূজা	...	৭ দিন	...
†৫৯	”	”	...	খোলাপোতা	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	...	১ মাস	৬৫০
†৬০	”	”	...	চোনা	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	...	২০ দিন	৫০০
†৬১	”	”	...	বেগুয়াডাঙ্গা	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	...	১৫ দিন	২৫০
†৬২	”	”	...	হাজরাতলা	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	...	২ দিন	২৫০
†৬৩	”	”	...	বাগুণ্ডী	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	...	৫ দিন	২০০
†৬৪	”	হাসনাবাদ	২১	খরমপুর	পৌষ	বারোয়ারী মেলা	...	৩ দিন	২০০
*৬৫	”	”	৬০	রামেশ্বরপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	১৬ বৎসর	৩-৮ দিন	৮০০-৯০০
‡৬৬	”	”	৭৯	ইছাপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	২০-২৫ বৎসর	১ দিন	৭০০-৮০০
†৬৭	”	”	...	ভেবিয়া	পৌষ	বারোয়ারী মেলা	...	৩ দিন	২০০
†৬৮	”	”	...	কোমরপুর	মাঘ	শীতলাপূজা	...	৭ দিন	৫০০
†৬৯	”	”	...	পারঘাটা	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	১ দিন	৩০০
†৭০	”	”	...	বোলতলা	চৈত্র	বারুনীস্নান	...	১ দিন	৩৫০
‡৭১	”	হিঙ্গলগঞ্জ	৯৫	কনকনগর	চৈত্র	চড়ক	২০-২৫ বৎসর	১ দিন	...
‡৭২	”	”	৯৮	বাঁকরা	চৈত্র	চড়ক	১৫০ বৎসর	৩ দিন	৩,০০০
†৭৩	”	”	১০৯	দেউলী	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	৫ দিন	২০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
†৭৪	২৪-পরগণা	হিঙ্গলগঞ্জ	১১১	চারলখালি	চৈত্র	বারোয়ারী মেলা	...	১ দিন	২০০
*৭৫	„	„	১১৪	রমাপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	৩ দিন	৩০০
†৭৬	„	„	১১৫	মাধবকাটি	ফাল্গুন	কালীপূজা	...	৭ দিন	৭০০
†৭৭	„	„	১১৭	যোগেশগঞ্জ	ফাল্গুন	মবকান-ঘুমটীর মেলা	...	৮ দিন	৩৫০
‡৭৮	„	„	...	হিঙ্গলগঞ্জ	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	১৬ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡৭৯	„	সন্দেশখালি	২১	ন্যাজাট	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২৫ বৎসর	৪ দিন	২,০০০
‡৮০	„	„	৩৭	সন্দেশখালি	চৈত্র	চড়ক	২৫ বৎসর	১ দিন	...
‡৮১	„	„	৪০	হাটগাছা	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	১৫-২০ বৎসর	৩ দিন	২,০০০
‡৮২	„	„	৪১	শীতলিয়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২৫-২৬ বৎসর	৪ দিন	২,০০০
‡৮৩	„	„	৫২	জয়গোপালপুর	চৈত্র	চড়ক	৩০-৩৫ বৎসর	১ দিন	...
‡৮৪	„	„	৫৪	দুর্গামণ্ডপ	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	সম্প্রতি	৪ দিন	২,০০০
‡৮৫	„	হাড়োয়া	৮	হরিপুর	চৈত্র	চড়ক	শতাধিক বৎসর	২ দিন	১,০০০
†৮৬	„	„	৪৫	কামারগাতি	কার্তিক	কালীপূজা	...	২ দিন	২৫০
‡৮৭	„	„	৯৪	উচিলদহ	চৈত্র	চড়ক	...	৭ দিন	...
‡৮৮	„	„	১১২	হাড়োয়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	সম্প্রতি	৪ দিন	৩,০০০-৪,০০০
*৮৯	„	„	১১২	„	ফাল্গুন	পীর গোরাচাঁদের উরস্	বহু প্রাচীন	৭ দিন	২৫,০০০-৩০,০০০
‡৯০	„	„	১১২	হাড়োয়া	চান্দ্রমাস	মহরম	সম্প্রতি	...	৫,০০০-৬,০০০
†৯১	„	মিনার্খা	৬৯	ধুতুরদহ	অগ্রহায়ণ	কালীপূজা	...	৮ দিন	৫০০
‡৯২	„	„	৮০	নলিক	ভাদ্র	মনসাপূজা	১০০ বৎসর	১ দিন	...
†৯৩	„	„	৮২	মাদারী	কার্তিক	রাসপূর্ণিমা	...	৬ দিন	৩০০

✤ ৯৪	২৪-পরগণা	মিনাখাঁ	৮৭	জয়গ্রাম	ফাল্গুন	...	...	৫ দিন	১৫০-২০০
⁂ ৯৫	"	"	৯০	বামনপুকুরিয়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২৫ বৎসর	৪ দিন	৫০০-৬০০
✤ ৯৬	"	"	"	"	মাঘ	কালীপূজা	...	৮ দিন	২০০-৩০০
⁂ ৯৭	"	"	"	"	চৈত্র	শিবপূজা	...	১ দিন	৫০০-৬০০
* ৯৮	"	"	"	"	চৈত্র	পীর গোরাচাঁদের তিরোধান উৎসব	...	২ দিন	৫০০-৬০০
✤ ৯৯	"	"	১৫৯	নিমচী	ফাল্গুন	নিমচী মেলা	...	৮ দিন	৩০০
⁂১০০	"	হাবড়া	১০	কেওটসাহা	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	বহুপ্রাচীন	১ দিন	১,০০০
⁂১০১	"	"	১৪০	মেটিয়াগাছি	...	ইছালে ছাওয়ার	...	...	...
⁂১০২	"	"	১৬১	গোবরডাঙ্গা	বৈশাখ	গোষ্ঠমেলা	...	৭ দিন	২০,০০০
⁂১০৩	"	"	"	গোবরডাঙ্গা (ষষ্ঠীতলা)	আষাঢ়	রথযাত্রা	প্রাচীন	...	৭,০০০-৮,০০০
⁂১০৪	"	"	"	গোবরডাঙ্গা (ষষ্ঠীতলা)	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	...	...
⁂১০৫	"	"	"	"	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	...	...
⁂১০৬	"	"	"	"	চৈত্র	গাজন	...	...	...
⁂১০৭	"	আমডাঙ্গা	১১	নগুণ্ডা	পৌষ	মশানচণ্ডীপূজা	৩০ বৎসর	৭ দিন	১২,০০০
*১০৮	"	"	৫৮	আমডাঙ্গা	পৌষ	করুণাময়ী কালীপূজা	আরম্ভকাল ১৯১০ খৃঃ	৪ দিন	৫,০০০-৭,০০০
✤১০৯	"	বারাসত	১	বাবপুর	বৈশাখ	কালীপূজা	...	৪ দিন	১৫০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
✤ কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
⁂ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
*১১০	২৪-পরগণা	বারাসত	১৬	সাইবনা	কার্তিক	রাসযাত্রা	...	১ দিন	৩,০০০
❋১১১	"	"	"	"	মাঘ	নন্দলালজীউর উৎসব	৪৫০ বৎসর	১ দিন	৫,০০০
❋১১২	"	"	"	"	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	...
❋১১৩	"	"	৩০	কাটুরা	আষাঢ়	রথযাত্রা	১৫০ বৎসর	১ দিন	৫০০
❋১১৪	"	"	"	"	চৈত্র	চড়ক	১৫০ বৎসর	১ দিন	৫০০
❋১১৫	"	"	৫৭	দেয়াড়া	চৈত্র	শিবের গাজন	১০০ বৎসর	১ দিন	১,৫০০
✢১১৬	"	"	৭৮	উত্তরহাট-কাজীপাড়া	মাঘ	...	...	৮ দিন	১,০০০
✢১১৭	"	"	৯৭	বামনগাছি	মাঘ	মানিক পীরের মেলা	...	৪ দিন	২৫০
✢১১৮	"	"	১১৫	ছোট জাগুলিয়া	চৈত্র	মানিক পীরের মেলা	...	৪ দিন	৪০০
✢১১৯	"	"	১১৬	বাহেড়া	বৈশাখ	একদিল পীরের মেলা	...	৪ দিন	১০০
✢১২০	"	"	১২২	দত্তপুকুর	কার্তিক	রাসযাত্রা	...	৮ দিন	৬০০
✢১২১	"	"	১২৯	পাঁচুরিয়া	মাঘ	পাঁচুরিয়া মেলা	...	৪ দিন	৯৫০
✢১২২	"	"	১৪০	উলা	পৌষ	মানিকপীরের মেলা	...	৬ দিন	১৫০
*১২৩	"	"	১৪৩	কদম্বগাছি	মাঘ	মানিকপীরের মেলা	২০০ বৎসর	১ দিন	১৫০
✢১২৪	"	"	১৪৪	শঙ্করগাছি	ফাল্গুন	শঙ্করগাছির মেলা	...	৩ দিন	৩০০
✢১২৫	"	"	১৪৮	শিমুলগাছি	চৈত্র	মানিকতলার মেলা	...	৪ দিন	২০০
✢১২৬	"	"	১৬৪	বালিপুর	মাঘ	বালিপুরের মেলা	...	৪ দিন	২৫০
❋১২৭	"	"	১৬৫	ভাগ্যমন্তপুর	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	২৫০
✢১২৮	"	"	"	"	কার্তিক	রাসযাত্রা	...	৪ দিন	৫০০
✢১২৯	"	"	১৬৬	দাদপুর	মাঘ	বুড়ীমার মেলা	১০০ বৎসর	১ দিন	৪,০০০

✢১৩০	২৪-পরগণা	বারাসত	১৭১	কায়েম্বা	কার্তিক	রাসযাত্রা	...	৬ দিন	৩৫০
✣১৩১	„	„	১৯৪	সরদার আঁটি	আষাঢ়	রথযাত্রা	শতাধিক বৎসর	২ দিন	৭,০০০-৮,০০০
✢১৩২	„	„	...	বারাসত পৌর এলাকা	আঁষাঢ়	রথযাত্রা	...	৭ দিন	২,০০০
✢১৩৩	„	„	...	বেনিয়াবৌ	ফাল্গুন	পাগল পীরের মেলা	...	৫ দিন	৪০০-৫০০
✢১৩৪	„	„	...	ধলা	ফাল্গুন	একদিল পীরের মেলা	...	৪ দিন	৩৫০
✢১৩৫	„	„	...	সোনা খড়কী	„	ফাতেমা খাতিম মেলা		৪ দিন	১,০০০
✢১৩৬	„	„	...	নারায়ণপুর	„	পীর গোরাচাঁদের মেলা		৪ দিন	১,০০০
✣১৩৭	„	দেগঙ্গা	১৭	সোহাই	চৈত্র	চড়ক	৫০০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
✢১৩৮	„	„	২৬	দোগাছিয়া	চৈত্র	পীর গোরাচাঁদের মেলা	...	৪ দিন	১৫০
✣১৩৯	„	„	৬০	দেগঙ্গা	আষাঢ়	রথযাত্রা	প্রাচীন	২ দিন	১০,০০০-১২,০০০
✣১৪০	„	„	„	„	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রীপূজা	সম্প্রতি	৪ দিন	১০,০০০-১৫,০০০
✣১৪১	„	„	৪৭	উত্তর কলস্বর	বৈশাখ	ওলাইচণ্ডীপূজা	৮৬ বৎসর	১ দিন	৩,০০০
*১৪২	„	„	„	„	কার্তিক	রাসযাত্রার মেলা	৮৯ বৎসর	১২ দিন	৩,০০০-৩,৫০০
*১৪৩	„	„	৬৮	দেউলিয়া	আষাঢ়	রথযাত্রা	২০০ বৎসর	২ দিন	১৫,০০০
✣১৪৪	„	„	৬৮	দেউলিয়া	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	...
✣১৪৫	„	রাজারহাট	৭	অর্জুনপুর	মাঘ	গোরক্ষনাথের বার্ষিক পূজা	প্রাচীন	১ দিন	কয়েক হাজার
✢১৪৬	„	„	৩৮	বালাগাছি	অগ্রহায়ণ	পাগলগাজী মেলা	...	১ দিন	১৫০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

✢ কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

✣ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
*১৪৭	২৪-পরগণা	রাজারহাট	৪৯	শিখরপুর	কার্তিক	রাসযাত্রা	২০ বৎসর	৩ দিন	৮০০-৯০০
*১৪৮	„	„	...	গোবরা	পৌষ	বন্ধরপীরের মেলা	...	৫ দিন	২৫০-৩০০
*১৪৯	„	„	...	„	মাঘ	একদিল সাহেবের মেলা	...	৬ দিন	২০০-২৫০
*১৫০	„	„	...	রাজারহাট	ফাল্গুন	ভুল ভেয়ালী মেলা	...	৪ দিন	৩০০
✢১৫১	„	বিজপুর	...	কাঁচড়াপাড়া	বৈশাখ	চড়ক	...	১ দিন	...
✢১৫২	„	„	...	„	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	৬,০০০-৭,০০০
✢১৫৩	„	„	...	„	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	...	...
✢১৫৪	„	„	...	„	মাঘ	অন্নকূট উৎসব	৬০ বৎসর	১ দিন	১০,০০০
✢১৫৫	„	„	...	„	চৈত্র	চড়ক	...	...	...
✢১৫৬	„	নৈহাটী	৩	নৈহাটী	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	৮ দিন	১০,০০০-১২,০০০
*১৫৭	„	„	৪	কাঁঠালপাড়া	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১৫ দিন	১,০০০
*১৫৮	„	„	...	মুক্তাপুর	অগ্রহায়ণ	রাসযাত্রা	...	১ মাস	২,০০০
*১৫৯	„	জগদ্দল	১	ভাটপাড়া	কার্তিক	রাসপূর্ণিমা	শতাধিক বৎসর	১ মাস	১০,০০০
✢১৬০	„	„	„	„	ফাল্গুন	পঞ্চমদোল	প্রাচীন	১ দিন	...
✢১৬১	„	„	২	মাদরাল	ফাল্গুন	সপ্তমদোল	১০০ বৎসর	৭ দিন	১০,০০০-১২,০০০
*১৬২	„	„	৪	নারায়ণপুর	চৈত্র	জয়চণ্ডী	...	৩ দিন	২০০
*১৬৩	„	„	১৬	আতপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১৫ দিন	৫,০০০
*১৬৪	„	„	১৮	মূলাজোড়	পৌষ	কালীপূজা	...	১ মাস	৬,০০০-৭,০০০
✢১৬৫	„	„	১৯	গড় শ্যামনগর	বৈশাখ	বৈশাখী সংক্রান্তি	...	...	...

*১৬৬	২৪-পরগণা	নওপাড়া	...	নবাবগঞ্জ	শ্রাবণ	ঝুলন উৎসব	...	১ মাস	৮,০০০-১০,০০০
‡১৬৭	„	টিটাগড়	...	আনন্দপুরী	চৈত্র	রামনবমী	৪৮ বৎসর	১ দিন	৩০,০০০-৪৫,০০০
*১৬৮	„	„	...	ষষ্ঠীতলা	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	১০,০০০
‡১৬৯	„	খড়দহ	২	খড়দহ	বৈশাখ	শ্যামসুন্দরজীউর ফুলদোল	...	১ দিন	...
‡১৭০	„	„	„	„	কার্তিক	শ্যামসুন্দরজীউর রাসযাত্রা	...	১ মাস	৮,০০০-১০,০০০
‡১৭১	„	„	„	„	মাঘ	শ্যামসুন্দরজীউর মাঘীপূর্ণিমা	...	১ দিন	...
*১৭২	„	„	৮	সোদপুর	অগ্রহায়ণ	গোপাষ্টমী	...	১ দিন	৮,০০০-১০,০০০
*১৭৩	„	„	১০	পানিহাটি	জ্যৈষ্ঠ	দণ্ড মহোৎসব	প্রাচীন	১ দিন	...
‡১৭৪	„	„	„	„	কার্তিক	শ্রীচৈতন্যের আগমন উপলক্ষে মহোৎসব	৫০ বৎসর	১ দিন	...
*১৭৫	„	„	১১	আগরপাড়া	মাঘ	তারাপুকুরের মেলা	...	১৫ দিন	...
†১৭৬	„	„	...	খড়দহ রাসখোলা	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	১৫,০০০
†১৭৭	„	বরাহনগর	.	ঝুলনতলী	শ্রাবণ	ধর্মীয় মেলা	...	৭ দিন	৫,০০০
†১৭৮	„	„	...	রথতলা	শ্রাবণ	ধর্মীয় মেলা	...	৩ দিন	৬,০০০
*১৭৯	„	„	...	দক্ষিণেশ্বর	পৌষ	কল্পতরু উৎসব	...	১ দিন	...
‡১৮০	„	„	...	আড়িয়াদহ	কার্তিক	শ্রীঅন্নদাঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব	...	১ দিন	৪০,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
*১৮১	২৪ পরগণা	বরাহনগর	...	আড়িয়াদহ	মাঘ	আন্থাপূজা	প্রাচীন	২ দিন	৫০,০০০
‡১৮২	„	„	...	„	...	বিন্ধ্যবাসিনীপূজা	...	...	...
*১৮৩	„	বেহালা	...	বড়িশা	অগ্রহায়ণ	চণ্ডীপূজা	...	৭ দিন	...
†১৮৪	„	মহেশতলা	৫	মহেশতলা	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	৫০০
†১৮৫	„	„	৮	চকমিরা	চৈত্র	চড়ক	...	২ দিন	৫০০
†১৮৬	„	„	১৩	গনিপুর	চৈত্র	চড়ক	...	২ দিন	৪০০
‡১৮৭	„	„	৩৯	বাগপোতা	বৈশাখ	গোষ্ঠপূজা	প্রাচীন	৩ দিন	২,০০০
‡১৮৮	„	„	„	„	জ্যৈষ্ঠ	চণ্ডীপূজা	৫ বৎসর	...	২,০০০
‡১৮৯	„	„	„	„	মাঘ	সরস্বতীপূজা	প্রাচীন	২ দিন	২,০০০
‡১৯০	„	„	„	„	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	৫ দিন	২,০০০
†১৯১	„	„	...	বনেশজোড়হাট	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	৪০০
†১৯২	„	„	...	পারবাঙ্গলা	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	১,০০০
†১৯৩	„	„	...	ডাকঘর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	৫০০
†১৯৪	„	„	...	ময়নগর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	৪০০
†১৯৫	„	„	...	নাঙ্গী	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	৭০০
†১৯৬	„	„	...	„	চৈত্র	চড়ক	...	২ দিন	৬০০
†১৯৭	„	„	...	শিবরামপুর	চৈত্র	চড়ক	...	২ দিন	৫০০
†১৯৮	„	„	...	চাতলা	চৈত্র	চড়ক	...	২ দিন	৪০০
†১৯৯	„	„	...	বিশালাক্ষীতলা	চৈত্র	চড়ক	..	২ দিন	৪০০
†২০০	„	„	...	গোপালপুর	চৈত্র	চড়ক	...	২ দিন	১০০

‡২০১	২৪-পরগণা	বজবজ	৩৩	বুইতা	চৈত্র	চড়ক	২০০ বৎসর	১ দিন	৪০০-৫০০
‡২০২	„	„	৪২	পূজালী	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	..	...
*২০৩	„	„	৫৪	বাওয়ালী	আষাঢ়	রথযাত্রা	৩০০ বৎসর	২ দিন	২৫,০০০
‡২০৪	„	„	৯৮	চাউলখোলা	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	২,০০০-৩,০০০
‡২০৫	„	„	...	বজবজ	বৈশাখ	গোষ্ঠ উৎসব	...	...	...
‡২০৬	„	„	...	„	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	...	...
*২০৭	„	„	...	রায়পুর	পৌষ	কালী ও গঙ্গাপূজা	...	...	...
‡২০৮	„	„	...	বিড়লাপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	...	...
*২০৯	„	বিষ্ণুপুর	৯	ঝিকুরবেড়ে	চৈত্র	নীলপূজা	...	...	...
†২১০	„	„	৩৪	জয়রামপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	১ দিন	৭০০
*২১১	„	„	„	„	চৈত্র	গাজন	১০০ বৎসর	৩ দিন	২০,০০০
‡২১২	„	„	৪১	কাঞ্চনবাড়িয়া	আষাঢ়	রথযাত্রা	প্রাচীন	২ দিন	১০,০০০-১২,০০০
‡২১৩	„	„	৪২	নাদাভাঙ্গা	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	প্রাচীন	৫-৬ দিন	৫০০-৬০০
‡২১৪	„	„	৪৬	বাখরাহাট	মাঘ-ফাল্গুন	শীতলাপূজা	...	„	...
†২১৫	„	„	৪৭	কীর্ত্তনখোলা	চৈত্র	বারুণীস্নান	...	১ দিন	১০০,০০০
†২১৬	„	„	„	„	চৈত্র	শীতলাপূজা	...	১ দিন	১,০০০
‡২১৭	„	„	৫০	জয়চণ্ডীপুর	বৈশাখ	ধর্মরাজের উৎসব	..	...	
‡২১৮	„	„	„	„	পৌষ	হাজতের মেলা	...	...	...
‡২১৯	„	„	১৫১	মৎস্যখালী	বৈশাখ	গোষ্ঠ উৎসব	৭০ বৎসর	১ দিন	৪,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
‡২২০	২৪-পরগণা	বিষ্ণুপুর	১৫৮	ভাদুরামকৃষ্ণপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠ উৎসব	১০০ বৎসর	৪-৫ দিন	১,০০০
†২২১	„	„	...	রামনাথপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠ উৎসব	...	৪ দিন	৫০০
‡২২২	„	সোনারপুর	২২	গোড়খোড়া	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	৬,০০০
‡২২৩	„	„	৩৬	হরিণাভি	চৈত্র	রাসযাত্রা	...	৩ দিন	...
‡২২৪	„	„	৪১	কামরাবাদ	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	৫০ বৎসর	১ দিন	২,০০০-৩,০০০
‡২২৫	„	„	৫৫	রাজপুর	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	...	৭ দিন	...
‡২২৬	„	„	„	„	ফাল্গুন	শিবচতুর্দশী	...	৭ দিন	...
‡২২৭	„	„	„	„	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	প্রাচীন	১ দিন	...
‡২২৮	„	„	„	„	চৈত্র	শিবের গাজন	প্রাচীন	...	...
‡২২৯	„	„	৬৫	বনহুগলী	চৈত্র	চড়ক	৫০ বৎসর	১ দিন	৭০০-৮০০
‡২৩০	„	„	১০৩	রায়পুর	চৈত্র	চণ্ডীপূজা	২০০ বৎসর	৬ দিন	১,০০০
‡২৩১	„	„	„	„	শ্রাবণ	স্বাধীনতা দিবস উৎসবের মেলা	সম্প্রতি	২ দিন	..
‡২৩২	„	„	১০৮	সাঙ্গুর	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা উৎসব	শতাধিক বৎসর	২ দিন	৫০০-৬০০
‡২৩৩	„	„	১০৯	নভাসন	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা উৎসব	...	১ দিন	...
†২৩৪	„	বারুইপুর	২০	মল্লিকপুর	পৌষ	ফতেহা-দোয়াজ-দাহাম	...	১ দিন	...
‡২৩৫	„	„	৩১	মদারাট	চৈত্র	শিবের গাজন	১০০ বৎসর	১ দিন	৫০০
‡২৩৬	„	„	„	বারুইপুর	বৈশাখ	গৌর-নিতাই পূজা	...	১৫ দিন	...
*২৩৭	„	„	„	„	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	৭ দিন	১০,০০০
*২৩৮	„	„		„	কার্তিক	রাসযাত্রা	২০০ বৎসর	১ মাস	২৫,০০০
‡২৩৯	„	„	„	„	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	২০০ বৎসর	১ দিন	২,০০০

✣২৪০	২৪-পরগণা	বারুইপুর	৩১	বারুইপুর	চৈত্র	চড়ক	২০০ বৎসর	২ দিন	৫,০০০
✣২৪১	"	"	৬৩	ইন্দ্রপালা	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রার উৎসব	৭০-৮০ বৎসর	৩ দিন	...
✣২৪২	"	"	৯৭	ধপধপি	মাঘ	দক্ষিণ রায়ের জাঁতাল উৎসব	১৫০ বৎসর	২ দিন	৫,০০০
✦২৪৩	"	ভাঙ্গড়	২৪	পিঠাপুকুরিয়া	মাঘ	পীরের মেলা	...	৩ দিন	৭০০
✣২৪৪	"	"	৪৫	বামুনিয়া	ফাল্গুন	গোরাচাঁদের মেলা	৮-৯ বৎসর	১ দিন	২০০-৩০০
✣২৪৫	"	"	৬৭	সানপুকুরিয়া	মাঘ	মহোৎসবের মেলা	১০০ বৎসর	২ দিন	৫০০-৭০০
✦২৪৬	"	"	৭২	শাখর	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তির মেলা	...	৭ দিন	৫,০০০
*২৪৭	"	"	"	মরিচা	ফাল্গুন	কালাচাঁদ মেলা	২৫ বৎসর	৩ দিন	৩,০০০
✦২৪৮	"	"	"	মরিচা (পীরস্থান)	বৈশাখ	ভাঙ্গড় পীড়ের বার্ষিক উৎসব	...	১ দিন	৫,০০০
*২৪৯	"	"	৯২	ভাঙ্গড়	চৈত্র	ভাঙ্গড় পীড়ের উরস	শতাধিক বৎসর	১ দিন	৫,০০০
*২৫০	"	"	১১৯	শাকসহর	পৌষ	বাবন পীরের উরস	শতাধিক বৎসর	১০-১২দিন	৮,০০০-১০,০০০
✦২৫১	"	জয়নগর	১০	খাকসারা	বৈশাখ	চড়ক	...	১ দিন	৪,০০০-৫,০০০
✦২৫২	"	"	১৭	জয়নগর	বৈশাখ	ধনেরতরী কালীবাড়ী উৎসব	...	৩ দিন	১,৫০০
✦২৫৩	"	"	"	"	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	৭ দিন	২,০০০
✣২৫৪	"	"	১৯	জয়নগর-মজিলপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	...	...	১০,০০০
✣২৫৫	"	"	"	"	বৈশাখ	ধন্বন্তরী কালীর বার্ষিক উৎসব	...	১৫ দিন	২০,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

✦ কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

✣ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
✤২৫৬	২৪-পরগণা	জয়নগর	১৯	জয়নগর-মজিলপুর	জ্যৈষ্ঠ	চণ্ডীদেবীর বার্ষিক পূজা	...	১৫ দিন	৬০০-৭০০
✤২৫৭	"	"	"	"	ফাল্গুন	পঞ্চমদোল	...	৯ দিন	১৫,০০০
†২৫৮	"	"	৩০	কালীনগর	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	...	১ দিন	৫০০
†২৫৯	"	"	৪১	ময়দা	ফাল্গুন	শ্রীপঞ্চমী	...	১ দিন	১,০০০
✤২৬০	"	"	১১৪	গোবিন্দপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা উৎসব	প্রাচীন	২-৩ দিন	২,০০০-৩,০০০
✤২৬১	"	কুলতলী	১৪৫	নলগোড়া	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	২০ বৎসর	২ দিন	...
✤২৬২	"	"	১৪৬	সোনাটিক্রি (৬নং)	পৌষ	গঙ্গাপূজা	প্রাচীন	...	...
✤২৬৩	"	"	"	"	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	...	...
✤২৬৪	"	"	"	"	চৈত্র	গোষ্ঠপূজা	প্রাচীন	...	...
✤২৬৫	"	"	"	সোনাটিক্রি (৮নং)	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	...	...
✤২৬৬	"	"	"	সোনাটিক্রি (৯নং)	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	৭-৮ বৎসর	৮-১০ দিন	৪,০০০ ৫,০০০
✤২৬৭	"	"	"	সোনাটিক্রি (১২নং)	চৈত্র	গাজন	৭-৮ বৎসর	৮-১০ দিন	১০,০০০-১২,০০০
†২৬৮	"	ক্যানিং	৫১	কালিকাতলা	মাঘ	বনবীরপূজা	...	৪ দিন	৩৫০-৪০০
†২৬৯	"	"	৫২	মাঠেরদীঘি	চৈত্র	বাসন্তীপূজা ও চড়ক	...	৮ দিন	৬০০
✤২৭০	"	"	৭৫	ক্যানিং	ফাল্গুন-চৈত্র	ব্রহ্মাপূজা	৫০-৬০ বৎসর	৭-১২ দিন	১০,০০০
✤২৭১	"	"	৭৮	তালদি	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	২০-২৫ বৎসর	৩ দিন	২,৫০০
*২৭২	"	"	"	"	জ্যৈষ্ঠ	শীতলাপূজা	...	২ দিন	৪০০-৫০০
*২৭৩	"	"	"	"	ফাল্গুন	কালীপূজা	২৫ বৎসর	৩ দিন	২,৫০০
✤২৭৪	"	"	৯৪	ডেভিস আবাদ	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	প্রাচীন	১ দিন	৫০০-৬০০

‡২৭৫	২৪-পরগণা	ক্যানিং	১২০	রায়বাঘিনী	চৈত্র	চড়ক	৪০ বৎসর	৩ দিন	৫০০
*২৭৬	”	”	১৮১	ঘুটিয়ারী শরীফ	আষাঢ়	পীর মোবারক গাজীর আবির্ভাব উৎসব	১০০ বৎসর	৭ দিন	২০,০০০
‡২৭৭	”	বাসন্তী	৭১	আমঝাড়া	বৈশাখ	নববর্ষ	...	১ দিন	৬০০-৭০০
‡২৭৮	”	”	”	”	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	সম্প্রতি	১ দিন	৬০০-৭০০
‡২৭৯	”	”	১২১	ভরতগড়	ফাল্গুন	শীতলাপূজা	১৪-১৫ বৎসর	৭ দিন	...
‡২৮০	”	মগরাহাট	৭	ইয়ারপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	৫০ বৎসর	২ দিন	৩,০০০
†২৮১	”	”	১৫	সেরপুর	চৈত্র	চড়ক	...	৩ দিন	৫,০০০
†২৮২	”	”	১৬	সীতারামপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	...	১ দিন	১,০০০
†২৮৩	”	”	১৭	চকপরাণকাটাখালি	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	...	২ দিন	১,৫০০
†২৮৪	”	”	”	”	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৩ দিন	২,৫০০
†২৮৫	”	”	২১	বেড়ামারা	মাঘ	সরস্বতীপূজা	...	৩ দিন	২,০০০
†২৮৬	”	”	২৪	করিমাবাদ	কার্তিক	কালীপূজা	...	১ দিন	১,০০০
†২৮৭	”	”	৩৪	মন্দিরামপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	...	৪ দিন	৩০০-৪০০
†২৮৮	”	”	৪১	বানিবেড়ী	বৈশাখ	গঙ্গাস্নান	...	২ দিন	২,০০০
‡২৮৯	”	”	৪৩	সালিকা	চৈত্র	চড়ক	২০০ বৎসর	১ দিন	...
‡২৯০	”	”	”	”	চৈত্র	বিবিমায়েরপূজা	২০০ বৎসর	১ দিন	২,০০০-৩,০০০
†২৯১	”	”	৫৬	রাজবল্লভপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠমেলা	...	৩ দিন	৩,০০০
†২৯২	”	”	৫৭	মহেশ্বরা	বৈশাখ	ধর্মপূজা	...	২ দিন	১,৫০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
+২৯৩	২৪-পরগণা	মগরাহাট	৫৯	ঢনঢনিয়া	বৈশাখ	ধর্মপূজা	...	২ দিন	২,০০০
+২৯৪	„	„	৬১	শিবপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৩ দিন	১,৫০০
+২৯৫	„	„	৬৭	সাপমারা	বৈশাখ	চড়ক	...	১ দিন	১,০০০
+২৯৬	„	„	„	„	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	...	৩ দিন	৩,০০০
*২৯৭	„	„	৭৯	রঙ্গিলাবাদ	চৈত্র	চড়ক	২০০ বৎসর	৩ দিন	৭০০
+২৯৮	„	„	৯৭	বামনগাছি	মাঘ	মাণিক পীরের মেলা	...	৪ দিন	২৫০
*২৯৯	„	„	„	নাজরা	চৈত্র	চড়ক	১০০ বৎসর	১ দিন	৫০০
+৩০০	„	„	১০২	কানপুর	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	১,০০০
*৩০১	„	„	১০৫	উত্তর কুসুম	শ্রাবণ-ভাদ্র	মহরম	প্রাচীন	২ দিন	৭,০০০
+৩০২	„	„	১১৫	উত্তর কলস	চৈত্র	পীরের তিরোভাব উৎসব	৭০ বৎসর	৩ দিন	৫০০
+৩০৩	„	„	১১৮	আজমখালি	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	১ দিন	৫০০
+৩০৪	„	„	„	„	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	১,০০০
+৩০৫	„	„	১২৯	সংগ্রামপুর	বৈশাখ	গাজন ও গোষ্ঠমেলা	...	১ দিন	১,০০০
+৩০৬	„	„	১৩৬	বামনা	বৈশাখ	গোষ্ঠমেলা	...	১ দিন	১,০০০
+৩০৭	„	„	„	„	মাঘ	সরস্বতীপূজা	...	২ দিন	১,৫০০
+৩০৮	„	„	১৪২	সরাচি	বৈশাখ	গোষ্ঠমেলা	...	১ দিন	১,২০০
+৩০৯	„	„	১৪৫	একতারা	বৈশাখ	গোষ্ঠমেলা	...	১ দিন	১,০০০
+৩১০	„	„	১৮৮	মাইতিরহাট	কার্তিক	কালীপূজা	...	১ দিন	১,০০০
+৩১১	„	„	১৯৩	বনসুন্দরিয়া	বৈশাখ	গঙ্গাস্নান	...	২ দিন	৫,০০০
+৩১২	„	„	„	„	বৈশাখ	চড়ক	...	২ দিন	৩,০০০

†৩১৩	২৪-পরগণা	মগরাহাট*	১৯৯	বেনিপুর	বৈশাখ	গাজন	...	৩ দিন	২,০০০
†৩১৪	„	„	„	„	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৩ দিন	২,০০০
†৩১৫	„	„	২০১	কাটাপুকুরিয়া	বৈশাখ	ধর্মপূজা	...	১ দিন	১,০০০
†৩১৬	„	„	২০৪	আবাদ ঈশ্বরীপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠমেলা	...	২ দিন	১,৫০০
†৩১৭	„	„	...	ইয়ারপুর	বৈশাখ	চড়ক	...	১ দিন	১,০০০
†৩১৮	„	„	...	মোহনপুরহাট	বৈশাখ	চড়ক ও গোষ্ঠমেলা	...	৪ দিন	৫,০০০
†৩১৯	„	„	...	মাজাদা	বৈশাখ	চড়ক	...	২ দিন	১,৫০০
†৩২০	„	„	...	মাকালী	বৈশাখ	ধর্মপূজা	...	১ দিন	২,৫০০
†৩২১	„	„	...	কাঠালবাড়ুয়া	বৈশাখ	চড়ক	...	১ দিন	১,০০০
†৩২২	„	„	...	বারহনপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠমেলা	...	১ দিন	১,০০০
†৩২৩	„	„	...	আলিদা	বৈশাখ	গোষ্ঠমেলা	...	৩ দিন	৫,০০০
†৩২৪	„	„	...	আলিদা	বৈশাখ	বিবিমায়েরপূজা	...	৪ দিন	৫০০
†৩২৫	„	„	...	টোনারহাট	বৈশাখ	গোষ্ঠমেলা	...	১ দিন	১,০০০
‡৩২৬	„	মন্দিরবাজার	৭৮	সিদ্ধেশ্বপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	প্রাচীন	৩ দিন	৫০০
‡৩২৭	„	„	১০১	পূর্বগোপালনগর	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	...	...	...
‡৩২৮	„	„	„	„	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	...	...	...
‡৩২৯	„	„	২০৯	পূর্ব বিষ্ণুপুর	পৌষ	পৌষপার্বণ	শতাধিক বৎসর	৩ দিন	...
‡৩৩০	„	„	...	জগদীশপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	৮০ বৎসর	৭ দিন	১০,০০০-১২,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
†৩৩১	২৪-পরগণা	মন্দিরবাজার	...	মন্দিরবাজার	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	১ দিন	৪,০০০
†৩৩২	„	„	...	„	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি, গাজন ও গোষ্ঠযাত্রা	...	৬ দিন	৭,০০০
†৩৩৩	„	„	...	দক্ষিণ বিষ্ণুপুর	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	...	১ দিন	৩,০০০
†৩৩৪	„	„	...	পোলারহাট	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	...	১ দিন	৩,০০০
†৩৩৫	„	„	...	বিজয়গঞ্জ	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	...	৪ দিন	৪০০
‡৩৩৬	„	ফলতা	৯	মামুদপুর	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	প্রাচীন	৪ দিন	৫০০-৬০০
*৩৩৭	„	„	১৪	পদ্মপুর	মাঘ	গঙ্গাপূজা	২০০ বৎসর	৭ দিন	...
‡৩৩৮	„	„	২৩	সহরা	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	প্রাচীন	৩ দিন	১,৫০০
*৩৩৯	„	„	২৭	জগন্নাথপুর	জ্যৈষ্ঠ	স্নানযাত্রা	১৫০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
*৩৪০	„	„	২৮	বেলসিংহা	আষাঢ়	রথযাত্রা	৮০ বৎসর	১ দিন	৭০০
*৩৪১	„	„	৪৩	রসুলপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	২০০ বৎসর	৩ দিন	১,২০০
‡৩৪২	„	„	৫৪	দলুইপুর	কার্তিক	রাসযাত্রা	২০ বৎসর	৭ দিন	১৫,০০০
‡৩৪৩	„	„	৬১	রুখিয়া	কার্তিক	মহরম	১০০ বৎসর	...	...
†৩৪৪	„	„	৭০	ধোলটিকারী	বৈশাখ	ধর্মযাত্রা	...	১ দিন	৫,০০০
†৩৪৫	„	„	৭৬	বাসুদেবপুর	পৌষ	বিশালাক্ষীপূজা	...	৮ দিন	৯০০
‡৩৪৬	„	„	৮৫	দোস্তপুর	মাঘ	গঙ্গাপূজা	প্রাচীন	৪-৫ দিন	১,০০০
*৩৪৭	„	„	৮৭	কোদালিয়া	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	শতাধিক বৎসর	৬ দিন	১,০০০
*৩৪৮	„	„	১২৩	ফতেপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	১০০ বৎসর	৬ দিন	৮,০০০
†৩৪৯	„	„	১২৩	ফতেপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	৭,০০০

‡৩৫০	২৪-পরগণা	ফলতা	১২৬	হাসিমনগর	বৈশাখ	শিবের গাজন	১৫০ বৎসর	৩ দিন	৫,০০০
+৩৫১	”	”	...	মালা	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	...	৩ দিন	৫,০০০
+৩৫২	”	”	...	সমিরনাথগোপালপুর	চান্দ্রমাস	মহরম	...	১ দিন	৭,০০০
+৩৫৩	”	”	...	দৌলতপুর	পৌষ	বিশালাক্ষীপূজা	...	৪ দিন	৯০০
‡৩৫৪	”	ডায়মণ্ডহারবার	৫৩	কুলটিকরী	চৈত্র	বারুণীস্নান	প্রাচীন	৪ দিন	১০,০০০
‡৩৫৫	”	”	৮১	পারুলিয়া	চৈত্র	পঞ্চানন্দপূজা	শতাধিক বৎসর	৮-১০ দিন	৭,০০০-৮,০০০
‡৩৫৬	”	”	৯৭	হরিণডাঙ্গা	বৈশাখ	রক্ষাকালীপূজা	১২৪ বৎসর	৪-৫ দিন	১,৫০০
‡৩৫৭	”	”	১২৯	মশাট	চান্দ্রমাস	মহরম	২০০ বৎসর	½ বেলা	৫,০০০
‡৩৫৮	”	কুলপী	২১	দেরিয়া	আষাঢ়	রথযাত্রা	শতাধিক বৎসর	৮ দিন	১,০০০
‡৩৫৯	”	”	৩৮	শ্যামবসুরচক	জ্যৈষ্ঠ	ধর্মপূজা	৩০-৪০ বৎসর	১ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡৩৬০	”	”	”	”	আষাঢ়	রথযাত্রা		১ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡৩৬১	”	”	”	”	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	৪,০০০-৫০০০
‡৩৬২	”	”	১৩৯	উদয়রামপুর	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	...	৪০০-৫০০
‡৩৬৩	”	”	১৮৫	দুর্গানগর	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	২-৩ দিন	৮,০০০
‡৩৬৪	”	মথুরাপুর	৯	উত্তরগোবিন্দপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	১২ বৎসর	১ দিন	১,০০০
+৩৬৫	”	”	৩৫	নালুয়া	মাঘ	শ্রীপঞ্চমী	...	৬ দিন	২৫০
‡৩৬৬	”	”	৩৬	কৃষ্ণচন্দ্রপুর	পৌষ সংক্রান্তি	নামসংকীর্তন মহোৎসব	...	৩-৪ দিন	১৫,০০০-২০,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

\+ কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
‡৩৬৭	২৪-পরগণা	মথুরাপুর	৪১	ছত্রভোগ	চৈত্র	স্নানযাত্রা	...	...	...
‡৩৬৮	"	"	"	"	চৈত্র	চড়ক	...	...	...
‡৩৬৯	"	"	৪৬	বড়াশী	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	২ দিন	...
†৩৭০	"	"	"	"	চৈত্র	হিন্দুমেলা	...	১৫ দিন	৫,০০০
‡৩৭১	"	"	"	"	চৈত্র	স্নানযাত্রা	...	৩ দিন	২৫,০০০-৩০,০০০
*৩৭২	"	"	৬৯	খাড়ীফৌজদারতলা	চৈত্র	সর্বমঙ্গলাপূজা	প্রাচীন	৬-৭ দিন	৫,০০০
‡৩৭৩	"	"	১১৯	গিলারছাট	বৈশাখ	নববর্ষের মেলা	৫০ বৎসর	৫ দিন	২,৫০০
†৩৭৪	"	"	১৫৬	দক্ষিণ গোবিন্দপুর	ফাল্গুন	শিবচতুর্দশী	...	৮ দিন	৩০০
†৩৭৫	"	"	১৮৭	লক্ষ্মীজনার্দনপুর	পৌষ	বিশালাক্ষ্মীপূজা	...	৭ দিন	৫০০
†৩৭৬	"	"	১৮৯	কুমারপুর	কার্তিক	জগন্নাথদেবের মেলা	...	৮ দিন	৩০০-৪০০
†৩৭৭	"	"	...	রায়পুর	বৈশাখ	গঙ্গাস্নানের মেলা	...	২ দিন	২০,০০০
‡৩৭৮	"	পাথরপ্রতিমা	১৪৩	দিগম্বরপুর	ফাল্গুন	নারায়ণীপূজা	প্রাচীন	৩ দিন	...
‡৩৭৯	"	"	১৮৫	কামদেবপুর	বৈশাখ	চন্দনীপূজা	প্রাচীন	৩-৪ দিন	২,০০০
‡৩৮০	"	"	২০১	শ্রীধরনগর	ফাল্গুন	বিশালাক্ষ্মীপূজা	২৫ বৎসর	১ দিন	৭০০-৮০০
‡৩৮১	"	"	২১১	ইন্দ্রপুর	মাঘ	বিশালাক্ষ্মীপূজা	৪০ বৎসর	৩ দিন	২,০০০
‡৩৮২	"	কাকদ্বীপ	৭	সীতারামপুর	ফাল্গুন	মহোৎসবের মেলা	প্রাচীন	৩-৪ দিন	৩,০০০-৪,০০০
‡৩৮৩	"	"	৮	মাধবনগর	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রার মেলা	১০০ বৎসর	৭ দিন	...
‡৩৮৪	"	"	২৬	উত্তর দুর্গাপুর	ফাল্গুন	গোরাচাঁদের মেলা	...	৭ দিন	...
‡৩৮৫	"	"	৩৩	মনিপুর	পৌষ	গঙ্গাপূজার মেলা	৫০ বৎসর	৭ দিন	৮০০-৯০০
‡৩৮৬	"	নামখানা	৭০	অমরাবতী	পৌষ	মকর সংক্রান্তি	৪০ বৎসর	৩ দিন	৬,০০০-৭০০০

‡৩৮৭	২৪-পরগণা	সাগর	৭	শিলপাড়া	চৈত্র	চড়ক	১৫০ বৎসর	৭ দিন	২০,০০০
‡৩৮৮	”	”	২১	মৃত্যুঞ্জয়নগর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	২২-২৩ বৎসর	৪ দিন	...
‡৩৮৯	”	”	২২	সুমতীনগর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৬ বৎসর	৫ দিন	২,০০০
‡৩৯০	”	”	২৪	লালপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১৪ বৎসর	৬ দিন	৬,০০০
‡৩৯১	”	”	”	”	কার্তিক	কালীপূজা	৭ বৎসর	২ দিন	৬,০০০
‡৩৯২	”	”	”	”	কার্তিক	রাসযাত্রা	৮ বৎসর	৮ দিন	৬,০০০
‡৩৯৩	”	”	”	”	চৈত্র	শিবপূজা	৭ বৎসর	১ দিন	৬,০০০
†৩৯৪	”	”	...	ঈশ্বরীপুর	পৌষ	গঙ্গাপূজার মেলা	...	২ দিন	৩০০-৫০০
†৩৯৫	”	”	...	দাসপুরা	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	১ দিন	৫০০
*৩৯৬	”	কাকদ্বীপ	৩৮	গঙ্গাসাগর	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি স্নান	প্রাচীন	...	৩-৪ লক্ষ
‡৩৯৭	মেদিনীপুর	মেদিনীপুর	২৫	চান্দাবিলা	বৈশাখ	গাজন	৬০ বৎসর	১ দিন	৩,০০০
‡৩৯৮	”	”	৮৫	এল্লাবনী	মাঘ	ফুলমণিপূজা	শতাধিক বৎসর	৩ দিন	৬০০-৭০০
‡৩৯৯	”	”	১২৭	মুড়াকাটা	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	২০০ বৎসর	৩ দিন	৭০০-৮০০
‡৪০০	”	”	১৮২	সুজাগঞ্জ	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	...	...
†৪০১	”	”	”	বেলা (২নং ইউনিয়ন)	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	...	৭ দিন	৫০০
‡৪০২	”	”	”	মেদিনীপুর সহর	পৌষ	পুণ্যস্নান	...	...	...
‡৪০৩	”	”	”	”	চান্দ্রমাস	মহরমের মেলা	...	...	...
†৪০৪	”	শালবনী	৯০	শালবনী	পৌষ	বারাংপূজা	...	১ দিন	৩,০০০
‡৪০৫	”	”	১৩৫	দেবগ্রাম	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	৭ দিন	১,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
♣৪০৬	মেদিনীপুর	শালবনী	১৮৩	শালবনী	পৌষ	বারাংপূজা	...	১ দিন	৩,০০০
♣৪০৭	"	"	২৪৫	গাইঘাটা	পৌষ	"	...	১ দিন	২,০০০
*৪০৮	"	"	২৪৮	জলহরি	বৈশাখ	গাজন	প্রাচীন	৭ দিন	৩,০০০
✿৪০৯	"	"	২৬৫	দেউলী	মাঘ	কালষণ্ডাপূজা	প্রাচীন	১ দিন	৩,০০০
✿৪১০	"	"	৩৫৭	বিষ্ণুপুর	মাঘ	ভীম একাদশী	১০ বৎসর	৭ দিন	২,০০০
♣৪১১	"	"	৪১৫	শালবনী	পৌষ	বারাংপূজা	...	১ দিন	৩,০০০
♣৪১২	"	"	৪২২	বাঁকিবন্দ	আশ্বিন	ঈদ উৎসব	...	২ দিন	২,০০০
*৪১৩	"	"	৫২৪	কর্ণগড়	পৌষ	বারাংপূজা	...	৭ দিন	৩,০০০
✿৪১৪	"	"	৫২৭	ডাঙ্গরপাড়া	বৈশাখ	গাজন	১৫০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
♣৪১৫	"	"	...	নান্দুরিয়া	পৌষ	বারাংপূজা	...	২ দিন	২,৫০০
♣৪১৬	"	"	...	মেঘাথাম	মাঘ	সংক্রান্তিপূজা	...	১ দিন	২,৫০০
✿৪১৭	"	কেশপুর	১৯	বেল্যা মহারাজপুর	মাঘ	সরস্বতীপূজা	৬০-৭০ বৎসর	৭ দিন	৩০,০০০
*৪১৮	"	"	৮১	কানাশোল	চৈত্র	গাজন	৩০০ বৎসর	৮ দিন	১,০০০
✿৪১৯	"	"	২০০	নেড়াদেউল	অগ্রহায়ণ	রাসযাত্রা	১০০ বৎসর	৭ দিন	১,০০০
*৪২০	"	"	"	"	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি ও সরস্বতীপূজা	...	২ দিন	১,০০০
✿৪২১	"	"	৩৭৮	আনন্দপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	২০০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
✿৪২২	"	"	"	"	পৌষ	বীরঝাপট উৎসব (গ্রাম্যদেবী)	১৫০ বৎসর	১ দিন	৫০০
✿৪২৩	"	"	৪০০	নূতনবাজার	মাঘ	ভাঙ সিংয়ের মেলা (গ্রাম্যঠাকুর)	৩০ বৎসর	৭ দিন	৩,০০০-৪,০০০
*৪২৪	"	"	৪৪৭	ধলহরা	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	২ দিন	২,৫০০

*৪২৫	মেদিনীপুর	কেশপুর	৪৭৩	কাণ্ঠখামার	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	প্রাচীন	২ দিন	২,৫০০
‡৪২৬	"	গড়বেতা	১৩	রূপারঘাগরা	মাঘ	রূপাসিনীপূজা	৪০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡৪২৭	"	"	৪৪	সারেঙ্গাগড়	মাঘ	বংগাঠাকুর পূজা	২০০ বৎসর	৭ দিন	১০,০০০-১২,০০০
‡৪২৮	"	"	১১৮	পিংবনী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৬০-৭০ বৎসর	৪ দিন	...
‡৪২৯	"	"	"	"	মাঘ	সরস্বতীপূজা	সম্প্রতি	১ দিন	...
*৪৩০	"	"	"	"	চৈত্র	শিবের গাজন	প্রাচীন	৩ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡৪৩১	"	"	১৭৯	আমলাগুলী	মাঘ	বোঙ্গাপূজা	প্রাচীন	১ দিন	...
‡৪৩২	"	"	২০৮	আষাঢ়গ্রাম	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রীপূজা	প্রাচীন	৪ দিন	৭০০-৮০০
‡৪৩৩	"	"	৩১৫	নলবোনা	মাঘ	সরস্বতীপূজা	৩০ বৎসর	১ দিন	৩,০০০-৪,০০০
‡৪৩৪	"	"	৩২৩	মঙ্গলপাড়া	চৈত্র	রামনবমী	১৪-১৬ বৎসর	৩ দিন	৩,০০০
†৪৩৫	"	"	৪০২	কৃষ্ণনগর	আষাঢ়	মহোৎসব	...	৩ দিন	৩০০-৪০০
‡৪৩৬	"	"	৪৭২	আকছড়া	মাঘ	শিকড়াসিনীপূজা	২০ বৎসর	৩ দিন	২,০০০-২,৫০০
‡৪৩৭	"	"	৪৮৯	ঝাড়বনি	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	৪ দিন	১,০০০
‡৪৩৮	"	"	"	"	...	ঝাড়বনীসিনীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	১,০০০
‡৪৩৯	"	"	৫০১	নোহারী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১২৫ বৎসর	৪ দিন	৭০০-৮০০
†৪৪০	"	"	৫৩১	নাচনজাম	মাঘ	নাচনজামসিনীপূজা	২০০ বৎসর	২ দিন	৮০০-৯০০
‡৪৪১	"	"	৫৫২	পড়িকাশুলী	মাঘ	মাচাইসিনীপূজা	২৫০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡৪৪২	"	"	৫৭০	গড়বেতা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	১০,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
‡৪৪৩	মেদিনীপুর	গড়বেতা	৫৭০	গড়বেতা	ফাল্গুন	পঞ্চমদোল	...	৩ দিন	...
‡৪৪৪	„	„	৬০৯	বনকাটী	চৈত্র	গাজন	শতাধিক বৎসর	৪ দিন	...
‡৪৪৫	„	„	৬১০	ব্রজনাথপুর	পৌষ	পৌষ পার্বণ	৩০০ বৎসর	১ দিন	৪০০-৫০০
‡৪৪৬	„	„	৬৫০	নলপা	বৈশাখ	মহোৎসব	প্রাচীন	১ দিন	৪০০-৫০০
‡৪৪৭	„	„	৭১২	কাঁচডহরি	মাঘ	সরস্বতীপূজা	সম্প্রতি	৭ দিন	...
‡৪৪৮	„	„	„	„	...	মহরম	প্রাচীন	...	...
*৪৪৯	„	„	৭৩৬	রসকুণ্ডু	বৈশাখ	শিবপূজা	...	৩ দিন	৭০০-৮০০
†৪৫০	„	„	৭৬৩	কেনকাতোর	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	...	৩ দিন	২,৫০০
‡৪৫১	„	„	৭৭৫	আউসাবাঁধি	চৈত্র	শালুইপূজা	২০০ বৎসর	৩ দিন	...
‡৪৫২	„	„	৮৩০	উত্তরবিল	ফাল্গুন	পীরের উরস্	প্রাচীন	৩ দিন	৩,০০০
†৪৫৩	„	„	...	রাপুরিয়া	আষাঢ়	মহোৎসব	...	৩ দিন	৩০০-৪০০
†৪৫৪	„	„	...	সর্গ	মাঘ	গাজন	...	৩ দিন	৩,০০০
*৪৫৫	„	„	...	বগড়ী কৃষ্ণনগর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	৩ দিন	৬,০০০
†৪৫৬	„	ডেবরা	৪৭	গোলগ্রাম	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	৬ দিন	১,০০০
†৪৫৭	„	„	৯২	মালিঘাটী	জ্যৈষ্ঠ	নবকুঞ্জ উৎসব	...	৭ দিন	৫০০
†৪৫৮	„	„	১০০	ত্রিলোচনপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	৩ দিন	৪০০
‡৪৫৯	„	„	১৩৮	লোয়াদা	মাঘ	রথযাত্রা	১০০ বৎসর	২ দিন	৫,০০০
*৪৬০	„	„	২৩০	চণ্ডীপুর	পৌষ-মাঘ	কেদারমেলা	...	১ মাস	৫,০০০
†৪৬১	„	„	২৬০	সত্যপুর	বৈশাখ	গাজন	...	১৫ দিন	২,০০০
†৪৬২	„	„	৩৩৯	দ্বারিকাপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	৬ দিন	৫০০

‡৪৬৩	মেদিনীপুর	ডেবরা	৩৩৯	কুমরপুর	বৈশাখ	হাতেশ্বরজীউ	...	...	...
‡৪৬৪	„	„	„	পুশং	বৈশাখ	খগেশ্বরজীউ	...	...	...
†৪৬৫	„	সবঙ্গ	২৪৮	তলস্তাপাড়া	কার্তিক	রাসযাত্রা	...	৫ দিন	২,০০০
‡৪৬৬	„	„	২৬৪	বাসুল্যা	বৈশাখ	গাজন	৬০ বৎসর	২-৩ দিন	৪০০-৫০০
‡৪৬৭	„	„	২৮২	গুগুত	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	৬-৭ দিন	৫০০
*৪৬৮	„	„	২৯৩	সবঙ্গ	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	সম্প্রতি	৭ দিন	৬০০-৭০০
‡৪৬৯	„	„	৩০৫	বেলকী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	৪ দিন	২,০০০
‡৪৭০	„	„	৩০৮	তেঘরি বাড়কমল	আষাঢ়	রথযাত্রা	২০০ বৎসর	২ দিন	১,০০০
‡৪৭১	„	„	৩১৮	দশগ্রাম	কার্তিক	কালীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	...
‡৪৭২	„	„	৩৩৬	বনাই	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	সম্প্রতি	৪ দিন	৫০০
‡৪৭৩	„	„	৩৫১	খড়িকা	বৈশাখ	গাজন	৮০-৯০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡৪৭৪	„	„	„	„	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	সম্প্রতি	৪ দিন	১,০০০
†৪৭৫	„	„	৩৮৯	শীতলদা	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	৪ দিন	১,০০০
†৪৭৬	„	„	৪০৭	বিষ্ণুপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৫০ বৎসর	৬ দিন	৩,০০০-৪,০০০
‡৪৭৭	„	„	„	কোলঙ্গা	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	...	...	৪০,০০০
‡৪৭৮	„	„	„	কেলেঘাই নদীর তীরে	...	„	...	১ দিন	৪,০০০-৫,০০০
†৪৭৯	„	পিঙ্গলা	২৭	গোপীনাথপুর	বৈশাখ	অগ্নিপূজা	...	১ দিন	২০০
‡৪৮০	„	„	৬৮	ডাঙ্গরা	বৈশাখ	গাজন	২৫ বৎসর	১ দিন	৩০০-৪০০
‡৪৮১	„	„	৭৬	টুঙ্গুরা	বৈশাখ	গাজন	৪০ বৎসর	১ দিন	৫০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
†৪৮২	মেদিনীপুর	পিঙ্গলা	৭৭	কালিকা কুণ্ডুয়া	চৈত্র	চড়ক	...	৪ দিন	৪,০০০
†৪৮৩	„	„	৮৩	পিঙ্গলা	বৈশাখ	মহোৎসব	...	৪ দিন	৪০০
†৪৮৪	„	„	১০৬	ধনেশ্বরপুর	বৈশাখ	মহোৎসব	...	২ দিন	৫০০
‡৪৮৫	„	„	২০৪	গোবর্দ্ধনপুর	বৈশাখ	গাজন	৬০ বৎসর	২ দিন	৫০০
‡৪৮৬	„	„	২০৯	পিণ্ডরুই	বৈশাখ	রথযাত্রা	১৯৪৪ খৃঃ	২ দিন	...
‡৪৮৭	„	„	„	„	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	৭ দিন	৫০০
‡৪৮৮	„	„	২৩৫	তিলদাগঞ্জ	বৈশাখ	গাজন	৭০ বৎসর	৩ দিন	৫০০
‡৪৮৯	„	„	২৩৬	জলচক	বৈশাখ	গাজন	প্রাচীন	৭ দিন	৩,০০০-৪,০০০
*৪৯০	„	„	...	কাঁটাপুকুর	মাঘ	রথযাত্রা	...	১৫ দিন	২০,০০০
†৪৯১	„	পড়্গাপুর	১৩	আন্ধারিয়া	মাঘ	মাঘী পূর্ণিমা	...	২ দিন	৫০০
‡৪৯২	„	„	৪৪	খেমাশোলী	ভাদ্র	ইন্দ্রপূজা	৯-১০ বৎসর	১ দিন	৪০০-৫০০
†৪৯৩	„	„	১৩১	মালঞ্চ	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	৮ দিন	১,০০০
‡৪৯৪	„	„	১৭৮	কাঁথড়া	আষাঢ়	রথযাত্রা	৫০ বৎসর	৭ দিন	৭০০-৮০০
†৪৯৫	„	„	২৪৭	ঘোলঘরিয়া	বৈশাখ	কালীপূজা	...	২ দিন	৩,০০০
‡৪৯৬	„	„	৩৩১	এলাসাই রাঙ্গাদিঘী	বৈশাখ	গাজন	২০০ বৎসর	১ দিন	৩,০০০-৪,০০০
†৪৯৭	„	„	৩৮৪	বলরামপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	..	২ দিন	৭০০
†৪৯৮	„	„	৫৩১	শ্রীরামপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	..	৩ দিন	১,৫০০
‡৪৯৯	„	„	৫৩৪	ঘড়ইগেড়্যা	চৈত্র	কালীপূজা	১০০ বৎসর	১ দিন	৩,০০০-৪,০০০
‡৫০০	„	„	৫৫৯	সাওড়দা	আষাঢ়	রথযাত্রা	১২ বৎসর	৪-৫ দিন	৭০০-৮০০
†৫০১	„	„	৫৭৩	ভাস্থরিয়া	বৈশাখ	কালীপূজা	...	২ দিন	১,০০০

‡৫০২	মেদিনীপুর	খড়্গপুর	৫৭৫	বাড়বাঁসি	কার্তিক	কালীপূজা	৬০ বৎসর	২ দিন	..
‡৫০৩	"	"	"	"	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	প্রাচীন	২ দিন	...
‡৫০৪	"	"	"	"	চৈত্র	গাজন	১০০ বৎসর	৭ দিন	...
‡৫০৫	"	"	৬৪৯	আতরা	চৈত্র	কালীপূজা	২৫ বৎসর	৭ দিন	৫০০
‡৫০৬	"	"	৬২৪	গোকুলপুর	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	প্রাচীন	১ দিন	৫,০০০-৭,০০০
‡৫০৭	"	"	"	"	ভাদ্র	ভীমএকাদশী	১৩৬০ বঙ্গাব্দ	১ দিন	৫,০০০-৭,০০০
‡৫০৮	"	"	"	"	চৈত্র	কালীপূজা	১৩৬৪ বঙ্গাব্দ	১ দিন	৫,০০০-৭,০০০
‡৫০৯	"	"	"	"	চৈত্র	শীতলাপূজা	...	৩-৭ দিন	৫,০০০-৭,০০০
‡৫১০	"	"	...	খড়্গপুর শহর	...	মহরম	...	...	...
†৫১১	"	"	...	মাওয়া	চৈত্র	কালীপূজা	...	১ দিন	১,২০০
*৫১২	"	নারায়ণগড়	২৬৮	কসবা নারায়ণগড়	আষাঢ়	রথযাত্রা	প্রাচীন	৪ দিন	২,০০০
‡৫১৩	"	"	"	"	আশ্বিন	ব্রহ্মাণীপূজা	৪০০ বৎসর	১ দিন	৩,০০০
†৫১৪	"	"	"	"	মাঘ	মাঘী পূর্ণিমা	...	১ দিন	২,০০০
†৫১৫	"	"	২৭৩	কসবা	মাঘ	মাঘী পূর্ণিমা	...	২ দিন	৪,৫০০
‡৫১৬	"	"	৩১২	দেউলী	কার্তিক	রাসযাত্রা	...	১ দিন	৩,০০০
‡৫১৭	"	"	"	"	মাঘ	পৌষ পার্বণ	প্রাচীন	১ দিন	৩,০০০
‡৫১৮	"	"	"	"	চৈত্র	চড়ক	...	১৫ দিন	৩,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
†৫১৯	মেদিনীপুর	নারায়ণগড়	৩১৫	বেলদা	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	২,০০০
†৫২০	„	„	„	„	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	২ দিন	২,৫০০
†৫২১	„	„	৩৫০	বাবলপুর	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	১,০০০
†৫২২	„	„	৪৩৯	রায়পুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	২ দিন	২,৫০০
*৫২৩	„	„	৪৮০	ভদ্রকালী	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	৮ দিন	৬,০০০
‡৫২৪	„	„	৫০৮	কোতাইগড়	বৈশাখ	অক্ষয় তৃতীয়া	প্রাচীন	৯ দিন	২,০০০
‡৫২৫	„	„	„	„	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৭০ বৎসর	৪ দিন	২,০০০
‡৫২৬	„	„	৫৮৮	খুরসি	কার্তিক	কালীপূজা	সম্প্রতি	২ দিন	...
‡৫২৭	„	„	„	„	চৈত্র	ভীমএকাদশী	সম্প্রতি	২ দিন	...
‡৫২৮	„	„	„	„	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	সম্প্রতি	৪ দিন	...
‡৫২৯	„	„	৬০৮	পাহাড়পুর	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	শতাধিক বৎসর	১ দিন	...
†৫৩০	„	„	৬৩০	রেড়ীপুর	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	১,০০০
†৫৩১	„	„	৬৩৪	দেউলা	পৌষ	মকর সংক্রান্তি	...	১ দিন	২,০০০
‡৫৩২	„	„	৭০৪	আসাদা	কার্তিক	রাসযাত্রা	শতাধিক বৎসর	৫-৬ দিন	৩,০০০
‡৫৩৩	„	„	...	মদনমোহন চক্	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	সম্প্রতি	৬-৭ দিন	১,০০০
†৫৩৪	„	„	...	মামনসা	পৌষ	মকর সংক্রান্তি	...	১ দিন	২,০০০
†৫৩৫	„	„	...	তুর্গা	পৌষ	মকর সংক্রান্তি	...	১ দিন	২,০০০
†৫৩৬	„	„	...	পাকৃতাপোল	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	১,০০০
‡৫৩৭	„	দাঁতন	৩	রাউতারাপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	সম্প্রতি	২ দিন	৩০০
‡৫৩৮	„	„	৩৮	পলাশিয়া	ভাদ্র	রাসযাত্রা	...	১ দিন	...
‡৫৩৯	„	„	„	„	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	৫ বৎসর	৭ দিন	...

‡৫৪০	মেদিনীপুর	দাঁতন	৭৩	মোগলমারি	বৈশাখ	গাজন	১৫০ বৎসর	১ দিন	১,৫০০
‡৫৪১	„	„	„	„	মাঘ	মহোৎসব	...	৩ দিন	৬০০-৭০০
‡৫৪২	„	„	৭৪	মনোহরপুর	ফাল্গুন	মাতৃমেলা	৫০ বৎসর	৫ দিন	৩,০০০
‡৫৪৩	„	„	১০৬	কেশিয়াড়ী	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তিস্নান	...	১ দিন	...
*৫৪৪	„	„	১২০	শরশঙ্কা	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	...	১ দিন	২,০০০
‡৫৪৫	„	„	১৮৫	শোলপাটা	বৈশাখ	গাজন	৫০-৬০ বৎসর	৪ দিন	১,৫০০
‡৫৪৬	„	„	২১৬	হরিপুরা	বৈশাখ	গাজন	২০ বৎসর	১ দিন	৫০০
‡৫৪৭	„	„	„	„	মাঘ	সরস্বতীপূজা	সম্প্রতি	৫ দিন	৫০০
‡৫৪৮	„	„	২৪৫	খণ্ডরুই	কার্তিক	রাসযাত্রা	৫০-৬০ বৎসর	৭ দিন	...
‡৫৪৯	„	„	„	„	মাঘ	সরস্বতীপূজা	২ বৎসর	৭ দিন	...
‡৫৫০	„	„	„	„	চৈত্র-বৈশাখ	চড়ক	৫০ বৎসর	১৫ দিন	...
†৫৫১	„	„	২৫০	কেদার	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	২ দিন	১,০০০
†৫৫২	„	„	...	ঠাকুরগড়	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	৪,২০০
†৫৫৩	„	মোহনপুর	৩৮৪	মোহনপুর	জ্যৈষ্ঠ	স্নানযাত্রা	...	১ দিন	১,০০০
†৫৫৪	„	„	„	„	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	৫,০০০
†৫৫৫	„	„	„	„	আষাঢ়	উল্টোরথ	...	১ দিন	৪,০০০
†৫৫৬	„	„	৩৯০	আগর আড়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	৫০০
†৫৫৭	„	„	...	সানপিঙ্গা	কার্তিক	রাসযাত্রা	...	৭ দিন	৬০০
†৫৫৮	„	„	...	বৈটাবাজার	বৈশাখ	কালীপূজা	...	১৫ দিন	২,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
ক৫৫৯	মেদিনীপুর	মোহনপুর	...	খড়িশা	চৈত্র	চড়ক	...	১২ দিন	৩০০
✽৫৬০	"	কেশিয়াড়ী	৯৫	বারমোড়	বৈশাখ	গাজন	প্রাচীন	৭ দিন	২,০০০
✽৫৬১	"	"	১২০	ভেলামপুর	মাঘ	শিবপূজা	প্রাচীন	১ দিন	৬০০-৭০০
✽৫৬২	"	"	১৪৫	সুকারোল	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	১ দিন	৫০০
✽৫৬৩	"	"	...	তলকেশরা	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	৭ দিন	...
✽৫৬৪	"	"	...	"	চৈত্র (পূর্ণিমা)	রথযাত্রা	...	১ দিন	...
✽৫৬৫	"	কাঁথি	৭৬	পশ্চিম সরপাই	পৌষ	গঙ্গাপূজা	২০ বৎসর	১ দিন	৭০০-৮০০
✽৫৬৬	"	"	৭৭	বলাগেড়্যা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৪ বৎসর	৪ দিন	১,০০০
✽৫৬৭	"	"	১০৩	খোলনাশ্বরী	চৈত্র	গাজন	২০০ বৎসর	১৫ দিন	৫০০
ক৫৬৮	"	"	১৩১	নীলপুরা	বৈশাখ	অক্ষয় তৃতীয়া	...	৩ দিন	১,০০০
ক৫৬৯	"	"	১৭৪	করালদা নিজ	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	...	১ দিন	১,৫০০
✽৫৭০	"	"	১৮১	রানী চক	পৌষ	ললিতকুমারী দেবী	...	১ দিন	২,৫০০-৩,০০০
✽৫৭১	"	"	"	"	চৈত্র	"	...	১ দিন	২,৫০০-৩,০০০
ক৫৭২	"	"	১৯৯	হামিরমহল	কার্তিক	কালীপূজা	...	৪ দিন	৭,০০০
ক৫৭৩	"	"	২১০	মাকুন্দপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৫ দিন	১,৯০০
ক৫৭৪	"	"	২১৫	নিমদাসবর	কার্তিক	কালীপূজা	...	৪ দিন	৭,৫০০
*৫৭৫	"	"	২৬৫	কিশোরনগর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	৩,৫০০
✽৫৭৬	"	"	২৭৮	নামালডিহা	ফাল্গুন	গ্রাম্য দেব-দেবী পূজা	২৫ বৎসর	১৫ দিন	২,০০০
✽৫৭৭	"	"	২৯০	হরিপুর	চৈত্র	চড়ক	৪০ বৎসর	১০ দিন	৫০০
ক৫৭৮	"	"	৩৮৬	বেলদা	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	৭৫০
✽৫৭৯	"	"	৩৯৩	মারিশদা	কার্তিক	রাসযাত্রা	৪০ বৎসর	১ দিন	৫০০-৬০০

†৫৮০	মেদিনীপুর	কাঁথি	৩৯৯	দহ লাউদা	বৈশাখ	অক্ষয় তৃতীয়া	...	১ দিন	১,৫০০
*৫৮১	"	"	৪১১	নাচিন্দা	বৈশাখ	চন্দনযাত্রা	৭৫ বৎসর	২১ দিন	৫,০০০
‡৫৮২	"	"	৪১৩	সেন্তাঝি	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১০০ বৎসর	২ দিন	...
‡৫৮৩	"	"	৪১৬	কানাইদিঘি	পৌষ	গঙ্গাপূজা	সম্প্রতি	৭ দিন	১,৫০০
†৫৮৪	"	"	৪১৯	উমাপতিবর	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	...	৩ দিন	২,৫০০
‡৫৮৫	"	"	৪২৮	বাসুদেববেড়্যা	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৬০-৭০ বৎসর	১ দিন	৪,০০০
‡৫৮৬	"	"	৪৩৩	বাড়চূণপাড়া	মাঘ	সরস্বতীপূজা	৫ বৎসর	৭ দিন	১,০০০
†৫৮৭	"	"	৪৩৯	আউরাই	কার্তিক	কালীপূজা	...	১২ দিন	১,০০০
‡৫৮৮	"	"	৪৮৫	বাসন্তীয়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	২০,০০০
†৫৮৯	"	"	৪৯৫	চক হজরতপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৫ দিন	১,৯০০
‡৫৯০	"	"	৫১২	দরিয়াপুর	চৈত্র	বঙ্কিমমেলা	...	১ দিন	১,০০০
†৫৯১	"	"	৫২০	মির্জাপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	২,৫০০
‡৫৯২	"	"	...	তুরমুট	বৈশাখ	চন্দনযাত্রা	সম্প্রতি	৫ দিন	২,৫০০
‡৫৯৩	"	"	...	দারুয়া	...	মহরম	...	১ দিন	১০,০০০-১৫,০০০
*৫৯৪	"	"	...	"	আষাঢ়	রথযাত্রা	...		...
*৫৯৫	"	"	...	জনপুট	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	প্রাচীন	...	...
‡৫৯৬	"	"	...	"	মাঘ	মকর স্নান	...	...	...
‡৫৯৭	"	"	...	বাহিরী	বৈশাখ	চন্দনযাত্রা	১৫০৬ শকাব্দ	১ দিন	৪,০০০-৫,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
※৫৯৮	মেদিনীপুর	কাঁথি	...	বাহিরী	আষাঢ়	রথযাত্রা	"	৯ দিন	৪,০০০-৫,০০০
※৫৯৯	"	"	...	"	শ্রাবণ	ঝুলনযাত্রা	"	৫ দিন	৫,০০০-৭,০০০
※৬০০	"	"	...	"	কার্তিক	রাসযাত্রা	"	১২ দিন	৪,০০০-৫,০০০
※৬০১	"	"	...	"	পৌষ	মকর স্নান	"	১ দিন	৪,০০০-৫,০০০
※৬০২	"	"	...	"	মাঘ	কৃষিপ্রদর্শনী মেলা	"	১২ দিন	৪,০০০-৫,০০০
※৬০৩	"	"	...	"	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	"	১২ দিন	৪,০০০-৫,০০০
※৬০৪	"	"	...	"	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	"	৫ দিন	৪,০০০-৫,০০০
*৬০৫	"	"	...	জুনপুর	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	..	১ দিন	১,০০০
*৬০৬	"	"	...	বিধুবনী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	১,৬০০
*৬০৭	"	"	...	আমরুই	কার্তিক	কালীপূজা	...	৪ দিন	৫,০০০
※৬০৮	"	খেজুরী	১৪	জাহানাবাদ	বৈশাখ	শীতলাপূজা	২০০ বৎসর	১ দিন	..
*৬০৯	"	"	১৩	"	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	২০০ বৎসর	১ দিন	৮,০০০-৯,০০০
※৬১০	"	"	২০	দেখালি	আষাঢ়	রথযাত্রা	সম্প্রতি	১ দিন	৫০০
※৬১১	"	"	"	"	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৪০ বৎসর	১ দিন	৫০০
※৬১২	"	"	"	"	চৈত্র	চড়ক	৪০ বৎসর	১ দিন	৫০০
※৬১৩	"	"	২৭	দেরখা চক	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১৫০ বৎসর	২ দিন	৩,০০০
※৬১৪	"	"	২৮	পানখাই	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	২০০ বৎসর	...	৫,০০০
※৬১৫	"	"	৩৩	চৌদ্দচূলী	মাঘ	বঙ্কিম স্মৃতি মেলা	১৩৪২ বঙ্গাব্দ	৭ দিন	৩,০০০
※৬১৬	"	"	৩৯	কুঞ্জপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	৪০০-৫০০
※৬১৭	"	"	"	"	কার্তিক	রাসযাত্রা	...	৫ দিন	৪০০-৫০০

‡৬১৮	মেদিনীপুর	খেজুরী	৩৯	কুঞ্জপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	১ দিন	৪০০-৫০০
‡৬১৯	„	„	৬৫	ফুলবাড়ি	ফাল্গুন	শীতলাপূজা	শতাধিক বৎসর	৫ দিন	...
*৬২০	„	„	৮৫	জনকা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	সম্প্রতি	৪ দিন	[illegible],০০০
†৬২১	„	„	৯০	বড়কাশাফলিয়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	২,০০০
†৬২২	„	„	৯৫	লক্ষ্মণ চক	পৌষ	গান্ধীমেলা	...	৩ দিন	৫০০
†৬২৩	„	„	১১৬	মেইদিনগর	পৌষ	ভীমেশ্বরী মেলা	...	১ দিন	৩,০০০
†৬২৪	„	„	১২৩	কৃষ্ণনগর	বৈশাখ	কালীপূজা	...	৭ দিন	২,৫০০
†৬২৫	„	„	১২৮	জোড়ারনগর	পৌষ	নেতাজীর জন্মোৎসব	...	৭ দিন	২,০০০
†৬২৬	„	„	১৩৪	ঠাকুরনগর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	৩ দিন	২,০০০
‡৬২৭	„	„	১৩৮	টিকাশী	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	প্রাচীন	১ দিন	৩,০০০
‡৬২৮	„	„	„	„	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	৩,০০০
*৬২৯	„	ভগবানপুর	২৮	গুড়গ্রাম	কার্তিক	রাসযাত্রা	৩০-৩২ বৎসর	৫ দিন	৫,০০০
*৬৩০	„	„	১১২	পূর্ব মাস্তড়িয়া	চৈত্র-বৈশাখ	গাজন	৩০ বৎসর	৮ দিন	১২,০০০-১৩,০০০
*৬৩১	„	„	১২৫	ভীমেশ্বরী	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	প্রাচীন	২ দিন	৬,০০০
‡৬৩২	„	„	১৩১	বাহাদুরপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	প্রাচীন	২ দিন	৪,০০০
‡৬৩৩	„	„	১৪৬	কলাবেড়িয়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	সম্প্রতি	৪ দিন	১,০০০
‡৬৩৪	„	„	২১৭	পূর্ব রাধাপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	প্রাচীন	১ দিন	৫০০-৬০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
*৬৩৫	মেদিনীপুর	ভগবানপুর	২২৯	সাতুল্যা চক	মাঘ	কালীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	...
*৬৩৬	"	"	২৪৫	এক্তারপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	৮০ বৎসর	৭ দিন	১০,০০০-১২,০০০
*৬৩৭	"	"	২৬১	খাজোদাপুর	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	...	৩ দিন	৫,০০০
*৬৩৮	"	"	২৯৯	অর্জ্জুননগর	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	২০০ বৎসর	৪ দিন	১,৫০০
*৬৩৯	"	"	৩১৬	হাটুরিয়া	মাঘ	ভীম একাদশী	...	...	..
*৬৪০	"	"	৩১৯	অনলবেড়ে	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১০০ বৎসর	৪ দিন	৭,০০০
*৬৪১	"	"	"	"	মাঘ	মকরপূজা	১০০ বৎসর	৪ দিন	৭,০০০
*৬৪২	"	"	"	"	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	১০০ বৎসর	৪ দিন	৭,০০০
*৬৪৩	"	"	"	"	চৈত্র	শিবপূজা	১০০ বৎসর	৫ দিন	৭,০০০
*৬৪৪	"	"	৩২১	কোটদলবাড়	মাঘ	ভীম একাদশী	...	...	...
*৬৪৫	"	"	৩৪১	উত্তর বরোজ	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	শতাধিক বৎসর	১ দিন	২,০০০
*৬৪৬	"	"	"	"	পৌষ	বিজয়চণ্ডীপূজা	১০০ বৎসর	১ দিন	...
*৬৪৭	"	"	...	শিববাজার	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	১,০০০
*৬৪৮	"	পটাশপুর	৯	মধুপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	শতাধিক বৎসর	১ দিন	৭০০-৮০০
*৬৪৯	"	"	"	"	মাঘ	মাঘী পূর্ণিমা	শতাধিক বৎসর	১ দিন	৭০০-৮০০
*৬৫০	"	"	১১	নৈপুর	বৈশাখ	গাজন	৩০০ বৎসর	১ মাস	২,০০০
*৬৫১	"	"	"	"	আষাঢ়	রথযাত্রা	৩০০ বৎসর	৭ দিন	২,০০০
*৬৫২	"	"	"	"	মাঘ	ভীম একাদশী	৩০০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
*৬৫৩	"	"	২৬	গোকুলপুর	পৌষ-মাঘ	গোকুলানন্দের তিরোধান	৪০০ বৎসর	৫ দিন	লক্ষাধিক

*৬৫৪	মেদিনীপুর	পটাশপুর	৩১	টেপরপাড়া	আষাঢ়	রথযাত্রা	৫০০ বৎসর	৮ দিন	৮,০০০
‡৬৫৫	”	”	”	”	কার্তিক	রাসযাত্রা	৫০০ বৎসর	৬ দিন	৮,০০০
*৬৫৬	”	”	৩৬	গোপালপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৫০ বৎসর	৩ দিন	৫,০০০
‡৬৫৭	”	”	৫৮	চাঁদপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	প্রাচীন	২ দিন	২,০০০
‡৬৫৮	”	”	৬৩	পদিমা	বৈশাখ	নববর্ষ	২৫-৩০ বৎসর	১৫ দিন	১,০০০
‡৬৫৯	”	”	৭১	মুস্তকাপুর	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	৫ বৎসর	৮ দিন	২,০০০
‡৬৬০	”	”	১০৩	চন্দনপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	২০ বৎসর	২ দিন	৬০০-৭০০
‡৬৬১	”	”	১০৪	পচেট	কার্তিক	রাসযাত্রা	৫০০ বৎসর	১২ দিন	১,০০,০০০
‡৬৬২	”	”	১০৯	পুরুষোত্তমপুর	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	সম্প্রতি	৭ দিন	১,৫০০
‡৬৬৩	”	”	১১৬	বাগমারী	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	১৫০ বৎসর	৮ দিন	১,৫০০
‡৬৬৪	”	”	১১৮	শ্রীরামপুর	পৌষ	বাসুলীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	৩,০০০-৪,০০০
‡৬৬৫	”	”	১৩৪	অমর্ষি কসবা	বৈশাখ	মখদুম পীরের উরস	…	৪ দিন	২৫,০০০-৩০,০০০
+৬৬৬	”	”	”	”	পৌষ	চন্দ্রনীল	…	১৫ দিন	৮,০০০
‡৬৬৭	”	”	২২৩	টানিয়াবিলা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	…	৭ দিন	১,০০০
‡৬৬৮	”	”	”	”	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	শতাধিক বৎসর	২ দিন	১,০০০
‡৬৬৯	”	”	২৫২	ভৈরবদাড়ী	মাঘ-ফাল্গুন	সত্যনারায়ণপূজা	প্রাচীন	১ দিন	১,০০০
‡৬৭০	”	”	২৮৩	ইচ্ছাবাড়ী	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	প্রাচীন	৩ দিন	৩,০০০
‡৬৭১	”	”	”	”	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	প্রাচীন	২ দিন	৩,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

+ কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
†৬৭২	মেদিনীপুর	পটাশপুর	...	পাঁচেলগড়	কার্তিক	রাসপূর্ণিমা	...	৮ দিন	৬,০০০
†৬৭৩	„	„	...	তুলসীচারা	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	...	২ দিন	১,৫০০
†৬৭৪	„	রামনগর	১২	দামোদরপুর	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	...	২ দিন	১,৮০০
†৬৭৫	„	„	৩৪	অর্জুনী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	১,০০০
†৬৭৬	„	„	৬২	মঙ্গলপুর	কার্তিক	কালিপূজা	...	৩ দিন	১,০০০
†৬৭৭	„	„	৭০	বাসুদেবপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	১,৯০০
‡৬৭৮	„	„	১২৮	দেপাল শাসন বাড়	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	শতাধিক বৎসর	৩ দিন	২,০০০-৩,০০০
†৬৭৯	„	„	১৩০	দেপাল	আশ্বিন	„	„	৪ দিন	১,০০০
‡৬৮০	„	„	১৪০	সোনাকনিয়া	চৈত্র	চড়ক	৩০০ বৎসর	১ দিন	৫০০
‡৬৮১	„	„	১৯৭	করোঞ্জি	বৈশাখ	গাজন	প্রাচীন	১ দিন	৩,০০০-৪,০০০
‡৬৮২	„	„	২০২	বাগপুরা	বৈশাখ	অক্ষয় তৃতীয়া	৫০ বৎসর	৫ দিন	১,০০০
‡৬৮৩	„	„	„	„	আষাঢ়	রথযাত্রা	৩০০ বৎসর	১ দিন	৫০০
‡৬৮৪	„	„	২১৩	দীঘা	পৌষ	পুণ্যস্নান	১০-১২ বৎসর	...	৭০,০০০-৮০,০০০
‡৬৮৫	„	„	২৩৪	বোম্বোড়া	পৌষ	মহোৎসব	১৩০১ বঙ্গাব্দ	৫ দিন	৪,০০০
†৬৮৬	„	„	২৩৫	ট্যাংরামারী	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	...	৩ দিন	৩,০০০
‡৬৮৭	„	„	২৪২	জলধা	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	শতাধিক বৎসর	১ দিন	১৪,০০০-১৫,০০০
†৬৮৮	„	„	২৬৫	কালিন্দী	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	...	৪ দিন	১,০০০
*৬৮৯	„	„	..	বালিসাই	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	..
*৬৯০	„	„	..	„	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	..

‡৬৯১	মেদিনীপুর	রামনগর	...	বালিসাই	পৌষ	মহোৎসব	শতাধিক বৎসর	১ দিন	৩,০০ -৪,০০০
+৬৯২	„	„	...	মীরগোদাগঞ্জ	কার্তিক	কালীপূজা	...	৭ দিন	৩,০০০
+৬৯৩	„	„	...	ট্যাংরাহাট	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	১,০০০
+৬৯৪	„	„	...	মীরগোদা	কার্তিক	কালীপূজা	...	৪ দিন	৪,৭০০
+৬৯৫	„	„	...	মাসাড়িয়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	১,০০০
+৬৯৬	„	„	...	বেলবনী	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	৪ দিন	৩,০০০
+৬৯৭	„	এগরা	৩৯	কুদি	চৈত্র	চড়ক	...	৭-৮ দিন	৮,০০০-১০,০০০
‡৬৯৮	„	„	৫৪	কল্যাণপুর	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	১ দিন	৫০০
‡৬৯৯	„	„	৬৬	গহর্বা	আষাঢ়	রথযাত্রা	প্রাচীন	৮ দিন	৫০০-৬০০
+৭০০	„	„	৭০	বাসুদেবপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১০-১২ দিন	১৫,০০০-১৬০০০
‡৭০১	„	„	১০৭	মানিকাবিন্দি	বৈশাখ	গোষ্ঠপূজা	সম্প্রতি	৩ দিন	৫০০
+৭০২	„	„	১২১	বরদা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	১ দিন	৩,০০০
‡৭০৩	„	„	১৬৬	সাহাড়দা	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	৭০ বৎসর	৪ দিন	৭,০০০
‡৭০৪	„	„	১৯১	দুবদা	কার্তিক	রাসযাত্রা	শতাধিক বৎসর	৭ দিন	৫,০০০
‡৭০৫	„	„	„	„	চৈত্র	রাসযাত্রা	শতাধিক বৎসর	৭ দিন	৫,০০০
+৭০৬	„	„	২০৩	পানিপারুল	চৈত্র	গাজন	...	৫ দিন	৫,০০০
‡৭০৭	„	„	২০৯	দক্ষিণ চৌমুখ	পৌষ	কালীপূজা	প্রাচীন	১০-১২ দিন	১,৫০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

+ কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
❁৭০৮	মেদিনীপুর	এগরা	২৪৪	বাধুয়াড়ী	জ্যৈষ্ঠ	কালীপূজা	শতাধিক বৎসর	১ দিন	১,০০০
❁৭০৯	"	"	"	"	...	মহরম	...	১ দিন	৬০০-৭০০
❁৭১০	"	"	...	এগরা	আষাঢ়	রথযাত্রা	প্রাচীন	...	...
*৭১১	"	"	...	"	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	৮ দিন	২০,০০০
†৭১২	"	"	...	"	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	...	৭-৮ দিন	৮,০০০-১০,০০০
†৭১৩	"	"	...	বালিঘাই	জ্যৈষ্ঠ	বারোয়ারীপূজা	...	৭-৮ দিন	৮,০০০-১০,০০০
†৭১৪	"	"	...	রাজসল	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	৫,০০০-৬,০০০
†৭১৫	"	"	...	হটনগর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	৫ দিন	১০,০০০
†৭১৬	"	"	...	আলমগেরিয়া	শ্রাবণ	জন্মাষ্টমী	...	১০-১২ দিন	১৫,০০০-১৬,০০০
†৭১৭	"	"	...	ভবানীচক	চৈত্র	বারোয়ারীপূজা	...	৩ দিন	৪,০০০-৫,০০০
†৭১৮	"	তমলুক	১১	বারাসতী বা হলদিচক	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	২ দিন	১,০০০
❁৭১৯	"	"	১৪	হোগলাবেড়্যা	আশ্বিন	শীতলাপূজা	প্রাচীন	১ দিন	...
*৭২০	"	"	১৬	বল্লুক	আষাঢ়	রথযাত্রা	প্রাচীন	৭ দিন	৩,০০০
❁৭২১	"	"	১৬	"	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	৪ দিন	৩,০০০
†৭২২	"	"	"	"	কার্তিক	কালীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	৩,০০০
❁৭২৩	"	"	"	"	কার্তিক	রাসযাত্রা	প্রাচীন	৪ দিন	৩,০০০
❁৭২৪	"		"	"	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	৩,০০০
†৭২৫	"	"	২১	সাহারা	মাঘ	ভীম একাদশী	...	২ দিন	৫০০
†৭২৬	"	"	২২	বাঁশদা	ফাল্গুন	মাঘীপূর্ণিমা	...	৩ দিন	৪,০০০-৫,০০০
❁৭২৭	"	"	৩৫	হুড়িনান	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	৫০০

‡৭২৮	মেদিনীপুর	তমলুক	৪৩	কাঁকট্যা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	সম্প্রতি	৪ দিন	৭০০-৮০০
‡৭২৯	”	”	৪৫	সাবল আড়া	কার্তিক	কালীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	১,০০০
‡৭৩০	”	”	”	”	মাঘ	বিন্ধ্যবাসিনীপূজা	প্রাচীন	৩ দিন	১,০০০
‡৭৩১	”	”	”	”	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	১ দিন	১,০০০
‡৭৩২	”	”	৫৬	টুল্যা	ফাল্গুন	শীতলাপূজা	প্রাচীন	১ দিন	৮,০০০-১০,০০০
†৭৩৩	”	”	৬১	ছায়াদীঘি	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	…	২ দিন	২,০০০
†৭৩৪	”	”	৭২	কাকুড়দা	চৈত্র	বারুণী	…	৪ দিন	১,০০০
‡৭৩৫	”	”	৭৪	শিউরী	ফাল্গুন	রথযাত্রা	৩৫ বৎসর	৭ দিন	২,০০০
†৭৩৬	”	”	৮৩	নারায়নদারী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	…	৪ দিন	১,০০০
‡৭৩৭	”	”	১২২	সালিকা ধনি চক	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	৫০ বৎসর	২ দিন	৩,০০০
‡৭৩৮	”	”	১৩২	কামারবাড়	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৬ বৎসর	৪ দিন	৫,০০০
*৭৩৯	”	”	১৫২	যোগীগোপ	কার্তিক	রাসযাত্রা	৫০ বৎসর	২ দিন	…
‡৭৪০	”	”	১৬৩	কিসমত পুতপুরা	মাঘ	কালীপূজা	শতাধিক বৎসর	৩ দিন	২,০০০
‡৭৪১	”	”	২৭০	নিমতোড়ী	বৈশাখ	গাজন	প্রাচীন	৯ দিন	১,০০০
*৭৪২	”	”	২৭৪	কুলবেড়্যা	মাঘ	ভীম একাদশী	শতাধিক বৎসর	৭ দিন	৮,০০০-১০,০০০
†৭৪৩	”	”	…	চিমুটিয়া	চৈত্র	নীলেরপূজা	…	১ দিন	২,০০০
†৭৪৪	”	”	…	ডিহি গুমাই	চৈত্র	চৈত্রসংক্রান্তি	…	২ দিন	২,১০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
†৭৪৫	মেদিনীপুর	তমলুক	...	দেহীমারি	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	৫০০
†৭৪৬	"	"	...	রামতারকহাট	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	২ দিন	২,০০০
†৭৪৭	"	"	...	ভালুকাহাট	আশ্বিন-কার্তিক	কার্তিক-একাদশী	...	২ দিন	২,০০০
†৭৪৮	"	"	...	দেকুয়ারীহাট	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	৫,০০০
†৭৪৯	"	"	...	রাধামণি বাজার	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	৫,০০০
†৭৫০	"	"	...	কেলোমল	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	২,০০০
†৭৫১	"	"	...	ধনিচক্	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	২ দিন	২,০০০
†৭৫২	"	"	...	নীলহানপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	২ দিন	৫০০
‡৭৫৩	"	"	...	খাটপুকুর	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	...	...	..
†৭৫৪	"	পাঁশকুড়া	২৯	জশড়া	আশ্বিন	ধর্মসংক্রান্তি	...	৪ দিন	২,৭০০
†৭৫৫	"	"	"	"	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	৩ দিন	১,৬০০
‡৭৫৬	"	"	৪০	ক্ষিয়াখালি	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	৩৫ বৎসর	৮ দিন	৫,০০০
†৭৫৭	"	"	৪১	বৃন্দাবনচক	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	৩,০০০
‡৭৫৮	"	"	১২২	রাতুলিয়া দলবাড়	বৈশাখ	গাজন	৯০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡৭৫৯	"	"	১৩৯	ঘোষপুর	কার্তিক	রাসযাত্রা	শতাধিক বৎসর	৪ দিন	৫,০০০
‡৭৬০	"	"	১৬৮	কুণ্ডরপুর	চৈত্র	চড়ক	শতাধিক বৎসর	৮ দিন	৫,০০০
*৭৬১	"	"	১৮১	বেগুনবাড়ী	জ্যৈষ্ঠ	কালীপূজা	২০০ বৎসর	১০ দিন	১০,০০০
‡৭৬২	"	"	১৯৬	মাগুরী জগন্নাথচক	চৈত্র	চড়ক	১০০ বৎসর	৩ দিন	৩,০০০-৪,০০০
‡৭৬৩	"	"	২০৩	কেশিয়াড়ী ভুঞ্যাবাড়	বৈশাখ	গাজন	সম্প্রতি	৭ দিন	১০,০০০

‡৭৬৪	মেদিনীপুর	পাশকুড়া	২৭০	জশাড়	বৈশাখ	গাজন	প্রাচীন	১ দিন	২,০০০-৩,০০০
‡৭৬৫	„	„	„	„	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	৪ দিন	...
‡৭৬৬	„	„	„	„	কার্তিক	রাসযাত্রা	প্রাচীন	৪ দিন	...
‡৭৬৭	„	„	„	„	মাঘ	সরস্বতীপূজা	প্রাচীন	৪ দিন	...
*৭৬৮	„	„	৩০০	দেউলিয়া	ভাদ্র	ধর্মরাজপূজা	প্রাচীন	৭ দিন	১০,০০০-১২,০০০
‡৭৬৯	„	-	৩০৯	ভোগপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	সম্প্রতি	২ দিন	৩,০০০
*৭৭০	„	„	৩৩৩	রঘুনাথবাড়ী	আশ্বিন	রঘুনাথজীউর রথযাত্রা	২৫০ বৎসর	৭ দিন	২৫,০০০-৩০,০০০
‡৭৭১	„	„	৩৬০	পূব চিল্কা	বৈশাখ	গাজন	৯০ বৎসর	৭ দিন	২,০০০-৩,০০০
‡৭৭২	„	ময়না	১৬৯	শ্রীকণ্ঠা	চৈত্র	গাজন	৬০ বৎসর	৮ দিন	২,০০০-৩,০০০
+৭৭৩	„	„	১৭৭	গোকুলনগর	চৈত্র	চড়ক	...	৩ দিন	৪,০০০
‡৭৭৪	„	„	১৮৫	তিলখোজা	বৈশাখ	গাজন	শতাধিক বৎসর	৭ দিন	১,০০০
*৭৭৫	„	„	১৯৬	জায়গীর চক	মাঘ	রথযাত্রা	৭৫ বৎসর	২ দিন	২,০০০
+৭৭৬	„	„	২০৭	গড় ময়না	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	১ দিন	৪,০০০
‡৭৭৭	„	„	২০৮	গড় সাফাৎ	কার্তিক	রাসযাত্রা	প্রাচীন	৪ দিন	১,০০০
+৭৭৮	„	„	২১০	পূর্ব দক্ষিণ ময়না	মাঘ	কালীপূজা	...	৮ দিন	৩,০০০
+৭৭৯	„	„	২১২	আনন্দপুর	ফাল্গুন	পঞ্চম দোল	...	১ দিন	২,০০০
‡৭৮০	„	„	২২৪	কিয়ারাণা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	৪ দিন	২,০০০
‡৭৮১	„	„	„	„	কার্তিক	রাসযাত্রা	প্রাচীন	১৫ দিন	২,০০০
‡৭৮২	„	„	২২৫	গোড়িনা	মাঘ	রাসযাত্রা	২০০ বৎসর	৭ দিন	২,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
+ কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
†৭৮৩	মেদিনীপুর	ময়না	২৩৫	ইজমালি চক	মাঘ	ভীম একাদশী	...	৫ দিন	১,৫০০
‡৭৮৪	”	”	২৩৬	হামিরুদ্দিনচক	ভাদ্র	ধর্মরাজপূজা	প্রাচীন	১ দিন	...
‡৭৮৫	”	মহিষাদল	৩৮	কামারদা	মাঘ	মাকরী সপ্তমী	১২ বৎসর	৪ দিন	৫০০-৬০০
†৭৮৬	”	”	৬১	কাকি	মাঘ	মাঘী পূর্ণিমা	...	২ দিন	৫,০০০
‡৭৮৭	”	”	১১৭	নাইকুন্তি	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	প্রাচীন	২ দিন	৭০০-৮০০
‡৭৮৮	”	”	১৪২	এক্তারপুর	২৫শে ফেব্রুয়ারী	গান্ধীমেলা	২৫ বৎসর	৫ দিন	১,৫০০-১,৬০০
†৭৮৯	”	”	১৫২	রামবাগ	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	১,০০০
†৭৯০	”	”	”	”	আশ্বিন	রথযাত্রা	...	১ দিন	১,৫০০
*৭৯১	”	”	...	মহিষাদল	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১৫ দিন	১০০০,০০০
†৭৯২	”	”	...	কাদামারা	মাঘ	মাঘী পূর্ণিমা		২ দিন	২,০০০
†৭৯৩	”	নন্দীগ্রাম	৫৮	বরোজ	ফাল্গুন	মধু পূর্ণিমা	...	২ দিন	১,৭০০
‡৭৯৪	”	”	৬১	বামুন আড়া	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	২ দিন	১,০০০
*৭৯৫	”	”	”	”	চৈত্র	শীতলাপূজা	১৩৩৭ বঙ্গাব্দ	১৫ দিন	৩০,০০০-৪০,০০০
†৭৯৬	”	”	৭৫	স্থবদী	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	৩,০০০
‡৭৯৭	”	”	৭৭	শ্রীকৃষ্ণপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	সম্প্রতি	৪ দিন	৫০০
†৭৯৮	”	”	৮০	আমদাবাদ	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	..	১ দিন	৫০০
†৭৯৯	”	”	”	”	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	১,০০০
†৮০০	”	”	১০২	হবিচক্	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	৮ দিন	২৫,০০০
†৮০১	”	”	১১১	জলপাই	চৈত্র	বারুণীস্নান	.	১ দিন	১২,০০০
‡৮০২	”	”	১২৫	আমড়াতল্যা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	৪ দিন	...
†৮০৩	”	”	১৩০	রেয়াপাড়া	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	৭ দিন	২০,০০০

†৮০৪	মেদিনীপুর	নন্দীগ্রাম	১৩০	রেয়াপাড়া	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	১,৫০০
‡৮০৫	"	"	১৩১	খোদামবাড়ী	মাঘ	রাসযাত্রা	১০-১২ বৎসর	...	২,০০০
‡৮০৬	"	"	১৩৩	চান্দভুঞ্যা	আষাঢ়	শীতলাপূজা	দুই শতাধিক বৎসর	৩ দিন	...
‡৮০৭	"	"	"	"	কার্তিক	কালীপূজা	দুই শতাধিক বৎসর	৩ দিন	...
†৮০৮	"	"	১৩৫	রুক্মিণীপুর	ফাল্গুন	মধু পূর্ণিমা	...	২ দিন	৫,০০০
‡৮০৯	"	"	১৪০	আমদাবাদ	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	৬০-৭০ বৎসর	...	...
‡৮১০	"	"	"	"	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	৬০-৭০ বৎসর	...	...
†৮১১	"	"	১৬৪	বাশুলীচক	আশ্বিন	বাশুলী পূজা	...	৪ দিন	১২,০০০
†৮১২	"	"	১৭০	ভেকুট্যা	বৈশাখ	চড়ক	...	১ দিন	৩,০০০
†৮১৩	"	"	১৮০	নন্দীগ্রাম	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	...	১ দিন	২,৫০০
†৮১৪	"	"	১৮১	পুরুষোত্তমপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	৭,০০০
†৮১৫	"	"	১৮৫	মহম্মদপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	৮ দিন	৫,০০০
‡৮১৬	"	"	২২০	কমলপুর		পীরের উরস্	প্রাচীন	৪ দিন	২,০০০
†৮১৭	"	"	২২৭	শিমূলকুণ্ডা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা		৪ দিন	[illegible],০০০
†৮১৮	"	"	"	"	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	১ দিন	১৬,০০০
†৮১৯	"	"	...	আমগাছিয়া	চৈত্র	চড়ক	...	২ দিন	৬,০০০
†৮২০	"	"	...	সরুশাবাদ	...	মহরম	...	১ দিন	১২,০০০
†৮২১	"	"	...	বামারসা	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	...	৪ দিন	৩,৫০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
†৮২২	মেদিনীপুর	নন্দীগ্রাম	...	টেরাপাখিয়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৭ দিন	৬,০০০
†৮২৩	”	”	...	অশ্বত্থতলা	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	...	৬ দিন	৮,০০০
†৮২৪	”	”	...	বাজাল	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	২০,০০০
†৮২৫	”	”	...	কুলুম	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	২ দিন	১,০০০
‡৮২৬	”	সুতাহাটা	৩৮	বরদা	বৈশাখ	শীতলাপূজা	প্রাচীন	৭ দিন	২,০০০-৩,০০০
‡৮২৭	”	”	”	”	শ্রাবণ	মনসাপূজা	প্রাচীন	৭ দিন	২,০০০-৩,০০০
‡৮২৮	”	”	”	”	আশ্বিন	লক্ষ্মীপূজা	প্রাচীন	৭ দিন	২,০০০-৩,০০০
†৮২৯	”	”	৬০	বড়বাড়ী	চৈত্র	গঙ্গেশ্বর মেলা	...	৬ দিন	৪,০০০
*৮৩০	”	”	৬২	বাড় বাসুদেবপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	সম্প্রতি	২ দিন	১,০০০
‡৮৩১	”	”	৭৭	গুয়াবেড়িয়া	পৌষ	অন্নপূর্ণাপূজা	৬০ বৎসর	১৫ দিন	১০,০০০
†৮৩২	”	”	৮৪	বাহুল্যা	বৈশাখ	গাজন	..	৫ দিন	১,০০০
‡৮৩৩	”	”	৯৪	কিসমত শিবরামনগর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	সম্প্রতি	১ দিন	১,০০০
‡৮৩৪	”	”	১০৩	শ্রীকৃষ্ণপুর	ফাল্গুন	রথযাত্রা	প্রাচীন	৮ দিন	১,০০০
‡৮৩৫	”	ঘাটাল	১৭	ইড়পালা	আষাঢ়	রথযাত্রা	৪০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡৮৩৬	”	”	৬৯	বরদা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	১৫,০০০-২০,০০০
‡৮৩৭	”	”	”	”	পৌষ	বিশালাক্ষীপূজা	৩০০ বৎসর	১ দিন	১৫,০০০-২০,০০০
‡৮৩৮	”	”	”	”	পৌষ	মকরস্নান	...	১ দিন	১৫,০০০-২০,০০০
‡৮৩৯	”	”	১২৩	কণকপুর	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	শীতলাপূজা	প্রাচীন	১ দিন	১,০০০
†৮৪০	”	”	...	ঘাটাল টাউন	বৈশাখ	শীতলাপূজা	...	১ দিন	১,০০০
†৮৪১	”	”	...	”	জ্যৈষ্ঠ	শীতলাপূজা	...	২ দিন	১,০০০
†৮৪২	”	দাসপুর	১৭	নিজ নাড়াজোল	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	৮ দিন	৩,০০০

†৮৪৩	মেদিনীপুর	দাসপুর	১৯	রামদাসপুর	চৈত্র	রামনবমী	...	৩ দিন	৩,৫০০
†৮৪৪	"	"	২৫	রাজনগর	মাঘ	ভীম একাদশী	...	৩ দিন	৫,০০০
‡৮৪৫	"	"	২৭	যদুপুর	ভাদ্র	কালীয়দমন	সম্প্রতি	৩ দিন	২,০০০-৩,০০০
†৮৪৬	"	"	৫৫	লাওদা	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	...	২ দিন	২,২০০
†৮৪৭	"	"	৫৯	পুরুষোত্তমপুর	ভাদ্র	ধর্ম সংক্রান্তি	...	১ দিন	১,৫০০
‡৮৪৮	"	"	৬৩	বাসুদেবপুর	বৈশাখ	রথযাত্রা	৩০০ বৎসর	২ দিন	১,০০০
‡৮৪৯	"	"	"	"	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৩০০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡৮৫০	"	"	১৩৫	ফতেপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	১০ বৎসর	৭ দিন	১,০৫০
‡৮৫১	"	"	১৪৬	চক বোয়ালিয়া	ফাল্গুন	কালীপূজা	১৩২৯ বঙ্গাব্দ	৮ দিন	...
†৮৫২	"	"	১৫৫	নবীন মন্নুয়া	চৈত্র	রামনবমী	...	৩ দিন	৩,৫০০
‡৮৫৩	"	"	১৫৯	জোত কেশব	কার্তিক	কালীপূজা	২০০ বৎসর	৭ দিন	২,০০০
‡৮৫৪	"	"	১৯৯	গোপালপুর	মাঘ	সরস্বতীপূজা	প্রাচীন	৬ দিন	১০,০০০
†৮৫৫	"	"	২০৩	কোটালপুর	মাঘ	সরস্বতীপূজা	...	৩ দিন	২,০০০
†৮৫৬	"	"	২০৫	খাঞ্জাপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	৩ দিন	৫,০০০
†৮৫৭	"	"	২২১	নৈহাটী	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	...	২ দিন	২,০০০
†৮৫৮	"	"	...	চেচুয়া	মাঘ	মাঘী পূর্ণিমা	...	৭ দিন	১,০০০
†৮৫৯	"	"	...	কিসমল	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	...	২ দিন	২,২০০
‡৮৬০	"	চন্দ্রকোণা	১৪	ঘোষা	আষাঢ়	মহোৎসব	...	৪ দিন	১,০০০
‡৮৬১	"	"	"	"	কার্তিক	কালীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	১,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
‡৮৬২	মেদিনীপুর	চন্দ্রকোণা	২৭	শ্রীনগর	মাঘ	রথযাত্রা	৩০০ বৎসর	২ দিন	১,০০০
‡৮৬৩	„	„	৫৫	ভৈরবপুর	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	...	৩ দিন	৫,০০০
†৮৬৪	„	„	১০৩	চন্দ্রকোণা	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	৮ দিন	২,৫০০
‡৮৬৫	„	„	১৩২	ধাইখণ্ড	ফাল্গুন	মহোৎসব	সম্প্রতি	৬ দিন	১,০০০
‡৮৬৬	„	„	১৩৭	পরমানন্দপুর	পৌষ	রঙ্কিনীপূজা	প্রাচীন	২ দিন	৫,০০০-৬,০০০
‡৮৬৭	„	„	১৫২	জাড়া	আষাঢ়	রথযাত্রা	৩৬ বৎসর	২ দিন	৫,০০০
†৮৬৮	„	„	„	„	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	৮ দিন	২,০০০
*৮৬৯	„	„	১৬৫	তাতারপুর	ফাল্গুন	বিশালাক্ষীপূজা	শতাধিক বৎসর	২ দিন	২,০০০-৩,০০০
‡৮৭০	„	„	১৮৪	ক্ষিরা	চৈত্র	গাজন	২০০ বৎসর	৩ দিন	...
‡৮৭১	„	„	১৮৯	কঙ্কাবতী	বৈশাখ	শীতলাপূজা	১০০ বৎসর	৬ দিন	...
†৮৭২	„	„	১৯৯	গোপালডাঙ্গা	বৈশাখ	পীরের উরস	...	৪ দিন	৫,২২০
‡৮৭৩	„	„	২০৮	বহরা	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	২০০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
‡৮৭৪	„	„	২১১	ভবানীপুর	জ্যৈষ্ঠ	ভবানীপূজা	...	...	...
‡৮৭৫	„	„	২১২	বাগপোতা	বৈশাখ	কালীপূজা	প্রাচীন	৩ দিন	১,০০০
‡৮৭৬	„	„	„	„	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	১ দিন	১,০০০
‡৮৭৭	„	„	২৩২	শ্রীরামপুর আটঘরা	জ্যৈষ্ঠ	কালীপূজা	প্রাচীন	৩ দিন	১,০০০
‡৮৭৮	„	„	২৬৬	গাংচা	জ্যৈষ্ঠ	কালীপূজা	শতাধিক বৎসর	৭ দিন	১,৫০০
‡৮৭৯	„	„	২৭৯	ডিঙ্গাল	মাঘ	মাঘী পূর্ণিমা	...	৮ দিন	২,৬০০
†৮৮০	„	„	„	„	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	৮ দিন	৬,০০০

*৮৮১	মেদিনীপুর	ঝাড়গ্রাম	৩৪০	শুগনীবাঁসা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২ শতাধিক বৎসর	১ দিন	২০০
†৮৮২	"	"	৩৯৬	পুরাতন ঝাড়গ্রাম	ভাদ্র	ইন্দ্রপরব	...	৯ দিন	২,০০০
†৮৮৩	"	"	"	"	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	৫০০
†৮৮৪	"	"	৪৭৩	চন্দ্রা	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৩০০
‡৮৮৫	"	"	৪৯৫	মেটিয়াল	পৌষ	পৌষ পার্বণ	২০০ বৎসর	১ দিন	...
†৮৮৬	"	"	৫৮৫	সড়িহা	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৩০০
‡৮৮৭	"	"	৬২৫	বল্লা	চৈত্র	চড়ক	৫০ বৎসর	৩ দিন	১,০০০
†৮৮৮	"	"	৮১১	চন্দ্রি	পৌষ	মকরস্নান	...	৪ দিন	৩০০
‡৮৮৯	"	"	"	"	চৈত্র	চড়ক	১৫০ বৎসর	৭ দিন	৬,০০০
†৮৯০	"	জাম্বনী	১১২	গিধনি	কার্তিক	কালীপূজা	...	৭ দিন	২,০০০
‡৮৯১	"	"	১৮৯	ডুবড়া	চৈত্র	গাজন	৫০ বৎসর	৭ দিন	৪০০-৫০০
†৮৯২	"	"	১৯৩	কেন্দুয়া	জ্যৈষ্ঠ	শিবপূজা	...	১ দিন	১,০০০
‡৮৯৩	"	"	২১০	বেলদা	চৈত্র	চড়ক	সম্প্রতি	২ দিন	২,৫০০
‡৮৯৪	"	"	২৬০	চিচ্‌ড়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২০০ বৎসর	৪ দিন	১,০০০
‡৮৯৫	"	"	"	"	...	উড়ার মেলা	...	...	...
‡৮৯৬	"	"	২৮৮	ছোট পিণ্ডরা	মাঘ	স্বর্গ বাউড়ীর মেলা	১০০ বৎসর	১ দিন	১,৫০০
‡৮৯৭	"	বিনপুর	২৭	কাঁকড়াঝোর	চৈত্র	শিবপূজা	৩৫ বৎসর	১ দিন	৭০০-৮০০
‡৮৯৮	"	"	৪৩	তামাজুরি	বৈশাখ	গাজন	৫০ বৎসর	১ দিন	৫০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
✽৮৯৯	মেদিনীপুর	বিনপুর	১১০	চাঁদাবিলা	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	১ দিন	৫০০
✚৯০০	"	"	১৩৬	বেলপাহাড়ী	ভাদ্র	ইন্দ্রপূজা	...	১ দিন	১,০০০
✽৯০১	"	"	১৭৩	ডুমুরিয়া	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	২ দিন	৫০০-৬০০
✚৯০২	"	"	১৯০	মুঁড়াশোল	ভাদ্র	ইন্দ্রদ্বাদশী	...	২ দিন	৩,০০০
✚৯০৩	"	"	৩০৫	শিলদা	ভাদ্র	ইন্দ্রপূজা	...	১ দিন	১,০০০
✽৯০৪	"	"	"	"	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	৫,০০০-৬,০০০
✽৯০৫	"	"	৩৬১	কোরকরা	আশ্বিন	লক্ষ্মীপূজা	সম্প্রতি	৩ দিন	৫০০-৬০০
✽৯০৬	"	"	"	"	কার্তিক	কালীপূজা	সম্প্রতি	৪ দিন	৫০০-৬০০
✽৯০৭	"	"	৫২৬	বিনপুর	পৌষ	পৌষ পার্বণ	১০০ বৎসর	১ মাস	৭০০-৮০০
✽৯০৮	"	"	৪৭০	নেপুরা	মাঘ	সরস্বতীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	৫০০
✚৯০৯	"	"	৫৭১	লাচ্ছিপুর	পৌষ	এখান মেলা	...	২ দিন	৫০০
✚৯১০	"	"	৬২৬	রামগড়	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	৫০০
✽৯১১	"	"	৬৯১	কাঁটাপাহাড়ি	মাঘ	ভীমরাজসিনীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	৬,০০০-৭,০০০
✽৯১২	"	"	৭০৮	ঘাগরা	মাঘ	ঘাগরাসিনীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	২০,০০০-২৫,০০০
✽৯১৩	"	"	৭৫৩	চিৎরাঙ্গা	আশ্বিন	মনসাপূজা	১৫০ বৎসর	১ দিন	৩,১০০
✽৯১৪	"	"	৭৯০	লালগড়	আষাঢ়	রথযাত্রা	শতাধিক বৎসর	৮ দিন	১০,০০০
✽৯১৫	"	"	৯৭০	দহিযুড়ি	আষাঢ়	রথযাত্রা	সম্প্রতি	২ দিন	১৪,০০০-১৫,০০০
✚৯১৬	"	"	"	"	ফাল্গুন	মহোৎসব	সম্প্রতি	৩ দিন	১৪,০০০-১৫,০০০

‡৯১৭	মেদিনীপুর	গোপীবল্লভপুর	২৩	মৌভাণ্ডার	কার্তিক	বাঁধনা পরব	প্রাচীন	২ দিন	৩,০০০
*৯১৮	”	”	১৮৪	বালিযাত	চৈত্র	বালিযাত উৎসব	প্রাচীন	১ দিন	১৫,০০০-২০,০০০
†৯১৯	”	”	১৮৬	চোরচিতা	চৈত্র	চড়ক	...	৪ দিন	১,৯০০
‡৯২০	”	”	৩৩৩	কানপুর	পৌষ-মাঘ	মকর স্নান	প্রাচীন	৫ দিন	১,০০০
‡৯২১	”	”	৩৬৭	আলমপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	প্রাচীন	১ দিন	২,০০০
†৯২২	”	”	৩৭০	মাল্লিকা	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	...	২ দিন	২,০০০
‡৯২৩	”	”	৩৯৪	গোপীবল্লভপুর	জ্যৈষ্ঠ	দণ্ড মহোৎসব	৩০০ বৎসর	১২ দিন	৬,০০০-৭,০০০
†৯২৪	”	”	”	”	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	১ দিন	৩,০০০
†৯২৫	”	”	৫৬৪	বেলাবেড়্যা	কার্তিক	রাসপূর্ণিমা	...	৩ দিন	৩,০০০
‡৯২৬	”	সাঁকরাইল	৬৬৬	ধানঘোরী	পৌষ	শিবপূজা	প্রাচীন	২ দিন	১,৪০০
†৯২৭	”	”	৭৫০	কাশীডাঙ্গা	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	৫,০০০
‡৯২৮	”	”	৮০১	পাথরকাটী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	শতাধিক বৎসর	১ দিন	১,০০০
†৯২৯	”	”	৯০৫	কুলটিকরি	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	৬০০
‡৯৩০	”	”	”	”	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	৫ দিন	১২,০০০
‡৯৩১	”	”	৯৩৩	রোহিণি	চৈত্র	চড়ক	২০০ বৎসর	৩ দিন	১০,০০০
†৯৩২	”	”	...	গড় রোহিণি	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	৩,২০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
†৯৩৩	মেদিনীপুর	সাঁকরাইল	...	পিতলকাঠি	আশ্বিন	জয়চণ্ডী পূজা	...	২ দিন	৩,০০০
‡৯৩৪	"	নয়াগ্রাম	৯৮৭	দেউলবাড়	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	প্রাচীন	২ দিন	১,০০০
‡৯৩৫	"	"	"	"	চৈত্র	বারুণী স্নান	প্রাচীন	২ দিন	১,০০০
‡৯৩৬	"	"	৯৮৮	রাঙ্গামাটিয়া	চৈত্র	চড়ক	...	...	৫০০
†৯৩৭	"	"	১১৫৫	সহস্রলিঙ্গ	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	১ দিন	২,০০০
*৯৩৮	"	"	১২৬৪	নয়াগ্রাম	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	সম্প্রতি	৪ দিন	৫,০০০
†৯৩৯	"	"	১২৬৫	বীরকাদা	পৌষ	কুমারশাহীব	...	৫ দিন	৫,০০০
†৯৪০	"	"	১২৯০	জামিরাপাল	মাঘ	মকর স্নান	...	৭ দিন	২,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

পরিশিষ্ট খ

চব্বিশপরগণার লোকসংস্কৃতি ও লোকোৎসব

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

বর্তমান চব্বিশপরগণা জেলা সংস্কৃতিগত ভাবে দুইটি প্রধান ভাবে বিভক্ত। ইহার একটি ভাগে রহিয়াছে নাগরিক সংস্কৃতি অপর ভাগে আরণ্য সংস্কৃতি। কলিকাতা মহানগরী এই জেলার কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া চব্বিশপরগণা জেলার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবন ইহার দ্বারা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত হইতে থাকে। কিন্তু তাহার পূর্ব হইতেই একদিক দিয়া কালীঘাট পীঠস্থান এবং অন্যদিক দিয়া ভাগীরথী নদীর আকর্ষণের ফলে একদিন উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিও ইহাতে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। কলিকাতা মহানগরী প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই বেহালা, বড়িশা প্রভৃতি স্থান ব্রাহ্মণ বসতির জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এবং তাহার মধ্যে শাস্ত্র চর্চার ধারা অক্ষুন্ন ছিল। বরং কলিকাতা নগরী শিল্প এবং বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিবার ফলে এই অঞ্চলের যাহারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের অনুসরণকারী ছিলেন তাহাদিগকে নূতন নাগরিক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নূতন পদ্ধতিতে জীবিকার সন্ধান করিতে হইয়াছে। তাহার ফলেই এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারা লুপ্ত হইয়া গিয়া আধুনিক নাগরিক সংস্কৃতির সকল প্রকার বৈশিষ্ট্যই তাহাতে প্রবেশ করিয়াছে।

চব্বিশপরগণা জেলার উত্তরাংশে প্রধানতঃ ভাগীরথীর পূর্ব তীর অবলম্বন করিয়া বৈদিক সভ্যতার একটি বিশেষ রূপ একদিন গড়িয়া উঠিয়াছিল, আজিও তাহার ধারা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে নাই—তাহা প্রধানতঃ ভাটপাড়াকে কেন্দ্র করিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ দ্বারাই সূচিত হইয়াছে এবং তাহা দ্বারাই পুষ্ট হইয়াছে। চব্বিশ-পরগণার বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের এই অঞ্চলের লোক—সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোন দানই নাই। নিজাম সমাজ এবং গোষ্ঠীর মধ্যেই ইহার সাংস্কৃতিক উপকরণের আদান-প্রদান হইয়াছে, বাহিরের সমাজের অঙ্গে ইহার যোগরক্ষার কোন প্রয়াস দেখা যায় নাই। বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের বাহিরে আর একটি ব্রাহ্মণ সমাজ এই অঞ্চলে যে সামাজিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজ। তাহাও যে এই অঞ্চলের সাধারণ জনসমাজের সঙ্গে কোন নিবিড় যোগ স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহা নহে। তবে বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ অন্যান্য সমাজ হইতে যতখানি বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজ তত বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে নাই। তাহার ফলে বহিরাগত আচার ইহার মধ্যে অনেকখানি আত্মসাৎ করাও সম্ভব হইয়াছিল। তাহার মধ্যে তান্ত্রিক আচার উল্লেখযোগ্য। তান্ত্রিক ধর্ম এই অঞ্চলে একদিন অত্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছিল। তান্ত্রিক আচারের পথেই হিন্দু সমাজের মধ্যে কিছু কিছু লৌকিক উপকরণ প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু চব্বিশপরগণা জেলার দক্ষিণাংশের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় অনেকখানি স্বতন্ত্র। ভাটপাড়া হইতে একদিকে বড়িশা, বেহালা এবং আর একদিকে হরিনাভি পর্যন্ত রাঢ়ীয় এবং বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ সাংস্কৃতিক জীবনের যে ধারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল, দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত তাহার কোন প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। সুন্দরবন অঞ্চলে মুসলমান ধর্ম প্রচারিত হইবার পর হইতে চব্বিশপরগণা জেলার দক্ষিণ অংশে মুসলমান সমাজের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। মুসলমান সমাজ হিন্দু সমাজের মত নিচ্ছিদ্র শাস্ত্রীয় ধারা অনুসরণ করিয়া না চলিবার জন্য ইহার মধ্যে জাতীয় জীবনের বহু লৌকিক উপকরণ গিয়া স্থান লাভ করিয়াছিল, কিংবা এই অঞ্চলে আদিম সমাজ জীবনের যে ধারা বহুকাল পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিয়াছিল, তাহার উপরই মুসলমান ধর্ম একটি অত্যন্ত ক্ষীণ আশ্বাস বিস্তার করিয়াছিল মাত্র। সেই জন্যই চব্বিশপরগণা জেলার সর্বাধিক সংখ্যক লৌকিক দেবদেবী এই অঞ্চলে আজও পূজা লাভ করিয়া থাকেন। এই অঞ্চলের সংখ্যা গরিষ্ঠ অধিবাসীরা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। ভাগীরথী

তীর অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রীয় হিন্দুধর্মের যে নিচ্ছিদ্র প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার বহির্ভাগেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের এই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া ইহা সাংস্কৃতিক বিষয়েও নিজস্ব ধারাটি অনুসরণ করিবার অনেকখানি সুযোগ পাইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট রূপ খুব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবার সুযোগ হয় নাই। এই অঞ্চলে যাহা হইয়াছে, তাহা একদিকে মুসলমান ধর্মের সঙ্গে এবং আর একদিকে লৌকিক ধর্মের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের একটি দুর্বল প্রয়াস মাত্র। হিন্দু এবং তান্ত্রিক সমাজও ইহাতে তাহাদের দূরাগত প্রভাবের ক্ষীণশক্তি প্রকাশ করিয়াছে।

সুন্দরবন অঞ্চলে যে সব ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেও জানিতেও জানিতে পারা যায় যে, এই অঞ্চল যতই দুর্গম ও ভয়াবহ হউক না কেন একদিন এখানেও একটি উচ্চতর সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, কালক্রমে তাহা লুপ্ত হইয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে এ কথাও মনে করা যাইতে পারে যে,একদিন চব্বিশ-পরগণার দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলেও ঘন জনবসতি ছিল এবং ধ্বংসাবশেষগুলির প্রকৃতি দেখিয়া এ কথাও মনে হয় যে, উচ্চহিন্দু সংস্কৃতিরই একটি ধারা ইহাতে একদিন প্রবাহিত ছিল। চব্বিশপরগণা জেলার সাংস্কৃতিক জীবনের দ্বিতীয় বিভাগটিকে আরণ্য সংস্কৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। ইংরাজি কালচার কথাটি ব্যাপক। ইহার মতে কেবল নাগরিক ও শিক্ষিত সমাজেরই যে সংস্কৃতি আছে তাহা নহে, মানুষ মাত্রেরই সংস্কৃতি আছে। সেই জন্য আদিম সংস্কৃতি বা প্রিমিটিভ কালচার বলিয়াও কথা আছে। আরণ্য সংস্কৃতি অর্থে আদিম সংস্কৃতি বলিয়া মনে হইলেও চব্বিশপরগণা জেলার আরণ্য সংস্কৃতি বলিতে আরও একটু বেশি কিছু বুঝিতে হইবে। চব্বিশপরগণার দক্ষিণে গঙ্গার মোহানায় পলিমাটি বিস্তারের ফলে যে নোনা মাটি মিশ্রিত বিস্তৃত ভূভাগ সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে তাহা এক নিবিড় অরণ্যে সমাকীর্ণ। কিন্তু এই অরণ্য যতই ভয়াবহ হউক, যতই হিংস্র এবং নরখাদক ব্যাঘ্র এবং কুম্ভীরের বাসভূমি হউক, তাহা প্রাচীনকাল হইতেই সেই অঞ্চলের অধিবাসিগণ নিজেদের জীবিকার অবলম্বন রূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। কঠিন এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া তাহাদের এক নিজস্ব জীবনাচরণ গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার সঙ্গে নাগরিক সংস্কৃতির কোনো সম্পর্কই নাই।

আজ ভাগীরথী নদী চব্বিশপরগণা জেলাকে উত্তরে হুগলী, হাওড়া এবং দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলা হইতে পৃথক করিয়াছে কিন্তু ভাগীরথী নদীর ধারা দীর্ঘকাল যে একখাতে বহিয়া গিয়া উক্ত তিনটি জেলার সাংস্কৃতিক জীবন হইতে ইহাকে পৃথক করিয়াছে তাহা নহে। বরং কোনো না কোনো সময়ে উক্ত তিনটি জেলা ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত ছিল। দক্ষিণ চব্বিশপরগণার রায়পুরের গঙ্গার অপর পারে হীরা-গঞ্জ। হীরাগঞ্জ হাওড়া জেলায় অবস্থিত। সেখানে একই জায়গায় মনসাদেবী ও শাহফরিদের থান রহিয়াছে। চব্বিশপরগণা হইতে বহুযাত্রী এইখানে পূজা দিতে আসে। হিন্দু মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতি চর্চার নিদর্শন চব্বিশ-পরগণা জেলায় বহুস্থানে মিলিবে এবং এখনকার গঙ্গা যে কাটিগঙ্গা হীরাগঞ্জ ও রায়পুরের ব্যবধান যে একদিন ছিলনা তাহা মনে করা যাইতে পারে। আবার ভাগীরথীর পূর্ব তীর যখন নিবিড় অরণ্যে সমাকীর্ণ ছিল তখন পশ্চিম তীরে হিন্দু সংস্কৃতির ধ্বজা স্থাপিত হইয়াছে। কেবলমাত্র তান্ত্রিক সাধকদিগের গূঢ় সাধন ভজনের সহায়ক বলিয়া পূর্ব তীরের নিবিড় অরণ্য অঞ্চলে কোনো কোনে স্থানে সাধনপীঠ স্থাপন হইত। কালীঘাটের পাশ দিয়া একদিন যখন মূল ভাগীরথীর ধারা প্রবাহিত হইত তখন গঙ্গার পশ্চিম বলিতে বর্তমান চব্বিশপরগণা জেলার এক বৃহৎ অংশ তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেই জন্য আদিগঙ্গার পশ্চিম তীর হইতেই বারাণসী সমতুল বলিয়া গণ্য করা হইত।

মুকুন্দরাম যখন চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচনা করেন তখন তিনি কালীঘাটকে মূল গঙ্গাপ্রবাহের তীরবর্তী এবং জনবহুল তীর্থক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—ধনপতি সদাগরের সমুদ্র যাত্রা সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন—

লঘুগতি সদাগর পাইল কালীঘাট
দুই কূলে জপতপ যাত্রিকের ঠাট।

কালীঘাটের এই ঐতিহ্য দীর্ঘকাল যাবত চব্বিশপরগণার জনমানসের ধর্মীয় প্রকৃতি গঠন করিতে সহায়ক হইয়াছে, তবে ইহার প্রভাব হিন্দু সমাজের উপরই ছিল, সুন্দরবন

অঞ্চলের অরণ্যচারী সমাজের মধ্যে তাহা বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। সুন্দরবন অঞ্চলের সমাজ অরণ্য জীবনের উপর লক্ষ্য রাখিয়া তাহার নিজস্ব প্রকৃতি গঠন করিয়াছে। তাহার ধ্যানধারণা ধর্ম-কর্ম সাহিত্য চিন্তার মধ্যে অরণ্যের রূপ স্পষ্ট হইয়া আছে। চব্বিশপরগণা জেলার সাংস্কৃতিক ও সমাজ জীবনের এই বৈচিত্র্যের ভিত্তির উপর ইহার লোকসাহিত্য, লোকউৎসব, পূজা-পার্বণগুলি একান্তভাবে নির্ভরশীল।

সংস্কৃতিগত বিভিন্নতার ফলেই এই জেলায় একটি অখণ্ড লোকসংস্কৃতির রূপ গড়িয়া উঠিবার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল। বিশেষ করিয়া লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমাজ সংহতির অখণ্ডতা উহার বিকাশের পক্ষে সহায়ক। চব্বিশপরগণা জেলার বৃহত্তর সমাজ একদিক দিয়া পুণ্য লোভাতুর ভগীরথীবাসী উচ্চতর হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক গঠিত হইয়া পরে বাণিজ্য ও শিল্পজীবনের দিকে আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিল, অপর দিকে আর একটি সম্প্রদায় দুর্ধর্ষ অরণ্য প্রকৃতির সংগে সংগ্রাম করিয়া সমাজজীবন রচনা করিতে গিয়া ক্রমে কলিকাতা মহানগরীর অর্থনৈতিক প্রভাবের কবলগ্রস্ত হইতে লাগিল। তাহার ফলে তাহাদেরও এক প্রধান অংশ তাহাদের জীবনাচার পরিত্যাগ করিয়া শিল্প জীবনে শ্রমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে লাগিল। তাহার ফলে ইহাদের মধ্য হইতে লোকসাহিত্যের প্রেরণা ক্রমাগতই লুপ্ত হইতে লাগিল। চব্বিশপরগণা জেলার দক্ষিণাংশের নিম্নশ্রেণীর অধিবাসী-দিগের মধ্যে যথার্থ সংহতি গড়িয়া উঠিবার আর একটি প্রধান অন্তরায় এই যে, ইহার একটি প্রধান অংশ আদিবাসী দ্বারা গঠিত। আদিবাসীরও সামাজিক সংহতি আছে। কিন্তু যে আদিবাসী এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছে তাহারা বিভিন্ন সময় ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল হইতে মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়া বিভিন্ন সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বাস করিয়াছে সেই কারণে সংহতি সৃষ্টি অপেক্ষা বিশিষ্টতা দেখা দিয়াছে। ছোটনাগপুর অঞ্চল হইতে দ্রাবিড়ভাষী ও মুণ্ডাভাষী বিভিন্ন শ্রেণীর উপজাতি মেদিনীপুর জেলার ভিতর দিয়া আসিয়া চব্বিশ-পরগণা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন সমাজের সম্মুখীন হইয়া যেমন তাহারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই তেমনি নিজেরাও কোন বিশেষ সমাজ সংহতি গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। সুতরাং বহু দূরাগত হিন্দু সমাজের পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, হিন্দু আদর্শকেও সক্রিয়ভাবে বরণ করিবার শিক্ষা ও সংস্কার তাহাদের নাই বলিয়া তাহারও বিশিষ্ট কোন রূপ তাহারা প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং চব্বিশ-পরগণার লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি বলিতে কোন রসরূপের সন্ধান পাওয়া দুরূহ। আজ শিল্প-বাণিজ্য সভ্যতার সর্বাধিক প্রভাব সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে চব্বিশ-পরগণা জেলার উপর সর্বাধিক পড়িয়াছে—ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চল ও সুন্দরবন অঞ্চলে সেই প্রভাবের ধারা অক্ষুন্ন অব্যাহত গতিতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তথাপি এই শিল্প-বাণিজ্যে আরণ্য সংস্কৃতির প্রভাবের ভিতর দিয়াও ইহার বিশেষত্ব যতই অস্পষ্ট হোক তাহা একেবারেই যে প্রকাশ পায় না, তাহাও বলিবার উপায় নাই।

চব্বিশপরগণা জেলার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইহার উৎসব পরিকল্পিত হইয়াছে। কৃষিভিত্তিক বাংলার পল্লীজীবনে প্রধানত দুইটি উৎসব পালিত হইয়া থাকে একটি পৌষোৎসব অপরটি গাজনোৎসব। গাজনোৎসব প্রকৃতপক্ষে সূর্যোৎসব, গ্রীষ্মের সময় অনাবৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া যথাসময় সুবৃষ্টি দ্বারা প্রচুর কৃষিসম্পদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই এই উৎসব উত্থাপন করা হইয়া থাকে। হিন্দু ধর্মের প্রভাববশতঃ এই উৎসবের সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে শিবের নামটি আসিয়া জড়িত হইবার ফলে ইহা আজ শিবের গাজন বলিয়া পরিচিত। দক্ষিণ-রায়ের পূজা এই জেলার একটি প্রধান উৎসব। জেলার উত্তরাংশের যেখানে নাগরিক সভ্যতার বিস্তৃতি ও প্রাধান্য সেখানে ইহার প্রচলন নাই। দক্ষিণরায়ের পূজা উৎসবের মধ্যে আরও দুইটি উৎসব আজ একাকার হইয়া গিয়াছে। তাহা বাবাঠাকুর বা দক্ষিণরায়ের পূজা, আর একটি নরমুণ্ডের পূজা, ইহার সঙ্গে সুন্দরবনের অরণ্যভূমির প্রতীক বন-দেবতার পূজাও আসিয়া সংমিশ্রণ লাভ করিয়াছে।

ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায়ের মত কুমীরের দেবতা কালুরায়ের পূজা নিম্নবঙ্গের প্রধানতঃ সুন্দরবন ও তাহার

সংলগ্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের লোকোৎসব। এই অঞ্চলে সর্পের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মনসার পূজারও বিশেষ জনপ্রিয়তা দেখা যায়। তবে এই অঞ্চলের মনসা পূজার একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, নিজমনসা গাছের নিচে ঘট বসাইয়া সাধারণতঃ এই দেবীর পূজা হইয়া থাকে, প্রতিমা, পট কিংবা অন্য কিছুর সাহায্যে গৃহে তাহার পূজা সাধারণতঃ হয় না।

চব্বিশপরগণা জেলা গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চল বলিয়া গঙ্গাপূজাও ইহার একটি বিশেষত্ব বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। কিন্তু গঙ্গাপূজা ও দশহারাকে প্রকৃত লোকোৎসব বলা যায় না, ইহা বর্তমানে হিন্দু প্রভাবের বশবর্তী হইবার ফলে উচ্চবর্ণের শাস্ত্রীয় কিংবা পৌরাণিক অনুষ্ঠানে চব্বিশ-পরগণা জেলার নিতান্ত সাধারণ স্তরের লোক যাহাদের লইয়া এখানকার লোকসমাজ (লোক সোসাইটি) গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারা এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে কোনো অন্তরের যোগ অনুভব করিতে পারে না।

চব্বিশপরগণা জেলায় কয়েকটা মুসলমান পীরের দরগাও আছে, ইহাদের মধ্যে কিছু দিন পূর্বেও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমবেত হইত। সাধারণ হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সমানভাবে পীরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করিত। গঙ্গাতীরবর্তী মছন্দালী সেকের দরগা চব্বিশপরগণা জেলার অতি প্রাচীন দরগা। পীর মছন্দালীর মাহাত্মসূচক বহু কাহিনী এদেশের সমাজে প্রচলিত আছে। সুন্দরবন অঞ্চলের একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান পীরের নাম (জিন্দাগামী-জিন্দিক-ই-গাজী) চব্বিশপরগণার গাজী পীরের মেলার মধ্যে হাড়োয়ার গাজী, ঘুটিয়ারী শরিফের গাজী ও তালডাঙ্গার রক্তগাজীর মেলা বিশেষ বিখ্যাত। এই অঞ্চলের মুসলমান কৃষক ও শ্রমিক সমাজে গাজী ছাড়াও সুন্দরবনের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিরূপে আর একটি স্ত্রী-চরিত্রের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি বনবিবি। তবে একথা সত্য দক্ষিণরায়কে অবলম্বন করিয়া যেমন মকর সংক্রান্তিরদিন পূজা ও উৎসব উদযাপন করা হইয়া থাকে, জিন্দাগাজী এবং বনবিবি প্রধানতঃ মুসলমান সমাজ আশ্রিত তাহাদের নামে কোন ব্যাপক সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় না। রাঢ় দেশেই একদা ডোম জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত হইয়াছিল পরে বৌদ্ধ ও হিন্দু আবার ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ধর্মঠাকুর নিরাকার শূন্যমূর্তি বিষ্ণুর অন্যতম অবতার কূর্ম মূর্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এখন গাজন কেবলমাত্র শিবের নামেই চৈত্র সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হয়, ধর্মের নামে বিরাট কোন লোকোৎসবের অনুষ্ঠান হয় না। মন্দিরের মধ্যেই কূর্মের আকৃতিতে পূজিত হন।

এই সকল দেবদেবী ছাড়াও পঞ্চানন্দ ও পাঁচুঠাকুর শিবের সহিত একাকার হইয়া যাইতেছেন। তথাপি এই এই জেলায় বাবাঠাকুর শিবের পুত্র বলিয়া পরিচিত। চব্বিশপরগণা জেলার অনেক অঞ্চলেই বিশালাক্ষী নামক এক দেবীর "থান" এবং মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রাম্য স্ত্রী দেবী মাত্রই কৃষি, ভূমি বা ধরিত্রীর প্রতিনিধি। ইহাদের কোন মূর্তি নাই। কোনো কোনো জায়গায় মাটিতে ছোট, ছোট টিপি তৈয়ার করিয়া তাহাতেই গ্রাম দেবীর পূজা করা হয়। বিশালাক্ষী মূর্তিও সর্বত্র এক নহে।

চব্বিশপরগণা জেলার কাঁটাবেনিয়া গ্রামের বিশালাক্ষী দেবীর প্রসিদ্ধি খুব 'ব্যাপক। জেলে ও মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ই ইহার প্রধান ভক্ত। নদীতীরবর্তী অঞ্চলগুলিতেই বিশালাক্ষী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়।

বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে যে বাৎসরিক জনসমাবেশ হয় তাহাকে সাধারণভাবে মেলা বলা হইয়া থাকে। এক একটি নির্দিষ্ট পল্লীতে এক একটি নির্দিষ্ট উপলক্ষ্যে এক একটি মেলার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কোনো কোনো মেলার উপর অভিজাত হিন্দুধর্মের প্রভাব আসিয়া তথায় দেব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক সময় তাহার লৌকিক পরিচয় সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। বাংলা দেশে একটি মাত্র সর্বভারতীয় হিন্দু তীর্থস্থান আছে তাহা গঙ্গাসাগর—এই জেলায় অবস্থিত। গঙ্গা যেখানে সাগরের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে, তা আজ সর্বভারতীয় হিন্দুর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। গঙ্গাসাগরের বাৎসরিক মেলা আজ সর্বভারতীয় মেলার রূপ ধারণ করেছে। ভারতবর্ষের সকল অঞ্চল থেকেই কোন সাধু-সন্ন্যাসীই নয়, গৃহস্থগণও সেখানে এসে সমবেত হয়। এই মেলাও একদিন স্থানীয় অধিবাসীরই একটি লৌকিক উৎসব অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র ছিল; হয়ত স্থানীয় মৎসজীবীরা সমুদ্রে প্রবেশ করার আগে এখানে সমুদ্রের নামে পুজো দিত, তারপর সমুদ্রগামী

বণিকেরাও এখানেই সমুদ্রের পুজো করে আজো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াত। এই ভাবে তা গড়ে উঠতে লাগল। তারপর সংস্কৃত পুরাণ রচিত হলো, পুরাণে তার মাহাত্ম্য কীর্তিত হলো। তারই পরিকল্পনায় এখানে কপিল মুণির আশ্রম গড়ে উঠল। সগর রাজের ঘোড়া ইন্দ্র এখানে এনে বেঁধে রেখে গেলেন, তারপর কপিলের ক্রোধাগ্নিতে সগর সন্তানগণ ভস্মীভূত হলেন, ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে এসে তাদের উদ্ধার করলেন। পুরাণে যখন এসব কাহিনী রচিত হলো, তখন তার উপর ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দু সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। একটি বিশেষ দিনে দলে দলে লোক সেখানে এসে সমবেত হতে লাগল। যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চার পাঁচ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তির দিনে এখানে স্নান করে। হিন্দু ধর্মের প্রেরণা তার সঙ্গে সংযুক্ত হবার ফলে গঙ্গাসাগর মেলাই আজ বাংলাদেশের বৃহত্তম মেলা। হিন্দু ধর্মের প্রভাবের জন্যই আজ তার লৌকিক পরিচয়টি প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে, কবে কি ভাবে কি উপলক্ষে যে তার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তা বুঝবার উপায় নেই। বাংলাদেশের আর কোন মেলার উপর গঙ্গাসাগরের মেলার মত হিন্দু ধর্মের এত ব্যাপক প্রভাব অনুভব করা যায় না।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত, এই মেলাগুলিই প্রকৃতপক্ষে জাতীয় জীবনের সংহতি গড়িয়া তুলিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। কোন মুসলমান পীরের মৃত্যু উপলক্ষ্যে বাংলার পল্লীতে কোন মেলার যদি প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, ক্রমে তাহা হিন্দু মুসলমান নিরপেক্ষ বাংলার জাতীয় মেলা হইয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ হিন্দুর লৌকিক দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া যে মেলার সৃষ্টি হয় তাহা সর্বশ্রেণীর বাংলার মিলনক্ষেত্রে হইয়া দাঁড়ায়।

এই শ্রেণীর মেলার উৎপত্তির ইতিহাস যেরূপ স্বতন্ত্র তাহাদের প্রত্যেকটি চরিত্রও তদ্রূপ স্বতন্ত্র। প্রত্যেক মেলার স্বতন্ত্র বিবরণ, ধারা ও পরিচয়ের মধ্য দিয়া বাঙালীর বহুমুখী সামাজিক জীবনের বিচিত্র পরিচয় উদ্ধার করা যাইতে পারে।

কলিকাতা হইতে মাত্র বারো মাইল দূরে রায়পুর গ্রাম অবস্থিত। এখানে গঙ্গার তীরে মাঘ মাসের পয়লা হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত দীর্ঘ একমাস ব্যাপী রায়পুরঘাতের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই গঙ্গা পর্তুগীজদিগের কাটা খাল বলিয়া কাটি গঙ্গা নামে পরিচিত। আমাদের ধারণা নদীর ধারা এই অঞ্চলে পূর্বেও ছিল। এই মেলার পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে জানা যায় যে নদীর তীরে কয়েকজন রাখাল বালক একটি কড়ি কুড়াইয়া পায় এবং তাহাদের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে আমি 'নদীর দেবী' এ কড়ি দিয়া এস্থানে আমার পূজা করিস। এইভাবে নদীতীরে তাঁহার পূজা হইতে থাকে। তাহার পর পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রভাবে মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাপূজা, এবং প্রথম শনিবারে কালীপূজা হইতে থাকে। বর্তমানে এই মেলা এই অঞ্চলের বিশেষ জনপ্রিয় লোকোৎসব তবে আধুনিকতা ইহার গ্রামীণ রূপটিকে বিনষ্ট করিয়াছে। রায়পুর গ্রামে ধর্মঠাকুরের পূজা, পীরের পূজা, পঞ্চানন ঠাকুরের পূজা উপলক্ষ্যে লোকোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া কুম্ভকার সম্প্রদায় চাকপূজা, তামলী সম্প্রদায় বরোজপূজা ও জেলে এবং মাঝি সম্প্রদায় নৌকাপূজা করিয়া থাকে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা আমতলা গ্রামের নিকট জয়রাম-পুরের গঙ্গেশ্বর শিবের গাজন উপলক্ষ্যে যে মেলা অনুষ্ঠিত হয় তাহা এতদঞ্চলের সর্ববৃহৎ মেলা। শোনা যায়, যখন জয়রামপুর সুন্দরবনের ঘন জঙ্গল ছিল তখন এই সাধু তথায় গোপনে শিবঠাকুরের পূজা করিতেন। এই শিব অনুমান করা যাইতে পারে ধর্মঠাকুর। তাহার বহুদিন পরে আলেক নামক এক সাধু পিনাক লইয়া ঐ শিবলিঙ্গের মধ্যে বসাইয়া দেন উহা এমনভাবে আঁটিয়া যায় যে সরানো সম্ভব হয় না। ঐ সাধুর নিকট হইতে জানা যায় যে এই লিঙ্গমূর্তিটি স্বয়ম্ভূ। উহার পরবর্তীকালে শিবরাত্রি ও গাজন মেলা আরম্ভ হয়। তাহার পর নীলের বাতি দিয়া প্রায় মাঝরাত্রি পর্যন্ত যতক্ষণ না শিবের বিবাহ সম্পন্ন হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উপবাস থাকিতে হয়। গাজনের সন্ন্যাসীদের নানা অনুষ্ঠান এইখানে লক্ষ্য করিবার মত।

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের মঙ্গলবারগুলিতে বেহালার চণ্ডীতলায় মঙ্গলচণ্ডীর পূজা উপলক্ষ্যে মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলায় মূলত স্ত্রীলোকেরাই বহুদূর দূরান্তর হইতে

আসিয়া থাকেন। মঙ্গলচণ্ডী ব্রত উদ্‌যাপন এই অঞ্চলের নারীদের একটি ব্রতানুষ্ঠান। চণ্ডীদেবীর নিকট গৃহের মঙ্গল ও স্বামীর মঙ্গল কামনা করা হয়। এখানকার চণ্ডীমূর্তি রক্ত সিঁদুর লিপিত শিলামূর্তি। পূর্বে আদি গঙ্গার মূলশাখা সেগোনার চণ্ডীতলার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত বলিয়া শ্রীমন্ত সদাগরের চণ্ডীতলায় আগমনের কীংবদন্তী এখানে প্রচলিত আছে। আমাদের অনুমান সদাগরেরা যখন বাণিজ্যযাত্রা করিতেন তখন সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও বাণিজ্যে সার্থকতা লাভের জন্য দেবী চণ্ডীর আশীর্বাদ লইয়া যাইতেন, ফিরিবার পথেও পূজা দিতেন। এই সকল ঘটনা ধনপতি সদাগরও শ্রীমন্ত সদাগরের কাহিনীকে পরিপুষ্ট করিয়াছে।

চব্বিশপরগণা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত কেয়াতলা হাটের সন্নিকটে কেয়াতলার মাঠ নামক এক শ্মশানে যে মেলা অনুষ্ঠিত হয় তাহা মনসা দাঁড়ির মেলা নামে পরিচিত। সাধারণত আষাঢ়ের সংক্রান্তিতে মঙ্গলবার অথবা শনিবার এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৎসরে একদিনই মাত্র মেলা হয়। মেলাটি স্থানীয় ভাষায় জাঁকিয়া উঠে মনসা পূজাকে কেন্দ্র করিয়া। কেয়াবনে মনসা যে জন্মলাভ করিয়াছিলেন সেই ঐতিহ্য অনুসারে মনসার অপর নাম কেতকা, ইহা হইতেই কেয়াতলা হাটের নামের উৎপত্তি। সম্প্রতি চব্বিশপরগণা জেলার চাড়িংপোতা গ্রামের নামকরণের পশ্চাতে লৌকিক চণ্ডীদেবীর প্রভাব রহিয়াছে তাহার বহু পুত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। মনসা দাঁড়ির মেলা প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন। এখানে শ্মশানের দুটি বটগাছ আছে সেখানে পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়, তিয়র ও বাগদী প্রভৃতি জাতিরা পূজা করেন এবং গ্রামের গোপ সম্প্রদায় পাঁচশো গজ দূরে আর একটি বট গাছের নিকট পূজা করেন। সম্প্রদায় গত বৈষম্য পরবর্তীকালীন বিভেদ নীতিরই ফল।

কেয়াবনে সাপের বাস। জনশ্রুতি এই যে, এক চাষী সাপের কবলে পড়ে তারপর সেখানে মনসার পূজা দেয় এবং তাহার প্রাণ রক্ষা হয়। আরও শোনা যায়, গ্রামের এক ব্যক্তি এই শ্মশানে সদ্য পোঁতা এক মৃত শিশুকে তুলিয়া তাহার উপর শব সাধনা করিয়াছিলেন—ইহা তান্ত্রিকাচার। এই সকল কিম্বদন্তী মনসার মহিমাকে স্থানীয় অঞ্চলকে ব্যাপকভাবে বিস্তার করেও এই মেলা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এখানে মূলতঃ স্ত্রীলোকেরাই বেশী আসেন। এ অঞ্চলে গ্রামবাসীদের মনে একটি ঘটনা এই দেবীর মহিমা সম্পর্কে স্থায়ী বিশ্বাস আনিয়াছে। তাহাদের ধারণা সারা আষাঢ় মাসে যদি বৃষ্টি নাও হয় তবে ঐদিন বৃষ্টি হইবেই। গ্রাম্য লোকের বিশ্বাস যে, ঐদিন বৃষ্টি হইলে সাপের বিষক্ষয় হইবেই। এই মেলার নামকরণ মনসা দাঁড়ির মেলা হইবার কারণ হইল মনসার দাঁড় বা অধিষ্ঠান হিসাবে ঐ স্থানের পরিকল্পনা। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এই মেলায় যোগদান করে। হিন্দুরাই কেবল পূজা দিয়া থাকেন।

বজবজ অঞ্চলের রাগরা হাটের উত্তরে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার বিখ্যাত গ্রামদেবতা বড় কাছারী অবস্থিত। বড় কাছারীতে একটি বৃক্ষ দেবতারূপে পূজিত হন। এই দেবতার কোনো পুরোহিত নাই। শ্মশানে ইঁহার অবস্থান, শ্মশানেই ইঁহার কাছারী। বৃক্ষপূজা আদিম জাতির পূজা, সেই ঐতিহ্য বিভিন্ন রূপান্তরের মধ্য দিয়া আধুনিক জীবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখানে যাঁহারা পূজা দিতে আসেন তাঁহারা একটি কাগজে লাল কালিতে যাহার যাহা প্রার্থনা তাহা লিখিয়া উক্ত বৃক্ষে ঝুলাইয়া দেন। দুধ, গাঁজা, মদ ও শোল মাছ এই দেবতার পূজা উপাচার। মানসিক থাকিলে কেহ কেহ পাঁঠাও বলি দেয়। এই দেবতার প্রভাব স্থানীয় লোকের মনে খুব গভীর। বড় কাছারীর আর এক নাম ভূতের কাছারী। এই ভূতের কাছারী আমতলার নিকট উদয়রামপুরেতে একটি আছে, সেখানে বৈশাখ মাসেও মেলা হয়। তাহার নাম ছোট কাছারী। বড় কাছারীর পূজা পদ্ধতি পূর্বে ছিল অন্য রকম। পূজার আয়োজন (যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে) সাজাইয়া কাক, চিল, ভীমরুল একটি দ্রব্যকে যতক্ষণ স্পর্শ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত ভক্তকে অপেক্ষা করিতে হইত, স্পর্শ করিলে তবে এ পূজা অনুমোদিত হইত। বড় কাছারী ছোট কাছারীর ন্যায় চব্বিশপরগণার বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষপূজার নানাবিধ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার বট অশ্বত্থ গাছের মধ্যে সমারোহ সহকারে

বিবাহ দেবার রীতি উল্লেখযোগ্য। গাছের বিবাহ উপলক্ষ্যে এই অঞ্চলে যে বিশেষ লোক উৎসব প্রতি বছর পালিত হয় তা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

এই জেলায় ছোট ছোট প্রায় পাঁচ শতের অধিক মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই মেলাগুলিকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, প্রথমত আঞ্চলিক, দ্বিতীয়ত: সর্বজনীন। ইহাদের মধ্যে একমাত্র চৈত্র সংক্রান্তির গাজনের মত এত ব্যাপক ও সর্বজনীন উৎসব চব্বিশ-পরগণার জেলার মত বাংলাদেশে আর কোথাও হয় না। ইহা ছাড়া এই জেলার উৎসবে ও মেলাগুলিতে যে অঞ্চলের যে শ্রেণীর লোকের প্রাধান্য সেই শ্রেণীর, জীবনাচার অনুযায়ীই সেই অঞ্চলের উৎসব পার্বণ গড়িয়া উঠিয়াছে। চব্বিশপরগণা জেলার ভৌগোলিক প্রকৃতির মধ্যে অখণ্ড ঐক্য নাই, তেমনি তাহার লোক চরিত্রের মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে। সেই অনুসারে ইহার উৎসব পার্বণ বৈচিত্র্যময় হইয়াছে।



পরিশিষ্ট গ

দক্ষিণরায়

ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়

বাংলার লৌকিক পূজা-পার্বণের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গ তথা দক্ষিণ চব্বিশপরগণার দক্ষিণরায়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধু লোকসমাজে পূজা ও প্রভাবের ব্যাপকতায় নয়, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক—নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে দক্ষিণরায়ের গুরুত্ব অসীম। হাওড়া, হুগলী, খুলনা, যশোহর প্রভৃতি জেলায় স্থান বিশেষে দক্ষিণরায় পূজার প্রচলন থাকলেও দক্ষিণরায় পূজার মূলকেন্দ্র সম্ভবত দক্ষিণ চব্বিশপরগণা। দক্ষিণ চব্বিশপরগণায় দক্ষিণরায়ের পূজা ব্যাপকরূপে অনুষ্ঠিত হয় এবং এতদঞ্চলে দক্ষিণরায়ের আধিপত্য ও প্রাধান্য তুলনামূলকভাবে সর্বাধিক। দক্ষিণবঙ্গের আবাদ অঞ্চলে পঞ্চানন-পঞ্চানন্দ-বিবিমা-বনবিবি-কালুরায়-পীর ও গাজীসাহেবের প্রতিপত্তিকেও অনেকক্ষেত্রে দক্ষিণরায় অতিক্রম করে যায়। নিঃসন্দেহে দক্ষিণবঙ্গের প্রধান লৌকিক দেবতা দক্ষিণরায় এবং দক্ষিণরায় পূজানুষ্ঠান দক্ষিণবঙ্গের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

দক্ষিণ চব্বিশপরগণার বিভিন্ন স্থানে দক্ষিণরায়ের সাধারণত দ্বিবিধ মৃন্ময় মূর্তি পরিলক্ষিত হয়—পূর্ণাঙ্গ দিব্যমূর্তি এবং কাণ্ডবিহীন বারা মুণ্ডমূর্তি। দক্ষিণরায়ের পূর্ণমূর্তির বর্ণহরিদ্রা, অত্যন্ত সুশ্রী ও সুগঠিত দেহ, মাথায় বাবরীচুলের উপর উষ্ণীষ বা শিরোস্ত্রাণ, আয়ত চক্ষু, বিস্তৃত গোঁফ, হাতে তীর-ধনুক-বন্দুক, কোমরে তরবারি, পিঠে ঢাল ও তূণীর। মোটের উপর দক্ষিণরায় পূর্ণ মূর্তি যোদ্ধাবেশী সুপুরুষ। দক্ষিণরায় ক্ষেত্রবিশেষে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্টরূপে দেখা যায়। অনেকক্ষেত্রে দক্ষিণরায় বাহনহীন হলেও প্রায়স ব্যাঘ্র বা অশ্বপৃষ্ঠে আসীন। দক্ষিণরায় স্থানবিশেষে ব্যাঘ্র বা অশ্বারূঢ় পূর্ণ নর মূর্তিতে পূজিত হলেও, লোকসমাজে ব্যাপকভাবে কর্তিত মুণ্ড মূর্তিতেই পূজিত হয় এবং ঐ মুণ্ডমূর্তি দক্ষিণরায়ের বারারূপে কথিত হয়। দক্ষিণরায়ের বারামূর্তি মূলত ধড়বিহীন মনুষ্য মুণ্ডমূর্তি, যার মাথায় শঙ্কুরাকৃতি শিরস্ত্রাণ থাকে। শিরস্ত্রাণ ছোট মুণ্ড মূর্তিতে সংলগ্ন ও বড় মুণ্ড মূর্তিতে পৃথক ভাবে বসানো থাকে, যা ইচ্ছামত মূল মুণ্ড থেকে পৃথক করা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে কচিৎ শিরস্ত্রাণ বিহীন বারারও সন্ধান পাওয়া যায়। সাদা-লাল-কাল রঙে বারার চোখ, ভুরু গোঁফ প্রভৃতি অঙ্কিত হয়। চোখগুলি বড় বড় কান পর্যন্ত টানা, ভুরু চওড়া এবং অর্ধাবৃত্তাকার চিবুক ও গালপাট্টা। স্ত্রী মুণ্ডে গোঁফ থাকে না, পুরুষ মুণ্ডে গোঁফ আঁকা থাকে। শিরস্ত্রাণের উপর নানারকম ফুল লতা পাতা বা আঁকা-বাঁকা রেখা অঙ্কিত থাকে। উগ্রদর্শন বারার শিল্পকলায় আদিমত্বের চিহ্ন সুস্পষ্ট। মূর্তি প্রকরণে কাণ্ডবিহীন দক্ষিণরায় বারা যে কর্তিত নৃমুণ্ড প্রতীক তা সহজেই অনুমেয়।

উন্নত বা বর্ণহিন্দু প্রধান অঞ্চলে দক্ষিণরায়ের মৃন্ময় পূর্ণ মূর্তির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। অগ্রবর্তী অঞ্চলে দক্ষিণরায়ের ইষ্টক নির্মিত মন্দির ও খড় বা টিনে ছাওয়া মাটির "থান" দেখা যায়। এই সমস্ত স্থানে বর্ণ ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্র মতে পূজা করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিত্যপূজা হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিত্যপূজা না হলেও, শনি মঙ্গলবার বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। লোকায়ত সমাজে দক্ষিণরায়ের ব্যাপক পূজা অনুষ্ঠিত হয় বারামুণ্ডমূর্তিতে পৌষ সংক্রান্তি বা তার পরের দিন পয়লা মাঘ আক্ষিণদিনে। দক্ষিণরায়ের বারাপূজা দক্ষিণ চব্বিশপরগণা জেলার সর্বজনীন পূজা বলা যায়। মউল্যা, মলঙ্গী, পোদ, বাগদী, কাঠুরিয়া, শিকারী, বুনো, নৌজীবী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দক্ষিণরায়ের প্রাধান্য দেখা যায়, মুসলমানেরাও এঁকে পীর গাজীর ন্যায় ভক্তি করে। অনেকক্ষেত্রে দক্ষিণরায়ের থান সংলগ্ন "গাজীর থান" বা "বিবিমার থান" পরিলক্ষিত হয়।

আক্ষিণদিনে দক্ষিণ চব্বিশপরগণা জেলায় বিশেষত পূর্ব ও দক্ষিণ অংশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে বারা স্থাপন করে

দক্ষিণরায়ের পূজা করা হয়। দক্ষিণরায় বারাপূজায় ক্ষেত্রবিশেষে একটি বা অনেকগুলি মুণ্ডমূর্তি স্থাপিত হলেও সাধারণত যুগ্মমুণ্ড মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয় যার একটি গোঁফযুক্ত পুরুষ এবং অপরটি গোঁফহীন নারীমূর্তি। অনেকক্ষেত্রে একক পুরুষ বারার পার্শ্ববর্তী জলঘটকে নারী বারা হিসাবে পরিগণিত করা হয়। বারা-পূজা গৃহে বা মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় না ; বনে, নদীতীরে, বৃক্ষমূলে, বৃক্ষ শাখায়, ক্ষেতের আচল, পানের বরজে, গ্রামের সীমান্তে, বাসস্থান থেকে দূরে ঝোপঝাড়, জলাশয়ের ধার বা মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সর্বত্র বারা মূর্তির পাশে মনসা গাছ (Euphorbia neriifolia) প্রত্যক্ষ করা যায়। "বাউনি"র নূতন ধানের শীষগুচ্ছ বিশেষভাবে ক্ষেত্র বিশেষে বারা মূর্তির পাশে বা ঘটের পর রাখা হয় অথবা উপরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। বর্ণহিন্দু অধ্যুষিত অগ্রসর অঞ্চলে দক্ষিণরায় বারা পূজায় ব্রাহ্মণ পৌরহিত্য করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বারা পূজিত হয় শাস্ত্রমন্ত্রহীন লোকায়ত প্রথায়, গ্রামগত ও সমাজগত ভাবে। দক্ষিণ-রায় পূজা সাধারণত অপরাহ্নকাল থেকে আরম্ভ হয় এবং অধিক রাত পর্যন্ত চলে। পূজায় আমিষ নিরামিষ উভয় প্রকার নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়। নূতন ধানের আতপ চালের পায়েস বা নৈবেদ্য ভোগ দেওয়া হয়। দক্ষিণরায় পূজায় সাধারণত হাঁস-পাঠা বলি হয় এবং মদ-গাঁজা উৎসর্গ করা হয়। দক্ষিণরায় বারা পূজার দিন হালবন্ধ, চাকবন্ধ, ধানসিদ্ধ-মাড়া-ঝাড়া-ভাণা প্রভৃতি বন্ধর আনুষ্ঠানিক নিষেধ (taboo) প্রতিপালিত হয়।

দক্ষিণরায়ের লৌকিক পূজানুষ্ঠানের মধ্যে "জাতাল পূজা" সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাতাল পূজা অনুষ্ঠিত হয় সাধারণত বনময় অঞ্চলে গভীর রাত্রে। বনের মধ্যে বা মাঠে প্রয়োজন মত স্থান পরিষ্কার করে মাটির বেদী নির্মাণ করা হয় এবং খেজুর গাছের শাখা দ্বারা বেষ্টিত করা হয়। সাধারণত বেদীর উপর দুটি বারা মুণ্ডমূর্তি স্থাপিত হয় যার একটি পুরুষ ও অপরটি নারী। নিকটবর্তী উচ্চ বৃক্ষ শাখায় লাল ধ্বজা তোলা হয়। গভীর রাত্রে মশাল জ্বালিয়ে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, মদ-মাংস-গাঁজা নৈবেদ্য দিয়ে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজায় হাঁস-পাঠা-মুরগী প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। বলির পশুপক্ষীর রক্তে পূজাঙ্গণ ভেসে যায়। নেশাগ্রস্থ ভক্তগণ কপালে রক্তের টিপ দিয়ে মশাল হস্তে নৃত্য করে এবং অশ্লীল অঙ্গ-ভঙ্গী ও উক্তি-প্রত্যুক্তি করে। পূজার কালে বিশেষত বলির সময় প্রচণ্ড বাদ্যধ্বনি ও উৎকট চিৎকার করা হয়। জাতালে মদ্যপান, অশ্লীল উক্তি প্রত্যুক্তি, যৌন শিথিলতা, বলিদান, উৎকট চিৎকার, প্রভৃতি অবশ্য প্রতিপালিত প্রথা। একটি লৌকিক ছড়ায় জাতালের বৈশিষ্ট্য পাঠ করা যায়—

জাতালে মাতাল কাণ্ড
খুনোখুনি সারা
মদ-মাগী-রক্ত-মাংস
সামাল সামাল বারা।

যদিও বারা মুণ্ডমূর্তি মূলত দক্ষিণরায়ের কাটামুণ্ড হিসাবে ব্যাপকরূপে সর্বজন স্বীকৃত, তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ মুণ্ডটি—গাজীর মাথা, কালুরায়ের মাথা, শনির দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন গণেশের মাথা, রাহুর মাথা, শিবের কোপে দ্বিখণ্ডিত ব্রহ্মার মাথা, বেনাকী বা হালাকাটার মাথা, হুড়ের মাথা ইত্যাদি রূপে কথিত হয়। অনেকক্ষেত্রে যুগ্ম বারার গোঁফহীন স্ত্রীমুণ্ডটি দক্ষিণরায় জননী নারায়নী বা দক্ষিণরায়ের স্ত্রী রায়মনী হিসাবে উল্লেখিত হয়। অঞ্চল ভেদে কাল্পনিক রূপ কল্পনায় দক্ষিণরায়ের বিভিন্ন নাম শোনা যায় যেমন— দক্ষিণরায়, দক্ষিণদার, দক্ষিণেশ্বর, দক্ষিণদর, উঠো ঠাকুর, হুড়ো ঠাকুর, বারা ঠাকুর, বেনাকী বারা, জলকাটান ঠাকুর, রাখাল ঠাকুর, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি। প্রকৃত পক্ষে অনির্দিষ্ট মুণ্ড বলেই বারামুণ্ড বিভিন্ন নামে উক্ত হয়। অবশ্য বিভিন্ন নামে উল্লেখিত হলেও বর্তমানে সাধারণত দক্ষিণরায় বারাই সবিশেষ প্রচলিত ও সাধারণ গ্রাহ্য। রায় মঙ্গল কাব্যেও দক্ষিণরায়ের কর্তিত মুণ্ড বারা হিসাবে উক্ত হয়েছে—

মায়া মুণ্ড এইরূপ দক্ষিণদেশের ভূপ
পূজা করিবেক যতো জন।
বারা তার ক্ষেয়াতি হইবে ঠাঁই ঠাঁই [পূজা] তবে
কোনখানে মুরতি সকল॥

দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে লোকসমাজে বিবিধ বিশ্বাসের প্রচলন দেখা যায়। দক্ষিণরায় বারাঠাকুর বাঘের দেবতা হিসাবে প্রচারিত হলেও, সাধারণত সুবর্ষণ ও সুফলনের সহায়ক, পশুকুলের উৎপাত ও পোকামাকড়ের

উপদ্রব থেকে ফসলের রক্ষক, রোগনিবারক, ক্ষেত্রপাল, বাস্তুদেবতা প্রভৃতি হিসাবেই ব্যাপকভাবে পূজিত হন। গোরু বাছুরের অসুখেও অনেকক্ষেত্রে দক্ষিণরায়ের মানত করা হয়। অবশ্য লোকসমাজে দক্ষিণরায় দুষ্ট প্রভাব মুক্তকারী কৃষি সহায়ক দেবতারূপেই সম্ভবত সর্বাধিক পূজিত হন।

মোটের উপর দক্ষিণরায়ের মূর্তি, পূজাচার, ও দৈব মাহাত্ম্যের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সরেজমিন ক্ষেত্রানুসন্ধানে ও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণায় এ তথ্য সহজলভ্য যে বারা মুণ্ড মূর্তিতেই বৃহত্তর লোকসমাজের প্রায় সর্বত্র দক্ষিণরায় পূজিত হন। বস্তুত উচ্চ ধর্ম ও হিন্দু পৌত্তলিকতার প্রভাববশত অর্বাচীনকালে স্থানবিশেষে দক্ষিণরায়ের পূর্ণাঙ্গ নররূপ কল্পিত হলেও, মুণ্ড পূজার প্রাচীনতম ধারাটি সুন্দরবন অঞ্চলের লোকসমাজে ব্যাপক ও স্বাধীনভাবে রক্ষা পেয়ে এসেছে। বলাবাহুল্য পূর্ণাঙ্গ মূর্তির ন্যায় দক্ষিণরায় নামটিও পরবর্তী কালে সংযুক্ত হওয়া সম্ভব। প্রসঙ্গত ব্যুৎপত্তিগত অর্থে দক্ষিণ অঞ্চলের লোকসমাজে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার-কারী দক্ষিণরায়কে দক্ষিণের অধীশ্বর রাজা হিসাবে চিহ্নিত করার যুক্তি উল্লেখযোগ্য। মনে হয় দক্ষিণবঙ্গের জনসমাজে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারের জন্যই ব্রাহ্মণ্য সমাজ লোকসমাজে ব্যাপকরূপে প্রচলিত বারামুণ্ড মূর্তি পূজাকে, দক্ষিণরায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেন এবং কাল্পনিক কাহিনী বর্ণনায় রায় মঙ্গল কাব্য রচনা করেন। লোকসমাজে ব্যাপকভাবে পূজিত, অনির্দিষ্ট নৃমুণ্ড পূজাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করতে, উপেক্ষা করতে বা লোকমানস থেকে উৎপাটন করতে না পারার জন্যই অর্বাচীন কালে তাকে শাস্ত্রীয়রূপে পূর্ণাঙ্গ দক্ষিণরায়ের কাটামুণ্ড হিসাবে নির্দেশ করে দিব্য মূর্তি দক্ষিণরায় ও নৃমুণ্ড পূজাকে সংযুক্ত করা হয়েছে। বলাবাহুল্য অনার্য লৌকিক দেবদেবীকে এইরূপে শাস্ত্রীয় করে তোলার প্রচেষ্টা ও তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে কাব্য রচনা করা মধ্যযুগের সাহিত্যে বিরল নয়। প্রকৃতপক্ষে আদিম উৎসজাত কর্তিত মুণ্ড পূজাই কালের প্রভাবে বিবর্তনের ধারায় দক্ষিণ-রায় রূপে কল্পিত ও পূজিত হয়েছে। বারা মুণ্ড মূর্তির পূর্ণাঙ্গ নররূপী দক্ষিণরায়ে রূপান্তরের কালে সমাজ পারি-পার্শ্বিকের প্রভাবেই ঐ পূজার আদিম উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বহুল প্রকারে পরিবর্তিত হয় এবং দক্ষিণরায় একান্তভাবে বাঘের দেবতারূপে বর্ণিত হয় বলে বিবেচনা করা যায়।

দক্ষিণরায়কে ব্যাঘ্রদেবতা রূপে চিহ্নিত করার প্রধান ভিত্তি সম্ভবত রায়মঙ্গল কাব্যাদিতে দক্ষিণরায়ের ব্যাঘ্রবাহন রূপ এবং ব্যাঘ্রসৈন্য সহ দক্ষিণরায়ের যুদ্ধ কাহিনী বর্ণনা। সর্বত্রই ব্যাঘ্রবাহন দিব্যরূপে পূজিত হলে হয়ত অনায়াসে বাহন অনুষঙ্গে দক্ষিণরায়কে বাঘের দেবতা বলে দাবী করা সম্ভব হত, এবং সঙ্গতরূপে অনুমান করা যেত বাঘের দেবতার ব্যাঘ্ররূপী zoomorphic পশুমূর্তিই কালের প্রভাবে ব্যাঘ্রবাহন আধুনিক anthromorphic মানবরূপে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এইরূপ অনুমানের পক্ষে প্রধান অন্তরায় প্রচলিত দক্ষিণরায়ের মূর্তি। দক্ষিণরায়ের পূর্ণমূর্তি কোথাও ব্যাঘ্রবাহন আবার কোথাও বা অশ্ববাহন রূপে লোকসমাজে প্রচলিত; অধিকাংশ ক্ষেত্রে বারামুণ্ড মূর্তিতেই দক্ষিণরায় পূজিত হয় যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে বাঘের কোনো সম্পর্কই নেই। সর্বোপরি বিভিন্ন কাব্যের কাহিনী অনুসরণে দেখা যায় দক্ষিণরায় কখনো ব্যাঘ্র বা কখনো কুমীর সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই এদিক থেকে পশু অনুষঙ্গে দক্ষিণরায়ের চরিত্র বৈশিষ্ট্য বিচারের বিশেষ কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। সর্বোপরি অদ্যাপি লোকসমাজে প্রধানত ব্যাঘ্রভয় নিবারণের জন্য দক্ষিণরায় পূজিত হয় না, মূলত সুবর্ষণ ও সুফলনের দুষ্ট শক্তি বিতাড়ক কৃষিসহায়ক দেবতারূপেই পূজিত হন। তাই সামগ্রিক বিচারে আদি ও অকৃত্রিম রূপ কর্তিত বারা মুণ্ড মূর্তির অনুষঙ্গেই দক্ষিণরায়ের মূল তাৎপর্য অনুধাবন সম্ভব।

মূর্তি প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যে কর্তিত মুণ্ড প্রতীক দক্ষিণরায়—বারা আদিম নরবলি বা মুণ্ড শিকার প্রথার স্মৃতিতে জাগ্রত করে। আদিম জাদু বিশ্বাস সঞ্জাত নরবলি প্রথাদিতে নরমুণ্ডের বিশেষ আনুষ্ঠানিক মূল্য সর্বজনবিদিত—

> "In human sacrifice, etc. The head is often ritually cut off and receives separate treatment."

আদিম জাদু বিশ্বাসে কালক্রমে যথার্থ নৃমুণ্ডের বদলে মুণ্ড প্রতীকের ব্যবহার নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন আদিবাসী সমাজের প্রচলিত প্রথায়।

আমাদের দেশেও ভেরিয়ার এলউইন নাগাদের ও খণ্ড উপজাতির অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত কাঠের মুণ্ড ও মুখোস বিশেষকে যথাক্রমে আদিম নৃমুণ্ড শিকার প্রথাজাত নৃমুণ্ড প্রতীক ও উর্বরতা জাদু বিশ্বাস জাত নরবলি প্রথার অবশেষ বলে উল্লেখ করেছেন।

(The tribal world of Verrier Elwin 1964, page 284. The tribal art of middle India, 1951, page 138.)

অনুরূপভাবে যুক্তিসঙ্গত রূপেই দক্ষিণরায়ের বারা মুণ্ড মূর্তিকে আদিম নরবলি বা মুণ্ডশিকার প্রথার অবশেষ রূপে গণ্য করা যায়। যে নামে বা রূপেই পরবর্তীকালে প্রচারিত করার চেষ্টা হোকনা কেন, দক্ষিণরায় যে মূলত কাটামুণ্ড বারা একথা কোনরূপেই অস্বীকার করা সম্ভবপর হয়নি। উচ্চ হিন্দু স্মার্ত সমাজের প্রভাবে রচিত রায় মঙ্গলকাব্যে তাই দেখা যায় গাজীর সঙ্গে যুদ্ধে দক্ষিণরায়ের মুণ্ড চ্যুত হয় এবং সেই কাটা মুণ্ডই বারা রূপে পূজিত হয়—

বড়খাঁ হানিল খাড়া গলায় তাঁহার
মায়া মুণ্ড ক্ষিতে পড়ে এমনি প্রকার ॥
কাটামুণ্ড বারা পূজা সেই হইতে করে
কোনখানে দিব্য মূর্ত্তি বাঘের উপরে ॥

এইভাবে রায়মঙ্গল কাব্যেও দিব্য মূর্তির পাশাপাশি কাটামুণ্ড পূজার উজ্জ্বল স্বীকৃতি সংলক্ষ্য। মোটের উপর মূর্তি প্রকরণ ও শিল্পগত সাদৃশ্য এবং কাব্যগত প্রমাণে একথা স্বীকৃত যে দক্ষিণরায় কোন কোন স্থানে ব্যাঘ্র বাহন দিব্য মূর্ত্তি হলেও মূলত কাটা মুণ্ডর পূজা। তাই সামগ্রিক বিচারে, অনুমিত হয় যে কালের প্রভাবে দক্ষিণরায়ের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি ও ব্যাঘ্র ভয় নিবারণ প্রসঙ্গ বারা ঠাকুরের সঙ্গে যুক্ত হলেও তা মূলত কর্তিত নৃমুণ্ড পূজা। আদিম বিশ্বাসের উৎসে যে কর্তিত নৃমুণ্ড পূজার প্রথা সুন্দরবন অঞ্চলে বিস্মৃত অতীতে প্রচলিত ছিল তারই পরিচয় বহন করে চলেছে দক্ষিণরায়ের কাণ্ডবিহীন মুণ্ডমূর্তি।

অবশ্য কেবলমাত্র দক্ষিণরায় বারার মূর্তি প্রকরণগত সাদৃশ্য বা সাহিত্যিক নিদর্শনের পর নির্ভর না করে ভূতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক গবেষণার সূত্রেও দক্ষিণরায় পূজার পশ্চাৎপট হিসাবে সুন্দরবন অঞ্চলের অতীত সভ্যতা ও আদিম সংস্কৃতির উজ্জ্বল উপস্থিতির তথ্য উদ্ঘাটন করা যায়। বিশেষজ্ঞগণের মতে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার নাব্য অঞ্চল ভূতাত্ত্বিক অবনমনে একাধিকবার বিপর্যস্ত হয়েছে। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ভূখণ্ডের উত্থান পতনের ইতিহাস ভূতত্ত্ববিষয়ক অনুসন্ধানে পাঠ করা যায় এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এই অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক লুপ্ত অতীত ও সুপ্রাচীন অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আধুনিক গবেষকগণ মনে করেন কালের করাল গ্রাসে প্রাগৈতিহাসিক সুন্দরবন অতীত অন্ধকারে লুপ্ত হয় এবং মোগল ও ব্রিটিশ যুগে নূতন করে তার উন্নয়ন সাধিত হয়। সুন্দরবন অঞ্চল থেকে যে সমস্ত মধ্যযুগীয় ও গুপ্তযুগীয় প্রত্ন উপকরণ পাওয়া গেছে তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সুন্দরবন অঞ্চলে জনবসতির অধিষ্ঠান সমসাময়িক কালের ঘটনা নয়। সর্বোপরি সাম্প্রতিক কালে সুন্দরবনের স্থান বিশেষে ভূগর্ভের নিম্নদেশ থেকে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পরীতি সমৃদ্ধ অনেক পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সমস্ত পুরাবস্তু ও প্রত্নউপকরণগুলির সঙ্গে প্রাচীন মিশর, মহেঞ্জদারো-হরপ্পা ও প্রস্তর যুগের উপাদান উপকরণের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত এই সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণে সুন্দরবন অঞ্চলের হারানো অতীত পুনরুদ্ঘাটিত হয় এবং প্রত্নসাক্ষ্যে অনুমান করা যায় যে নিম্নবঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী বিস্তৃত অঞ্চল, বিশেষত দক্ষিণ চব্বিশপরগণা অঞ্চল সুদূর অতীতে আদিম সভ্যতার একটি বিশিষ্ট লীলাভূমি ছিল। দক্ষিণ চব্বিশপরগণার আদিম সভ্যতার ধারাবাহিকতা প্রাকৃতিক ভৌগোলিক বিপর্যয়ে বার বার বিপর্যস্ত হওয়ায় তার প্রাচীনত্বের প্রচুর নিদর্শন রয়ে গেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। তাই সুন্দরবন ও দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণা অঞ্চলের যথার্থ ইতিহাস বহুলাংশে ভূতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদের উৎখনন এবং নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীদের গবেষণা মুখাপেক্ষী। এদিক থেকে দক্ষিণ-রায়ের মুণ্ড মূর্ত্তি সুন্দরবনের হারানো অতীতের জীবন্ত সাক্ষ্য যার মাধ্যমে আমরা এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী-দের ধর্মাচারের লুপ্ত পরিচয় উদ্ধার করতে সক্ষম হই। এই প্রসঙ্গে বারা মুণ্ড পূজার আদিমত্ব সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে ডায়মণ্ডহারবারের অন্তর্গত হরিনারায়ণপুর গ্রামে নব্যপ্রস্তর যুগের সমগোত্রীয় অস্ত্রাদির সঙ্গে প্রাপ্ত মুণ্ডমূর্ত্তির কথা

সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিল্পপ্রকরণের দিক থেকে ঐ মুণ্ড মূর্তির সঙ্গে বারামুণ্ড মূর্তির আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। পত্রাকার শিরস্ত্রাণ যুক্ত এই মুণ্ডাকৃতি পোড়ামাটির মূর্তি লোকসমাজে প্রচলিত বারামুণ্ড মূর্তির আদিম নিদর্শনরূপে হয়ত গণ্য করা যায় এবং ভারত ও অন্যান্য দেশের কর্তিত নৃমুণ্ড পূজক আদিম জাতির ন্যায় এই অঞ্চলের আদিবাসীদের দ্বারা সুদূর অতীতে বারা মুণ্ড পূজার প্রচলন হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

পরবর্তীকালে নবপর্যায়ে জঙ্গল হাসিল করে সুন্দরবনের ব্যাঘ্র অধ্যুষিত অরণ্য অঞ্চলে চাষাবাদ ও জনপদ বিস্তারের কালে আদিম নৃমুণ্ড পূজার সঙ্গে কার্য কারণ সূত্রে ব্যাঘ্র-প্রসঙ্গ যুক্ত হয়েছে বলে মনে হয়। বড় খাঁ গাজী বা বনবিবির প্রসঙ্গ থাকায় অনুমান করা যায়, যে সময় বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলে মুসলমান আধিপত্য বিস্তার হয় সেই সময় দক্ষিণরায় প্রসঙ্গের বিস্তার ঘটে। রায়মঙ্গলকাব্য, বনবিবির জহুরানামা, গাজী-কালু-চম্পাবতী প্রভৃতি কাব্য কাহিনীর মধ্যে আঞ্চলিক অধিপতিদের লড়াই ও হিন্দু মুসলমান সংঘাতের চিত্র এবং সর্বশেষে সাম্প্রদায়িক মিলন ও সংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়—

অর্দ্ধেক মাথায় কালো একভাগে চূড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি হাথে।
ধবল অর্দ্ধেক কায় অর্দ্ধনীল মেঘ প্রায়
কোরাণ পুরাণ দুই হাথে॥
এইরূপ দরশন পাইয়াছে দুইজন
ধরিয়া পড়িল দুই পায়।
তুলিয়া অখিলনাথে বুঝাইয়া হাথে হাথে
দুইজন দোস্তানি পাতায়॥

'কাব্য কাহিনীর পৃষ্ঠায় কোরাণ-পুরাণ ও হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সাম্প্রতিক ইতিহাস পাঠ করা গেলেও দক্ষিণরায়-গাজী-বনবিবি কাহিনীর মধ্যে এমন কতকগুলি তথ্যের আভাস আছে যার সঙ্গে নরবলি বা নৃমুণ্ড তথা বারা মুণ্ড মূর্তির প্রত্নমূলক সাক্ষ্যের পূর্ণসঙ্গতি বিদ্যমান। ঐ সমস্ত কাব্যের মধ্যে দক্ষিণরায় নররক্ত পিপাসু ও নরবলির জন্য কাতর হিসাবে চিত্রিত হয়েছেন। রায়মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণরায় রতাই বাউল্যাকে নিজের পুত্র বলি দিয়ে তাঁর পূজা করতে বলেছেন—

আমি দক্ষিণের রায় সর্বলোকে গুণগায়
আঠারো ভাটিতে পূজে সভে
পুত্র দিয়া বলিদান পূজ আমা সবিধান
ছয় ভাই জীয়াইবে তবে॥

বনবিবির জহুরা নামায় দক্ষিণরায় সরাসরি নরবলি দাবী করেছেন—

যাবত না দেয় মোরে নরবলি পূজা
নাহি দিব মোম-মধু-দেখাইব মজা।
… … …
যদি তুমি নরবলি-পূজা পার দিতে
সাত ডিঙা মোম দিব তোমার তরেতে॥

এইভাবে দেখা যায় দক্ষিণরায় সর্বত্র নরবলী প্রার্থী ও একান্তরূপে নররক্ত পিপাসু।

দেব-দেবীর আচার-আচরণ ও বাসনা-কামনা দেবতা বিশেষের মৌলিক চরিত্র বৈশিষ্ট অনুধাবনের সহায়ক। এই দিক থেকে বারার মূর্তিপ্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের অনুগামী হিসাবে দক্ষিণরায়ের নরবলি কামনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উগ্র নররক্ত পিপাসা ও নরবলি কামনা এবং কর্তিত বারা নৃমুণ্ড মূর্তি, দক্ষিণরায়ের আদিম চরিত্রকে প্রকট করে এবং এই সূত্রে নাগা বা খণ্ড উপজাতির ন্যায় উর্বরতা জাদু বিশ্বাস ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিশ্বাসে নরবলি দেওয়া বা মুণ্ড শিকার প্রথার একদা এ অঞ্চলে প্রচলনের সম্ভাবনা সম্পর্কিত অনুমানের উদ্রেক করে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য অদ্যাপি দক্ষিণ চব্বিশপরগণার প্রায় সর্বপ্রকার দেব-দেবীর পূজার অন্যতম অঙ্গ বিভিন্ন প্রকার বলিদান প্রথা। দক্ষিণ-রায়ের পূজা বিশেষত 'জাতাল' পূজানুষ্ঠানে বলিদানের প্রাচুর্য সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অর্বাচীনকালে রচিত হলেও রায়মঙ্গল কাব্য ও অন্যান্য কাব্য-কাহিনীতে যে সাহিত্য-মূলক সাক্ষ্য (Literery evidence) বর্তমান, তার সঙ্গে বারা ঠাকুরের কর্তিত মুণ্ডের শিল্পপ্রকরণগত (Iconographical) ও প্রত্নমূলক (Archaeological) সাক্ষ্যর সঙ্গতিসূত্রে অনুমান করা যায় যে বারামুণ্ড মূর্তির পূজা, সুপ্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ও আদিম উর্বরতা জাদু বিশ্বাস থেকে জাত মুণ্ড শিকার বা নরবলি প্রথা থেকে উদ্ভূত। কালক্রমে নৃমুণ্ড পূজার আদিম প্রথার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে বড় খাঁ গাজি-বনবিবি-দক্ষিণরায়-কালু-

রায়ের প্রসঙ্গ এবং হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত-সম্মিলনের কথা।

যুগসন্ধির কালে বিভিন্ন ধর্ম-সংস্কৃতি যখন ঘটনাচক্রে পরস্পরের সম্মুখীন হয় তখন দ্বন্দ্ব সংঘাতের মাধ্যমে চলে সমন্বয়ের চেষ্টা এবং এইভাবেই আদিম আচার বিশ্বাস ও লৌকিক দেবদেবী শাস্ত্রীয় স্তরে উন্নীত হন। দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের এই ঐতিহাসিক বস্তুমূলক পথেই অন্যান্য স্থানের ন্যায় দক্ষিণ চব্বিশপরগণার আদিম উর্বরতা জাদু বিশ্বাসের উৎসে উৎসারিত নৃমুণ্ড পূজা স্থানকালবিশেষে রূপান্তরিত হয়েছে দক্ষিণরায়ে। ঐতিহাসিককালে সুন্দরবন অঞ্চলে বন্যমধু আহরণ, কাঠকাটা, পশু-মৎসশিকার এবং কৃষিকর্মের পক্ষে প্রধান অন্তরায় ছিল বাঘের উপদ্রব। তাই নূতন করে বন হাসিল ও জনপদ বিস্তারের সময় কালক্রমে আদিম উর্বরতা জাদুমূলক নৃমুণ্ড পূজার সঙ্গে বাঘের প্রসঙ্গ যুক্ত হয় এবং তার সমর্থনে কাল্পনিক ব্যাখ্যায় রায়মঙ্গল কাব্যাদি রচিত হয় বলা যায়। এইভাবেই কর্তিত মুণ্ড-প্রতীক বারা, ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায় রূপে লোকসমাজে প্রচারিত ও পূজিত হন। হিন্দু পৌত্তলিকতার প্রভাবে পরবর্তীকালে বারা মুণ্ডমূর্তির স্থলে দক্ষিণরায়ের পূর্ণাঙ্গ দিব্যমূর্তির প্রবর্তন হয়। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণরায় বা বারামুণ্ডমূর্তি-বিবর্তনের এক প্রান্তে আদিম নরবলি বা নৃমুণ্ড শিকার প্রথা এবং অন্যপ্রান্তে পূর্ণাঙ্গ নরমূর্তির পুতুল প্রতিমা। তাই মঙ্গলকাব্যের কবিকেও ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাঘ্রবাহন দক্ষিণরায়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, কেবলমাত্র দক্ষিণরায় বারা মুণ্ডমূর্তির কথা ঘোষণা করতে হয়েছে—

বাঘের উপরে নাঞি দক্ষিণের রায়
একখানি মুণ্ড মাত্র বারা বলে তায়।

নৃতত্ত্ববিদ ও লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীদের মতে—নরবলি, নৃমুণ্ডশিকার ও কর্তিত মুণ্ডপূজার প্রথা মূলত আদিম উর্বরতা সহায়ক জাদু বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এদিক থেকে লোকসমাজে ব্যাপকরূপে পূজিত ধড়বিহীন কর্তিত নৃমুণ্ডাকৃতি দক্ষিণরায় বারামূর্তি আদিম নরবলি প্রথা, মুণ্ডশিকার প্রথা, বা নৃমুণ্ড পূজার অতীত ইতিহাসকে নির্দেশ করে বলে অনুমিত হয় এবং এই সূত্রে স্বভাবতই মনে হয় দক্ষিণরায় মৌলিক বৈশিষ্ট্যে ব্যাঘ্র দেবতা নয়, আদিম উর্বরতা জাদু বিশ্বাসজাত নৃমুণ্ড শিকার বা মুণ্ড পূজার অবশেষ।

দক্ষিণবঙ্গে ব্যাপক প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে এই লৌকিক দেবতার দক্ষিণরায় নাম ও মুণ্ডমূর্তির শিরস্ত্রাণটি সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বুৎপত্তিগত অর্থে দক্ষিণ অঞ্চলের রাজা বা অধিপতিই দক্ষিণরায় (Lord of the South) এবং মাথার শিরস্ত্রাণ তথা রাজমুকুট দক্ষিণ অঞ্চলের উপর তাঁর সর্বব্যাপী আধিপত্য বা প্রভুত্বের স্মারক হিসেবে বিবেচিত হয়। মূর্তি প্রকরণগত দিক থেকেও বারা মুণ্ডমূর্তির ত্রিকোণাকৃতি শিরোভূষণও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শিরোভূষণের সঙ্গে বাংলার লৌকিক ইতুব্রত বা সূর্যপূজার আল্পনার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, যা বারা মুণ্ডপূজার সঙ্গে উর্বরতাবাদের নিকট সম্পর্ককে ভিন্ন দিক থেকে সমর্থন করে। সর্বোপরি দক্ষিণরায় পূজায় স্ত্রী ও পুরুষ দুই বিপরীত লিঙ্গের যুগ্মবারার সহঅবস্থান প্রজনন সহায়ক লৌকিক উর্বরা জাদু বিশ্বাসের প্রতীকরূপে বিবেচিত হয়। লোকসমাজে দক্ষিণরায় বারামুণ্ড প্রতীকেই ব্যাপকরূপে পূজিত হয় এবং সুবর্ষণ ও সুফলনের কৃষিসহায়ক দেবতা বা 'ক্ষেত্রপাল' রূপেই বন্দিত হন। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য রায়মঙ্গল কাব্যেও দক্ষিণরায় ক্ষেত্রপালরূপে উক্ত হয়েছেন—

আমি শুয়্যা থাকি টঙ্গে ক্ষেত্রপাল মনরঙ্গে
মোরে দেখা দিল ততক্ষণ।

বা

মায়া করি ক্ষেত্রপতি হরিষ অন্তরে
ভাসিয়া উঠিল বারা সলিল উপরে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লোকসমাজে প্রচলিত দক্ষিণরায়-বারা পূজার মন্ত্ররূপে কথিত লৌকিক কাব্য' যেখানে গণেশ-মহালক্ষ্মী-নারায়ণ-নারায়ণী প্রভৃতি দেব-দেবীর নাম উচ্চরিত হলেও প্রথমত ও প্রধানত তাঁকে মুণ্ডরূপেই অভিহিত করা হয়েছে এবং ক্ষেত্রপাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে—

মুণ্ডমাতা মুণ্ডপিতা
নারায়ণঃ নারায়ণী
ক্ষেত্রপাল মহালক্ষ্মী
গণেশানন—নমোনমঃ ॥

কর্তিত নৃমুণ্ড পূজার ঐতিহ্যজাত বলেই দক্ষিণরায়-বারা পূজার মন্ত্রে স্পষ্টতই মুণ্ডমাতা মুণ্ডপিতা শব্দের ব্যবহার একথা অনুমান করা যায় এবং 'মুণ্ডমাতা-মুণ্ডপিতা' বলায় স্পষ্টতই বিপরীত লিঙ্গ-প্রতীক যুগ্মবারার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে বলা যায়—যা সমগ্রভাবে দক্ষিণরায় পূজার মৌলিক তাৎপর্য উদ্ঘাটন করে।

স্থানকাল ভেদে এবং উচ্চসমাজ ও শাস্ত্রীয় পৌরাণিকতার প্রভাবে যে নাম বা রূপেই, পরবর্তী অধ্যায়ে, দক্ষিণরায়কে বর্ণিত করার চেষ্টা হোক না কেন, দক্ষিণরায় যে মৌলিক উৎসে মুণ্ডবিশেষ এবং মৌলিক তাৎপর্য কৃষি সংশ্লিষ্ট উর্বরতা জাদু বিশ্বাসজাত লৌকিক দেবতা এ সত্য অনস্বীকার্য। সাহিত্য-দৃষ্টান্ত, লোকপ্রচলিত কিংবদন্তী, দেবমাহাত্ম্য সম্পর্কিত প্রচলিত বিশ্বাস, মূর্তিপ্রকরণগত বৈশিষ্ট্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, পূজার কাল, বিপরীত লিঙ্গের যুগ্মবারার পূজা, জাতাল পূজার বিশেষ অনুষ্ঠান—অশ্লীল উক্তি-প্রত্যুক্তি, অবাধ যৌনাচার ও অন্যান্য পূজাবিধি, ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় দক্ষিণরায় মৌল তাৎপর্যে ব্যাঘ্রদেবতা বা বনদেবতা রূপে বিবেচিত হবার সম্ভাবনা রহিত। বরং বিপরীতক্রমে সরেজমিন অনুসন্ধান ও ও নৃতত্ত্ব লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সর্বদিক বিশ্লেষণে বোঝা যায়, সুবর্ষণ ও সুশস্যদাতা এবং অশুভশক্তি বিতাড়ক ও শস্যক্ষেত্রের রক্ষাকর্তা হিসাবে দক্ষিণরায় ঋতুমৌল কৃষি সমাজের শস্যসম্পর্কিত লৌকিক দেবতা। কালের প্রভাবে ও বিবর্তনের ধারায় মূর্তি ও পূজাচারে বহুবিধ পরিবর্তন সাধিত হলেও সামগ্রিক বিচারে দক্ষিণরায়ের আদিম উৎস উদ্ঘাটন করা যায় এবং উপযুক্ত তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া যায় যে দক্ষিণরায় লৌকিক বৈশিষ্ট্যে কৃষিসহায়ক আদিম উর্বরতা জাদু বিশ্বাস সঞ্জাত কাণ্ডবিহীন কর্তিত নৃমুণ্ড পূজা।

পরিশিষ্ট ঘ

স্থানসূচী

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

(as on 17th February 1964)

AGARTALA

1 Laxmi Bhandar Books & Scientific Sales (Rest)

AGRA

1 National Book House, Jeoni Mandi (Reg.)
2 Wadhawa & Co., 45, Civil Lines (Reg.)
3 Banwari Lal Jain, Publishers, Moti Katra (Rest)
4 English Book Depot, Sadar Bazar, Agra Cantt. (Rest)

AHMADNAGAR

1 V. T. Jorakar, Prop., Rama General Stores, Navi Path (Rest)

AHMEDABAD

1 Balgovind Kuber Dass & Co., Gandhi Road (Reg.)
2 Chandra Kant Chiman Lal Vora, Gandhi Road (Reg.)
3 New Order Book Co., Ellis Bridge (Reg.)
4 Mahajan Bros., Opp. Khadia Police Gate (Rest)
5 Sastu Kitab Ghar, Near Relief Talkies, Patthar Kuva, Relief Road (Reg.)

AJMER

1 Book Land, 663, Madar Gate (Reg.)
2 Rajputana Book House, Station Road (Reg.)
3 Law Book House, 271, Hathi Bhata (Reg.)
4 Vijay Bros., Kutchery Road (Rest)
5 Krishna Bros., Kutchery Road (Rest)

ALIGARH

1 Friend's Book House, Muslim University Market (Reg.)

ALLAHABAD

1 Superintendent, Printing & Stationery, U. P.
2 Kitabistan, 17-A, Kamala Nehru Road (Reg.)
3 Law Book Co., Sardar Patel Marg, P. Box 4 (Reg.)
4 Ram Narain Lal Beni Modho, 2-A, Katra Road (Reg.)
5 Universal Book Co., 20, M. G. Road (Reg.)
6 University Book Agency (of Lahore), Elgin Road (Reg.)
7 Wadhwa & Co., 23, M. G. Marg (Rest)
8 Bharat Law House, 15, Mahatma Gandhi Marg (Rgst)
9 Ram Narain Lal Beni Prashad, 2-A, Katra Road (Rest)

AMBALA

1 English Book Depot, Ambala Cantt. (Reg.)
2 Seth Law House, 8719, Railway Road, Ambala Cantt. (Rest)

AMRITSAR

1 The Law Book Agency, G. T. Road, Putligarh (Reg.)
2 S. Gupta, Agent, Government Publications, Near P. O. Majith Mandi (Reg.)
3 Amar Nath & Sons, Near P. O. Majith Mandi (Reg.)

ANAND

1 Vijaya Stores, Station Road (Rest)
2 Charto Book Stall, Tulsi Sadan, Station Road (Rest)

ASANSOL

1 D. N. Roy & R. K. Roy, Booksellers, Atwal Building (Rest)

BANGALORE

1 The Bangalore Legal Practitioner Co-operative Society Ltd., Bar Association Building (Reg.)
2 S. S. Book Emporium, 118, Mount Joy Road (Reg.)
3 The Bangalore Press, Lake View, Mysore Road, P. O. Box 507 (Reg.)
4 The Standard Book Depot, Avenue Road (Reg.)
5 Vichara Sahitya Private Ltd., Balepet (Reg.)
6 Makkala Pustaka Press, Balamandira, Gandhinagar (Reg.)
7 Maruthi Book Depot, Avenue Road (Reg.)
8 International Book House (P) Ltd., 4F, Mahatma Gandhi Road (Reg.)
9 Navakarnataka Pubns. (P) Ltd., Majestic Circle (Rest)

BAREILLY

1 Agarwal Brothers, Bara Bazar (Reg.)

BARODA

1 Shri Chandrakant Mohan Lal Shah, Raopura (Rest)
2 Good Companions Booksellers, Publishers & Sub-Agent (Rest)
3 New Medical Book House, 540 Madan Zampa Road (Rest)

BEAWAR

1 The Secretary, S. D. College, Co-operative Stores Ltd. (Rest)

BELGHARIA

1 Granthlok, Antiquarian Booksellers & Publishers (24-Parganas), 5/1, Ambica Mukherjee Road (Reg.)

BHAGALPUR

1 Paper Stationery Stores, D. N. Singh Road (Reg.)

BHOPAL

1 Superintendent, State Govt. Press
2 Lyall Book Depot, Mohd. Din Bldg. Sultania Road (Reg.)
3 Delite Books, Opp. Bhopal Talkies (Rest)

BHUBANESWAR

1 Ekamra Vidyabhaban, Eastern Tower, Room No.3 (Rest)

BIJAPUR

1 Shri D. V. Deshpanda, Recognied Law Booksellers, Prop. Vinod Book Depot, Near Shiralshetti Chowk (Rest)

BIKANER

1 Bhandani Bros. (Rest)

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

BILASPUR

1 Sharma Book Stall, Sadar Bazar (Rest)

BOMBAY

1 Supdt., Printing and Stationery, Queens Road
2 Charles Lambert and Co., 101, Mahatma Gandhi Road (Reg.)
3 Co-operator's Book Depot, 5/32, Ahmed Sailor Bldg., Dadar (Reg.)

BOMBAY

4 Current Book House, Maruti Lane, Raghunath Dadaji Street (Reg.)
5 Current Technical Literature Co. (P) Ltd., India House, 1st floor (Reg.)
6 International Book House Ltd., 9, Ash Lane, M. G. Road (Reg.)
7 Lakkami Book Depot, Girgaum (Reg.)
8 Elpees Agencies, 24, Bhangwadi, Kalbadevi (Reg.)
9 P. P. H. Book Stall, 190-B, Khetwadi Main Road (Reg.)
10 New Book Co., 188-190, Dr. Dadabhai Naoroji Road (Reg.)
11 Popular Book Depot, Lamington Road (Reg.)
12 Sundar Das Gian Chand, 601, Girgaum Road, Near Princess Street (Reg.)
13 D. B. Taraporewala Sons & Co. (P) Ltd., 210, Dr. Dadabhai Naoroji Road (Reg.)
14 Thacker and Co., Rampart Row (Reg.)
15 N. M. Tripathi Private Ltd., Princess Street (Reg.)
16 The Kothari Book Depot. King Edward Road (Reg.)
17 P. H. Rama Krishna and Sons, 147, Rajaram Bhuvan, Shivaji Park Road No. 5 (Rest)
18 C. Jamnadas and Co., Booksellers, 146-C, Princess St. (Reg.)
19 Indo Nath and Co., A-6, Daulat Nagar Borivli (Reg.)
20 Minerva Book Shop, Shop No. 1/80, N. Subhas Road (Reg.)
21 Academic Book Co., Association Building, Girgaum Road (Rest)
22 Dominion Publishers, 23, Bell Bldg. Sir P. M. Road (Rest)
23 Bombay National History Society, 91, Walkeshwar Road (Rest)
24 Dowamadeo and Co., 16, Naziria Building, Ballard Estate (Rest)
25 Asian Trading Co., 310, the Miraball, P. B. 1505 (Rest)

CALCUTTA

1 Chatterjee and Co., 3/1, Becharam Chatterjee Lane (Reg.)
2 Dass Gupta and Co. P. Ltd., 54/3, College Street (Reg.)
3 Hindu Library, 69A, Bolaram De Street (Reg.)
4 S. K. Lahiri and Co, P.Ltd.,CollegeStreet (Reg.)
5 M. C. Sarkar and Sons P. Ltd., 14, Bankim Chatterjee Street (Reg.)
6 W. Newman and Co. Ltd., 3, Old Court House Street (Reg.)
7 Oxford Book and Stationery Co., 17, Park Street (Reg.)
8 R. Chambray and Co. Ltd.. Kent House P. 33, Mission Row Extension (Reg.)
9 S. C. Sarkar and Sons (P) Ltd., 1C, College Square (Reg.)
10 Thacker Spink and Co. (1933) (P) Ltd., 3, Esplanade East (Reg.)

CALCUTTA

11 Firma K. L. Mukhopadhya, 6/1A, Bancha Ram Akrur Lane (Reg.)
12 K. K. Roy, P. Box No. 10210, Calcutta-19 (Rest)
13 Sm. P. D. Upadhya, 77, Muktaram Babu Street (Rest)
14 Universal Book Dist.,8/2, Hastings Street (Rest)
15 Modern Book Depot, 9, Chowringhee Centre (Rest)
16 Soor and Co., 125, Canning Street (Reg.)
17 S. Bhattacherjee, 49, Dharamtala Street (Rest)
18 Mukherjee Library, 10, Sarba Khan Road (Reg.)
19 Current Literature Co., 208, Mahatma Gandhi Road (Reg.)
20 The Book Depository, 4/1, Madan Street (1st floor) (Rest)
21 Scientific Book Agency, Netaji Subhas Road (Rest)
22 Reliance Trading Co., 17/1, Banku Bihari Ghosh Lane, District Howrah (Rest)
23 Indian Book Dist. Co., 6512, Mahatma Gandhi Road (Rest)

CALICUT

1 Touring Book Stall (Rest)

CHANDIGARH

1 Supdt., Govt. Printing and Stationery, Punjab
2 Jain Law Agency, Flat No. 8, Sector No. 22 (Reg.)
3 Rama News Agency, Booksellers, Sector No. 22 (Reg.)
4 Universal Book Store, Booth 25 Sector 22 D (Reg.)
5 English Book Shop, 34, Sector 22 D (Rest)
6 Mehta Bros, 15-Z, Sector 22 B (Rest)
7 Tandon Book Depot, Shopping Centre, Sector 16 (Rest)
8 Kailash Law Publishers, Sector 22 B (Rest)

CHHINDWARA

1 The Verma Book Depot. (Rest)

COCHIN

1 Saraswat Corporation Ltd., Palliarakav Road (Reg.)

CUTTACK

1 Press Officer, Orissa Sectt.
2 Cuttack Law Times (Reg.)
3 Prabhat K. Mahapatra, Mangalabag, P.B.35 (Reg.)
4 D. P. Sur & Sons, Mangalabag (Rest)
5 Utkal Stores, Balu Bazar (Rest)

DEHRA DUN

1 Jugal Kishore & Co., Raipure Road (Reg.)
2 National News Agency, Paltan Bazar (Reg.)
3 Bishan Singh and Mahendra Pal Singh, 318, Chukhuwala (Reg.)
4 Uttam Pustak Bhandar, Paltan Bazar (Rest)

DELHI

1 J. M. Jaina & Brothers, Mori Gate (Reg.)
2 Atma Ram & Sons, Kashmere Gate (Reg.)
3 Federal Law Book Depot, Kashmere Gate (Reg.)
4 Bahri Bros., 188, Lajpat Rai Market (Reg.)
5 Bawa Harikishan Dass Bedi (Vijaya General Agencies) P, B. 2027, Ahata Kedara, Chamalian Road (Reg.)
6 Book-Well, 4, Sant Narankari Colony, P. B. 1565 (Reg.)
7 Imperial Publishing Co., 3, Faiz Bazar, Daryaganj (Reg.)

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

DELHI

8 Metropolitan Book Co., 1, Faiz Bazar (Reg.)
9 Publication Centre, Subzimandi (Reg.)
10 Youngman & Co., Nai Sarak (Reg.)
11 Indian Army Book Depot, 3, Daryaganj (Reg.)
12 All India Educational Supply Co., Shri Ram Bldgs., Jawahar Nagar (Rest)
13 Dhanwant Medical & Law Book House, 1522, Lajpat Rai Market (Rest)
14 University Book House, 15 W. B. Bangalore Road, Jawahar Nagar (Rest)
15 Law Literature House, 2646, Balimaran (Rest)
16 Summer Bros, P. O. Birla Lines (Rest)
17 Universal Book & Stationery Co., 16, Netaji Subhash Marg (Reg.)
18 B. Nath & Bros., 3808, Charakhawalan (Chowri Bazar) (Rest)
19 Rajkamal Prakashan P. Ltd., 8, Faiz Bazar (Reg.)
20 Premier Book Co., Printers, Publishers & Booksellers, Nai Sarak (Rest)
21 Universal Book Traders 80, Gokhale Market (Reg.)
22 Tech. & Commercial Book, Coy., 75, Gokhale Marke (Rest)
23 Saini Law Publishing Co., 1416, Chabiganj, Kashmere Gate (Rest)
24 G. M. Ahuja, Booksellers & Stationers, 309, Nehru Bazar (Rest)
25 Sat Narain & Sons, 3141 Mohd. Ali Bazar, Mori Gate (Reg.)
26 Kitab Mahal (Wholesale Div.) P. Ltd., 28, Faiz Bazar (Reg.)
27 Hindu Sahitya Sansar, Nai Sarak (Rest)
28 Munshi Ram Manohar Lal, Oriental Booksellers & Publishers, P. B. 1165, Nai Sarak (Rest)
29 K. L. Seth, Suppliers of Law, Commercial Tech. Books, Shanti Nagar, Ganeshpura (Rest)
30 Adarsh Publishing Service, 5A/10, Ansari Road (Rest)

DHANBAD

1 Ismag Co-operative Stores Ltd., P. O. Indian School of Mines (Reg.)
2 New Sketch Press, Post Box 26 (Rest)

DHARWAR

1 The Agricultural College Consumers Co-operative Society (Rest)
2 Rameshraya Book Depot., Subhas Road (Rest)
3 Karnatakaya Sahitya Mandira of Publishers and Booksellers

ERNAKULAM

1 Pai & Co., Cloth Bazar Road (Rest)
2 South India Traders, C/o, Constitutional Journal (Reg.)

FEROZEPUR

1 English Book Depot, 78, Jhoke Road

GAUHATI

1 Mokshada Pustakalaya (Reg.)

GAYA

1 Sahitya Sadan, Gautam Budha Marg (Reg.)

GHAZIABAD

1 Jayana Book Agency (Rest)

GORAKHPUR

1 Vishwa Vidyalaya Prakashan, Nakhes Road (Reg.)

GUDUR

1 The General Manager, The N. D. C. Publishing & Ptg. Society Ltd. (Rest)

GUNTUR

1 Book Lovers Private Ltd., Kadriguda, Chowrasta (Reg.)

GWALIOR

1 Supdt., Printing & Stationery, M. B.
2 Loyal Book Depot, Patankar Bazar, Laskhar (Reg.)
3 M. C. Daftari, Prop. M. B. Jain & Bros., Booksellers, Sarafa, Lashkar (Rest)

HUBLI

1 Pervaje's Book House, Koppikar Road (Reg.)

HYDERABAD

1 Director, Govt. Press
2 The Swaraj Book Depot, Lakdikapul (Reg.)
3 Book Lovers Private Ltd. (Rest)
4 Labour Law Publication, 873, Sultan Bazar (Rest)

IMPHAL

1 Tikendra & Sons Booksellers (Rest)

INDORE

1 Wadhawa & Co., 56, M. G. Road (Reg.)
2 Swarup Brother's, Khajuri Bazar (Rest)
3 Madhya Pradesh Book Centre, 41, Ahilya Pura (Rest)
4 Modern Book House, Shiv Vilas Palace (Rest)
5 Navyug Sahitya Sadan, Publishers & Booksellers, 10, Khajuri Bazar (Rest)

JABALPUR

1 Modern Book House, 286, Jawaharganj (Reg.)
2 National Book House, 135, Jai Prakash Narain Marg (R.)

JAIPUR

1 Government Printing and Stationery Department, Rajasthan
2 Bharat Law House, Bookseller & Publishers, Opp. Prem Prakash Cinema (Reg.)
3 Garg Book Co., Tripolia Bazar (Reg.)
4 Vani Mandir, Sawai Mansingh Highway (Reg.)
5 Kalyan Mal & Sons, Tripolia Bazar (Rest)
6 Popular Book Depot, Chaura Rasta (Reg.)
7 Krishna Book Depot, Chaura Rasta (Reg.)
8 Dominion Law Depot, Shah Building P. B. No. 23 (Rest)

JAMNAGAR

1 Swadeshi Vastu Bhandar (Reg.)

JAMSHEDPUR

1 Amar Kitab Ghar, Diagonal Road, P. B. 71 (Reg.)
2 Gupta Stores, Dhatkidih (Reg.)
3 Sanyal Bros., Booksellers & News Agents, Bistapur Market (Rest)

JAWALAPUR

1 Sahyog Book Depot (Rest)

JHUNJHUNU

1 Shashi Kumar Sarat Chand (Rest)
2 Kapram Prakashan Prasaran, 1/90, Namdha Niwas, Azad Marg (R.)

JODHPUR

1 Dwarka Das Rathi, Wholesale Books and News Agents (Reg.)
2 Kitab Ghar, Sojati Gate (Reg.)
3 Choppra Brothers, Tripolia Bazar (Rest)

JULLUNDUR

1 Hazooria Bros., Mai Hiran Gate (Rest)
2 Jain General House, Bazar Bansanwala (Reg.)
3 University Publishers, Railway Road (Rest)

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

KANPUR
1 Advani & Co., P. Box. 100, The Mall (Reg.)
2 Sahitya Niketan, Shradhanand Park (Reg.)
3 The Universal Book Stall, The Mall (Reg.)
4 Raj Corporation, Raj House, P. B. 200, Chowk (Rest)

KARUR
1 Shri V. Nagaja Rao, 26, Srinivasapuram (Rest)

KODARMA
1 The Bhagawati Press, P. O. Jhumri Tilaiya, Dt. Hazaribagh (Reg.)

KOLHAPUR
1 Maharashtra Granth Bhandar, Mahadwar Road (Rest)

KOTA
1 Kota Book Depot (Rest)

KUMTA
1 S. V. Kamta, Booksellers & Stationers (N. Kanara) (Reg.)

LUCKNOW
1 Soochna Sahitya Depot (State Book Depot)
2 Balkrishna Book Co. Ltd., Hazratganj (Reg.)
3 British Book Depot, 84, Hazaratganj (Reg.)
4 Ram Advani, Hazaratganj, P. B. 154 (Reg.)
5 Universal Publishers (P.) Ltd., Hazartganj (Reg.)
6 Eastern Book Co., Lalbagh Road (Reg.)
7 Civil & Military Educational Stores, 106/B, Sadar Bazar (Rest)
8 Acquarium Supply Co., 213, Faizabad Road (Rest)
9 Law Book Mart, Amin-Ud-daula Park (Rest)

LUDHIANA
1 Lyall Book Depot, Chaura Bazar (Reg.)
2 Mohindra Brothers, Katchari Road (Rest)
3 Nanda Stationery Bhandar, Pustak Bazar (Rest)
4 The Pharmacy News, Pindi Street (Rest)

MADRAS
1 Supdt., Govt. Press, Mount Road
2 Account Test Insitutte, P. O. 760 Emgore (Reg.)
3 C. Subbiah Chetty & Co., Triplicane (Reg.)
4 K. Krishnamurty, P. B-384 (Reg.)
5 Presidency Book Supplies 8, Pycrofts Road, Triplicane (Reg.)
6 P. Vardhachary & Co., 8 Linghi Chetty Street (Reg.)
7 Palani Parchuram, 3, Pycrofts Road, Triplicane (Reg.)
8 NCBH Private Ltd. 199, Mount Road (Rest)
9 V. Sadanand, The Personal Bookshop, 10, Congress Bldg., 111, Mount Road (Rest)

MADURAI
1 Oriental Book House, 258, West Masi Street (Reg.)
2 Vivekananda Press, 48, West Masi Street (Reg.)

MANDYA SUGAR TOWN
1 K. N. Narimhe Gawda & Sons, (Rest)

MANGALORE
1 U. R. Shenoye Sons, Car Street, Post, Box 128 (Reg.)

MANJESHWAR
1 Mukenda Krishna Nayak (Rest)

MATHURA
1 Rath & Co., Tilohi Bldg. Bengali Ghat (Rest)

MEERUT
1 Prakash Educational Stores, Subhas Bazar (Reg.)
2 Hind Chitra Press, West Kutchery Road (Reg.)
3 Loyal Book Depot, Chhipi Tank (Reg.)
4 Bharat Educational Stores, Chippi Tank (Rest)
5 Universal Book Depot, Booksellers & News Agents

MONGHYR
1 Anusandhan, Minerva Press Bulding (Rest)

MUSSOORIE
1 Cambridge Book Depot, The Mall (Rest)
2 Hind Traders (Rest)

MUZAFFARNAGAR
1 Mittal & Co., 85-C, New Mandi (Rest)
2 B. S. Jain & Co., 71, Abupura (Rest)

MUZAFFARPUR
1 Scientific & Educational Supply Syndicate (Reg.)
2 Legal Corner, Tikmanio House, Amgola Road (Rest)
3 Tirhut Book Depot (Rest)

MYSORE
1 H. Venkataramiah & Sons, New Statue Circle (Reg.)
2 Peoples Book House, Opp. Jagan Mohan Palace (Reg.)

MYSORE
3 Geeta Book House, Booksellers & Publishers, Krishnamurthipuram (Rest)
4 News papers House, Lansdowne Building (Rest)
5 Indian Mercantile Corporation, Toy Palace, Ramvilas (Rest)

NADIAD
1 R. S. Desay, Station Road (Rest)

NAGPUR
1 Supdt., Govt. Press & Book Depot (Reg.)
2 Western Book Depot, Residency Road (Reg.)
3 The Asstt. Secretary, Mineral Industry Association, Mineral House (Rest)

NAINITAL
1 Coural Book Depot, Bara Bazar (Rest)

NANDED
1 Book Centre, College Law General Books, Station Road (Rest)
2 Hindustan General Stores, Paper & Stationery Merchants P. B. No. 51 (Rest)
3 Sanjoy Book Agency, Vazirabad (Rest)

NEW DELHI
1 Amrit Book Co., Connaught Circus (Reg.)
2 Bhawani & Sons, 8F, Connaught Place (Reg.)
3 Central News Agency, 23/90, Connaught Circus (Reg.)
4 Empire Book Depot. 278 Aliganj (Reg.)
5 English Book Stores, 7-L. Connaught Circus P. O. B. 328 (Reg.)
6 Faqir Chand & Sons, 15-A, Khan Market (Reg.)
7 Jain Book Agency, C-9, Prem House, Connaught Place (Reg.)
8 Oxford Book & Stationery Co., Scindia House (Reg.)
9 Ram Krishna & Sons (of Lahore) 16/B, Connaught Place (Reg.)

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

NEW DELHI

10 Sikh Publishing House, 7-C, Connaught Place (Reg.)
11 Suneja Book Centre, 24/90, Connaught Circus (Reg.)
12 United Book Agency, 31, Municipal Market, Connaught Circus (Reg.)
13 Jayana Book Depot, Chhaparwala Kuan, Karol Bagh (Reg.)
14 Navayug Traders, Desh Bauhdu Gupta Road, Dev Nagar (Reg.)
15 Sarawati Book Depot. 15, Lady Harding Road (Reg.)
16 The Secretary, Indian Met. Society, Lodi Road (Reg.)
17 New Book Depot, Latest Books, Periodicals, Sty. & Novelles, P. B. 96, Connaught Place (Reg.)
18 Mehra Brothers, 50-G, Kalkaji (Reg.)
19 Luxmi Book Stores, 42, Janpath (Rest)
20 Hindi Book House, 82 Janpath (Rest)
21 People Publishing House (P) Ltd., Rani Jhansi Road (Reg.)
22 R. K. Publishers, 23, Beadon Pura, Karol Bagh (Rest)
23 Sharma Bros., 17, New Market, Moti Nagar (Reg.)
24 Aspki Dukan, 5/5777, Dev Nagar (Rest)
25 Sarvodaya Service, 66A-1, Rohtak Road, P. B. 2521 (Rest)
26 H. Chandson, P. B, No. 3034 (Rest)
27 The Secretary, Federation of Association of Small Industry of India, 23/B/2 Rohtak Road (Rest)
28 Standard Booksellers & Stationers, Palam Enclave (Rest)
29 Lakshmi Book Depot, 57, Regarpura (Rest)
30 Sant Ram Booksellers, 16, New Municipal Market, Lody Colony (Rest)

PANJIM

1 Singhals Book House P. O. B. 70 Near the Church (Rest)
2 Sagoon Gaydev Dhoud Booksellers, 5-7, Rua, 31 de Jameria (Rest)

PATHANKOT

1 The Krishna Book Depot, Main Bazar (Rest)

PATIALA

1 Supdt., Bhupendra State Press
2 Jain & Co., 17, Shah Nashin Bazar (Reg.)

PATNA

1 Supdt., Govt. Printing (Bihar)
2 J. N. P. Agarwal & Co., Padri-Ki-Haveli Raghunath Bhawan (Reg.)
3 Luxmi Trading Co., Padri-Ki-Haveli (Reg.)
4 Moti Lal Banarsi Dass, Bankipore (Reg.)
5 Bengal Law House, Chowhatta (Rest)

PITHORAGARH

1 Maniram Punetha & Sons (Rest)

PONDICHERRY

1 M/s. Honesty Book House, 9 Rue Duplix (R.)

POONA

1 Deccan Book Stall, Deccan Gymkhana (Reg.)
2 Imperial Book Depot, 266, M. G. Rd. (R.)
3 International Book Service, Deccan Gymkhana (Reg.)
4 Raka Book Agency, Opp. Natu's Chawl Near Appa Balwant Chowk (Reg.)
5 Unity Book Depot, 1339, Shivaji Nagar (Rest)

PUDUKOTTAI

1 Shri P. N. Swaminathan Sivam & Co., East Main Road (Rest)

RAJKOT

1 Mohan Lal Dossabhai Shah, Booksellers and Sub-agents (Reg.)

RANCHI

1 Crown Book Depot, Upper Bazar (Reg.)
2 Pustak Mahal, Upper Bazar (Rest)

REWA

1 Supdt., Govt. State Emporium V. P.

ROURKELA

1 The Rourkela Review (Rest)

SAHARANPUR

1 Chandra Bharata Pustak Bhandar, Court Road (Rest)

SECUNDERABAD

1 Hindustan Diary Publishers, Market Street (Reg.)

SILCHAR

1 Shri Nishitto Sen, Nazirpatti (Rest)

SIMLA

1 Supdt., Himachal Pradesh Govt.
2 Minerva Book Shop, The Mall (Reg.)
3 The New Book Depot, 79, The Mall (Reg.)

SINNAR

1 Shri N. N. Jakhadi, Agent, Times of India, Sinnar (Nasik) (Rest)

SHILLONG

1 The Officer-in-Charge, Assam Govt., B. D.
2 Chapla Bookstall, P. B. No. 1 (Rest)

SONEPAT

1 United Book Agency (Reg.)

SRINAGAR

1 The Kashmir Bookshop, Residency Road (Reg.)

SURAT

1 Shri Gajanan Pustakalaya, Towar Road (Reg.)

TIRUCHIRAPALLI

1 Kalpana Publishers, Wosiur (Reg.)
2 S. Krishnaswami & Co., 35, Subhash Chandra Bose Road (Reg.)
3 Palamiappa Bros. (Rest)

TRIVANDRUM

1 International Book Depot, Main Road (Reg.)
2 Reddear Press & Book Depot, P. B. No. 4 (Rest)

TUTICORIN

1 Shri K. Thiagarajan, 10/C, French Chapal Road (Rest)

UDAIPUR

1 Jagdish & Co., Inside Surajapole (Rest)
2 Book Centre, Maharana, Bhopal Consumers, Co-op. Society Ltd. (Rest)

UJJAIN

1 Manak Chand Book Depot, Sati Gate (Rest)

VARANASI

1 Students Friends & Co., Lanka (Rest)
2 Chowkhamba Sanskrit Series Office, Gopal Mandir Road, P. B. 8 (Reg.)

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

VARANASI

3 Globe Book Centre (Rest)
4 Kohinoor Stores, University Road, Lanka (Reg.)
5 B. H. U. Book Depot (Rest)

VELLORE

1 A. Venkatasubhan, Law Booksellers (Reg.)

VIJAYAWADA

1 The Book & Review Centre, Eluru Road, Governpet (Rest)

VISAKHAPATNAM

1 Gupta Brothers, Vizia Bldg. (Reg.)
2 Book Center, 11/97, Main Road (Reg.)
3 The Secy. Andhra University, General Co-op. Stores Ltd. (Rest)

VIZIANAGARAM

1 Sarda & Co. (Rest)

WARDHA

1 Swarajeya Bhandar, Bhorji, Market (Reg.)

FOR LOCAL SALE

1 Govt. of India Kitab Mahal, Janpath, Opp. India Coffee House, New Delhi
2 Govt. of India Book Depot, 8, Hesting Street, Calcutta
3 High Commissioner for India in London, India House, London, WC. 2

RAILWAY BOOKSTALL HOLDERS

1 S/S. A. H. Wheeler & Co., 15, Elgin Road, Allahabad
2 Gahlot Bros., K. E. M. Road, Bikaner
3 Higginbothams & Co. Ltd., Mount Road, Madras.
4 M. Gulab Singh & Sons Private Ltd., Mathura Road, New Delhi

FOREIGN

1 S/S, Education Enterprise Private Ltd., Kathumandu (Nepal)
2 S/S. Akite Bologat, C. E. Fritzes Kungl, Hovobokhandel, Fredigation-2, Box 1656, Stockholm-16 (Sweden)
3 Reise-und Verkehrsverlag Stuttgart, Post 730, Gutenoergstra 21, Stuttgart. No. 11245, Stuttgart den (Germany West)
4 Shri Iswar Subramanyam, 452, Reversite Driv Apt. 6, New York, 27 NWY
5 The Proprietor, Book Centre, Lakshmi Mansons 49, The Mall, Lahore (Pakistan).

ON S. AND R. BASIS

1 The Head Clerk, Govt. Book Depot, Ahmedabad
2 The Asst. Director, Extension Centre, Kapileswar Road, Belgaum
3 The Employment Officer, Employment Exchange Dhar
4 The Asst. Director, Footwear Extension Centre, Polo Ground No. 1, Jodhpur
5 The O.I/C., Extension Centre., Club Road, Muzaffarpur
6 The Director, Indian Bureau of Mines, Govt. of India, Ministry of Mines & Fuel, Nagpur
7 The Asstt. Director, Industrial Extension Centre, Nadiad (Gujarat)

ON S. AND R. BASIS

8 The Head Clerk, Photozincogrophic Press, 5, Finance Road, Poona.
9 Govt. Printing & Stationery, Rajkot
10 The O.I/C., Extension Centre, Industrial Estate, Kokar, Ranchi
11 The Director, S. I. S. I. Industrial Extension Centre, Udhna, Surat
12 The Registrar of Companies, Narayani Bulding, 27, Brabourne Road, Calcutta-1
13 The Registrar of Companies, Kerala, 50, Feet Road, Ernakulam
14 The Registrar of Companies, H. No.3-5-83, Hyderguda, Hyderabad
15 The Registrar of Companies, Assam, Manipur and Tripura. Shillong
16 The Registrar of Companies, Sunlight Insurance Bldg., Ajmeii Gate Extension, New Delhi
17 The Registrar of Companies, Punjab and Himachal Pradesh, Link Road, Jullundur City
18 The Registrar of Companies, Bihar, Jamal Road, Patna-1
19 The Registrar of Companies, Raj. & Ajmer ; Shri Kamta Prasad House, 1st Floor, 'C' Scheme, Ashok Marg, Jaipur
20 The Registrar of Companies, Andhra Bank Bldg. 6, Linghi Chetty St., P. B. 1530, Madras
21 The Registrar of Companies, Mahatma Gandhi Road, West Cott. Bldg., P B. 334, Kanpur
22 The Registrar of Companies, Everest 100, Marine Drive, Bombay
23 The Registrar of Companies. 162, Brigade Road, Bangalore
24 The Registrar of Companies, Gwalipr
25 Asstt. Director, Extension Centre. Bhuli Road, Dhanbad.
26 The Registrar of Companies, Orissa, Cuttack Chandi, Cuttack
27 The Registrar of Companies, Gujarat State, Gujarat Samachar Bldg., Ahmedabad
28 Publication Division, Sale Depot, North Block, New Delhi
29 The Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi
30 The O.I/C., University Employment Bureau, Lucknow
31 O.I/C., S. I. S. I. Extension Centre, Malda
32 O.I/C., S. I. S. I. Extension Centre,' Habra, Tabalaria, 24-Parganas
33 O.I/C.. S. I. S. I. Model Carpentry Workshop, Piyali Nigar, P. O. Burnipyr
34 O.I/C., S. I, S. I, Chrontanning Extension Centre, Tangra 33, North Topsia Road, Calcutta-46
35 O. I/C., S. I. S. I. Extension Centre (Footwear), Calcutta
36 Asstt. Director, Extension Centre, Hyderabad
37 Asstt. Director, Extension Centre, Krishna Distt. (A. P)
38 Employment Officer, Employment Exchange, Jhabua
39 Dy. Director Incharge, S. I. S. I., C/o., Chief Civil Admn. Goa, Panjim
40 The Registrar of Trade Unions, Kanpur
41 The Employment Officer, Employment Exchange, Gopal Bhavan, Mornia
42 The O. I/C., State Information Centre, Hyderabad
43 The Registrar of Companies, Pondicherry
44 The Asstt. Director of Publicity and Information, Vidnana Saubha (P. B. 271) Bangalore.

পি. আর. জি. ১৬৭(বি) (iii) (এন)
১,০০০

অঙ্ক প্রেস, ৫১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা ৯, ভারত হইতে মুদ্রিত এবং দি ম্যানেজার অব্ পাবলিকেশনস, সিভিল লাইনস্, দিল্লী হইতে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত।

মূল্য ঃ ১০ টা. ৫০প. বা ২৪শি. ৬পে. বা ৩ড. ৭৮সে.